# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

## অখণ্ড

স্বামী গম্ভীরানন্দ




উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

# প্রথম খণ্ডের গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্বিখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থরচনার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া কর্তব্য। দুই বৎসরাধিক পূর্বে স্বামী বামদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের জীবনীর একখানি পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিতে দেন। অতঃপর গুরুজনদিগের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগপূর্বক একখানি নাতিবৃহৎ পুস্তক-প্রণয়ন আবশ্যক। বর্তমান প্রচেষ্টা ঐ সিদ্ধান্তের ফল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, স্বামী বামদেবানন্দের প্রাথমিক উদ্যম এবং উৎসাহই ইহার ভিত্তিভূমি। এতদ্ব্যতীত তৎসংগৃহীত তথ্যগুলিও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিদৃষ্টে অথবা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সহিত আলোচনাক্রমে এই পুস্তকে এমন অনেক ঘটনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। অধিকন্তু বিচ্ছিন্ন জীবনীগুলিতে ঘটনা ও সময়াদির যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা অনেকাংশে পরিহৃত হইয়াছে।

জীবনীগুলির পারম্পর্য স্থির করা সুকঠিন। তথাপি বিশৃঙ্খলার হস্তে আত্মসমর্পণ অবাঞ্ছনীয় বুঝিয়া আমরা প্রথমে সন্ন্যাসীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে আবার পাঁচজন ঈশ্বরকোটির জীবনী প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের পরে গৃহী ভক্তেরা ও সর্বশেষে স্ত্রীভক্তবৃন্দ স্থান পাইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইহাতে উচ্চাবচত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না—সে বিচার আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-রচয়িতার সহিত বলি—

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম।<br>
সকলে আমার পূজ্য বুঝিবে এমন ॥<br>
ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার।<br>
সকলে বুঝিবে রামকৃষ্ণ-পরিবার ॥

ইহা সত্য হইলেও পাঠক হয়তো লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থ-রচনার সৌকর্যার্থে জীবনীগুলির পারম্পর্য বিষয়ে কতকটা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারের ঐতিহাসিক গতি ও গুরুত্বকেই পরিমাপকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের দুঃখ এই যে, উপাদানাভাবে এবং গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধিভয়ে আরও কয়েকটি অমূল্য জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

এই পুস্তকরচনায় আমরা যে সকল গ্রন্থ বা ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থে কয়েকটি নাম সংক্ষেপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নাম যথাক্রমে ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' যথাক্রমে 'লীলাপ্রসঙ্গ' 'কথামৃত' ও 'পুঁথি'-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সর্বশেষে ভক্তদের চরণে প্রার্থনা এই,

কৃপাবিন্দু ভক্তবৃন্দ কর মোরে দান।
অধমেরে যুগলচরণে দেহ স্থান ॥ (পুঁথি)

চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৫৮ গম্ভীরানন্দ

---

# দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

উপাদানের অভাবে ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অনেকগুলি জীবনী পূর্ণতর করিতে এবং ইচ্ছা থাকিলেও অপর কতকগুলি জীবনী মুদ্রিত করিতে পারি নাই—ইহা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই বলিয়া আসিয়াছি। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

প্রথম ভাগের ন্যায় এই ভাগেরও পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীর নাম শ্রীশ্রীমা, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম মহারাজ এবং স্বামী শিবানন্দের নাম মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৺সপ্তমী পূজা, ১৩৫৯ গম্ভীরানন্দ

# সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ভূমিকা | ... | ... | ছ |
| স্বামী বিবেকানন্দ | ... | ... | ১ |
| স্বামী ব্রহ্মানন্দ | ... | ... | ৬৩ |
| স্বামী যোগানন্দ | ... | ... | ১০০ |
| স্বামী প্রেমানন্দ | ... | ... | ১২৪ |
| স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | ... | ... | ১৫২ |
| স্বামী শিবানন্দ | ... | ... | ১৬৮ |
| স্বামী সারদানন্দ | ... | ... | ২০৩ |
| স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ | ... | ... | ২৩২ |
| স্বামী অভেদানন্দ | ... | ... | ২৫৮ |
| স্বামী অদ্ভুতানন্দ | ... | ... | ২৮৩ |
| স্বামী তুরীয়ানন্দ | ... | ... | ৩১০ |
| স্বামী অদ্বৈতানন্দ | ... | ... | ৩৩৬ |
| স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ | ... | ... | ৩৪৭ |
| স্বামী অখণ্ডানন্দ | ... | ... | ৩৬৭ |
| স্বামী সুবোধানন্দ | ... | ... | ৩৮৯ |
| স্বামী বিজ্ঞানানন্দ | ... | ... | ৪০৬ |
| পূর্ণচন্দ্র ঘোষ | ... | ... | ৪২৫ |
| মথুরানাথ বিশ্বাস | ... | ... | ৪৩৬ |
| শম্ভুচরণ মল্লিক | ... | ... | ৪৫০ |
| নাগ মহাশয় | ... | ... | ৪৫৪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বলরাম বসু | ... | ... | ৪৭৫ |
| মাস্টার মহাশয় | ... | ... | ৪৮৮ |
| অধরলাল সেন | ... | ... | ৫০৫ |
| গিরিশচন্দ্র ঘোষ | ... | ... | ৫১১ |
| সুরেন্দ্রনাথ মিত্র | ... | ... | ৫৩০ |
| রামচন্দ্র দত্ত | ... | ... | ৫৪২ |
| মনোমোহন মিত্র | ... | ... | ৫৫৮ |
| দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার | ... | ... | ৫৭২ |
| সুরেশচন্দ্র দত্ত | ... | ... | ৫৮৭ |
| অক্ষয়কুমার সেন | ... | ... | ৫৯২ |
| নবগোপাল ঘোষ | ... | ... | ৫৯৭ |
| হরমোহন মিত্র | ... | ... | ৬০৩ |
| মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত | ... | ... | ৬০৭ |
| উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ৬১২ |
| চুনীলাল বসু | ... | ... | ৬২০ |
| কালীপদ ঘোষ | ... | ... | ৬২৫ |
| রানী রাসমণি | ... | ... | ৬২৯ |
| গোপালের মা | ... | ... | ৬৪১ |
| যোগীন-মা | ... | ... | ৬৫৬ |
| গোলাপ-মা | ... | ... | ৬৬৭ |
| গৌরী-মা | ... | ... | ৬৭৬ |
| লক্ষ্মী-দিদি | ... | ... | ৬৯১ |
| নির্ঘণ্ট | ... | ... | ৬৯৯ |

# ভূমিকা

শ্রীভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম—যুগপ্রয়োজন-অনুসারে ধর্মের গ্লানি-অপনোদন, দ্বিতীয়—রসাস্বাদন। এই উভয় কার্যের সহায়করূপে তিনি বিশেষ বিশেষ যোগ্য পাত্রকেও ধরাধামে আনয়ন করেন। ইঁহারা বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেও যথাসময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার কৃপায় অচিরে নিজ নিজ স্বরূপ ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের চিরন্তন সম্বন্ধ অবগত হন। এইরূপে তাঁহারা নিজেরা তো কৃতকৃত্য হনই, অধিকন্তু শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত দ্বিবিধ লীলাপুষ্টির সহায়কও হন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার অঙ্গ, কেহ উপাঙ্গ, কেহ বা তাঁহার পার্ষদাদি। ভগবান যতদিন স্থূলদেহে সংসারে বিরাজমান থাকেন, ততদিন ইঁহারা তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়া থাকেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও আনন্দ দেন এবং তাঁহার উপদেশ-অনুসারে নিজ নিজ ধর্মজীবন গঠন করেন। পরে ভগবান স্থূলশরীর ত্যাগ করিলে ইঁহারা তাঁহার আরব্ধ লোককল্যাণকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া যথাকালে স্ব স্ব ধামে প্রয়াণ করেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ও বিশেষকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য। তাঁহারা যে এ পৃথিবীর লোক ছিলেন না, তাহা বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের জীবনের ধারা ও অধ্যাত্মরাজ্যে দ্রুত, অভূতপূর্ব উন্নতির কথা পর্যালোচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। অন্য দশজনের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিপালিত হইয়া, কিরূপে এক অন্তর্নিহিত প্রেরণায় তাঁহারা নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া—অধিকাংশ স্থলে যৌবনের প্রারম্ভেই—শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে উপনীত হন এবং তাঁহার দিব্যস্পর্শে এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পান, তাহা পাঠ করিলে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইতে হয়। আরও বিস্মিত হইতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের লোক চিনিবার ও তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ভাব-অনুযায়ী ধর্মরাজ্যে অগ্রসর করিয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহি-ত্যাগী, ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ভেদ ছিল না। দেহগত কোন বাহ্য আবরণ তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারিত না। কোন কোন স্থলে জগন্মাতা তাঁহাকে পূর্ব হইতেই ইঁহাদের আগমনবিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য সাধনকালের অবসানে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ঐ সকল চিহ্নিত ভক্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' প্রভৃতি

প্রামাণিক গ্রন্থে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত মিলনপ্রসঙ্গে তাঁহার পূর্বোক্ত শক্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন পাই। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রধানত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বভাবতই জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার অদর্শনের পর তাঁহার বিশেষ কৃপাপুষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণ কিভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন—তখনও তাঁহাদের বাক্য ও আচরণে ঠাকুরের মহিমাই পরিস্ফুট হইয়াছিল কি-না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সফল হইয়াছিল কি-না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঠাকুরের সহিত মিলনের পূর্বেকার জীবনবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিবার কৌতূহল হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' আমাদের এই উভয়বিধ আকাঙ্ক্ষারই অন্তত আংশিক পূর্তি সাধন করে। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিত বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আবার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পরবর্তী জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। পক্ষান্তরে, ঠাকুর যাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন, এমন কাহারও কাহারও জীবনের ইতিহাস একপ্রকার অপরিজ্ঞাত বলিলেই চলে। দীর্ঘকাল ব্যতীত হওয়ায় এখন এমন কেহ জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই, যাঁহার নিকট ইঁহাদের সম্বন্ধে নূতন কিছু উপাদান সংগ্রহ করা চলে। কাজেই গ্রন্থকার প্রাপ্ত উপকরণসমূহের যতটুকু বা যতখানি যে-ভাবে সাজাইলে অল্প পরিসরের মধ্যে ইঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠে, তৎপ্রতিই দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ইহাতে অনেক পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছেন। ফলে পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে উহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অলোকসামান্য মহত্ত্ব ও মাধুর্য সাধারণ মনকেও আপনা হইতে এক উচ্চ ভূমিতে লইয়া যায়। মনে হয়, অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণই যেন এই সকল শুদ্ধ আধার-অবলম্বনে লোককল্যাণার্থ নানাভাবে লীলা করিতেছেন—যেন তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ বাস্তবিকই অভেদ। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ঠাকুরই রূপায়িত হইয়া আছেন। ভক্তগণের পরবর্তী জীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, দেহত্যাগের পরও শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী শক্তি তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদে সমভাবে রক্ষা করিতেছে। ইহাতে আমরা তাঁহার অপার্থিব ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই এবং তাঁহারই চরণে নিজেদের উৎসর্গ করিতে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হই।

সাগরগামিনী বিশালকায়া নদী যেমন বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিপুল ভূভাগকে শস্যশালী ও অসংখ্য জীবকে জলদানে তৃপ্ত করে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও সেইরূপ

লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজনসাধন ও ত্রিতাপদগ্ধ মানবের শান্তিবিধান করিয়াছেন। অন্য কথায়, ঠাকুর ছিলেন যেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক বিদ্যুদাধার, আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেন ঐ অমিত তেজের সঞ্চরণের উপযোগী তারসমূহ। ইঁহাদের বহুমুখী শক্তির উৎস তিনিই; সকলেই এক বিশেষাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিব্যসংস্পর্শে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ ইঁহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অল্পকালস্থায়ী না হইয়া আজীবন নরনারায়ণের সেবায় অর্পিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সকলের কর্মক্ষেত্র অবশ্য সমান ছিল না এবং হইবার কথাও নহে; কারণ তাঁহাদের জাগতিক জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা একরূপ ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবৈভব ও গুণগরিমায় সকলের শীর্ষস্থানীয় নরেন্দ্রনাথ বা জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দও যেমন ছিলেন, তেমনি আবার আভিজাত্যের সম্পর্কশূন্য নিরক্ষর লাটু মহারাজ বা স্বামী অদ্ভুতানন্দও ছিলেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারায় একটি ওলটপালট আনিয়া দিয়াছেন—যাহার পূর্ণবিকাশ হইতে এখনও অনেক দেরি, আর লাটু মহারাজ তাঁহার ঈশ্বরীয়ভাববিভোর জীবন ও গ্রাম্য কথাবার্তা দ্বারা, সংখ্যায় তেমন বেশি না হইলেও, যাঁহারাই শান্তিলাভের আশায় তাঁহার নিকট গিয়াছেন তাঁহাদেরই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপে উঁহাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস, ত্যাগ-তপস্যা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণরাজি সকলেরই জীবনে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-গগনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে বড় ছোট বিচার করা আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত; আমাদের নিকট সকলেই অতি মহান সকলেই আদর্শস্থানীয়। ইঁহাদের চরিত্রের অনুধ্যানে এবং ইঁহাদের উপদেশ পালনেই আমাদের পুরুষার্থসিদ্ধি। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে বলিতেন, "ঠাকুর তো অনেক দূরের কথা, আগে আমরা স্বামীজীকে বুঝি, তারপর ঠাকুরকে বুঝব।" বাস্তবিকই ইঁহাদের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যস্বরূপ। ইঁহাদের মধ্য দিয়াই আমরা সেই পুরুষোত্তমের লোকোত্তর মহিমার কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। যিনি ইঁহাদের বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির মনকে কাদার তালের মতো ইচ্ছানুযায়ী আকার দিতে পারিতেন, তিনি না জানি কত বড় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ও অন্য কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইতে দেখিয়া আমাদের ঐ ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

গ্রন্থকার এই মূল্যবান পুস্তকখানি-প্রণয়নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন

করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে পরস্পরবিরোধী বিবরণগুলির মধ্যে যেটি গ্রহণীয় তাহাই তিনি বিচারপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত কতক বিষয় অন্য পুস্তক বা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ইহাতে অনেক নূতন তথ্যেরও সমাবেশ আছে। পুস্তকখানির ভাষা সরল অথচ সরস। বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্মবৃদ্ধির সহায় হউক, ইহাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা।

বেলুড় মঠ - মাধবানন্দ
১ বৈশাখ, ১৩৫৯

# স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বলিয়াছিলেন, "একদিন দেখছি মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্রসূর্যতারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করে উহা ক্রমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হলো। ...নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসকল পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখতে পেলাম। ...মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করল। সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হলো। অদ্ভুত দেবশিশু অসীম আনন্দপ্রকাশে অন্যতম ঋষিকে বলতে লাগল—'আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'...নরেন্দ্রকে দেখবামাত্র বুঝলাম, এ সেই ব্যক্তি।" বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণই ধরাধামে অবতরণের পূর্বে অখণ্ডের গৃহে সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত জ্যোতির্ময় বিগ্রহ দেবশিশুরূপে শরীরধারণ করিয়াছিলেন এবং সাগ্রহে ধ্যাননিষ্ঠ অন্যতম যে ঋষির গলে সাবলীল স্বীয় কোমল বাহুদ্বয় বেষ্টনপূর্বক তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ধরাধামে লীলাসহচররূপে আগমনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। এই যুগ্ম আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-ঋষির অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন।

কলকাতা মহানগরীর সিমুলিয়া পল্লির শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত আইনব্যবসায়ী ছিলেন এবং স্বোপার্জিত অর্থে দত্ত-বংশকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ কিন্তু ভোগে মগ্ন না হইয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত পিতারই ন্যায় বিশ্বনাথেরও নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখা গেল। ইতিহাসেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিল। কিন্তু দুর্গাচরণের ন্যায় সংসারবিমুখ না হইয়া তিনি বরং সংসারীই হইলেন। এটর্নীর ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। রন্ধনে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং নিত্য নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ও অপরকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দেশভ্রমণ ছিল তাঁহার আর একটি শখের জিনিস। এই ভ্রমণব্যপদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ স্তরের মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট

হন। ধর্মসম্বন্ধে তিনি হিন্দু মতাবলম্বী হইলেও পরধর্মের প্রতি, বিশেষত ঈশার বাইবেল এবং হাফেজের বয়েৎসমূহের প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বিশ্বনাথের পত্নী ভুবনেশ্বরীও অনুরূপ বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা ও সুরূপা ছিলেন; অধিকন্তু ধর্মে তাঁহার অনুপম অনুরাগ ছিল। সুবৃহৎ সংসার তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ ছিল। এই সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সূচীকর্মাদি-শিল্পাভ্যাস করিতেন এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ করিতেন। বিবিধ উপায়ে তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই মনে হইত যে, এই মিতভাষিণী মহীয়সী মহিলা অতি সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না ও রাজরানীতুল্যা তেজস্বিনী। তাঁহার প্রকৃতি ছিল গম্ভীর অথচ অমায়িক।

ভগবান এই দম্পতিকে চারিটি কন্যা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দুইটি অল্পবয়সে গতায়ু হয়। এই কারণে এবং পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকায় মাতা ভুবনেশ্বরীর চিত্তে শান্তি ছিল না। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় হৃদয়ের এই বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। অতঃপর অনেক ভাবিয়া কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে পত্র লিখিলেন, তিনি যেন বংশরক্ষার জন্য ৺বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইয়া প্রত্যহ পূজা দেন ও অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করেন। পূজা চলিতে লাগিল—এদিকে ভুবনেশ্বরীও নিত্য শিবপূজা ও শিবধ্যানে মগ্না রহিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ তপস্যার পরে একদিন ভুবনেশ্বরী ৺যোগিরাজ মহাদেবের ধ্যানে সমস্ত দিবস দেবালয়ে যাপনান্তে রাত্রিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, দেবাদিদেব রজতগিরিনিভ বরবপু শঙ্কর পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তদবধি তাঁহার শ্রীবদনের অপূর্ব শোভা ও অপার্থিব জ্যোতিঃদর্শনে চমৎকৃত হইয়া প্রতিবাসীরাও বলিতে লাগিলেন যে, এইবারে শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। যথাকালে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি (বঙ্গাব্দ ১২৬৯, ২৯ পৌষ, পৌষ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি) সোমবার সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৬টা ৪৯ মিনিটে) ভুবনেশ্বরীর ক্রোড় আলোকিত করিয়া ভুবনবিজয়ী নবসূর্য উদিত হইলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া জননী পুত্রের নাম রাখিলেন বীরেশ্বর। শুভ অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার নাম হইল নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রই ভবিষ্যতের প্রথিতযশা স্বামী বিবেকানন্দ। স্বগৃহে কিন্তু ক্ষুদ্রকায় বীরেশ্বর 'বিলে' নামেই পরিচিত হইলেন।

সুদর্শন বালক পরিবারের সকলের আদরে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়ই অশান্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দৌরাত্ম্যে সকলেই অস্থির—ভয়প্রদর্শন, ভর্ৎসনা, শাসন কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ ও অভিমান দেখিয়া মাতা ভুবনেশ্বরী খেদপূর্বক বলিলেন,

"অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে সন্তানকে বশে আনিবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন—ক্রোধপ্রশমনার্থ তিনি অনেক সময় তাঁহার মস্তকে জল ঢালিয়া দিতেন কিংবা ভয় দেখাইয়া বলিতেন, "যদি দুষ্টুমি করিস, তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা মহৌষধের ন্যায় ফলপ্রদ হইত।

পিতামহ দুর্গাচরণের সহিত দেহগত সাদৃশ্যদর্শনে অনেকে ভাবিতেন যে, দুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে আবার নরেন্দ্ররূপে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বালকের মনও ছিল পিতামহের অনুরূপ। বাটিতে সাধু-সন্ন্যাসীর আগমনমাত্র নরেন্দ্র তাঁহাদের দিকে ছুটিতেন এবং প্রার্থিত দ্রব্য অবিলম্বে গৃহ হইতে আনিয়া দিতেন—কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতেন না কিংবা কোন বাধা শুনিতেন না। একবার নববস্ত্র-পরিহিত নরেন্দ্র সগর্বে সকলকে স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইতেছেন, এমন সময় দ্বারে শব্দ উঠিল 'নারায়ণ হরি'। সাধুর আহ্বান-শ্রবণমাত্র নরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সাধু পরিধেয়ের প্রয়োজন জানাইলে অম্লানবদনে স্বীয় নববস্ত্র তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। তাদৃশ ক্ষুদ্র বসন পরিধান করা অসম্ভব বলিয়া সাধু উহা মস্তকে বন্ধনপূর্বক বিদায় লইলেন। সাধুদের প্রতি বিশ্বনাথের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও এই ঘটনার পর হইতে গৃহে সাধুসমাগমকালে নরেন্দ্র নিকটে যাইতে পাইতেন না। কৌশলী বালক কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতির আভাস পাইলেই অপরের অজ্ঞাতে উপর হইতে বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতেন এবং অভিভাবকের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে শুচি-অশুচিতে সমবুদ্ধি নরেন্দ্র পলায়নপূর্বক নর্দমা বা আস্তাকুঁড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন এবং মৃদু হাস্য-সহকারে মুখভঙ্গি করিয়া বলিতেন, "ধর না, ধর না।" জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর তাঁহার প্রিয় ছিল। একটি গাভী তাঁহার যথেষ্ট আদর পাইত। পিতার অশ্বগুলিকেও তিনি ভালবাসিতেন। অশ্বযানের অগ্রভাগে উচ্চে অধিষ্ঠিত কোচোয়ান সশব্দে চাবুক ঘুরাইয়া সবেগে তেজস্বী অশ্বযুক্ত শকটগুলিকে কলকাতার সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে দেখিয়া তাঁহারও মনে ঐরূপ স্বাধীন সবল সারথি হইবার ইচ্ছা জাগিত। একদিন মাতৃক্রোড়ে বসিয়া অশ্বযানে চলিতে চলিতে তিনি পিতার প্রশ্ন শুনিলেন, "বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?" ইতস্তত না করিয়াই তিনি বলিলেন, "সহিস কিংবা কোচোয়ান।" নরেন্দ্রের বহু সময় অশ্বশালায়ই কাটিত—চঞ্চল সবল বালকের চক্ষে দুরন্ত অশ্বকে বশে রাখা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিল নিশ্চয়!

রামায়ণে রাম-সীতার কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত তাঁহাদের চরণে অবনত হইয়াছিল। একদিন প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণছেলের সাহায্যে বাজার হইতে রাম-সীতার মৃন্মূর্তি আনাইয়া বাড়ির রুদ্ধদ্বার চিলের ঘরে পূজায় লাগিয়া গেলেন। উভয় বালক ধ্যানস্থ। এদিকে সর্বত্র অনুসন্ধান চলিতেছে—নরেন্দ্র কোথায়? কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া অবশেষে সকলে ছাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ; অতএব বলপ্রয়োগে উহা উদ্ঘাটিত হইল। ব্রাহ্মণবালক অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল। পরন্তু আগন্তুকদের সম্মুখে এ কী দৃশ্য—নরেন্দ্র ধ্যানস্তিমিত, বাহিরে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

এত শ্রদ্ধার রাম-সীতাও কিন্তু অধিক দিন নরেন্দ্রের চিত্তে স্থান পাইলেন না; কারণ পিতার আস্তাবলের সবজান্তা সহিস জানাইয়া দিল, "বিবাহ করা বড় খারাপ।" ইহাতে নরেন্দ্র মহা সমস্যায় পড়িলেন—এদিকে মায়ের নিকট তিনি শুনিয়াছেন রাম-সীতার অলৌকিক প্রেমকাহিনী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুমাত্রকে ঘোর সংসারে পথ প্রদর্শন করিয়াছে, আর অন্য দিকে আজ এই সংসারতাপক্লিষ্ট বিশ্বস্ত সহিসের মুখে এরূপ নিদারুণ সত্য! সাশ্রুনয়নে নরেন্দ্র মাতার নিকট স্বীয় সমস্যা জ্ঞাপন করিলেন। মাতা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, "বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিবপূজা কর।" সন্ধ্যার অন্ধকারে নরেন্দ্র চিলের ঘরে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতা-রামের মূর্তি নিরীক্ষণ করিলেন; অতঃপর দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে উহা তুলিয়া লইয়া নিচে রাস্তায় ফেলিয়া দিলেন—ঊর্ধ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত মৃৎপুত্তলিকা রাজপথের কঠিন আঘাতে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। পরদিন শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী শিব আসিয়া রাম-সীতার আসনে বসিলেন।

শিবচিন্তায় মগ্ন নরেন্দ্রকে একদিন একখণ্ড গৈরিকবস্ত্র কোমরে কৌপীনের মতো পরিধানপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জননী প্রশ্ন করিলেন, "এ কিরে?" বালসন্ন্যাসী সোল্লাসে জানাইলেন, "আমি শিব হয়েছি।" আবার বালক হইলেও ধ্যানপরায়ণতা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছিলেন, মুনি-ঋষিরা ধ্যানে এতই মগ্ন হন যে, জটা দীর্ঘায়িত হইয়া ক্রমে বটের শিকড়ের ন্যায় ভূমিতে প্রবেশ করে। ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্র তাই লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারও ঐরূপ হইতেছে কি না। ধ্যানকালে জটা ভূমিতে প্রবেশ না করিলেও মন কিন্তু কোন এক অজ্ঞাতরাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। একদিন ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্রের পার্শ্বে ভীষণাকার গোক্ষুরা সর্প ফণা বিস্তারপূর্বক দুলিতেছে দেখিয়া সঙ্গের বালক সন্ত্রাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। প্রত্যুত নরেন্দ্র বাহ্যসংজ্ঞাহীন। চিৎকার শ্রবণে তথায় সমবেত বয়স্করা সে দৃশ্য-সন্দর্শনে একই কালে ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সর্পটি আপনা হইতেই চলিয়া গেলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। মহাবিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় আর একদিন তিনি রুদ্ধকক্ষে ধ্যানে বসিয়া আছেন—অকস্মাৎ মুণ্ডিতমস্তক এক সৌম্যশান্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু প্রশান্ত মূর্তিকে কিছুকাল দেখিয়াই নরেন্দ্র ভয়ে গৃহত্যাগ করিলেন। হয়তো সেই দিন তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের নিদ্রাও ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। তিনি অভ্যাসমতো উপুড় হইয়া শুইতেন। ঐ অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই এক জ্যোতির্বিন্দু সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া অকস্মাৎ ফাটিয়া যাইত ও চতুর্দিক আলোকে পরিপূর্ণ করিত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে নরেন্দ্র সুষুপ্তিতে মগ্ন হইতেন। পরমহংসদেব পরে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা ধ্যানসিদ্ধের লক্ষণ।

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্রের পাঠশালায় যাওয়া আরম্ভ হইল; কিন্তু দুই-চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সহপাঠীদের নিকট হইতে বহু অভিধান বহির্ভূত শব্দ আয়ত্ত করিতে দেখিয়া পিতা বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ করিলেন। অতঃপর গৃহশিক্ষকের অধীনেই শিক্ষা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রের পাঠাভ্যাসের রীতি ছিল অদ্ভুত। তিনি নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিতেন, আর গুরুমহাশয় পাঠ বলিয়া যাইতেন—ইহাতেই তাহা অধিগত হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা তখন নরেন্দ্রের বাটিতেই বাস করিতেন এবং নরেন্দ্র তাঁহার নিকট শয়ন করিতেন। কঠিন বিষয় বাল্যকালে সহজে মুখস্থ হয়—এই ধারণার ফলে বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় প্রতিরাত্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে এক বৎসরে নরেন্দ্রনাথ পুস্তকখানির অধিকাংশ আয়ত্ত করেন।

নেতৃত্বের ভাব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বালকদের সহিত রাজা-প্রজা-ক্রীড়ায় তিনি রাজা সাজিয়া মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতেন। দস্যুর বিচারে বসিয়া সান্ত্রীদিগকে আদেশ দিতেন, "দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।" দুরাত্মা তখনই তীরবেগে দত্তবাড়ির সদর দরজা পার হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হইত—পশ্চাতে রক্ষীরাও ছুটিত। ইহাতে দ্বিপ্রহরে নিদ্রাতুর ভৃত্যেরা চমকিত হইয়া উঠিত এবং বালকদের দৌরাত্ম্যনিবারণের জন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিত। এদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট নরেন্দ্রের নিকট সমস্ত কৌতুকটিই বড় উপভোগ্য হইত।

আবার সঙ্গীদের প্রতি তাঁহার সখ্যও শতভাবে প্রকাশ পাইত। একবার চড়কতলা হইতে মহাদেব ক্রয় করিয়া তিনি জনৈক বন্ধুসহ ফিরিতেছেন। প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ একখানি ঘোড়ার গাড়ি দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। নরেন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, সঙ্গীটি প্রায় অশ্বপদতলে। অমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সহায়ে

মহাদেবকে বাম কক্ষপুটে স্থাপনপূর্বক দ্রুতবেগে বালকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। নরেন্দ্রের যখন সাত আট বৎসর বয়স, তখন তিনি সদলবলে মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজিদ্ আলি শা-র পশুশালা দেখিবার জন্য চাঁদপালঘাটে নৌকায় উঠেন। ফিরিবার পথে নৌকাভ্রমণে অনভ্যস্ত একটি বালক নৌকায় বমি করিয়া ফেলিলে মাঝি বালকদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতে বলে; কিন্তু তাহারা পয়সা দিয়া বলে, সে যেন উহা অপরের দ্বারা করাইয়া লয়। পরন্তু মাঝি কটূক্তি করিতে থাকে এবং ঘাটের নিকটে আসিয়া ভয় দেখায় যে, ঐ কার্যসমাধা না হইলে নৌকা তীরে ভিড়াইবে না। বচসা প্রায় মারামারিতে পরিণত হইতে যাইতেছে, এমন সময় সর্বকনিষ্ঠ নরেন্দ্র এক সুযোগে লম্ফপ্রদানপূর্বক তীরে অবতরণ করিলেন এবং দুইজন শ্বেতকায় সৈনিককে ময়দানের দিকে যাইতে দেখিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের নিকট গিয়া হস্তধারণপূর্বক আকার ইঙ্গিত ও ভাঙ্গা ইংরেজিতে নিজেদের বিপদ জ্ঞাপন করিলেন। পল্টনের গোরাদ্বয় ঐ সুন্দর ক্ষুদ্র বালকের আকর্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিতবেত্র কম্পিত করিয়া বালকদিগকে মুক্তিদানের আদেশ জানাইল। মাঝি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকদিগকে তীরে উঠাইয়া দিল।

বিশ্বনাথবাবুর নিকট অনেক মক্কেল আসিতেন। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান মক্কেলকে নরেন্দ্র চাচা বলিতেন। নরেন্দ্র চাচার বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন এবং তাহার নিকট মিষ্টান্নাদি পাইতেন। হিন্দু মক্কেলদের ইহা অনুমোদিত না হইলেও উদারপ্রকৃতি বিশ্বনাথ ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলেও দেশাচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তিনি স্বীয় বৈঠকখানায় বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক হুঁকা রাখিতেন। নরেন্দ্রের নিকট ইহা একটি সমস্যাবিশেষ ছিল। তিনি যখন অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন যে, ভিন্ন জাতির হুঁকায় ধূমপান করিলে জাতিনাশ হয়, তখন সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া উঠিল। একদিন তিনি ইহার তাৎপর্য-পরীক্ষার জন্য অপরের অনুপস্থিতিতে অভিনিবেশ সহকারে হুঁকাগুলি একটির পর একটি টানিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় পিতা সেখানে সহসা প্রবেশান্তে পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কচ্ছিস রে?" পুত্র উত্তর দিলেন, "দেখছি জাত না মানলে কি হয়।" পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং "বটে রে দুষ্টু!" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

আর একদিন লুকোচুরি-খেলার সময়ে নরেন্দ্রনাথ দোতলার সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নিচে পড়িয়া জ্ঞান হারাইলেন! অনেক চেষ্টার ফলে এক ঘণ্টা পরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আঘাত অতি

গুরুতর হইলেও জীবননাশের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরে একটি ক্ষতচিহ্ন চিরজীবনের জন্য রহিয়া গেল। পরমহংসদেব পরে বলিয়াছিলেন, "যদি সেদিন ঐ রকমে ওর শক্তি না কমে যেত তা হলে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলত।"

সপ্তম বর্ষ বয়সে মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রবেশানন্তর খেয়ালী বালক ইংরেজি শিক্ষায় সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ও বিদেশী ভাষা, ও শিখব কেন?" সকলে নানা ভাবে বুঝাইয়াও বিফল মনোরথ হইলেন; কিন্তু কয়েকমাস পরে তিনি নিজেই আগ্রহসহকারে পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং অচিরেই বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়সেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধ ও শরীরচর্চায়ও পারদর্শী হইয়াছিলেন। বালকদের নায়করূপে তিনি তাহাদের মারামারিতে মধ্যস্থতা করিতেন এবং পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন উভয়পক্ষের অনভিপ্রেত আঘাত। আবার আপদ-বিপদেও তিনি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন। একবার সমবয়স্কদের সহিত কেল্লা দেখিতে গিয়াছেন; অকস্মাৎ একটি ছেলে অসুস্থ বোধ করিয়া বসিয়া পড়িলে অপর বালকেরা কিছু হয় নাই ভাবিয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নরেন্দ্র কিন্তু গাড়ি ডাকিয়া বালকটিকে উহাতে বসাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রের সাহস এবং অনুসন্ধিৎসাও ছিল অপূর্ব। প্রতিবেশী এক বালকের বাটিতে চম্পকবৃক্ষের শাখায় পদদ্বয় সংলগ্ন করিয়া মুক্তহস্তে নতমস্তকে দুলিতে তিনি আনন্দ পাইতেন। একদিন বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ক্ষুদ্র বালককে তদবস্থায় দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র অমনি কারণ জানিতে চাহিলেন। বালককে সম্পূর্ণ নিরস্ত করার আশায় বৃদ্ধ ভয় দেখাইলেন, "ও গাছে বেম্মদৈত্যি আছে; যারা ও গাছে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়।" নরেন্দ্র আপাতত নীরব রহিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ চলিয়া যাইবামাত্র পুনর্বার পরীক্ষার্থ বৃক্ষে উঠিয়া ঠিক আগেরই মতো দুলিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের আগমনের লক্ষণ দেখা গেল না। সাথী তাঁহাকে বারণ করিলে বলিলেন, "তুই ছোঁড়া আহাম্মক। একজন বলে গেল আর অমনি বিশ্বাস করতে হবে? যদি বুড়োর কথা সত্যি হতো, তাহলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচড়ে যাওয়া উচিত ছিল।" হয়তো এরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়াই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলাম; তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

নরেন্দ্রনাথের সাহসের দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে। তন্মধ্যে দুই-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রের বয়স যখন একাদশ বৎসর তখন 'সিরাপিস্' নামক ড্রেডনট

জাতীয় একখানি যুদ্ধজাহাজ কলকাতায় আসে। নরেন্দ্র সঙ্গীদের সহিত উহা দেখিতে যাইয়া জানিলেন যে চৌরঙ্গীতে বড় সাহেব থাকেন, তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। বড় সাহেবের অফিসে উপস্থিত হইলে চাপরাসী ক্ষুদ্র বালককে তাড়াইয়া দিল। নরেন্দ্র পরাজয় মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, বাটির পশ্চাদ্ভাগে যে লৌহময় সোপানশ্রেণী আছে, উহা বড় সাহেবের গৃহাভিমুখেই উঠিয়াছে। অমনি ঐ পথে সাহেবের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষমাণ সকলের সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন এবং যথাকালে সাহেবের অনুমতি পত্র লইয়া নিচে নামিলেন। বহির্দ্বারে ব্যঙ্গচ্ছলে চাপরাসীকে অনুমতিপত্র দেখাইলে সে সবিস্ময়ে বলিল, "ক্যায়সে উপর গয়ে?" বিজয়োল্লাসিত নরেন্দ্র মুখভঙ্গিসহকারে বলিলেন, "হাম্ জাদু জানতা।"

নরেন্দ্রদের পাড়ার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের একটি জিম্ন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল। নরেন্দ্র বয়স্যদের সহিত সেখানে ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। একদিন ট্রাপিজের (দোলনার) দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে বালকগণ গলদঘর্ম, অথচ প্রতিবারে ব্যর্থমনোরথ হইতেছে দেখিয়া পথচারী এক বলবান ইংরেজ নাবিক তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইল। তাহার সহায়তায় ফ্রেম অনেকটা ঊর্ধ্বে উঠিল, কিন্তু হঠাৎ ফ্রেমের একটি পদ নাবিকের কপালে সজোরে লাগিয়া তাহাকে সংজ্ঞাশূন্য করিল এবং ক্ষতস্থান হইতে রুধিরস্রাব আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিয়া বালকগণ পুলিসের ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলাইল। প্রত্যুত নরেন্দ্র নাবিকের শুশ্রূষায় নিরত রহিলেন এবং নবগোপালবাবু ও চিকিৎসকদের সাহায্যে তাহাকে ট্রেনিং একাডেমি বিদ্যালয়ে এক সপ্তাহ রাখিয়া নিরাময় করিলেন। অতঃপর পাথেয় বাবদ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নাবিকের হস্তে প্রদানপূর্বক তাহাকে বিদায় দিলেন।

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সহিত স্বগৃহে মাতা ভুবনেশ্বরী ও পিতা বিশ্বনাথের নিকট নরেন্দ্রের নানাবিধ শিক্ষা চলিতেছিল। বিশ্বনাথের শিক্ষা-প্রণালীর একটা নিজস্ব ধারা ছিল। একদিন নরেন্দ্র মাতার সহিত বচসা করিতে করিতে হঠাৎ একটি কটু কথা বলিয়া ফেলিলেন। বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ তিরস্কার না করিয়া নরেন্দ্রের গৃহদ্বারের উপরিভাগে কয়লা দ্বারা লিখিয়া রাখিলেন, "নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এইসকল কথা বলিয়াছেন"—উদ্দেশ্য, নরেন্দ্রের বয়স্যগণ উহা পড়িবে এবং নরেন্দ্র তাহাতে লজ্জিত হইবেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে বিশ্বনাথের বহু অর্থব্যয় হইত। অনেক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার গৃহে থাকিয়া অন্ন ধ্বংস করিতেন, এমন কি নেশাভাঙ্গেরও পয়সা পাইতেন। জ্ঞানোন্মেষ হইলে নরেন্দ্র যখন ইহাতে আপত্তি জানাইলেন, তখন বিশ্বনাথ বলিলেন, "জীবনটা কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি তখন এ দুঃখের হাত থেকে

ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।" পুত্রকে উপদেশ দিতে যাইয়া পিতা কখনও তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত করিতেন না—সূত্র ধরাইয়া দিয়া ও বিধি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং স্বাধীনচেতা বালক নরেন্দ্র যখন একদিন দ্বিধাশূন্যভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর আমার জন্য কি করেছেন? তখন পিতা বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "যা, আরশিতে একবার নিজের চেহারাটা দেখগে, তা হলেই বুঝবি।" আর একদিন পিতার নিকট জানিতে চাহিলেন, "সংসারে কিরূপ চলা উচিত?" উত্তর পাইলেন, "কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময়প্রকাশ করিস না।" এই অমূল্য উপদেশ বিশ্বের বহু রাজপ্রাসাদে ও ভিখারির পর্ণকুটিরে বিবেকানন্দের মনকে সমভাবে প্রশান্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মাতা ভুবনেশ্বরীও অশেষভাবে সন্তানের সদ্‌গুণরাশিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অযথা নিপীড়িত পুত্র মাতাকে দুঃখের কথা জানাইলে তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাছা, যদি তোর ভুল না হয়ে থাকে তবে ওতে যায় আসে কি? ফল যাই হোক না কেন, যা সত্য বলে মনে করবি, তাই করে যাবি। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে; কিন্তু তবু সত্যকে ছাড়বি না।" দূরদৃষ্টিসম্পন্না জননী এতাদৃশ বিবিধ ঘটনায় অবিচলিত থাকিয়া সাময়িক অবিচার, পরাজয় ও বিপর্যয়ের পশ্চাতে যে সত্য, শিব, সুন্দর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তৎপ্রতি সন্তানের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়াই মাতৃভক্ত বিবেকানন্দ একদা সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঋণী।"

নরেন্দ্রের বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর (১৮৭৭ খ্রিঃ) তখন তাঁহার পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বর্তী রায়পুরে যান এবং কিছু দিন পরে পত্নী ও পুত্রগণকেও তথায় আহ্বান করেন। রায়পুর পর্যন্ত তখন রেলগাড়ি হয় নাই—এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে পৌঁছিয়া তথায় গোযানে আরোহণপূর্বক প্রায় এক পক্ষকাল পরে রায়পুরে উপস্থিত হইতে হইত। নিবিড় বনানীপরিবৃত ও বিহঙ্গকাকলীপূরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে নরেন্দ্র সহসা এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যেখানে অত্যুচ্চ শৈলশিখরদ্বয় যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের জন্য বিপরীত দিক হইতে পরস্পরের প্রতি অগ্রসর হইয়া বনপথকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্বতগাত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি নরেন্দ্র দেখিলেন, একদিকের শৃঙ্গ হইতে ভূমি পর্যন্ত একটি ফাটলের মধ্যে মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ এক সুবিশাল মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। অমনি মক্ষিকারাজ্যের আদি-অন্তের রহস্যচিন্তায় বিভোর নরেন্দ্রের মন এক অসীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া

তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিল। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কতক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারেন নাই।"

নরেন্দ্র তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রায়পুরে বিদ্যালয় না থাকায় তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। ঐ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতে নিবদ্ধ ছিল না—পিতাপুত্রে বহু বিষয়ে আলোচনা, এমন কি ঘোর তর্কও হইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথের বাসস্থানে সমাগত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব্যপদেশে নরেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত। দুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যখন সপরিবারে কলকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তখন দেহ ও মনে বেশ সবল সুপরিপুষ্ট ও আত্মপ্রত্যয়শীল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাগতপ্রায়। অনেক যত্নে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা অনেকেই আশা করেন নাই; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছেন। এই সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি পিতার নিকট হইতে একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পাইলেন।

এই কয় বৎসর শুধু বিদ্যাবুদ্ধিতেই নরেন্দ্রের উৎকর্ষলাভ হয় নাই, তাঁহার অপরাপর সদ্গুণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই সুকণ্ঠ গায়ক ও গায়িকা ছিলেন। নরেন্দ্রেরও সুকণ্ঠোত্থিত তাল-লয়সমন্বিত সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হইতেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রন্ধনকৌশল শিখিয়াছিলেন। অধিকন্তু শরীরচর্চা, নৌকাপরিচালন, অসিযুদ্ধ, অভিনয় ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তেজস্বিতা ছিল তাঁহার অন্যতম জন্মগত গুণ। একবার অভিনয়মঞ্চে উঠিয়া আদালতের জনৈক পেয়াদা এক প্রবীণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে নরেন্দ্র উত্তেজিতকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন, "স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও; যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।" অমনি সাহস পাইয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।" এইরূপে অভিনয় সেরাত্রে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন, কিন্তু একবৎসর পরেই জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউশনে চলিয়া

গেলেন। কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শন অতি মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তিলাভ হইল। একদা পারিতোষিক-বিতরণসভার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক শিক্ষকের বিদায়সভাও অনুষ্ঠিত হয়। স্বনামধন্য বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এই সভায় সহপাঠীদের অনুরোধে নরেন্দ্র অর্ধঘণ্টাকাল ইংরেজিতে এমন একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন যে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুই বৎসর পরে তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের বীজ উপ্ত হইল।

কলেজ-জীবনের প্রথমে পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি স্বধর্মে ও ঈশ্বরবিশ্বাসে আস্থা হারাইয়া অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিতেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের মন বস্তুত সেরূপ উপাদানে গঠিত ছিল না। বিশেষত এ সময়ে ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরে আস্থা না থাকিলেও কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় চমৎকৃত কলকাতার সমাজ উহার মূল তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। সমসাময়িক অপর বহু শিক্ষিত যুবকের ন্যায় নরেন্দ্রও অবিলম্বে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিমধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং ঘন ঘন উপাসনাদিতে যোগদান ও ব্রাহ্ম নেতাদের নিকট যাতায়াতের ফলে ব্রাহ্মসমাজের তালিকায় নাম রেজিস্ট্রি করাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, ব্রাহ্মদের অনুকরণে তিনি পরিচিতদের মধ্যে কঙ্কালসার হিন্দুধর্মের নিন্দা, জাতিভেদের সমালোচনা এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধেও সোৎসাহে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এরূপ বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না। তিনি জানিতেন, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ। ব্রাহ্মসমাজে বহু চরিত্রবান ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন বটে এবং সমাজমন্দিরে ধর্মসঙ্গীতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ক্ষণিক উচ্চানুভূতির আভাসও পাইলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের পথ তখনও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। অবশেষে আকুল মনের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকায় অবস্থানপূর্বক ধ্যানধারণায় সময় কাটাইতেন। ক্ষিপ্তপ্রায় নরেন্দ্র দ্রুতবেগে নৌকামধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসনারত মহর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" ব্যগ্র কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ধ্যানোত্থিত মহর্ষি নীরবে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার সেই তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাবাণে জর্জরিত হইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসুর চক্ষে স্বীয় নয়ন সংস্থাপনপূর্বক মহর্ষি বলিলেন, "তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক

যোগীদের চক্ষুর ন্যায়।” সেই নিরর্থক প্রশংসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া নরেন্দ্র অতৃপ্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

শাস্ত্র বলেন, শিষ্যের মন প্রস্তুত হইলে ভগবৎকৃপায় গুরুলাভে বিলম্ব হয় না। সিমুলিয়া পল্লির সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একদিন স্বীয় ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রণপূর্বক এক ক্ষুদ্র উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের প্রয়োজন হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত নরেন্দ্রকে তথায় লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়কের এই প্রথম মিলন এইরূপেই সংঘটিত হইয়াছিল। “নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুই-একটি কথা বলিয়া অবিলম্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।”[১]

উক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই নরেন্দ্রের এফ.এ. পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কন্যাদানের আগ্রহ জানাইলেন এবং পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া দশসহস্র মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ও আত্মীয়স্বজনের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নরেন্দ্রের সম্মতি পাওয়া গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রের পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণায় নরেন্দ্র এই প্রকার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, “যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট চল।” তদনুসারে দুই-এক জন বয়স্য সমভিব্যাহারে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের পৌষ মাসে একদিন তিনি রামচন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের এই প্রথম আগমনের কথা ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন ঃ “পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল, দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থে ইতরসাধারণের মতো একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলাদা। এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার

১ ‘লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব’, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৪

মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব!" মেজেতে মাদুর পাতা ছিল; নরেন্দ্র উহাতে বসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা আদিষ্ট হইয়া গাহিলেন, "মন, চল নিজ নিকেতনে, সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?" ইত্যাদি। নরেন্দ্র ষোল-আনা মন দিয়াই গাহিলেন এবং ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। গানের পরেই ঠাকুর সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন ও তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহের উত্তরের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। উত্তরের শীতল বাতাস নিবারণের জন্য সেখানে স্তম্ভগুলির অবকাশস্থল ঝাঁপ দিয়া আবৃত ছিল। সেখানে যাইয়াই গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আর নরেন্দ্রের হস্ত নিজ হস্তে লইয়া দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পূর্বপরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "এত দিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপ অপেক্ষা করিয়া আছি তাহা একবার ভাবিতে নাই?" ইত্যাদি কথা বলেন, আর রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জানি আমি, প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।" এতাদৃশ অদ্ভুত আচরণে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এতো একেবারে উন্মাদ! না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে?' এদিকে ঠাকুর পরক্ষণেই নরেন্দ্রকে তথায় থাকিতে বলিয়া গৃহ হইতে মাখন, মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইলেন। নরেন্দ্র যতই বলেন যে সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইবেন, ঠাকুর ততই "উহারা খাইবে, এখন তুমি খাও" বলিয়া সবগুলি খাওয়াইয়া নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, "বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকট একাকী আসিবে?" আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'আসিব' বলিয়া নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন যে, পূর্বমুহূর্তের পাগল ঠাকুর উচ্চ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন—আলোচনামধ্যে কোন অসংলগ্ন ভাব নাই, আচরণেও উন্মাদের আভাসমাত্র নাই। উভয় অবস্থার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধানে অপারগ নরেন্দ্র স্থির করিলেন যে, ইনি অর্ধোন্মাদ; কিন্তু উন্মাদ হইলেও তাঁহার ত্যাগ ও পবিত্রতা অতুলনীয় এবং এইজন্য তিনি মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মানের অধিকারী। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে নরেন্দ্র চলিয়া গেলে ঠাকুরের হৃদয় অহর্নিশ পুনর্মিলন-আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, অনেক সময় বোধ হইত বুকের ভিতরটায় কে

যেন গামছা নিংড়াইবার মতো জোরে মোচড় দিতেছে। আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ঝাউতলার দিকে যাইয়া, "ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেন। পরে অপর কোনও কোনও বালক-ভক্তের জন্যও তাঁহার আর্তি প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, "নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সে কিছু নয় বলিলে চলে।"

সন্দেহদোলায়িত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত নরেন্দ্রের জীবনধারা পূর্বেরই ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সেই অবোধ্য অথচ মধুর স্মৃতি এবং স্বীয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে অবিরাম তথায় যাইতে প্ররোচিত করিতেছিল। অবশেষে নরেন্দ্র একদিন পদব্রজে সেখানে চলিলেন; তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বগৃহে একাকী ছোট তক্তপোশখানিতে বসিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে দেখিয়া সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন এবং আবিষ্টের ন্যায় অস্পষ্টভাবে কি যেন বলিতে বলিতে ক্রমে নরেন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, আজ আবার পাগলের না জানি কি অভিনয় হইবে। ভাবিতে না ভাবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় দক্ষিণচরণে নরেন্দ্রের অঙ্গস্পর্শ করিলেন, অমনি মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্র দেখিলেন, সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে—নিখিল বিশ্বের সহিত নরেন্দ্রের আমিত্ব যেন কোন্ এক মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হইতেছে! তবে কি মরণ সম্মুখে? নরেন্দ্র আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমায় এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!" শুনিয়া অদ্ভুত ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্পর্শপূর্বক বলিলেন, "তবে এখন থাক্, একবারে কাজ নেই—কালে হবে।" আশ্চর্যের বিষয়, নরেন্দ্র অমনি দেখিলেন, সমস্ত পূর্ববৎ অবস্থিত আছে। ইহা কি মোহিনী-বিদ্যা? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না; কারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, পুরুষকারের প্রতিমূর্তি নরেন্দ্রের মন এই দুর্বল মানবের নিকট চকিতে পরাস্ত হইবে—ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি তো বরং ইঁহাকে অর্ধোন্মাদ জানিয়া ইঁহার বশ্যতাস্বীকারে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, চিন্তার অতীত কত ব্যাপার আছে—ইহাও তাহারই একটা হইবে। আবার ইহাও বুঝিলেন যে, যিনি ইচ্ছামাত্র এইরূপ একটি শক্তিশালী মনকে কাদার তালের মতো ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন, তাঁহাকে পাগলও বলা চলে না। ঠাকুর কিন্তু তারপর সহজ ভাবেই আলাপ-আলোচনা ও রঙ্গ-পরিহাস করিতে লাগিলেন। খাওয়াইয়া, আদর করিয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছে না! অপিচ বিদায়কালে ধরিয়া বসিলেন, "আবার শীঘ্র আসিবে বল?" নরেন্দ্র তদনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই বাড়ি ফিরিলেন।

নরেন্দ্র শীঘ্রই পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেদিন জনতা নাই। ঠাকুর তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটিতে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। উদ্যান ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎকাল ভ্রমণানন্তর বৈঠকখানায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলে নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, পূর্বদিনেরই ন্যায় ঠাকুরের ভাবান্তর হইতেছে। নরেন্দ্র সতর্ক থাকিলেও পূর্বদিনেরই ন্যায় সহসা নিকটে আসিয়া তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। অমনি নরেন্দ্র সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞা হারাইলেন; যখন জ্ঞান ফিরিল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন। বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য নরেন্দ্রকে ঠাকুর সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র কে—কোথা হইতে আসিয়াছেন—কেন আসিয়াছেন—কতদিন ধরাধামে থাকিবেন ইত্যাদি। নরেন্দ্রও তদবস্থায় নিজ অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন যে, নরেন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন বা ভাবিয়াছিলেন, সবই সত্য। তিনি জানিলেন যে, যেরূপ গুণ বা শক্তির দুই একটির মাত্র অধিকারী হইতে পারিলে মানব জনসমাজে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে কিংবা স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘ গঠন করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তাদৃশ অষ্টাদশটি বিদ্যমান আছে; পরন্তু নরেন্দ্র ঈশ্বর, জগৎ ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চরম তথ্যের সন্ধানলাভপূর্বক ঐ শক্তি যথাযথ প্রয়োগ করিতে না পারিলে হিতে বিপরীত হইবে। অতএব নরেন্দ্র যাহাতে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও ঠাকুরের মহান ভাব যথাযথ গ্রহণপূর্বক নিজের জীবনের গতি উহারই সাফল্যের জন্য নিয়মিত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অতঃপর তৎপ্রতিই সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। নরেন্দ্রও দেখিলেন, দৈববলে বলীয়ান এই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ অবলীলাক্রমে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মনকে উচ্চপথে পরিচালিত করিতে পারেন—ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্ফল এবং ইঁহার কৃপা অতি ভাগ্যের কথা। তাঁহার পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃপ্ত ও ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত মন আজ বাধ্য হইয়াই মানিয়া লইল যে, বিরল হইলেও এইরূপ মহামানব বস্তুতই আছেন, যিনি সত্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান দিতে পারেন। সুতরাং ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয়। কিন্তু তিনি এই বিষয়েও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন যে, বশ্যতা স্বীকার করিলেও নির্বিচারে কিছুই গ্রহণ করিবেন না। পরীক্ষার ফলে যাহা সত্য মনে হইবে তাহাই মাত্র লইবেন, অপর সমস্ত হয় বর্জন করিবেন কিংবা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। যুগাবতারের অদ্ভুত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি প্রায় প্রতিসপ্তাহেই এক বা দুই দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন বা তথায় অবস্থান করিতেন। ঠাকুরও

নরেন্দ্রকে দেখিলে আনন্দবিহ্বল, কিংবা দীর্ঘকাল না দেখিতে পাইলে বিরহব্যাকুল হইতেন। অনেক সময় সেই বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলকাতায় যাইতেন। ভক্তদের নিকট নরেন্দ্রের প্রশংসায় তিনি সহস্রমুখ হইয়া উঠিতেন, যুবক ভক্তদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন। নরেন্দ্রের তদানীন্তন তেজস্বিতা ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার অনেক সমালোচকের চক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতারই রূপান্তর বলিয়া মনে হইলেও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর জানিতেন যে, এই পুরুষপ্রবরের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার যুগধর্ম প্রচারের সৌধ উত্থিত হইবে। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণার আভাস নিম্নোক্ত কথাবার্তা হইতে কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। একদা নরেন্দ্রেরই সম্মুখে ঠাকুর বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেমন একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূর করিয়াছে।" নরেন্দ্র অবশ্য সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একটুও অহংকৃত না হইয়া বরং ক্ষোভ ও লজ্জায় প্রতিবাদ জানাইলেন, "মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার এরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়, আর কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া!" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন, "কি করব রে! তুই কি ভাবিস, আমি ঐরূপ বলিয়াছি? মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই—তাই বলিয়াছি।"

নরেন্দ্রও ঠাকুরের প্রেমে সত্যই আবদ্ধ হইয়াছিলেন; তাই যখন ব্রাহ্মসমাজাদিতে ঘুরিয়া এমন কাহাকেও পাইলেন না, যিনি বলিতে পারেন তাঁহার ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন যদিও স্বতই ইচ্ছা হইতেছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণকেও অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন, তথাপি আবার ভয় হইতেছিল—"ইনিও যদি ঐরূপ সোজা উত্তর না দিয়া প্রশ্ন এড়াইয়া যান তাহা হইলে তো আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।" যাহা হউক, মনের অস্বস্তি দীর্ঘকাল মনেই চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি একদিন সাহসভরে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট উত্তর আসিল, "হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি।" ইহা বলিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি নরেন্দ্রকে জানাইলেন যে, তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন। নরেন্দ্র অন্ধকারে পথ পাইলেন, যদিও তাঁহার যুক্তিপ্রবণ মন তখনও সর্ববিষয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল না। তাই ঠাকুর

যখন স্বীয় অনুভূতি বা নরেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোপনীয় তথ্য-উদ্‌ঘাটনান্তে বিশ্বাসোৎপাদন-জন্য বলিতেন, "মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন," স্পষ্টবাদী, নির্ভীক নরেন্দ্র তখন বিচারের পথ অবলম্বনপূর্বক বলিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐ সকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?" এই কথা বলিয়া পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের মতাবলম্বনে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত করে এবং ঐরূপ দর্শনাদি মনের বাসনানুসারেই হইয়া থাকে। কখনো কখনো নরেন্দ্রের এই রকম কথা ঠাকুরকে ভাবাইয়া তুলিত—"তাইতো, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তো মিথ্যা বলিবার লোক নহে!" এইরূপ ভাবনায় পড়িয়া মীমাংসার জন্য অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বার শরণাপন্ন হইলে মা বলিয়া দিলেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন? ও ছেলেমানুষ! কিছুদিন পরে ও সব কথা সত্য বলে মানবে।" মাতৃবাক্যে একান্ত নির্ভরশীল ঠাকুর ঐ আশ্বাসবাণীতেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের কলেজের পাঠাভ্যাসও চলিতেছিল। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন; সুতরাং কলেজের পাঠাভ্যাসের জন্য অল্প সময়ই প্রয়োজন হইত—অতিরিক্ত সময় বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদে বা বিবিধবিষয় শিক্ষায় ব্যয়িত হইত। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের প্রারম্ভ হইতে (১৮৭৯) তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ আগ্রহসহকারে পড়িয়াছিলেন। এফ.এ. অধ্যয়নকালে ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ একে একে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বি.এ. পরীক্ষার পূর্বে ইংলণ্ড ও ইউরোপের বর্তমান ও প্রাচীন ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চর্চার ফলে তাঁহার দ্রুত পাঠের শক্তি অদ্ভুত বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহাকে গ্রন্থের প্রতি ছত্র পড়িতে হইত না—প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তিতে মনঃসংযোগ করিয়াই তিনি গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিয়া লইতেন। এমনকি, ক্রমে প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট হইত, কিংবা একসঙ্গে তিন-চারি পৃষ্ঠাও উলটাইয়া যাইতে পারিতেন। নরেন্দ্র পাঠাভ্যাসকালে সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জনপূর্বক ব্রহ্মচারীর আদর্শে চলিতেন। বয়স্য কাহাকেও শৌখিন দেখিলে মুখের উপর দু-কথা শুনাইয়া দিতেন; বিশেষত চলাফেরায় নারীজনোচিত হাবভাবের আভাসমাত্র থাকিলে সেই পুরুষসিংহের ধৈর্যচ্যুতি হইত। এই সময় তাঁহার আবার নির্জনবাসও আরম্ভ হয়। বি.এ পরীক্ষার পূর্বে বাটির বালকবালিকা ও লোকজনের কলরবে পাঠের অসুবিধা হয় দেখিয়া তিনি মাতামহীর আলয়ের বহির্বাটির একটি ক্ষুদ্র দ্বিতলের গৃহে আশ্রয় লইলেন; অন্দরমহলের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব ছিল না। দৈনিক পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। বাহির

হইতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে দেখা যাইত, একখানি অপ্রশস্ত কক্ষ—প্রস্থে চারি হাত ও দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিগুণ—আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ক্ষুদ্র বালিশ, মেজের উপর ছিন্ন মাদুর এবং এক কোণে একটি তানপুরা, সেতার ও বায়া। এই ঘরটিকে তিনি 'টঙ্গ' আখ্যা দিয়াছিলেন। আত্মীয়বর্গ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও বন্ধুবৎসল নরেন্দ্রের এই পাঠাগারও প্রায়শ বন্ধুদের সহিত বিবিধ আলোচনা ও সঙ্গীতাদিতে মুখর হইয়া উঠিত। অপরের প্রাণে ব্যথা দিতে অসমর্থ নরেন্দ্র তাই অনেক সময় একান্তে অধ্যয়নোদ্দেশে টঙ্গের সংলগ্ন এবং তদপেক্ষাও স্বল্পায়তন চোরকুঠরিতে হামাগুড়ি দিয়া আশ্রয়গ্রহণান্তর দীর্ঘকাল অপরের অলক্ষ্যে পাঠে মগ্ন থাকিতেন। নরেন্দ্রের গৃহে প্রচুর অর্থ এবং তাঁহার অধীনে বহু দাসদাসী থাকিলেও এইরূপ অনাড়ম্বর দীন আবেষ্টনের মধ্যে এবং দরিদ্র সহপাঠীদের সাহচর্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ইহারই মধ্যে আবার রাত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানে তাঁহার অনেকক্ষণ কাটিত। নরেন্দ্রের চরিত্রে একাধারে এইসব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দেখিয়া লোকে অবাক হইত। ইহারই মধ্যে আবার কলেজেও সুনাম হইয়াছিল—দর্শনের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেব তাই বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান বালক।"

বি.এ. পাসের পর নরেন্দ্র বি.এল.পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বি.এ.পরীক্ষার স্বল্পকাল পরেই (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার আয় ছিল যেমন প্রচুর, ব্যয়ও ছিল তেমনি অপরিমিত। মুক্তহস্ত বিশ্বনাথ পরিবারের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। বিপদের কালে নরেন্দ্রের পিতৃগৃহে প্রতিপালিত বন্ধুবান্ধব সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন অপর আত্মীয়স্বজন এই সুযোগে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভবিষ্যতে যিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রবর্তনপূর্বক জগদ্বরেণ্য হইবেন, আজ তাঁহাকে দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিবার জন্যই বোধ হয় এই আয়োজন! কিন্তু সে শিক্ষা বড় নিদারুণ, বড় মর্মন্তুদ। যাঁহার সংসারে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত এবং যাঁহার কৃপালাভের জন্য বহু ব্যক্তি লালায়িত থাকিত, সেই নরেন্দ্র আজ পদব্রজে কলেজে যাইতেছেন—সে পদ নগ্ন, পরিধানে অতি স্থূল বস্ত্র, উদর অন্নহীন! দারিদ্র্য যাহাদের জন্মসাথী, তাহারা দারিদ্র্যের ঠিক পরিচয় পায় না; কিন্তু অকারণে অকস্মাৎ সচ্ছলতা হইতে বঞ্চিত যাহাকে অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয় এবং মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়াও অশ্রুরোধপূর্বক মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়, সে জানে 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী', এই কথা কত সত্য। বাটিতে অভাব জানিয়া নরেন্দ্র 'নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন এবং অনেকদিন অনাহারেই কাটাইতেন। সময় বুঝিয়া মহামায়াও মোহজাল বিস্তার করিলেন। এক সঙ্গতিসম্পন্না

রমণী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারেন। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-অবলম্বনে তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পরন্তু গৃহের এই অর্থাভাবে মাতা ভুবনেশ্বরী পর্যন্ত বিশেষ বিচলিতা হইলেন। এক প্রভাতে নরেন্দ্র শ্রীভগবানের নামোচ্চারণপূর্বক শয্যাত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া মাতা বলিলেন, "চুপ কর, ছোঁড়া! ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান! ভগবান তো সব কল্লেন!" মাতার সেই তীব্র মনোবেদনার আঘাতে পুত্রের হৃদয়ও এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের প্রতি দারুণ অভিমানে পূর্ণ হইল। অতএব গোপনে কার্য করিতে অপারগ নরেন্দ্র যুক্তিতর্ক-সহায়ে মনের ভাব বন্ধুদের নিকট খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। মুখে মুখে প্রচারিত এই সকল কথা বিকৃত হইয়া রব উঠিল—নরেন্দ্র নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন, হয়তো বা কুসঙ্গে পড়িয়াছেন। কলকাতাস্থ ভক্তরাও ইহা শুনিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা রটিয়াছে তাহার সমস্তটা না হইলেও অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। ইঁহারা তাঁহাকে এতটা হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া অভিমানে স্ফীত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শনাবলম্বনে বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয় না, দণ্ডভয়ে ভগবানে বিশ্বাস করা দুর্বলতা মাত্র! ফলে নরেন্দ্রের অধঃপতন সুস্পষ্ট, এই দৃঢ়তর প্রত্যয় লইয়া ভক্তগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—ইহা বুঝিয়া নরেন্দ্র আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এই সব কথা ঠাকুরের কর্ণে পৌঁছিল; কিন্তু জগদম্বার অভ্রান্ত নির্দেশে পরিচালিত তিনি একান্ত বিশ্বাসভরে বলিলেন, "চুপ কর শালারা! মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। আর কখনও ঐরূপ কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।"

নরেন্দ্র অন্নসংস্থানের জন্য কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন অবসন্ন দেহে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে গৃহে ফিরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, শিবের সংসারে এই অশিবের তাণ্ডবলীলা কেন? ঈশ্বরের ন্যায়ের রাজ্যে এত অন্যায় কেন? কিন্তু উপবাসক্লিষ্ট দেহ আর এক পদও অগ্রগমনে অক্ষম হওয়ায় তিনি পার্শ্বস্থ বাটির রোয়াকের উপর চেতনাহীন জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। বাহিরের জ্ঞান কতক্ষণ ছিল না তিনি জানেন না; কিন্তু অন্তরে যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে আবরণের পর আবরণ অপসৃত হওয়ায় একে একে তাঁহার সমস্ত সমস্যা মিটিয়া গেল। ঐ ভাবে রাত্রি-অবসান হইয়া যখন প্রভাত আগতপ্রায়, তখন নিদ্রোত্থিত নরেন্দ্র বাহিরের জগতে অন্তরের সেই প্রশান্তির কোনও প্রতিচ্ছবি দেখিতে না পাইলেও অমিত বল ও অদম্য বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুনর্বার অর্থচেষ্টায় মহানগরীর রাজপথে

নামিলেন। এইরূপে জননী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবাজারের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকিলেন। অনন্তর কিছুকাল এটর্নির কার্য শিক্ষার চেষ্টায় ঘুরিয়া অর্থাভাবে উহা ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদের দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায়ও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন।

এদিকে ঠাকুর বিভিন্ন কথায় নরেন্দ্রের প্রতি অটুট বিশ্বাসমাত্র জানাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; পরন্তু সংসারের কার্যে বিব্রত থাকায় নরেন্দ্র দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলকাতার ভক্তদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তবু নরেন্দ্রের যাওয়া হইল না। অধিকন্তু দশজনের কথা শুনিয়া যখন ভক্তগণও সত্যই নরেন্দ্রের মানসিক অবস্থা পরীক্ষার্থ তৎসকাশে আসিতে লাগিলেন এবং কথাচ্ছলে আপন আপন সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তখন নরেন্দ্র ভাবিলেন, "অবশেষে কি শ্রীরামকৃষ্ণও আমার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইলেন?" কাজেই দারুণ অভিমানে স্থির করিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না। কিন্তু মনে মনে ইহাও বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারধর্ম পালনের জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই। সুতরাং সর্ববিষয়ে ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, সংসারত্যাগই শ্রেয়। এমন সময়ে একদিন কলকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণের সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর শেষ দর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর অমনি ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে। নরেন্দ্র অনেক আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু কিছুই কার্যকর হইল না—দক্ষিণেশ্বরে যাইতেই হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবাবেগে বিভোর ঠাকুর নরেন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিলেন,

> "কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই;
> (আমার) মনে সন্দ হয়—
> বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই!"

সে প্রেমের উচ্ছ্বাসে নরেন্দ্রের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুই নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের এই প্রকার আচরণে বিস্মিত পার্শ্বস্থ সকলেরই অনুসন্ধিৎসা জাগিলেও ঠাকুর কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া শুধু বলিলেন, "আমাদের ও একটা হয়ে গেল।" সে রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে তিনি নরেন্দ্রকে একান্তে বলিলেন, "জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না; কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক।"

পরদিন শান্তহৃদয়ে নরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু পরিবারের দুরবস্থা পূর্বেরই ন্যায় চলিতে লাগিল। অগত্যা একদিন তিনি স্থির করিলেন যে ঠাকুরকে প্রতিবিধানের জন্য ধরিতে হইবে। অতএব দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, "আপনি মা কালীকে বলে কয়ে আমাদের সাংসারিক দুঃখনিবারণের একটা উপায় করে দিন।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাই নাই—তবু তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না—তাই মা তোর কথায় কান দেন না।" ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত নরেন্দ্র তখনও প্রতিমাপূজায় আস্থাহীন; কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তিনি জানেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং ঐ কথায় নিরস্ত না হইয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "যা, মাকে প্রণাম করে প্রার্থনা কর—হয়ে যাবে।" নরেন্দ্র ৺কালীমন্দিরে চলিলেন। সন্ধ্যার সুমধুর আরাত্রিক-ধ্বনি তখন মানবমনের সমস্ত গ্লানি দূরে সরাইয়া এক প্রশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে; আর মায়ের নয়নে রহিয়াছে অপূর্ব করুণাদৃষ্টি এবং ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদুমন্দ প্রাণবিমোহক হাস্যরেখা! জীবন্ত দেবী লোককল্যাণে বরাভয়করা হইয়া মানবকে আশ্বাস দিতেছেন—যেন পূর্ব হইতেই শরণাগতের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। নরেন্দ্র প্রণামান্তে ভাবগদগদ চিত্তে প্রার্থনা করিলেন ঃ "মা, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি দাও।" নিঃস্পৃহ-হৃদয়ে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে ফিরিয়া আসিলে শ্রীগুরু প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, মাকে বলেছিস তো?" অমনি দিব্যভাবে আত্মবিস্মৃত নরেন্দ্রের চিত্তদর্পণে সংসারের করালমূর্তি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "না, মশায়, সে কথা বলতে ভুলে গেছি।" ঠাকুর তাঁহাকে পুনর্বার যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের পুঞ্জীভূত-মূর্তি নরেন্দ্রনাথ মাতৃচরণে উপস্থিত হইয়া আবার সংসার ভুলিলেন; তৃতীয় বারেও তাহাই ঘটিল। শেষে বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুরকেই ধরিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনাকেই এটা করে দিতে হবে।" অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "যা, মার ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কোন অভাব হবে না।"

নরেন্দ্রের পুরুষোচিত মতিগতি ও তেজস্বিতা-দর্শনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দিত হইতেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে সেটা পুরুষ—ও আমার শ্বশুরঘর।" তিনি জানিতেন, নরেন্দ্র যেন 'খাপখোলা তলোয়ার'—তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে তাহার তেজে জাগতিক আবর্জনা মুহূর্তে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তাই সকাম ব্যবসায়ী ভক্তের আনীত যে সকল দ্রব্যাদি তিনি অপরকে আহার

করিতে দিতেন না, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে নরেন্দ্রের মুখে তুলিয়া ধরিতেন। নরেন্দ্রের কেহ প্রশংসা করিলে বলিতেন, "তা হবে না কেন গো? ওর জন্যই তো এবার এখানকার (স্বদেহের) আসা।" আরও বলিতেন, "ও অখণ্ডের ঘর—সপ্তর্ষির একজন—নর-নারায়ণ ঋষির নর"; "ও নিত্যসিদ্ধের থাক—ও যেদিন নিজেকে জানতে পারবে, সেদিন আর দেহ রাখবে না"; "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে খাক হয়ে যায় ও যদি শোর-গরুও খায়, কোন দোষ হবে না।"

এত উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও কিন্তু নরেন্দ্রের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে ঠাকুর সর্বদা তৎপর ছিলেন। নরেন্দ্র একদিন অন্ধ-বিশ্বাসের কথা তুলিলে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসের আবার অন্ধ কিরে? বিশ্বাসমাত্রই তো অন্ধ! বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বলো শুধু বিশ্বাস, না হয় বলো জ্ঞান। তা না হয়ে আবার অন্ধ-বিশ্বাস, চোখওয়ালা-বিশ্বাস—এ কি রকম?" নরেন্দ্র নিরাকারবাদী হইলেও অদ্বৈতমতে তাঁহার আস্থা ছিল না। তাই ঠাকুরের মুখে 'সবই ব্রহ্ম' এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, তাও কি কখনও হয়? তা হলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।" এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও বিচলিত না হইয়া অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর যোগ্য শিষ্যকে অদ্বৈতমার্গেই পরিচালিত করিতেন। সাধারণ ভক্তদিগকে তিনি ভক্তিশাস্ত্রের চর্চায় নিরত রাখিতেন; কিন্তু নরেন্দ্রের অনিচ্ছা জানিয়াও 'অষ্টাবক্রসংহিতা'দি অদ্বৈতমূলক গ্রন্থপাঠের নির্দেশ দিতেন। আবার নরেন্দ্র পাছে শুষ্ক জ্ঞানী হইয়া পড়েন এই ভয়ে প্রায়ই ভক্তপ্রবর গিরিশবাবু কিংবা শ্রীযুক্তা গোপালের মায়ের সহিত তাঁহার তর্ক বাধাইয়া দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন।

নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণের এক প্রধান কারণ ছিল এই যে, নরেন্দ্র ঠাকুরের ভাব অপরের তুলনায় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক দিবসে ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সারমর্ম সকলকে বুঝাইতে যাইয়া বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐমতে উপদেশ করে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন'। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া...।" এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধিভঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" কথার পরে বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে

পাইলাম! ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।...যাহা হউক, ভগবান যদি দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" বস্তুত নরনারায়ণের সেবক ভাবী বিবেকানন্দ তখন হইতেই রূপ গ্রহণ করিতেছিলেন।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের সুমধুর দিনগুলি ফুরাইয়া গেল। ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে আসিলেন। শ্যামপুকুরে নরেন্দ্র সর্বদা যাতায়াত ও তত্ত্বাবধান করিতেন; অনন্তর কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পর সেবাশুশ্রূষা-পরিচালনের জন্য সেইখানে রহিয়া গেলেন। কাশীপুরের উদ্যানবাটিটি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে গুরুসেবা, ভগবদারাধনা, তপস্যা, ভাবসংশুদ্ধি ও সঙ্ঘসৃষ্টির বিভিন্ন প্রচেষ্টার নিদর্শন ও আকররূপে চিরস্মরণীয়। বহু ভক্ত ঠাকুরকে অবতাররূপে স্বীকার করিলেও এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা ভাবিতেন, ঠাকুরের রোগ একটা লীলামাত্র; উহাতে সত্যসত্যই তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা হয়, এইরূপ মনে করার কারণ নাই। কিন্তু নরেন্দ্র-পরিচালিত যুবকবৃন্দ[১] ঐ সকল বাদ-বিতর্কে যোগ না দিয়া প্রত্যক্ষদৃষ্ট কষ্টকে সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক নির্বিচারে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অথচ নরেন্দ্রের মনে দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এইরূপ এক অনুপম বিশ্বাস ছিল, যাহাকে কেবল মানুষ বা দেবতার মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা চলে না। একদা অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, হয়তো বা অসাবধানতাবশত সেবকদের দেহেও শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ সংক্রামিত হইবে। অমনি বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি জ্বলন্তপাবকসদৃশ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্ঠীবনমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে অবশিষ্ট পথ্য পান করিলেন—সন্দেহ চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া গেল!

কাশীপুরে অবস্থানকালে গুরুভ্রাতৃগণ নরেন্দ্রের প্রেরণায় শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদিতে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের অবসরকাল কঠিন তত্ত্বালোচনায় মুখরিত হইয়া উঠিত; আবার গভীর নিশীথের অন্ধকার ধ্যাননিরত যুবকদের সম্মুখে প্রজ্বলিত ধুনির আলোকে উদ্ভাসিত হইত। নরেন্দ্র ঐ সময়ে কখনও কখনও দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানাদির জন্য যাইতেন। একদা তিনি বুদ্ধের ভাবে এতই প্রভাবিত হইয়া পড়েন যে, তারক (শিবানন্দ) ও কালী (অভেদানন্দ)-কে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় গমনপূর্বক তথায় তিন রাত্রি কাটাইয়া আসেন।

---

১ রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (বুড়ো), কালী, শশী, শরৎ, (হুট্‌কো) গোপাল।

কাশীপুরে সাধনায় মগ্ন নরেন্দ্রের মন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় বহু অনুভূতিলাভে সমর্থ হয়। তিনি ধ্যানকালে ললাটমধ্যে এক ত্রিকোণাকার জ্যোতি দর্শন করিতেন—ঠাকুর উহাকে ব্রহ্মযোনি বলিয়া নির্দেশ করেন। অনেক সময়ে নরেন্দ্র দেখিতেন, ধুনির পার্শ্বে নানা দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। এই সাধনার ফলে এক সময় তাঁহার অনুভূতি জাগিল যে, তাঁহার মধ্যে এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যাহা অপরে সংক্রামিত করা চলে। সুতরাং পরীক্ষাচ্ছলে শিবরাত্রির গভীর নিশীথে ধ্যানকালে অভেদানন্দকে স্বীয় অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিলেন। ঐরূপ করিলে অভেদানন্দের বোধ হইল, যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।[১] তদবধি ভক্ত অভেদানন্দ ঘোর বৈদান্তিকে পরিণত হইলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, তিনি যাহাতে ভবিষ্যতে এইভাবে শক্তির অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা অপরের মধ্যে বলপূর্বক বিজাতীয় ভাব সঞ্চার না করেন।

এই কালে নরেন্দ্রের মনে নির্বিকল্প সমাধির আকাঙ্ক্ষা বড়ই তীব্র হইয়া উঠিল। একদিন অন্তরের বাসনা গোপন রাখিতে না পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উহা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার দেহ নিরাময় হইলে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু নরেন্দ্রের তখন বিলম্ব অসহ্য। অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "তুই কি চাস্ বল?" নরেন্দ্র জানাইলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" ঠাকুর অমনি গম্ভীরকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "ছিঃ, ছিঃ, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্!" ঐরূপ তিরস্কারে নরেন্দ্রের নয়নে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল—তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরের হৃদয় কত মহান। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একদা সন্ধ্যার পরে নির্বিকল্প ভূমিতে আরূঢ় হইলেন—শরীর স্থির নিস্তব্ধ! গোপাল দাদা (অদ্বৈতানন্দ) এই জড়বৎ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঠাকুরের নিকট যাইয়া সংবাদ দিলেন, "নরেন্দ্র মরিয়া গিয়াছে।" চারদিকে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; কিন্তু তত্ত্ববেত্তা ঠাকুর বলিলেন, "বেশ হয়েছে—থাক খানিকক্ষণ ঐ রকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।" রাত্রি

১ 'কথামৃত' ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ২য় পরিচ্ছেদ। স্বামী অভেদানন্দের নিজের মতে স্বামীজী তখনও ভাবসঞ্চারের শক্তিলাভ করেন নাই; কুণ্ডলিনীর জাগরণবশত ঐরূপ কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

এক প্রহর পরে নরেন্দ্র সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।" এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধ্যান এতই পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল যে, একদিন গিরিশবাবু তাঁহার সহিত এক বৃক্ষমূলে ধ্যানে বসিয়া দেখিলেন যে, মশকের উপদ্রবে তিনি যদিও চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ হইতেছেন, তথাপি নরেন্দ্র শান্তভাবে বসিয়া আছেন; নরেন্দ্রের দেহ মশকে আচ্ছাদিত বলিলেও চলে, অপিচ গিরিশচন্দ্রের আহ্বানেও তাঁহার কোন সাড়া নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের কাল সমাগত প্রায়; তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা নিবারণের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না; অথচ নিজের সাধনাও অগ্রসর হইতেছে না। এইসব ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ হতাশভাবে উন্মাদপ্রায় ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এমন কি, একদিন সন্ধ্যার পর হইতে গগনবিদারক 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণপূর্বক বাগানের সর্বত্র ঘুরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। শেষরাত্রে ঠাকুর তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই ওরকম কচ্ছিস কেন? ওতে কি হবে?" কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনঃ বলিলেন, "দ্যাখ্, তুই এখন যেমন কচ্ছিস, এমনি বারটা বছর মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি, বাবা!"

লীলাসংবরণের কয়েক দিন পূর্ব হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আপনার সকাশে ডাকিতেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুই-তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ বিবিধ উপদেশ দিতেন। তিন-চারি দিবস পূর্বে তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া তিনি সমাধিমগ্ন হইলে নরেন্দ্র অনুভব করিলেন, যেন একটা সূক্ষ্ম তেজরশ্মি বিদ্যুৎ-কম্পনের ন্যায় তাঁহার দেহে সঞ্চারিত হইতেছে। ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখেন, সমাধিব্যুত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে জলধারা; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।" ঠাকুর বিদায় লইতেছেন বুঝিয়া নরেন্দ্রের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না—শুধু গণ্ড বহিয়া বিগলিতধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। লীলাশেষের দুই দিন পূর্বে আর একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দ্যাখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।" ক্রমে বিদায়ের অতি বিষাদময় সুর বাজিয়া

উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন নরেন্দ্রের মনে অকস্মাৎ চিন্তা জাগিল, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়াছেন, এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" মানবের দুর্দমনীয় সন্দেহ যেন আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মন অবলম্বনে মূর্ত হইয়া উঠিল, আর অমনি লীলাধৃতবিগ্রহ ভগবান এই নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও নরেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" কৃতাপরাধ নরেন্দ্র মৌনবিস্ময়ে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই দিবস পরে (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট), ৩১ শ্রাবণ, ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে ১টা ৬ মিনিটে ঠাকুর মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

সেই মর্মন্তুদ বিচ্ছেদের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একরাত্রে উদ্যানে ভ্রমণনিরত নরেন্দ্র দেখিলেন, সম্মুখে ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। চক্ষুর ভ্রম মনে করিয়া তিনি নির্বাক রহিলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থিত গুরুভ্রাতা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "নরেন্দ্র, দেখ দেখ।" সংশয় দূর হইল—নরেন্দ্র বুঝিলেন, ঠাকুরের স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও তিনি শাশ্বত জ্যোতির্ময় দেহে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অমনি সকলকে নরেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্বেই সে মূর্তি অদৃশ্য হইল।

কাশীপুরত্যাগ হইতে আমেরিকাযাত্রা পর্যন্ত নরেন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা অপর গুরুভ্রাতাদের জীবনের সহিত বিজড়িত বলিয়া আমাদিগকে অন্য প্রবন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে; অতএব পুনরুক্তিভয়ে এখানে কেবল প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের স্বল্প পরেই ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপনান্তে নরেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কার্য হইল যুবক-গুরুভ্রাতাদের গৃহে গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসে প্রণোদিত করা। এইরূপে প্রধানত তাঁহারই অনুপ্রেরণায় গৃহে প্রত্যাগত যুবকগণ ক্রমে মঠে সমবেত হইতে থাকিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা-অবলম্বনে এই সঙ্ঘরচনা সুগম হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনের সময় যুবকভক্তদের অনেকেই[১] আঁটপুরে বাবুরামের বাটিতে গমন করেন। সেখানে বৃক্ষমূলে ধুনি জ্বালাইয়া সদালোচনা চলিত। এক রাত্রে ভাববিহ্বল নরেন্দ্র উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসি-জীবনের তপশ্চর্যা, আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিলেন যে, তদ্ভাবে ভাবিত যুবকগণ তখনই সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহাদের ভাবী জীবন ঐ আদর্শেই

---

১ নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদা।

পরিচালিত হইবে। এই দিব্যভাবের আবেশ কাটিয়া গেলে তাঁহারা সবিস্ময়ে জানিতে পারিলেন যে, উহা ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্সন্ধ্যা। আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে ইঁহারা যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন নরেন্দ্রের নাম হইল বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বরাহনগর মঠের প্রাণ—তাঁহার পরিচালনায় তখন চলিয়াছিল শাস্ত্রপাঠ, বিচার, পূজা, ধ্যান, তপস্যা। জীর্ণগৃহে বাস, উদরে প্রায়শ অন্ন নাই, অন্নের সহিত ব্যঞ্জনের সংস্পর্শ অতীব বিরল—আর সঙ্গে সঙ্গে মঠের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পিতপ্রাণ যুবকগণ তখন ঈশ্বরলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানেন। এইরূপে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর বরাহনগর মঠ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ত্যাগবৈরাগ্যের ও একনিষ্ঠ সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে মাতা ও পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন; যৌবন-প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া সনাতনধর্মের পীযূষপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; সম্প্রতি ভারতভ্রমণপূর্বক উহার চিরন্তন সংস্কৃতির পরিচয়গ্রহণের সময় সমাগত। বিধির পরিচালনায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণের ফলে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চিত্তে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, পরবর্তী জীবনে উহাই তাঁহার নবযুগের বাণীকে রূপ প্রদানপূর্বক সাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। নবভাবপ্রচারের উৎসরূপে বরাহনগরের মঠজীবন গঠন করা যেমন যুগপ্রয়োজনে অত্যাবশ্যক ছিল, তেমনি ভারতকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন অল্পায়ু; অতএব শতবৎসরে সমাপ্য সাধনা ও তদনুরূপ সাফল্য এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আত্মবিকাশে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জীবনকে এমন এক বিচিত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল যাহার ইঙ্গিতমাত্রও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

পরিব্রাজক-জীবনের প্রারম্ভে তিনি দিন কতকের জন্য বরাহনগর হইতে অদৃশ্য হইতেন এবং যাইবার সময় বলিয়া যাইতেন, "এই শেষ আর ফিরছি না।" কিন্তু প্রতিবারেই নিকটবর্তী কোন স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া মঠে ফিরিতেন। অবশেষে দীর্ঘভ্রমণমানসে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মঠ ত্যাগপূর্বক ক্রমে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একদিন দুর্গাবাড়ি যাইবার পথে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিলেন—বানরগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অকস্মাৎ একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "থামো, থামো, বানরদের সামনে রুখে দাঁড়াও।" বিবেকানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিল। স্বামীজী

শিক্ষা পাইলেন যে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বীরবিক্রমে বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হয়।

কাশীধাম হইতে তিনি অযোধ্যা হইয়া আগ্রায় গেলেন। আগ্রা হইতে বৃন্দাবনে যাইবার পথে কপর্দকহীন পথশ্রান্ত বিবেকানন্দ দেখিলেন এক ব্যক্তি পথপার্শ্বে আরামে ধূমপান করিতেছে। অমনি তাঁহারও পিপাসাবোধ হওয়ায় তিনি লোকটির নিকট কলিকাটি চাহিলেন; কিন্তু সে পাপভয়ে ভীত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ হাম ভাঙ্গী (মেথর) হ্যাঁয়।" স্বামীজী নিরাশচিত্তে চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন, "সারাজীবন আত্মার অভেদত্ব চিন্তা করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম—ছিঃ ছিঃ, এখনও সংস্কার।" হাঁটিয়া পূর্বস্থানে আসিলেন—লোকটি তখনও বসিয়া আছে; বলিলেন, "বাবা, আমায় শিগ্‌গির এক ছিলিম তামাক দাও।" সে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মেথর; কিন্তু কে শুনে সে কথা? স্বামীজী তখন পণ করিয়া আত্ম-পরীক্ষায় অগ্রসর। তিনি ধূমপান সারিয়া আবার আপন পথ ধরিলেন।

রাধাকুণ্ডে তিনি রাধারানীর মহিমার প্রমাণ পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কুণ্ডে স্নানের পূর্বে একমাত্র কৌপীন ধৌত করিয়া পার্শ্বে রাখিয়া যেমন জলে নামিয়াছেন অমনি বানর আসিয়া উহা লইয়া গেল। স্নানান্তে তিনি উহা যথাস্থানে না পাইয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, উহা বানরের হস্তগত ও ছিন্নভিন্ন। নিষ্কিঞ্চন ভিখারি সন্ন্যাসীর উপর রাধারানীর রাজ্যে এ কি উপদ্রব! উলঙ্গ অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়াও চলে না; কাজেই রাধারানীর উপর অভিমানভরে আত্মগোপনের জন্য দ্রুত বনাভিমুখে চলিলেন। তখনই এক ব্যক্তি তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতে থাকিলে তিনি লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। প্রত্যুত সেই ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল এবং তথায় লইয়া গিয়া নববস্ত্রাদি-দানান্তে সযত্নে আহার করাইল।

বৃন্দাবন হইতে হাতরাস স্টেশনে উপনীত হইয়া অভুক্ত স্বামীজী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি সেই তেজঃপুঞ্জসদৃশ যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি বিবিধ খাদ্যসামগ্রী আনাইয়া তাঁহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং দৈনিক কর্মাবসানে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের আশায় স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। শরৎবাবু ও হাতরাসের অপরাপর ভদ্রলোকদের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজীকে কয়েকদিন বিভিন্ন বাটিতে বাস করিতে হইল। কিন্তু একদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি শরৎবাবুকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর অধিকদিন এক স্থানে থাকা অনুচিত, তাই তিনি অন্যত্র গমনে কৃতসঙ্কল্প। শরৎবাবু

যখন দেখিলেন, স্বামীজীর সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়, তখন সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “আপনি আমায় আপনার শিষ্য করিয়া লউন।” স্বামীজী প্রথমে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু শরৎবাবুর ধনুর্ভঙ্গ-পণ দেখিয়া পরীক্ষাচ্ছলে বলিলেন, “তুমি সত্যই যদি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাকো, তবে আমার ঐ ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া স্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ কর।” শরৎবাবু অম্লানবদনে তাহাই করিলেন; অতঃপর গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া গুরুদেবের সহিত উত্তরাখণ্ডে প্রস্থান করিলেন।[১] গুরুশিষ্যের ইচ্ছা ছিল, সেই বারে ৺কেদার-বদরী দর্শনে যান, কিন্তু শরৎচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়ায় উভয়ে হৃষীকেশ হইতে হাতরাসে ফিরিলেন। এখানে আসিয়া স্বামীজীরও অসুখ হইল। এমন সময়ে দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বরাহনগর মঠে লইয়া গেলেন। এইবারে ভ্রমণের ফলে স্বামীজীর যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল কথাপ্রসঙ্গে উহা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাতবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ আবার এক হইবে।” বলা বাহুল্য, ইহা ভাবুকের কল্পনা-বিলাস নহে; বাস্তব-আদর্শবাদী বিবেকানন্দের জীবন ইহা কার্যে পরিণত করিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

ইহার পরে স্বামীজী বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ ও কাশী হইয়া ১৮৯০ সনের জানুয়ারিতে গাজীপুরে গমনপূর্বক গগনবাবু ও বাল্যবন্ধু সতীশবাবুর বাটিতে কিছুদিন কাটাইলেন। তাঁহার গাজীপুরে আসার উদ্দেশ্য ছিল যোগীশ্রেষ্ঠ পওহারীবাবার দর্শন লাভ। এখানে অবস্থানকালে বহু দেশী ও বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত-শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হন। কিন্তু নগরে থাকিলে বাবাজীর দর্শন সুলভ হইবে না মনে করিয়া তিনি অতঃপর বাবাজীর গুহার পার্শ্বে এক নির্জন লেবুবাগানে আশ্রয় লইলেন। কয়েক দিন চেষ্টার পর অবশেষে বাবাজীর দর্শনলাভ হইল—চাক্ষুষ দর্শন নহে, দ্বারপার্শ্ব হইতে আলাপমাত্র। পরিচয় নিবিড়তর হইতে থাকিলে বাবাজী উপদেশ দিয়াছিলেন, “জন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি”, “গুরুকে ঘরমে গৌকে মাফিক পড়ে রহো”। ক্রমে বাবাজীর প্রতি স্বামীজী অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; তিনি জানিলেন, বাবাজী হঠযোগী ও রাজযোগী; স্বকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাখেন ও তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বিবেকানন্দ স্থির করিলেন, যোগমার্গে সিদ্ধিলাভের জন্য বাবাজীর নিকট দীক্ষা লইবেন। পরন্তু অনুমতি লাভের জন্য স্বামীজী গৃহাভিমুখে চলিলেন অমনি চরণদ্বয় অচল হইল, দেহ অবশ ও ভারী ঠেকিল, মন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি

১ বরাহনগর মঠে গমনান্তে সন্ন্যাসপরিগ্রহণপূর্বক তিনি স্বামী সদানন্দ নামে পরিচিত হন; রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাঁহার সুবিদিত নাম ছিল গুপ্ত মহারাজ।

তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অটল রহিলেন এবং বাবাজীর নিকট যথেষ্ট আশা-ভরসা পাইয়া দীক্ষার দিন স্থির করিলেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্বরাত্রে শয্যায় শয়ান বিবেকানন্দের মনে এই সকল চিন্তারই আলোড়ন চলিয়াছে, এমন সময় দেখেন, অন্ধকার গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংসদেবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত—সেই মুদিতবদন করুণ মূর্তির স্নেহসিক্ত নয়ন দুইটির দৃষ্টি তাঁহারই চক্ষে সংবদ্ধ। বেদনাক্লিষ্ট সেই দৃষ্টিতে ব্যথিত স্বামীজীর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন, "না না, তা কখনই হবে না—রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না—জয় রামকৃষ্ণ।" কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সুতরাং পরীক্ষাচ্ছলে দুই-একদিন পরে আবার ইচ্ছাপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থলে বাবাজীকে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন, অমনি পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সকরুণ জ্যোতির্ময় মুখখানি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চেষ্টা বিফল করিল। পাঁচ-ছয় দিন এইরূপ দর্শনলাভের পর স্বামীজী দীক্ষাগ্রহণের বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী দেখিলেন যে, বাবাজী কোন কোন বিষয়ে স্বামীজীর নিকট শিক্ষার্থী; অতএব বাবাজীর মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমে চিরাবদ্ধ রহিয়া গেলেন।

স্বামীজী গাজীপুর হইতে কাশীতে আগমনপূর্বক প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গাজীপুর থাকাকালেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কঠিন পীড়াগ্রস্ত। অধুনা সংবাদ আসিল যে, ভক্তবর বলরাম বসুও শয্যাগত। ইহাতে বিবেকানন্দ বড়ই বিচলিত হইলেন; পরন্তু সেরূপ কাতরতাদর্শনে প্রমদাদাসবাবু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা অনুচিত, কারণ উহা মায়ারই রূপান্তরমাত্র। ইহার উত্তরে স্বামীজী জানাইলেন, "বলেন কি সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টাকে বিসর্জন দিব? যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করিতে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" ফলে দেখা গেল যে, হৃদয়বান সন্ন্যাসী অচিরে বলরামবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? ১৩ এপ্রিল বলরামবাবু বাঞ্ছিতলোকে চলিয়া গেলেন এবং ২৫ মে সুরেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণপদে লীন হইলেন।

দুই মাসাধিক মঠে অবস্থানের পর স্বামীজী ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে পুনর্বার উত্তরপশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন—পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে চলিলেন তিব্বত ও হিমালয়ভ্রমণে অভিজ্ঞ স্বামী অখণ্ডানন্দ; এই ভ্রমণকালে নৈনিতাল হইতে আলমোড়া গমনের পথে স্বামীজী একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে অখণ্ডানন্দকে জানান যে, সেদিন তাঁহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছে।

অখণ্ডানন্দ পরে স্বামীজীর দিনলিপি খুলিয়া দেখিলেন, লিখিত আছে "আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি—বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে; দেখিলাম, প্রতি পরমাণুমধ্যে বিশ্বসংসার বিদ্যমান।" আলমোড়ার অনতিদূরে স্বামীজী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলে অখণ্ডানন্দ জলের সন্ধানে গেলেন। এমন সময় সম্মুখস্থ গোরস্থানের রক্ষক এক মুসলমান ফকির একটি শশা খাইতে দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। যথাকালে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত জগদ্বিখ্যাত স্বামীজীকে যেদিন আলমোড়াবাসীরা মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানান, সেদিন সভাস্থলের এক কোণে ঐ ফকিরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন এবং জনতার নিকট জীবনদাতারূপে পরিচিত করিয়া দেন। লব্ধোপকার মহতের উপকারস্মৃতি ও প্রতিদান অতীব অপূর্ব।

ক্রমে তাঁহারা আলমোড়ায় যাইয়া সারদানন্দ ও কৃপানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে একসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের তীর্থদর্শনে চলিলেন। ইতোমধ্যে অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হওয়ায় হিমালয়ভ্রমণ শেষ করিতে হইল এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে অখণ্ডানন্দকে সমভূমিতে প্রেরণপূর্বক স্বামীজী অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত অগ্রসর হইয়া ক্রমে মুশুরী পাহাড়ের নিচে রাজপুরে তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর হৃষীকেশে আগমনপূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিবার কিছুদিন পরেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে একজন সাধু তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং একটি ঔষধ প্রয়োগপূর্বক আশ্চর্যরূপে তাঁহার জীবনরক্ষা করিলেন।

ইহার পরে স্বামীজী কনখল, শাহারানপুর প্রভৃতি ঘুরিয়া এবং ব্রহ্মানন্দাদি গুরুভ্রাতাদের সাহচর্যে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া রোগমুক্ত অখণ্ডানন্দের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে সদলবলে মীরাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সাধারণ পুস্তকাগার হইতে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার লাবকের পুস্তকাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যহ আনিয়া পর দিবস ফেরত দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থাবলী শেষ হইল; কিন্তু গ্রন্থাগারিকের মনে সন্দেহ লাগিল ইহা বস্তুত অধ্যয়ন নহে, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি-অর্জনের জন্য লোকদেখানো প্রহসনমাত্র। সন্দেহ একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে স্বামীজী পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন পুস্তক হইতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, স্বামীজীও সদুত্তরদানে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রন্থাগারিককে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামীজী

বলিলেন, "আমি এক একটি শব্দের প্রতি নজর দিয়া পড়ি না, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই।"

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপনান্তে স্বামীজী একাকী ভ্রমণোদ্দেশ্যে সকলকে ত্যাগ করিতে দিল্লী চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহ কেহ নিষেধ না মানিয়াই কিয়দ্দিবস পরে সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাদের সহিত কয়েক দিন কাটাইয়া পুনর্বার রাজপুতানাভিমুখে নিঃসঙ্গ যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি ভিতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি আমায় একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধ্যান-ভজন-তপস্যা করছ, তেমনি কর। আমি এবার একলা বেরুব; কোথায় থাকব কাউকে সন্ধান দেব না।" ফলত আমেরিকা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান তিনি দেন নাই বলিলেই চলে—যদিও ভালবাসার আকর্ষণে বা ঘটনাচক্রে স্বামী অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সহিত স্বল্প দিনের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। সেসব কথা আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিব।

দিল্লী হইতে ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে (১৮৯১) আলোয়ারে পৌঁছিয়া স্বামীজী জনসাধারণের মধ্যে আপনাকে অকাতরে বিলাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবভাবে ভাবিত নগরবাসীরা স্বামীজীর অশ্রুসিক্ত বদনে আবেগময় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত-শ্রবণে সিদ্ধান্ত করিল, "বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন; নতুবা আমরাও তো তাঁহাকে ডাকি; কিন্তু কই, আমাদের তো এমন তন্ময়তা হয় না!" ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর উপস্থিতিসংবাদ আলোয়ার-মহারাজের দেওয়ান রামচন্দ্রজীর কর্ণে পৌঁছিল। সুশিক্ষিত ও অনুভূতিসম্পন্ন স্বামীজীর প্রভাবে ইংরেজভাবাপন্ন মহারাজের মতিগতি পরিবর্তিত হইতে পারে ভাবিয়া একদিন দেওয়ানজী স্বামীজীকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং মহারাজকে আমন্ত্রণপূর্বক পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা,স্বামীজী, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনি তো সহজেই অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন। ঐ পথ ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বলতে পারেন, আপনি রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক দিনরাত্রি সাহেবদের সহিত খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীজীর এই অসমসাহসিক উত্তরে মহারাজ ক্রুদ্ধ না হইয়া সহজভাবেই বলিলেন যে, তাঁহার ঐরূপ করিতে ভাল লাগে। তখন স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহারও পক্ষে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আলাপ চলিতে লাগিল। মহারাজ আবার কথাপ্রসঙ্গে মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর অভিমত জানিতে চাহিলেন। ঐ বিষয়ে যুক্তি-তর্কে ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামীজী সম্মুখের প্রাচীরে

আলোয়ারের মহারাজের যে ফটোখানি ছিল তাহা আনাইয়া দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, "ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করুন।" উপস্থিত সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন—"সাধু কি উন্মাদ! প্রাণের ভয় পর্যন্ত নাই!" তখন চারিদিকের সশঙ্ক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, ছবিতে মহারাজ সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার স্মারকরূপে উহা যেমন শ্রদ্ধেয়, তেমনি ভগবানের প্রতীকসমূহও আমাদের পূজার্হ; অধিকন্তু বিম্ব ও প্রতিবিম্বে যেমন এক হিসাবে প্রভেদ নাই, মূর্তি ও ভগবানেও তেমনি অভেদ। এইরূপে আলোয়ারে দুই মাস অবস্থানপূর্বক সকলের মনে ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি উদ্দীপিত করিয়া স্বামীজী ২৮ মার্চ অন্যত্র চলিলেন।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামীজী তথায় প্রায় দুই সপ্তাহ যাপন করিলেন। জয়পুরে জনৈক বৈয়াকরণের সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী তিন দিবস ধরিয়া প্রথম সূত্রটির ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিলেও স্বামীজীর ধারণা হইতেছে না দেখিয়া জানাইলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা আর কোনও বিশেষ উপকার সম্ভব নহে। ইহাতে স্বামীজী লজ্জিত হইয়া স্বয়ং যত্নসহকারে তিন ঘণ্টা ধরিয়া ঐ অংশ পাঠ করিলেন। এবং যখন ধারণা হইল যে, উহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তখন পণ্ডিতজীর নিকট ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তখন তাঁহার গূঢ় লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদক সুচিন্তিত ব্যাখ্যা শ্রবণে স্তম্ভিত হইলেন!

অনন্তর স্বামীজীর ভ্রমণের ধারা—জয়পুরের পর আজমীঢ় এবং তাহার পর আবু-পর্বতের রমণীয় পরিবেশের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আট কোটি টাকায় নির্মিত অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত জৈনমন্দির-দর্শন। তিনি ১৪ এপ্রিল আবুতে উপস্থিত হইয়া এক গুহায় আশ্রয় পান। পরে তিনি এক উকিলের বাড়িতে থাকেন। সেখানে খেতড়ির মহারাজ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। তাঁহার মধুর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে বিমুগ্ধ খেতড়ির মহারাজ কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহাকে লইয়া আজমীঢ় ও জয়পুরের পথে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবায় রত হইলেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ ছিলেন। এই সুযোগ বৃথা যাইতে না দিয়া স্বামীজী তাঁহার নিকট অসমাপ্ত পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং স্বীয় ব্যুৎপত্তির জন্য অচিরেই পণ্ডিতজীর প্রশংসালাভে সমর্থ হইলেন। খেতড়ির রাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন পুত্রলাভের জন্য সানুনয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদপ্রার্থী হইলে এইরূপ পরম অনুগত ভক্তের অনুরোধ

অনুপেক্ষণীয় জানিয়া স্বামীজী প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমরা দেখিব—সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞের এই বরদান যথাকালে সফল হইয়াছিল। এই সময়ে এক নিদাঘসন্ধ্যায় জনৈকা নর্তকীর বীণাবাদনসম্বলিত সঙ্গীতের আসর বসিয়াছিল। তখন মহারাজ অকস্মাৎ মনে করিলেন, স্বামীজীকে সেখানে আহ্বানপূর্বক এই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করানো উচিত। আহ্বানশ্রবণে স্বামীজী আসিলেন বটে; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গের পর যেমনি সেই নর্তকী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, অমনি তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন যে, ইহা অতি উচ্চস্তরের সঙ্গীত—শুনিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। অগত্যা পুনর্বার আসন গ্রহণ করিতে হইল। লোকচক্ষে হীনা, সমাজে অবমানিতা রমণী স্বীয় সঙ্গীতমধ্যে অন্তরের করুণ মিনতি ঢালিয়া দিয়া সুরদাসের একটি পদাবলী গাহিতে লাগিল—

> প্রভু মেরে অওগুণ চিত না ধরো।
> সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ॥
> ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধঘর পরো,
> পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো ॥

ভক্তকবির ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই অপূর্ব সঙ্গীত তারকাখচিত নীলাকাশের নিম্নে শান্ত নৈশ সমীরণে ভাসিয়া চলিল—স্বামীজী সেই ভাবরাজ্যে মগ্ন হইয়া দেখিলেন, সত্যই তো "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" অবহেলিতা নারীর মধ্যেও আজ আদ্যাশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি অপরাধ করিয়াছি; আপনাকে অবহেলা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম—আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।"

ক্রমে খেতড়ি-ত্যাগের সময় আসিল। অনুরক্ত রাজা ও গরিব প্রজাদের নিকট বিদায়গ্রহণের পর স্বামীজী গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে আহমেদাবাদে কতিপয় দিবস অতিবাহনান্তে ক্রমে সৌরাষ্ট্রের লিমড়ি নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের একটি নির্জন বাসস্থান আছে—সেখানে অনায়াসে থাকা চলে। স্বামীজী সরলমনেই সেখানে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু প্রবেশের পরই বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই সাধুনামধারী ভণ্ডগণের হস্তে তিনি বন্দি। তাহাদের নেতা স্পষ্টই জানাইল, "আমরা এক বিশেষ সাধনায় রত আছি; উহার সিদ্ধির জন্য আপনার ন্যায় একজন উচ্চদরের সাধুর আকুমার ব্রহ্মচর্যভঙ্গের আবশ্যক।" স্বামীজী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু বাহিরে কোন উদ্বেগ না দেখাইয়া শান্তমনে জগদম্বার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পর দিবস একটি পূর্বপরিচিত বালক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি একখানি

শৃঙ্খলমকুচিতে কয়লার দ্বারা কয়েকটি শব্দ লিখিয়া তাহার মারফত লিমড়ি-রাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং এইরূপে প্রায় দুই দিবস এই বন্দিশালায় নরকযন্ত্রণা-ভোগের পর রাজার সাহায্যে উদ্ধার পাইলেন। তারপর কয়দিন রাজভবনেই কাটাইয়া তিনি জুনাগড়ে গেলেন।

জুনাগড়ে তিনি রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের অতিথি হইলেন। এই অবসরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান—সর্বসম্প্রদায়ের সুপবিত্র ও সুবিদিত ধর্মক্ষেত্র গির্নার পর্বতে গমন করেন এবং দত্তাত্রেয় ও তীর্থঙ্করাদির পূত স্মৃতি ও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে আকৃষ্ট হইয়া একটি গুহাভ্যন্তরে কিয়দ্দিবস ধ্যানধারণায় যাপন করেন। অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাবর্তনান্তে বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ভুজ রাজ্যাভিমুখে চলিলেন। বিদায়কালে দেওয়ানজী তাঁহার হস্তে ভুজ রাজ্যের উচ্চ রাজকর্মচারীদের নামে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পাঠকের হয়তো কৌতূহল জাগিবে যে, পথচারী কপর্দকহীন পরিব্রাজকের এই কি পরিণতি—তাঁহার কেন রাজদ্বার হইতে রাজদ্বারান্তরে পরিচয়পত্র হস্তে অভিগমন? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজ-অতিথি হইলেও তিনি সর্বত্র সর্বদা জনসাধারণের সহিত ধর্মচর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। অধিকন্তু লোককল্যাণে উৎসর্গিত-জীবন স্বামীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দেশের ধর্ম, শিক্ষা ও কৃষ্টির উৎকর্ষবিধান এবং আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে নেতৃস্থানীয় সকলের ভাবরাজ্যে এক আমূল পরিবর্তন আনয়ন আবশ্যক। অতএব স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াও তিনি ধনিগণের মনোজয় করিতে অগ্রসর হইলেন। ভুজ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি দেওয়ানজীর আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ও ভুজরাজের সাহায্যে দূরে ও নিকটে সমস্ত তীর্থ দর্শন করিলেন। অনন্তর জুনাগড় হইয়া ভেরাওয়াল ও সোমনাথ (প্রভাস) অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ঐ সকল তীর্থাদি দর্শনান্তে তৃতীয়বার জুনাগড়ে প্রত্যাগমনপূর্বক পোরবন্দর (সুদামাপুরী) দর্শনে চলিলেন।

পোরবন্দরের মহারাজের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি পুনর্বার সংস্কৃত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাহা তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত তখন তাঁহার প্রায় সমস্ত দিনই অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত। রাজসভার সভাপণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয় তখন বেদের অনুবাদকার্যে লিপ্ত ছিলেন; তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী তাঁহাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের সাহায্যে ফরাসী ভাষাও অনেকটা আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয় বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতেছে

বিদেশ—সভাসদ্‌গণও ইহা অনুমোদন করিলেন। বস্তুত স্বামীজীর মনেও এই চিন্তা পূর্বেই উদিত হইয়াছিল এবং জুনাগড়ে অবস্থানকালে তথাকার অন্যতম রাজকর্মচারী শ্রী সি.এইচ. পাণ্ডিয়ার নিকট এ অভিলাষ জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য যাহাই হউক না কেন, সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে ভারতের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা তখনও কল্পনাবিলাস মাত্র। অতএব আপাতত মনের স্বপ্ন মনেই রাখিয়া কিংবা অকস্মাৎ আগ্রহবশে দুই-চারি জন বন্ধুকে বলিয়া ফেলিয়া, অবশেষে সুদামাপুরীর মায়া কাটাইয়া তিনি দ্বারকায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রয় লইলেন। মঠের নির্জনকক্ষে তাঁহার অন্যতম গভীর চিন্তার বিষয় হইল—এই আত্মহারা, নিপীড়িত, পরানুকরণরত হিন্দু ভারতের তিনি কি করিতে পারেন? কিন্তু ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইলেও পন্থা তখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল। এদিকে অশান্ত মন তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া চলিল।

অতঃপর তিনি খাণ্ডোয়ায় উপনীত হইলেন এবং দৈবক্রমে উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটায় তাঁহারই ভবনে প্রায় তিন সপ্তাহ যাপন করিলেন। খাণ্ডোয়াতেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ভাবের আদান-প্রদানকালে স্বামীজীর মনে চিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। একদিন হরিদাসবাবুকে বলিয়াও ফেলিলেন, "কেহ আমায় যাতায়াতের খরচ দিলে আমি যাইতে পারি।" কিন্তু তখনও উপযুক্ত সময় আসে নাই; সুতরাং তিনি ৺রামেশ্বরদর্শনমানসে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে বোম্বাই নগরে পৌঁছিলেন।

১৮৯২ সনের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই-এ পদার্পণান্তে স্বামীজী ব্যারিস্টার ছবিলদাসের বাটিতে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক বেদান্তচর্চায় মন দিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে স্বামী অভেদানন্দের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কালী, আমার ভিতর এতটা শক্তি জমিয়াছে যে, ভয় হয় পাছে ফাটিয়া যাই।" বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার ট্রেনে একই কক্ষে কয়েকজন ভদ্রলোক স্বামীজীকে দেখিয়া ইংরেজি ভাষায় সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিতে থাকেন—তাঁহাদের ধারণা ছিল স্বামীজী ঐ ভাষায় অজ্ঞ। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজীও আলোচনায় যোগদান করিলে সকলে সর্ববিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা সন্দর্শনে ও অকাট্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে চমৎকৃত হইলেন। ঐ কক্ষে গুণগ্রাহী বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও ছিলেন; তিনি স্বামীজীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া প্রায় এক মাস রাখিলেন। পুনা হইতে স্বামীজী বেলগাঁওয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রথমে একজন মহারাষ্ট্র ভদ্রলোকের ও পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয়ের বাটিতে অবস্থান করেন। উভয় স্থলে সর্বদা বহু ধর্মপিপাসু

তাঁহার সন্দর্শন ও সদালাপ শ্রবণের জন্য সমবেত হইতেন। সকলেরই দেখিয়া বিস্ময় জন্মিত যে, স্বামীজী যে শুধু ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ অথচ মৌলিক প্রণালীতে অতি সুন্দর বুঝাইয়া দিতে পারেন তাহাই নহে, জড়বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ এবং প্রতিটি কথা ভাবসম্পদে পূর্ণ। স্বামীজীর মনে তখনও চিকাগো যাইবার বাসনা জাগিতেছে—একদিন হরিপদবাবু উহা জানিতে পারিয়া পূর্ণ উৎসাহে অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্বামীজী জানাইলেন যে শুভমুহূর্তের তখনও বিলম্ব আছে—৺রামেশ্বর-দর্শন না করিয়া তিনি অন্য কিছুতেই হাত দিবেন না। অতঃপর সস্ত্রীক হরিপদবাবুকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তিনি ২৭ অক্টোবর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

কয়েক স্থান ঘুরিয়া স্বামীজী মহীশূরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহারই আহ্বানে আয়ার-গৃহে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে আয়ার মহাশয় মহারাজের সহিতও তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন। অতঃপর তরুণ আচার্যের গুণে মুগ্ধ মহারাজের আদেশে রাজপ্রাসাদেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজসংসারে বাস সর্বদা অবিমিশ্র শান্তির আকর নহে। একদিন রাজসভায় উপবিষ্ট মহারাজ স্বীয় অমাত্যদিগের সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত আহ্বান করিলে স্পষ্টভাষী নির্ভীক সন্ন্যাসী জানাইলেন যে, পার্ষদরা সর্বদা সর্বত্র যেরূপ স্বার্থপর ও চাটুবাদী ইত্যাদি হইয়া থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই। কথাপ্রসঙ্গে তিনি দেওয়ানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সভা নিস্তব্ধ! স্পষ্টই মনে হইল, এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্য হইলেও অপ্রিয়; সুতরাং ক্ষোভের উদ্রেক হইয়াছে। সভাশেষে মহারাজ স্বামীজীকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, অপ্রিয় সত্য না বলাই উচিত, ইহাতে এইরূপ স্থলে বিষপ্রয়োগে প্রাণহানিও ঘটিতে পারে। স্বামীজী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তেজিতকণ্ঠে জানাইলেন, "তোষামোদ চাটুকারদিগের ব্যবসায়—সন্ন্যাসীর ব্যবসায় সত্যকথন।" রাজবাটিতে কখনও কখনও অন্যরূপ কার্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে নামিতে হইত। একদিন প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে এক বেদান্ত সভায় বহু পণ্ডিত বক্তৃতা করেন। পরে স্বামীজী আহূত হইয়া আপন অনুভূতিদ্বারা লব্ধ বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব ও জীবনে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন যে, চতুর্দিকে ধন্যবাদ বর্ষিত হইল। অপর একদিন স্বামীজীর গুণাবলীতে বিমুগ্ধ প্রধান অমাত্য মহাশয় স্বীয় সেক্রেটারির সহিত স্বামীজীকে বাজারে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য, উপহার-স্বরূপে স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুযায়ী কোন একটি মূল্যবান বস্তু, প্রয়োজন হইলে সহস্র মুদ্রাব্যয় করিয়াও কিনিয়া দিবেন। স্বামীজী

সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া প্রশংসা করিলেন, কিন্তু কিছুই লইলেন না; অবশেষে সেক্রেটারির অনুরোধে বলিলেন, "আমাকে এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরুট আনিয়া দিন।" ইহাকে বলে নিঃস্পৃহা! অপর একদিন অমাত্যবর ও স্বামীজীকে স্বকক্ষে আহ্বানপূর্বক মহারাজ জানিতে চাহিলেন, তিনি স্বামীজীর জন্য কি করিতে পারেন। স্বামীজী একঘণ্টা যাবৎ ভারতের উন্নতিবিষয়ে চিত্তগ্রাহী আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার চিকাগো যাইবার অভিলাষ জানাইলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজীর সেই এক কথা—৺রামেশ্বর দর্শনের পূর্বে কর্তব্য স্থির করা হইবে না। সম্ভবত ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁহার বরপুত্রকে বিদেশপ্রেরণের পূর্বে স্বদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

মহীশূর পরিত্যাগান্তে স্বামীজী প্রথমে কোচিনে গেলেন এবং পরে ডিসেম্বর মাসে ত্রিবান্দ্রামে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক সুন্দররামন আয়ারের বাটিতে উঠিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও বিদ্বৎসমাজে স্বামীজী শীঘ্রই সুপরিচিত হইলেন। এইরূপে নয় দিবস তথায় যাপনান্তে ২২ ডিসেম্বর তিনি কন্যাকুমারী যাত্রা করিলেন। তথায় মন্দিরে যথাবিধি দেবীদর্শনান্তে বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল নিপীড়িত হিন্দুজাতির অসহ্য মর্মবেদনা। সে জাতির উন্নতির মুখ নিরুদ্ধ, অন্তরে গভীর অন্ধকার, আর চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্যের পূতিগন্ধময় করাল ছবি। ইহার প্রতিকার সম্ভব কি? এই নিপতিত জাতির উদ্ধার বর্তমান যুগে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সুদূরপরাহত—ইহার আত্মচেতনা জাগাইবার জন্যও বহির্দেশ হইতে আঘাত আসা প্রয়োজন। কিন্তু উপায়? সম্মুখে তরঙ্গায়িত অনন্ত জলরাশি, পশ্চাতে স্পন্দনহীন মৃতপ্রায় অস্থিকঙ্কালসার বিশাল জনতা! স্বামীজী সঙ্কল্প করিলেন—এই দুর্লঙ্ঘ্য জলধি অতিক্রম করিয়া বিদেশে ভারতের গৌরব খ্যাপন করিবেন এবং ভারতের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত দুই-চারিটি অমূল্যসম্পদ পাশ্চাত্যের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার প্রতিদানে ভিক্ষা করিয়া লইবেন তাহাদের ইহলৌকিক ঐশ্বর্যলাভের যাদুমন্ত্র। মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইবার ইহাই কৌশল!

স্থিরসঙ্কল্প, লব্ধালোক স্বামীজী গাত্রোত্থানপূর্বক ৺রামেশ্বর অভিমুখে চলিলেন। পথে মাদুরায় রামনাদ-রাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ৺রামেশ্বর দর্শনান্তে পণ্ডিচেরী হইয়া মাদ্রাজে পদার্পণ করিলে নগরের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও যুবকগণ অচিরে তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য ও মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া উপদেশ লাভের অভিলাষে তাঁহার নিকট যাতায়াত

করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনুরাগীর সংখ্যা বর্ধিত হইয়া একটি বৃহৎ দল গড়িয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী বিদেশগমনে উৎসুক। ইহা তাঁহাদেরও প্রাণে সাড়া দিল; অতএব ঐ সঙ্কল্পকে রূপদানের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মন অকস্মাৎ সংশয়ে দোলায়িত হইল—"আমি কি নিজের খেয়ালে ইহা করিতেছি, কিংবা ইহার মধ্যে বিধাতার গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?" প্রকাশ্যে ভক্তদিগকে জানাইলেন যে, তিনি জগদম্বার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া সংগৃহীত অর্থগ্রহণে অক্ষম; অতএব উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বণ্টিত হউক—মহামায়ার ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনিই আসিবে। অগত্যা অর্থ বিতরিত হইয়া গেল—স্বামীজীও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অসম্ভব-সাধনের পূর্বে ইহা কি সন্দেহজনিত উন্মাদপ্রায় চিত্তচাঞ্চল্য, অথবা উদ্দাম লম্ফনে বেলা অতিক্রমের পূর্বে সমুদ্রপ্রায় ক্ষণিক পশ্চাদপসরণ? কেবল ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

অনন্তর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে (১৮৯৩) তিনি হায়দরাবাদে উপস্থিত হইলেন। ১৩ তারিখে সেকান্দ্রাবাদে মহবুব কলেজে 'আমার পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে তিনি এক বক্তৃতা প্রদানপূর্বক স্বীয় বিদ্যাবত্তা, ভারতের অমূল্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের প্রাপ্য সাহায্যাদি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সমুৎসুক করিয়া তুলিলেন। ইহার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাদির ফলে বহু ব্যক্তি তাঁহার বিদেশ যাত্রার ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাগত স্বামীজীকে মাদ্রাজবাসীরা বিপুল সংবর্ধনা জানাইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পুনর্বার পাশ্চাত্য গমনের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহে তৎপর হইলেন। এবারে স্বামীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন না; পরন্তু জগজ্জননীর অভিপ্রায় জানার প্রত্যাশায় মনে মনে প্রার্থনাদিতে নিরত রহিলেন। ইতোমধ্যে এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকেও পশ্চাদনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনোমধ্যে এক পরম শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল আর দৈববাণী শোনা গেল, "যাও।" তথাপি উহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া কলকাতায় শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখিয়া সমস্ত জানাইলেন এবং তাঁহার আশীর্বাদ চাহিলেন। মাতাঠাকুরানী বহু দিবস পরে স্নেহাস্পদের পত্র পাইয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইলেন, অপর দিকে তেমনি বিদেশে সন্তানের অনিষ্ট-আশঙ্কায় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইলেন! এই দ্বিধাসঙ্কুলচিত্তে শয়ন করিয়া এক

রাত্রিতে তিনি স্বামীজীরই অনুরূপ এক স্বপ্ন দেখিলেন ও নরেন্দ্রকে পত্রে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; অধিকন্তু গমনেরও অনুমতি দিলেন। পত্র পাইয়া স্বামীজীর বদন উৎসাহে সমুজ্জ্বল হইল এবং সে আগ্রহ শিষ্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ায় দুই-এক দিনের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

এদিকে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের দুই বৎসর পরে পুত্রমুখ-সন্দর্শনে অতিমাত্র আহ্লাদিত খেতড়ি-রাজ তাঁহার দ্বারা পুত্রকে আশীর্বাদ করাইবার মানসে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটারি জগমোহনজীকে মাদ্রাজে পাঠাইলেন। স্বামীজী যদিও জানাইলেন যে, ৩১ মে তাঁহার যাত্রার দিন অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং তৎপূর্বে খেতড়ি যাওয়া অসম্ভব, জগমোহন তথাপি ধরিয়া বসিলেন যে, বন্দোবস্ত প্রভৃতির দায়িত্ব খেতড়ি-রাজের উপর ছাড়িয়া দিয়া অন্তত এক দিনের জন্যও তাঁহাকে তথায় যাইতেই হইবে; এই নির্বন্ধাতিশয়ে যাইতেই হইল। খেতড়ি হইতে ফিরিবার পথে রাজার অভিপ্রায়ানুসারে জগমোহন বোম্বাই পর্যন্ত সঙ্গে যাইয়া স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন এবং রাজপ্রদত্ত কিঞ্চিৎ বস্ত্রাদিও সঙ্গে দিলেন। ৩১ মে (১৮৯৩) স্বামীজী বিশাল সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য জাহাজে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর স্বামীজীর জীবনের এক অভিনব অধ্যায়—ভারতের জীবনেও তাহাই। এক আত্মবিস্মৃত জাতিকে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দানপূর্বক স্বশক্তিতে অবিশ্বাস দূর করা, পরপদাবনত ভারতকে উন্নতমস্তকে বিশ্বসমাজে আপন স্থান অধিকারের জন্য আহ্বান করা, মদদর্পিত পাশ্চাত্য জগতে এক অজ্ঞাতপূর্ব সত্যের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া সেই সত্যের আকরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এবং পররাজ্যশোষক বিদেশীদিগকে স্বার্থত্যাগপূর্বক বিজিতের সেবায় নিয়োজিত করা বড় সহজসাধ্য কর্ম নহে—অথচ ইহাই বিবেকানন্দ-জীবনের ধনুর্ভঙ্গ-পণ। কে তখন জানিত যে, এই অজ্ঞাতনামা নগণ্য সন্ন্যাসীই ভারতে, তথা সমগ্র বিশ্বে, এক নব ভাবধারার প্রবর্তন করিবেন, কে ভাবিয়াছিল যে, সামান্য ধর্মমহাসভাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় সমুজ্জ্বল অধ্যায় বিরচিত হইবে? অথচ অবিশ্বাস্য হইলেও উহা সত্য।

বোম্বাই হইতে সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান হইয়া স্বামীজী প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি অতিক্রমপূর্বক জুলাই মাসের শেষে, সম্ভবত ২৫/৭/৯৩ কানাডা রাজ্যের ভ্যাঙ্কুভার (Vancouver) বন্দরে অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতে ট্রেনে আমেরিকার অন্যতম বিশাল মহানগরী চিকাগোতে উপনীত হইলেন। তখন বিশ্বমেলা (World's Fair) চলিতেছে—দেশবিদেশাগত নরনারীতে তখন চারিদিক কোলাহলমুখর। অজ্ঞাতকুলশীল নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর স্থান এখানে কোথায়?

অপরিচিত বন্ধুহীন বিদেশে বিবেকানন্দের বজ্রদৃঢ়চিত্তও অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই ব্যয়বহুল শহরে স্বল্প অর্থ লইয়া কিরূপে দীর্ঘকাল কাটাইবেন? সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, ধর্মমহাসভা হইবে সেপ্টেম্বরে। ততদিন হোটেলে বাস করিলে তিনি নিঃসম্বল হইবেন। তাই অনিশ্চিত নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কম্পিতহস্তে স্বদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে হয়তো ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে—সুতরাং অর্থ চাই। ইতোমধ্যে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, বস্টনে এতদপেক্ষা ব্যয় কম এবং সেখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও অধিক, কাজেই আপাতত সেখানে যাওয়াই সমীচীন মনে করিলেন। বস্টনের পথে রেলে সৌভাগ্যক্রমে ব্রিজি মেডোস নামক গ্রাম-নিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামীজী যেন অকূলে কূল পাইলেন। স্বামীজীর গুণে আকৃষ্টা বৃদ্ধা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

ব্রিজি মেডোসের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাইট মহোদয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইলেন এবং স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণের জন্য মহাসভার কর্তৃপক্ষের নামে চিঠি দিয়া তাঁহাকে পুনর্বার চিকাগোয় যাইতে বলিলেন। তদনুসারে চিকাগোয় উপস্থিত হইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যস্ত স্বামীজী দেখিলেন, রাইট সাহেব মহাসভার যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। লোকের নিকট সন্ধান করিলেন—কিন্তু সুবিশাল মহানগরে কে কাহার সংবাদ রাখে? ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিরুপায় স্বামীজী মালগাড়ি রাখিবার প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে শুইয়া ভগবচ্চিন্তায় প্রচণ্ড শীতে রাত্রি কাটাইলেন। রাত্রিপ্রভাতে হ্রদের ধারে ক্রোড়পতিদের বাটির সম্মুখে অন্ন ও বাসস্থানের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা তো ভারতবর্ষ নহে যে, কেহ ভিক্ষুকের প্রতি দয়াপরবশ হইবে! অবশেষে ক্লান্তদেহে নিরাশমনে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন; এমন সময়ে সম্মুখবর্তী হর্ম্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—একজন মহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কিনা। স্বামীজী কহিলেন, "হাঁ।" ইহাই যথেষ্ট। স্বামীজী অচিরে শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ হেল মহোদয়ের গৃহে আত্মীয়স্বরূপে সাদরে গৃহীত হইলেন—বিধাতা চোখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর যথাকালে সাড়ম্বরে মহাসভার উদ্বোধন হইলে সমাগত প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিকর্তৃক আহূত হইয়া আপন আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। সকলেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেতাদুরস্ত বক্তৃতায় অনভ্যস্ত স্বামীজী বিদেশে ছয়-সাত সহস্র সুশিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে এইভাবে

আপন হৃদয়ের কথা জানাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; অতএব সভাপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াও বারংবার "এখন নহে" বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাপতি আর তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই ঘোষণা করিলেন, "পরবর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ।" অমনি নিরুপায় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণচরণ স্মরণপূর্বক যন্ত্রপরিচালিতবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ!" সে আহ্বানে মন্ত্রের ন্যায় কার্য হইল। সাধারণ নিয়মানুরূপ ভব্যতার পরিবর্তে স্বামীজী সামান্য কয়টি শব্দে সমস্ত মহাসভায় যে অন্তরের বাণী প্রকটিত করিলেন, তৎশ্রবণে আমেরিকাবাসী উৎফুল্ল হইল—চতুর্দিকে মহাশব্দে করতালিনিনাদ উত্থিত হইল। স্বামীজী কিন্তু প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে, গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগপূর্বক তিনি যে মর্মস্পর্শী ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাতেই সমবেত নরনারীর রুদ্ধ প্রেমের উৎসমুখ অকস্মাৎ উন্মোচিত হইয়া সকলকে ভাববন্যায় ভাসাইতেছে; অতএব কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামীজী মত্ত জনতার সম্মুখে কিঞ্চিৎকাল মৌনবিস্ময়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সভা নিস্তব্ধ হইলে গেরুয়াগাত্রাবরণ ও উষ্ণীষ পরিহিত ভারতের সন্ন্যাসী বীরদর্পে বক্ষে হস্তদ্বয় নিবদ্ধ করিয়া এবং পদ্মপলাশলোচনদ্বয়ে জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া পুনর্বার গম্ভীরস্বরে আবেগভরে ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী শুনাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, স্বামীজী মহাসভার বিশ্ববিজয়ী বীর—আর তাঁহার নামে অপূর্ব যাদু! ইহার পর কোন দিন সভায় শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিতে হইলে সভাপতিকে ঘোষণা করিতে হইত, ঐ দিন সর্বশেষ বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। সেই দিন হইতে চিকাগো মহানগর স্বামীজীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল—আমেরিকার সমস্ত শহর সেই দিন হইতে হিন্দুসন্ন্যাসীর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিল এবং চিকাগোর সর্বত্র বীর সন্ন্যাসীর ত্রিবর্ণ প্রতিচ্ছবি দর্শকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে লাগিল।

চিকাগো মহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে বিবিধ বিষয়ে স্বকীয় ভাষণ শেষ হইয়া গেলে স্বামীজীর বিশ্বাস জন্মিল যে, তখনই দেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া আরও কিছুকাল আমেরিকায় প্রচার কার্যে রত থাকিলে সুফল ফলিবে। আমেরিকার নরনারীরাও এই বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ দেখাইলেন। সুতরাং সর্বত্র বক্তৃতাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু সুনাম হইলেই শত্রুবৃদ্ধি হয়। তবে আমেরিকার ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা তত আশ্চর্যের বিষয় নহে—স্বামীজী তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় এই যে, যে সকল স্বদেশবাসী তখন আমেরিকায় ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বিবিধরূপে তাঁহাকে জনসমাজে হেয় করিতে চাহিলেন। প্রত্যুত বিধি যাঁহার সহায় মানুষ তাঁহার কি করিবে? ফলত

শত্রুঞ্জয় সন্ন্যাসী এই সকল ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া বিজয়মাল্যে ভূষিত হইতে থাকিলেন।

এই বিজয়ের ও এই শত্রুতার ঢেউ অচিরে স্বদেশের কূলেও আসিয়া আঘাত করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "নরেন জগৎ মাতাইবে"; মঠের ভাইরা দেখিলেন আজ ইহা সত্যে পরিণত। আর ভারতের দিকে দিকে লক্ষমুখে উচ্চারিত হইল, "জয়, বিবেকানন্দের জয়।" কিন্তু একদিকে স্বধর্মপরায়ণ হিন্দু ভারত যেমন স্বামীজীর নামে মাতিয়া উঠিল, অপরদিকে তেমনি আবার বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও স্বদেশী স্বার্থান্বেষী একদেশদর্শীর দল তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। পরন্তু বিদেশের ন্যায় স্বদেশেও সেই ক্ষণিক বিদ্বেষ কিয়ৎকাল গরল উদ্গীরণপূর্বক আপনারই অবমাননা করিয়া অচিরে ক্ষীণপ্রভ হইল—ভারতগগনে স্বামীজীর অমল ধবল যশোরাশি একমাত্র জ্যোতিষ্করূপে বিদ্যমান থাকিয়া অধিকতর ভাস্বর দেখাইতে লাগিল।

অর্থের দিক হইতে স্বামীজী তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন নাই; অতএব প্রয়োজনের তাড়নায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথমত একটি বক্তৃতা কোম্পানির আনুকূল্যে তাহাদেরই পরিকল্পনানুযায়ী আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যদিও দেশ-বিদেশের মানবের কল্যাণার্থ তিনি সন্ন্যাসের রীতিবিরুদ্ধ অর্থোপার্জনে পর্যন্ত তৎপর হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তথাপি লব্ধ আয়ের ন্যায্য অংশ তাঁহাকে না দিয়া কোম্পানি অধিকাংশ অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। কাজেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি স্বাবলম্বী হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমত আর্থিক ক্ষতি হইবে যথেষ্ট—ইহা জানিয়াও তিনি সানন্দে এই স্বাধীন পন্থা বরণপূর্বক এক পত্রে ভারতীয় ভক্তদিগকে কার্যধারা-পরিবর্তনের কারণ জানাইলেন, "এইরূপে যথেষ্ট অর্থসমাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে উদিত হইল—এ কি করিতেছি! আমি না সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শিষ্য! আমার আধ্যাত্মিক শক্তি যে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে! তৎক্ষণাৎ ঐরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করা ছাড়িয়া দিলাম।" ইত্যবকাশে তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার অবসরে তিনি আমেরিকানদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিশিতেন এবং পুস্তকাগার, মিউজিয়াম, সভাসমিতিতে যোগদানপূর্বক একদিকে যেমন স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত করিতেন, অপরদিকে তেমনি প্রচারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিতেন। অথচ ভাবিয়া অবাক

হইতে হয় যে, এইরূপে সর্বদা কর্মব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মন অনুক্ষণ চিরধ্যানমগ্ন হিমালয়েরই মতো আপনাতে ডুবিয়া থাকিত। অনেক সময় ট্রামে চলিতে চলিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তিনি গন্তব্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাইতেন; পরে কণ্ডাক্টর আসিয়া ভাড়ার জন্য তাগাদা করিলে সলজ্জভাবে উহা দিয়া নামিয়া পড়িতেন। আর তিনি সর্বদা বোধ করিতেন, কি এক অদৃশ্য দৈবশক্তি যেন তাঁহাকে হাত ধরিয়া সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে! ফলত প্রাচ্যভাবে লালিতপালিত বিবেকানন্দের এই আমেরিকার কার্যকে তপস্যার নামান্তর বলিলেই চলে—স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্মের অভ্যুত্থান ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণীর প্রচারকল্পে তিনি এই সমস্ত অভাব-অনটন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোকলজ্জা প্রভৃতিকে অঙ্গের ভূষণরূপে সহজ সরল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও তজ্জন্য প্রতিমুহূর্তে তাঁহাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত।

স্বামীজীকে বিদেশে বিভিন্ন সময়ে কিরূপ বিচিত্র হাবভাব ও পরিবেশের মধ্যে এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকসঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপূর্বক স্বকার্য পরিচালনা করিতে হইত, তাহার দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। আমেরিকায় ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বক্তা ও নাস্তিক ইঙ্গারসোলের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইঙ্গারসোল বলিয়াছিলেন যে, জগৎটা একটা ভোগ্য বস্তু; কাজেই জগদ্‌রূপ নেবুটাকে নিংড়াইয়া যতটা সম্ভব রস বাহির করিয়া লইতে হইবে। স্বামীজী তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, নিংড়াইতেই যদি হয় তবে ভগবানের বিধানে বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে সুস্থে নিংড়ানোই উচিত—অত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? ধীরে সুস্থে নিংড়াইলে বহুগুণ অধিক রস পাওয়া যায়। একবার পশ্চিমের এক নগরে বক্তৃতাকালে কয়েকটি যুবক তাঁহার মুখে বেদান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বক্তৃতা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যায়। সেখানে এক উল্‌টানো পিপার উপর দণ্ডায়মান স্বামীজী বক্তৃতায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কানের পাশ দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল। স্বামীজী তথাপি অবিকম্পিত—বক্তৃতা চলিতেই লাগিল! যুবকেরা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া সহর্ষে চিৎকার করিয়া উঠিল—"বহুৎ আচ্ছা আদমী!" একবার একস্থানে ট্রেন হইতে অবতীর্ণ তাঁহাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া জনৈক কৃষ্ণকায় নিগ্রো অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আমাদের জাতির মধ্যে একজন মস্তবড় লোক হইয়াছেন; তাই আমি আপনার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্যলাভ করিতে আসিয়াছি।" স্বামীজী বুঝিলেন, তাঁহাকে অশ্বেতকায় দেখিয়া ঐ নিগ্রো ভাবিয়াছেন যে, তিনিও নিগ্রো; পরন্তু তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া, বা দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গদের ন্যায় নিগ্রোকে অবমানিত না করিয়া, স্বীয় মৌনদ্বারা নিগ্রোর স্বাজাত্য স্বীকারপূর্বক সাদরে হস্তপ্রসারণ করিলেন ও তাঁহার করমর্দনান্তে ধন্যবাদ জানাইলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক নগরে তাঁহাকে নিগ্রো

ভাবিয়া কোন কোন শ্বেতাঙ্গ অপমান করিলেও তিনি আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সে অপমান হইতে রক্ষা পাইতে চাহিতেন না। পরবর্তী কালে কেহ এই ঔদাসীন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "কি! অপরকে ছোট করে বড় হব? ওজন্য তো আমি জগতে আসিনি।"

এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যুদ্বেগে নগর হইতে নগরান্তরে গমনাগমন করিতে হইত; অনেক ক্ষেত্রে এক সপ্তাহে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা ততোধিক বক্তৃতাও দিতে হইত। বক্তৃতা প্রস্তুত করার অবকাশ তো ছিলই না, ভাবিবারও সময় ছিল না। পরন্তু অন্তরের গভীরতম স্তরে এক অপূর্ব অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার চিন্তার ধারা নিয়মিত করিত। গভীর রাত্রে মনে হইত যেন, দূরাগত কোন অশরীরী বাণী তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্দেশ করিয়া দিতেছে; কিংবা আলোচনায় রত দুইটি বিদেহ আত্মা বিষয়বস্তুর উপর অভিনব আলোকপাত করিতেছে। এইসব শব্দ অপরেরও শ্রুতিগোচর হইত এবং তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেন, স্বামীজী এই গভীর রাত্রে কাহার সহিত আলোচনায় নিরত! ইহা ছাড়া অন্যান্য যোগজ শক্তিও এই কালে তাঁহার দেহমনে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছামত অপরের মনোভাব বা অতীত জীবনের ইতিহাস জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীজী স্বয়ং এইসব শক্তির কবলে পড়িতেন না—তিনি জানিতেন, ইহা শুধু নিম্নস্তরের লোকেরই নিকট কাম্য।

যাহা হউক, বক্তৃতা-কোম্পানির সম্পর্কত্যাগান্তে তিনি আমেরিকার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত গঠনকার্যে অগ্রসর হইলেন এবং এই জন্য তাঁহার নবীন কার্যধারার মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনা ও ধর্মগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিল। এইরূপে ডেট্রয়েট, গ্রীনএকার প্রভৃতি স্থানে আলোচনাদির সহায়ে তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হইলেন। এতদ্ব্যতীত ১৮৯৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হইল। অর্থের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সঞ্চিত অর্থই তিনি ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং আরব্ধ কার্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নপরায়ণ হইলেন। অবশ্য বাধাও আসিতে লাগিল প্রচুর। এমন কি, খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ এক সময়ে মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কালিমালেপনেও অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তকেশরী ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া সকল বাধাবিপত্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক আরও উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের শাশ্বত বাণী বিঘোষিত করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জয় হইল তাঁহারই—আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ বিবেকানন্দকে লইয়া মাতিয়া উঠিল।

নিউইয়র্কে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ অবলম্বনে শিক্ষাপ্রদানকালে তিনি যে সকল বক্তৃতাদি করিতেন তাহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইরূপ মৌখিক শিক্ষা

ভিন্ন তিনি ধ্যানাদি-অভ্যাসও করাইতেন। বস্তুত তাঁহার আবাসস্থলটি ক্রমে একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল বলিলেই চলে। কর্মকোলাহলপূর্ণ ও বিজাতীয় ভাবধারায় আপ্লুত মার্কিনদেশে এইরূপ ভারতীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। নিউইয়র্কে কার্যপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্তপ্রচারব্যপদেশে অন্যত্রও যাইতেন। এতাদৃশ প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে তিনি স্বভাবতই বিশেষ ক্লান্তিবোধ করিলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, গ্রীষ্মকালে যখন পাঠাদি বন্ধ থাকিবে তখন স্বামীজী জন কয়েক অনুরাগী ভক্তের সহিত সেন্ট লরেন্স্ নদীর মধ্যস্থিত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে) একটি রমণীয় ভবনে বাস করিবেন এবং ঐ সময়ে মাত্র কয়েকজন আগ্রহশীল ভক্তের জীবন নিবিড়ভাবে গঠনে নিযুক্ত থাকিবেন। তথায় তাঁহারা প্রায় দেড় মাস ছিলেন। প্রথমে শিষ্য-সংখ্যা ছিল দশ জন; পরে উহা দ্বাদশ জনে পরিণত হয়। এই দ্বীপোদ্যানে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় স্বামীজী ভাবমগ্ন হইয়া বিভিন্ন ধর্মপুস্তক অবলম্বনে যে সকল উচ্চ ভাবগম্ভীর উপদেশ দিতেন, তাহাই মিস ওয়াল্ডো-কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া পরে 'Inspired Talks'(দেববাণী) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজী ঐ সময়ে কিরূপ উচ্চ অধ্যাত্মভূমিতে অবস্থিত ছিলেন, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতি পঙক্তিতে বিদ্যমান।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে কার্যাবসানে তিনি শ্রীযুক্তা মূলার ও শ্রীযুক্ত ই.টি. স্টার্ডির আমন্ত্রণে প্যারি শহর হইয়া লণ্ডন যাত্রা করিলেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছিলেন। লণ্ডনে স্টার্ডি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণপূর্বক কার্য আরম্ভ করিলে অচিরেই তাঁহার নাম ও যশ সর্বত্র বিস্তৃত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল বাস অসম্ভব—তথায় থাকিলে আমেরিকায় বহু কষ্টে আরব্ধ এবং সাফল্যমণ্ডিত কার্যটি বিনষ্ট হইবে; কাজেই অপর কোনও সন্ন্যাসীকে ইংলণ্ডে রাখিয়া স্বয়ং আমেরিকায় যাইবেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তিনি ভারতে নবীন সন্ন্যাসীর জন্য পত্র লিখিয়া ইংলণ্ডে তিন মাস যাপনের পর ৬ ডিসেম্বর আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

এইবারে আমেরিকায় আসিয়া স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। উহাও যথাসময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। স্বামীজী লিখিয়া বক্তৃতা দিতেন না—বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া যেরূপ অনুপ্রেরণা পাইতেন তদনুযায়ী অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার মূল্যবান উপদেশ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ১৮৯৫-এর শেষে একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিদ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বামীজীর দ্রুত বাগ্মিতার অনুসরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত দেখিয়া অতঃপর মিঃ গুডউইন নামক একজন ইংরেজের উপর কার্যভার ন্যস্ত হইল। নবনিযুক্ত লেখক অচিরেই স্বামীজীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া

অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা ত্যাগপূর্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামীজীও গুডউইনের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই অল্পকাল পরেই ভারতে যখন শিষ্যের দেহত্যাগ হয়, তখন বলিয়াছিলেন, "আমার দক্ষিণহস্ত স্কন্ধচ্যুত হইল।" যাহা হউক, নূতন ব্যবস্থা-সাহায্যে নিউইয়র্ক নগরে সপ্তাহে সতেরটি পর্যন্ত ক্লাস চালাইয়াও স্বামীজীর আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা যেন তৃপ্ত হইতেছিল না; তাই তিনি সুযোগ পাইলেই বস্টন, ব্রুকলিন প্রভৃতি নগরেও বক্তৃতার জন্য যাইতেন। ফলত কর্মচঞ্চল আমেরিকাও এই 'প্রভঞ্জনসদৃশ হিন্দু' (সাইক্লোনিক হিন্দু) ও 'বিদ্যুৎসদৃশ বাগ্মী'কে (লাইট্‌নিং ওরেটার) দর্শন করিয়া চমকিত হইল।

১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইলে ঐ সকল বক্তৃতাবলম্বনে 'ভক্তিযোগ' রচিত হইয়া গেল। 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতাটিও ঐকালেই প্রদত্ত হয়। পূর্ববারে আমেরিকায় অবস্থানকালে কেহ কেহ তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন—এইবারেও একজন সন্ন্যাস লইলেন। এইরূপে স্বামী কৃপানন্দ (হার লিঁও ল্যান্সবার্গ), স্বামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরি লুইস) ও স্বামী যোগানন্দ (ডাক্তার স্ট্রীট) তাঁহার পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী শিষ্য হইলেন। অধিকন্তু শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা লেগেট, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি তাঁহার আমেরিকার কার্যের সহায় হইলেন।

১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করিয়া স্বামীজী আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে ইংলণ্ড হইতেও বারংবার আহ্বান আসিতেছিল। অতএব ১৫ এপ্রিল পুনর্বার ইংলণ্ডে চলিলেন—আমেরিকায় কার্যপরিচালনার জন্য রহিলেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবগণ।

মে মাসের প্রথমাবধিই স্বামীজীর লণ্ডনের বক্তৃতাদি আরম্ভ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে পাঁচটি ক্লাস ও প্রতি শুক্রবার প্রশ্নোত্তর ক্লাস চলিতে লাগিল। এই সঙ্গে বিভিন্ন সভাসমিতির আমন্ত্রণে নগরে এবং বাহিরে অন্যান্য বক্তৃতাদিও হইতে লাগিল। তাঁহার এই লণ্ডন-জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত পরিচয়। এই পরিচয়ের ফলে অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী রচনা করেন। এইবারে শ্রীযুক্তা মূলার, শ্রীমতী নোবল (নিবেদিতা), সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও শিক্ষিতসমাজ তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে।

জুলাই মাসে লণ্ডনের অবকাশকাল আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী ইউরোপভ্রমণে বহির্গত হইলেন—সহযাত্রিরূপে চলিলেন সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীমতী মূলার।

তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডে উপনীত হইয়া দ্রষ্টব্য-স্থানগুলি দর্শনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে জার্মানির কীল-নগরনিবাসী দার্শনিক পণ্ডিত পল ডয়সনের পত্র আসিল যে, তিনি স্বামীজীকে আপন ভবনে পাইতে অভিলাষী; সুতরাং আপাতত ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহিল। সুইজারল্যাণ্ডের দুই-একটি স্থান দেখিয়াই স্বামীজী জার্মানির হাইডেলবার্গ ও বার্লিন নগর হইয়া কীলে উপনীত হইলেন। বিদ্যোৎসাহী ঋষিতুল্য অধ্যাপক স্বামীজীকে পাইয়া সদালাপে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন এবং প্রথম পরিচয়ই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। অধ্যাপকের ইচ্ছা ছিল, কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গসুখ লাভ করেন; কিন্তু স্বামীজী জানাইলেন যে, প্রায় দেড়মাস ইংলণ্ডের কার্য বন্ধ আছে—উহার পুনরারম্ভ আবশ্যক। অগত্যা অধ্যাপক তাঁহাকে তখনকার মতো বিদায় দিয়া একসঙ্গে কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করার অভিপ্রায়ে পুনর্বার হামবার্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টার্ডাম হইয়া লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ইতঃপূর্বেই লণ্ডনে আসিয়াছিলেন এবং পরে স্বামীজীর আদেশে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে নিরত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামী অভেদানন্দও লণ্ডনে আসিয়া সেখানকার কার্যভার লইলে স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন যে, প্রতীচ্যে তাঁহার আরব্ধ কার্যের সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে—এখন তাঁহার ভারতে গমন আবশ্যক। তদনুসারে ১৬ ডিসেম্বর (১৮৯৬) তিনি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন। পথে ইটালির প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভূমধ্যসাগরে নেপল্‌স্‌ ও পোর্ট সৈয়দের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন—দেখিলেন, এক পক্বশ্মশ্রু বৃদ্ধ বলিতেছেন, "তুমি এক্ষণে ক্রীটদ্বীপের সন্নিকটে; এই স্থান হইতেই খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি।" স্বামীজীকে উক্ত বৃদ্ধ আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, বৌদ্ধদিগের 'থেরা-পুত্ত' ও 'আসীন' নামক শ্রমণ-সম্প্রদায়দ্বয়ই কালে 'থেরাপুটী' ও 'এসেনী' নামে খ্যাতিলাভ করে এবং উহাদেরই নিকট হইতে পরে খ্রিস্টীয় মতের উপাদান সংগৃহীত হয়। এই স্বপ্ন বা অনুভূতি স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং ভারতই যে জগতের সমস্ত ধর্মের আদিম উৎস, এই বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। এডেনের একটি ঘটনায় দরিদ্রের ও স্বদেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর অনাবিল প্রীতি-দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। জাহাজ এডেনে থামিলে তিনি ভ্রমণোদ্দেশ্যে তীরে নামিয়া দেখিলেন দূরে একজন ভারতীয় পানবিক্রেতার দোকান রহিয়াছে। অমনি ইংরেজ বন্ধুদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ঐ পানওয়ালার নিকটে গমনপূর্বক সোল্লাসে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ বন্ধুরা যখন কাছে আসিলেন, তখন স্বামীজী ঐ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "ভাই তোমার ছিলিমটা দাও তো", এবং উহা পাইয়া সানন্দে ধূমপান করিতেছেন। সেভিয়ার

সাহেব অবস্থা দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন, "ও, বুঝেছি, এই জন্যই আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?" ক্রমে ১৫ জানুয়ারি 'তমালতালী-বনরাজিনীলা' সিংহলের নয়নাভিরাম বেলাভূমি নয়নগোচর হইল এবং জাহাজ শীঘ্রই প্রভাতের নবারুণরাগে রঞ্জিত কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এক বিপুল জনতার পুরোবর্তী হইয়া বন্দরেই উপস্থিত ছিলেন—তিনি জাহাজে উঠিয়া বিজয়ী গুরুভ্রাতাকে সাদর আলিঙ্গন ও অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বামীজী সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন।

ডেট্রয়েটের কয়েকজন অনুরাগীকে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এদেশের লোকের নিকট আমার কার্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কতটুকুই বা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে।... কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মর্মস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হইবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।" স্বামীজী তাঁহার স্বদেশকে জানিতেন, স্বদেশবাসীকে চিনিতেন; কিন্তু ভারতে অবতরণের পর যে জয়োল্লাস, সঙ্গীত, স্তবপাঠ, উৎসব, শোভাযাত্রা, নগরসজ্জা, সভাসমিতি প্রভৃতি অবলম্বনে কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মাতিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় তিনিও মানসচক্ষে দেখিতে পান নাই। বাস্তবের নিকট কল্পনাও কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বিবেকানন্দের মুখে নব অভিযানের বার্তা শুনিবার জন্য ভারত তখন উন্মুখ। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রাথম্য ও প্রাধান্য বিঘোষণপূর্বক পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে নবভাবে রূপায়িত করা, হিন্দুভাবধারার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্বক তৎপ্রতি সকলকে আকৃষ্ট করা, অরণ্যের বেদান্তকে কর্মকোলাহলময় সংসারে আনয়নপূর্বক প্রতিগৃহে উহাকে 'কার্যে পরিণত বেদান্ত'রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরস্পরবিবদমান ধর্মসমূহ ও চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয়সাধনপূর্বক বিশ্ববাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করা যেমন বিবেকানন্দের অমূল্য অবদান, তেমনি প্রতিভাসমুজ্জ্বল দূরদৃষ্টি-সহায়ে জাতির গৌরবভাস্বর অতীতের প্রাণশক্তির আরাধনাপূর্বক মহাসম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করা, মুহ্যমান জাতির ধর্ম সমাজ শিক্ষা শিল্পকলা সাহিত্য—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের উদ্বোধনান্তে সর্বাঙ্গীণ প্রগতি সাধনে ভারতভারতীকে বজ্রনির্ঘোষে প্রাণোন্মাদক আহ্বান জানানো এবং স্বীয় জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সমস্ত পরিকল্পনাকে রূপ প্রদানপূর্বক সেই আদর্শগ্রহণে সকলকে আমন্ত্রণ করাও বিবেকানন্দ-জীবনের অন্যতর উদ্দেশ্য। কলম্বো হইতে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ।

কলম্বো, কাণ্ডি, অনুরাধাপুরম, জাফনা প্রভৃতি সিংহলের দ্রষ্টব্য স্থানে গমন ও বক্তৃতাদি দ্বারা, নবযুগের বাণী বিঘোষণান্তে স্বামীজী দক্ষিণ ভারতের পাম্বান বন্দরে পদার্পণ করিলে রামনাদাধিপতি অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। পরে সকলে ৺রামেশ্বর-দর্শনপূর্বক রামনাদে উপনীত হইলেন এবং অনন্তর পরমকুডি, মনমদুরা, কুম্ভকোণম হইয়া মাদ্রাজে আসিলেন। পথে অনেক স্থানেই বক্তৃতা করিতে হইল এবং প্রায় প্রতি স্টেশনেই বহু দর্শনার্থীর আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইল। মাদ্রাজ তাঁহাকে রাজসম্মানে আপ্যায়িত করিল এবং মাদ্রাজের শিক্ষিতসমাজ তাঁহার উদার বাণী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণপূর্বক উহা ভারতের সর্বত্র প্রচারে মত্ত হইল।

মাদ্রাজ হইতে জাহাজে কলকাতার সন্নিকটে আসিয়া তিনি যখন ট্রেনে স্বীয় জন্মভূমি ও সাধনক্ষেত্র কলকাতায় উপস্থিত হইলেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭), তখন অন্যান্য নগরের ন্যায় কলকাতাও এই দেবমানবকে সমুচিত পূজাসহকারে বরণ করিয়া লইল। অভ্যর্থনাদির পর যথাসময়ে স্বামীজী আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর মহানগরীতে সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি চলিতে লাগিল। জনগণকে উদ্বোধিত করিবার ইহা এক অমোঘ উপায় জানিয়া স্বামীজীও নিজস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সোৎসাহে এই সকল কার্যে যোগদানপূর্বক জনসেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, ইহাতে স্থায়ী ফল হইবে না—স্থায়ী ফল লাভের জন্য দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমেরিকায় অবস্থানকালেও তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং ঐ জন্য অর্থের আয়োজনে ও পত্রাদিতে উপযুক্ত উপদেশপ্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি কলকাতায় পদার্পণ করিয়া ভূমি-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠান-গঠন ও কর্মীদের শিক্ষায় মন দিলেন। পরিকল্পনা বিরাট; অতএব উদ্যম উৎসাহও হওয়া চাই বিপুল। প্রত্যুত প্রাণ চাহিলেও শরীর সর্বদা প্রাণের আবেগ মিটাইতে সক্ষম নহে। স্বামীজী বলিতেন, "আমার কার্য হইবে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র এবং বজ্রের ন্যায় দৃঢ়।" এদিকে অন্তর্যামী নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছিলেন যে, ইহলোকে তাঁহার দিন নিতান্তই সুপরিমিত। এই স্বল্পকালের মধ্যে বিশাল কার্যের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিতে যাইয়া তিনি স্বীয় শক্তিকে নিঃশেষে ব্যয় করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দাম ভাবধারা বহনে অপারগ দেহ তাই অল্পবয়সেই প্রতিপদে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া অবশেষে কলকাতা আগমনের অব্যবহিত পরে আশু বিপদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে লাগিল। সুতরাং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অচিরেই তাঁহাকে দার্জিলিং যাইতে হইল।

কর্মকে যিনি স্বেচ্ছায় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবকল্যাণে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, সুদূঢ় হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়েই বা তাঁহার চিন্তার বিরাম কোথায়?

অধিকন্তু বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক হইলেও উহা তখন অতি দুর্লভ ছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, তাঁহার কীর্তি পূর্ব হইতেই সেখানে প্রসারিত হইয়া শত শত গুণগ্রাহীকে নিকটে আকর্ষণ করিত। অতএব আলাপ-আলোচনায় অবশিষ্ট শক্তিটুকুও ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। ফলত শৈলনিবাসেও বিবিধ ধর্মালোচনা চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রচিত হইতে থাকিল ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের মানস মূর্তি। এপ্রিল মাসের শেষে মঠে ফিরিয়া স্বামীজী ১ মে কল্পনাকে রূপদানপূর্বক রামকৃষ্ণ মিশন গড়িয়া তুলিলেন। তিনি স্বয়ং সর্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি হইলেন এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেন যথাক্রমে উপসভাপতি ও কলকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি। বলরাম-মন্দিরে সমস্ত সাধু ও গৃহস্থভক্তের উপস্থিতিতে ও শুভেচ্ছাক্রমে এই দীর্ঘকাল-পরিকল্পিত ও বহুজনবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়া স্বামীজী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন—তিনি জানিলেন যে, গুরুদেবের হস্ত হইতে তিনি যে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অন্তত আংশিক সূত্রপাত হইল।

এইরূপে আপাতদৃষ্টিতে একের কর্মভার বহুজনের স্কন্ধে অর্পণের ফলে স্বামীজীর কর্তব্যের লাঘব হইলেও উহাতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি ঘটিল না, কারণ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে পরিচালিত করিবে কাহারা? অতএব যুবকদের শিক্ষাদিতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। এদিকে তাঁহার স্বাস্থ্যের অধিকতর অবনতি ঘটিতে থাকায় আলমোড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তথাপি দৈহিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্মবীর কি নীরব থাকিতে পারেন, অথবা প্রতিকারের প্রয়োজন সর্ববাদিসম্মত হইলেও দৈবপরিচালিত মহামানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারেন? ফলত আলমোড়া যাত্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত সময়ই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ব্যয়িত হইতে লাগিল—শাস্ত্রাদি পাঠ, আলাপ-আলোচনা, নব নব পরিকল্পনা ও তদনুরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহতই রহিল। এই কালের একটি ঘটনা অতীব স্মরণযোগ্য। একদিন তিনি স্বশিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে সায়ণভাষ্যসমেত বেদ পড়াইতেছেন, এমন সময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, "জি.সি., তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না—শুধু কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!" গিরিশবাবু নিজ দৈন্য জানাইয়া বেদরাশিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!" পরন্তু লোকচরিত্রবিদ গিরিশবাবু জানিতেন, বিবেকানন্দ বাহিরে যতই জ্ঞানপ্রচার করুন, অন্তর তাঁহার অতীব কোমল। অতএব শিষ্যসকাশে সেই ভাব উন্মোচিত করিবার অভিলাষে ভারতের দুঃখদৈন্যের একখানি মর্মন্তুদ চিত্র স্বীয় কবিসুলভ ভাষায় অঙ্কিত করিয়া অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "বল তো, এসব রহিত

করবার কোন উপায় বেদে আছে কিনা?" স্বামীজী ততক্ষণে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেছেন। নাট্যাচার্য অমনি শিষ্যকে সেই মূর্তি দেখাইয়া বিজয়গর্বে বলিলেন, "দেখলি রে, তোর গুরুর হৃদয়টা?" স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও স্বামীজী এ সময়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তপস্বিনী মাতার প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা দর্শনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৬ মে আলমোড়া-যাত্রা হইতে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট দ্বিতীয় বার আমেরিকা-গমন পর্যন্ত ঘটনাবলী আমাদিগকে সংক্ষেপেই বলিয়া যাইতে হইবে। আলমোড়া হইতে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া কাশ্মীরগমনকালে সর্বত্রই তাঁহাকে ইংরেজি ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতে হইয়াছিল। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথেও শিয়ালকোট ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে লাহোরের বক্তৃতাগুলি অতি চমকপ্রদ ও ভাবগম্ভীর। লাহোর হইতে তিনি দেরাদুনে যান এবং পরে রাজপুতানা ভ্রমণে নির্গত হন। অতঃপর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরিয়া আসেন।

এই উত্তরভারত-ভ্রমণকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষের করালছায়া নিপতিত হওয়ায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা স্বামীজীরই অনুপ্রেরণায় তাঁহাদের প্রথম সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। স্বামীজী দূরে থাকিলেও অর্থ ও উপদেশের দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন।

স্বামীজীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই অলক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা আর একটি নূতন প্রবাহ-রচনায় অগ্রসর হইল। ২৮ জানুয়ারি (১৮৯৮) স্বদেশ ও স্বগৃহের মমতা ত্যাগ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সেবাকল্পে শ্রীগুরু চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা ওলি বুল, শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও সেভিয়ার-দম্পতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন। অধুনা বিবেকানন্দের কর্তব্য হইল—ইঁহাদিগকে ভারতীয় কার্যের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা যথাকালে দেখিতে পাইব।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেও দেখা গেল, স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া দ্রুত অবনতি হইতেছে। অতএব প্রত্যাগমনের প্রায় তিনমাস পরেই (৩০ মার্চ) তাঁহাকে স্বাস্থ্যলাভার্থ পুনর্বার দার্জিলিং যাইতে হইল। পরন্তু অনতিকাল পরেই কলকাতা মহানগরীতে প্লেগ মহামারীরূপে দর্শন দিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী স্থির থাকিতে পারিলেন না—৩ মে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেবাকার্যে নামিলেন। এরূপ কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; সে অর্থ তখন রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের নাই। চিন্তাক্লিষ্ট জনৈক গুরুভ্রাতা স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন,

"স্বামীজী, টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?" মহাপ্রাণ মহামানব বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিলেন, "কেন? যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মঠের জন্য যে নূতন জমি ক্রয় করা হইয়াছে উহা বিক্রয় করিব।" তবে কার্যত ততদূর অগ্রসর হইতে হয় নাই; কারণ দেশের বদান্য ব্যক্তিগণ মুক্তহস্তে দান করিয়া সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ তুলিয়া দেওয়ায় সেবা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকিল। ইহার অল্পদিন পরেই প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হওয়ায় এবং সরকারের চেষ্টায় রোগীদের সেবার সুব্যবস্থা হওয়ায় স্বামীজী স্বীয় স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ১১ মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দ এবং কোন কোন গুরুভ্রাতা।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজীর প্রচারকার্যের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হইল। 'প্রবুদ্ধভারত' নামক একখানি ইংরেজি সাময়িক পত্র মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইত; উহার সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই সময়ে উহার সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় এবং পত্র কিছুকাল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহা আলমোড়ায় আনীত হইয়া স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের হস্তে ন্যস্ত হইল এবং সেভিয়ার-দম্পতি উহার বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই দম্পতিরই আনুকূল্যে পরবৎসর মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয় এবং 'প্রবুদ্ধভারত'ও তথায় স্থানান্তরিত হয়। যাহা হউক, এই বারে ১০ জুন পর্যন্ত স্বামীজী আলমোড়ায় থাকিয়া সদলবলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শনকালে লোককল্যাণব্রতী স্বামীজীর হৃদয়ে এক নবভাবের স্ফোট উঠিল। দেবীর মন্দির বিধর্মীর হস্তে বিধ্বস্ত ও কলুষিত দেখিয়া বিবেকানন্দের মনে যেমনি অতীতের নির্বীর্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রতি ধিক্কার-ধ্বনি উত্থিত হইল, অমনি মা-ভবানীর ভর্ৎসনা বাণী শুনিতে পাইলেন, "আমি মনে করিলে কি অসংখ্য মঠ ও মন্দির স্থাপন করিতে পারি না?—এই মুহূর্তেই কি এখানে সপ্ততল মন্দির উঠিতে পারে না?" এই দৈববাণীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া অদম্য কর্মী বিবেকানন্দ মায়ের ইচ্ছাসাগরেই আপন ইচ্ছা বিসর্জন দিলেন—তদবধি যাহা ঘটিবে, সবই মায়ের অঙ্গুলি হেলনে। এখন হইতে তিনি কর্তৃত্বাভিমানবিমুক্ত ও অধ্যাত্মভাবে বিভোর হইলেন—বাহিরের সহিত সম্পর্ক রহিল অতি অল্প। অবশেষে কাশ্মীরভ্রমণ সমাপনান্তে তিনি ১৮ অক্টোবর বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন—মঠ তখন ঐ বাড়িতে।

ইত্যবসরে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্তা ওলি বুলের সৌজন্যে বেলুড়ে স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্য ভূমি-ক্রয়ের বায়না হইয়া যথাসময় উহাতে নূতন গৃহাদি-নির্মাণ ও পুরাতন গৃহের সংস্কারাদি পূর্ণবেগে চলিতেছিল। নভেম্বর মাসের

প্রারম্ভে উহার কার্য শেষ হইলে ৯ ডিসেম্বর সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি হইল এবং অবশিষ্ট সমস্ত আয়োজন-সমাপনান্তে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি সাধুবৃন্দ নবীন মঠবাটিতে উঠিয়া আসিলেন। বিবেকানন্দের আর একটি কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। ১৮৯৮-এর ১৩ নভেম্বর ৺কালীপূজার দিনে নিবেদিতার পরিকল্পিত বালিকাবিদ্যালয়েরও সূত্রপাত হইয়াছিল। আবার ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদকতা ও পরিচালনায় বঙ্গভাষায় 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশিত হইলে স্বামীজীর সাফল্য আর একটি স্তর ঊর্ধ্বে উঠিল। সুতরাং দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-যাত্রার পূর্বে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের আপ্রাণ পরিশ্রম দ্রুত সার্থকতার পথে চলিয়াছে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা বিবিধরূপে শরীর পরিগ্রহ করিতেছে, আর সমস্ত দেশ তাঁহার আহ্বানে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে দুর্বল শরীরে বক্তৃতাদি করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। অতএব চিকিৎসকদের পরামর্শে ২০ জুন (১৮৯৯) তিনি পশ্চিমগমন-মানসে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কলকাতায় জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ৩১ জুলাই লণ্ডনে পৌঁছিল এবং তাঁহারা ১৬ আগস্ট আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জনসাধারণকে কি বার্তা শুনাইয়া গেলেন? প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্নতাবশত তাঁহার বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দুইটি বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও মূলত উহা ছিল এক। স্বামীজীর ভারতীয় প্রচেষ্টা যেমন ধর্মবিহীন সমাজসেবামাত্র নহে, পাশ্চাত্য প্রচারও তেমনি শুধু কর্মশূন্য মোক্ষসাধন নহে। স্থান-কাল-পাত্রানুসারে তিনি উভয় সভ্যতাকেই তাহার স্বকীয় আদর্শানুসারে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আর চাহিয়াছিলেন উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক আদান-প্রদান। তাঁহার মতে "অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে কার্যে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে।" কিন্তু প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশেষ আদর্শ আছে—"আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।" এই ভিত্তিকে অবিচল রাখিতে হইবে; অতএব "অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা হারাইও না।" ফলত জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজেরও দীর্ঘজীবী হইবার ইচ্ছা থাকিলে এই অধ্যাত্মভিত্তি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—"যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

ধর্ম বলিতে আচারমাত্র গ্রহণীয় নহে; কারণ ধর্মের অন্তরের সত্তা অপরিবর্তনীয় হইলেও বাহিরের রূপ পরিবর্তনশীল—আচারগুলি ভিতরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ভাবহীন আচার উন্নতির সহায়ক না হইয়া জাতির অধঃপতনের কারণ হয়—"আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী ধর্মের সহিত আপাতত সংশ্লিষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতে উঠিয়া যাইবে।" সংস্কার সাধারণত এইরূপ ক্রমাভিব্যক্তিমূলক প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে এবং সংস্কারককে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় অথবা পরানুকরণে কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়—"সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।" বিবেকানন্দ তাই আপনাকে 'আমূল সংস্কারক' বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার মতে সংস্কারের সর্বোত্তম মাধ্যম হইতেছে শিক্ষা—এমন কোন সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষাপ্রভাবে বিদূরিত না হয়। তবে আধুনিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষা মানবের অন্তঃশক্তির সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, উহাই প্রকৃত শিক্ষা।

অকস্মাৎ সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের বিরোধী হইলেও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে যুগপ্রয়োজনানুরূপ নিত্য নূতন বিধানরচনার সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে এবং সমাজজীবনে বহু আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। অতএব উহার দূরীকরণার্থ কতকগুলি বিষয়ে আমাদের আশু প্রচেষ্টা আবশ্যক। বর্তমানে নারীজাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, নারী জাতির অভ্যুদয় না হইলে "ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" আবার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী।" সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া নারী জাতিকে জাগিতে হইবে। এই জাগরণের ক্ষেত্রে আবার নরনারীর মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য ব্যবধান স্বীকৃত হয় নাই—"এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে তা বুঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন।" পরন্তু বিবেকানন্দ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, নারীদের যথার্থ কল্যাণসম্পাদনে নারীরাই সমর্থ—পুরুষ এই বিষয়ে দূর হইতে যথাসম্ভব সাহায্য করিলেও কখনও তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে।

জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব; অতএব তথাকথিত

নিম্নশ্রেণীর সর্বপ্রকার অভ্যুত্থানের আয়োজন অত্যাবশ্যক। কারণ "এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আর আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কর্মকালে সিংহবিক্রম! ...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" "এই নূতন ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে; বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চনদের অভ্যুত্থানের আলোড়নে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি যেন কেন্দ্রভ্রষ্ট না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে প্রাচীন ব্রাহ্মণসংস্কৃতিকে শূদ্রের স্তরে না নামাইয়া প্রত্যেক শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা। "সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে পুনঃ সেই সত্যযুগের সূত্রপাত হইয়াছে—"তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষের ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান, হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল।"

জাতিভেদ বর্তমানে যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, উহা একসময়ে অপরিবর্জনীয় হইলেও এবং উহার মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত থাকিলেও আধুনিক জগতে মূল ভিত্তি অটুট রাখিয়া উহার অভিব্যক্তির পরিবর্তন আবশ্যক। ধর্মের নামে সমাজে যে নিষ্ঠুর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্বামীজী আক্ষেপসহকারে বলিলেন, "ধর্ম কি আর ভারতে আছে, দাদা! জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, সব পলায়ন; এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র—সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে।" এইসব অযৌক্তিক ও পাশবিক ব্যবস্থা দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে অন্যসমাজসুলভ সাম্য ও সৌভ্রাত্র অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন—"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মস্বরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—এক মাত্র আশা।...আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

ভারতের জনসাধারণ ধার্মিক হইলেও দারিদ্র্যের নিপীড়নে কর্মশক্তিহীন।

বিশেষত দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে তাহাদের জীবনে প্রায়শ সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে ঘোর তামসিকতা বিরাজমান। অতএব এদেশে প্রকৃত ধর্মপ্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও প্রথমে রজোগুণের উদ্বোধন আবশ্যক। "যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আর ধর্ম?" "খালিপেটে ধর্ম হয় না—প্রথমে কূর্মদেবতার পূজা" অত্যাবশ্যক। অতএব "ঐ অন্নসংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই।" "আগে অন্নসংস্থান করার উপদেশ দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস্।"

যুগপ্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমাদিগকে নরনারায়ণের পূজায় আহ্বান করিয়াছেন—"প্রথমে পূজা—বিরাটের পূজা। তোমার সম্মুখে তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা। ইহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পূজা শব্দেই ঐ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।" এই নরনারায়ণের পূজা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই মাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশে ধর্ম ও সাংসারিক অভ্যুদয়ের মধ্যে যে এক দুরপসরণীয় কৃত্রিম প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, বিবেকানন্দের মতে উহাই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। বস্তুত উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; বরং ধর্মবৃদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ ফলরূপে জাগতিক উন্নতি আপনিই আসিতে বাধ্য। না আসার কারণ এই যে, শাস্ত্রে যে সকল প্রাণপ্রদ ও প্রগতিমূলক উপদেশ রহিয়াছে, আমরা সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না—"আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন—নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারি না।" ধর্মানুভূতির যথার্থ তাৎপর্য জানিলে আমরাও বিবেকানন্দের সহিত সমস্বরে বলিব, "যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।" সমাজজীবনের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মানুষ্ঠান ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে বর্তমানে কোনও যোগসূত্র নাই। সেই সূত্র পুনঃস্থাপনের জন্য চাই 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'—"তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসার দ্বারা প্রীত করিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।" সংসারে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্তকেই এই ভাগবতদৃষ্টি-সহায়ে ঈশ্বরলাভের সহায়ক করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, জীবনের প্রতিটি কর্ম

ঈশ্বরাদেশে সাধিত হওয়া আবশ্যক, কারণ বস্তুত কর্ম, করণ, কর্তা, কর্মফল ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে।

ভারতবর্ষের অধোগতির আর এক কারণ হইল তাহার কূপমণ্ডূকসদৃশ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ভারত যেদিন 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কারপূর্বক আপনার জাতীয় জীবনের চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিল, সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার অবনতি—"কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।" বিবেকানন্দ তাই আহ্বান জানাইলেন, "নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বাহিরে এসে দেখ, সব জাতি কেমন চলছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তা হলে এস, ভাল হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর।" অপরের সহিত মিশিতে হইলে চাই অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—"আমরা শুধু 'পরধর্মে বিদ্বেষ করিও না', এই কথা প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্যেও পরিণত করিয়া থাকি।" এই আদান-প্রদানের মধ্যে আবার ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি সর্বথা পরিত্যাজ্য—"সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না। যদি তোমাদের ইংরেজ বা মার্কিনগণের সহিত সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে।"

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ যদিও ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতের অভ্যুত্থানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতিতে বিজড়িত হন নাই; অধ্যাত্মানুভূতিই ছিল তাঁহার সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও প্রচারের একমাত্র উৎস। সেই বিবাদ-বিচ্ছেদহীন প্রেমরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং প্রতিমুহূর্তে নিখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অদ্বিতীয় সত্তার সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, "একথা ভুলে যেয়ো না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে—শুধু ভারতের প্রতি নহে।"

ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আমেরিকায় দ্বিতীয়বার পদার্পণানন্তর স্বামীজী পূর্বের ন্যায় পূর্ণোদ্যমে কার্য আরম্ভ করিতে না পারিলেও নীরব রহিলেন না। তিনি কিয়দ্দিবস 'রিজলি ম্যানরে' লেগেট-দম্পতির সহিত অতিবাহনান্তে ৮ নভেম্বর নিউইয়র্কে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং নগরের ও পার্শ্ববর্তী স্থানসকলে পক্ষকাল যাবৎ এইরূপ প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া আমেরিকার পশ্চিমকূলাভিমুখে চলিলেন। তথায় লস এঞ্জেলেস, ওকল্যাণ্ড, স্যান ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন এবং ইহার ফলে ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বেদান্তের বীজ সুপ্রোথিত হইয়া কালক্রমে বহু মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় অবস্থানকালে লেগেট-দম্পতির নিকট হইতে সংবাদ ও আমন্ত্রণ আসিল যে, প্যারিসে একটি ধর্মেতিহাস-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে—লেগেট-দম্পতি ঐ সময়ে তথায় থাকিবেন এবং স্বাস্থ্যোন্নতি ও ঐ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামীজীরও তথায় গমন আবশ্যক। সে আহ্বানে অবহেলা প্রদর্শন না করিয়া তিনি ফরাসী দেশে যাইবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং তদনুসারে ক্যালিফোর্ণিয়ার কার্যসমাপনান্তে ডেট্রয়েট ও চিকাগোতে কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করিয়া নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। এখানেও কিয়দ্দিবস বক্তৃতাদি করিয়া ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই ইউরোপগামী জাহাজে উঠিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামীজীর দেহ তখন ভগ্নপ্রায়, তথাপি তাঁহার কার্যক্ষমতা ছিল তখনও বিপুল—বিশেষত তাঁহার অমিত মনোবলের সম্মুখে সমস্ত বিঘ্ন পরাজিত হইত। ইতঃপূর্বে ফরাসী ভাষার সহিত তাঁহার স্বল্প পরিচয় ঘটিয়া থাকিলেও উহা উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সভার আলোচনায় যোগদানের সঙ্কল্প উদিত হইবামাত্র দুই মাস যাবৎ গভীর মনোনিবেশ-সহকারে উহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন এবং প্যারিসে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিতসমাজের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে উহা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিয়া লইলেন। অনন্তর যথাসময়ে বক্তৃতাসহায়ে স্বীয় মতবাদের অবতারণাব্যপদেশে ঐ ভাষার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সকলকে চমৎকৃত করিলেন। সভায় খাঁটি ভারতীয় ভাব উপস্থাপনের প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল; কিন্তু এতদাপেক্ষাও অধিক লাভ হইল এই যে, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস ফরাসী দেশে ভাবের আদান-প্রদানে কাটাইয়া স্বামীজী পূর্ব ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন—সঙ্গী হইলেন লয়জন-দম্পতি, শ্রীযুক্ত জুল বোওয়া, শ্রীমতী কালভে ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড। ইঁহারা ভিয়েনা, হাঙ্গেরি, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া কন্‌স্টান্টিনোপলে পৌঁছিলেন; তথা হইতে এথেন্সে গমন করিলেন এবং পরে মিশরে উপনীত হইলেন। মিশরে আসিয়া স্বামীজীর মন ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইল। বিশেষত তাঁহার অন্তর যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আর ইহধামে নাই। এই চিন্তা তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিল। অতএব প্রথম যে জাহাজ পাইলেন তাহাতে আরোহণ করিয়া বোম্বাই উপস্থিত হইলেন এবং ৯ ডিসেম্বর (১৯০০) রাত্রে বিনা সংবাদে অকস্মাৎ বেলুড় মঠে আবির্ভূত হইলেন।

ভারতে পুনরাগমনের পর তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সেভিয়ার সাহেব সত্য সত্যই ইহলোকে নাই; অতএব সেভিয়ার-গৃহিণীকে সান্ত্বনাদানের জন্য হিমালয়-ক্রোড়ে আলমোড়া জেলার অন্তঃপাতী মায়াবতীতে যাওয়া তাঁহার প্রথম কর্তব্য

বলিয়া বোধ হইল। তখন প্রচণ্ড শীত—চারিদিক তুষারাবৃত। তথাপি সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি তথায় গমনপূর্বক সেভিয়ার-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ৩ জানুয়ারি হইতে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর ২৪ জানুয়ারি মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মঠে দুই মাস ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাদান, মঠপরিচালনা, অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত সদালাপ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইলে স্বামীজী ১৮ মার্চ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন। ঢাকায় তাঁহার দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল। ঢাকা হইতে তিনি ৺চন্দ্রনাথ ও ৺কামাখ্যাদর্শনে যান এবং তথা হইতে শিলং-এ উপস্থিত হন। স্বামীজীর শরীর তখন বহুমূত্রাদি রোগে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ঐ শৈলনিবাসে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। দৈহিক অসুস্থতাসত্ত্বেও জনসাধারণের আগ্রহে তাঁহাকে এখানেও একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। শরীরের কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সেখানে দীর্ঘকাল না থাকিয়া তিনি মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামীজীর আগ্রহে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হইল। ইহাতে একদিকে যেমন স্বামীজীর মাতৃপূজার আগ্রহ চরিতার্থ হইল, অপর দিকে তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ জানিল যে, বিদেশ-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ স্বধর্মচ্যুত হন নাই, কিংবা তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠে প্রাচীন পন্থার সহিত সম্বন্ধহীন কোন অভিনব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ঐ বৎসরেরই শেষভাগে জাপান হইতে শ্রীযুক্ত ওডা এবং ওকাকুরা নামক দুইজন কৃতবিদ্য ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ভারতে আসিয়া স্বামীজীকে জাপানে একটি ধর্মসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। পরন্তু মানসিক উৎসাহ থাকিলেও শারীরিক অক্ষমতানিবন্ধন স্বামীজী সঠিক কিছু না বলিয়া আগ্রহমাত্র প্রকাশ করিলেন। ওকাকুরা তাঁহার সাহচর্যলাভের জন্য কিয়দ্দিবস মঠে বাস করিলেন এবং অতঃপর বুদ্ধগয়া-দর্শনে উৎসুক হইয়া স্বামীজীকেও সঙ্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইহার পূর্বেই স্বামীজীর কাশীধামে যাওয়া স্থির হইয়াছিল বলিয়া তিনি জাপানীদের সহিত প্রথমে গয়াধামে গেলেন এবং তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এখানে ওকাকুরা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারই ব্যবস্থানুসারে ও তন্নির্দিষ্ট সঙ্গীর সহায়তায় ভারতভ্রমণে নির্গত হইলেন।

কাশীধামে স্বামীজীর অবস্থানের সুযোগে ভাবী দুইটি আশ্রমের সূত্রপাত হয়। জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বেদান্ত প্রচারের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন—ইহাতেই পরে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের আরম্ভ হয়। এতদ্ভিন্ন স্বামীজীর প্রেরণায় কতিপয় যুবক

সামান্য অর্থাদি-সংগ্রহান্তে একটি সমিতি গঠনপূর্বক আর্তসেবায় ব্রতী হন—উহাই বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিপত্তন।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের পূর্বেই স্বামীজী মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শরীরের অবস্থা তখন ভয়াবহ; তথাপি তখনও উৎসাহ-উদ্যমের বিন্দুমাত্র হ্রাস নাই। তিনি আর চারিমাস মাত্র ইহধামে ছিলেন। কিন্তু ইহার প্রতিটি দিন স্মরণীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ, প্রতিমুহূর্ত শিক্ষাপ্রদ, প্রতিক্ষণ এই জগদ্বরেণ্য মহামানবের সোনার কাঠি-স্পর্শে সঞ্জীবিত। দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে ইচ্ছামৃত্যু নর-ঋষি স্বশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং আলোচ্য দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জিকাখানির কয়েকটি পাতা উলটাইয়া উহা স্বকক্ষেই রাখিয়া দিলেন। ইহার তাৎপর্য প্রথমে ভক্তদের বুদ্ধির অগোচর থাকিলেও দেহত্যাগান্তে স্মরণ হইল যে, শ্রীরামকৃষ্ণও একদা এইরূপই করিয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে ফিরিয়া স্বামীজী সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "বাবা ৺অমরনাথ আমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।" এইরূপে আরও বহুবার তিনি স্বীয় আশু দেহত্যাগের ইঙ্গিত দিলেও প্রিয়জনের বিরহচিন্তায় অপারগ ভক্তবৃন্দের মন তাহা অন্য অর্থেই গ্রহণপূর্বক বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না যে, সিদ্ধসঙ্কল্প দেবমানব আপন কার্যসমাপনান্তে সত্যই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

৪ জুলাই, শুক্রবার, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ—উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার পুণ্যতিথি। প্রাতে চা-পানের আসরে কতই আমোদ-আহ্লাদ চলিল। তাহার পরদিবস শনিবার ও অমাবস্যা; সুতরাং স্বামীজীর মনে সেদিন ৺শ্যামাপূজার সঙ্কল্প উদিত হইল এবং তখনই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব তথায় আগমন করায় স্বামীজী সানন্দে তাঁহাকে ঐ অভিলাষ জ্ঞাপনপূর্বক মঠবাসীদের পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। তদনন্তর ঠাকুরঘরে যাইয়া ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত গভীর ধ্যানে কাটাইলেন। তথা হইতে স্বামীজীর অবতরণকালে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার অস্ফুট বাণী শুনিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" অতঃপর তিনি শুক্লযজুর্বেদের অংশবিশেষ ভাষ্যসহকারে স্বামী শুদ্ধানন্দকে পড়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রামের পর পুনর্বার ব্রহ্মচারীদের গৃহে যাইয়া সংস্কৃতপাঠে যোগ দিলেন। বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা উত্তম। ঐ ভ্রমণকালে একটি বেদবিদ্যালয়স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ঐ বিষয়ে প্রেমানন্দের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। পরে সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাগমনপূর্বক সকলের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসান্তে নিজ কক্ষে

প্রবেশ করিলেন এবং সেবকের নিকট হইতে মালা চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। পরে ভাগীরথীমাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একঘণ্টা অতীত হইলে তিনি সেবককে ডাকিয়া বাতায়নগুলি খুলিয়া পা টিপিতে ও হাওয়া করিতে বলিলেন। এইভাবে আধ ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; এক মিনিট পরে আবার ঐরূপ নিঃশ্বাস পড়িল। তারপর তিনি ক্লান্ত শিশুর ন্যায় জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় তেজঃপূর্ণ।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুদীর্ঘ সাধনা-সমাপনান্তে ত্যাগী ভক্তদের সঙ্গলাভের বাসনায় একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ জ্বলে গেল।" জগন্মাতা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা আসছে।" ফলেও দেখা গেল যে, যথাকালে ত্যাগী যুবকগণ আসিতে লাগিলেন। এই অন্তরঙ্গদের মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রাখালের স্থান অতি উচ্চ। তিনি স্বল্পসংখ্যক ঈশ্বরকোটিদের অন্যতম এবং ঠাকুরের মানসপুত্র। জগন্মাতা তাঁহার আগমনের কথা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র।' শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি?—আমার আবার ছেলে?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম—এই সেই বালক।"

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ মাঘ, চান্দ্রমাঘ শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে, রাত্রি প্রায় একটায়) বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীনগ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ সঙ্গতিপন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়। অতঃপর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং বিমাতা হেমাঙ্গিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে রাখালচন্দ্র মানুষ হইতে থাকেন।

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাটির নিকটে একটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাখালকে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেখানে বালকের সৌম্য সুন্দর আকৃতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতিতে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। অধিকন্তু তিনি অল্পদিনেই সহপাঠীদের নেতৃত্বলাভ করিলেন। অধ্যয়নাদিতেও তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। রাখাল স্বভাবতই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শিক্ষকগণ প্রহার করিলে তিনি সমবেদনায় অভিভূত হইতেন। ইহার ফলে শিক্ষকদের অন্তরেও ক্রমে কোমলতার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা ঐ গর্হিত অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বেশ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়াদিতে যেমন কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত না। গ্রামের বিবিধ

ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। পিতার দৃষ্টান্তে বাল্যকাল হইতেই ফলফুলের বাগানের প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ লক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া ছিপে মাছ ধরাও তাঁহার একটি বড় আমোদের বিষয় ছিল।

কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সাধারণ বালকদের ন্যায় তিনি কেবল এই সকল খেলাধুলায়ই মত্ত থাকিতেন। গ্রামের উপকণ্ঠে ৺কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় তিনি কখনও কখনও সঙ্গীদের লইয়া স্বরচিত শ্যামামূর্তির পূজাদিতে মগ্ন হইতেন। আবার তাঁহাদের বাটিতে প্রতি বৎসর যখন ধুমধামের সহিত শারদীয়া পূজা হইত, তখন পূজামণ্ডপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে আপনাকে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল—সময় সময় সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। কাহারও মুখে নূতন শ্যামাসঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিখিয়া লইতেন এবং বৈষ্ণব ভিখারির মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখাল-রাজের গান শুনিয়া আত্মহারা হইতেন।

পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দ্বাদশবর্ষ বয়সে কলকাতায় আনিলেন এবং বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরগৃহে বাসস্থান নির্দেশপূর্বক নিকটবর্তী 'ট্রেনিং একাডেমি'তে ভর্তি করিয়া দিলেন (১৮৭৫ খ্রিঃ)। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ভাবী বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন পল্লির বালকবৃন্দের নেতা। বিদ্যালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন-চারি শ্রেণী নিচে পড়িলেও বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। রাখাল তাঁহাকে দেখিয়াই আকৃষ্ট হইলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হইল। দুইজনে একই সঙ্গে একই আখড়ায় কুস্তি লড়িতেন। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের আকর্ষণে একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত আরম্ভ হইল। এইভাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকায় রাখালের অধ্যয়নে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া চিন্তান্বিত পিতা প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ এবং অবশেষে কঠোর শাসন-অবলম্বনে পাঠাদিতে পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে স্থির করিলেন যে, বিবাহ দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার। ঘটনাক্রমে শীঘ্রই মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। কোন্নগরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র তখন কলকাতায় কাঁসারীপাড়ার নিকটেই সিমুলিয়া পল্লিতে বাস করিতেন। বিশ্বেশ্বরী নাম্নী সর্বসুলক্ষণা বিবাহযোগ্যা তাঁহার

একটি ভগ্নী ছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভূতা এই কন্যাটির সহিত রাখালের পরিণয় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তখনও বালিকা—বয়স প্রায় একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মানুষ স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য জগতে কত কিছুই না করিয়া থাকে—অথচ বিধির বিধানে ফল অন্যরূপ হইয়া যায়। রাখালের পিতা বিবাহ দিয়া পুত্রকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন; কিন্তু এই বিবাহই অচিরে রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিল। রাখালের জ্যেষ্ঠ শ্যালক মনোমোহন পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধর্মশীলা শ্বশ্রূমাতাও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্তা ছিলেন। বিবাহের পর কোন্নগরের বাড়ি হইতে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে মনোমোহন একদিন শ্বশুরগৃহে আগত রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিলেন।

এই শুভ লগ্নের জন্য জগদম্বা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের মন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন, বটতলায় একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগিল—এইরূপ দর্শন কেন হইল? ভাগিনেয় হৃদয়কে এই সন্দেহের কথা জানাইলে হৃদয় সোল্লাসে বলিলেন, "মামা, তোমার ছেলে হবে—তাই দেখেছ!" শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কিরে? আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কি করে?" এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয় দিতে পারেন নাই—দিয়াছিলেন জগদম্বা। সে কথা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। আলোচ্যদিনে প্রতীক্ষমাণ শুদ্ধসত্ত্ব মানসপুত্র রাখালের আগমনের প্রাক্কালে ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন—গঙ্গাবক্ষে সহসা শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়াছে; তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা; চিরকিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া অপর একটি অনুরূপ বালক নূপুরপায়ে শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে; নৃত্যের অপূর্ব ছন্দে মাধুর্যসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন রাখালচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বটতলায় দণ্ডায়মান বালক, জগদম্বার প্রদর্শিত মানসপুত্র, কমলদলে নৃত্যপরায়ণ ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণসখা! তিনি সব দেখিলেন, সব বুঝিলেন; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ মহামানব বাহিরে কোনও আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না; গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে রাখালকে নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্গী মনোমোহনকে বলিলেন, "সুন্দর আধার!" অতঃপর অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত স্নেহ-সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নামটি কি?" "শ্রীরাখাল চন্দ্র ঘোষ।" 'রাখাল' শব্দ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের গদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!" পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সাদরে বলিলেন, "আবার এসো।"

এদিকে প্রথম দর্শনেই রাখালের অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মতো কি এক উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল—তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে এই পরমপুরুষের প্রতি নিবিড় আবেশে আকৃষ্ট হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইঁহার অনিমেষ দৃষ্টিতে যে দিব্য মাধুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা তো ইহলোকের নহে—ইঁহার নয়নসমক্ষে নিশ্চয়ই সেই নিত্যসত্য বস্তু সদা বিদ্যমান।" পথে যাইতে যাইতে রাখালের কর্ণে সেই কোমল বাণী কুহরিত হইতে থাকিল, "আবার এসো।"

প্রেমঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব আকর্ষণে রাখাল পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে গমনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পর একদিন একাকী তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন—রাখালের আগমনমাত্র অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "তোর এখানে আসতে এত দেরি হলো কেন?" রাখাল কি আর বলিবেন? উভয়ে তখন উভয়ের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে এক অলৌকিক ভাবভূমিতে উপস্থিত হইয়া লীলাবিলাসে মগ্ন—ভাষায় তখন উত্তর দিবে কে? মাতৃহীন রাখাল ভাবঘনতনু শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন জননীরূপে পাইলেন এবং রাখালের আকৃতি তখন যুবার ন্যায় হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তদবধি রাখাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। এইকালের অপূর্ব লীলা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন-চারি বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা—এখান হইতে কোথাও এক পাও নড়িতে চাহিত না। আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না।"

রাখাল সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "রাখালের সাকারের ঘর, নরেনের নিরাকারের।" রাখাল প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তদনুসারে মূর্তিপূজা বা দেবদেবী প্রভৃতিকে প্রণাম করা তাঁহার পক্ষে গর্হিত ছিল। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ঐসব করিতে শিখিলেন

এবং উহাই তাঁহার স্বভাবানুরূপ হওয়ায় উহাতে আনন্দই পাইতেন। রাখালের আগমনের কয়েক মাস পরেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাখালের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের অসাক্ষাতে তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া রূঢ়ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। কোমলপ্রকৃতি রাখাল নরেন্দ্রনাথকে সমীহ করিতেন এবং তাঁহার তর্কের সম্মুখীন হইতেন না। সুতরাং এই ঘটনার পরে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অনুসন্ধানে কারণও জানিতে পারিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দ্যাখ্, রাখালকে আর কিছু বলিস নি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—তা কি করবে বল? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?" এই সময়ে একদিন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলী কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর গাত্রস্থ আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে অশ্রু-পুলক-কম্পাদি প্রকটিত হইল। মহাভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে! হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।" রাখাল অপলকদৃষ্টিতে সে ভাব দেখিলেন, সাগ্রহমনে সে আর্তির অনুধাবন করিলেন—আর জানিলেন যে, সাকারোপাসনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, সাকার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্ভূত এই সাত্ত্বিক বিকারের পশ্চাতে এমন একটা সত্য আছে, যাহা যুক্তিতর্কের অতীত।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এইরূপ অলৌকিক লীলায় ও লীলাসন্দর্শনে মগ্ন রাখাল ক্রমেই শুধু যে অধ্যয়নে অমনোযোগী হইলেন তাহাই নহে, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য স্ফুটতর হইতে থাকিল। পিতা আনন্দমোহন ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি বিষয়ী লোক—পুত্রকেও সম্পত্তিপরিচালনে সক্ষম দেখিতে চাহেন। বালক কি অবশেষে সাধুর সঙ্গে মিশিয়া সাধু হইয়া যাইবে? প্রতিকারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহে অবরুদ্ধ করিলেন। বাধা পাইয়া রাখালের মন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইল মাত্র এবং তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগের অন্বেষণে রহিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্নেহের দুলালকে না দেখিয়া সাশ্রুনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।" জগন্মাতা সে আর্তিতে বিচলিত হইলেন। একদিন পুত্রকে পার্শ্বে বন্দির মতো বসাইয়া আনন্দমোহন মকদ্দমার কাগজপত্র নিবিষ্টমনে দেখিতেছেন, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই, এমন সময়ে রাখাল পলায়নের উত্তম সুযোগ বুঝিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন—কিছুদিন আর ফিরিলেন না। এদিকে পিতাও তখন বৈষয়িক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে

দক্ষিণেশ্বরে যাইবার অবকাশ ঘটিল না। মকদ্দমাটি বড়ই জটিল ও উহাতে জয়লাভের আশা ছিল না; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমোহনেরই জয় হইল। অতএব তদনন্তর অবসর পাইয়া যেদিন তিনি পুত্রের অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন সেদিন মন আর পূর্বের ন্যায় গুরুভারে পীড়িত নহে; উহা অনেকটা উদ্বেগশূন্য ও প্রশান্ত। হয়তো তাঁহার মনে ইহাও উদিত হইয়াছিল যে এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভ পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই হইয়া থাকিবে। বিশেষত মাতৃহীন বালকের শৈশবের অসহায় স্মৃতি জাগরিত হইয়া আনন্দমোহনের মনকে সবিশেষ কোমল করিয়া তুলিল।

আনন্দমোহনকে দূর হইতে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমানে বুঝিলেন, ইনিই রাখালের পিতা হইবেন; কাজেই রাখালকে বলিলেন, "ওরে রাখাল , ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ্ দেখি।" দেখিয়াই ভীতচকিত রাখাল আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "ভয় কি? বাপ-মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কী না হতে পারে?" রাখাল বিনয়নম্রচিত্তে পিতাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পিতার নিকট পুত্রের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আদর আপ্যায়নে পিতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। পুত্রের প্রতি ঠাকুরের যত্নের পরিচয় পাইয়া এবং পুত্রের উৎফুল্ল বদন ও সোল্লাস গতি দেখিয়া এই স্নেহের নীড় হইতে তাহাকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিতে আনন্দমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াই তিনি বিদায় লইলেন—শুধু প্রার্থনা করিয়া গেলেন, ঠাকুর যেন ইচ্ছামত রাখালকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর তদনুসারে রাখালকে গৃহে পাঠাইলেও রাখাল পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাই আনন্দমোহনও পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ এক সুযোগে রাখালের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আহা আহা! দেখ দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে—অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভগবানের নামজপ করে কি না! যদি বল বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয়? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা-গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। তা রাখাল যে এখানে আসে তাতে কি আপনার অমত আছে?" প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দমোহন ফাঁপরে পড়িলেন। সাধুর বিরাগভাজন হইবেন কিরূপে? বিশেষত তিনি দেখিলেন যে, ঠাকুরের নিকট অনেক গণ্যমান্য লোকের যাতায়াত আছে। পুত্র এখানে থাকিলে ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কি মশায়, রাখাল তো

আপনারই ছেলে। আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" এইরূপে মধ্যে মধ্যে স্বগৃহের সংস্পর্শ ঘটিতে থাকিলেও রাখালের মনে ধর্মানুষ্ঠানস্পৃহা ক্রমেই প্রবলতর হইতে থাকিল। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পিতার উচ্ছিষ্ট কিংবা ভুক্তাবশেষ-পাত্রে খাইতে পারেন কিনা। অমনি ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে খাবি না? মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত—তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দেব।"

এইভাবে প্রায় দুইবৎসর অতীত হইল। এদিকে জামাতার বৈরাগ্যদর্শনে প্রতিবেশীরা রাখালের শ্বশ্রূমাতা শ্যামাসুন্দরীকে সততই সাবধান করিয়া দিতে থাকিলেন। ঐ কারণেই হউক কিংবা কন্যাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উপস্থিত করিবার জন্যই হউক, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্যামাসুন্দরী একদিন বিশ্বেশ্বরীর সহিত তথায় আসিলেন। কিন্তু বারংবার পীড়াপীড়ি করিলেও রাখাল দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল তখন ঘরের ছেলের মতো আছে। জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, 'সব আলুনী লাগে।' ওর পরিবার এখানে এসেছিল—বয়স চৌদ্দ বৎসর।...ও গেল না। বিবাহ করিলেও রাখাল যে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা ঠাকুর ইতঃপূর্বেই বধূকে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প পরে সেদিনও ঠিক এইভাবেই শ্যামাসুন্দরী বালিকাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বধূকে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহসা মনে প্রশ্ন জাগিল, "বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?" তাই সংশয়ের নিরসনকল্পে বালিকাকে নিকটে আনাইয়া তিনি তাহার কেশরাশি ও গঠনভঙ্গি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, "ভয়ের কারণ নেই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হবে না।" তখন হৃষ্টচিত্তে নহবতে মাতাঠাকুরানীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

ঠাকুর জানিতেন, তাঁহার মানসপুত্র সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তিনি 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইতেন, আর কত ভাবেই না আদর করিতেন। অপরের অন্যায় দেখিলে ঠাকুর শাসন করিতেন। কিন্তু রাখালের অবাধ্যতায় বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ করিতেন। একদিন আহারের পর ঠাকুর বলিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে!" মানসপুত্র উত্তর দিলেন, "পান সাজতে জানি নে।" "সে কিরে? পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি,

যা, পান সেজে আন।" "পারব না, মশায়"—জবাব শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া আকুল। এরূপ সপ্রতিভ ব্যবহারে ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন রাখাল সত্যসত্যই তাঁহাকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—তাঁহার আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নাই, আছে শুধু স্নেহসম্ভূত আবদার। কিন্তু এইরূপে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক উদ্দীপিত করিলেও রাখাল যে সততই শাসনের অতীত ছিলেন তাহা নহে। একদিন ৺কালীমন্দির হইতে প্রসাদী মাখন আসিয়াছে; রাখাল ক্ষুধিত ছিলেন, তাই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মাখনের ডেলাটি তুলিয়া মুখে দিলেন। ঠাকুর অমনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি নিয়ে খেলি?" লজ্জায় রাখালের মুখ আরক্তিম হইল। অপর একদিন একটি পয়সা দেখিয়া রাখাল কুড়াইয়া লইলেন—ইচ্ছা, কোন ভিক্ষুক বা অন্ধ-খঞ্জকে দিবেন। তিনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব কথাই জানাইতেন; সুতরাং ইহাও নিবেদন করিলেন। ঠাকুর কিন্তু শুনিয়াই ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "যে মাছ খায় না, সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই, তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"

ঠাকুর নিজে বিশেষ স্থলে শাসন বা সাবধান করিয়া দিলেও, অপরে রাখালকে কোন রূঢ় কথা বলিবে ইহা একান্ত অসহনীয় ছিল। মানসপুত্রকে অন্য কেহ শাসন করিলে স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিতেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়।" আবার কেহ কোন কাজের আদেশ দিলে বলিতেন, "আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব!"

ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাখাল সাধূচিত সদাচারও শিখিয়াছিলেন। একবার জনৈক অনুরাগীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর প্রিয় পুত্রের সঙ্গে সেখানে যান। তথায় ভজনাদি শেষ হইবার পর আহারের বন্দোবস্ত হইল। গৃহকর্তা আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুরের কোন খোঁজ লইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সহাস্যে রাখালকে বলিলেন, "কই রে, কেউ ডাকে না যে রে!" এরূপ ব্যবহারে সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত রাখাল অপমান বোধ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "মশায়, চলে আসুন।" ঠাকুরের নিকট কিন্তু মানাপমান সমান; তিনি সহাস্যে বলিলেন, "আরে রোস, গাড়ি-ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে খাই কোথা!" অগত্যা রাখাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আহারের আহ্বান আসিলে দেখা গেল যে, বসিবার স্থান পূর্ব হইতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অতিকষ্টে একটা অপরিষ্কার স্থানে ঠাকুরকে বসানো হইল। আহারশেষে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে তিনি

রাখালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশত অনেক সময় সাধুর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না; তবু সাধু তাহাদের দোষ না দেখিয়া কেবল কল্যাণচিন্তাই করিবে। কিছু না খাইয়া আসিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়—সাধুর ঐরূপ করিতে নাই, অন্তত এক গ্লাস জল চাহিয়াও খাওয়া উচিত।

ঐ সময়ে তথায় আগত ভক্তগণ ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন এবং আপন অনুভূতির কথা ঠাকুরের শ্রুতিগোচর করাইতেন। শুনিতে শুনিতে রাখালের আগ্রহ হইল, তাঁহারও ঐরূপ অনুভূতি হউক। একদিন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে করিতে ঐ বিষয়ে ধরিয়া বসিলেন এবং ঠাকুর সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন সেই অবাঞ্ছিত আগ্রহের নিবৃত্তির জন্য এমন এক মর্মান্তিক কথা বলিলেন যে, রাখাল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু উদ্যান-দ্বার অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার চরণদ্বয় অবশ হইল—তিনি মৌনবিস্ময়ে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে রামলাল-দাদা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ঠাকুর তখন সকৌতুকে বলিলেন, "কি, গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারলি?" সেই দিন বিকালে আবার সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়!" আর একবার রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অধর সেনের গৃহে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড় হুড় করে আসে, আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—মা এর অপরাধ নিসনি।"

কিছুদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাখাল অন্তররাজ্যে ডুবিয়া বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল—তারপর একেবারে স্থির!"

ঠাকুরের কৃপায় বহুপ্রার্থিত অলৌকিক অনুভূতিতে অধিকারী হইলেও রাখালের মনে একটা অতৃপ্তি রহিয়া গেল। তিনি চাহেন, ইচ্ছামাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া নানাবিধ দর্শনাদিতে সময় অতিবাহিত করিবেন। অপরের এরূপ হয়, তাঁহার কেন হইবে না? সুতরাং একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "কই, আমার তো ওদের মতো

কোন দর্শনাদি হয় না?" ঠাকুর বলিলেন, "একটু ধ্যানজপ নিয়মিত করলে এ রকম দর্শন হয়।" তাঁহার কথায় রাখাল সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমত উহাতে কোন রসবোধ না হওয়ায় সাধনে শৈথিল্য দেখা গেল। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়।" অতঃপর একনিষ্ঠসাধক রাখাল একদিন ঠাকুরের সহিত ৺কালীমন্দিরে গিয়াছেন; ঠাকুর গর্ভমন্দিরে উপবেশন করিলে তিনি নাটমন্দিরে বসিয়া জপ করিতে করিতে দেখেন, সহসা গর্ভমন্দির অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে সেই তীব্র স্নিগ্ধজ্যোতি মন্দিরদ্বার অতিক্রমপূর্বক তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভীত-চকিত রাখাল অমনি আসন ছাড়িয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে ঠাকুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুই না বলিস্, তোর দর্শন-টর্শন কিছু হয় না? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে পালিয়ে আসবি? তা হলে কি করবি বল?" আর একদিন রাখাল নাটমন্দিরে ধ্যানে মগ্ন আছেন; এমন সময় ঠাকুর উপনীত হইয়া বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র, আর ঐ দেখ তোর ইষ্ট।" রাখাল সত্য সত্যই সেইক্ষণে মন্ত্রলাভ করিয়া এবং ইষ্টমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অপর একদিন তিনি বহু চেষ্টায় মন স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণচিত্তে আপন দুরদৃষ্টের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আসন ত্যাগ করিলেন। ঠিক তখনই ঠাকুর তথায় আগমনপূর্বক অকস্মাৎ আসন ছাড়িবার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং সব শুনিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে রাখালের জিহ্বায় তিনটি রেখা টানিয়া দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে রাখালের অন্তরে শান্তির নির্ঝর প্রবাহিত হইতে থাকিল।

ক্রমে সাধনানিষ্ঠ রাখালের এমন অবস্থা হইল যে, তিনি দৈনিক কার্যে পর্যন্ত মনোনিবেশ করিতে পারেন না। ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমায় জল দিতে হয়; সেবা করতে পারে না।" সংসারে বৈরাগ্যও তখন এমন উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে যে, রাখাল ঠাকুরকে বলিতেন, "সংসার আমার আলুনী লাগে—সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।"

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় রাখাল প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় যাইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে না যাইয়া বলরাম মন্দিরে বা অধর সেনের বাটিতে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার চিত্তেও একটা আলোড়ন চলিতেছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন, "রাখালের মনে তখন বালকের মতো হিংসাও ছিল। তাই আমার মনে কখনও কখনও তার জন্য ভয় হতো। কারণ মা (জগদম্বা) যাদের এখানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।" নবাগতরা ঠাকুরের

স্নেহভাগী হইবে—ইহা রাখালের সহ্য হইত না। এই অবস্থা যখন চলিতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা ভাবচক্ষে দেখিলেন, মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন; অমনি সচকিতে মাকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন, "মা ওকে হৃদের মতো সরাসনি; মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না—তাই কখনও কখনও অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস, তাহলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস।" যাহা হউক, রাখাল কলকাতায় ভক্তগৃহে কিছুদিন আনন্দেই কাটাইলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার যত্নসত্ত্বেও শরীর সুস্থ হইল না। ঠিক সেই সময় বলরামবাবু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন। তিনি রাখালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলে ঠাকুর সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাখাল ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। সৌন্দর্যনিলয় ও ভাবগম্ভীর ব্রজধামে রাখাল বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। এই সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, আর এই সেই যমুনাপুলিন! এখানে কুঞ্জে কুঞ্জে ময়ূরময়ূরী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বভাবসুন্দর ধামে রাখালের মনের ন্যায় শরীরও প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই ছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার জ্বর হইল। সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্নমনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসে শরীরধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।" তাই আকুলকণ্ঠে মাকে জানাইলেন, "মা, কি হবে? তাকে ভাল করে দে; সে যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে!"

ঠাকুরের প্রার্থনা মা শুনিলেন। তিন মাস পরে নভেম্বরের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়া রাখাল বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুনঃ ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন। কিন্তু দৈবক্রমে মাসেক পরেই তিনি আবার অসুখে পড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও তখন সর্দি প্রভৃতি রোগে পীড়িত। রাখাল জানিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার বিষয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন। রুগ্ণ শরীর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলে ঠাকুরের উদ্বেগবৃদ্ধি হইবে মাত্র। সেরূপ দুশ্চিন্তা যাহাতে না হয় তাহাই করা উচিত—এই ভাবিয়া তিনি ঠাকুরকে স্বীয় মনোভাব না জানাইয়াই পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় সেখানেই রহিয়া গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাখাল বাড়িতে না যাইতে চাহিলেও ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া হৃতশাবকা বিহঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিয়া দিন কাটাইতেন। রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও ক্রমে যাতায়াতের ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিশ্বেশ্বরীর সহিত তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তার পরিবারের কাছে তাকে

আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকি ছিল।" রাখালের সহজ ব্যবহার দর্শনে পরিবারস্থ লোকেরা আশ্বস্ত হইয়া রাখালকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখাল এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর করাইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস—একথা যেন না শুনি।" আত্মীয়-স্বজন কিন্তু ছাড়েন নাই, তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, নিজের জন্য না হইলেও পরিবারের জন্য অর্থোপার্জন করা উচিত, কারণ পরিবারের প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। সরলভাবে রাখাল তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" এই প্রশ্নে ঠাকুরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রাখাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এবং হয়তো অলৌকিক বিধানে বাকি 'একটু ভোগ' শেষ করিবারই জন্য তিনি অধুনা এইরূপ সন্দেহদোলায়মান-চিত্তে এখন গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন। এদিকে ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে ভক্তদের বলিলেন, "রাখাল এখন পেন্‌সন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে বাস করছে।" রাখাল এইভাবে কিছুদিন স্বগৃহে বাস করিয়া সুস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মচক্র রচনাপূর্বক সাধন করিতে অভিলাষ হইয়াছে। তারপর ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তাঁহারই কক্ষে কৃষ্ণাচতুর্দশীর গভীর রাত্রে রাখাল, মাস্টার, কিশোরী প্রভৃতিকে লইয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইলে ঠাকুর সেই রাত্রে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া বাহ্যসংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহার দিন দুই পরে ঠাকুর মৌনাবলম্বন করেন এবং মৌনভঙ্গে বলেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি অধিক কিছু বলেন নাই। পরে শরৎকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত দেখাইয়াছেন! তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

ইহার দুই মাস পূর্বেই ঠাকুরের গলরোগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথাসময়ে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আনা হইলে রাখালও তথায় আসিয়া সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সেবার সহিত ত্যাগী ভক্তদের জীবনে এখন চলিল এক অপূর্ব সাধনা—সংসারের চিন্তা ক্রমেই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাশীপুরে আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি সব শুনিলেন; কিন্তু তখন মায়িক সংসারের ঘটনাবলী তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিত না; সেজন্য এই

সংবাদে তাঁহার বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তির কোন হ্রাস লক্ষিত হইল না—তিনি পূর্বেরই ন্যায় দিবসে সেবা ও রাত্রে ধ্যানজপে মগ্ন রহিলেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে, সেসব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।"

লীলাবসানে উন্মুখ ঠাকুর এই সময়ে ভাবী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-গঠনের জন্য প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" কে জানে, এই বাক্যে নরেন্দ্র কিসের ইঙ্গিত পাইলেন! অনন্তর একদিন তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে বলিলেন, "আজ হতে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকব।" ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিলে তিনিও সানন্দে বলিলেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।" তদবধি গুরু-ভ্রাতাদের নিকট তিনি 'রাজা' বলিয়াই পরিচিত হইলেন; কিন্তু পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাঁহার সর্বজন-পরিচিত নাম হইয়াছিল 'মহারাজ'। আমরাও তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিব।

ঠাকুরের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই তখন বিশেষ চিন্তিত থাকিলেও হৃদয়ে আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত একদিন নরেন্দ্র ও মহারাজের মুখে আদরে হাতে বুলাইতে বুলাইতে স্নেহবিগলিতস্বরে তিনি তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হতো। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে লোক সব ধরে পড়ে—সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।" মহারাজ শ্রবণমাত্র মর্মভেদী কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি বলুন, যাহাতে আপনার শরীর থাকে। নির্বিকার মাতৃচালিত মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

বিশ্বাস ভাঙ্গিলেও আশা যায় না; আর ভক্ত কখনও ঠাকুর-সেবায় বিরত হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও মহারাজ একমনে সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন কি, সাধনার প্রবল উচ্ছ্বাসে গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ তীর্থদর্শন ও তপস্যাদিতে বহির্গত হইলেও তিনি স্থিরভাবে একটানা কাশীপুরেই অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুর যুবক ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষান্বেষণে বাহিরে পাঠাইতেন—বলিতেন, "ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ।" তদনুসারে একদিন লাটু ও মহারাজ ভিক্ষায় চলিলেন। যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "কেউ গাল দেবে, আর কেউ আশীর্বাদ করবে, হয়তো আবার কেউ পয়সাও দেবে—তোরা সব নিবি।" পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি রন্ধন করাইয়া স্বয়ং সেই অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন।

কাশীপুরের একটি ঘটনায় মহারাজের তৎকালীন উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাগলী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। কাশীপুরেও তাহার উৎপাত আরম্ভ হইলে নিরঞ্জনাদি ভক্তেরা তাহার ঠাকুরের নিকট উপরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু সে নিষেধ মানিতে চাহে না। একদিন শশী শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখেই মহারাজকে বলিতেছিলেন, "এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।" অহেতুক-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর অমনি ইঙ্গিতে বলিলেন, "না না, সে আসবে আর দেখে চলে যাবে।" মহারাজেরও মনোভাব ছিল, "যেমন করেই হোক, পাগলী ঠাকুরের কথাই তো চিন্তা করছে; সুতরাং আমরা বিরক্ত হব কেন?" পরন্তু এ প্রকার যুক্তিতে আস্থাহীন শশী বলিলেন, "কিন্তু অসুখের সময় কেন আর ওরকম উপদ্রব!" মহারাজ প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে উত্তর দিলেন, "উপদ্রব সবাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিইনি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল! কত তর্ক করত! ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।" অতঃপর পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আবার বলিলেন, "দুঃখ হয় যে, সে উপদ্রব করে। আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।"

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলেন। মহারাজের হৃদয়ে আজ পিতার সম্পত্তি, যুবতী ভার্যা, শিশুপুত্র—কেহই স্থান পাইল না, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি এবং এক অননুবর্ণনীয় ব্যথা। কিন্তু কাল বড়ই নিষ্ঠুর, সে বর্তমানের কঠিন আঘাতে মানবকে জর্জরিত করিয়া জানাইয়া দেয় যে, অতীত সত্যই চলিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ঠাকুরের শেষ স্মৃতির সহিত বিজড়িত কাশীপুরের উদ্যানবাটি ত্যাগ করিয়া মহারাজকেও বলরাম-মন্দিরে আসিতে হইল। তারপর বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি যথাসময়ে সেখানে যোগ দেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে নরেন্দ্রাদি যখন আঁটপুরে যান তখন রাখাল অন্যত্র থাকায় সেখানে যাইতে পারেন নাই। ইহাতে বাবুরামের মাতাঠাকুরানী অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হন; তাই রাখাল, বাবুরাম ও বুড়োগোপালকে লইয়া নরেন্দ্র পুনর্বার সেখানে যান। আঁটপুরের একটি যুবক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে মহারাজের ধ্যান-তন্ময়তা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। আঁটপুর হইতে ফিরিয়া যথাকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মহারাজের নাম হইল ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার সন্ন্যাস যে শুধু একটা বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, পরন্তু অন্তরের বৈরাগ্যোজ্জ্বল গৈরিক রাগের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বরাহনগরে একদিন তাঁহার পিতার প্রতি আচরণে। আনন্দমোহন মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। মহারাজও

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভালবাসা দেখাইতেন; কিন্তু গৃহে ফিরিতেন না। ইহাতে পিতা বিরত হইতেন না দেখিয়া অবশেষে তিনি নম্রভাবে অথচ স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" মায়িক সম্বন্ধ তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিলে দেখা গেল যে, মহারাজ অবিচলিত আছেন। এমন কি, কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৬-এর ২০ এপ্রিল) তাঁহার একমাত্র দশমবর্ষীয় পুত্র সত্যানন্দের মৃত্যুসংবাদেও তিনি সুমেরুবৎ অচল, অটল ও নির্বিকার ছিলেন।

বরাহনগরের মঠে অবিরাম বৈরাগ্যাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলেও মহারাজের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দশজনের সঙ্গে নানাবিধ কার্য ও আলাপাদিতে লিপ্ত থাকাই চিত্তবিক্ষেপের কারণ।" সুতরাং নেতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন একান্তে জানাইলেন, "এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবদ্দর্শন, কই হল?" গুরুভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" এবারে নেতা উত্তর দিলেন, "বের হয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?" ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, " 'মুক্তি ও তাহার সাধন' বইখনিতে আছে—সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়।" নরেন্দ্র নীরব রহিলেন; কারণ ইহাই তো ভারতের চিরন্তন ধারা যে, সন্ন্যাসী নির্জনে ভগবচ্চিন্তা করিবে। নূতন কর্মপ্রণালীর চিন্তা চকিতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও উহা তখনও স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই; আর সনাতন বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহারও প্রাণ তখন তীর্থাদিদর্শন ও নির্জনবাসাদির জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেও ঠাকুরের আদরের রাখালকে তিনি তখনই যথা-তথা যাইতে দিলেন না। অনন্তর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমায়ের নীলাচল-গমনকালে রাখালও সকলের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত সেখানে চলিলেন।

নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমা অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বলরাম বাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠ' নামক বাড়িতে থাকিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অপরেরা অন্যত্র অবস্থানপূর্বক ভিক্ষান্তে উদরপূর্তি করিয়া ৺জগন্নাথ-দর্শন ও ধ্যান-জপাদিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পরন্তু যত্নের অভাবে মহারাজের শরীর শীর্ণ হইতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বিশেষ চিন্তিত রহিলেন এবং বলরামবাবুও তাঁহাকে স্বগৃহে আনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। রাখাল বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ

অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার ও তপস্যাদি করা সম্ভব হইবে না। অতএব কয়েকমাস পরেই পুরী হইতে কটক হইয়া তিনি বরাহনগর মঠে চলিয়া আসিলেন।

মহারাজের নির্জন-তপস্যার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহচররূপে সুবোধানন্দকেও পাঠাইলেন। মহারাজ ও সুবোধানন্দ ৺বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পিশাচমোচন-পল্লিতে শ্রীযুক্ত প্রমদাদাসবাবুর এক নির্জন উদ্যানবাটিতে অবস্থানপূর্বক সত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এইরূপে মাঘ মাস পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া স্বামী সুবোধানন্দ ও অপর একজন বাঙালি পরিব্রাজকের সহিত মহারাজ নর্মদা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নর্মদাতীরে মহারাজ একাদিক্রমে ছয়দিন গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া এককালীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চবটী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র তীর্থাদি দর্শন ও তত্তৎস্থলে কিয়ৎকাল ধ্যান-জপাদিতে অতিবাহিত করিয়া বোম্বাই হইয়া শ্রীদ্বারকাধাম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে এবং সৌরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে মহারাজের অপ্রতিগ্রহ ও নিঃস্পৃহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বোম্বাই শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা-কালী) তাঁহাদিগকে নিজের আবাসে লইয়া যাইতে চাহিলে ব্রহ্মানন্দ উহাতে অস্বীকৃত হন এবং শ্রীশ্রীমুম্বাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন এক নিভৃত স্থানে প্রায় সাত-আট দিন থাকিয়া দ্বারকাগমনার্থ জাহাজে উঠেন। যাত্রাকালে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ লাবণ্যময় ধ্যানগম্ভীর মূর্তি সন্দর্শনে জনৈক ভাটিয়া মহাজন তীর্থদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলে মহারাজ অস্বীকৃত হন। অগত্যা শেঠজী তিনখানি টিকেট কিনিয়া সুবোধানন্দের হস্তে অর্পণ করেন।

দ্বারকাধামে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যতোয়া গোমতীর জলে স্নান করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জন্য প্রত্যেককে রাজসরকারে দুই টাকা মাশুল দিতে হয়। নিঃসম্বল স্বামী ব্রহ্মানন্দাদির নিকটও ঐরূপ অর্থ চাহিলে তাঁহারা হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া চলিলেন; অধিকন্তু জনৈক ব্যবসায়ী উপযুক্ত অর্থপ্রদানে অগ্রসর হইলে মহারাজ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী নদীতে স্নান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পুণ্যপ্রদ। বৃথা অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই—আমরা বেটপুরী-সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিব।" শেঠজী তাঁহার এই সারগর্ভ বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক তিন দিন তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একখানি

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অর্পণ করিলেন। শেঠজী তাঁহাদের তীর্থযাত্রার সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে পত্র দিতেও চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শুধু বলিলেন, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যক নাই—সাধু-সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।" অতঃপর শেঠজী অর্থদানের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে উহাও অস্বীকারপূর্বক পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দজী বেটদ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নান ও মন্দিরাদি-দর্শনান্তে সুবোধানন্দকে ধর্মশালায় ভিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ধর্মশালার অধ্যক্ষ ঐ জন্য বাদাম রাখিতেন। সুবোধানন্দজী ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত কয়েক সের বাদাম লইয়া মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলে বাদামের পরিমাণ দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এত বাদাম কে দিয়েছে?" "ধর্মশালার অধ্যক্ষ।" মহারাজ বলিলেন, "আমাদের জন্য দুই ছটাক রেখে বাকিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" কিন্তু সুবোধানন্দ উভয় বিপদে পড়িলেন—সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ সঞ্চয় করিতে পরাঙ্মুখ, সাধুসেবক অধ্যক্ষ প্রতিগ্রহণে অস্বীকৃত। অগত্যা ব্রহ্মানন্দের ব্যবস্থানুসারে দুই ছটাক রাখিয়া অবশিষ্ট বাদাম দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইল। বেটদ্বারকা হইতে তাঁহারা ক্রমে সুদামাপুরী ও জুনাগড়ে গির্ণার পর্বতোপরি মন্দিরাদি দর্শনান্তে আমেদাবাদে উপনীত হইলেন এবং তদনন্তর রাজপুতানার তীর্থগুলি দর্শনের জন্য প্রথমে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে সঙ্গের পরিব্রাজকটি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আজমীরের হাসপাতালে রাখিয়া কিছুদিন পরে (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে) ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনধামে মহারাজের এই দ্বিতীয়বার আগমন। স্বধামে উপস্থিত ব্রজের রাখাল ভগবদ্ভাবে বিভোর হইলেন। এইভাবে কত দিন কাটিয়া গেল, কত মহানিশার অবসান হইল—ভগবদ্ধ্যানে তন্ময় মহারাজের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কোন দিন সুবোধানন্দের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন, কোন দিন উহা অনাদরে পড়িয়া থাকে। কোন দিন মন্দিরে গমনপূর্বক ভাবমুগ্ধচিত্তে অনিমেষনয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, কোন দিন বা সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারান। আর রাত্রিতে নিদ্রার স্থলে ধ্যানই অধিক হইয়া থাকে। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মহারাজের কঠোর তপস্যার কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন; তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে-সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" গোসাঁইজী এইরূপ উত্তর কিভাবে লইয়াছিলেন জানি না; পরন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের

ইতিহাস পর্যালোচকের দৃষ্টিতে এবংবিধ তপস্যার গূঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে। সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-চেতনাকে সদা সক্রিয় রাখিতে হইলে সঙ্ঘের মর্মস্থলে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ছিল, যাহা হইতে কর্মব্যাপৃত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত আপনাদিগকে পুনঃপুনঃ পূর্ণ করিয়া লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। ইহারই আর এক সময়ে মহারাজের জ্বর হইলে গোসাঁইজী অচিরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সুবোধানন্দের নিকট জানিতে পারিলেন যে, রোগীর মশারি নাই। শ্রবণমাত্র তিনি মশারি ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মানন্দ শীঘ্রই নিরাময় হইলেন। ইত্যবসরে সুবোধানন্দের মন পূর্ব সংকল্পানুসারে উত্তরাখণ্ডের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইয়া পড়িল। মহারাজের নিকট ইহা জানাইলে তিনি সানন্দে তাঁহাকে যাত্রার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি একদিন দেখিলেন যে, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বলরামবাবু জ্যোতির্ময়দেহে হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। পরে যথাসময়ে পত্রে জানিতে পারিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৩ এপ্রিল, ১৮৯০)। ইহার পরে আরও কয়েক মাস বৃন্দাবনে কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি পদব্রজে হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। অপর কয়েকজন গুরুভ্রাতা ঐ অঞ্চলে পূর্ব হইতেই তপস্যায় নিরত ছিলেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারি মাসে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দসকাশে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। মহারাজ সেই আদেশ পালনপূর্বক মীরাটে গেলেন এবং সেখানে অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। মীরাটে মার্চ পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে স্বামীজী সকলকে বলিয়া নিঃসঙ্গ ভ্রমণে নির্গত হইলেন; এদিকে মহারাজও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এপ্রিল মাসে জ্বালামুখী তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগোমারী, মুলতান ও সক্কর হইয়া করাচীতে উপনীত হইলেন। করাচী হইতে জাহাজে বোম্বাই পৌঁছিলে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল। স্বামীজী তখন আমেরিকা গমনে উদ্যত; কিন্তু তৎপূর্বে খেতড়িরাজের আহ্বানে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ এবং তুরীয়ানন্দও তাঁহার সহিত গমনপূর্বক পথে আবুরোড স্টেশনে নামিয়া আবু পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। খেতড়ি হইতে স্বামীজীর বোম্বাই প্রত্যাগমনকালে তাঁহারা পুনর্বার আবুরোডে আসিয়া স্বল্পক্ষণের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর কিয়দ্দিবস আবুপাহাড়ে যাপনান্তে তাঁহারা আবুরোডে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে অখণ্ডানন্দও বোম্বাই হইতে তথায় আসিলে তিনজনে আজমীর হইয়া জয়পুর গেলেন। সেখানে একমাস অবস্থানের

পর অখণ্ডানন্দ রাজপুতানা ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে চলিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া উভয় গুরুভ্রাতা দিব্যভাবে ভাবিত হইলেন। তুরীয়ানন্দ একদিন বলিলেন, "আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না। দেখি, রাধারানী উপবাসী রাখেন কি না।" ধ্যানে মগ্ন গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের একদিন একরাত্রি কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল—কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। পরদিন এক তীর্থযাত্রী অযাচিতভাবে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়া গেল। বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা পদব্রজে নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুসুমসরোবরে উপনীত হইলেন এবং ঐ স্থানটি তপস্যার অনুকূল দেখিয়া তথায় রহিয়া গেলেন। এই সময়ের কঠোর জীবনের ইতিহাস আমরা বিদিত নহি বলিলেই চলে। অন্য সময়েরই বা কতটুকু বিদিত আছি? ভাবময় ঠাকুরের মানসপুত্রের বিভিন্ন তীর্থাদিতে যে-সব সাধন, অনুভূতি বা দর্শনাদি হইয়াছিল তাহার কতটুকু আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আর কতটুকুই বা ভাষায় প্রকাশ করা চলে? মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।" যে নির্বিকল্প সমাধি বহুজীবনের সাধনায় ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং উহার পরবর্তী অনুভূতিসম্পদে ভূষিত হইয়া যিনি বহু ভক্তকে ধর্মপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অতি স্থূল আভাসমাত্রই আমরা দিতে সক্ষম।

ইতোমধ্যে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে মঠের কার্যবৃদ্ধির সূত্রপাত হওয়ায় মঠে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট বারংবার আহ্বান আসিলেও তখনই যাওয়া হইল না। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা লক্ষ্ণৌ হইয়া অযোধ্যায় গেলেন। তথায় শিবানন্দজীর মুখে মঠে ফিরিবার জন্য স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়া তুরীয়ানন্দ আগস্ট মাসে কলকাতায় গেলেন; পরন্তু মহারাজ পুনর্বার বৃন্দাবনে ফিরিলেন। এইবারে বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন—ভিক্ষার্থে কোথাও যাইতেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। কোনদিন আহার জুটিত, কোনদিন বা অনাহারে কাটিত। কখনও কোন শেঠ একখানি কম্বল দিয়া যাইতেন; পরক্ষণেই চোর আসিয়া উহা লইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষিস্বরূপ সব দেখিয়া যাইতেন মাত্র। দিব্যভাবে বিভোর হইয়া কখনও তিনি বাহ্যহারা হইতেন; আবার কখনও তাঁহার দেহে অশ্রুপুলকাদি সঞ্চার হইত। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া মঠাভিমুখে চলিলেন।

মহারাজের মঠে প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই অসুস্থা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে কলকাতায় আনিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ধারে 'গুদামওয়ালা বাড়ি' নামক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ির ত্রিতলে রাখা হয়। সেখানে তাঁহার সেবাদির জন্য গোপালের মা এবং গোলাপ-মাও বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত যোগানন্দ এবং দুই-একজন ব্রহ্মচারীও দ্বিতলে থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দও সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি সমাগত ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং কোন কোন ভাগ্যবানকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত মহারাজ অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকিতেন। গুদামওয়ালা বাড়ির পরে বলরাম-মন্দির ছিল তাঁহার প্রধান আবাস-স্থল।

১৮৯৭-এর প্রারম্ভে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে যখন দার্জিলিং গমন করেন, তখন ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা-রচনায় সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। পরে ১ মে মিশন প্রতিষ্ঠান্তে তিনি ব্রহ্মানন্দকে কলকাতাকেন্দ্রের কার্যভার দিলেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বেলুড়ে নূতন মঠ-নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইলে তাঁহাকে উহার দায়িত্ব লইতে হইল এবং পর বৎসর নূতন বাটিতে মঠ উঠিয়া আসার পর তাঁহারই হস্তে উহার পরিচালনভার ন্যস্ত হইল। অবশেষে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামীজী দলিল সম্পাদনপূর্বক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গুরুভ্রাতাদের হস্তে তুলিয়া দিয়া ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আরম্ভে মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন। অতঃপর ঐ পদে মহারাজ নির্বাচিত হইলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" গুরুভ্রাতারা তাহা ভুলেন নাই। আরও তাঁহাদের মনে ছিল যে, মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র; তাই একদিন স্বামীজী অতর্কিতে মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" প্রত্যুৎপন্নমতি মহারাজও ইহাতে অপ্রস্তুত না হইয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।" বস্তুত ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন; অধিকন্তু স্বামীজীর ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল জগতে নব অনুপ্রেরণা জাগাইবার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। অতএব সংগৃহীত সমস্ত অর্থাদি মহারাজের হস্তে অর্পণান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এতদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।" এখন হইতে আমরা মহারাজকে সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপেই পাইব।

যৌবনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে যেমন

একটা সুদৃঢ় সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে ছিল একটা আবাল্য অকৃত্রিম দিব্য প্রেমবন্ধন। রাখাল-রাজকে সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "রাখাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।" কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন—যতদিন স্বামীজী স্থূলদেহে ছিলেন, একটি কাজও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরও এই শ্রদ্ধা শতধা পরিস্ফুট হইত। তাঁহার প্রদত্ত একখানি গ্রন্থ ধরিবার পূর্বে মহারাজকে গঙ্গাজলে হস্ত প্রক্ষালন করিতে দেখা যাইত। স্বামীজীর প্রতিকৃতি হস্তে লইয়া তিনি কি প্রেমিকের দৃষ্টিতেই না উহা নিরীক্ষণ করিতেন! ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার যেমন বন্ধুজনসুলভ হাস্যপরিহাসপূর্ণ, তেমনি প্রেমকলহবহুলও ছিল। দুইজনে মঠপ্রাঙ্গণে একটি কাল্পনিক রেখাপাতপূর্বক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, কাহার প্রতিপালিতদের কতটুকু গণ্ডি। এই রেখা অতিক্রমপূর্বক একের হাঁস প্রভৃতি অপরের বাগানে আসিয়া পড়িলে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত এবং সারা মঠ সে আমোদে মাতিয়া উঠিত। এদিকে রোগে ভুগিয়া স্বামীজীর মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকিত না। তাঁহার দিন অল্প; তাই পরিকল্পনাগুলি দ্রুত কার্যে পরিণত হইতেছে না দেখিয়া ধৈর্যচ্যুতি হইত; আর সে বিরক্তির অধিকাংশই আসিয়া পড়িত মঠাধ্যক্ষ মহারাজের উপর। আবার পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া তিনি বলিতেন "রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি, তোমায় গালাগালি করেছি—আমায় ক্ষমা কর।" আর তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু আমি জানি, রাজা আমাকে কখনও ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগালি সহ্য করে থাকে, সে একমাত্র রাজা।" মহারাজও মনে করিতেন, "সে বকেছে তো হয়েছে কি?" আর স্বামীজীর অনুশোচনা দেখিয়া তিনি বলিতেন, "তুমি অমন করছো কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।" এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ আমরা লোকদৃষ্টিতে বুঝিব কিরূপে? মহারাজ একদিন ঠাকুরের একটি আদেশ অমান্য করিলে ঠাকুর সহাস্যে নিকটবর্তীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল এতদিনে সত্য সত্যই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ আপনার জনের ন্যায় আবদার করিতে পারিয়াছেন। মহারাজ ও স্বামীজীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও ঐ অলৌকিক প্রেমের দৃষ্টিই অবলম্বন করিতে হইবে। বস্তুত শুধু নেতা ও পরিচালিতের সম্বন্ধ লইয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। এ প্রেমের লীলাখেলা কিন্তু অচিরেই শেষ হইয়া গেল—স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হইলেন। মহারাজ সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন—সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতার বক্ষস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে সন্তর্পণে তুলিয়া

আনিলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল!"

স্বামীজীর অদর্শনের পর সঙ্ঘনায়কের গুরুদায়িত্ব বহন করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা মহারাজ সুবিদিত ছিলেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ভারত ও ভারতেতর দেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সুনাম রক্ষা ও অধিকতর প্রসার বহু আয়াসসাধ্য—ইহা জানিয়াই মহারাজ সাবধানে অথচ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে দলে দলে ভক্তগণ আসিত লাগিলেন। অনেক ত্যাগী যুবকও মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। মহারাজ এই যুবকদিগকে সমুচিত শিক্ষাদি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-বহনের উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুণে তিনি মানুষ চিনিতে পারিতেন এবং অধিকারানুসারে নিষ্কাম কর্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ইত্যাদির উপদেশ দিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহজ সরল ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সকলেই মুগ্ধ হইত—ত্যাগী বা গৃহস্থ যিনিই একবার আসিয়া পড়িতেন, তিনি আবার আসিতে বাধ্য হইতেন, এমন কি, ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়া যাইতেন।

শিক্ষাদান ব্যতীত তাঁহার আর একটা প্রধান কার্য ছিল, মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গমনপূর্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং সাধুদের জীবনগঠনে সাহায্যদান এবং ভক্তদিগকে আকর্ষণপূর্বক কেন্দ্রগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন মঠ-মিশন জনসমাজে আদৃত ও উহাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি উহাদের প্রভাব ভারতেতর দেশেও প্রসারিত হইতে থাকিল। স্বামীজী বেলুড়, মাদ্রাজ ও মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু ঢাকাতে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে একটি মঠ গড়িয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শ ও উৎসাহে মিশন-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সারগাছি আশ্রম, ১৯০০ অব্দে কাশী সেবাশ্রম, ১৯০১ অব্দে কনখল সেবাশ্রম এবং ১৯০২ অব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। ইহার পর মহারাজ উহাদের স্থায়িত্ব-সম্পাদন ও নূতন নূতন কেন্দ্রস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

সঙ্ঘনায়করূপে তিনি হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের নূতন নূতন কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহার উদ্দীপনা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই সকল কেন্দ্রের যখন যেটিতে তিনি যাইতেন, সেইটিতে তখন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কাশীতে যাইয়া একমাস বাস করেন। স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই কাশীতে জন কয়েক যুবক মিলিয়া 'হোম অব্ রিলিফ—পুওর মেন্স্ রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন' (অনাথাশ্রম—দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার সমিতি) নামক এক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।[১] স্বামীজী মহারাজকে বলিয়া যান, "এ প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।" এবারে মহারাজের আগমনে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ বর্ধিত হইল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বানপূর্বক সকলে স্থির করিলেন যে, উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইরূপে উহাই পরে অধুনা বিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে' পরিণত হয় এবং রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের পার্শ্বে সংগৃহীত নিজস্ব ভূমিতে উহার গৃহাদি নির্মিত হয়। অতঃপর মহারাজ কনখলে যান। সেখানে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। তখন মাত্র তিনখানি চালাঘর ছিল। উহারই একখানিতে মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহারাজের মারফত কিছু কিছু অর্থের ব্যবস্থা হইলে আশ্রমের জন্য জমি সংগৃহীত হয় ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার নির্দেশে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী গৃহ নির্মিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কনখল হইতে মহারাজ বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তপস্যানিরত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন। এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ১২টায় উঠিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন উঠিতে দেরি হইলে এক সূক্ষ্মদেহী বাবাজী তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া জপাদি করিতে ইঙ্গিত করেন। বৃন্দাবন হইতে মহারাজ এলাহাবাদে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত একদিন যাপন করিয়া বিন্ধ্যাচলে উপনীত হন। সেখানে তাঁহার ত্রিরাত্র বাসের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যে ও ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া যান। বিন্ধ্যাচলে তিনি যেন সর্বদাই দেবীর ভাবে বিভোর থাকিতেন। কখনও গভীর নিশীথে দেবীদর্শনে গমন, কখনও জনমানবশূন্য স্থানে ধ্যান, কখনও বা মায়ের গুণগানশ্রবণ ইত্যাদিতে দিনগুলি পরমানন্দে কাটিয়া যাইত। অনন্তর নভেম্বর মাসে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর মার্চ মাসে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভান্তে স্বামী বিরজানন্দের সহিত বায়ুপরিবর্তনের জন্য শিমূলতলায় যান। মঠে ফিরিয়া আসার কয়েকমাস পরে (১৯০৪-এর শেষে) ভাগলপুরে প্লেগের আবির্ভাব হইলে তথায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

---

১। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে ক্ষামেশ্বর ঘাটে একটি আশ্রম ও কিছু পরে জঙ্গমবাড়ির এক ভাড়াবাড়িতে সেবাকার্য চলিতে থাকে। ১৫ সেপ্টেম্বর সমিতির নামকরণ হয়। ১৯০১-এর প্রথমে সেবাকার্য দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে এবং ২ জুন ৩৮।১৫৩ নম্বর রামাপুরার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন মহারাজের পুরী গমনকালে প্রেমানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে যান এবং স্বামী শিবানন্দ এবং অখণ্ডানন্দ রথযাত্রার পূর্বে তথায় সম্মিলিত হন। এ বৎসর ২৩ আগস্ট তারিখে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ নীলাচলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন; অধিকন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও দুইদিন পরে সেখানে উপস্থিত হন। অনন্তর ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কোঠার হইয়া বেলুড়ে ফিরিলেন—সেখানে মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনর্বার পুরীধামে গমন করেন এবং পুরী হইতে ডিসেম্বর মাসে ভদ্রকে যান। ভদ্রকে তখন বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব। ভক্তগণ তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সেখানে অবস্থানপূর্বক সকলকে স্বাস্থ্যবিধিপালনে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং যথাসময়ে কোঠার হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অচিরেই কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের জন্য তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। মহারাজ সকল বিষয়েই বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন এবং তাঁহার সৎ পরামর্শ সকলেই নতশিরে মানিয়া লইতেন। কারণ উহার সঙ্গে থাকিত তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। অতএব ১৬ এপ্রিল ভিত্তিস্থাপনকার্য-সমাপনান্তে স্বামী অচলানন্দ তাঁহারই অনুমোদিত পরিকল্পনানুসারে বাটি নির্মাণকার্যে নিরত হইলেন। অতঃপর মহারাজ বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বে তিনি পুরীধামে গমন করেন এবং সেখান হইতে অক্টোবর মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নির্গত হন।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণভারতেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সর্বদা ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মাদ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় দেখা গেল যে, তিনি আরতি শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেও একই ভাবে সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। ঐ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মার্কিন ভক্তমহিলা দেবমাতা মাদ্রাজেই ছিলেন। মহারাজ সদলবলে তাঁহার বাসভবনে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করেন। মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তিনি একশত আটটি করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের বিল্বপত্রে মহাদেবের পূজা করেন। মাদুরায় শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করিয়া তিনি দিব্যভাবে বিহ্বল হন, এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার দেহ স্বহস্তে ধারণ করেন। এই দর্শন সম্বন্ধে পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।" মাদুরা হইতে সকলে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন প্রবল সামাজিক পার্থক্য। ইহা জানিয়াও মহারাজ একদিন একজন অব্রাহ্মণ ভক্তের আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে গেলেন। সেদিন ঐ বাটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। মহারাজের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিভোজনে বসেন এবং ভক্তটির কন্যা এবং অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশনে যোগদান করেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্যে নেতৃত্ব করেন। সেখানে রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং উহা লিখিয়া আনিয়া মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রচলিত করেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি পুরীধামে ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর দেখা গেল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের প্রসার হওয়ায় উহাকে আইন অনুসারে রেজেস্ট্রি করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্বেই ১৯০৮ অব্দের প্রথমাংশে স্বামী শিবানন্দ ও অখণ্ডানন্দের সহিত বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দও সেই আলোচনায় মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন। এইরূপে মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে মহারাজের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে মিশনকে রেজেস্ট্রি করা হইল।

মহারাজ দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠের নিজস্ব জমি হইয়া গিয়াছে। মহারাজ নূতন মঠ-বাটির নক্সাদি দেখিয়া দিলেন এবং ৪ আগস্ট মহাসমারোহে উহার ভিত্তিস্থাপন হইল। ইহার এক সপ্তাহ পরে তিনি বাঙ্গালোরে গেলেন। সেখানকার মঠে প্রতি রবিবার অস্পৃশ্যজাতির অনেকে আসিয়া কীর্তনাদি করিত। ইহাতে মহারাজ বড়ই প্রীত হইতেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। এমন কি, একদিন তাহাদের পল্লিতে তাহাদের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে তিনি মেলকোট, শিবসমুদ্রম্ ও মহীশূরের দেবস্থানাদি দর্শনে যান এবং পুনরায় বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তনান্তে কন্যাকুমারী যাত্রা করেন। পথে মন্দিরাদি দর্শন করিতে করিতে তিনি ক্রমে ত্রিবান্দ্রমে উপনীত হইলেন। এখানে আশ্রমস্থাপনের জন্য পূর্ব হইতেই ভূমি সংগৃহীত ছিল। মহারাজ ৯ ডিসেম্বর ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কন্যাকুমারীতে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন দেবীদর্শন করিতেন এবং মন্দিরে ভাবে বাহ্যহারা হইয়া অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিতেন। কন্যাকুমারী হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি মাদ্রাজে

গমন করেন এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকটি তীর্থ দর্শন করেন। এই সময়মধ্যে মাদ্রাজের মঠ-বাটির কিয়দংশ সম্পূর্ণ হইলে ১৯১৭ অব্দের ২৪ এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে আনা হইল এবং ৩০ এপ্রিল হইতে মহারাজ ঐ বাটিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৬ মে মাদ্রাজের ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন হইয়া গেলে ৯ মে তিনি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ ছাত্রাবাসে দ্বারোন্মোচন উপলক্ষে ১৯২১ অব্দের ১ এপ্রিল স্বামী শিবানন্দ ও সাধুভক্তগণের সহিত তিনি পুনর্বার মাদ্রাজ যাত্রা করেন। মে মাসের শেষে ঐ শুভকার্য সমাধান করিয়া কিছুদিন পরে তিনি বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ মঠে প্রত্যাগমনান্তে কলকাতা হইতে মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া যথাবিধি ৺শারদীয়া পূজা করান। অতঃপর যথাকালে শ্রীশ্রীকালীপূজারও অনুষ্ঠান করাইয়া ১৯ নভেম্বর মাদ্রাজ পরিত্যাগপূর্বক ২১ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে পৌঁছান।

আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ একই স্থানে সন্নিবদ্ধ করিলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তর্বর্তী সময়গুলিতেও মহারাজ বিভিন্ন মঠ-মিশন-কেন্দ্র ও তীর্থাদি-দর্শনে এবং তত্তৎস্থলে উৎসাহবর্ধনে ও পুণ্যস্মৃতিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৬ অব্দে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও বহু সাধুভক্তের সহিত কামাখ্যাতীর্থদর্শনে গমন করেন। সেখানে তিনি কিরূপ দিব্যভাবে তন্ময় থাকিতেন তাহা তাঁহার সঙ্গিমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুত গ্রন্থাদিতে যাঁহারা ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি প্রভৃতির কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল দেবস্থানে তাঁহার মানসপুত্রের এই ভাববিহ্বলতা দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিলেন। ৺কামাখ্যা হইতে তিনি ময়মনসিংহে যান এবং তথায় দিন কয়েক অবস্থানান্তে ঢাকায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন-বাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি একবার দেওভোগে গমনপূর্বক নাগমহাশয়ের তপস্যাপূত আশ্রম দর্শন করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, রামলাল-দাদা এবং কয়েকজন সাধু ও ভক্তের সঙ্গে হরিদ্বারে গমন করেন। সেইবারে তাঁহার উপস্থিতিতে কনখল সেবাশ্রমে মহাসমারোহে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হয়। তীর্থস্থানে সাধুসেবার প্রয়োজনবোধে মহারাজ সকল সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে পূজায় আমন্ত্রণ করেন এবং তাহারাও আশ্রমে পদার্পণপূর্বক পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপে সাধুসমাজের সহিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। পূজান্তে মহারাজ প্রভৃতি সকলে কাশীতে আগমন করেন।

এই সময়ে বিখ্যাত সুগায়ক অঘোরবাবু প্রায়ই মহারাজকে ভজন শুনাইতেন এবং মহারাজও ইহাতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। বস্তুত গুণী গায়ক ও গুণগ্রাহী শ্রোতার সমাবেশে ভগবদ্ভাবপূর্ণ সে সঙ্গীত-লহরী উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিত। তখন মাস্টার মহাশয় কাশীতে ছিলেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ছিলেন। মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই কাজ—ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে রহস্যপ্রিয় মহারাজের ইঙ্গিতে অল্পবয়স্ক সাধুব্রহ্মচারীরা মাস্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "মাস্টার মহাশয়, মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; এখন আপনি কি বলেন?" ঠাকুরের শরণাগত ভক্ত মাস্টার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নাই।"

এই ভাবে কাশীতে সেবাশ্রমে ছয় মাস যাপনান্তে মহারাজ ১৯১৩ অব্দের এপ্রিল মাসে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু ঐ বৎসর ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুনর্বার কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সেখানেই দুর্গোৎসব সমাধা করিলেন। কাশীতে তিনি প্রত্যহ 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করিতেন এবং সকলকে সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন। বৃক্ষাদির প্রতি তাঁহার আশৈশব প্রীতি ছিল; দেশ-বিদেশ হইতে বৃক্ষাদি আনাইয়া তিনি সেবাশ্রমের ভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উভয় আশ্রম যাহাতে পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐ বৎসর সেবাশ্রমের একটি বিল্ববৃক্ষে তিনি একজন সূক্ষ্মদেহীর দর্শনলাভান্তে সকলকে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন; তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ বিদেহী অনিষ্টপরায়ণ নহেন। মহারাজের এইরূপ অসংখ্য অলৌকিক দর্শনের দুই-চারিটিই মাত্র লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একদিন একজন নটের সুমধুর নৃত্য ও ভজনে আত্মহারা হইয়া তিনি প্রবল বারিপাতসত্ত্বেও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন; অগত্যা সঙ্গীদিগকে ঐ বৃষ্টি হইতে তাঁহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। বারিপাত নিবৃত্ত হওয়ার বহু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ নিজে যেমন ধর্মসঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, সাধুব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সমবেতকণ্ঠে কালীকীর্তন, রামনামকীর্তন ও স্তোত্রাদিপাঠে উৎসাহিত করিতেন। ভজনকালে তিনি সকলের মধ্যে নীরবে এমন ভাববিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত এবং শ্রোতৃবৃন্দও সেই জমাট ভাবের যতটুকু সম্ভব স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া

থাকিতেন। তাঁহার আদেশে মন্দিরাদিতেও কীর্তন হইত। এইরূপে কাশীর ৺দুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন ও ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরাদিতে বহুবার সাধুদের কীর্তন শুনিয়া সমাগত যাত্রিগণ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। অযোধ্যাদর্শনান্তে মহারাজ কাশীতে ফিরিলেন। ভারতের সুপ্রাচীন জনবিশ্রুত তীর্থসমূহে সানন্দে ভগবৎসম্ভোগে নিমগ্ন মহারাজের তখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা ছিল না; তথাপি স্বামী প্রেমানন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে ৺কালীপূজার পরে প্রয়াগদর্শনান্তে নভেম্বর মাসে বেলুড় যাইতে হইল।

মহারাজের কাশীধামে শেষ আগমন হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি। ঐ সময়ে কাশী সেবাশ্রমের আভ্যন্তর অবস্থা নিরীক্ষণান্তে সারদানন্দজী ভুবনেশ্বরে যাইয়া মহারাজকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার সেখানে গমন আবশ্যক। অগত্যা তিনি সারদানন্দজীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ আসিয়াই কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু ফলত দেখা গেল তিনি কর্মের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া সকলের আধ্যাত্মিক জীবন আরও গভীরতর করার মানসে বিভিন্ন উপায়-উদ্ভাবনে নিরত রহিলেন। কোনদিন উদ্দীপনাময় উপদেশ, কোনদিন কীর্তন, কোনদিন প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সমস্যাসমাধান—এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল এবং এই ধারার পরাকাষ্ঠা হইল সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে। সেই বৎসর স্বামীজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ফল অচিরেই পরিলক্ষিত হইল। মহারাজের প্রভাবে সেবাশ্রমের সমস্যা আপনা হইতেই মিটিয়া গেল। বস্তুত মহারাজের আচরণ ও উপদেশে কর্ম অপেক্ষা ভাগবত জীবনলাভের জন্য উদ্দীপনাই অধিক প্রকটিত হইত এবং তাঁহার সংস্পর্শে যিনিই আসিতেন তিনিই বুঝিতে পারিতেন, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ধর্মহীন সমাজসেবকদের প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে, উহা ধর্মপিপাসুবর্গের সাধনক্ষেত্র। এইরূপে তাঁহারা মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জাগতিক অসম্পূর্ণতাকে অবহেলা করিতে শিখিতেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজের দৈনন্দিন ব্যবহারে তাঁহার ভাবগাম্ভীর্যের পরিচয় অল্পই পাওয়া যাইত—ভাবসংবরণে তিনি এতই সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাবরাশি উথলিয়া পড়িত। অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীর্ণ প্রতিকৃতির স্থলে নূতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও মহারাজ তদ্‌গতচিত্তে নিজে নাচিয়া এবং গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে নাচাইয়া সমাগত সকলকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন।

পুরী ও ভুবনেশ্বরে মহারাজ প্রায়ই যাইতেন। পুরীতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন এবং সেখানে একটি মঠস্থাপনেরও ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করেন জানিয়া

বলরামবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে চক্রতীর্থে একখণ্ড ভূমি দান করেন। উহাতেই পরে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মঠ নির্মিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ ভুবনেশ্বরে মঠস্থাপনের আয়োজন করেন এবং মঠনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার সময় সাধু-ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে সানন্দে তথায় উপনীত হন। ৩১ অক্টোবর ঐ মঠের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ঐ সময় ভুবনেশ্বরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেখানে মিশনের সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয় এবং স্থায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থাকল্পে দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়। ভুবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়।" মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভুবনেশ্বরের মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া এবং অনুকূল স্থানে বাস করিয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—ইহাও মহারাজের ইচ্ছা ছিল। ফলত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনক্ষেত্ররূপেই ভুবনেশ্বরে মঠ স্থাপিত হয়। মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ছেলেরা সব সাধনভজন করবে—আমি দেখে আনন্দ করব।" ভুবনেশ্বরে তিনি নিজে যেমন নিয়মিত ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকেও ঠিক তেমনি পরিচালিত করিতেন। তাঁহার যত্নে ভুবনেশ্বরের দিনগুলি আনন্দে ও ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত; আবার ফলফুলে, বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত আশ্রমটি নয়ন-মনে আনন্দ ঢালিয়া দিত।

মহারাজের নিজের পক্ষে কিন্তু ঐ দিনগুলি সর্বতোভাবে সুখপ্রদ ছিল না। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগের পর আর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ৪ শ্রাবণ (২১ জুলাই) রাত্রে প্রায় একটার সময় সেবক দেখিতে পাইলেন, মহারাজ একখানি চাদরে শরীর আবৃত করিয়া আরাম-কেদারায় গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সেবক সে রাত্রে প্রশ্ন করিয়াও এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ জানিতে পারেন নাই। পরদিন তারে সংবাদ আসিল, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহারাজ এই সংবাদে একান্ত মর্মাহত হন এবং শোকাচ্ছন্ন মাতৃহারা অবোধ শিশুর ন্যায় দ্বাদশ দিবস নগ্নপদে থাকিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন।

১৯২২ অব্দের প্রারম্ভে তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যখনই অন্য স্থান হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখনই সেখানে উৎসব লাগিয়া যাইত। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নানা দিক হইতে নিত্য বহু ছাত্র, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধু, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভক্ত ও ধর্মপিপাসুগণ ছুটিয়া আসিতেন। মহারাজ বিবিধ অধিকারীর আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের জন্য কত

সময়ে কত যে অপূর্ব উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা তাঁহার সুগভীর ভাবরাজ্যের সহিত অপরিচিত নবাগন্তুক সহজে বুঝিতে পারিতেন না—অথচ প্রতি সাক্ষাতের পর স্পষ্ট বোধ করিতেন, যেন তিনি এক অজ্ঞাত সম্পদের অধিকারী হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। মহারাজ হয়তো গল্প করিতেছেন, হাসিতেছেন কিংবা ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত আছেন; নবাগত ইহা দেখিয়া হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেন, "ইনিই কি ঠাকুরের মানসপুত্র, আর ইনিই কি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার?" কিন্তু ইহারই মধ্যে জিজ্ঞাসুবিশেষ নবালোক পাইয়া ধন্য হইতেন এবং শীঘ্রই পুনর্বার আসিবার সঙ্কল্প লইয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিতেন। সাংসারিক চিন্তায় নিপীড়িত কত নিরাশ মনে এই অনাবিল আনন্দ এক নবলোকের সন্ধান আনিয়া দিত! গতানুগতিক গুরুশিষ্যসম্বন্ধের সহিত পরিচিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ এই অসাধারণ মহামানবের নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তির ধারণা করিবে কিরূপে?

পূর্বোক্ত বিবরণ পড়িয়া যদি কেহ স্থির করিয়া ফেলেন যে, মহারাজ সর্বদা বালকসুলভ রঙ্গরসাদিতে মগ্ন থাকিতেন, তবে নিতান্তই ভুল হইবে। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক সরলতার সহিত এমন একটি গাম্ভীর্য মিশ্রিত থাকিত যে, তাঁহার সম্মুখে সর্বপ্রকার চপলতা এককালে নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি যখন একাকী পদচারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের ন্যায় মনে হইত এবং তাঁহার তাদৃশ মধুর প্রকৃতি জানিয়াও অকস্মাৎ কেহ সম্মুখে আসিতে পারিত না, কিংবা আসিয়া পড়িলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষের অপেক্ষা করিত। অধিকারী দুর্লভ; সুতরাং সুগভীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা কাহার সহিত হইবে? কিন্তু মানুষ ভালবাসার ভিখারি; তাই মহারাজের অধ্যাত্মভাব ঐ প্রণালী-অবলম্বনেই শিষ্যের অন্তরে সঞ্চারিত হইত। কিন্তু দৈবাৎ উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইলে মহারাজের সাধনালব্ধ অনুভূতির দ্বারা উদ্বেলিত এবং ভাবপ্রকাশের অপূর্ব মাধুর্যে অনুস্যূত সেই আধ্যাত্মিক পীযূষধারায় দুই কূল ভাসিয়া যাইত; শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত তখনকার মতো সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই অপূর্ব প্লাবনে নিষ্ণাত হইত।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীর দেহমনের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া তিনি কার্যপরিচালনে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ছেলেদের ধ্যান-তপস্যা, সাধন-ভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না।" অতঃপর তিনি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিলেন, অপরদিকে তেমনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি চারিটায় শয্যাত্যাগান্তে সকলে অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকটে জপধ্যানে বসিবেন এবং পরে সেখানে ভজন

ও স্তবপাঠাদি হইবে। জপধ্যানান্তে আবার সমবেত সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গও হইত। এদিকে মঠের কার্যের যাহাতে ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একদিন কার্যের কথা ভুলিয়া সকলে উপদেশশ্রবণে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দজীকে উঁকি মারিতে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরাম-দা, কি খবর?" তিনি যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরসেবা আছে যে।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাবে সকলকে বিদায় দিলেন। কর্ম-সম্বন্ধে কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "ভগবান-লাভের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তোমরা বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর?" অথবা বলিতেন, "কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।" আরও বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কর্মে কোন বন্ধন আসে না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেন, "কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" "বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেসে যায়।" তাঁহার মতে সমাজসেবকদের জীবনেও ধর্মভাব থাকা একান্ত আবশ্যক; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এই ভাব ইংরেজি শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না—তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।" পাঠকের মন ইহাতে সায় দিয়া সহজেই বলিবে, "ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রেরই উপযুক্ত উপদেশ।"

মঠ-মিশনের গুরুদায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত থাকায় উহার অভাব-অনটনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চে তুলিয়া ধরিতেন, সঙ্ঘের জীবনেও তেমনি তাঁহার দৃষ্টিতে ত্যাগের আসন ছিল অতি ঊর্ধ্বে। একবার পুত্রশোকে কাতর জনৈক ধনী ব্যবসায়ী কিছুদিন বেলুড় মঠের পার্শ্বে বাস করিয়া উহার ভাবধারায় মুগ্ধ হন এবং প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়টি লোককল্যাণার্থে সাধুদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। এই সংবাদটি স্বামী প্রেমানন্দ যেমনি মহারাজকে শুনাইলেন, অমনি তিনি সন্ত্রস্তভাবে করজোড়ে বলিলেন, "বাবুরাম-দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে?" বলা বাহুল্য, ঐ প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যাত হইল।

স্বভাবতই শান্ত ও গম্ভীর মহারাজের অন্তরের ভাবরাশি যে অকস্মাৎ কিরূপে স্বীয় ভাস্বর সৌন্দর্য বিকাশপূর্বক সকলকে বিহ্বল করিত, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বেলুড় মঠে সংঘটিত ঐরূপ আর একটি উদাহরণ দিলে পাঠক উহা আরও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে আন্দুলের কালীকীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও মঠে আসিয়াছেন। চারিদিকে একটা অতি গম্ভীর পরিবেশ। ইহারই মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মহারাজকে কীর্তনস্থলে লইয়া গেলেন। মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়াই অনুপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বোধ হইল যেন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—দেহমাত্র তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দুলিতেছে। অমনি স্বামী সারদানন্দের ইঙ্গিতে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনা হইল। ভিতরে আসিয়াও সে ভাবসমাধি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। অবশেষে শ্রীশ্রীমা আসিয়া সস্নেহে আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন।

সঙ্ঘের নেতা হিসাবে তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—উপদেশ পালিত হইতেছে কিনা, ইহাও দেখিতেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি রাত্রে উঠিয়া প্রতিগৃহে যাইয়া সন্ধান লইতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন করিতেছেন কিনা। তাঁহার মতে রাত্রিকাল মনঃসমাধানের পক্ষে অতি অনুকূল; আর তিনি স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই হইবেন সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। মাদ্রাজ মঠে একদা জনৈক ভক্তের আনীত ফুলগুলি সেবক তাঁহার গৃহে সাজাইতেছে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কিছু ফুল ঠাকুরের জন্য রেখেছিস তো?" সেবক জানাইলেন যে, রাখা হয় নাই; আর মনে মনে ভাবিলেন, "ঠাকুরঘরে তো শুধু পটে পূজা হয়, শ্রীগুরুর মধ্যে জীবন্ত ভগবান আছেন।" মহারাজ মনের কথা ধরিতে পারিতেন; তাই ঐ ভাবেই প্রশ্ন করিয়া সব জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতে দেন না। কাজেই অধ্যক্ষকে ডাকিয়া ঐরূপ সুযোগ দিতে বলিলেন, আর সেবককে উপদেশ দিলেন, "মনকে একাগ্র করতে হলে এমন মূর্তি আর কোথায় পাবি?" সেবক ইহার পর পূজা করিয়া সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু শাসন ও উপদেশপ্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—উহার মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শও ছিল। একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অপর সেবকগণ অভিযোগ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন; তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার—আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।"

অপরের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ দেখিলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন এবং

মহাপুরুষদের জীবনে জীবের প্রতি করুণার কাহিনী তাঁহাকে অভিভূত করিত; এমন কি, স্থলবিশেষ তিনি তাঁহাদিগকে অনুসরণ পর্যন্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দীক্ষার্থীদের নির্বাচনে তিনি অতি সাবধান ও বিচারপরায়ণ হইলেও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রামানুজাভিনয় দেখিতে যাইয়া উক্ত আচার্যের আচণ্ডালে মন্ত্রবিতরণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

মহারাজের মনের আর একটা দিক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সর্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল এই মনকে দৈনন্দিন কার্যের জন্য কোন আলোচনা সভায় নামাইয়া আনা বড় সহজ ছিল না। ঐরূপ সময়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সভায় যাইবেন না; কারণ শরীর ভাল নহে। অথচ একবার যদি অনুনয়-বিনয় সহায়ে তাঁহাকে আলোচনা স্থলে উপস্থিত করা হইত, তবে মঠ-মিশনের সর্ব বিষয়ে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও তত্তৎ বিষয়ে অনিন্দনীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং বিনা দ্বিধায় উহা মানিয়া লইতেন। সভার বাহিরেও এই আত্মনিমগ্ন মহাপুরুষের ইঙ্গিতে বা আদেশে মঠের সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে পরিচালিত হইত, মঠের প্রত্যেক সাধু-ব্রহ্মচারীর চিত্ত উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এবং মঠভূমি দুর্লভ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে সুসজ্জিত হইত।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রেমসম্বন্ধের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। এখন অপরের সহিত এই সপ্রেম ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বামী অখণ্ডানন্দ একবার মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারগাছি গমনোদ্দেশে রাত্রে রেলস্টেশনে যাইতে উদ্যত হইলে মহারাজ গোপনে পালকি বাহকদিগকে কি যেন বলিয়া দিলেন। ফলে তাহারা অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গেলে অখণ্ডানন্দকে পূর্বস্থানে উপস্থিত করিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; অখণ্ডানন্দজী চক্ষু মেলিয়া অবস্থা বুঝিলেন, আর অমনি মহারাজপ্রমুখ সকলে সেই আমোদে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। হাস্যপরিহাস ছাড়াও এই বন্ধুপ্রীতির প্রকাশ অন্যভাবে হইত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্ররোগের বৃদ্ধি হইলে মহারাজ সেবকরূপে একজন ব্রহ্মচারীকে দেরাদুনে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং চিঠিতে লিখিয়া দেন যে, একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া যেন স্বতন্ত্রভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়—মহারাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। বেলুড় মঠের সম্মুখের পোস্তা ও ঘাট-নির্মাণকালে অনুমানাপেক্ষা অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় কার্যনিরত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে পর্যন্ত যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না, তখন মহারাজ ঐ সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন

এবং অম্লানবদনে স্বামীজীর সমস্ত ভর্ৎসনা সহ্য করিলেন যেন অপরাধ তাঁহারই। স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় রত হইলে তিনি উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন, "তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception (জমকালো অভ্যর্থনা), এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।"

মহারাজ অপরের মনকে কত সহজে উচ্চসুরে বাঁধিয়া দিতে পারিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মহাকবি ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশবাবুর জীবনে পাওয়া যায়। তখন তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বোধ করিতেছেন, তাঁহার ভক্তি যেন শুকাইয়া গিয়াছে, এবং তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে যেসব সাধু আসিতেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি ইহা বলিলেও সে যন্ত্রণা একই ভাবে চলিতে থাকে। অবশেষে মহরাজকে ঐ বিষয়ে বলিলে তিনি উচ্চহাস্যসহকারে কহিলেন, "ঐ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? সমুদ্রের ঢেউ উঠে-নামে—মনের স্বভাবও তাই। কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আপনার এখন যে এরূপ হচ্ছে, তার মানে, আপনি শিগ্‌গিরই খুব উপরে উঠবেন; মনের ঢেউ একটু শক্তি অর্জন করে নিচ্ছে মাত্র।" মহারাজ চলিয়া গেলে গিরিশবাবুর বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণের শুষ্কতা কাটিয়া গিয়াছে, বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মন উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হইয়াছে।

তাঁহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শিষ্যরক্ষার দৃষ্টান্তও সমভাবে চমকপ্রদ। একদিন তিনি স্বামী প্রভবানন্দ ও অপর একজন শিষ্যের সহিত বেড়াইতেছেন, এমন সময় রব উঠিল, "পালাও পালাও", আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, একটি ষাঁড় মাথা নিচু করিয়া ঐদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তখনই শিষ্যদ্বয় মহারাজের রক্ষার জন্য সম্মুখে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি দৃঢ়হস্তে উভয়কে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষাঁড় সেখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং মাথা নাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আর একবার তিনি স্বামী অখিলানন্দ ও একজন ভক্তের সহিত ভুবনেশ্বরের জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি বাঘ তাঁহাদের সম্মুখে প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়িলে মহারাজ অচঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাঘও থামিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া পলাইয়া গেল।

যাহা হউক, মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া জীবনেতিহাসের ধারায় ফিরিতে হইবে।

মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম-মন্দিরে যাইয়া বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে রামলাল-দাদা তাঁহার সাক্ষাৎমানসে সেখানে আসিলেন। দাদাকে

দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও হাস্যকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। সেইদিন রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "দাদা, আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো—ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে।" বেলুড় মঠে ঐরূপ অনাবিল রঙ্গরসে দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহা চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু মহারাজের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে যথাসময়ে সন্ধ্যায় অপূর্বসাজে সজ্জিত হইয়া বলরাম-মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ প্রভৃতির সম্মুখে আসরে নামিতে হইল। তিনি হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে ঢপ-কীর্তনের সুরে গান ধরিলেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মতো—
(ও তোর) মন মানে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল একহেটো জল,
এখন যমুনা অতল—সাঁতার দিতে হবে;
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধুলা লাগিবে—
(বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
—না হয় ব্রজনারীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে॥"

গান ও গানের আখর শুনিতে শুনিতে মহারাজের সহাস্য বদন সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। গানের প্রতি চরণ কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল, প্রতি ভাবে কোন্ বিরহ সমস্ত আমোদ-প্রমোদের উপর ঘনযবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল যখন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তখন তার আর দেহ থাকবে না।" আজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয়া অবতীর্ণ হইল? তরল হাস্যকৌতুক এতটা গাম্ভীর্যে পরিণত হইবে—ইহা কে ভাবিয়াছিল?

ইহার কয়েকদিন পরে শিবরাত্রিব্রত-উদ্‌যাপনান্তে মহারাজ বেলুড়ে আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার পুনঃ বলরাম-মন্দিরে যাত্রার দিন প্রাতঃকালে সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া তিনি স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের স্থান নির্দেশপূর্বক বলিলেন, "স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মিত হয়।" অনন্তর স্বামীজীর নির্দেশানুসারে অঙ্কিত মন্দিরের নক্সাটি আনাইয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেন—যেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই মহৎ কার্যটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ইহা স্বামীজী দায়স্বরূপ সঙ্ঘের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বলরাম-মন্দিরে আগমনান্তে দিনকয়েক স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত হইল; কিন্তু ২৪ মার্চ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। সকলের পরামর্শানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভপূর্বক অন্নপথ্য করিলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সদানন্দ জীবন্মুক্ত মহারাজের হাস্যকৌতুক সমভাবেই চলিত এবং দুশ্চিন্তার মধ্যেও ভক্ত ও সেবকদের হৃদয়ে আনন্দ আনিয়া দিত। তাঁহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে হল-গৃহে লইয়া যাইবার কালে তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, মরা হাতি লাখ টাকা!" মহারাজ এমনই কৌতুক-সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ স্থূল দেহের প্রতি সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, এই দুঃসময়েও সেবকগণ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলত রোগের উপশম ও এই রকম সকৌতুক ব্যবহারে সকলের হৃদয় ক্রমে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু উহা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নিদারুণ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিবহির্ভূত করিলেও পরক্ষণেই তাঁহারা সচকিতে দেখিলেন, তাঁহারা প্রতিকারহীন ও চিত্তবিভ্রমকারী এক ভয়ানক সঙ্কটের সম্মুখীন। অন্নপথ্য করিবার দুই দিন পরেই মহারাজের বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দিল। তজ্জন্য প্রথমে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব হইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন, "হাকিমিটা আর বাকি থাকে কেন?" নির্বিকার নিত্যসিদ্ধ পুরুষ তখন স্বদেহকে একটা পৃথক জড়বস্তুরূপে দেখিয়া রোগের চিকিৎসা ও উহার ফলাফল সম্বন্ধে এমনি সম্পূর্ণ উদাসীন! যাহা হউক, কবিরাজ শ্যামাদাসবাবু আসিলেন। সদানন্দ মহারাজ তাঁহার বিভূতিমণ্ডিত কপাল দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য আর সবই মিথ্যা।" কোন্ অর্থে এই মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল তাহা মহারাজই জানেন। ভক্তেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

ক্রমে ২৫ চৈত্র (৮ এপ্রিল) শনিবার আসিল। সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগকে নিকটে ডাকিয়া মহারাজ একে একে সকলকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভয় পেও না; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" আর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল সন্তানের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় বলিলেন, "বাবারা, যে যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক।" সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন—ধ্যান-নিমগ্ন মহাপুরুষ যেন ক্রমশ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সাগ্রহ সস্মিত বাণী উঠিল, "এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল; দে দে আমায়

ঘুংঙুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব—ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্-ঝুম্! কৃষ্ণ এসেছ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই। আহা-হা, কি সুন্দর আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ—এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়।" মহারাজ নীরব হইলেন। এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ এপ্রিল, ২৭ চৈত্র, সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলবারে সেই পূত দেহ বেলুড় মঠে আনীত ও পুষ্প-চন্দন-ধূপ-অগুরু প্রভৃতির সহিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুত হইল।

# স্বামী যোগানন্দ

স্বামী যোগানন্দ অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—"প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর ইহাকে দেখিয়া এবং ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদের অন্যতম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।" স্বামীজী বলিতেন—"আমাদিগের ভিতর যদি সর্বতোভাবে কেহ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।" নিরঞ্জনানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুমি আমাদের মাথার মণি।" বলা বাহুল্য যে, এরূপ উচ্চ প্রশংসার যিনি অধিকারী তিনি অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ। বস্তুত সরল, মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী, মাতৃভক্ত ও শুকদেবের ন্যায় পরম পবিত্র যোগানন্দ শুধু রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন, যেকোনও সমাজ বা কালের 'মাথার মণি'।

স্বামী যোগানন্দের পূর্ব নাম যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (১২৬৭ সালের ১৮ চৈত্র চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে) শনিবার, ইঁহার জন্ম হয়। পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; সেই জন্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষয়বিমুখতার ফলে অচিরেই দারিদ্র্যগ্রস্ত হন। যোগীনের তখন মাত্র কৈশোর। পিতা আশা পোষণ করিতে লাগিলেন, যোগীন বড় হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিবে এবং দারিদ্র্যেরও লাঘব করিবে; কিন্তু ঐরূপ কোন লক্ষণ যোগীনের চরিত্রে দেখা গেল না। বরং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানলাভের জন্য স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। তিনি নিজেই বলিতেন যে, অতি শৈশবকালে এক অভাবনীয় ভাবনায় তিনি বিভোর থাকিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুর ক্রীড়া চাপল্যের মধ্যেও অকস্মাৎ অনন্তের ডাক আসিয়া তাঁহাকে আনমনা করিয়া তুলিত—তিনি উদাসপ্রাণে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন, "এ কোথায় এসেছি? আমি তো এখানকার লোক নই!" তাঁহার মনে হইত, তিনি ঐ সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তারার মালা পরিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার খেলার সাথী ঐ ওখানে আছে—এখানে নয়। মাঝে মাঝে সে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইত।

ক্রমে যোগীনের উপনয়ন হইয়া গেল। এখন তিনি পূজাধ্যানাদির অধিকতর সুযোগ পাইয়া প্রাণে একটা তৃপ্তি অনুভব করিলেন এবং উহাতে অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকও পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বাটি প্রায়ই ভাগবতপাঠ ও কীর্তনাদিতে মুখরিত থাকায় তাঁহার ও সকলের মনে সর্বদা ধর্মভাব জাগরূক থাকিত।

যথাসময়ে পিতা তাঁহাকে আগরপাড়া মিশনারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠে নিরত থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির-সংলগ্ন উদ্যানের সন্নিকটেই তাঁহার গৃহ অবস্থিত থাকায় তিনি প্রায়ই তথায় ভ্রমণ করিতে আসিতেন। বিশেষত ধর্মপ্রাণ পিতা পুষ্পচয়ন ও গঙ্গাস্নানাদির জন্য প্রত্যহ রাসমণির দেবালয়ে যাতায়াত করিতেন। এইরূপে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সহিত তাঁহার আশৈশব সম্বন্ধ ছিল বলিলেই চলে। তিনি পরমহংসদেবের নামও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছাও পোষণ করিতেন; কিন্তু স্বভাবসুলভ লজ্জা ঘনিষ্ঠতার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিত। বিশেষত আলাপীদের মধ্যে তিনি তখন পর্যন্ত পরমহংসদেব সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণার আভাস পান নাই—বরং প্রদীপের ঠিক নিম্নস্থলে অন্ধকার থাকার ন্যায় যুগাবতারের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে তখন বিরুদ্ধ সমালোচনাই অধিক হইত।

ইতোমধ্যে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িয়া যোগীন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে উৎসুক হইলেন; কিন্তু পরিচয় করাইয়া দিবে কে? এমন সময় একদা ৺কালীবাড়ির উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার একটি ফুল পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইল এবং সম্মুখেই অতি সাধারণ পোশাক-পরিহিত একজনকে দেখিয়া ভাবিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাগানের মালি; সুতরাং ফুলটি তুলিয়া দিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। আদিষ্ট পুরুষ অম্লানবদনে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর একদিন যোগীন দেখিলেন এক গৃহে বসিয়া বহু ভদ্রলোক নিবিষ্টমনে সেই পূর্বদৃষ্ট মালির বাণী শুনিতেছেন, আর উপদেষ্টা অবিরাম তত্ত্বকথা বলিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, দক্ষিণেশ্বরের লোকেরা যাঁহাকে 'পাগলা বামুন' বলে এবং কেশবচন্দ্র যাঁহাকে 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ' বলিয়া প্রচার করেন, ইনিই তিনি। মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিল, "পাগল যদি হন, তবে এত লোক কেন?" ঔৎসুক্য জাগরিত হওয়ায় কি প্রসঙ্গ হইতেছে জানিবার জন্য তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দ্বারের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন।

যোগীন মৌনবিস্ময়ে কাষ্ঠবৎ বাহিরে দণ্ডায়মান, এমন সময় ঠাকুর একজনকে

আদেশ করিলেন, "বাইরে যারা আছে, তাদের ভেতরে নিয়ে এস।" বাহিরে যোগীন ব্যতীত আর কেহ ছিল না; আহূত হইয়া তিনি ভিতরে আসিয়া বসিলেন। প্রসঙ্গান্তে দূরাগত ভক্তেরা চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের নিকট আসিলেন এবং সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, "তবে তো তুমি আমাদের চেনা ঘর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি তখন কত যেতুম, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি শুনতাম—তোমাদের বাড়ির কর্তাদের ভেতর কেউ কেউ আমাকে বড় যত্ন করতেন।" তারপর অবশিষ্ট সকলের নিকট যোগীনের পরিচয় প্রদানসূত্রে বলিলেন, "এঁরা দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরী। এঁদের প্রতাপে সেকালে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত। এঁরা লোকের জাত দিতে নিতে পারতেন। ভক্তিমানও সব খুব ছিলেন—বাড়িতে কত ভাগবত-পুরাণাদি হতো। জানা শোনা হল, বেশ হল—এখানে যাওয়া-আসা করো। মহদ্বংশে জন্ম—তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার—খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।"

তদবধি যোগীন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট আসিতেন, কিন্তু অতি গোপনে—অপর কাহাকেও না জানাইয়া; কারণ দক্ষিণেশ্বরের লোকের দৃষ্টিতে ঠাকুর পাগল, আর তাহাদের মতে তিনি জাতিবিচার মানিতেন না। অতএব যোগীনের ভয় ছিল যে, উচ্চবংশসম্ভূত হইয়াও সদা-সর্বদা এই পাগলের নিকট যাতায়াত করিতেছেন ইহা জানিলে বাড়ির লোকেরা শুধু আপত্তি করিবে না, হয়তো একটা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসিবে। কিন্তু ক্রমে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সমবয়স্কেরা বিদ্রূপাদিও করিতে লাগিল। যোগীন তবু পশ্চাৎপদ হইলেন না; আর সৌভাগ্যবশত পিতা ও মাতা সব শুনিয়াও বাধা দিলেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, সে বাধা নিষ্ফল হইবে।

এই জানাজানির পরেও স্বভাবত নির্জনতাপ্রিয় যোগীন কখন আসিতেন বা কখন যাইতেন, কেহ টের পাইত না—এমন কি, ঠাকুরের ভক্তদের নিকটও উহা অজ্ঞাত থাকিত। ক্রমে ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল; তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষার পরে আর পড়াশুনা করিতে চাহিলেন না। কি করিয়াই বা পড়াশুনায় মন বসিবে? ঠাকুর তাঁহাকে যে-ভাবের ভাবুক করিয়াছেন, তাহার সহিত সাংসারিক শিক্ষার সামঞ্জস্য করা দুষ্কর। তিনি ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, কাম-কাঞ্চনত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরলাভের আশা দুরাশা মাত্র। এদিকে সংসারের অনটন তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতেছিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, দারপরিগ্রহপূর্বক সংসারে লিপ্ত না হইলেও চাকরি অবলম্বনে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক; তবে অবসরকাল তিনি নিজ সাধন-ভজনেই

কাটাইবেন। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে (আনুমানিক ১৮৮৪ ইং-তে) চাকুরির সন্ধানে কানপুরে তাঁহার মেসোর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কয়েক মাস চেষ্টার ফলেও কোন কাজ জুটিল না। ইহাতে একদিকে যোগীনের সুবিধাই হইল। তিনি দীর্ঘ অবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া ধ্যান-জপের সময় বাড়াইয়া দিলেন। যোগীন যতই অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, বাহিরে ততই তাঁহার গাম্ভীর্য ও উদাসভাব স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মেসোমহাশয় ইহা অচিরেই লক্ষ্য করিলেন এবং এতাদৃশ উচ্চ জীবনের সহিত পরিচিত না থাকায় ইহা অপ্রকৃতিস্থতার পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রতিকারকল্পে যোগীনের পিতাকে পত্র লিখিলেন—"ছেলে বড় হয়েছে, এখন বিয়ে না দিয়ে এমন করে রাখলে একেবারে বয়ে যাবে" ইত্যাদি।

চিঠি পাইয়া পিতা বিবাহের যাবতীয় আয়োজন ঠিক করিলেন; কিন্তু পুত্রের স্বভাব অবগত থাকায় তাহাকে কিছুই না জানাইয়া কানপুরে সংবাদ দিলেন— "যোগীনকে বাটিতে পাঠাইয়া দাও, বাটিতে অসুখ।" খবর পাইয়া যোগীন মনে করিলেন, হয়তো তাঁহার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন। যোগীনের মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়ায় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু বাড়িতে আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। একি? কোথায় কাহার অসুখ কাহারও মুখে কোন ভাবনা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই— শুধু রহিয়াছে অজ্ঞাত এক ভাবী উৎসবের ব্যস্ততা। কেহ কিছু না বলিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই সমস্তই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে—তাঁহার বিবাহ আসন্ন; আর মাত্র দুইদিন বাকি আছে। যোগীন আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। অবিবাহিত থাকিবেন—ইহাই তো তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প; কিন্তু আজ একি বিধির বিড়ম্বনা! যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া পিতাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কিন্তু পিতা তাহা শুনিবেন কেন? পুত্রকে কৌশলে রাজি করাইবেন— ইহা ভাবিয়াই না তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন? সেই ছেলের অবিবেচনায় ও অবাধ্যতায় আজ কি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে আর তিনি কন্যাপক্ষকে কথা দিয়া উহার রক্ষণে অসমর্থতা-নিবন্ধন সমাজের নিকট অপদস্থ হইবেন? পিতা এককালে ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন যে অবাধ্য যোগীনের মুখ দর্শন করিবেন না। বাড়ির লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। তখন যোগীনের মাতা ছেলের হাতদুখানি ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মাথা খাও, অমত করো না, কর্তার মুখ রাখ—তিনি কন্যাকর্তাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তুমি অমত করলে তাঁর অপমানের অবধি থাকবে না। তোমার ইচ্ছে না থাকলেও তুমি আমার জন্য বিয়ে কর।" ইহা বলিতে বলিতে জননী অশ্রুজলে ভাসিতে

লাগিলেন। কোমলহৃদয় মাতৃভক্তের পক্ষে সে অনুনয় উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। জননীর অশ্রুধারা তাঁহার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিকে শিথিল করিল, আর "তুমি আমার জন্য বে কর" মায়ের এই করুণ বাণী বার বার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সে ভিত্তি অকস্মাৎ ধ্বসিয়া পড়িল। মাতৃভক্তির বেদিতে স্বীয় সঙ্কল্পকে বলি দিয়া যোগীন বিবাহে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে নবপরিণীতা বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু যোগীনের বৈরাগ্য অটুট রহিল—বাসরগৃহে প্রবেশকালে তাঁহার বিষাদ-গম্ভীর হৃদয় মথিত করিয়া অস্ফুটধ্বনি উঠিল "হরিবোল, হরিবোল।

বিবাহ করিয়া যোগীন জননীকে সুখী করিতে পারিয়াছিলেন কিনা—জানি না; কিন্তু নিজের শান্তি যে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, তাঁহার উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যে একে একে আজ বিদায় লইতেছে—যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন ইহা তাঁহার নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিবাহ করিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন; সুতরাং মন্দিরোদ্যানের সেই প্রাণ-মন-হরণকারী ঠাকুরের নিকট আর তো যাওয়া চলিবে না। তিনি ভাবিলেন—"যে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না তার মতো হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আর ভালবাসবেন? তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। এখন আমার আর তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে?" এইরূপ নানা চিন্তার পর তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, আর ৺কালীমন্দিরে যাইবেন না।

ধীরে ধীরে যোগীনের বিবাহের সংবাদ ঠাকুরের নিকট পৌছিল। তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন লোকদ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। যোগীন তথাপি আসিলেন না, কিংবা ঠাকুরের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া ঠাকুর অবশেষে একদিন কোন এক পরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—"অমুকের ছেলে কি রকম লোক? কানপুরে যাবার আগে তাঁর নিকট এখানকার পয়সাকড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডেকে পাঠালেও আসে না। বোলো তো তাকে।"

এই সংবাদ পাইয়া যোগীন বড়ই মর্মাহত হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, মন্দিরের খাজাঞ্চী একটা জিনিসের জন্য কিছু পয়সা তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং উহা হইতে উদ্বৃত্ত আনা চার পয়সা খাজাঞ্চীকে দেওয়া হয় নাই, কারণ পূর্বোক্ত নানা হাঙ্গামায় তিনি ৺কালী-মন্দিরে যাইতে পারেন নাই; পরে যখন স্থির করিলেন যে আর ঠাকুরের নিকট যাইবেন না, অন্য উপায়ে পয়সা ফেরত পাঠাইয়া দিবেন, ঠিক সেই

সময়েই ঠাকুরের নিকট হইতে এই অভিযোগ আসিল। তখন অভিমানে এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া ভাবিলেন, "আমার সকল আশা-ভরসা গেছে বটে, তথাপি এখনও এত হীন হইনি যে, চুরি করব। তিনি কি আমাকে এতদূর খারাপ ঠাওরান না কি? যাই হোক, আজই সে পয়সা ফেলে দিয়ে আসব।" বড়ই ব্যথিতহৃদয়ে যোগীন ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বর-বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ছোট চৌকির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই ছোট ছেলের মতো কাপড়খানি বগলে ফেলিয়া কাছে আসিলেন। বহুদিন বাঞ্ছিত নিধিকে আজ একেবারে সম্মুখে পাইয়া ভাবময় পুরুষের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আজ তাঁহার সমস্ত দেহমনকে চকিত করিয়া তুলিল! হাত ধরিয়াই বলিলেন, "বে করেছিস—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি? (নিজ বক্ষে হস্ত রাখিয়া) এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না । তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তাকে এমন করে দেব যে, সে তোর ধর্মপথে সহায় ছাড়া কখনও বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার করতে না ইচ্ছে হয় তো বলিস, তোর মায়া মমতা সব খেয়ে ফেলব।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া যোগীন একেবারে বিমুগ্ধ! "বে করেছিস—তা কি হয়েছে?" এ কী নূতন কথা! যাহা শুনিলেন, স্বপ্ন না সত্য? "এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না"—দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা বামুন' এই বুকভরা আশার বাণী শুনাইয়া তাঁহার মনের গুরুভার অপসারিত করিলেন এবং চিরদিনের মতো তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। চারি গণ্ডা পয়সা ফেরত দিবার জন্যই না তিনি সেদিন মন্দিরে আসিয়াছিলেন, মন দিতে তো আসেন নাই! কিন্তু বার বার পয়সার উল্লেখ করাতেও ঠাকুর সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন না—শুধু বলিলেন, "ঐ ভাঙ্গা টিনের বাক্সে রেখে দে।" অতঃপর ঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না; শান্ত মনে তিনি সেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং তদবধি ৺কালী-মন্দিরে পুনর্বার যাতায়াত ও অধিকাংশ সময় ঠাকুরেরই কাছে যাপন করিতে লাগিলেন।

যোগীনের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি মা পর্যন্ত এই পুনর্মিলনকে পূর্বের ন্যায় সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কারণ ইতোমধ্যে বিবাহের বন্ধনে পড়িয়া যোগীন এক গুরুদায়িত্ব মানিয়া লইয়াছেন—তাহা স্বেচ্ছাকৃতই হউক বা পরেচ্ছাকৃতই হউক। পুত্রকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া জননী একদিন বলিয়াই ফেলিলেন, "যদি উপার্জনে মন দিবি না, তবে বিয়ে করলি কেন?" উত্তরে যোগীন বলিলেন, "আমি

তো ঐ সময়ে তোমাদিগকে বার বার বলেছিলুম বিয়ে করব না! তোমার কান্না সহ্য করতে না পেরেই তো শেষে ঐ কাজে রাজি হলুম।" ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া মা বলিলেন, "ওটা আবার একটা কথা! ভেতরে ইচ্ছা না হলে, তুই আমার জন্য বে করেছিস—এ কি সম্ভব?" মাতার ঐ কথা শুনিয়া যোগীন মহারাজ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বড়ই মর্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হা ভগবান! যাঁর কষ্ট না দেখতে পেরে তোমাকে ছাড়তে উদ্যত হলুম. তিনিই এই কথা বললেন! দূর হোক! এ সংসারে মন ও মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কারও নেই। কথায় আছে 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর'।" তাঁহার সরল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। ইহার পর তাঁহার বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়ায় তিনি ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে রাত্রিতেও বাস করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর স্বীয় সন্তানদিগকে তাঁহাদের নিজস্ব ভাব-অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতেন—কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। যোগীন প্রথম প্রথম আহারাদি সম্বন্ধে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, কাহারও বাটিতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। ঠাকুর ইহা সবিশেষ জানিতেন। একদিন তিনি যোগীনের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যোগীনের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই—মাত্র জলযোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহার আচারনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় উত্থাপন করেন নাই। সেইজন্য বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, "ওগো, এর (যোগীনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয়নি, একে কিছু খেতে দাও।" বলরামবাবু ঠাকুরের কথায় যোগীনকে সাদরে জলযোগ করাইলেন। বলরামের প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে ঠাকুর পবিত্র মনে করিতেন বলিয়া যোগীনের মনেও বলরামের গৃহ ও স্বয়ং বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল; তাই সেদিন নির্বিবাদে আহার করিতে পারিলেন।

এই প্রকার সহানুভূতিসম্পন্ন গুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার অধীনে যোগীনের জীবন গঠিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা ফুলিতে থাকিলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল বিধান দিলেন যে, লেবু খাইতে হবে। যোগীন উহা শুনিয়া প্রত্যহ দুইটি টাটকা লেবু আনিয়া ঠাকুরকে দিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন ঠাকুর উহার রস খাইতে পারিলেন না। ইহাতে যোগীন আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং অনুসন্ধানের ফলে অবগত হইলেন যে, যে বাগান হইতে তিনি লেবু আনিতেন, উহা সেইদিন হইতে অপরকে জমা দেওয়া হইয়াছে; মালিকের অজ্ঞাতসারে আনীত লেবু সাধুভোজনে লাগিল না।

সদ্বংশে জাত ও ধার্মিক পরিবারে শিক্ষিত যোগীন সংসারসম্বন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই শ্রেণীর লোককে সংসারের স্বার্থপর ব্যক্তিরা সহজেই প্রতারণা করে। ঠাকুরের কিন্তু শিক্ষা ছিল, "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?" যোগীনকেও একদিন ঐ শিক্ষাদানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। সেদিন যোগীন একখানা কড়া কিনিতে বাজারে গেলেন এবং দোকানীকে শুধু ধর্মভয় দেখাইলেই উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায়, এইরূপ বিশ্বাস থাকায় তাহার কথায় আস্থাস্থাপনপূর্বক নিজে পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আসিলেন। বাড়িতে আসিয়া কিন্তু দেখেন কড়াখানা ফাটা! ঠাকুর ইহা জানিয়া ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন, "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত গ্রহণ না করে চলে আসবি না।"

যোগীন ভাবুক ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জানা ছিল না যে, ভাবপ্রবণ বহু সাধক মিথ্যা সাত্ত্বিকতার মোহে আপন মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া জীবনে অযথা কষ্ট ডাকিয়া আনেন এবং অপরেরও কষ্টের কারণ হন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শিক্ষকের সাবধানবাণী না শুনিয়া প্রতিকারের উপায়ও বন্ধ করিয়া ফেলেন। ঠাকুর সময় বুঝিয়া যোগীনকে এই বিষয়েও সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের বস্ত্রাদি যে বাক্সে থাকিত উহার মধ্যে আরসুলা বাসা করিয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইয়া যোগীনকে বলিলেন, "আরসুলাটাকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।" যোগীন আরসুলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন বটে, কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। ঠাকুর এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, আরসুলাটাকে মেরে ফেলেছিস তো?" যোগীন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।" ঠাকুর তখন তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মেরে ফেলতে বললুম—তুই কিনা সেটাকে ছেড়ে দিলি! যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি। নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়সকলেও নিজের মতে চলে পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হবে।"

কাশীপুরের উদ্যানে ঠাকুর একদিন পালো-দেওয়া ক্ষীর—যেমন কলকাতায় নিমন্ত্রণবাটিতে খাইতে পাওয়া যায়—খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারদের ইহাতে অমত ছিল না; অতএব যোগীন্দ্র পরদিন ভোরে ঐরূপ ক্ষীর কিনিয়া আনিতে

কলকাতায় চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে মনে চিন্তার উদয় হইল, "বাজারের ক্ষীরে পালো ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশানো থাকে—ঠাকুরের খেলে অসুখ বাড়বে না তো?" আবার ভাবিলেন, "ঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসা করিনি; তাই কোন ভক্তের দ্বারা ক্ষীর তৈরি করিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তো বিরক্ত হবেন না?" সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বলরাম-ভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিলে ভক্তরাও বাজারের ক্ষীরে আপত্তি জানাইয়া গৃহে উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু সকালে ক্ষীর প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না, তাই যোগীন্দ্রকে একবেলা সেখানে থাকিয়া আহারাদির পরে অপরাহ্ণে লইয়া যাইতে বলিলেন। যোগীনও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বেলা প্রায় চারিটায় সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ঠাকুর মধ্যাহ্নেই ক্ষীর খাইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা নিত্য খাইতেন তাহাই খাইলেন; পরে যোগীন উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হল, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এরূপ ক্ষীর নিয়ে এলি? তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক; ওকি খাওয়া চলবে? ও আমি খাব না।" বাস্তবিকই তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন না। শ্রীশ্রীমাকে আদেশ দিলেন, সমস্ত ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয় এবং বলিলেন, "ভক্তের দেওয়া জিনিস—ওর ভেতর গোপাল আছে—ও খেলেই আমার খাওয়া হবে।"

আর একদিন কলকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য যোগীন অপরাপর যাত্রীদের সহিত নৌকায় উঠিয়াছেন। আরোহীদের মধ্যে একজন ঐ কথা জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ এক ঢং আর কি? ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন, আর ধর্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন" ইত্যাদি। ঐ কথা শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরন্তু তাঁহার স্বভাব বড় শান্ত। সেইজন্য কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরকে না বুঝিয়া দুনিয়ার কত অজ্ঞ ব্যক্তি কত কি মনে করে তাহাতে ঠাকুরের মতো মহান ব্যক্তির কিছুই আসিয়া যায় না। ৺কালীমন্দিরে পৌঁছিয়া কথাচ্ছলে তিনি ঠাকুরের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ঠাকুর ঐসব কথায় কিছুই মনে করিবেন না। কিন্তু ফল অন্যরূপ হইল। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমায় অযথা নিন্দা করল, আর তুই কিনা তা চুপ করে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করবে। তুই মিথ্যা রটনার একটাও প্রতিবাদ করলি না?"

ইহা ভাবিলে কিন্তু ভুল হইবে যে, ঠাকুর সত্য সত্যই যোগীনকে অপরের সহিত

এই সব বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন; তিনি মাত্র তাঁহার মনের একটি দুর্বলতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অপর একটি অনুরূপ ক্ষেত্রে ঠাকুরের আচরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। দক্ষিণেশ্বরের জনৈকা কুখ্যাতা রমণী কালীমন্দিরের ঘাটে স্নানান্তে ফিরিবার পথে ঠাকুরকে দূর হইতে প্রণাম করিত এবং কখনও বা দুই-একটি কথাও বলিত। ইহা লইয়া গ্রামে আলোচনা হইতে লাগিল। দুষ্ট লোকের মুখে দুষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া যোগীন প্রতিবাদ জানাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ঠাকুর নির্মল চরিত্র; খোঁজ নিলেই পার।" এক ব্যক্তি তাহাই করিল এবং বন্ধুদিগকে পরে জানাইল, "তোমাদের পাল্লায় পড়ে আজ আমায় অপমানিত হতে হল। সে বলে, 'আমি দেহ বিকিয়েছি, কিন্তু এতই হীন নই যে, দেবচরিত্রে দোষ দেব। তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, আমার দেবতাকে অপমান কর' ইত্যাদি।" যোগীনের নিকট সমস্ত বিবরণটি শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "কত বাজে লোক কত কিছু বলে। তুই ওসব কথায় কান দিস কেন?" বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুল্যরূপ ঘটনায় বিচিত্র ও বিরুদ্ধ বিধান।

স্বীয় জীবনতরীর হাল ঠাকুরের হাতে তুলিয়া দিলেও যোগীন এক দিনেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সরল প্রকৃতির যুবক হইলেও তাঁহার মন যুগপ্রভাবে সন্দেহমুক্ত ছিল না। ইহার ফলে তিনি ঠাকুরকেও প্রতিক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইতেন। তবে তাঁহার আস্তিক মনে প্রতি পরীক্ষার পরে দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিত, নাস্তিকদের ন্যায় উহা ক্রমেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিত না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ পূজার প্রসাদের কিয়দংশ ঠাকুরের নিকট আসিত। "একদা ৺ফলহারিণী কালীপূজার পরদিন প্রায় বেলা ৮/৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারি ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।' রামলাল-দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন। এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন তখনও আসিল না, তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া উপস্থিত

হইলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁগা, ওঘরে (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হল নাকি? চিরকেলে মামুলী বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে—বড় অন্যায় কথা।' খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'এখনও আপনার ওখানে পৌঁছায় নি? বড় অন্যায় কথা। আমি এখনই পাঠাইয়া দিতেছি'।"

যোগীন তখন বালক হইলেও তাহার যথেষ্ট বংশগৌরববোধ ছিল, তাই কালী-বাড়ির খাজাঞ্চী প্রভৃতিকে একটা মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন না। অতএব সামান্য প্রসাদের জন্য ঠাকুরের এইরূপ দৌড়াদৌড়িকে ভাল চোখে দেখিলেন না। আবার যখন বুঝিলেন যে, ঠাকুর পেটরোগা—ঐসব কিছুই খাইতে পারিবেন না, তখন স্থির করিয়া ফেলিলেন, "বুঝিয়াছি! ঠাকুর হন আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চালকলা-বাঁধা পূজারি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু-না-একটু থাকবে তো? তাই আর কি!" "এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত ভক্ত-লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে! এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে-সব ভক্তেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে তারাই খায়। এতে রাসমণির যেজন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তারপর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা-সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যেজন্য দান, তার কিছুও অন্তত সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।' সামান্য একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে এতটা গভীর রহস্য! মুগ্ধ হইয়া যোগেন মহারাজ ভাবিলেন, 'ঠাকুরকে বুঝা দায়'।" (লীলাপ্রসঙ্গ)।

দক্ষিণেশ্বরে আর একবার ঠাকুরের উপদেশের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যোগীনের মনে দারুণ অবিশ্বাস উপস্থিত হইলে ঠাকুরের কৃপায় উহা দূরীভূত হইয়াছিল। ঘটনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গের' ভাষায় এইরূপ—

"স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মতো ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ (কামজয়-বিষয়ে) প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪/১৫ হইবে এবং অল্প দিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটিরে থাকিয়া নেতি ধৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন যে, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ

সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—ঐ সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন-একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, 'ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা আমার একটুও মনের মতো হল না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-টিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়—তাহলে এত লোক তো কচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাড়ির বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের ওপরই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা—কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি! ... তারপর ভাবলাম—'উনি যা বলছেন তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম'।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১৫-১৬ পৃঃ)

যোগীনের সন্দেহ ঠাকুরের উপদেশ বা লোকব্যবহারে মাত্র সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একদা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি সেদিন ঠাকুরের অনুমতিক্রমে কালীবাড়িতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। নানাবিধ ঈশ্বরীয় আলাপ-আলোচনাদিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেলে আহার-সমাপনান্তে উভয়ে একই ঘরে শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ মধ্য রাত্রে যোগীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠিয়া দেখেন, ঠাকুর ঘরে নাই—দরজা খোলা। ঠাকুর হয়তো বাহিরে পায়চারি করিতেছেন, এই ভাবিয়া যোগীন তাঁহার সন্ধানে বাহিরে গেলেন। একে গভীর রাত্রি তাহাতে নির্জন। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। যোগীন তথাপি ঠাকুরকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি তিনি পত্নীর নিকট শয়ন করিতে গিয়াছেন? তাহা হইলে মনমুখ এক করিয়া তিনিও কি কাজ করেন না? এই বিষয়ে তিনি পরে বলিয়াছিলেন—"ঐ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হয়ে পড়লুম। পরে স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও যা সত্য তা জানতে হবে। অনন্তর নিকটবর্তী

একস্থানে দাঁড়িয়ে নবতখানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরূপ করতে না করতে পঞ্চবটীর দিক থেকে চটিজুতার চট চট শব্দ শুনতে পেলুম এবং অবিলম্বে ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' তাঁর উপরে মিথ্যা সন্দেহ করেছি বলে লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলুম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখেই সকল কথা বুঝতে পারলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি'।" ঠাকুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আবার যোগীনের মন হইতেও সেদিন ঐ সময়ে আর এক অলৌকিক চিত্রদর্শনের ফলে চিরকালের মতো এই সন্দেহের যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার স্থানে প্রকটিত হইল অটুট শ্রদ্ধা ও ততোধিক ভালবাসা। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর দিক হইতে আসিতেছিলেন, তখন যোগীনের দৃষ্টি নহবতের উপর দিকে সহসা আকৃষ্ট হইলে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রালোকে মা সমাধিস্থা, আর তাঁহার এই অনুভূতি হইল যে, মা সাধারণ মানবী নহেন। সম্ভবত সেই দিন হইতেই যোগীন প্রকৃত মাতৃভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে স্বীয় জীবন প্রধানত মাতৃসেবায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পরে আমরা যোগীনের আবার দর্শন পাই কাশীপুরে। গুরুগতপ্রাণ যোগীন তখন নিজের দেহের কথা ভুলিয়া ঠাকুরের সেবায় রত আছেন। কিন্তু শরীরের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে; কাজেই তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সেবার ত্রুটি হবে বলে তোমরা নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ না; তোমাদের শরীর ভেঙ্গে গেলে আমার যত্ন করবে কে? তোমরা বাপু অসময়ে খাওয়া-দাওয়া করো না।" তদবধি ঠাকুর কাহাকেও অসময়ে খাইতে দিতেন না। শুধু ঠাকুরের সেবাতেই যে যোগীনের ঐকান্তিকতা দেখা যাইত তাহাই নহে; সেবার অবসরে তিনি বৃথাকর্মে বা বৃথালাপে যোগ না দিয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "কাশীপুরে এক সঙ্গেই ছিলুম; যোগীন খুব ধ্যান করত।"

কাশীপুরে ঠাকুরের স্মৃতির সহিত যোগীন আর একভাবে জড়িত হইয়া আছেন। মহাসমাধির আট নয় দিন পূর্বে একদিন হঠাৎ ঠাকুর যোগীনকে পঞ্জিকা আনিয়া ২৫ শ্রাবণ হইতে প্রতিদিনের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে শ্রাবণসংক্রান্তি পর্যন্ত সব দিনের বিশেষ বিবরণী পঠিত হইল। ৩১ শ্রাবণের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি শুনিয়াই ঠাকুর ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রাখিয়া দিতে বলিলেন। ঐ দিন শুভ পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ১টা ৬ মিনিটের সময় (১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রিঃ) ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পক্ষকাল পরেই শ্রীশ্রীমা (১৫ ভাদ্র) বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন যোগীন, লাটু, কালী, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী ও নিকুঞ্জদেবী। ইঁহারা পথে বৈদ্যনাথ, কাশীধাম ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। পথে ট্রেনে যোগীনের ভীষণ জ্বর হয়। যতক্ষণ হুঁশ ছিল, ততক্ষণ তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন, 'কি করে এঁদের বৃন্দাবনে নামাব।' এই সময় তিনি দেখিলেন যেন ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিকটেই বিকটাকৃতি জ্বরাসুর। সে বলিতেছে, "তোকে দেখে নিতুম; তা পারলুম না, তোর গুরু পরমহংসদেবের জন্য। তোকে এখনই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যাক্, এই বেটীকে (লাল কাপড়-পরা এক স্ত্রীমূর্তি দেখাইয়া) রসগোল্লা দিস।" ভোরেই জ্বর সারিয়া গেল। পরে জয়পুরে দেবাদি দর্শনকালে কোন এক মন্দিরে পূর্ববর্ণিত মূর্তি দেখিয়া তিনি সব কথা শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে জানাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই রসগোল্লার দোকান ছিল—দেবীকে ভোগ দেওয়া হইল। ঐ দেবী হয়তো শীতলা; হয়তো ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা যোগীন বসন্তরোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজকে এক বিশেষ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিবার জন্য মা ঠাকুরের নিকট আদেশ পাইলেন। তখন পর্যন্ত তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, এমন কি, দুই-তিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অপর সন্তানদের সহিত কথাও বলিতেন না। তাই প্রথমে ঐ আদেশকে মনের খেয়াল ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু পর পর তিন দিন ঐ ভাবে আদেশ পাইলেন। তাই যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে একটা কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বলিয়া যান নাই। অধিকন্তু তিনিও শ্রীমায়েরই মতো মন্ত্র গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন। তখন মা একদিন পূজাকালে ভাবাবেশে তাঁহাকে আহ্বানপূর্বক দীক্ষা দিয়া ঠাকুরের আদেশ পালন করিলেন।

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জদেবী একমাস থাকিয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন ও কালী মহারাজের সহিত কলকাতায় ফিরিয়া আসেন। লাটু মহারাজও কয়েক মাস পরেই কলকাতায় চলিয়া আসেন। সুতরাং অতঃপর মায়ের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব যোগীন মহারাজকেই লইতে হইল। বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা এক বৎসর বাস করেন। ইহারই মধ্যে একসময়ে তিনি পায়ে হাঁটিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন এবং সকলকে লইয়া হরিদ্বার দেখিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহারা ক্রমে জয়পুর, পুষ্কর ও প্রয়াগ হইয়া কলকাতায় উপস্থিত হন। এইবারে শ্রীশ্রীমা একপক্ষকাল কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া যোগীন মহারাজ ও গোলাপ-মার সঙ্গে কামারপুকুরে যান। মাকে কামারপুকুরে পৌঁছাইয়া দিয়া যোগীন মহারাজ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় তীর্থদর্শনে বাহির হন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তিনি অপর গুরুভ্রাতাদের ন্যায় সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি তপস্যায় নির্গত হইলেও দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিতে পারেন নাই—শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ খ্রিঃ-এর মধ্যভাগে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও তথায় আসিয়া মায়ের সেবাভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় বরাহনগর মঠ হইতে সাধুরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন-মা , যোগীন-মার জননী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত পুরীধামে গমন করেন। তখনও রেললাইন প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং সকলে কটক পর্যন্ত স্টিমারে গিয়া তথা হইতে গো-যানে পুরীধামে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমা যোগানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া পৌষ মাস পর্যন্ত (১৮৮৮ নভেম্বর হইতে ১৮৮৯ জানুয়ারি) নীলাচলে ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা কলকাতায় বলরাম মন্দিরে আগমন করেন এবং তিন চারি সপ্তাহ পরে আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর যাত্রা করেন। আঁটপুর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অভেদানন্দ, মাস্টার মহাশয়, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যোগানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুর যান। শ্রীশ্রীমা সেবারে প্রায় এক বৎসর কামারপুকুরে ছিলেন। ইত্যবসরে যোগানন্দ পুনর্বার তীর্থদর্শনে নির্গত হন।

তিনি বৈদ্যনাথ, গয়াধাম, প্রয়াগ, চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথাদি-দর্শনান্তে প্রয়াগে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসেন। সৌভাগ্যক্রমে অসুখ গুরুতর হয় নাই—পানি-বসন্ত মাত্র। দিন কয়েক ভুগিয়াই তিনি সুস্থ হইলেন। আরোগ্যলাভের পরেও যোগানন্দজী কিছুদিন প্রয়াগে ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি কলকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে বিবিধ ভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্বক মায়ের সেবা না করিয়া থাকিলেও কলকাতা ও বেলুড় প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে অথবা তীর্থদর্শনকালে যোগানন্দজী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানাদি সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল ইহাতে যোগানন্দ মহারাজের অজ্ঞাত জীবনের উপর অনেকটা আলোকসম্পাত হইবে।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে (১২৯৬ বঙ্গাব্দের শেষে) মা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বেলুড়ে রাজু গোমস্তার ভাড়াবাড়িতে বাস করেন। পরে কম্বুলিয়াটোলায় মাস্টার মহাশয়ের বাটিতে আসেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি বেলুড়ে ঘুষুড়িতে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। যোগানন্দজী এখানে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ভাদ্র মাস পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া মায়ের রক্তামাশয়রোগ হইলে তাঁহাকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আনা হয়; যোগানন্দ তখন বরাহনগর মঠে থাকিয়া মায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতঃপর মা বলরাম-মন্দিরে আসেন এবং ৺দুর্গাপূজার পরে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটি যান। পর বৎসর ১৩০০ সালের (১৮৯৩ খ্রিঃ) আষাঢ় মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে দোতলায় বাস করিতে থাকেন; সঙ্গে থাকিতেন গোলাপ-মা আর যোগীন-মা এবং বাহিরের নিচের বৈঠকখানায় তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাসে মা যখন কৈলোয়ারে বায়ুপরিবর্তনে যান তখন যোগানন্দও সঙ্গে গিয়াছিলেন। দুই মাস পরে কৈলোয়ার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা ১৩০১ সালের ৺দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত বেলুড়ে বাস করিয়া আঁটপুরে যান এবং সেখানে পূজার কয়দিন কাটাইয়া জয়রামবাটি চলিয়া যান। ঐ বৎসরের শেষভাগে স্বীয় গর্ভধারিণী প্রভৃতি এবং যোগানন্দজীর সহিত শ্রীশ্রীমা তীর্থদর্শনে গমন করেন এবং বৃন্দাবনে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করেন। অতঃপর মা কলকাতায় ফিরিয়া কিছুদিন সেখানে কাটাইয়া দেশে যান। ১৩০৩ সালের প্রথম ভাগে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বাগবাজারে 'গুদামওয়ালা' বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস বাস করেন। ঐ বাড়িতে সেবক যোগানন্দও থাকিতেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে কিংবা ১৩০৫ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে মা বোসপাড়া লেনের ১০/২ নং ভাড়াবাড়িতে আসিলে যোগানন্দজীও তাঁহার অনুসরণ করেন।

মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দকে কেহ সামান্য কিছু পয়সা দিলেও তিনি তাহা তুলিয়া রাখিতেন, যাহাতে মা কখনও তীর্থাদিতে গেলে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। এইরূপে দুই-চারি আনা করিয়া তিনি মায়ের জন্য ছয় শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ৺জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা প্রতিবৎসর বাসনাদি মাজিবার জন্য জয়রামবাটি যাইতেন—ইহা দেখিয়া যোগানন্দ মহারাজ পূজার জন্য কাঠের বারকোশ, লটকেন, সিংহাসনের চৌকি ইত্যাদি করাইয়া দিয়া মাকে বলিলেন, "তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।" পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিন বিঘা জমিও কিনিয়া দিয়াছিলেন।

যোগীন মহারাজ যে এতখানি মনপ্রাণ ঢালিয়া মায়ের সেবা করিতে পারিতেন,

ইহা শুধু তিনি মাকে দীক্ষাগুরুরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নহে। দীক্ষার পূর্বেও এই সেবা বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ থাকিত। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বেও শ্রীশ্রীমা যোগীনের উপর গৃহস্থালির অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। ঠাকুরের শ্যামপুকুরে বাসকালের প্রারম্ভে যোগীন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কাশীপুরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিরূপ ব্যবস্থাদি হইবে তাহা মা অনেক ক্ষেত্রে যোগীনের মারফত সকলকে জানাইয়া দিতেন। ঠাকুরের শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে দেখিয়া কোনও সেবক হতাশ হইয়া পড়িলে যোগীনকে দিয়া মা বলিয়া পাঠাইতেন, "ওকে হতাশ হতে মানা কর; তাঁর শরীর তো আজকাল একটু ভাল রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে হয়েছে" ইত্যাদি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে কাশীপুরের শ্মশানে মা যখন শোকে আত্মহারা, তখন যোগীন ও বাবুরামই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এইভাবে যোগীন সর্বদাই মাতৃসেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন। অপরে যেখানে পশ্চাৎপদ হইত, মা সেখানে যোগীনকে পাইতেন। একদিন হয়তো লাটুকে বাজার করিতে বলিলেন; খেয়ালী লাটুর মেজাজ তখন অন্যরূপ থাকায় তিনি রাজি হইলেন না। অমনি যোগীনের ডাক পড়িল—যোগীন অম্লানবদনে কাজ সারিয়া আসিলেন।

যোগীন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জননীরূপে পাইয়াছিলেন আর জানিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। মায়ের প্রতি তাঁহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহা একদিনকার ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শরৎ মহারাজ একবার তাঁহাকে বলিলেন, "যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কত রকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।" যোগানন্দ বলিলেন, "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, তিনি যা বলবেন তাই ঠিক।" এখানেই ক্ষান্ত না হইয়া তিনি তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। এইরূপেই শরৎ মহারাজ ক্রমে মায়ের সেবাধিকার পর্যন্ত পাইয়া ও সেই সুযোগে মাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রামকৃষ্ণসঙ্ঘে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন।

মায়ের সেবার ফলে পূতচরিত্র যোগানন্দজীর মনে এরূপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, এককালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মায়ের কৃপায় অবিকম্পিতপদে অনন্যসাধারণ পথে চলিতে সাহস পাইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথম বারে বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে, যোগীনের সহিত মায়ের সেবায় একজন ব্রহ্মচারীও নিযুক্ত রহিয়াছেন, তখন তিনি এই বিষয়ে স্বামী যোগানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণান্তে জানিতে চাহিলেন, "মায়ের নিকট

বহু প্রকারের লোকের আনা-গোনা আছে; সেখানে ব্রহ্মচারীর মন নিম্নগামী হইলে দায়ী হইবে কে?" যোগানন্দ সদর্পে বুকে হাত রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আমি।" সেবক যোগানন্দের এই 'আমি'র পশ্চাতে কাহার অদৃষ্টশক্তি প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে কি?

যোগীনের যেমন মাতৃভক্তি, মায়েরও তেমনি সন্তানবাৎসল্য। তাঁহার সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, "যোগীন কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জুন—ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের জন্য ভগবানের নরলীলার সাথী হয়েছে।" স্নেহপুত্তলী যোগীনের স্মৃতিও ছিল মায়ের নিকট আদরের। যোগানন্দ মাকে একখানি লেপ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে জনৈক ভক্তকে তুলাটা পিঁজাইয়া ও নূতন খোল দিয়া সংস্কার করাইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পরে বলিলেন, "না, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল—দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।" আর একবার যোগানন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে বলিয়াছিলেন, "যোগীনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না"; অধিকন্তু সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভার কি সকলে নিতে পারে? পারত যোগীন, আর পারে শরৎ।"

স্বামী যোগানন্দের মঠজীবনের ইতিবৃত্ত অন্যান্য সময়েরই ন্যায় প্রায়শ অজ্ঞাত। সুতরাং কাল ও সময়ানুযায়ী ঐ ঘটনাবলীকে সুসংবদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া তদবলম্বনে আমরা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। যোগীন মহারাজের চেহারা সুদীর্ঘ এবং শরীর অতি কৃশ ছিল। তাঁহার চক্ষু সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "যেন জগন্নাথের চোখ।" দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে তিনি এত ধ্যান করিতেন যে—চক্ষু লাল হইয়া থাকিত; তাই ঠাকুর বলিতেন, "অর্জুনের চোখের মতো।" মঠজীবনে তাঁহার এই 'অর্জুনচক্ষু' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই সময়ের চিত্র জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে—তিনি একদিন এই লম্বা, কৃশ ও অপূর্বনয়নযুক্ত সাধুটিকে বরাহনগরের মঠের দিকে যাইতে দেখেন। সন্ন্যাসী যোগানন্দের চরণ তখন রিক্ত, আবরণ একখানি মাত্র বহির্বাস, মস্তক মুণ্ডিত। তাঁহার পিঠে একটি ঝুলিতে আনাজ-তরকারি, আর ডান হাতে একটা হাঁড়ি। ঠাকুরসেবার এই সব দ্রব্যসম্ভার লইয়া দারুণ রৌদ্রে হাঁটিয়া চলিয়াছেন সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর; অথচ তাঁহার মুখ স্নিগ্ধ, প্রশান্ত!

দ্বিতীয় চিত্র বলরাম-মন্দিরে। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু মঠজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তা তখনও কাটিয়া যায় নাই। এইরূপ নিরাশার দিনেও স্বামী যোগানন্দের কণ্ঠে একটা বড় আশার বাণী উত্থিত হইয়াছিল। সেইদিন বলরাম-মন্দিরের বারান্দায় পদচারণ করিতে করিতে তিনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে

বলিয়াছিলেন, “যিশুর সময় কতকগুলো ত্যাগী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করেছিল, এইবার আর একবার কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করবে।” ঠাকুরের বাণীতে কতখানি বিশ্বাস থাকিলে ঐ সুদূর অতীতের ঘোর তিমিরে এই রকম আশার আলোক বিচ্ছুরিত হইতে পারে, পাঠক কি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন?

স্বামী শিবানন্দের মতে যোগীন মহারাজ খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন; আলমবাজারের মঠে বাসকালে তিনি একদিন ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা ভঙ্গিসহকারে মঠবাসীদিগের নিকট বলিয়া সকলকে আমোদিত করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, “মাগীটার আছে কি? একখানা খোড়ো ঘর, দুখানা ছেঁড়া কাঁথা, আর একটি তামার ঘটি! হায়রে, বলে কিনা তারই বাড়িতে চুরি করতে গেছি!” বলা বাহুল্য যে, সন্ন্যাসী যোগানন্দ তখন মানাপমানের অতীত হইয়া সহজ আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন।

তিনি খুব নির্জনতা ভালবাসিতেন। একটু গীতা উপনিষদ্ ইত্যাদি ছাড়া তিনি শাস্ত্রাদি পড়াশুনা বেশি করেন নাই। কিন্তু স্বেচ্ছায় বৃত তপস্যা তিনি খুবই করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত প্রয়াগে তপস্যা করেন। অতঃপর ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীতে যান এবং সীতারামের ছত্রের সম্মুখে থাকিয়া গভীর ধ্যান, ভজন ও কঠোর তপস্যায় রত হন। ঐ সময়ে বারংবার ভিক্ষার জন্য সময় নষ্ট না করিয়া একবারের ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটিগুলি রাখিয়া দিতেন, এবং উহারই একটু একটু জলে ভিজাইয়া তিন চারি দিন ধরিয়া খাইতেন। সম্ভবত এইরূপ কঠোরতার ফলে তিনি পরে দারুণ উদরাময়ে আক্রান্ত হন এবং উহা তাঁহার দেহত্যাগের কারণ হয়। যাহা হউক, কাশীবাসীরা নির্ঝঞ্ঝাট যোগানন্দকে শ্রদ্ধা করিত; তাই ঐ বৎসর কাশীতে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইলেও নিঃসঙ্কোচ-ভ্রমণশীল তাঁহাকে কেহ স্পর্শমাত্র করিত না। ইহার পর কঠোরতাসম্ভূত অজীর্ণ-রোগ লইয়া মে মাসে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন এবং আগস্ট মাসে আবার কাশীধাম হইয়া প্রয়াগে যান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকমাস সেখানে বাস করেন।

এইরূপ অন্তর্মুখ হইয়া থাকিলেও জগতের দুঃখাদি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার গ্রামের একব্যক্তি রেল-দুর্ঘটনায় মারা গেলে ঐ ব্যক্তির পরিবার অসহায় হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ ব্যথা লাগে এবং তিনি তাহাদিগকে কিছু টাকার সংস্থান করিয়া দেন।

‘কথামৃত’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বিষয়েও তাঁহার একটু হাত ছিল। মাস্টার মহাশয় তখন অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে ‘কথামৃত’ ছাপাইতেছিলেন। যোগানন্দের ইচ্ছা

যে, উহা বড় পুস্তকাকারে বাহির হয়; তাই তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিলেন। অতঃপর মাস্টার মহাশয় মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা তাঁহাকে পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন। মাস্টার মহাশয় সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সন্তানদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহাদের সকলেরই যেন একটা সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল—স্থলে স্থলে উহা বিকশিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিত। যোগানন্দের শাস্ত্রচর্চাও ঐরূপ এক চমকপ্রদ ব্যাপার। শ্রীশ্রীমা যখন বোসপাড়ার বাড়িতে থাকিতেন তখন যোগানন্দ গিরিশবাবুর বাড়িতে নিয়মিতভাবে ভক্তদের লইয়া শাস্ত্রপাঠাদি করিতেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রায়ই বিবিধ আলোচনায় যোগ দিতেন ও সভাপতিত্ব করিতেন।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল বড়ই ঘনিষ্ঠ, বড়ই প্রেমপূর্ণ। পরস্পরের প্রতি ইঁহাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও সহজ বাক্যালাপ দেখিলে অপরিচিতেরা ইহাদের অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনেক ক্ষেত্রে মনে করিতেন, বুঝিবা মনোমালিন্যেরই একটা অবাঞ্ছনীয় অভিনয় চলিতেছে। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর এই অভিনয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, পরন্তু অচিরেই সকলে উহার মর্মার্থ বুঝিয়া ঐসব সৌহার্দ্যপূর্ণ কলহে আনন্দই পাইতেন। ঠিক এইভাবেই একদিন বলরামবাবুর গৃহে স্বামীজীর সহিত তাঁহার তর্ক উপস্থিত হয়। স্বামীজীর আরব্ধ ও পরিকল্পিত কার্যাবলীতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যোগানন্দজী আপত্তি তুলিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সেবাই এই যুগের সাধন হইবে, কারণ প্রাচীনমতে ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অতি বিরল। আর সেবা করিলে সাধনের সময় পাওয়া যায় না—ইহাও ঠিক নহে; কারণ এক ঘণ্টা ঠিক ঠিক মন স্থির করিতে পারিলে ভগবানলাভের আর বিলম্ব থাকে না। এইরূপ আলোচনা সেদিন বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ স্বামীজীকে কার্যান্তরে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যোগানন্দের মত অপরিবর্তিত থাকায় দুই বৎসর পরে আর একদিন ঐ মতভেদ অন্য ঘটনাবলম্বনে প্রকটিত হইল। সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া স্বামীজীর মত ও কার্যপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে

আলোচনা করেন। আলোচনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "আমরা সব বিষয়েই আপনাদের সহিত একমত; শুধু আপনাদের ঐ অবতারবাদে আমরা সায় দিতে পারি না।" স্বামীজী বলেন, "আমি তো ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করি না।" তখনই দেখা গেল যোগানন্দের চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে—"নরেন বলে কি?" শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া গেলেই তিনি এই বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠাইলেন এবং গুরুভাইদের অপর কেহ কেহ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, ঠাকুরই স্বামীজীকে বড় করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে অকৃতজ্ঞতা করা হয়। ইহাতে স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি যদি প্রচার না করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?" যোগানন্দজীও দমিবার পাত্র নহেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তিনি না থাকলে তুমি বড় জোর একজন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জির মতো বড় ব্যারিস্টার হতে।" আলোচনা ক্রমেই গম্ভীর হইতে থাকিলে সেদিন স্বামীজীর হৃদয়াবেগ এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি অশ্রু রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশপূর্বক ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং ঐ সমালোচনার ঐখানেই সমাপ্তি হইল। গুরুভ্রাতারা তখন সর্বদা সতর্ক থাকিতেন, যাহাতে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বামীজীর দুর্বল শরীরকে আরও দুর্বল না করিয়া ফেলে। যোগানন্দও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন; সেজন্য উক্ত ঘটনার এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং অপরের নিকটও তাহা প্রকাশ করিলেন। ফলত কথাচ্ছলে মতভেদ প্রকাশ পাইলেও গুরুভ্রাতাদের এমন একটি প্রীতির সংযোগক্ষেত্র ছিল যেখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বতই হইয়া যাইত। অতএব ঐ ঘটনার পরে স্বামীজী যখন একদিন যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, যোগা, তোরা কি আমায় কাজ করতে দিবি না? তোরা অবতার কি বলছিস, অবতার তো ছোট কথা, ঠাকুর যে বেদমূর্তি। আমি তাঁরই আদেশে কাজে নেমেছি"— যোগানন্দ তখনই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা তো চিরদিনই তোমার কথা মানি; তবু কি জান মাঝে মাঝে কেমন খটকা লাগে—ঠাকুরকে অন্যরূপ দেখেছি কিনা?"

এইটুকু বলিলেই কিন্তু উভয়ের মনোগত ভাব কিংবা পরস্পরের সৌহার্দ্যের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। স্বামী যোগানন্দ সত্যই বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবার বিরোধী ছিলেন না; বিরোধী হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালে উহার প্রথম উপসভাপতি হইবেন কেন এবং মিশনের বহু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া স্বামীজীর প্রারব্ধ কার্যের সহায়তা করিবেন কেন? আর ঠাকুরের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় বিশ্বাস-ভক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার মনে প্রকৃত কোন সন্দেহ ছিল না। তাই পূর্বোক্ত প্রথম দিনের তর্কের পরেই তিনি উপস্থিত একজনকে বলিয়াছিলেন, "আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কিনা ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ

তৈরি হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হতো, ধন্য হতুম।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "নরেন নর-ঋষির অবতার। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে।"

স্বামীজী জানিতেন এই সব ঘটনা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার, তাঁহাদের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন হইলেও ঠাকুর স্বীয় কার্যসাধনের জন্য তাঁহাদিগকে যে প্রীতিসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহাতে উহার ব্যাঘাত হইতে পারে না। কার্যতও দেখিতে পাই যে, যোগানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশনের উপসভাপতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারবুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। বেলুড় মঠের জন্য নির্বাচিত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিবার পূর্বে স্বামীজী যোগানন্দকেই পাকাপাকি ভাবে উহা দেখিবার জন্য পাঠান। তাঁহার সঙ্গে আরও জন কয়েক ভক্ত নৌকাযোগে সেখানে যান। জমি দেখিয়া সকলেই খুব তুষ্ট হন এবং নানাকথা বলিতে থাকেন। জনৈক ভক্ত বলেন, "দুটি পুকুর আছে, এতে যে পদ্ম জন্মাবে তাতে ঠাকুরের পূজা হবে।" যোগানন্দ কোন কথায় যোগ না দিয়া ঘুরিয়া জমি দেখিতে থাকেন। তখন তাঁহার মুখে একটা সন্তোষ ও দিব্যভাবের স্ফূর্তি হইয়াছিল। এবং ভূমি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সুন্দর জমি।" মঠে ফিরিয়া তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "ফলাও জমি, সুন্দর; তুমি একবার দেখে এস।" কিন্তু স্বামীজী তাঁহারই কথায় বিশ্বাস করিয়া আর উহা দেখিতে যান নাই।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যোগানন্দজী অগ্রণী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। ইহারও পূর্বে স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে কলকাতাবাসীরা টাউন হলে যখন তাঁহার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তখনও স্বামী অভেদানন্দের সহিত মিলিত হইয়া তিনি সমস্ত আয়োজন করেন। ইঁহাদের ভালবাসার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। যোগানন্দের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তাই আমেরিকা হইতে স্বামীজী প্রায়ই তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং অসুখের জন্য দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী যখন ১৮৯৭-এর মে মাসে আলমোড়ায় যান তখন যোগানন্দকেও সঙ্গে লইয়া যান এবং ২০ মে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়া পাঠান, "যোগেন আছে ভাল।" কিন্তু মাস দুই সেখানে থাকিয়াই যোগানন্দ ৯ জুলাই নিচে নামিলেন—আলমোড়া তাঁহার সহ্য হইল না। স্বামীজী দুঃখ করিয়া লিখিলেন, "যোগেন ভায়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন।" কলকাতায় ফিরিয়া তিনি শীঘ্রই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইতেছে

সংবাদ পাইয়া স্বামীজী পত্রে নির্দেশ দিলেন, "যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়—আসল ভেঙ্গেও টাকা খরচ করিবে।"

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই যোগানন্দ জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর কাটাইলেন। পেটরোগা লোক—ঝোল-ভাত খাইতেন। শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও ঠাকুরের কাজে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ পাইত। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহারই প্রেরণায়, উদ্যমে ও উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে বেশ ঘটা করিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় এবং তৎপরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর তিনি সেখানে উৎসব করেন। তিনি তখন প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন এবং উত্তর কলকাতার বহু লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। তাঁহার আকর্ষণে আহিরীটোলার অনেক স্বেচ্ছাসেবক উৎসবে যোগ দিয়া উহার সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিতেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সহিত কোনও বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ঐ বৎসর সেখানে উৎসব করা সম্ভব হইল না। কিন্তু যোগানন্দ ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে বিরাট উৎসব করাইলেন। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার শেষ উৎসব; কারণ পরবর্তী উৎসবের পূর্বেই তিনি ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমায়ের ২০/২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে শেষ রোগশয্যা গ্রহণ করেন।

শেষ অসুখের সময় পালাক্রমে অনেকে তাঁহার সেবা করিতেন। যখন তাঁহার দাঁত দিয়া রক্ত পড়িত ও তাহাতে মুখ ভরিয়া উঠিত, তখন উহা ফেলিবার জন্য মুখের কাছে কোনও পাত্র তুলিয়া ধরিতে হইত। মুখ বন্ধ থাকায় তিনি কথা বলিতে পারিতেন না, ইঙ্গিতমাত্র করিতেন। উহা বুঝিয়া লইয়া সেবক অগ্রসর না হইতে পারিলে এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। জনৈক যুবক ভক্ত একদিন সেবাকালে ঐরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে না পারায় যোগীন মহারাজ তাহাকে ধমক দেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সব ভুলিয়া গিয়া যুবকটিকে বলেন, "আমায় মাপ কর।" বিরক্ত সকলেই হয়; কিন্তু কেবল মহাপুরুষই বিরক্তিকে অতিক্রম করিয়া দেবভাব প্রকাশ করিতে পারেন! শেষ অসুখের সময় পিতামাতা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিলে দেখা গেল যে, তিনি তখন সমস্ত মায়িক সম্বন্ধের অতীত; তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভক্তিলাভ হোক।" ভগবানে বদ্ধচিত্ত যোগানন্দের তখন জাগতিক সম্বন্ধ-অবলম্বনে লৌকিকতা-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। যোগীন মহারাজের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজীর মনে যে কি বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তাঁহাকে

বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি মরি।" কিন্তু হায়, দৈব বড়ই নিষ্ঠুর! সে কাহারও সুখ-দুঃখ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না ফিরাইয়া আপনমনে স্বকার্য সাধন করিয়া চলে। যোগানন্দেরও আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগ দেওয়া যোগানন্দের সম্ভব হইল না। তখন বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে মঠেও বাস করা তাঁহার হইল না। স্বামীজী তাঁহাকে একদিন নৌকা করিয়া আনিয়া বেলুড় মঠ দেখাইয়া লইয়া গেলেন মাত্র।

অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বামী যোগানন্দের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট লইয়া আসেন। যোগানন্দজীর ইহাতে খুব আপত্তি ছিল এবং তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন এই শেষ মুহূর্তে আবার স্ত্রীর সেবাগ্রহণ করা কেন? শ্রীমা পত্নীকে নিকটে আনিয়া যোগানন্দজীকে কহিয়াছিলেন, "তুমি একে দু-একটি কথা বল, একটু উপদেশ দাও।" বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি যোগীন উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি ওসব পারব না, আপনি সেসব বুঝুন।" অতঃপর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃসেবার পর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ (১৩০৬ সালের ১৫ চৈত্র) শেষদিন উপস্থিত হইল। সেদিন স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যোগীন, ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আরও খুব বেশি মনে আছে, আরও বেশি, আরও বেশি।" অতঃপর অপরাহ্ণ তিনটা দশ মিনিটের সময় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একটি সমুজ্জ্বল উদীয়মান নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। স্বামীজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, "কড়ি খসলো! এবারে ধীরে ধীরে বর্গা সবও খসে পড়বে।" শ্রীশ্রীমাও ইহাতে মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ির একখানি ইট খসল; এবারে সব যাবে।"

# স্বামী প্রেমানন্দ

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। তাঁহাদের মধ্যে ঘোষ ও মিত্র বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি। স্বামী প্রেমানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী যথাক্রমে ঘোষ ও মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর ইঁহারা কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী একটি কন্যার মুখদর্শন করেন এবং পরে তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামক তিনটি পুত্র মাতঙ্গিনীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করেন। মধ্যম পুত্র বাবুরামই আমাদের স্বামী প্রেমানন্দ। ইঁহার জন্মকাল ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৬ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর, ১৮৬১), মঙ্গলবার, রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট, চান্দ্র অগ্রহায়ণ, শুক্লা নবমী তিথি। বাবুরামের জন্মগ্রহণের কিঞ্চিৎ পূর্বে কিংবা ঐ বৎসরই তারাপদ ঘোষ মহাশয় স্বীয় দুহিতা কৃষ্ণভাবিনীকে উড়িষ্যার কোঠারের জমিদার শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন এবং বাবুরামের জন্মের কয়েক বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

বাবুরাম ছিলেন বড় বংশের বড় আদরের দুলাল। কিন্তু তিনি যে সাধারণ সংসারী জীব নহেন, ইহা অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ যদি তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিয়া বিরক্ত করিত, তিনি অমনি অর্ধস্ফুট ভাষায় বলিয়া উঠিতেন, "না, বিয়ে দিও না; মরে যাব, মরে যাব।" কিশোর বয়সে নদীতীরে কোন সন্ন্যাসী দেখিলেই সময় ভুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপে মগ্ন হইতেন। আর অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি কল্পনা করিতেন, কোন সন্ন্যাসীর সহিত লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃক্ষলতাবৃত একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে কালযাপন করিতেছেন।

আঁটপুরের ঘোষপরিবার স্বীয় কুলদেবতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবায় বিশেষ রত ছিলেন। দানধ্যানাদি সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট সুযশ ছিল। এই ধর্মপরায়ণ পরিবারের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বাবুরাম শৈশব ও বাল্যের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া অতঃপর গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন-সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় আগমনপূর্বক চোরবাগানে স্বীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহাদের বাসস্থান কম্বুলিয়াটোলায় স্থানান্তরিত হয়। বাবুরাম প্রথমে 'এরিয়ান স্কুলে' এবং পরে 'মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে'র শ্যামপুকুর শাখায় ভর্তি হন।[১] দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মাস্টার মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি

---

১ 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' (১০ পৃঃ) অনুসারে বাবুরাম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অভেদানন্দের সহিত আহিরীটোলার যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' পড়িতেন।

যুগাবতারের প্রবল আকর্ষণে তাঁহার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াই মাত্র ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং ভক্তিমান কাহাকে কাহাকেও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিতেন। বাবুরাম এইরূপেই মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন। পরবর্তী কালে একদা মাস্টার মহাশয় বেলুড় মঠে আসিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপস্থিত সকলকে জানাইলেন, "এই তো এঁরই কৃপায় জীবন ধন্য হয়ে গেল। ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন, তা হলে কি ঠাকুরের কৃপা পেতুম?" মাস্টার মহাশয় কিন্তু ততোধিক বিনীতভাবে আপত্তি জানাইলেন, "ওসব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধসত্ত্ব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ—তিনিই টেনে নিয়েছিলেন।"

অবশ্য জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় ইতঃপূর্বেই বাবুরাম একদিন দৈবক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন—ঠাকুর সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাবুরাম তখন জানিতেন না যে ইনিই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব—যদিও তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত তুলসীরামের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন যাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের মতো মুহুর্মুহু ভাবসমাধি হয়। আবার বাবুরামের দক্ষিণেশ্বরে গমনের পূর্বেই তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত বলরাম বসু শ্রীরামকৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং বলরামের পরিবারে ঠাকুরের কথা অবিদিত ছিল না। বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর গমনের পর এই সূত্রগুলি ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আরও সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল যদিও বাবুরামের সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং উভয়ের বেশ হৃদ্যতাও ছিল, তথাপি বাবুরামের অজ্ঞাতসারেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পরে বাবুরাম ইহা অবগত হইলেন। তদবধি উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বহুকাল অতিবাহিত করিতেন এবং অনেক সময় একই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম মিলনদিবসেই[১] ঠাকুর বাবুরামকে সস্নেহে আপন জনের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবুরামের সুঠাম সুকোমল দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও ভক্তোচিত সুবিনীত আচরণ প্রভৃতি সদ্‌গুণ-দর্শনে তাঁহার চিনিতে বাকি রহিল না যে, মা যাঁহাদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। বাবুরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-নিরীক্ষণের ফলেও তাঁহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল; কারণ শ্রীমতী শ্রীরাধিকার অংশে যাঁহার জন্ম তিনি এইরূপ সর্বপ্রকার সুলক্ষণসম্পন্নই হইয়া থাকেন। সর্বশেষে যখন জানিলেন যে, তিনি ভক্তপ্রবর

১ সম্ভবত ১৮৮২-র শেষে ('কথামৃত' ৫/৩/২৬ দ্রঃ)।

বলরামের নিকট আত্মীয় এবং শ্রীমতীরই অংশে জাত কৃষ্ণভাবিনী ঠাকুরানীর ভ্রাতা তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বাবুরামও দক্ষিণেশ্বরে যেন স্বীয় শৈশবস্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখিতে পাইলেন—এই তো শৈশবের স্বপ্নানুরূপ পূতসলিলা সাগরবাহিনী সুরধুনী, সেই নির্জন পঞ্চবটী এবং তৎসংলগ্ন বহুতপস্যাপূত সাধনভূমি—কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ! আর এই তো সেই পরব্রহ্মে লীন লোকাতীতচরিত্র পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম মিলনের তিন চারিদিন পরেই ঠাকুরের ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত বাগবাজারে দেখা হইলে তিনি বাবুরামকে জানাইলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। দেবমানবের অপ্রাকৃত প্রেমের সহিত অপরিচিত বাবুরাম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "আমায় ডেকেছেন? কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তখনই পান নাই; কিন্তু পরে দক্ষিণেশ্বরে গমনান্তে নরেন্দ্রের জন্য ঠাকুরের আকুলতা দেখিয়া অলৌকিক প্রেম যে কি বস্তু, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন। সেদিন শনিবারে বিদ্যালয়ের ছুটির পর বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য রাখালের সহিত হাটখোলার নৌকায় উঠিলেন। ভক্ত রামদয়ালবাবু একই উদ্দেশ্যে সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দলে যোগ দিলেন। রাস্তায় রাখাল বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে থাকবে কি?" তখনও দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না হওয়ায় বাবুরাম প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "সেখানে থাকবার জায়গা হবে কি?" রাখাল সব জানিয়াও একটু বোধ হয় রহস্য করিয়াই বলিলেন, "হয়তো হয়ে যাবে।" আবার প্রশ্ন হইল, "রাত্রে খাবারের কি হবে?" রাখাল উত্তর দিলেন, "যেমন করে হোক হয়ে যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরে তাঁহারা যখন পৌঁছিলেন, তখন দিনমণি পশ্চিম দিঙ্‌মণ্ডল রক্তোজ্জ্বল করিয়া অস্তগামী হইয়াছেন। সন্ধ্যার শেষ আলোকে মন্দিরগুলি অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। ঐ সাক্ষাৎকারের কথা বাবুরাম স্বমুখে বর্ণনা করিয়াছেন, "ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে, এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্বে তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই জন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের মতো টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তপোশখানির

উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয়-জিজ্ঞাসান্তে আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজ-হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ'। ঐরূপে কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়ালবাবুকে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'সে অনেক দিন এখানে আসে নাই; তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে—একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্মবিষয়ক নানা কথায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে উঠানের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জন্য ঘরের ভিতরই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়ালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো ঘুমুলে'? আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম এবং বলিলাম, 'আঁজ্ঞে না'। উহা শুনিয়া বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো! সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র উপশম হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐ কথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকট পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল।" ('লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ—দিব্যভাব' ৬২-৬৩ পৃঃ)। মনে রাখিতে হইবে, নরেন্দ্রের সহিত বাবুরামের তখনও পরিচয় হয় নাই।

পরদিন সকালবেলা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলেন, অতি সুস্থ সহজ মানুষ—রাত্রিবেলার সেই চঞ্চলতা, সেই আকুলতা, সেই গামছা-নিংড়ানো ব্যথা নাই; ভীষণ ঝড়ের পরে সমুদ্রবক্ষ যেমন শান্ত স্থির হয় তেমনি প্রশান্তবদনে ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত। অতঃপর তাঁহার আদেশে বাবুরাম কিয়ৎক্ষণ পঞ্চবটীতে কাটাইয়া ঠাকুরকে এবং ৺কালীমন্দিরাদিতে প্রণামান্তে সেদিনকার মতো বিদায় লইলেন।

ইহার পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন রবিবার—কয়েক জন ভক্ত ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া সাদরে কহিলেন, "বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। পঞ্চবটীর দিকে যাও—সেখানে তারা চড়ুইভাতি করছে। নরেনও এসেছে—গিয়ে তার সঙ্গে কথা বল।" পঞ্চবটীর নিকটে গিয়া তিনি দেখিলেন রাখাল সেখানে বসিয়া আছেন, এতদ্ব্যতীত অপরাপর যুবক ভক্তও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রের গুণাবলী তিনি পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন; আজ বাঞ্ছিত জনকে অতি নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আপন শ্বশ্রূমাতাকে ইহার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী ঠাকুরানীর ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং ইষ্ট-লাভের জন্য তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বাবুরামের আগমনের পরে একদিন মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "এই ছেলেটিকে তুমি আমায় দাও।" এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যাচ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া মাতঙ্গিনী উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনার নিকট বাবুরাম থাকবে, এ তো অতি সৌভাগ্যের কথা।" বাবুরামের মনও তখন পরমহংসদেবের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের জন্য লালায়িত ছিল; অতএব ঠাকুরের আহ্বান ও গর্ভধারিণীর সম্মতি পাইয়া তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কালে পরম কারুণিক ঠাকুরের স্নেহ শতধা প্রকাশিত হইত। বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ও আমার দরদী।" আবার সুর করিয়া গাহিতেন,

"মনের কথা কইব কি সই?—কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।"

পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের ভালবাসার উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে বলিতেন, "আমি কি আর তোদের ভালবাসি? যদি ভালবাসতাম তা হলে তোরা আমার আজীবন গোলাম হয়ে থাকতিস। আহা, ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন! তার শতাংশের এক ভাগও আমরা তোদের ভালবাসি না। কোন কোন দিন রাত্রে তাঁকে হাওয়া করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম; তিনি আমাকে তাঁর মশারির ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। আমি আপত্তি করতুম, কারণ তাঁর বিছানা আমার ব্যবহার করা কি ঠিক? তাতে তিনি বলতেন, 'বাইরে তোকে মশায় কামড়াবে; যখন দরকার হবে আমি জাগিয়ে দেব'।"

বাবুরাম কলকাতা হইতে দীর্ঘকাল না ফিরিলে ঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার জন্য ছুটিয়া দারুণ গ্রীষ্মকালেও কলকাতায় যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৫

খ্রিস্টাব্দের এক চৈত্রের দিনে বলরাম-মন্দিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বলে ফেলেছি—তিনটের সময় যাব, তাই আসছি, কিন্তু বড় ধুপ।... ছোট নরেনের জন্য বাবুরামের জন্য এলাম।" ('কথামৃত' ৩য় ভাগ, ১৪৩ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৭৮৫)। বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "নৈকষ্য কুলীন, হাড় শুদ্ধ।" ভাবমুখে তিনি দেখিয়াছিলেন, বাবুরাম "দেবীমূর্তি, গলায় হার, সখী সঙ্গে", আর বলিয়াছিলেন, "ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে। কি জানো, দেহরক্ষার অসুবিধা হচ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১১২ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৬০)। আর একদিন বলিয়াছিলেন, "কাল ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল, তাই বাবুরামকে নিয়ে যাই—দরদী" (ঐ, ১৫২পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫২১)। ভাবাবস্থায় ঠাকুর সকলের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া অকস্মাৎ কেহ ধরিতে গেলে তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন; সুতরাং ঐ সময় ধরিয়া থাকিবার জন্য 'দরদী' ও 'নৈকষ্য কুলীন' বাবুরামকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে হইত। ঠাকুর যদ্যপি অব্রাহ্মণের হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন না, তথাপি বাবুরামের পবিত্রতা-সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র না থাকায় এক সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমায় একদিন রেঁধে দিস, তোর হাতে খাব।" অবশ্য কার্যত উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

কিন্তু স্নেহ ও বিশ্বাসের কোনও ন্যূনতা না থাকিলেও ঠাকুর কাহারও ভাব নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন বলিয়া একদিন স্নেহের দুলাল বাবুরামের অনুরোধও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভক্তদের ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া বাবুরাম একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "আমার ভাবসমাধি করে দিতে হবে।" ঠাকুর যতই বলেন, "আমার ইচ্ছায় কি হয় রে। মার ইচ্ছা না হলে হয় না।" ততই তিনি আবদার করেন, "আপনাকে করে দিতেই হবে।" অগত্যা ঠাকুর জগদম্বার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। কিন্তু উত্তর পাইলেন, বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।

বাবুরাম প্রভৃতিকে ঠাকুর শুধু সাধারণ ভক্ত হিসাবে দেখিতেন না, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ত্যাগী বার্তাবহ ও উত্তরাধিকারিরূপেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত সাবধান ছিলেন। একবার হাজরা মহাশয় বাবুরাম প্রভৃতি অল্পবয়স্ক কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশপ্রসঙ্গে বুঝাইতেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ মহাপুরুষ—তাঁহার নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা চলে। তা না করে শুধু ভাল খাবার-দাবার খেয়ে তাঁর সঙ্গে সুখে বাস করে ফল কি?" ঠাকুর পার্শ্বেই ছিলেন—হাজরার কাণ্ড দেখিয়া বাবুরামকে নিকটে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "আচ্ছা, তোরা কি চাইবি? আমার যা কিছু তা সবই তো তোদেরই জন্য

রয়েছে। আমার যা কিছু অনুভূতি প্রভৃতি হয়েছে, সবই তো তোদের জন্য। ভিখারির মতো ক্যাঙলামি করিস নে— ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল করে বুঝে নে এবং সমস্ত ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর!"

বস্তুত বাবুরামকে ঠাকুর স্বীয় অলৌকিক দৃষ্টিসহায়ে এক অনন্যসাধারণ জীবন এবং অচিন্তনীয় ভবিষ্যতের জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ স্বয়ং বলিয়াছেন, "তিনি গৃহীদের এক রকম, ত্যাগীদের অন্য রকম উপদেশ দিতেন। ঘরে যখন কোন গৃহী ভক্ত না থাকত, তখন দরজা বন্ধ করে আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন—আবার মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখে আসতেন, কোন বিষয়ী লোক এসেছে কি না। কামিনী-কাঞ্চনে যাতে বিতৃষ্ণা এসে যায়, সেই জন্য সে-সব কথা উপমা দিয়ে বলতেন—যাতে আমাদের প্রাণে বিঁধে যায়।" আর ইহা যে শুধু উপদেশরূপেই হৃদয়ে মুদ্রিত হইত তাহা নহে, জগদম্বার নির্দেশে পরিচালিত ঠাকুরের প্রতিটি আচরণ তদনুরূপ আদর্শ স্থাপনপূর্বক বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, এই উপদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে অপ্রকাশ্য অনুভূতি ও অনুপম জীবন। এক রাত্রে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে মেঝেতে মাদুরের উপর ঘুমাইতেছেন—নিশীথে ঠাকুরের পদশব্দে জাগিয়া দেখেন, তিনি অর্ধবাহ্যদশায় বগলে পরিধানবস্ত্র রাখিয়া গৃহময় ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 'থু থু'-শব্দে চারিদিকে মুখামৃত ছড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, "দিস নি, মা, দিস নি।" মা যেন ধামা পুরিয়া নাম-যশ লইয়া তাঁহাকে দিতে আসিয়াছেন, আর তিনি উত্ত্যক্ত শিশুর ন্যায় মিনতিমিশ্রিত ত্রাসভরে বলিতেছেন, "দিস নি, মা, দিস নি!" অপর একদিন তিনি বাবুরামকে কামিনীর মায়া হইতে মুক্ত থাকারও উপদেশ দিলেন। ঠাকুর সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। শৌচান্তে বাবুরাম তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ বাটির একটি গৃহে তখন বালিকা বিদ্যালয় ছিল। বাবুরাম যখন ঐ কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তখন একটি বালিকা স্বীয় অঞ্চল ধরিয়া উহাতে আবদ্ধ একটি চাবির গুচ্ছকে সশব্দে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরাইতেছিল। ঠাকুর বাবুরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ মেয়েরা পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন্‌বন্ করে ঘোরায়। তুইও কি তাদের হাতে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?"

এই বিষয়ে দ্বিতীয় ঘটনাটিও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ। তখনও বাবুরাম মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মাস্টার মহাশয় শ্যামপুকুরে থাকিতেন। সেবারে কলকাতায় বিসূচিকার প্রকোপ হইলে তাঁহার বাটিতে ঐ রোগ প্রবেশ করিল। বাবুরাম প্রভৃতি ছাত্রেরা তখন বাটির মধ্যে রোগীদের দেখিতে যাইতেন। ঠাকুর

এই সংবাদ পাইয়া একদিন মাস্টার মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, "হ্যাঁ গা, বাড়িতে তোমার যুবতী পরিবার রয়েছে—তুমি ছেলেদের অমন বাড়ির ভেতর ঢুকতে দাও কেন?" মাস্টার মহাশয় জানাইলেন যে, উহারা তাঁহার ছাত্র, সুতরাং দোষ নাই। ঠাকুর তদুত্তরে নীরব না থাকিয়া ঐ সাবধানবাণীই পুনর্বার উচ্চারণ করিলেন। মাস্টার মহাশয় হয়তো তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ঠাকুর সেদিন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ-অবলম্বনে কথা কহিতেছিলেন না—তিনি তাঁহার চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানের কঠোর সাধনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বাবুরামের বয়স তখন আনুমানিক ২৩ বৎসর হইবে।

এই সকল বিষয়িসুলভ দুর্বলতা হইতে বাবুরামকে পক্ষিমাতার ন্যায় স্বীয় পক্ষপুটে সর্বদা রক্ষা করিলেও ঠাকুর স্বীয় সন্তানের অন্তর্নিহিত প্রেমকে সঙ্কুচিত না করিয়া বরং সুনির্ধারিত প্রণালীতে বিবিধরূপে বিকাশের পথেই লইয়া যাইতেছিলেন। তাই ভোগ্যবস্তু হইতে তাঁহাকে সতর্কভাবে দূরে আকর্ষণ করিলেও ভক্তসেবায় সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। বাবুরাম মহারাজ পরে একদা বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি, ঠাকুরের কাছে কোন ভক্ত উপস্থিত হলে তিনি তাকে কত ভাবে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, 'পান খাবেন?' পান না খেলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তামাক খাবেন?' আমাদেরও তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।" এই ভক্তসেবার ভাব বাবুরাম মহারাজ উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ণমাত্রায়ই পাইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন আমরা যথাস্থানে পাইব।

বাবুরাম মেধাবী ছাত্র ছিলেন না; বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের পর ধর্মভাব বিশেষ উদ্দীপিত হওয়ায় বিদ্যালয় হইতে মন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৮৮৫ খ্রিঃ) উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পরে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল সহ বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে কথাপ্রসঙ্গে সান্যাল বলিলেন, "ও পরীক্ষায় পাস হয় নি।" শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "ভালই তো—ও পাশমুক্ত হলো। যার যটা পাস, তার তটা পাশ (অর্থাৎ বন্ধন)।" বাবুরাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; কারণ ঠাকুর যদিও জানিতেন যে, বাবুরাম সংসারে জড়িত হইবেন না এবং সেই আশায় তাঁহাকে বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেন, তথাপি আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে ঐ আদর্শ বাবুরামের জীবনে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা পরে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়াই হউক, ঠাকুর তখন বাবুরামের ভাব নষ্ট না করিয়া এবং অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং উৎসাহই দিতেন। ঐ কালে মাস্টার মহাশয়ের সহিত একদিনের কথোপকথন হইতে

ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শ্রীম-কে সেদিন তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে? বাবুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১২৯ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৬০)। অশেষ ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় বাবুরাম তখনও পান নাই; তাই তাঁহার ভয় ছিল যে, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় ঠাকুর বিরক্তই হইবেন। কিন্তু অদ্যকার আচরণে তাঁহার ফাঁড়া কাটিয়া গেল। বস্তুত অনুধাবন করিলে বাবুরাম বুঝিতে পারিতেন যে, পূর্বেও ঠাকুর তাঁহার মনে বৈরাগ্যসঞ্চারের জন্য একবার এই বিষয়েই অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোর বই কৈ? পড়াশুনা করবি না? (মাস্টারের প্রতি) ও দুদিক চায়। বড় কঠিন পথ—একটু তাঁকে জানলে কি হবে?... অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।"

"বাবুরাম (সহাস্যে)—আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়।

বাবুরাম (সহাস্যে)—আপনি নিয়ে আসুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই দুর্বল। তোর সাহস কম।...(মাস্টারকে) আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে। সকলেই এক-একটা ওজর করে।" ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, ১৩০ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৭৫৭-৫৮)।

দরদী বাবুরামের উপর ঠাকুর কতখানি নির্ভর করিতেন তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ঠাকুর একদিন 'চৈতন্য-লীলা' অভিনয় দেখিতে যাইবেন—বাবুরামকে সঙ্গে লইলেন এবং বলিলেন, "দ্যাখ, সেখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লে সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আর গোলমাল করে উঠবে! আমার ঐরূপ হবার উপক্রম দেখলে অন্য বিষয়ে খুব কথা বলবি।" এইরূপ ঠিক করিয়া তো অভিনয়দর্শনে গেলেন; কিন্তু যে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাধির দিকে এবং যাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বলপূর্বক সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিতে হইত, সে মন উদ্দীপকের সান্নিধ্যলাভ করিয়াও কিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? ফলে ঠাকুর অচিরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বাবুরাম নাম শুনাইতে শুনাইতে ঐ মনের গতি ব্যবহারিক জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। এইরূপ আরও কতবার ঘটিয়াছে; কিন্তু এই প্রকার বিশ্বস্ত সেবকরূপে ও পার্ষদরূপে দক্ষিণেশ্বরে বাস ও ঠাকুরের সহিত সর্বত্র গমনাগমন ও তাঁহার স্নেহস্পর্শলাভ করিতে থাকিলেও বাবুরাম কখনও গর্বে স্ফীত হইতেন না, বরং পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার জন্য কোন অপবিত্র লোক থাকতে পারত না। ঠাকুরের কৃপা না থাকলে

আমিও তাঁর কাছে থাকতে পারতুম না। এখন ভাবি, কি করেই যে ছিলুম—একটু কিছু ভাবের উদ্রেক হলেই অমনি সমাধিস্থ!" বস্তুত এ রকম সৌভাগ্যের কারণরূপে তিনি ঠাকুরের কৃপার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, নিজের আবাল্য পবিত্রতার উল্লেখমাত্র করিতেন না।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি নিঃশেষিত হইলে বাবুরাম ও অন্যান্য ত্যাগী যুবকদের কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় যোগদান, ঠাকুরের দেহত্যাগান্তে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে তথায় তাঁহাদের আগমন এবং তদনন্তর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সন্ন্যাসগ্রহণের কথা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাসকালে ঠাকুরের বাণী স্মরণ করিয়া বাবুরামের নাম রাখা হইল স্বামী প্রেমানন্দ। বরাহনগর ও পরে আলমবাজার মঠে স্বামী প্রেমানন্দ অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত কঠোর তপস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননে রত হইলেন। আলমবাজারে তিনি কিরূপ শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া থাকিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহাকে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে (২০/১১/১৫ ইং) পাওয়া যায়—"তোমাতে প্রভু ভিন্ন কিছুর তো আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম, 'যথা যথা দৃষ্টি যায়, তথা কৃষ্ণ স্ফুরে' বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল; এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুর স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কি না জানি না; আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে মগ্ন ('ডাইলিউট্') হইয়া যাওয়া।" বরাহনগরের আর একটি দিব্য ভাবধারার পরিচয় স্বামী প্রেমানন্দের পত্রে পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা বরাহনগরের মঠে এক সময়ে পরস্পর কেবল গুণ দেখতুম—কেহ কাহারো দোষ দেখতে পেতুম না!" অশেষকল্যাণগুণাকর শ্রীভগবানে যাঁহাদের মন সতত নিমগ্ন, তাঁহাদের এইপ্রকার আচরণই স্বাভাবিক—ভগবদ্‌গুণাস্বাদননিরত তাঁহারা দোষদর্শন করিবেন কখন?

স্বামী প্রেমানন্দ, সারদানন্দ ও অভেদানন্দ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পর পদব্রজে ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা এমার মঠে অবস্থানপূর্বক ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদ দ্বারা শরীরধারণ করিতেন। ঐ সময়েই প্রেমানন্দ টাইফয়েড-রোগে শয্যাগত হন; তবে গুরুভ্রাতাদের বিশেষ যত্নে অচিরে আরোগ্যলাভ করেন এবং ভুবনেশ্বর হইয়া ছয় মাস পরে মঠে ফিরিয়া আসেন। ৺জগন্নাথক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য তীর্থেও তিনি ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার

সঠিক বা বিস্তৃত বিবরণ আমরা অবগত নহি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের একসময়ে তিনি ৺কাশীতে ছিলেন। স্বামীজী তখন গাজীপুরে। ঐ সময় প্রেমানন্দ একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন স্বামীজীকে ফিরাইয়া আনার জন্য; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া একাই ফিরিয়া আসেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্বনামধন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন এবং ভাস্করানন্দ স্বামীরও সাক্ষাৎলাভ করেন। পুনর্বার ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরভারতের তীর্থাদি-দর্শনান্তে তিনি ক্রমে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন 'কালাবাবুর কুঞ্জে' যাপন করেন। এখানে তিনি সারাদিন আপনভাবে তন্ময় থাকিতেন এবং অপরাহ্নে দেবদর্শনে যাইতেন। কিয়দ্দিবস পরে ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ঝুলনের সময় ভক্তমাল নামক বৈষ্ণব সাধুর সহিত উভয়ে ব্রহ্মমণ্ডল পরিক্রমায় নির্গত হইলেন। পথ কণ্টকাকীর্ণ, তাই ভক্তমাল পাদুকা কিনিতে বলিলেন; কিন্তু বাবুরাম ব্রজভূমিতে পাদুকা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন বলিয়া রিক্তপদেই চলিলেন। এই ভ্রমণকালে সাধারণত ভক্তমালই তাঁহাদের জন্য মাধুকরী করিতেন। রাধারানীর জন্মস্থান বর্ষানায় তাঁহারা কিছুদিন ছিলেন। সেখানে ব্রজরমণীদিগকে প্রেমানন্দজী গোপীজ্ঞানে ভূমিষ্ঠ- প্রণাম করিতেন। বর্ষানায় দেড়মাস ও অন্যান্যস্থানে কিয়দ্দিবস যাপনান্তে পুনঃ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে কালীকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রেমানন্দ তখন তাঁহাকে সযত্নে এটোয়ায় স্বীয় গুরুভ্রাতা হরিপ্রসন্নবাবুর (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) নিকট চিকিৎসাদির জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও কিছুদিন এটোয়ায় কাটাইয়া আসিলেন।

ইতোমধ্যে সংবাদ আসিল যে, আচার্য বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিতেছেন। তপস্যার ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমানন্দ ও কালীকৃষ্ণের মন যদিও অকস্মাৎ বৃন্দাবনত্যাগে সম্মত ছিল না, তথাপি স্বদেশপ্রত্যাগামী স্বামীজীর প্রবলতর আকর্ষণে তাঁহারা ১৮৯৬-এর শেষে কলকাতায় চলিলেন। বর্ধমানে পৌঁছিয়া মাতৃভক্ত প্রেমানন্দের মনে মাতৃদর্শনের আকুলতা জাগিল। কাজেই উভয়ে জয়রামবাটী চলিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রায় এক পক্ষকাল ছিলেন। একদিন ভ্রমণকালে ঐ গ্রামে পুষ্করিণীতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলরাজি দর্শনে প্রেমানন্দের মনে উহা মাতৃচরণে অর্পণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিল এবং তিনি স্বয়ং উহা তুলিতে জলে নামিলেন, কারণ সঙ্গী ব্রহ্মচারী সাঁতার জানিতেন না। মনেরসাধে পদ্ম তুলিয়া যখন তিনি তীরে উঠিলেন, তখন উভয়ে সচকিতে দেখিলেন যে, বিশ-ত্রিশটা জোঁক তাঁহার সর্বাঙ্গে ঝুলিতেছে। অনেক চেষ্টায় ঐগুলিকে তুলিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া খুবই বিচলিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। জয়রামবাটী হইতে তাঁহারা

৺তারকেশ্বর-দর্শনান্তে আঁটপুরে পৌঁছিলেন এবং সেখানে দুই-তিনদিন অবস্থানান্তে আলমবাজারে আসিয়া দেখিলেন যে, চার-পাঁচ দিন পূর্বেই স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐ সময়ে একটি ঘটনায় গুরুভ্রাতাদের প্রেমের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রত্যূষে যথাসময়ে যিনি শয্যাত্যাগ না করিবেন তাঁহাকে সেইদিন ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিতে হইবে। একদিন বাবুরামের উঠিতে দেরি হইল। স্বামীজী আদেশ করিলেন, "যা, তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।" এইরূপ চেষ্টায় বাবুরাম উঠিলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া কৃত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য স্বামীজীর নিকট আগমনপূর্বক বলিলেন, "আজ উঠতে পারিনি। আমার জন্য সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি। তা ভাই, তুমি তো নিয়ম করেছ যে উঠতে পারবে না, তার শাস্তি হবে—আমায় শাস্তি দাও।" শ্রবণমাত্র স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোকে আমি শাস্তি দেব একথা তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বাবুরামেরও অবস্থা তখন অনুরূপ। উভয়ের বিহ্বলতা দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ মধ্যস্থরূপে জানাইলেন, "শাস্তির প্রশ্ন হচ্ছে না; তবে নিয়ম আছে বটে যে, ভিক্ষা করতে হবে।" তখন বাবুরাম মাধুকরীর উদ্দেশে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে প্রেমই সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়—এই ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণিত হইল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ গমন করিলে মঠের ঠাকুরপূজার দায়িত্ব স্বামী প্রেমানন্দ সানন্দে গ্রহণ করেন। অতঃপর কিয়দ্দিবস পরে তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং বেলুড় মঠ স্থাপনের কিঞ্চিৎ পূর্বে পুনরায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হন। অনন্তর স্বামীজীর ইহধাম-পরিত্যাগান্তে সঙ্ঘ পরিচালনার ভার ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর পতিত হইলে প্রেমানন্দজী তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া মঠের ঠাকুরপূজা হইতে গো-সেবা পর্যন্ত সমস্ত কার্য যথাসম্ভব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রেমের গভীরতম উৎস এই সময় যেন শতধা বর্ধিত ও উৎসারিত হইয়া আপামর সাধারণে বিস্তৃত হইয়াছিল। সঙ্ঘের নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তখন প্রায়ই বহুস্থানে যাইতে হইত। সেই জন্য মঠে নবাগত সাধুব্রহ্মচারীদের শিক্ষার ভার প্রধানত বাবুরাম মহারাজের উপর ন্যস্ত ছিল। বাহির হইতেও তখন বিস্তর ভক্তসমাগম হইত। তাঁহাদের সকলকে তিনি ভালবাসায় এবং মিষ্ট কথায় আপনার করিয়া লইতেন।

স্বামী প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই তখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের মঠজীবন পরিচালিত হইত এবং উহার প্রভাব বেলুড় হইতে উৎসারিত হইয়া এখনও পরম্পরাক্রমে সঙ্ঘের স্তরে স্তরে শতধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—এইরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সত্য বটে যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবৃন্দের আদর্শও নবাগতদের জীবনে অনুপ্রেরণা জাগাইত এবং তাঁহাদের আচার এবং ভাবভঙ্গি নবপথে পদক্ষেপের রহস্য উদ্ঘাটিত করিত। কিন্তু মঠবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চরণবিন্যাসের সহিত বিজড়িত থাকিত স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশ ও প্রেমময় আকর্ষণ। কখনও ভালবাসায় বিচলিত হইয়া নবাগতরা কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইত, কখনও তাঁহার তিরস্কার তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বৃত নবজীবনের দায়িত্ব-সম্বন্ধে সচেতন করিত, আবার কখনও বা তাঁহার আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে তাহারা অকস্মাৎ জগদতীত সত্তার আভাস পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইত। তাঁহার দয়ায় কত অসাধু সাধু, কত পাপী ধার্মিক হইয়াছে। কত মায়ামুগ্ধ মানব ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে! আমরা সাধারণ ও সুবিদিত দৈনন্দিন স্তর হইতেই সামান্য দিগ্‌দর্শন করিতে পারি মাত্র।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস হইবে। বেলুড় মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে চোরকাঁটা ও আগাছা হইয়াছে। প্রেমানন্দ নবাগত কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে এ সকলের উৎপাটনে নিযুক্ত করিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, প্রাঙ্গণের অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে—দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। কিন্তু নিকটে আসিয়া বুঝিলেন, আগাছা উন্মূলিত হয় নাই, ছুরি দিয়া কাটিয়া প্রাঙ্গণকে সহজে পরিষ্কার করা হইয়াছে মাত্র। সহাস্য বদন অমনি গম্ভীর হইয়া গেল। এ কি? এই সব যে আবার দুই দিন পরেই বর্ধিত হইবে! বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুরি দিয়ে কাটলে যে?" "শিকড় উঠানো বড়ই হাঙ্গামা, তাই ছুরি দিয়ে কাটছি।" স্বামী প্রেমানন্দ অমনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঙ্গামা! আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরের কাজ আনন্দে করছ। হাঙ্গামা যদি মনে কর, সে কাজ আমি করতে বলিনি। আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ছুরি দিয়ে কাটা বড় অন্যায় ; কারণ তাতে আগাছার শিকড়গুলো আর সহজে উঠানো যাবে না।" একটু দূরে একজন ব্রহ্মচারী ধীর-স্থির ভাবে শিকড়সমেত আগাছা উঠাইতেছে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমাদেরই মধ্যে একজন নিখুঁতভাবে কাজটি করছে—তোমাদের মতো বুদ্ধি করে ছুরি দিয়ে সে কাটছে না।" একটু নীরব থাকিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ বাবা, একটা কথা বলছি; ভবিষ্যতে তোমরা অনেক বড় বড় কাজ করবে। কিন্তু ফাঁকি দেবার বদ অভ্যাসটুকু যদি একবার জীবনের স্তরে স্তরে ঢুকে পড়ে, তা হলে রক্ষা নেই।

সামান্য উঠানের ঘাস পরিষ্কার করার কথা আমি বলছি না, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে এই ফাঁকি দেবার অভ্যাসটুকু দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করলে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। সুতরাং এটা করো না—এই আমার অনুরোধ।"

প্রেমানন্দ জানিতেন যে, মনোরাজ্যের চিকিৎসা শুধু বক্তৃতার দ্বারা হয় না, শুধু উপদেশে কাজ হয় না—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' সুতরাং শেষদিন পর্যন্ত তিনি সর্বদাই কর্মব্যস্ত থাকিতেন, আর বলিতেন, "কাজ কথা বলুক, মুখ বন্ধ হোক।" ব্রহ্মচারীদের সহিত কাজ করিতে করিতে বলিতেন, "আমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে গোবর দিয়ে নাড়ু পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধুলো দিয়ে কি নিজের পরকালটা খাব? তাই গোবরও কুড়ুই, নাড়ুও দিই; গোরুর সেবাও করি; আবার ঠাকুরপুজোও করি।" এই কয়টি কথার মধ্যে বাবুরাম মহারাজের সর্বজীবনের একখানি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল, 'জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত' সমস্ত কর্ম করতে হবে; বাবুরাম মহারাজও বলিতেন, "এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে হবে—রাঁধতে, কুটনো কুটতে, ঠাকুরঘরের কাজ, পূজা, হিসাব রাখা, বক্তৃতা দেওয়া—ইত্যাদি। সকল কাজে পারদর্শী হওয়া দরকার। এদের ঐ রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত ভালমন্দ গাল দিচ্ছি—ওদের ভালর জন্য। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই। এদের কত ভালবাসি।" আর ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া যাইতেন, "তোদের বকি-ঝকি বলে কিছু মনে করিস নি।" মনে তাঁহারা কিছু করিতেন না; কারণ অল্পদিন সঙ্গলাভের ফলেই তাঁহারা প্রেমানন্দের ক্ষণিক কঠোরতার পশ্চাতে একখানি চিরস্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইতেন, আর জানিতেন উহাই তাঁহার স্বরূপ।

সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি কাজ শিখাইতেন, প্রয়োজন মতো ভর্ৎসনা করিতেন; আবার সকলকে লইয়া অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। শাস্ত্রচর্চা না করিলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। একবার মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে বাগানের কার্যে অতিমাত্রায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন, "পড়াশুনা কিছু হচ্ছে, না কেবল কুলিগিরি?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হাঁ,—দা পড়েন, আমরা শুনি।" "মূল শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড়?" "সংস্কৃত ভাল জানি না।" স্বামী ধীরানন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি ব্রহ্মচারীর পক্ষ লইয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, "পড়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল; আবার এখানেও পড়াশুনো?" সে রসিকতায় কর্ণপাত না করিয়া প্রেমানন্দ নূতন একখানি ইংরাজি বইএর নাম করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ওখানি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিন মাসের মধ্যে শেষ করা চাই—নইলে অফিস থেকে

চারটি পয়সা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাবে (অর্থাৎ কলকাতা গমনের পয়সা লইয়া মঠ ত্যাগ করিবে)।" আর ঐ সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এটা বাবাজীদের আখড়া নয়—স্বামীজী সেজন্য বেলুড় মঠ নির্মাণ করেন নাই। বিবেকানন্দ চাহিতেন, আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি—ধ্যানে, জ্ঞানে, সেবায়, ভক্তিতে। বেলুড় মঠে নবাগত জনৈক ব্রহ্মচারী এই নবীন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গতানুগতিক প্রাচীন সংস্কারের বশে যখন প্রশ্ন করিলেন, "কিরূপ ধ্যান করব?" তখন প্রেমানন্দ সহজভাবে উত্তর না দিয়া মূল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলিয়া উঠিলেন, "ও সব এখন ছেড়ে স্বামীজীকে ধ্যান কর—তা হলে তাঁর সত্তা পেলে, ঠিক ঠিক তাঁর সেবার ভাব তোর ভেতর জন্মাবে; তাঁর কৃপাতেই ঠাকুরকে তখন বুঝতে পারবি।"

অনেক সময় আবার ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে যে হাসি-ঠাট্টা চলিত উহার মধ্য দিয়া সদ্যঃসমাগতবৃন্দ নবীন পথের জটিলতার সহিত সুপরিচিত হইতেন। একদিন সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকোষ্ঠে খুব সৎপ্রসঙ্গাদি চলিতেছে, বেলা হইয়াছে, তবু সাধু-ব্রহ্মচারীরা দৈনন্দিন কার্যে যোগ দিতেছেন না। নিম্নে প্রেমানন্দের আহ্বান উত্থিত হইল, "ওরে ভক্তেরা, কে কোথায় আছিস—নেমে আয়। ঠাকুরের রান্নার যোগাড় তো এখনও হল না।" মহারাজ তখনই সকলকে নিচে যাইতে আদেশ করিয়া কৌতুকভরে বললেন, "গিয়ে ওকে বলবি, মশাই, মুক্তিটে দিয়ে দিন না; তা হলে তো আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্ঝাট থাকে না—আপনি তো ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন।" শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই—আমি নিজেই সব করে নেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাট-বাজার বসাও, তা হলে কিন্তু কান ধরে টেনে এনে কাজে লাগাব।"

প্রকৃতপক্ষে প্রেমানন্দের সঙ্গে কাজ করাকে ঠিক কাজ করা বলা চলে না—উহা ছিল সাধনারই রূপান্তর, যাহাকে গীতায় বলিয়াছে, "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" তরকারি কুটিতে বসিয়া তিনি অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে থাকিতেন; জাব কাটিতে বসিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহা ঠাকুরেরই কাজ—এইরূপ সর্বত্র। প্রতিপদে সকলের মনে এই ভাবই জাগরূক থাকিত যে, সমস্ত মঠটি ঠাকুরের—তিনি সশরীরে ইহার সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন, কোথাও ধুলা-বালি পড়িয়া থাকিলে তাঁহার কষ্ট হইবে বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। উদ্যানে উন্মিষিত পুষ্প তুলিয়া লইয়া নিজের ভোগে লাগাইলে ঠাকুরসেবায় অর্পণ না করার অপরাধ ঘটিবে—এ উদ্যান যে তাঁহার! বাগানের বিকশিত কুসুমরাজি

বিরাটের পূজায়ই অর্পিত! রন্ধন সুচারুরূপে সম্পাদিত না হইলে তাঁহাকেই অবজ্ঞা করা হয়, অর্থ অযথা ব্যয় হইলে তিনি রুষ্ট হন—ইত্যাদি। এই সমস্ত শাসন ও কায়িক শ্রমের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত প্রেমানন্দের অনাবিল প্রেম। স্বামী তুরীয়ানন্দ সত্যই তাঁহাকে একদিন লিখিয়াছিলেন, "তোমরা যেখানে শুভাগমন করিবে, সেখানেই আনন্দের স্রোত বহিবে—

নিত্যোৎসবঃ ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলং।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥"

রাত্রে কোন ব্রহ্মচারী হয়তো মশারি খাটাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন; প্রেমানন্দ তাঁহার মশারি খাটাইয়া দিলেন। অপর কেহ হয়তো অভিমান করিয়াছেন, প্রেমানন্দ তাহার পশ্চাতে দুধের বাটি লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিত।

প্রেমাধার প্রেমানন্দের সর্বগ্রাসী প্রেমের পূর্ণ আবেগের সম্মুখে সব ভাসিয়া যাইবে মনে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই দীক্ষা দিস না, দিলে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে ঝগড়া হবে।" বাবুরাম সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অগণিত ভক্ত আসিত এবং অনেকে দীক্ষাও প্রার্থনা করিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সুবিধামত হয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণপ্রান্তে, না হয় সঙ্ঘনেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু স্বামীজীর সাবধানবাণী হয়তো নিষ্প্রয়োজন ছিল; কারণ জগন্মাতার অদৃশ্য সঙ্কেতে প্রেমানন্দের প্রেমধারা বিচারহীন ভাবপ্রবণতার ব্যর্থ উচ্ছ্বাসে দুই কূল ভাসাইয়া আপনাকে নিঃশেষিত ও বিস্তীর্ণ তীরভূমিকে বিপর্যস্ত না করিয়া যুগপ্রয়োজনসাধনের অনুকূলরূপেই নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবুরামের নির্বন্ধাতিশয়ে ঠাকুর যখন জগন্মাতার নিকট স্নেহাস্পদের জন্য ভাবসমাধি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন উত্তর পাইয়াছিলেন, "বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" জ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত প্রেম লইয়াই বাবুরাম মহারাজ এই যুগে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবারে ভক্তির সংস্কার লইয়া জাত হইলে বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামাদি সহকারে তাঁহার সুঠাম দেহ সুগঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে একটি পুরুষোচিত দৃঢ়তা অঙ্কিত ছিল। আর তাঁহার সমস্ত জীবন ছিল ক্রিয়াচঞ্চল। বেলুড় মঠে ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁহারই বাণী সর্বপ্রথমে সকলের কর্ণগোচর হইয়া তাহাদিগকে শয্যাত্যাগ করাইত। অতঃপর চলিত সারা-দিবসব্যাপী বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। পূজাও তিনি অতি ভক্তিসহকারেই করিতেন; কিন্তু পূজাগৃহে গমন বা প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার পদক্ষেপে

কোন লাস্যবিলাস প্রকটিত না হইয়া ফুটিয়া উঠিত সপ্রতিভ প্রগতি। যুগের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি অপরিচিত ছিলেন না; কিংবা উহার প্রতি উদাসীনও ছিলেন না। পরাধীন নিপীড়িত ভারতে চারিদিকে অহরহ যে আর্তনাদ উঠিত তাহাতে ব্যথিত মহাপুরুষের মর্মস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা জাগিত—"হে ভগবান, এ অত্যাচারের আশু প্রতিকার কর।" ইহা বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষসম্ভূত বা রাজনীতির পঙ্কিলতাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে—ইহা সর্বভূতে বিদ্যমান ভগবানের সেবায় নিয়োজিত কোমল সপ্রেম হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার। এক প্রকারের প্রেম আছে, যাহা সক্রিয়ভাবে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্বভূতাধিষ্ঠিত প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনে সন্তোষপ্রাপ্ত হয়; অন্য প্রকারের প্রেম নিষ্ক্রিয় ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনলাভে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম কোটির অন্তর্ভুক্ত।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, এই সক্রিয় পুরুষোচিত ভাবের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী অধিকতর নিবিষ্টমনে অধ্যয়নের পরে। সম্ভবত ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন কাশীধামে ছিলেন তখন মঠের কর্মব্যস্ততা হইতে মুক্ত থাকায় স্বামীজীর বাণীর পূর্ণতর অনুধ্যানের সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং সেই সুযোগ সর্বতোভাবে গ্রহণের ফলে তিনি এক নূতন উদ্দীপনার অধিকারী হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার প্রতি কার্যে ও প্রতি কথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই ভাবধারার সোচ্ছ্বাস উন্মেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মালদহের বক্তৃতায়। স্বামী প্রেমানন্দ সেই বক্তৃতায় বিবেকানন্দ-প্রচলিত দরিদ্রনারায়ণসেবার বাণীই বিঘোষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার শেষদিকে জনৈক শ্রোতা বলিলেন, "একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম।" বাবুরাম মহারাজ উহাতে কর্ণপাত না করিয়াই স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন; পরন্তু উক্ত ভদ্রলোক বার তিনেক ঐ একই কথার আবৃত্তি করিলে বক্তার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে?" অতঃপর ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন। উহার মর্ম এই—এক সময়ে এক পসারী পাড়া ঘুরিয়া প্রেম ফিরি করিতেছিল, "প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে?" আর উহার প্রতিদানে মূল্য চাহিতেছিল ক্রেতার কাঁচা মাথা। ক্রেতা সে কাহাকেও পাইল না। গল্প শেষ হইলে প্রেমানন্দজী জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কেউ পারবেন আপনারা মাথা দিতে? সহজ নয় প্রেমভক্তি! এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" সভা তখন নিস্তব্ধ!

প্রেমানন্দের জীবন ভাবপ্রবণ না হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি নিজে

প্রেমে মাতিতেন, অপরকেও মাতাইতেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার আনীত মালা ও তিলক পরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বেলুড় মঠে ভাবে কয়েক ঘণ্টা হরিনাম-সংকীর্তনে মত্ত হইয়াছিলেন। একবার মঠে মহাষ্টমীর রাত্রে খুব কালীকীর্তন জমিয়াছে। আনন্দে বিভোর বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ ভাবাবেগে শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমায় আজ গান গাইতে হবে। দেখছ না কত আনন্দ—তোমার গান ছাড়া আনন্দ যেন পূর্ণ হচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ যতই বলেন "অনেক দিন অভ্যাস নেই, হঠাৎ গাইব কি করে?"—বাবুরামের আগ্রহ ততই বাড়িয়া যায়। অগত্যা তাঁহাকে গাহিতে হইল এবং নৃত্যেও যোগ দিতে হইল। পরদিন শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কি করব? বাবুরাম বুড়ো বয়সে নাচিয়ে ছাড়লে!" এমনি ছিল বাবুরামের যুক্তিতর্কহীন ভাবের আবেগ। পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে তিনি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের আবাসস্থল দর্শনের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত নারায়ণগঞ্জ হইতে পদব্রজে কীর্তনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া যেমনি নাগপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, অমনি ভাবের আতিশয্যে গাত্রবাস উন্মোচনপূর্বক সেই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; অতঃপর মহারাজকে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এদের একটু কৃপা"—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহাকে ধরিয়া কীর্তনস্থলে আনিলেন। মহারাজও সেই প্রাণমাতান কীর্তনে হুঙ্কারপূর্বক নৃত্য করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ভাবের আতিশয্যে অক্ষমতানিবন্ধন স্থাণুবৎ সমাধিমগ্ন হইলেন। পূর্ববঙ্গে প্রেমানন্দের অন্যান্য ভাববিলাসের কথা আমরা পরে বলিব। আপাতত আরও দুই-চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনারই উল্লেখ করা যাউক।

কলকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক যুবক অসৎসঙ্গে পড়িয়া গাঁজা ভাঙ্গ ইত্যাদি সেবন করিতে শিখিল। শিক্ষিত পরিবারে এরূপ ব্যবহারে সকলেই মর্মাহত; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কেহ সেই যুবককে সুপথে আনিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে যুবকের এক আত্মীয় স্বামী প্রেমানন্দকে জানিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন সমস্ত কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। প্রেমের প্রতীক স্বামী প্রেমানন্দ সমস্ত শুনিয়া যুবকটিকে দেখিবার জন্য একদিন তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ প্রসঙ্গে তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া একদিন মঠে আসিতে বলিলেন। যুবক সেই আকর্ষণে সত্যই মঠে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত দিবসটি প্রেমানন্দের সহিত মঠে কাটাইল। প্রেমানন্দের ব্যবহারে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখিতে পাইল—সকলেই তাহাকে ভর্ৎসনা করে, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, এমন কি, তাহার সান্নিধ্য অবাঞ্ছিত মনে করে। আর এই একজন সর্বত্যাগী শুদ্ধচিত্ত সাধু সেই সকল অসদভ্যাসের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কোনও কিছু পরিত্যাগের আদেশ না দিয়া কেবলই একটি অতি লোভনীয় উচ্চাবস্থার

আদর্শ জাজ্বল্যমানরূপে সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। অবহেলার পরিবর্তে যুবক পাইল আদর। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, আর অপর দিকে নিঃস্বার্থ প্রেম—এই প্রেমের আবেদন বড়ই প্রবল! যুবক দিনান্তে গৃহে ফিরিল; কিন্তু শীঘ্রই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিল। শুধু তাহাই নহে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, সে সমস্ত বদ অভ্যাস ছাড়িয়া সাধু হইবে এবং অচিরেই উহা কার্যে পরিণত করিল।

কর্তব্যানুরোধে প্রেমানন্দ ভর্ৎসনাও করিতেন ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, শাসন করিতে যাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি বহির্জগৎ ছাড়িয়া স্বস্বরূপের দিকে ধাবিত হইত—আর শাসন নামিয়া আসিত নিজেরই উপর। একদিবস জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিতে করিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি শাসক ও শাসিতের দ্বৈত সম্বন্ধের অতীত অদ্বৈত ভূমিতে প্রসারিত হওয়ায় অপর সকলকে শুনাইয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কিরূপ প্রেম-আনন্দ রে বাবা!" সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কারের স্থলে বিরাজিত হইল মধুর প্রশান্তি।

দেওঘরে তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য যান, তখন জনৈক সেবকের আহারে অধিক লোভ দেখিয়া তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করেন। সেবকটি অভিমানে দ্বিপ্রহরে আহারে আসিলেন না। বাবুরাম ভাবিয়াই আকুল—ছেলেটির কি হইল? অনুসন্ধান করাইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া কোলের কাছে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বাবা, বুড়ো হয়েছি। রোগে শরীর দুর্বল। মেজাজ সব সময়ে ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, তার জন্য কি রাগ করতে আছে?" বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—সে অশ্রুধারায় সেবকের অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল!

প্রেমানন্দের প্রেম ভক্তসেবায় কোন বাধা মানিত না। কেহ মঠে আসিলে প্রসাদ না পাইয়া ফিরিতে পারিত না। একদিন জনৈক ভক্ত প্রসাদ না লইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি ঠাকুর-ভাণ্ডারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ইনি একটুও দাঁড়ালেন না—কি করে প্রসাদ দিই?" বিরক্ত হইয়া প্রেমানন্দ উত্তর দিলেন, "তবু ডেকে এনে দিতে হয়—যখন মঠের ভেতর এসে পড়েছে। সংসারে থাকলে না নিজে খেতে পেতিস, না বাছাদের মুখে দুটো দিতে পারতিস। এখানে ঠাকুরের এত আসছে—হাতে করে তুলে দিতে পারবি নি?"

মঠের রাস্তায় বাবুরাম মহারাজকে স্বহস্তে চোরকাঁটা উঠাইতে দেখিয়া জনৈক ভক্ত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কেন এ কাজ করছেন?" প্রেমানন্দ অমনি উত্তর দিলেন, "ভক্তেরা কষ্ট করে আসে—অসুবিধা হয়; তাই

তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিচ্ছি।" কে জানে এই সামান্য চোরকাঁটার সঙ্গে তিনি কোন অজানা জগতের পথের কাঁটা সরাইতেছিলেন।

এই অপূর্ব প্রেম একদা প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। একদিন পঙ্‌ক্তিভোজনকালে অভ্যাসানুযায়ী আহারস্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রেমানন্দ মহারাজ সমাজপতিসকাশে উপস্থিত হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—বাক্য, ভাব, ভাষা কোথায় পাব? রস-টস্ তো নেই! আপনার কলমের ডগায় রস টস্ টস্ করে।" সমাজপতি হার মানিবেন কেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে। কিন্তু আপনার রস চলায়, ফেরায়, কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে।"—আরও কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় নিপীড়িত প্রেমানন্দজী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন।

উৎসবের দিনে মঠপ্রাঙ্গণে ভদ্রলোক, মুচি, মেথর, ধনী, দরিদ্র—সর্বস্তরের নারায়ণই পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়াছেন। খিচুড়ি পরিবেশন হইতেছে। তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দ দেখিলেন, দূরে এক পঙ্‌ক্তি হইতে বারংবার 'খিচুড়ি দাও, খিচুড়ি দাও' এই রব উঠিতেছে। তিনি অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কখনো পরিবেশন করনি?" উত্তর পাইলেন, "আমি বার বার দিচ্ছি, তবু কুলাচ্ছে না; এরা দাও দাও বলে শুধু গোল করছে।" প্রেমানন্দ দেখিলেন, পঙ্‌ক্তির প্রায় সবই গরিব—ইহাদের অধিক আহার করাই অভ্যাস। তাই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া আবেগভরে বলিলেন, "আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা যায়! জানি না জীবনে কদিন এরা পেটভরে খেতে পায়—এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলছে। যাও যাও, বালতিটা এদের এক এক পাতে ঢেলে দাও। ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে খেয়ে নিক।" বলিতে বলিতে স্বর শুষ্ক হইয়া আসিল, নয়নকোণে বারি ঝরিয়া পড়িল—প্রেমানন্দ আর সামলাইতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মঠে সমাগতদের সেবার জন্য প্রেমানন্দের হৃদয়ের দ্বার ও ঠাকুরভাণ্ডারের অর্গল সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। সকলেই যে ভক্ত হিসাবে আসিতেন, তাহা নহে; কেহ হয়তো মঠের মুক্তবায়ু-সেবনে আগমন করিতেন, কেহ হয়তো বা ঔৎসুক্য মিটাইতে আসিতেন। যিনি যে ভাবেই আসুন না কেন, প্রেমানন্দের মিষ্ট আলাপন ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বারংবার যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। অনেক সময় হয়তো মঠের প্রসাদ-বিতরণের সময় অতীত হওয়ার পরে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অতীতপ্রৌঢ় প্রেমানন্দজী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজেই অভ্যাগতদের আহারাদির

জন্য রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইতেন। দেখিতে পাইয়া অপর কেহ সাহায্যার্থ আসিলে আশীর্বাদ করিয়া বলিতেন, “দেখ, গৃহস্থদের অনেক কাজ করতে হয়, সব সময় কি তাদের সময় মতো আসা সম্ভব? আমরা তাদের জন্য কি আর করতে পারি—একটুখানি তাদের সেবা বৈ তো নয়? তাতে আমাদের হয়তো শারীরিক একটু কষ্ট। ঠাকুরের কৃপায় এখানে তো কিছুর অভাব নেই। আমরা কি তাঁর সন্তানদের সেসব দিয়ে ধন্য হব না?” রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি ভক্তসেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। অসুখবৃদ্ধির আশঙ্কায় কেহ সাবধান বাণী শুনাইতে গেলে বলিতেন, “এ আমার স্বভাব—ভক্তদের সেবা ও ঈশ্বরের পূজা এক জিনিস।” দেহত্যাগের দিন দুই পূর্বে মঠের জনৈক সেবককে ডাকিয়া বড়ই আকুলকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি একটি কাজ করতে পার?” সেবক সাগ্রহে উত্তর দিলেন, “বলুন, কি করতে হবে।” প্রেমানন্দ বলিলেন, “ভক্তদের সেবা করতে পারবে?” “খুব পারব।” প্রেমানন্দ আবার আবেগভরে বলিলেন, “এটা কিন্তু ভুলো না।” ঠাকুরের প্রসাদ পাইলে ভক্তদের পরম কল্যাণ হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর বলিতেন, “একবার যখন পুণ্যস্থানে—ঠাকুরের স্থানে এসেছে তখন দুটো ভাল কথা শুনে যাক।” বস্তুত বাবুরাম মহারাজের নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটাইয়াই গৃহে ফিরিতেন এবং সেই অমৃতের লোভে পুনঃ তাঁদের চরণ মঠাভিমুখে ধাবিত হইত। বয়স্ক ভক্তদের সহিত কলেজের ছাত্ররাও তাঁহার নিকট আসিত এবং তিনি অকাতরে তাঁহার সময় ও জ্ঞান তাহাদের সেবায় ঢালিয়া দিতেন। এইরূপে কত যুবকই না তাঁহার উদ্দীপনায় সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক তাঁহারই অনুসৃত পথে চলিতে দৃঢ়পণ হইয়াছে।

প্রেমানন্দের অধিকতর পরিচয়লাভের জন্য অতঃপর তাঁহার চরিত্রের আরও কয়েকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মন্দ হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব এবং বাবুরামের পূর্ব সংস্কারের সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে চকিতে এক অপূর্ব আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। পুরীতে বাসকালে একদিন বাবুরাম মহারাজ দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখেই খ্রিস্টান প্রচারকেরা যিশুর মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অমনি তাঁহার জাতিগত সংস্কার সহসা ক্ষুভিত হইয়া বাধাদানে অগ্রসর হইল। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল”—সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারীর কণ্ঠে নিনাদিত হইল, “হরিবোল, হরিবোল।” সভা ভাঙ্গিয়া গেল। পাণ্ডারা বাবুরামকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, “আমরা এতদিন ভয়েই কিছু করতে পারি নি।” প্রেমানন্দের ভাগ্যে কিন্তু আসিল বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে গভীর বিষাদ! রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর দর্শন দিয়া বলিতেছেন, “হ্যাঁরে, ওদের সভা ভেঙ্গে দিলি কেন? ওরা তো আমার

নাম, আমার কথাই প্রচার করছিল! কাল ভোরে উঠে গিয়েই ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে।" বাবুরাম প্রত্যূষে উঠিয়াই শশব্যস্তে অন্বেষণে নির্গত হইলেন এবং বহু কষ্টে খ্রিস্টান প্রচারকদের বাটির সন্ধান পাইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিলেন।

তিনি মাছ খাইতেন না। দীর্ঘকালের সংস্কার সূক্ষ্ম ঘৃণারূপেই হয়তো হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল। বাহিরে উহা ভর্ৎসনা ও সমালোচনার আকারে মাঝে মাঝে অভিব্যক্ত হইত। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই মাছ খাসনে বলে কি মনে করিস তোর সব হয়ে গেছে?" নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠিয়া মাছের আঁশ-বাটি জিহ্বায় ঠেকাইলেন। আর অতঃপর ভর্ৎসনাদি না করিয়া বলিতেন, "যাদের ইচ্ছা তারা মাছ খাবে।" নিজে নিরামিষাশী হইলেও তিনি প্রসাদী মাছ জিহ্বায় স্পর্শ করাইতেন। একদিন কিন্তু তাঁহাকে প্রসাদী মৎস্যও ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ সেদিন পাশাপাশি বসিয়া খাইতেছেন। সারদানন্দের পাতে মাছের মুড়ো পরিবেশিত হইলে তিনি হঠাৎ সবটাই প্রেমানন্দের পাতে তুলিয়া দিলেন। প্রেমানন্দ "কি কর, কি কর" বলিয়া আপত্তি জানাইলেও সারদানন্দ বিরত হইলেন না এবং প্রেমানন্দও প্রসাদ-বিবেচনায় উহা আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

তারপর প্রেমানন্দের বৈরাগ্য। তাঁহার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ফতুয়া, একখানি গায়ের চাদর, এক জোড়া চটিজুতা, একটি লাঠি ও ছাতা। শীতের সময় একখানি চাদর ও একটি তুলার জামা অধিক ব্যবহার করিতেন। এই সকল সামান্য দ্রব্য হইতে আবার দানও চলিত। অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে থাকাকালে জনৈক নাপিত চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়; সুতরাং শাসন না করিয়া অভাবমোচন করাই সক্ষম ব্যক্তির কর্তব্য—এই ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ধারণা। অতএব তিনি ধৃত ব্যক্তিকে শাস্তির পরিবর্তে একটি টাকা দিতে বলিলেন। শুধু তাহাই নহে, সেবক দূরে সরিয়া গেলে নিজের ব্যবহার্য গামছাখানিও তাহাকে দিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। মায়ের আদেশ ভিন্ন তিনি কোন বিশেষ কার্যে অগ্রসর হইতেন না এবং মায়ের আদেশে স্বমত পরিত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।" আর বলিতেন, "শ্রীশ্রীমাঠাকরুনকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়—তিনি শক্তিস্বরূপিণী কি না? তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর

চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুনের ভাবসমাধি হচ্ছে; কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন?" ১৯১৪-এর মে মাসে স্বামী প্রেমানন্দকে মালদহে লইয়া যাইবার জন্য জনৈক ভক্ত বেলুড়-মঠে আসেন। তাঁহার আগ্রহে তিনি যাইতে সম্মত হন। কিন্তু বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্মতি থাকিলেও যাবার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি লইতে হইবে। তদনুসারে ভক্তসহ কলকাতায় 'উদ্বোধন'-বাটিতে উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দ মাতৃচরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। স্নেহময়ী মা যখন শুনিলেন, বাবুরামের শরীর তত ভাল নহে, উৎসবস্থানের পথ দীর্ঘ ও দুর্গম, আর উৎসবে অনিয়মাদি হইবে, তখন বলিলেন, "তবে গরমের মধ্যে এতদূর নাই বা গেলে।" বাবুরাম অবনতমস্তকে আদেশ মানিয়া লইলেন। এদিকে ভক্ত তো শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন—এই অল্পক্ষণ পূর্বে যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর এখন এই! তিনিও তৎক্ষণাৎ মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মালদহ তেমন দূর নহে, আর যাতায়াত ও অবস্থানের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইবে, বিশেষত প্রেমানন্দ মহারাজ না গেলে ভক্তদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে। সব শুনিয়া মা পুনর্বার বাবুরামকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে; তবে কি তুমি যাবে?" মাতৃভক্ত উত্তর দিলেন, "আমি কি জানি মা?—যা আদেশ করবেন তাই করব।" অবশেষে মা বলিলেন, "যাও একবার এসগে, তবে বেশিদিন থেকো না।" অমনি আবার যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

এই আত্মসমর্পণের ভাব অন্যপ্রকারেও তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইত। মঠে তিনি বাস করিতেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশে—তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই করিবার উপায় ছিল না। সেই আদেশ শুধু হৃদয়েই সূক্ষ্ম অনুভূতিরূপে নামিয়া আসিত না—স্থলবিশেষে নির্দেশ দিবার জন্য বিগ্রহধারণ করিয়া ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। একবার মঠপরিচালন সম্বন্ধে গুরুভ্রাতাদের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প লইয়া মঠের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন—সঙ্গে মাত্র পরিধেয় বস্ত্র, গামছা আর এক খণ্ড কাপড়। কিন্তু যেই ফটক পার হইয়া পা বাড়াইবেন, অমনি দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার স্কন্ধস্থিত গামছা ধরিয়া আকর্ষণপূর্বক বলিতেছেন, "যাচ্ছ কোথায় চাঁদ? আমায় ফেলে যাবে কোথায়?" স্বামী প্রেমানন্দের অনির্দিষ্ট পথের যাত্রা সেখানেই সমাপ্ত হইল।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত হইলেও সাধুজনোচিত তীর্থদর্শনমানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাহিরে যাইতেন, ইহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। আচার্য বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর কয়েক বৎসর মঠে কাটাইয়া তিনি

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পুরীধামে যান। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ এবং অপর কয়েক জন সাধু-ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি ৺অমরনাথদর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীরে যান। অতঃপর ৺অমরনাথদর্শনান্তে প্রায় তিন মাস কাশ্মীরে থাকিয়া শ্রীনগরাদি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেন। কাশ্মীর হইতে তুরীয়ানন্দ সিমলায় যান এবং প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ চৌদ্দ-পনের দিন কনখলে থাকিয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্বার কাশীধামে যাইতে হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তথায় গিয়াছিলেন। তিনি পরবৎসর অক্টোবর মাস পর্যন্ত মঠে প্রত্যাবর্তন না করায় মঠবাসীরা তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহাকে আনিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কিন্তু তখনই মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন না, তিনি বরং প্রয়াগে চলিয়া গেলেন। অগত্যা প্রেমানন্দজীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেখানে তিন দিন কাটিয়া গেলেও মহারাজের বেলুড়ে আসিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া প্রেমানন্দ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তোমায় মঠে যেতেই হবে।" বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবম্প্রকার বিনয় ও কাতরোক্তিতে অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি, "বাবুরাম-দা, ওকি! ওঠ ওঠ।" বাবুরাম মহারাজ তদবস্থ থাকিয়াই পুনর্বার আকুল আবেদন জানাইলেন। অবশেষে ব্রহ্মানন্দজীকে বলিতে হইল, "বাবুরাম-দা, ওঠ ওঠ—আমি যাব।" পরদিনই সকলে মঠে রওয়ানা হইলেন। এখানে পাই অনুপম গুরুভ্রাতৃপ্রেম, আর ততোধিক অতুলনীয় অধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইহাই ভিত্তিভূমি। পরবৎসর প্রেমানন্দজী নীলাচলে যাইয়া কয়েক মাস মহারাজের সহিত কাটাইয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি শেষবারের মতো কাশীধামে গমন করেন এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। এতদ্ব্যতীত মঠজীবনের প্রারম্ভে কোন একসময়ে তিনি স্বীয় জননীকে লইয়া ৺রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতের প্রধান তীর্থগুলির প্রায় সমস্তই দর্শনপূর্বক স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সাধুত্বের স্পর্শে তাহাদেরও তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তীর্থভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীও প্রচার করিতেন। প্রথম প্রথম উহা ঘটনাচক্রে সকলের, এমন কি তাঁহার নিজের, অজ্ঞাতসারেই হইয়া যাইত। কিন্তু জীবনের শেষ কয়বৎসর এই প্রচারের প্রভাব ও প্রসার দেখিয়া লোক অবাক হইয়া গিয়াছিল। যে বাবুরাম মহারাজ মঠের খুঁটিনাটি কাজেই কালক্ষেপ করিতেন

এবং যিনি কখনও বিদ্যা বা বুদ্ধিমত্তার দাবি করিতেন না, তিনি যে একদিন সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অটুট বিশ্বাস ও প্রেমের প্রবাহে জনসমাজকে ধর্মভাবে মাতাইবেন, ইহা কে ভাবিয়াছিল? তাঁহার প্রচারশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল পূর্ববঙ্গে। তাহারও আগে উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহুবার গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁহার কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "পূর্ববঙ্গ তোর জন্য রইল।" বস্তুত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভাবে মুগ্ধ পূর্ববঙ্গের আধ্যাত্মিক সাগরে নূতন প্রেমের হিল্লোল তুলিবার উপযুক্ত শক্তি ছিল স্বামী প্রেমানন্দেরই হৃদয়ে—আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইতে তিনিই মাত্র পারিতেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভক্তদের আমন্ত্রণে রাড়িখাল (ঢাকা) যান। সেখানে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটিতে তাঁহাদের থাকিতে দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদের আগমনে সেবার উক্ত অঞ্চল প্রেমে টলটলায়মান হইয়াছিল। এমন কি, মুসলমানেরাও ঐ আনন্দে যোগ দিয়াছিলেন। স্থানবিশেষে তাঁহাদের নিকট উৎসবের চাঁদা চাহিতে না যাওয়ায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "উনি কি শুধু আপনাদের নাকি? উনি তো আমাদেরও পীর মশাই!" ঐ অঞ্চলে বহু গৃহে ঠাকুরের পূজা ও কীর্তনাদিতে লোকের উৎসাহ দেখিয়া প্রেমানন্দ বিস্মিত হইয়াছিলেন। উৎসবে তিনি বক্তৃতাদিও করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে উৎসবান্তে কলকাতা ফিরিয়া তাঁহার কলেরা হয় এবং প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। এহেন অবস্থায় একদিন বাবুরাম মহারাজকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সকলের ধারণা হইল তিনি দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভান্তে সকলের বিমর্ষ বদন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নেই, এ দেহ এখন যাবে না—মা বেঁচে আছেন।" এই রহস্য অনেকে জানিতেন না, কিংবা জানিলেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বাবুরামের মাতার নিকট ঐ সন্তানটিকে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন মাতা উহাতে সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ভগবানে যেন আমার ভক্তি থাকে, আর আমায় যেন পুত্রকন্যার শোক পেতে না হয়।" ঠাকুর সে বর দিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ সেই অমোঘ বাণীর কথা এখন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ পর্যন্ত আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অতঃপর দৈববলে অতি আশ্চর্যরূপে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অসুখের সময় পূর্ববঙ্গের মুসলমান অনুরাগীরা 'শিরনি' মানিয়াছিলেন এবং মঠে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তিনি ৺কামাখ্যাদর্শন ও পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে

যাত্রা করেন। ক্রমে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া একদিন নদীতীরে পদচারণকালে তিনি দেখিলেন যে, মহারাজ ভাবস্থ। অমনি লোককল্যাণে সদা উন্মুখ প্রেমানন্দজী নিকটস্থ ছেলেদিগকে তাঁহার পদপ্রান্তে আনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ছেলেদের আশীর্বাদ কর।" মহারাজও সাগ্রহে বলিলেন, "ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে।" ইহার পর ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি-স্থাপনান্তে তাঁহারা কাশীপুরের জমিদারবাটিতে যান। তৎপরে দেওভোগে নাগভবন-দর্শনান্তে ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ও পর দিবস বেলুড়ে উপনীত হন।

প্রেমানন্দ শেষবারে পূর্ববঙ্গে যান ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তর গমনকালে এবং তাঁহার অবস্থিতিস্থলের চারিপার্শ্বে এরূপ লোকসমাগম হইত যে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী পরে উহার সহিত মহাত্মা গান্ধীর আকর্ষণী শক্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্যেও তেমন লোকসমাগম হয় না।" প্রেমানন্দের প্রেম শুধু হিন্দু-সমাজেই আবদ্ধ না থাকিয়া মুসলমান-সমাজেও বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার খারিন্দা গ্রামে তাঁহার অবস্থানের সুযোগে জনৈক মুসলমান মৌলবী তাঁহাকে পরীক্ষা ও পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সম্মোহিনী বিদ্যায় পারদর্শী জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সকাশে উপস্থিত হন। কিন্তু কার্যত অপারগ হইয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করেন। বাবুরাম মহারাজ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া মৌলবীকে ফল মিষ্টান্নাদি আহার করিতে দিলেন; তখন মৌলবী বলিলেন, "আপনি এ যাবৎ উদার মত প্রচার করিতেছিলেন; আপনি আমার সঙ্গে এক-পাতে খাইতে পারেন?" প্রেমানন্দ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ পারি" এবং কার্যত তাহাই করিলেন। মৌলবী তখন সঙ্গী ধীরানন্দকেও আমন্ত্রণ করিলে প্রেমানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "একজন খেলেই হল; ধীরানন্দের অবস্থা এখনও ঐরূপ নহে।"

মুসলমানদের সহিত তাঁহার এরূপ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একবার ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহার উদারবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া নবাব সলিমুল্লা তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণপূর্বক ধর্মগুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেন। আর একবার মঠে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোককে কিছু খাইতে দিবার পর কেহ উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া তিনি স্বহস্তে ঐ কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুত প্রচারক, গুরু বা সেবক যেরূপেই অপরে তাঁহাকে গ্রহণ করুক না কেন, স্বামী প্রেমানন্দের প্রেম জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিতরিত হইত।

খারিন্দার পরে তিনি ঢাকায় গমন করেন এবং ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া হাসাড়া ও সোনারগাঁ প্রভৃতি গ্রামে উৎসব করিতে যান। বহির্দৃষ্টি অবলম্বনে যদিও

আমরা 'উৎসব' শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে ইহাতে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইল না; কারণ তখন তিনি উৎসব উপলক্ষে জনগণের মনে নবযুগের উপযোগী এক নূতন প্রেরণা অনুসঞ্চারিত করিতে বদ্ধপরিকর। কীর্তন, উপদেশ, বক্তৃতা, দৈনন্দিন আচরণ প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টার মধ্য দিয়া উহাই আত্মবিকাশ করিতেছিল এবং উহার প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়া সমাজ ও স্বাস্থ্যাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারা যায় যে, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামে তিনি দেখিলেন, জলাশয়গুলি কচুরিপানায় পূর্ণ—একটু পরিশ্রম করিলেই ঐগুলি পরিষ্কৃত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল ও ব্যবহারোপযোগী হয় জানিয়াও গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া প্রতিকারকল্পে তিনি প্রথমত গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও সুফল না হওয়ায় আদর্শস্থাপনার্থ স্বয়ং জলে নামিয়া পানা তুলিতে লাগিলেন। তখন গ্রামবাসীরাও তাঁহার অনুকরণে ও উদ্দীপনায় ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন।

এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বামী প্রেমানন্দ কালাজ্বরগ্রস্ত হইলেন। কলকাতায় আগমনান্তে চিকিৎসার ফলে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে বৈদ্যনাথধামে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে প্রথম বেশ উপকার দেখা গেল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তখন পৃথিবীর সর্বত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা-ব্যাধি মহামারীরূপে প্রসারিত হইয়া ক্রমে বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার দেহেও উহা সংক্রমিত হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন করিল। সংবাদ পাইয়া স্বামী শিবানন্দ অবিলম্বে মঠ হইতে তথায় গেলেন এবং তাঁহাকে কলকাতায় লইয়া আসিলেন। কলকাতায় যখন আসিলেন রোগ তখন প্রতিকারের অতীত; অতএব সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ফিরিয়া আসার চতুর্থ দিবসেই তিনি স্বধামে প্রস্থান করিলেন (৩০ জুলাই, মঙ্গলবার, বিকাল ৪টা ১৫মিঃ, ১৯১৮ খ্রিঃ)। সেই দিন সকাল হইতেই সাধুরা নামকীর্তন করিতেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিমর্ষভাবে ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। একবার ভিতরে যাইয়া প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো?—তা হলে আমাদেরও ভরসা হয়।" ঠাকুরের মানসপুত্র রাখালের মনে কখনও, এমন কি মরণকালেও, বিস্মরণ উপস্থিত হইতে পারে না, বাবুরামেরও নহে—ইহা জানিয়াও ব্রহ্মানন্দ বর্তমান জড়সভ্যতার দিনে প্রমাণস্থাপনের জন্য এবং সমবেত সাধু ও ভক্তদের মনে শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্যই সম্ভবত ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন! সেজন্য উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যেন বাবুরামও একগাল হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন আর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "কৃপা, কৃপা, কৃপা!" এই বলিয়া ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু বড়ই গম্ভীর!

মহাসমাধির পূর্বে একদিন তিনি স্বামী সারদানন্দকে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন, "চাঁপা ফুলের মতো রং কাপড় পড়তে ইচ্ছা করে, আর বেলফুলের মতো ধবধবে অন্ন খেতে ইচ্ছা করে।" শুনিয়া এক পরিপক্কবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়াছিলেন, "আমরা গৃহস্থ, অত সব জোগাড় কি করে করব?" তিনি কি করিয়া জানিবেন যে, হ্লাদিনী শক্তি হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যে মূর্তি মর্তধামে ভগবৎ কার্যসাধনের জন্য এতকাল নিয়োজিত ছিলেন, আজ তিনি স্বরূপে লীন হইতে চাহেন?—বাবুরাম মহারাজ এই দৈব ভাষায় তারই পূর্বাভাস দিলেন মাত্র।

প্রেমানন্দ স্বামী প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। নিদারুণ সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সকলের মনে মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করিল। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন!"

# স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যে কয়জন অন্তরঙ্গকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ চব্বিশ পরগণা জেলার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অম্বিকাচরণ ঘোষ এবং তাঁহার পূর্ব নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। বারাসাত-নিবাসী পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহার মাতুল ছিলেন। নিরঞ্জন মাতুল মহাশয়ের কলকাতাস্থ বাটিতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যে তিনি তীরধনু ও অস্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর ছিল এবং ব্যায়ামাদির ফলে শরীর সুদীর্ঘ, সবল ও সুঠাম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতিও তদনুরূপ নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমনের পূর্বে তিনি আহিরীটোলানিবাসী ডাক্তার প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে একটি প্রেততত্ত্বান্বেষী দলের সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা নিরঞ্জনকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম (মিডিয়াম) রূপে ব্যবহার করিতেন; কারণ তাঁহার উপর ভূতের আবেশ অতি সহজে হইত এবং এইরূপ প্রেতাবিষ্ট নিরঞ্জনের সাহায্যে ঐ দলটি দুরারোগ্য রোগ নিরাময় করা প্রভৃতি বহু অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভুতুড়েদের দলে যাতায়াত করিতে করিতে একটি ঘটনায় নিরঞ্জনের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। জনৈক ধনশালী ব্যক্তি সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর অনিদ্রায় ভুগিয়া অবশেষে নিরঞ্জনের শরণাপন্ন হন। নিরঞ্জন পরে বলিয়াছেন, "জানি না ঐ ব্যক্তি আমার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইয়াছিল কি না; কিন্তু এইরূপ ধনকুবের হইয়াও ঐ ব্যক্তিকে দারুণ কষ্ট পাইতে দেখিয়া আমার মনে ধনসম্পত্তির অসারতা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত হইল।"

বৈরাগ্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বারও তাঁহার নিকট শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইল। তিনি লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভগবৎপ্রেম ও চিত্তাকর্ষক উপদেশের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং অচিরেই প্রেততত্ত্বানুসন্ধিৎসু জনকয়েক বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে উপস্থিত

হইলেন। নিরঞ্জনের বয়স তখন আনুমানিক অষ্টাদশ বৎসর[১]—সুদীর্ঘ সুন্দর অবয়ব, আর চক্ষে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। শুনা যায়, ঐ প্রথম দর্শনের দিনেই নিরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধুরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম হইতে অনুরোধ করিলে বালকের ন্যায় সরলপ্রকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হইয়া তাঁহাদের চক্রে উপবেশন করেন; কিন্তু একটু পরেই আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান।

নিরঞ্জন যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় সকলে উঠিয়া গেলে তিনি নিরঞ্জনের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পরিচয় লইলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিরঞ্জনকে বলিলেন, "দ্যাখ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি। তা কোনটা হওয়া ভাল?" নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, "তা হলে ভগবান হওয়াই ভাল। "ফলত এইরূপে ঠাকুর সেদিন নিরঞ্জনকে ভূতুড়েদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং নিরঞ্জনও তাহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রথম দর্শনের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাই দক্ষিণেশ্বরে যেদিন প্রথম গিয়েছিল, সেদিন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ, তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস, তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তা হলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাত জানবি।" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', ৪২৮ পৃঃ)

সেদিন এইরূপ নানা কথা চলিতে লাগিল। ঠাকুরের আপন জনের সহিত কতকাল পরে আজ দৈবক্রমে দেখা হইয়াছে—আলাপ আর শেষ হয় না। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ বাড়ি নাইবা গেলি; এখানেই আজ থাক না।" নিরঞ্জন বাড়িতে বলিয়া আসেন নাই, রাত্রে থাকিলে মাতুল রাগ করিবেন; সুতরাং থাকিতে রাজি হইলেন না। ঠাকুর আবার বলিলেন, "ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাসনি, থেকে যা।" নিরঞ্জন তখনও সম্মত না হওয়ায় ঠাকুর বলিলেন, "একান্তই যাবি তো যা, কিন্তু আবার আসিস। কবে আসবি?" নিরঞ্জন শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া পদধূলি গ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ সেই প্রথম দিনের দর্শনেই তাঁহার মর্মস্থল

১ 'কথামৃত', ৩য় ভাগ, ৩০৭ পৃষ্ঠায় (অখণ্ড সং, পৃঃ ১১৪০) উল্লিখিত হইয়াছে—১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার বয়স ছিল ২৫/২৬ বৎসর। অতএব জন্মবৎসর ১৮৬২, শ্রাবণ-পূর্ণিমা ধরা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি সম্ভবত ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে আসেন।

আলোড়িত করিয়াছিল। তাই বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "থেকে গেলেই হতো।" অমনি আবার কর্তব্যবুদ্ধি স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, "না, মামা রাগ করবেন।" সেদিনকার মতো নিরঞ্জন গৃহে ফিরিলেন।

দুই-তিন দিন পরেই তিনি আর এক সন্ধ্যায় পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কক্ষের দ্বারে আগমনমাত্র ঠাকুর দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন এবং আকুলস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায়রে—তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল? আমি যে তাই ভেবে আকুল।" নিরঞ্জন অবাক!—"ইনি কে? আমার ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে আমার জন্য এঁর এত আর্তি কেন? পরের জন্য এ কি অহৈতুকী ভালবাসা!" এ রহস্য তিনি ভেদ করিতে পারিলেন না; কিন্তু গভীর আবেগপূর্ণ সেই সুধাময় বাণীতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল—তিনি সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই থাকিয়া গেলেন। শুধু তাহাই নহে, সে অপূর্ব প্রেম তাঁহাকে পরদিনও সেখানেই ধরিয়া রাখিল। এইরূপে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত হইলে চতুর্থ দিন তিনি কলকাতায় ফিরিলেন। না বলিয়া এই ভাবে তিন দিন অনুপস্থিত থাকায় মাতুল বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং নানা স্থানে ভাগিনেয়ের অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। অতঃপর চতুর্থ দিন ফিরিয়া আসিলে বিরক্তিসহকারে তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বাড়ির সকলের উপর আদেশ দিলেন, যেন নিরঞ্জনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দিন কয়েক পরই মাতুলের মন কোমল হইল। এতদ্ব্যতীত বাড়ির ভৃত্যদের অনুভূতি হইত, যেন কি এক দিব্য শক্তি নিরঞ্জনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—উঁহার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। সুতরাং শীঘ্রই তিনি আবার নির্বিবাদে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

নিরঞ্জনের সরলতা ঠাকুরকে প্রথমাবধিই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি মাস্টার মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল ইহা সত্য কি না, এইটি দেখবে বলে।" ('কথামৃত', ৫ম ভাগ, ১৪৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৩৮)। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন কাঁকুড়গাছিতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে এক মহোৎসবে ঠাকুর গিয়াছিলেন। কীর্তনান্তে তিনি ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, "এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দ-বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, 'তুই এসেছিস।' (মাস্টারকে) 'দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল।

সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না'।"(ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১ পৃষ্ঠা; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৪৯)। নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা তখন জীবিতা ছিলেন; তাই মাতার ভরণপোষণের জন্য নিরঞ্জনকে চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন না যে, তাঁহার কোন উচ্চাধিকারী যুবক-ভক্ত কাঞ্চনের বন্ধনে পড়েন। তাই ঐ দিনই নিরঞ্জনকে বলিলেন, "দেখ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাব-পত্র করতে হয় আরও নানা রকম কাজ আছে—সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি করছিস; তবে একটু তফাত আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জন্য চাকরি করতিস, আমি বলতুম—ধিক ধিক, শত ধিক, একশ ছি!" অতঃপর ঠাকুর মণি মল্লিককে বলিলেন, "দেখ, ছোকরাটি ভারি সরল। তবে আজকাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়—এই যা দোষ! সেদিন বলে গেল যে, আসবে; কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল বলছিল—তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস নাই কেন?" নিরঞ্জন বলিলেন, "আমি এঁড়েদয়ে সবে দুইদিন এসেছিলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ তারপর মাস্টার মহাশয়কে দেখাইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "ইনি হেডমাস্টার। তোর সঙ্গে দেখা করতে গিছিলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম।" (ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৪৯)।

নিরঞ্জনের সরলতা ও বৈরাগ্যের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন তাহা 'কথামৃতে'র বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। নিরঞ্জনের বৈরাগ্যসম্বন্ধে ঠাকুর একদিন (১৮৮৬ খ্রিঃ, ৫ জানুয়ারি) মণিকে বলিয়াছিলেন, "দেখছ না নিরঞ্জনকে! 'তোর এই নে, আমার এই দে'—ব্যস্; আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই।" (৩য় ভাগ, ২৭৬ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৭)। ইহার পূর্বে একদিন (১৮৮৪ খ্রিঃ, ২০ জুন) ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "বাবুরাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোকরা? যদি আর কেউ আসে, বোধ হয় ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে।...নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?" মাস্টার উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, বেশ চেহারা!" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না, চেহারা শুধু নয়! সরল। সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়।...নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল—কামিনীকাঞ্চনেই বদ্ধ করে?" মাস্টার—"আজ্ঞে হাঁ।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে ওকে দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম করে—ওতে দোষ নাই।...নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটা ছেলের ভাব।"

(৪র্থ ভাগ, ১১৪-১৫ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৬০-৬১)। বলরামভবনে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "আলেখ্ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ—খারে, নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব। তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।" আবার ঐ দিনই অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ!' ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৬৪-৬৬ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৬৮-৬৯)। কাশীপুরে (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৫) এই অনুপম স্নেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।"

এই সকল ঘটনায় ও আলাপপ্রসঙ্গে নিরঞ্জনের প্রতি ঠাকুরের অগাধ ভালবাসা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাই; কিন্তু ঠাকুর কখনও স্নেহান্ধ ছিলেন না! প্রয়োজন হইলে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার ন্যায় তিনি কঠোর শাসনেও বিরত হইতেন না—"শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনের স্বভাব উগ্রপ্রকৃতির ছিল। গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে আরোহী সকলকে ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতেও উহারা নিরস্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল এবং তিনি বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্তির সম্মুখে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অনুনয়, বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল।" ঠাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হয়েই মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায়কথা বলে, তা নিয়ে বিবাদবিসংবাদ করতে গেলে ওতেই জীবনটা কাটাতে হয়। ওরূপ স্থলে ভাববি, লোক না পোক (কীট) এবং তাদের কথা উপেক্ষা করবি। ক্রোধের বশে কি অন্যায় করতে উদ্যত হয়েছিলি, ভাব দেখি—দাঁড়িমাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল যে, সেই গরিবদের উপরও অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়েছিলি!" ('লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ—দিব্যভাব', ৯৩ পৃঃ)।

নিরঞ্জন তখন অধিক পরিমাণে ঘৃত ভোজন করিতেন জানিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "অত ঘি খাওয়া? শেষে কি লোকের ঝি-বউ বার করবি?" ভক্তকে বিচারবুদ্ধিহীন হইতে তিনি নিষেধ করিতেন। অনুধাবন না করিয়া কিংবা আদর্শের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন মতামত পোষণ বা প্রকাশ করিলে ঠাকুর

তখনই সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছিলেন, "এত ঐশ্বর্যভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করত, লোকে বলত, ধিক।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।" ঠাকুর কোন উচ্চস্তর হইতে কথা বলিতেছেন তাহা নিরঞ্জনের ধারণা হয় নাই দেখিয়া তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "রেখে দে ওসব কথা! আর জ্বালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ! তবে সংসারী একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ।...ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখবে না—পাছে আসক্তি হয়।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১৬৩-৬৪ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫৩০-৩১)

আবশ্যকক্ষেত্রে এইরূপ কঠিন শাসনাদি করিলেও ঠাকুরের কথায় ও কার্যে ভালবাসা ও বিশ্বাস শতধারে প্রবাহিত হইত। লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাইকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে ছুঁয়ে দিলেন। তাতেই তিন দিন, তিন রাত্রি তার চোখের পাতা পড়েনি, কেবল জ্যোতি দেখেছে আর জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছুটে যায় নি। ভারী ভূত নামাত কি না, তাই তিনি মস্করা করে বলেছিলেন—'এবার আর যে-সে ভূত নামেনি, একেবারে ভগবান ভূত ঘাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কি যে তুই তাকে ঘাড় থেকে নামাস'।" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', ৪২১ পৃঃ)।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের কোনও এক সুযোগে ঠাকুর নিরঞ্জনকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। "ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর স্পর্শ করা ভিন্ন কখনো কখনো আণবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষাপ্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠিবিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐরূপ কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।" ('লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ—দিব্যভাব', ২১৬ পৃঃ)।

নিরঞ্জনও ঠাকুরের প্রেমে ও অধ্যাত্মস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া তাঁহাকেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই শ্যামপুকুরে যে রাত্রে (৬ নভেম্বর, ১৮৮৫) গিরিশাদি ভক্তগণ

ঠাকুরের দেহে মা কালীর আবির্ভাব-সন্দর্শনে শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সে রাত্রে নিরঞ্জনও ভক্তিগদগদ চিত্তে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলিয়া অঞ্জলিপ্রদানান্তে শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বরূপের পরিচয় ছাড়াও বড় জিনিস ছিল, ঠাকুরের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা—যাহার ফলে ত্যাগী সন্তানেরা ঠাকুরের একান্ত আপনার জন হইতে পারিয়াছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রিঃ, ২৩ ডিসেম্বর) নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছল। তুই বল দেখি, কি রকম বোধ হয়?" নিরঞ্জন কোন ইতস্তত না করিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ৩২৮ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১১)।

নিরঞ্জন একে তো শক্তিশালী ও বীরভাবাপন্ন ছিলেন, তাহাতে আবার ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা নিজের একান্ত কর্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অপরের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইত সত্য, কিন্তু সর্বদাই ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার ঐকান্তিকতা দেখিয়া আগন্তুকগণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং মুগ্ধ হইতেন। ঠাকুরের অসুখের শেষ অবস্থায় যুবক ভক্তেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের নিকট যখন-তখন যাহাকে-তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। বীরভক্ত নিরঞ্জন অগ্রণী হইয়া এই অত্যাবশ্যক অথচ অপ্রিয় কার্যের ভার লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় একদিন ঠাকুরের নিকট যাইতে চাহিলে নিরঞ্জন তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন রামবাবু কিছু মিষ্টি ও মালা লাটুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।" লাটু ইহাতে দুঃখিত হইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "এঁকে উপরে যেতে দাও না , ভাই। আপনা-আপনির মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে?" নিরঞ্জন কিন্তু তখনও অটল। লাটু খোঁটা দিয়া বলিলেন, "শ্যামপুকুরে সেদিন দানা-কালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে, আর আজ এঁর মতো লোককে ছাড়তে চাইছ না?" পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে বিনোদিনী নাম্নী এক ভক্তিমতী অভিনেত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের (দানা-কালীর) নিকট ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বিশেষ আর্তি প্রকাশ করে। ঐ সময়ে নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ঐ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠাকুরের নিকট যাইতে দেওয়া হইবে না; কারণ ইহাদের স্পর্শে ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি পায়। দানা-কালী তখন অনন্যোপায় হইয়া বিনোদিনীকে সাহেব সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া আসেন এবং এই ভাবে দ্বারী নিরঞ্জনকে ফাঁকি দিয়া তাহাকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করেন। সেখানে গিয়া দানা-

কালী অবশ্য সমস্ত খুলিয়া বলেন এবং এই প্রহসনের পর হাসিঠাট্টাও হয়। যাহা হউক, আলোচ্য দিবসে লাটুর কথায় নিরঞ্জনের মন গলিল এবং তিনি রামবাবুকে বলিলেন, "আপনি উপরে যান্।" অতঃপর লাটু উপরে গেলে অন্তর্যামী ঠাকুর সেই দিনকার সব জানিয়াই যেন লাটুকে বলিলেন, "দেখ, কারুর কখনও দোষ দেখবিনি, লোকের কেবল গুণ দেখবি।" ঠাকুরের কথায় লাটুর বড় দুঃখ হইল এবং তিনি নিচে নামিয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "ভাই, আমার মতো মুখ্যুর কথায় দুঃখ করিসনি।" বলা বাহুল্য নিরঞ্জন স্বীয় কর্তব্য পালন করিতেছিলেন, তাঁহার তখন সুখ-দুঃখের অবসর কোথায়?

এক পাগলিনী মাঝে মাঝে কাশীপুরে আসিয়া বড়ই উৎপাত করিত বলিয়া যুবক ভক্তেরা স্থির করেন যে, তাহাকে আর উপরে যাইতে দেওয়া হইবে না। একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া সে জেদ করিতে লাগিল—সে উপরে যাইবেই। এদিকে নিরঞ্জনও কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিবেন না। ইতোমধ্যে উপর হইতে খবর আসিল, ঠাকুর পাগলীকে ডাকিয়াছেন। সুতরাং শশী তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন। পাগলী উপরে গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি অধিকাংশ যুবক ভক্তদের বিরক্তি বৃদ্ধি পাইল বৈ হ্রাস হইল না। এই সময়ে কোমলহৃদয় রাখাল একদিন (১৮৮৬ খ্রিঃ, ১৬ এপ্রিল) শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে আলাপপ্রসঙ্গে পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "দুঃখ হয় সে উপদ্রব করে, আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোর মাগ আছে, তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।" রাখালও বৈরাগ্যের নামে নিষ্ঠুরতা সহ্য না করিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বাহাদুরি ওঁর সামনে ঐসব কথা।" ('কথামৃত', ২য় ভাগ, ২৬৬ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০৪২)। দুইটি আদর্শের এক অপূর্ব সংঘর্ষ—একদিকে গুরুসেবা, অপর দিকে মাতৃজাতির সম্মান ও ভক্তপ্রীতি!

কর্তব্যানুরোধে ও বৈরাগ্যের প্রথমাবেগে নিরঞ্জনকে আপাতত একটু উগ্রপ্রকৃতির লোক মনে হইলেও তাঁহার চরিত্রে কোমলতার অভাব ছিল না। বস্তুত তিনি সময়বিশেষে যেমন বজ্রাদপি কঠোর হইতেন, তেমনি কুসুমাদপি মৃদুও হইতে পারিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে যখন নরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে আঁটপুরে যান তখন নিরঞ্জনও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে স্নান করিতে যাইয়া সারদা মহারাজ ডুবিয়া যান। তখন নিরঞ্জনই স্বীয় প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করেন। এই সব কার্যে তাঁহার অপূর্ব তৎপরতা ও উৎসাহ ছিল। মঠের প্রথমাবস্থায় শশী মহারাজ একবার বাইরে যাইয়া জ্বরগ্রস্ত হন। সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে সযত্নে মঠে লইয়া আসেন এবং শুশ্রূষাদি দ্বারা

নিরাময় করেন। স্বামী যোগানন্দ যখন এলাহাবাদে বসন্তে আক্রান্ত হন, তখনও নিরঞ্জন অবিলম্বে তাঁহার রোগশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হন। লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "কারুর অসুখ শুনলে, দৌড়ঝাঁপের কাজ নিরঞ্জন ভাই নিজের মাথায় নিত।" ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া হইলে নিরঞ্জন তাঁহার সেবার অনেকখানি দায়িত্বই নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। বলরামবাবুর শেষ অসুখের সময়ও স্বামী শিবানন্দ এবং সদানন্দের সহিত প্রাণ ঢালিয়া তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

মঠ যখন বরাহনগরে ছিল, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন এক ছোট ঠোঙ্গায় করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য সন্দেশ আনিতেছিলেন। তখন কোনও দরিদ্র রমণী একটি ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। ছেলেটি নিরঞ্জনানন্দের হাতে খাবারের ঠোঙ্গা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমি সন্দেশ খাব।" মা যত শাসন করে, ছেলের কান্না ততই বাড়িয়া চলে। দেখিয়াই নিরঞ্জনানন্দ সন্দেশগুলি ছেলেটির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "খাও বাবা, খাও।" কথা শুনিয়া রমণী বলিল, "না বাবা, তুমি ঠাকুরসেবার জন্য সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছ; এ খেলে ছেলের অমঙ্গল হবে।" নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "না মা, ছেলের কোন দোষ হবে না। ও খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে।" এই বলিয়া ঠোঙ্গাটি বালকের হস্তে দিয়া পুনরায় ঠাকুরের জন্য সন্দেশ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল—তাঁহার পূত দেহাবশেষ গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; কিন্তু প্রবীণগণ যখন স্থির করিলেন যে, উহা কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন কপর্দকহীন যুবক ভক্তগণ অন্য কোন পথ না দেখিয়া আপাতত ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষার জন্য বলরাম-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং অতঃপর চিতাবশেষও যাহাতে হস্তচ্যুত না হয় তাহার উপায়-উদ্ভাবনে যত্নপর হইলেন। প্রবীণ ও নবীনদের এই মতদ্বৈধস্থলে মধ্যস্থ নরেন্দ্র অবশ্য প্রবীণদের দিকেই মত দিয়া তখনকার মতো বিরোধের মীমাংসা করিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে শশী ও নিরঞ্জন গোপনে পরামর্শ করিয়া একটি নূতন পাত্রে "অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয়" সরাইয়া রাখিলেন এবং যথাকালে অবশিষ্ট অস্থিপূর্ণ পূর্বের তাম্রকলসীটি প্রবীণদের হস্তে তুলিয়া দিলেন। শশী ও নিরঞ্জনের সংরক্ষিত অস্থিই পরে 'আত্মারামের কৌটা'য় করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে আনেন; ইহা অদ্যাপি তথায় রহিয়াছে। ('উদ্বোধন' ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে[১] তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হন। মঠে নিরঞ্জনানন্দের প্রধানত

---

১ 'কথামৃত' ৩য় ভাগ পরিশিষ্ট; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১৩১।

তপস্যার দিকেই ঝোঁক দেখা যাইত। তবে তিনি মঠের দৈনন্দিন শ্রমসাধ্য কার্য যথেষ্ট করিতেন এবং পূজাদিতেও অপরকে সাহায্য করিতেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে মঠবাস তাঁহার হয় নাই; কারণ অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় তিনিও মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে যাইতেন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি একবার পুরীধামে যান এবং ৮ এপ্রিল মঠে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি তপস্যায় নির্গত হইয়া প্রথমে দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথ দর্শন করেন। দেওঘর হইতে তিনি কাশীতে যান এবং বংশীদত্তের বাটিতে থাকিয়া কিছুদিন তপস্যা করেন। ঐ সময়ে মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহার সম্বল ছিল। ইতোমধ্যে স্বামী যোগানন্দের অসুখের সংবাদ আসাতে তাঁহাকে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইতে হয় এবং এই সুযোগে সেখানে তাঁহার কল্পবাসও হয়। পরে তিনি উত্তর ভারতের অপরাপর তীর্থদর্শন করেন এবং কোন কোন স্থলে কিছুকাল তপস্যাও করেন।

স্বামী বিরজানন্দ যখন ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় ও ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিতে যাইতে দেখিতেন, বিরজানন্দও মধ্যে মধ্যে সঙ্গে যাইতেন। মঠে যোগ দিবার পূর্ববর্তী গ্রীষ্মাবকাশটি মঠে কাটাইয়া বিরজানন্দ মহারাজ আবার যখন গৃহে ফিরিয়া যান, তখন নিরঞ্জনানন্দজী মাঝে মাঝে তাঁহার বাটিতে যাইয়া তাঁহার বৈরাগ্য উদ্দীপিত করিতেন। পরে তিনি বিরজানন্দকে লইয়া কয়েকবার জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার বিরজানন্দ যখন ম্যালেরিয়া লইয়া জয়রামবাটী হইতে মঠে আসেন, তখন স্নেহপরায়ণ নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তাঁহাকে গিরিশবাবুর নিকট লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাও শুনাইতেন।

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের ২২/১০/৯৪ তারিখের পত্রে জানিতে পারা যায় যে, নিরঞ্জনানন্দ তখন সিংহলে উপস্থিত। স্বামীজী লিখিতেছেন—"নিরঞ্জন সিলোনে পালিভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে? অনর্থক ভ্রমণে কি ফল—তা তো বুঝিতে পারি না।" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অবশ্য অনর্থক ভ্রমণ করিতেছিলেন না—সাধুর ভ্রমণ কখনই একেবারে ব্যর্থ হইতে পারে না। তিনি যখন যেখানে যাইতেছিলেন, সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকীর্তন করিতেছিলেন এবং সর্বত্রই এইরূপে অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বামীজীও যে ইহা অবগত ছিলেন না তাহা নহে, তাই ঐ সময়ের কিছু পূর্বে অপর এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন এখন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে

যাবে। আমি খবর রাখছি।" সিংহল হইতে ফিরিয়া আসার পরেও তাঁহার সৎকার্যের প্রশংসা করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে।" বস্তুত স্বামীজী চাহিতেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতারা যিনি যাহাই করুন না কেন, তাহা যেন আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই সদিচ্ছাই অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনার রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। যাহা হউক, ঐ সময়ে নিরঞ্জন মহারাজ কিছু দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে কাটাইয়া অবশেষে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পূর্বেই আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

ক্রমে সংবাদ আসিল যে, স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। খবর পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্রুত কলম্বো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পর বৎসর ১৫ জানুয়ারি স্বামীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা জানাইলেন। অতঃপর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া কলকাতায় উপস্থিত হইলেন। ঐ বৎসর স্বামীজীর উত্তরভারত-ভ্রমণকালেও তিনি তাঁহার সহিত পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু স্থানে গিয়াছিলেন। আবার ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী যখন আলমোড়ায় যান তখনও তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

ঐ বৎসর তিনি আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে আসিয়া বংশীদত্তের বাগানে পুনর্বার তপস্যায় রত হন। তখন তাঁহারা মাধুকরী করিয়া খাইতেন। কাশীতে অবস্থানকালে চারুবাবুর (স্বামী শুভানন্দের) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইতঃপূর্বে চারুবাবু যখন একবার আলমবাজার মঠে যান তখন সেখানে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত পরিচিত হন। অধুনা ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গকে সন্নিকটে পাইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন। তখন কাশীর কয়েকটি যুবক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মৌলিকদের (স্বামী অচলানন্দ) বাড়িতে সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনাদি করিতেন। চারুবাবুর নিকট ঐ সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ একদিন ঐ সভায় যোগ দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে চারুবাবু সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক পার্ষদ কাশীতে আছেন এবং আগামী বৈঠকে তিনি উপস্থিত হইবেন। এই সংবাদে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। চারুবাবু কর্তৃক আনীত শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি পূর্ব হইতেই কেদারনাথের গৃহে রক্ষিত ছিল। সেই দিবস উহা পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইল। পরে সায়ংকালে নিরঞ্জন মহারাজ যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের গুণানুকীর্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণ

তাঁহার ভাবমাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে তিনি কেদারনাথের গৃহে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পূজাদি সমাপন করিলেন। আয়োজন অল্প হইলেও সেদিন ভক্তদের উৎসাহ ছিল বিপুল; বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের উপস্থিতি ও তাঁহার মুখে ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রসাদবিতরণও হইয়াছিল। এইভাবে স্বামী নিরঞ্জনানন্দেরই পৌরোহিত্যে কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব প্রবর্তিত হয় এবং অতঃপর সেখানে নিত্য সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আলোচিত হইতে থাকে।

কাশীধামে কিছুদিন তপস্যাদিতে কাটাইয়া নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। এদিকে কেদারনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ হরিদ্বার যাইবার পথে কাশীতে নামিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথের বৈরাগ্য চরমে উঠিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু একদিন বলিলেন, "আর কেন মশায়, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন।" কেদারনাথ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় যাব?" চারুবাবু বলিলেন, "হরিদ্বারে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী আছেন। আপনি কিছুদিন তাঁর নিকটে গিয়া থাকুন। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।" কেদারনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় চারুবাবু হরিদ্বারে পত্র লিখিয়া নিরঞ্জনানন্দকে কেদারনাথের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। উত্তরে নিরঞ্জন মহারাজ অতি স্নেহপূর্ণ ভাষায় কেদারনাথকে এই পথের বিপুল বাধা-বিপত্তির কথা জানাইলেন এবং কঠোপনিষদের "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কেদারনাথের হৃদয়ে কিন্তু তখন প্রবল বৈরাগ্য। তিনি অন্তরের আগ্রহ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের একদিন হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ এই সময়ে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন। কেদারনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছি।" নিরঞ্জন মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেখানে রাখিলেন এবং গেরুয়াবস্ত্র দিয়া কি ভাবে মাধুকরী করিতে হয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে হয় ইত্যাদি সাধূচিত বৃত্তি শিখাইয়া দিলেন।

কেদারনাথের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রায় আড়াই মাস পরেও শরীর সুস্থ না হওয়ায় তিনি কেদারনাথকে লিখিলেন, "আমার শরীর

অত্যন্ত খারাপ এবং সেবাদির অসুবিধা হইতেছে। তুমি চলিয়া আসিলে ভাল হয়।” কেদারনাথ পত্র পাইয়াই অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় নিরঞ্জন মহারাজ ভবানীচরণ দত্ত লেনে মাস্টার মহাশয়ের একখানি ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা প্রায়ই তথায় যাইয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই অসুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং এক সময়ে জীবনসঙ্কটও উপস্থিত হইয়াছিল।

কেদারনাথ কলকাতায় আসিয়া একান্তমনে একাকীই দিবারাত্র নিরঞ্জন মহারাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পরে প্রয়োজনবোধে স্বামী বোধানন্দ মঠ হইতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই উভয়ে অসুস্থ হইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দ সেবার ভার লইলেন। এই সময়ে অখিল মিস্ত্রীর গলিতে অপর একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া রোগীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। জনৈক ভক্ত ঐ বাড়ির ভাড়া এবং চিকিৎসা ও পথ্যাদির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। কেদারনাথ মঠে মাত্র তিন-চারি দিন থাকার পরেই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের আহ্বানে পুনঃ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন, কিন্তু ইহাতে দুর্বল শরীর শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি কাশীতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথায় যাইয়া কেদারনাথ স্বীয় মানসিক অশান্তি জানাইয়া নিরঞ্জন মহারাজকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, “জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাও, তথায় আমার সহিত দেখা হইবে।” নিরঞ্জনানন্দ আশা করিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। কিন্তু শরীর আরও খারাপ হওয়ায় সেবারে তাঁহার আর জয়রামবাটী যাওয়া হইল না। যাহা হউক সকলের ঐকান্তিক যত্নে ও ঠাকুরের কৃপায় তিনি দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রা সারিয়া উঠিলেন।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে (১৯০০ খ্রিঃ ডিসেম্বর) ভারতে ফিরিয়া আসিলে নিরঞ্জনানন্দ পুনর্বার তাঁহার সাহচর্যলাভের সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী যখন কাশীধামে বাস করিতে যান তখন তিনি তাঁহার জন্য বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদোপম বাড়িটি সংগ্রহ করিয়া দেন। ঐ সময়েরই কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ভারতে আসিয়া প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে তাঁহার সঙ্গে দেন এবং ওকাকুরা ও নিরঞ্জনানন্দ একসঙ্গে বুদ্ধগয়া, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করেন। ওকাকুরা নিরঞ্জন মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া স্বামীজীকে লিখিত পত্রে অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারির শেষে কাশীধামে স্বামীজী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে মহাপুরুষ শিবানন্দের সহিত নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে বেলুড় মঠে লইয়া আসেন। মঠে আসিয়াও সেবায় নিরত নিরঞ্জন মহারাজ পাগড়ি-মাথায় যষ্টিহস্তে স্বামীজীর দ্বার রক্ষা করিতেন এবং ইহাতেই বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন। এই সেবাকালে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা হয় এবং উহাতে তাঁহার রহস্যবোধের আভাস পাওয়া যায়। স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত একজন ব্রহ্মচারী একদিন মায়াবতী হইতে আসিয়া স্বামীজীর দর্শন ভিক্ষা করেন। দ্বারে উপস্থিত নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে চিনিতেন না; সুতরাং ভিতরে যাইতে দিলেন না। কিন্তু চতুর ব্রহ্মচারী ইহাতে নিরস্ত না হইয়া কথার অবসরে একটু সুযোগ পাইয়া দ্বাররক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গিয়া স্বামীজীর চরণবন্দনা করিলেন। অতঃপর স্বামীজীর নিকট হইতে ব্রহ্মচারীর পরিচয় পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার উপর একটুও রাগ না করিয়া বরং অবলম্বিত কৌশলের জন্য খুব হাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ের আর এক ঘটনায় তাঁহার নিস্পৃহতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। স্বামীজী যখন কাশীতে ছিলেন, তখন কলকাতার কোন এক ভদ্রলোক কাশীতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক যদি আর্তদের জন্য সেখানে কিছু করিতেন তবে তিনি হাজার মন্দির নির্মাণের ফল পাইতেন। লোকমুখে স্বামীজীর এই মন্তব্য শুনিয়া ভদ্রলোক তথাকার পুওর মেনস রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনে (পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে) প্রচুর অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানান। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার উৎসাহ কমিয়া যাওয়ায় তিনি যখন প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্রা হ্রাস করিয়া অনেক কম টাকা দিতে চাহিলেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজ বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর দান প্রত্যাখ্যান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি নিরঞ্জনানন্দের শ্রদ্ধা ছিল অনুপম। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একবার একখানি পত্রে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন লাঠি-বাজি করে; কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।" বস্তুত এই ডানপিটে মানুষটির অন্তস্তল যে কত কোমল, কত ভক্তিশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কেহ বাহির হইতে বুঝিতে পারিত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অনন্ত ভাব লোকসমক্ষে প্রকটিত করিবার জন্য যেসব সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র লোকাতীত এবং বিস্ময়কর; অতএব বাহ্যত কঠোরহৃদয় নিরঞ্জন মহারাজের হৃদয়ে কোথায় কোন্ দেবদুর্লভ ভাব আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিব কিরূপে? তাঁহার

মাতৃভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় কবি গিরিশচন্দ্রের কথায় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে অনেক ভক্তই শ্রীশ্রীমাকে শুধু গুরুপত্নীরূপে জানিতেন—জগজ্জননীরূপে তিনি তখনও অনেকের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন নাই। ঐ সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত দানা-কালীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকারের ছবি দেখিতে পাইলেও মায়ের ছবি না দেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানা-কালী ঠাকুরকে দেখাইয়া বলেন, "ইনিই আমার মা, ইনিই আমার বাবা।" এই ঘটনা উক্ত ভক্ত গিরিশচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলেন, "আমিই কি প্রথমে মানতুম—নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিলে।" বস্তুত ঐ সময় অপর কেহ কেহ মায়ের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্যে উহা প্রচার করিতেন না—মনে মনেই ঐ ভাব পোষণ করিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ কিন্তু সমস্ত কার্পণ্য বর্জন করিয়া ভক্তমহলে উহা বলিয়া বেড়াইতেন এবং আবশ্যক স্থলে যুক্তিতর্কের দ্বারা অপরকে স্বমতে আনিতেন। গিরিশচন্দ্র যখন পুত্রশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া কোনও অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে এই অমোঘ ঔষধের সন্ধান দেন এবং পরে স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া গিয়া কিছুদিন জয়রামবাটীতে মাতৃভবনে বাস করেন। গিরিশবাবুকে জয়রামবাটী লইয়া যাইবার সময় স্বামী সুবোধানন্দ এবং ব্রহ্মচারী কানাই, হরিপদ প্রভৃতিও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং তিনি সানন্দে সকলের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ধমানের পথে উচালন ও কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। তখন পনেরো-ষোল দিন অবস্থানের পর নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশবাবু ব্যতীত সকলে ফিরিয়া আসেন; গিরিশবাবু ও নিরঞ্জন মহারাজ আরও কিছুদিন তথায় ছিলেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিরঞ্জন মহারাজ অধিকদিন ধরাধামে ছিলেন না। বেলুড় মঠ ও কলকাতায় থাকাকালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি আমাশয়ের বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি হরিদ্বারে যাওয়া স্থির করিলেন। যাত্রার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার ভক্তি শতধা উথলিয়া উঠিল। ইহার কারণ কেহ স্থির করিতে পারিলেন না—হয়তো তিনি চিরবিদায়ের আহ্বান অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন এবং উহারই এইভাবে কথঞ্চিৎ বাহিরে উন্মেষ হইয়াছিল। যাত্রার কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি আবদার ধরিলেন, মা যেন তাঁহার সব করিয়া দেন। মাতৃ-হস্তে রন্ধন, মাতৃ-হস্তে আহার প্রভৃতি সমস্ত কার্যের জন্য তিনি মায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন—যেন মায়ের অসহায় সন্তান, মা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। শেষমুহূর্তে যখন সত্যই বিদায় লইতে আসিলেন, তখন ধৈর্যের বাঁধন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—অবোধ শিশুর ন্যায় নিরঞ্জন মহারাজ মায়ের দুটি চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। কী সেই করুণ মিনতি, আর কী সেই মাতৃচরণে আকুল প্রার্থনা! তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—অন্তরে জানিলেন ইহাই শেষ বিদায়।

হরিদ্বারে আসিয়া তিনি এক ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তপস্যায় রত হইলেন। অতএব শরীরের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতে লাগিল। তিনি আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন; তদুপরি অকস্মাৎ বিসূচিকা দেখা দিল। সেই প্রাণঘাতী রোগেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে (২৭ বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) বীরভক্ত জগজ্জননীর ক্রোড়ে বীরশয্যায় চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—সে দৃশ্য একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক, অপরদিকে তেমনি বৈরাগ্যমণ্ডিত। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীসকাশে তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেবক কত অনুরোধ জানাইল শেষমুহূর্তে সান্নিধ্যলাভ ও সেবার অনুমতি পাইতে; কিন্তু নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মন তখন সপ্তম সুরে বাঁধা, আর গীতার বাণী স্মরণ হইতেছে "অরতির্জনসংসদি"—জনসমাজে বিরক্তি! তাই সেবককে সে অনুমতি দিলেন না; এমন কি, সেবক আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিকটে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দের দুর্বল দেহেও কোথা হইতে যেন অমিত বলসঞ্চার হইল, চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল, আর বিরক্তির সুরে বলিলেন, "তুমি কি আমায় নিশ্চিন্তমনে মরতেও দেবে না?" সন্ত্রস্ত সেবক সরিয়া গেলেন। তিনি আবার যখন ফিরিলেন, তখন অঞ্জনবিহীন, বন্ধনশূন্য নিত্যনিরঞ্জন জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া চিরসমাধিতে নিমগ্ন!

# স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন্দ যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূকৈলাসের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত তাঁহাদেরও উপাধি ছিল ঘোষাল। তাঁহার পিতা শ্রীযুত রামকানাই ঘোষাল মোক্তারি পাস করিয়া বারাসতে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং উহাতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভান্তে রানী রাসমণির মোক্তার নিযুক্ত হন। কলকাতা হইতে যশোহরগামী বড় রাস্তার উপরে রানীর একটি ছোট কাছারি-বাড়ি ছিল। ঘোষাল মহাশয় ঐ বাড়িতেই সপরিবারে বাস করিতেন এবং ঐ বাড়িতেই ১২৬১ সালের ২ পৌষ (ইং ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৪) চান্দ্র অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে স্বামী শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। পিতা রামকানাই এবং মাতা বামাসুন্দরী অনেককাল পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় ৺তারকেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বৎসরাধিক কাল ব্যাকুলমনে পুরশ্চরণ উপবাস ও প্রার্থনাদি করিতে থাকেন। অবশেষে একরাত্রে বামাসুন্দরী স্বপ্নে দেখিলেন, বাবা ৺তারকেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি—তুমি সুপুত্রের জননী হইবে।" ৺তারকেশ্বরের কৃপায় লব্ধ সন্তানের নাম হইল তারক; আর তাঁহার আদরের ডাক নাম হইল ফুনু। জ্যোতিষীরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া জানাইলেন যে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরে নবজাতকের সন্ন্যাসযোগ রহিয়াছে, আর যদি সে একান্তই গৃহে থাকে তবে রাজসম্মানের অধিকারী হইবে।

তারকের পিতা দেবীভক্ত ছিলেন। তিনি বাড়িতে তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপনপূর্বক নিয়মিত উপাসনা করিতেন। প্রশস্ত তিথ্যাদিতে বিশেষ পূজায় অনেকে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে প্রসাদ পাইতেন। দূর দেশ হইতে সাধকগণ আসিয়া কখনও কখনও ঘোষালভবনে আতিথ্যস্বীকার করিতেন। ঘোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন অপরদিকে তেমনি ব্যয় করিতেন মুক্তহস্তে। তিনি বারাসতের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পঁচিশ-ত্রিশটি ছাত্রকে বাড়িতে প্রতিপালন করিতেন। তারকের গর্ভধারিণী বামাসুন্দরী দেবী খুবই ধর্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন, আর দেখিতে ছিলেন অতি সুন্দরী। ছাত্রদের ও পরিবারের সকলের রন্ধনাদি তিনিই করিতেন—রামকানাই পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে চাহিলেও রাজি হইতেন না। তারক ঐ পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলেদেরই মতো প্রতিপালিত হইতেন। প্রতিবেশিনী কেহ যদি অভিযোগ করিতেন, "ছেলেটাকে একটু আদর-যত্ন

করছে না'', তাহাতে মাতা উত্তর দিতেন, "তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন, তিনি ওকে দেখবেন।'' ভক্তিমতী জননী স্নেহপুত্তলি তারককে ৺তারকনাথের হস্তে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে দৈনন্দিন কর্মে মগ্ন থাকিতেন।

কর্মোপলক্ষে ঘোষাল মহাশয় দক্ষিণেশ্বরেও যাইতেন এবং গঙ্গাস্নানান্তে লাল চেলি পরিয়া ৺মায়ের মন্দিরে ধ্যান করিতেন। তাঁহার যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ, আর বুকটা সর্বদাই লাল—দেখিয়া মনে হইত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। সঙ্গে একজন গায়ক থাকিত। ধ্যানে মগ্ন থাকাকালে গায়ক পশ্চাতে বসিয়া দেহতত্ত্ব ও শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিত, আর ধ্যাননিরত সাধকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকিত। মন্দির হইতে তিনি যখন বাহির হইতেন, তখন ভয়ে কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিত না। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সাধনকালে ঠাকুরের যখন অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তখন ঘোষাল মহাশয় সমস্ত শুনিয়া ইষ্টকবচ-ধারণের পরামর্শ দেন। এই কবচধারণ করা অবধি ঠাকুরের গাত্রদাহ একেবারে কমিয়া যায়।

সাধক পিতা ও ধর্মপ্রাণা জননীর একমাত্র আদরের দুলাল তারক ক্ষুদ্র শহরের গ্রামোচিত শ্যামল আবেষ্টনের মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচে খেলিয়া বেড়াইতেন। বাবার বাক্স হইতে টাকা-পয়সা লইয়া পুকুরের জলে ছিনিমিনি খেলিয়া হাততালি সহকারে নাচিতেন। তিনি জিলাপি খুব ভালবাসিতেন; বাবা প্রিয়দর্শন বালকের জন্য থালার মতো বড় জিলাপি করাইয়া আনিতেন। জীবজন্তুর মধ্যে কুকুর ছিল তাঁহার বড় আদরের—রাত্রে শয়নকালেও সে হইত তাঁহার সাথী। গাজনের ছড়া ছিল তাঁহার মুখস্থ, আর গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে পরাস্ত করা ছিল এক অদ্ভুত খেয়াল। তিনি রাস্তায় গণ্ডি টানিয়া ছড়া কাটিতেন; আর সন্ন্যাসীদের ঐরূপ গণ্ডি অতিক্রম করিতে নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকারপূর্বক কাকুতিমিনতি করিয়া নিস্তার পাইতে হইত।

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল বারাসত মিশনারি স্কুলে। সেখানে অল্পদিন অধ্যয়নের পর তিনি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু মেধাবী হইলেও বালকের পাঠে মনোযোগ ছিল না—তিনি ছিলেন ভাবুক। শুনিয়া শুনিয়া তিনি অনেক ভজনগান শিখিয়াছিলেন। সুকণ্ঠ বালকের মুখে শ্যামাসঙ্গীত শ্রবণে অনেকে মুগ্ধ হইতেন।

তারকের বয়স যখন প্রায় নয় বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। একটি তিন মাসের শিশু ভগ্নীকে রাখিয়া জননী পরলোকগমন করিলে নয় বৎসরের বালকের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ভগ্নীটির লালনপালনে

মনোনিবেশপূর্বক কথঞ্চিৎ ঐ শোকের উপশম করিতে হইল। কয়েক বৎসর পরে পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিলে বিমাতাই মাতৃহীন ভগ্নীর লালনভার লইলেন। বামাসুন্দরী দেবীই কিন্তু ছিলেন পরিবারের লক্ষ্মী; তাঁহার দেহত্যাগের পর ঘোষাল মহাশয়ের আয় অনেক কমিয়া গেল। অধিকন্তু দানপরায়ণ কানাইবাবু অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই; সুতরাং পরিবারে ক্রমেই অর্থাভাব দেখা দিতে লাগিল।

মাতৃবিয়োগের পর তারকনাথ ছুটির সময়টা নিমতা গ্রামে বড়মামার নিকট কাটাইয়া আসিতেন—মামী তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কখনও বা তিনি পৈতৃক গ্রামে বেড়াইতেও যাইতেন। এই গ্রামে ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানপরায়ণ জীবন অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়াছিল; শান্ত পল্লির দীঘির ধারে একান্তে বসিয়া তিনি উদাসমনে গান গাহিতেন আর অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেন। পল্লির সৌন্দর্য, আকাশের অসীমতা আর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানের খোরাক যোগাইত।

তারকনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন ম্যালেরিয়ার কঠিন আক্রমণে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। আরোগ্যলাভান্তে তিনি অন্যত্র বায়ু-পরিবর্তনের জন্য যান এবং বৎসরাধিক পরে সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে বারাসতে ফিরিয়া পুনর্বার পাঠাভ্যাসে মন দেন। ইহার প্রায় বৎসরাধিক কালের মধ্যেই দুইটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি খুবই ব্যথিত হন। তাঁহার দিদি চণ্ডীদেবী দুইটি সন্তানের মাতা হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মধ্যমা ভগিনী ক্ষীরোদাও বালবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লন। নবম বর্ষ বয়স হইতে পরপর এইরূপ দুঃখের সম্মুখীন হইলে শুদ্ধমনে স্বভাবতই বৈরাগ্য আসে। স্বভাবত অন্তর্মুখ তারকনাথ যে অতঃপর অন্তরের আরও নিবিড়তর প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া প্রাণের দেবতার অমৃত স্পর্শের জন্য লালায়িত হইবেন—ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরুভারে পীড়িত হইয়া অকস্মাৎ তীর্থাদিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঠাভ্যাস এইখানেই সমাপ্ত হইল; কিন্তু স্বাবলম্বী তারকনাথ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রয়োজনবোধে রেলওয়েতে চাকরি লইলেন। এই চাকরি উপলক্ষে তাঁহাকে কয়েক বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে কাটাইতে হইয়াছিল। তৎকালীন মনোভাব সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কখনও বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না এ ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এই ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম।"

শৈশব হইতেই তিনি মা কালীর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কেবলই মনে হইত, "বিরাট ভগবান—কি করে এতটুকু মূর্তির ভেতর বদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব?" জ্যোৎস্না রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া বা অন্ধকারে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিতেন এক নিরাকার সর্বব্যাপীর মধ্যে; আর আকাশে মেঘসঞ্চার হইলে তৎপশ্চাতে তিনি আভাস পাইতেন সেই অব্যক্ত অসীমের। গাজিয়াবাদে বাসকালে তিনি একতারা লইয়া আপন-মনে ভজন গাহিতেন। যে উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর বাটিতে তিনি থাকিতেন, তিনি হঠাৎ মারা গেলে ভাবুক তারকনাথ মৃতের সৎকারান্তে গৃহে ফিরিয়া উদাসহৃদয়ে গাহিতে লাগিলেন—

"দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী?
সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়-হারী" ইত্যাদি।

গানের নেশা যখন কাটিল তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন, শূন্যগৃহে তিনি একা—বাটির অপর সকলে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তারক অতঃপর যখন মোগলসরাইয়ে ছিলেন, তখনও নিভৃত চিন্তায় দিন কাটিত। বস্তুত ইহা ছিল তাঁহার স্বভাব। তাঁহার অন্তর্লীন মন তখন হইতেই স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে যে সত্য শিব সুন্দর আছেন, তিনিই একমাত্র ধ্যেয়; আর তাঁহার মনে চিন্তা উঠিত, "সমাধি জিনিসটা কি?" শিবের সমাধিমগ্ন মূর্তি, বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি তাঁহার খুব ভাল লাগিত। মোগলসরাইয়ে তাঁহার সঙ্গী প্রসন্নবাবু তারকের সমাধিস্পৃহা দেখিয়া একদিন বলিলেন যে, সমাধি অতি দুর্লভ জিনিস; একমাত্র তেমন লোক আছেন দক্ষিণেশ্বরে—পরমহংসদেব—যাঁহার ঠিক ঠিক সমাধি হয়। শুনিয়া অবধি তারক সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আসিতে আরও আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল।

মন যখন এমনি ঊর্ধ্বগামী তখনই আবার পিতার নিকট হইতে প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের প্রসঙ্গ পূর্বেও উঠিয়াছিল এবং তারক তাহা অনায়াসেই নিরাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারে প্রস্তাব উপস্থিত হইল একটা জটিল সমস্যার আকারে। সংসারের অসচ্ছলতার মধ্যে কন্যা নীরদার বিবাহের জন্য চিন্তান্বিত রামকানাইবাবু বাধ্য হইয়া বরপক্ষের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন যে, নীরদাকে যে উচ্চ বংশে পাত্রস্থা করিবেন, তারককেও তাঁহাদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। এই বিনিময়-বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তারক অতীব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এই মাতৃহীনা স্নেহের পুত্তলি ভগিনীটিকে তিনি কত আদরে লালন-পালন করিয়াছিলেন—আজ কি তাহার প্রতি তাঁহার কোন কর্তব্য

নাই? গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি সম্মত হইলেন এবং যথাকালে উভয় বিবাহই হইয়া গেল। ঘোষালপরিবারে পুত্রবধূরূপে আসিলেন মহেশ্বরপুর গ্রামের ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা সর্বসুলক্ষণা শ্রীমতী নিত্যকালী দেবী।

ঐ সময়ে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির অফিসে একটি পদ খালি হইলে তারকনাথ বন্ধুগণের পরামর্শে ঐ পদে যোগদানপূর্বক কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাটিতে আসিয়া উঠিলেন। বাটিটি কেশব সেনের 'লিলি কটেজের' নিকটে অবস্থিত থাকায় তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। সমাজের বিধিবদ্ধ উপাসনায় কিন্তু তিনি তৃপ্ত হইতেন না—তাঁহার মনে হইত উহা একান্তই অগভীর। তাই গৃহে ফিরিয়া রাত্রে চক্ষের জলে ভাসিয়া ভগবানের নিকট প্রাণের আকুলতা নিবেদন করিতেন, "হে প্রভু, আমায় ঠিক পথের সন্ধান দাও।" ছুটির দিনে তিনি বাড়িতে যাইতেন; কিন্তু নিত্যকালী দেবীর প্রতি ভরণ-পোষণ ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতেন না। পরিবারের এক সঙ্কট-মুহূর্তে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আদর্শ ছাড়িতে পারেন না; তাই সহধর্মিণীকে মনের ভাব জানাইয়া নিজেকে সমস্ত মায়িক সম্পর্ক হইতে মুক্ত রাখিতেন।

যে আত্মীয়ের গৃহে তারকনাথ বাস করিতেন, কিছুদিন পরে তিনি সিমলা-পল্লিতে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটির নিকটে উঠিয়া আসিলেন। ইংরেজি ১৮৮০ অব্দের শেষভাগে একদিন পরমহংসদেব রামবাবুর বাটিতে শুভ পদার্পণ করিলে সংবাদ পাইয়া তারকনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া ঠাকুরের অমৃতবাণী পান করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভাবাবস্থ—আড়ষ্টস্বরে বলিতেছেন, "আমি কোথায়?" একজন কহিলেন। "রামের বাড়িতে।" ঠাকুর "ও ও" বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সমাধিতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। তারকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—যে জিনিসটা জানিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ আজ প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ঠাকুরের আচরণে ও শ্রীমুখের বাণীতে তাহারই সবিশেষ পরিচয় পাইলেন। কথা-শেষে তারক বাটিতে ফিরিতে উদ্যত হইলে রামবাবু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

দেবমানবের প্রথম সন্দর্শনেই তারকনাথের মন-প্রাণ তাঁহার চরণে অর্পিত হইল; তিনি পুনর্বার তাঁহার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরবাসী এক সহকর্মীর সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, শনিবারে অফিসের ছুটির পর সেখানে যাইবেন। চলতি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বন্ধুর বাটিতে উঠিলেন এবং সন্ধ্যার

সময় কালীবাড়িতে গেলেন। আলোকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের তরলছায়া তখন উদ্যানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে—কোন্ এক অজানা যেন ধীরপদক্ষেপে অগ্রগামী। ঠাকুর তখন পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় আছেন। তারক আবিষ্টের ন্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি?" তারক রামবাবুর বাড়ির দর্শনের কথা বলিলে তিনি রামবাবুর কুশল-জিজ্ঞাসান্তে তারককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ছোট খাটটিতে বসিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়াই তারকের মনে হইয়াছিল যেন 'মা'; তিনি পুরুষ কি স্ত্রী—এরূপ চিন্তা মনে আসিল না। গৃহে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুনর্বার প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—যেন কত আপনার জন! ঠাকুরের চক্ষে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে! ততক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তারকও যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাকার মান, না নিরাকার?" তারকনাথ বলিলেন, "নিরাকারই আমার ভাল লাগে।" ঠাকুর শুধু বলিলেন, "শক্তি মানতে হয়।" মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর মা কালীকে প্রণাম করিলেন। তারকের ব্রাহ্মসংস্কার প্রথমে বাধা দিলেও যুক্তি জানাইয়া দিল যে, ব্রহ্ম সর্বানুস্যূত হইলে তিনি প্রতিমাতেও থাকিবেন না কেন? সুতরাং তিনিও সশ্রদ্ধ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন। অনন্তর বিদায়গ্রহণকালে তারক সেই রাত্রি ঐ স্থানেই যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, পূর্ব হইতেই বন্ধুগৃহে থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তখন প্রসন্নমুখে অনুমোদন করিলেন, "কথা রাখতে হয়—সত্য কথা কলির তপস্যা।" খানিক মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এসো।"

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পিতপ্রাণ তারকনাথ ভদ্রতার খাতিরে বন্ধুগৃহে পরদিবস অপরাহ্ণ পর্যন্ত কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং রাত্রিতে সযত্নে প্রসাদী লুচি খাওয়াইয়া দক্ষিণের বারান্দায় শয়নের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। মনের আনন্দে সে রাত্রে তারকের ঘুম হইল না। মধ্যরাত্রে দেখেন উলঙ্গ ঠাকুর ভাবের ঘোরে পায়চারি করিতেছেন আর আপন-মনে কি যেন বলিতেছেন। পরে বারান্দায় আসিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, ঘুমিয়েছ কি?" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তারক বলিলেন, "না তো, ঘুমুই নি।" আদেশ হইল, "একটু রাম-নাম শোনাও তো।" তারক রাম-নাম গাহিতে লাগিলেন। এইরূপে দিব্য আবেশে রাত্রিযাপনান্তে সকালে বিদায় লইতে গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো—একলা।"

পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর আরও কৃপা করিলেন। সেই দিন হঠাৎ স্বীয় শ্রীচরণ তারকের বক্ষে তুলিয়া দিয়া দিব্যস্পর্শে তাঁহাকে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিরাজ্যে লইয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ ছিলেন, তারক তাহা বুঝিতে পারেন নাই; যখন জ্ঞান হইল, দেখেন ঠাকুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "মা, নেমে এস, নেমে এস।" সেই স্পর্শে তারক সেই দিন ঠিক ঠিক অনুভব করিলেন যে, তিনি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা; আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর—জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনুভূতিতে ঠাকুরকে ঐরূপে জানিলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল মাতা ও সন্তানের। 'কথামৃতে'ও (৪র্থ ভাগ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ; অখণ্ড সং, পৃঃ ২০৭) ইহার আভাস পাওয়া যায়। একদিন 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন—তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।" বস্তুত উভয়ের সহজ মিলনের মধ্যে ঐশ্বর্যের স্থান ছিল না। তারক বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যে ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই তাঁর কাছে ছিলাম। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন; কেউ অবতার ভগবান ইত্যাদি বললে বিরক্ত হতেন—ওতে আপন-বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়।" তারক যতই স্বাধীন, স্বাবলম্বী হউক না কেন এবং শৈশব হইতে যতই দুঃখের সহিত সুপরিচিত থাকুক না কেন, তাঁহার অন্তরটি ছিল বড়ই কোমল। কখনও বা তাঁহার মনে হইত ঠাকুরের নিকট খুব কাঁদেন। বকুলতলায় একদিন তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়—জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।" আর একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যানকালে ঠাকুরকে ঝাউতলার দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার হুহু করিয়া কান্না পাইল, বুকের ভিতর গুড়্গুড় করিয়া উঠিল এবং শরীর এমনি কাঁপিতে লাগিল যে, আর থামে না। বস্তুত কুণ্ডলিনী-জাগরণ যেন ঠাকুরের মুঠোর মধ্যে ছিল—তিনি না ছুঁইয়া দূরে দাঁড়াইয়া কৃপাকটাক্ষে তাহা করিতে পারিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাঁহারা থাকিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে রাত্রি তিনটার সময় উঠাইয়া ধ্যানে বসাইতেন। কোন দিন বা কীর্তন হইত—সঙ্গে খোল বাজিত। আবার কোনও দিন নৃত্য হইত—লাজুক কেহ বসিয়া থাকিলে ঠাকুর জোর করিয়া নাচাইতেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাত্রি তিনটায় উঠা তারকের এমনই সহজসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, শেষ বয়সেও এই অভ্যাস অটুট ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তখন ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত; কারণ সদা-সতর্ক ঠাকুর চাহিতেন, তাঁহার যুবক-ভক্তগণ অনুক্ষণ

ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম বড় একটা হইত না। তারক প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি এখানে ঘুমুতে এসেছিস? সারা রাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তবে মাকে ডাকবি কখন?" সমাগত ভক্তদের অনেকেরই ভাব হইতেছে দেখিয়া তারক একদিন ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্য ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "হবে রে হবে এত উতলা হচ্ছিস কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন।" তবে তোর মূর্তিদর্শন এখন হবে না, পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।" তারপর একদিন ঠাকুর অঙ্গুলি-দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলেন, অমনি তারকের বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং সস্নেহে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিয়া সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সেই ভাবের নেশা তাঁহার অনেক দিন ছিল। সাধন-ভজন ছাড়া অপরাপর বিবিধ বিষয়েও ঠাকুর উপদেশ দিতেন। তারক গঙ্গাতেই শৌচাদি করেন শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "সে কি গো! গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি—ওতে কি শৌচ করতে আছে?" আর একদিন বলিয়াছিলেন যে, সাধুদর্শনে শুধু-হাতে যাইতে নাই—অন্তত এক পয়সার পান লইয়া যাইতে হয়। তারক সে উপদেশ পালন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একদিন অভিমান ত্যাগ করাইবার জন্য তারকনাথকে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষায় পাঠাইয়াছিলেন।

অপর একসময়ে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "দ্যাখ, এখানে কত লোক আসে; কিন্তু কার বাড়ি কোথায় বা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নে, জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক; আর তোর বাড়ি কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। কেন বল তো?" তারক পিতৃপরিচয় দিলে ঠাকুর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বটে! তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন! ... তাঁকে একবার আসতে বলিস তো!" তারকনাথ বাবাকে ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এমনি ভাবস্থ ঠাকুর তাঁহার স্কন্ধে একখানি চরণ তুলিয়া দেন এবং ঘোষাল মহাশয় আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন। উত্তরে ঠাকুর বলেন, "মার ইচ্ছা হলে তাই হবে।"

তারকের মনের অন্তস্তলে তখন এক গভীর আলোড়ন চলিতেছে। তিনি বিবাহিত—স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য ধর্মত দায়ী, অথচ মন এই স্বভাববিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবনে সম্পূর্ণ বীততৃষ্ণ। কাজ করিতে করিতে অসহনীয় প্রাণের আবেগে চক্ষের ধারা নির্গত হয়; কাগজ-পত্র ইতস্তত ফেলিয়া রাখিয়া অকস্মাৎ নৌকাযোগে তিনি ছুটেন দক্ষিণেশ্বরে। সুযোগ বুঝিয়া তারকনাথ একদিন স্বীয় বিবাহ ও অন্তর্বিপ্লবের

কথা ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "ভয় কিরে—আমি আছি। স্ত্রী যত দিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখা-শুনা করতে হবে বই কি! একটু ধৈর্য ধর—মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি—তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।" এই বলিয়া তারকের বক্ষে ও মস্তকে হাত দিয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন। আর একবার তিনি তারককে নিদ্রার পূর্বে চিত হইয়া শুইয়া ভাবিতে বলিয়াছিলেন, যেন মা কালী বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, ঐরূপ ভাবনার ফলে ভক্তিলাভ ও কামজয় হয়। অন্যসময়ে ঠাকুর তারকের মনে স্বীয় মাতৃভাবের ছাপও দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন; দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।" স্বভাবত সংযমশীল তারকনাথ তখন হইতে আপনাকে দেবরক্ষিত জানিয়া নির্ভয় হইলেন। তিনি প্রয়োজনানুসারে বাটিতে যাইতেন এবং স্ত্রী অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবাশুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিতেন; কিন্তু নিজে সর্বদা অনাসক্ত থাকিতেন। পরবর্তী কালে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া তিনি রোমাঁ রোলাঁকে লিখিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি কখনও স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করেন নাই। আশ্চর্য গুরু আর আশ্চর্য তাঁহার শিষ্য!

তারকনাথ দেখেন আর শিখেন। কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রহিয়াছে যাহাতে তিনি নির্বিচারে যাহার-তাহার অনুকরণ না করেন। একসময় 'কথামৃত'-কারের দৃষ্টান্তে তিনি ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। এই কাজের সুবিধার জন্য একদিন নিবিষ্টমনে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া সব কথা ভাল করিয়া শুনিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, "কি রে, অমন করে কি শুনছিস?" অপ্রস্তুত হইয়া তারক নিরুত্তর রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।" সেদিন হইতে লিখার সঙ্কল্প নষ্ট হইল এবং যাহা লিখা হইয়াছিল তাহাও গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইল।

এই জাতীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও ঘটিয়াছিল। একবার দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষ্ণব সাধু আসেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় রাধা মানেন না, কৃষ্ণ মানেন; সাধুটির ইচ্ছা ছিল যে, তারক প্রভৃতি যুবকেরা তাঁহার নিকট যান; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "ওদের মত ভাল হতে পারে, তবে আমার প্রাণের মত নয়। ভগবানের লীলা চাই।" সুতরাং তারকের সেখানে যাওয়া বন্ধ হইল। তারকের রামবাবুর বাড়িতে থাকাকালে নিত্যগোপালও সেখানে ছিলেন। ঠাকুর নিত্যগোপালের ভগবৎপ্রেমে ভাবাবস্থাদির প্রশংসা করিতেন; কিন্তু তারককে সাবধান করিয়া দিলেন, "দ্যাখ, তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশি মিশিস নি। ওর ভাব আলাদা—ও এখানকার

লোক নয়।” নিত্যগোপালের সঙ্গে ভদ্রতাহিসাবে যতটুকু মিশা প্রয়োজন তদতিরিক্ত আলাপাদি সেই দিন হইতে বন্ধ হইল।

ঠাকুরের সেবার জন্য তারক সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং সুযোগও খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, “কি ভাগ্যবানই আমরা! পান সেজে, তামাক সেজে খাইয়েছি—তাঁর সেবা করেছি, আদর-ভালবাসা কত পেয়েছি।” ঠাকুর কিন্তু সর্বপ্রকার সেবা এই সেবকটির হাতে লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঝাউতলার দিকে গেলে উপস্থিত কেহ গাড়ু লইয়া যাইতেন। একদিন অন্যের অনুপস্থিতিতে তারকই গাড়ুটি লইয়া চলিলেন। ফিরিবার পথে ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, তারক গাড়ুটি আনিয়াছেন, তখন বলিলেন, “তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করি।”

ক্রমে তারকের বৈরাগ্যবৃদ্ধি হওয়ায় একদিন তিনি বাড়িতে গিয়া নিত্যকালী দেবীকে জানাইলেন যে, আর তাঁহার সংসারে থাকা অসম্ভব; তবে তিনি তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুত ঐ জন্য তিনি ইতোমধ্যেই কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্থ তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরেই নিত্যকালী রোগগ্রস্ত হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান। পত্নীর মৃত্যুর পর সংসারের বন্ধন সম্পূর্ণ দূর হওয়ায় তারক পিতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। পিতা সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন; কিন্তু বাধা না দিয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন এবং অতঃপর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, “তোমার ভগবানলাভ হোক! আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু পারি নি। তাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার ভগবানলাভ হোক।” পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া সংসারত্যাগ বড়ই বিরল। তারকের সে সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “খুব ভাল হয়েছে।” ইহা অনুমান ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগের কথা।

সদ্যোবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী তারকনাথ কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিলেন। অনন্তর একদিন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তকে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, রাম, এই তারক তোমাদের বাড়িতে থাকবে। ও সর্বদা এখানকার ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে বড়ই উৎসুক হয়েছে।” আর তারককে বলিলেন, “দ্যাখ, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—তাদের অন্নটা খাসনি, আর সব খাবি।” তারক রামবাবুর বাড়িতে স্বপাক খাইয়া ভগবানের স্মরণ-মননে কালাতিপাত করিতেন। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূমিশয্যায়

একাহারে সেই কঠোর তপস্যা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "অধিকাংশ দিনই একাহার, তাও হবিষ্যান্ন। কখনও বা আলুবেগুন বা যা হয় কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে দুটি খেয়ে নিতাম। দেহের আরামের জন্য সময় দিতে আদৌ ইচ্ছা হত না।" 'কথামৃতে' আছে, "তারকের অবস্থা এখন অন্তর্মুখ। তিনি লোকের সঙ্গে বেশি কথা কন না" (৫ম ভাগ, ৮১ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ২৭৪)। পথ চলিতে তাঁহার দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠনিবদ্ধ থাকিত। একদিন ঐ ভাবে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোক কথা বলিবার জন্য পশ্চাদ্ভাগ হইতে অগ্রসর হইলেন এবং নাম ধরিয়াও ডাকিলেন। তারকের কিন্তু হুঁশ নাই—আপন মনে চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোক ভাবিলেন, তারক দাম্ভিক। কিন্তু উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন যে উহা অন্তর্লীন অবস্থা—ইঁহার সহিত আলাপ করিতে হইলে সম্মুখ হইতে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। অপর একদিন ভদ্রলোক ঐরূপ করিলে তারক অতি বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন এবং ভদ্রলোকের খেদ দূর হইল। আত্মনিমগ্ন ও নিঃসঙ্গ তারক প্রাণের আবেগে তখন সব সময় আবাসস্থলেও থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের কথায় জানা যায়, "এমন অনেক সময় গেছে, যখন বিডন স্কোয়ারে ও হেদোয় রাতভর ধ্যানভজন করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কখনও বা কালীঘাটে এবং কেওড়াতলায়ও ধ্যানভজন করেছি।" রামবাবুর বাড়ি হইতে তিনি কাঁকুড়গাছিতে গমন করেন। তখন ঐ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ, লোকজনের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। বাগানে একটি মালী মাত্র থাকিত। সেখানে আমগাছ-তলায় ধুনি জ্বালাইয়া তিনি দিনরাত ধ্যানজপে কাটাইতেন; দিনে একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; পরিধানে একমাত্র কাপড় ছাড়া শরীরে অন্য আবরণ থাকিত না; আর দেহ, কেশ প্রভৃতির পরিপাটি মোটেই ছিল না।

তপস্যাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং অনেক সময় রাত্রিকালে সেখানে থাকিতেন। আত্মধ্যানে নিমগ্ন তারক তখন লোকসমাগম এড়াইয়া চলিতেন, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উপস্থিতি ভক্তদের নিকট প্রায়শ অজ্ঞাত থাকিত। কাঁকুড়গাছিতে থাকাকালে (১৮৮৪ খ্রিঃ) তিনি একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ব্রজের রজঃ তিলকমাটি ও প্রসাদী ছোলা-ভাজা আনিয়া তৎসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডাক্তার তখন ঠাকুরের হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধুর এরূপ দৈহিক ক্লেশ হওয়া যুক্তিসহ কি না ইত্যাদি বিষয়ে তখন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলিত। ঠাকুর তারককে সম্মুখে পাইয়া পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন?"

তারক ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন, "ভগবানদাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শয্যাগত ছিলেন।" কোন দর্শন বা মতবাদ-অবলম্বনে সত্যকে আবৃত করার বা স্বীয় সন্দেহকে ঢাকিবার চেষ্টা এই সরল উত্তরের মধ্যে নাই; কারণ সাধুজীবনের সহিত পরিচিত তারকের জানাই ছিল যে, শরীর প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে—রোগ হওয়া বা না হওয়ার সহিত সাধুত্বের সম্পর্ক কি?

১৮৮৬ অব্দে ঠাকুর চিকিৎসার্থে কাশীপুরে আসিলে তারকও তাঁহার সেবার জন্য তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেবার অবসরে নরেন্দ্রের নেতৃত্বে তখন ধ্যান ভজন ও শাস্ত্রালোচনা চলিত। বৌদ্ধধর্মের এবং নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তাও যথেষ্ট হইত। সমাগত ভক্তদের সহিত নরেন্দ্র এই সব বিষয়ে তর্ক করিতেন কিংবা তারকনাথকে তর্কে লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ভক্তেরা ইঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া একসময়ে ইঁহাদিগকে নাস্তিক পর্যন্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন যে, সাধকজীবনের উহা অবস্থাবিশেষমাত্র—দুশ্চিন্তার কিছুই নাই।

তথাগতের চিন্তায় বিভোর নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে বলিলেন যে, বুদ্ধগয়ায় গিয়া তপস্যা করিতে হইবে। উভয়েই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; প্রত্যেকের সম্বল—গায়ে গেরুয়া বহির্বাস ও স্কন্ধে একখানি কম্বল। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিয়া, যে বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্ন তথাগত বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহার নিম্নে ধ্যানে রত হইলেন। যে বজ্রাসনে শাক্যসিংহ বসিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। তিন জনে পাশাপাশি ধ্যানে রত আছেন, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ ভাবাবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে তারকনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। মুহূর্তমধ্যে আবার সহজাবস্থা লাভ করিয়া ধ্যানে বসিলেন।[১] পরে তারককর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলুম।... সবই তো রয়েছে—কিন্তু তিনি কোথায়?...বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে, আর সামলাতে পারলুম না—কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরলুম।" সেই রাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া গেল। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধগয়ায় কিছুদিন থাকেন, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ মড়ুয়ার রুটি নরেন্দ্রের পেটে সহ্য হইল না। আবার শীতবস্ত্রের অভাবে

---

১ স্বামী অভেদানন্দের বিবরণ একটু অন্যরূপ। তাঁহার মতে এই ঘটনা হইয়াছিল পরদিন প্রত্যূষে (৮ বা ৯ এপ্রিল, ১৮৮৬)—যখন তিন জনে সারা রাত্রি বোধিদ্রুমের নিচে ধ্যান করিয়া পুনর্বার প্রত্যূষে মন্দিরমধ্যে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বামে ছিলেন কালী (অভেদানন্দ) ও কালীর বামে তারক। এই ঘটনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র কালীকে বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধমূর্তি থেকে তোমার পাশে তারকদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতি pass (বের) হয়ে গেল" ('স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা')। সম্ভবত এই বিবরণ শুনিয়াই স্বামী অদ্ভুতানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "সেখানে (বুদ্ধগয়া) তো লোরেন ভাই তারকদাদার দেহে একটা জ্যোতি প্রবেশ করতে দেখেছিল।" কে জানে নিরাকারের চিন্তায় নিমগ্ন তারকের সহিত নির্বাণমার্গী বৌদ্ধগণের কোন অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল কি না।

রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সুতরাং তিন-চারি দিন পরেই তাঁহারা গয়া হইয়া পুনর্বার কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিলেন, "কোথাও কিছু নেই।" অবশেষে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাওনা কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।" কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়াও তাঁহাদের ধ্যানের নেশা অনেক কাল ছিল। তাই তাঁহারা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করিতেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতেন।

তারক নরেন্দ্রের প্রতি স্বভাবতই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন; তদুপরি একটি ঘটনায় ঐ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা অধিকতর বর্ধিত হইল। কাশীপুরে একটি বড় মশারির নিচে অনেকে একত্রে শয়ন করিতেন। একরাত্রে নিদ্রাভঙ্গে তারক দেখেন, সর্বত্র আলোকিত করিয়া নরেন্দ্রের দেহের চতুষ্পার্শ্বে ছোট ছোট শিবমূর্তিসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, নরেন্দ্রের অপর নাম বীরেশ্বর। কাশীধামে বীরেশ্বর-শিবের মূর্তি ঐরূপেই কল্পিত এবং তাহারই পূজার ফলে নরেন্দ্রের জন্ম হয়।

কাশীপুরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তারকের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন পাচকের অভাবে তারক রন্ধন করিতেছিলেন। উপর হইতে ফোড়নের গন্ধ পাইয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রাঁধছে?" তারক রাঁধিতেছেন জানিয়া তিনি একটু চচ্চড়ি আনাইয়া মুখে দিলেন।

অবশেষে যুবক ভক্তদিগকে নরেন্দ্রের অধীনে এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া ঠাকুর মর্তলীলা সংবরণ করিলে অনেকেই স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু যাইবার অন্য স্থান না থাকায় বা সেরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে অবকাশ না পাওয়ায় লাটু, বুড়ো গোপাল ও গৃহত্যাগী তারক বাগানবাটিতেই রহিলেন এবং সেখানে সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থিকে জীবন্ত ঠাকুর-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ৩১ আগস্ট (১৮৮৬) বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গৃহী ভক্তেরা আর সে বাড়ি রাখিবেন না জানিয়া অগত্যা লাটু বৃন্দাবনে গেলেন। তারকও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার বেশি দিন থাকা হইল না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহে নরেন্দ্র মঠস্থাপনের জন্য একটি বাটির অন্বেষণে ছিলেন এবং তারককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন যে কোন মুহূর্তে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন; তদনুসারে তিনি কাশীধামে আসিয়া নরেন্দ্রের তারের অপেক্ষায় রহিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বরাহনগরে একটি ভূতুড়ে বাড়ি ভাড়া করিয়া এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্রব্যাদি সেখানে রাখার ব্যবস্থা করিয়া নরেন্দ্র তারকনাথকে তার করিলেন, আর

তারকও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে নরেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ঘোড়ার গাড়িতে আসিয়াছিলেন উহাতেই নরেন্দ্র ও রাখাল তাঁহার সহিত উঠিয়া পড়িলেন এবং সকলে বরাহনগরের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রথম মঠ আরম্ভ হইল।

ঐ খ্রিস্টাব্দের অবিস্মরণীয় ঘটনা ডিসেম্বর মাসে সকলের দলবদ্ধ হইয়া আঁটপুরে গমন, সপ্তাহাধিক সেখানে আনন্দে ধ্যান-ভজনাদিতে কাটানো এবং বড়দিনের রাত্রে ধুনির সম্মুখে বসিয়া ঈশার ত্যাগ-বৈরাগ্যের আলোচনাকালে সন্ন্যাসের প্রেরণালাভ। পরে যথাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকাসম্মুখে বিরজা হোম সমাপনান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণান্তর শিবপ্রায় তারক শিবানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন।[১]

শিবানন্দ মহারাজ বয়সে বড়, দীর্ঘকাল সন্ন্যাসিজীবনে অভ্যস্ত এবং মঠের অন্যতম প্রথম অধিবাসী; সেজন্য ঐ সময়ে মঠপরিচালনার দায়িত্ব স্বভাবতই তাঁহার উপর ছিল। তিনিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া সকলের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতেন। কুটনা-কোটা, জলতোলা, ঝাঁটদেওয়া, পায়খানা পরিষ্কার করা—এই সমস্তই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম; অথচ ব্যবহারে ছিলেন তিনি সরল, নিঃসঙ্কোচ, নম্র ও মধুরালাপী, আর মুখে তাঁহার সর্বদাই উচ্চারিত হইত 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। ভজনাদিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। এক শিবরাত্রির দিনে 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মঠের ভাইরা উপবাস করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামীজীর রচিত "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" ইত্যাদি গানটি ধরিয়া শিবানন্দজী নৃত্য আরম্ভ করিলেন; রাখালও সঙ্গে যোগ দিলেন এবং 'কথামৃত'-কারকেও তাঁহারা দলে টানিয়া লইলেন। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত স্বামী শিবানন্দ এক বর্ষাকালে আকাশে-বাতাসে বিরহ ঢালিয়া গান ধরিলেন—

"হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল সই! মালতীর মালা ॥" ইত্যাদি

ঠাকুর তাঁহার পার্ষদবর্গকে যে প্রেমসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গৃহী-সন্ন্যাসীর ভেদ ছিল না। শিবানন্দ মহারাজও সেই প্রেমে পরিনিষ্ণাত হইয়া উহার বহিঃপ্রকাশরূপে সকলের সেবায় রত থাকিতেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগধামে যোগীন মহারাজের বসন্ত হইলে তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রিঃ বলরামবাবু কঠিন নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হইলে অকাতরে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন; এবং ১৮৯৬ অব্দে স্বামী অদ্বৈতানন্দ পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া

---

১ 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা', 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ৩৪২-৪৩ পৃঃ, এবং স্বামী শিবানন্দের ৮-১-৯০-এর পত্র।

উত্থানশক্তি রহিত হইলে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে এই বৃদ্ধ স্বামীজীর সেবা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই অশেষ সদ্‌গুণাবলীর জন্য তিনি স্বতঃই সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মঠের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে 'তারকদা' বলিয়া ডাকিতেন এবং নরেন্দ্রনাথও 'আপনি' ভিন্ন অন্যভাবে সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার অপর লোকপ্রিয় নাম ছিল 'মহাপুরুষ'; বরাহনগরের জীবনে একবার তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া বলরাম-ভবনে যান। সেখানে ঠাকুরের প্রসঙ্গে মগ্ন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে বিবাহিত-জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" শুনিয়া শিবানন্দ মহারাজ বলিলেন, "তা কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি-সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কামজয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।" সবিস্ময়ে নরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে তো আপনি মহাপুরুষ।" তদবধি লোকসমাজে তিনি 'মহাপুরুষ' নামেই পরিচিত হইলেন।

উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সদা বিচরণশীল এই 'মহাপুরুষ' মনুষ্যোচিত আনন্দরসে বঞ্চিত ছিলেন না। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলেন, "হামাদের মঠে তারকদা ছিল ভারী আমুদে। কেবল লোকদের নকল করত আর বলত, 'তোদের নিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি বলে তোরা রাগ করিস নি, ভাই'!" তাঁহার হাত-পা নাড়িয়া অপরের অনুকরণ, বা পশ্‌তু ও গুজরাটী ভাষার ছন্দে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মনকে যেমন হালকা করিতেন, তেমনি অপরকেও বিমল আনন্দে ভাসাইতেন। একবার স্বামীজী 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের গুণাগুণ লইয়া বিচার করিতেছিলেন। ঐ কাব্যে ইচ্ছামত বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় পরিণত করা ও ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করার কৌশল দেখিয়া রসিক মহাপুরুষের বড়ই আমোদ হইল। অমনি তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওহে 'আলুর দম কর' না বলে বলতে হবে 'আলুটা দমিয়ে দাও'।" গুপ্ত মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুপ্ত, তামাকটা তামকাইয়ে দে।" এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তর্জনী নাড়িতে নাড়িতে ও মাথা দুলাইতে দুলাইতে অপূর্ব ভঙ্গিতে আহ্লাদে গৃহময় হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—আর সকলে হাসিয়া আটখানা!

কিছুকাল মঠে বাসের পর অনেকেই এদিকে-সেদিকে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে একবার উত্তরাখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু হাতরাসে পৌঁছিয়া দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে অসুস্থ। সুতরাং সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কেবল বৃন্দাবনদর্শনান্তে স্বামীজীকে লইয়া কলকাতায় ফিরিতে চাহিলেন। মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ডে যাইতেছেন জানিয়া ৺কাশীধাম হইতে আর

এক জন তীর্থযাত্রী তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাঁহাকে কলকাতায় ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সহযাত্রী ব্যঙ্গ ও অনুযোগের স্বরে জানাইলেন যে সন্ন্যাসীর পক্ষে তথাকথিত গুরুভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে পড়িয়া তীর্থদর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া ও মায়ায় মগ্ন থাকিয়া ধর্মকর্মে বিরত হওয়া একই কথা। উত্তরে মহাপুরুষ জানাইলেন যে, তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেমের স্থান অতি উচ্চ, লৌকিক যুক্তিতে উহা পরাস্ত হইতে পারে না। সহযাত্রী ইহাতেও উষ্মা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষ স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থভিক্ষা করিয়া তাঁহার হরিদ্বার গমনের সুব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং স্বামীজীর সহিত কলকাতায় চলিলেন।

এই বৎসর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়ায় পর বৎসরের আরম্ভে তিনি পুনর্বার হিমালয়যাত্রা করিলেন। এবারের ভ্রমণকালে কেদারনাথের পথে শ্রীনগরে দৈবক্রমে দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিব্বতী পোশাকে আবৃত ও তিব্বতভ্রমণের ফলে ঝলসানো মুখ গঙ্গাধরকে তিনি প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া "দাদা, দাদা" বলিয়া ডাকিতেই তিনি স্নেহবিগলিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে? গঙ্গা? তুই বেঁচে আছিস!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর উভয়ে অনেকটা পথ একই সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথে শ্রীবিগ্রহদর্শনে ভাবে বিহ্বল মহাপুরুষ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কেদারের পর বদরীনারায়ণ-দর্শনান্তে তিনি গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহিলেন; পরন্তু তিব্বতের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় গঙ্গাধর মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা মহাপুরুষ মহারাজ আলমোড়া ও কাশীধামে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া একাকী বরাহনগরে ফিরিলেন। আলমোড়ায় তিনি বদ্রী-শা নামক এক ভদ্রলোকের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। শা-জী তাঁহার গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর বরাহনগর মঠের যে-কোনও সাধু ঐ অঞ্চলে আসিলে শা-জী তাঁহাকে সাদরে আপন গৃহে রাখিয়া সেবা করিতেন।

১৮৯১ অব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্রীগুরুরূপী তীর্থদেবতা'র আকর্ষণে মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণদেশের তীর্থগুলির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে গুরুই সব।" তাই রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রার পূর্বে তিনি লিখিলেন, "একদিন গাঢ় ধ্যানের সময় রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পক্ষীর ন্যায় যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম।

...শ্রীগুরুদেব এবার তাঁহার ৺রামেশ্বরমূর্তিতে আকর্ষণ করিতেছেন। অনন্ত তাঁহার রূপ।" পরে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া আবার লিখিলেন, "ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও গোদাবরীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর...ইঁহারা আকর্ষণ করিতেছেন। সকলই গুরুরূপ। রামকৃষ্ণের বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা যে, আমি এই সকল দর্শন করি—তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে? এ মন যে তাঁর কাছে বিক্রীত।" ৺রামেশ্বরদর্শন কিন্তু তাঁহার সেই বারে হইল না। পুণায় ৺সোমেশ্বর-শিবমন্দিরে তিনি তপস্যায় রত আছেন এমন সময়ে রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পীড়িত দুইজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সময়ে অস্বাস্থ্যকর ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিলেন। সেজন্য পূর্ব সঙ্কল্প আপাতত স্থগিত রাখিয়া তিনি পুনর্বার উত্তর ভারতের দিকে ফিরিলেন এবং পথে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানে দেবদর্শন ও তপস্যাদি করিয়া ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঝুসিতে কল্পবাস, মকরসংক্রান্তি-স্নান ও মাঘ-স্নান সমাপনান্তে তিনি কাশীধামে উপস্থিত হইয়া তপস্যার্থ বংশীদত্তের উদ্যানবাটিতে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পরবৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পূর্বেই মহাপুরুষ মহারাজ আলমবাজারে আগমনান্তে জানিলেন যে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। অতএব জন্মস্থানে গমনপূর্বক পিতার শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুজলে শেষ তর্পণ করিলেন। মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি শশী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থানদর্শনে গেলেন। জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে তাঁহারা একদিন শ্রীশ্রীমাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। কামারপুকুরে মহাপুরুষের ম্যালেরিয়া জ্বর হওয়ায় তাঁহারা অবিলম্বে আরামবাগ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯২ অব্দে তিনি আর একবার তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, বরাহ-অবতারের জন্মস্থান সারোঁ এবং সহস্রবাহু পরশুরামের জন্মস্থান দর্শন করেন। এই সময়ে তিনি নিঃসম্বলভাবে চলিতেন এবং লোকসমাগম পরিহার করিতেন। অবশেষে আলমোড়ায় পৌঁছিয়া পাতাল-দেবী প্রভৃতি নির্জন স্থানে ভিক্ষালব্ধ অন্নে শরীরধারণপূর্বক তপস্যায় নিমগ্ন হন। এই স্থানে শ্রীযুক্ত ই টি স্টার্ডি নামক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হন। ইনি পরে স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডনের কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ অব্দের অক্টোবর মাসে ৺রামেশ্বরদর্শনমানসে তিনি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আবু ও বোম্বাই

হইয়া তিনি যখন মাদ্রাজে পৌঁছিলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দের যশোগানে দাক্ষিণাত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া মাদ্রাজবাসীর উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। মহাপুরুষও ভক্তদের নিকট লিখিত স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অতঃপর কাঞ্চী, চিদম্বরম, মাদুরা, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন করিয়া তিনি ভক্তদের আহ্বানে বাঙ্গালোর উপস্থিত হইলেন (১৮৯৪ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি)। বাঙ্গালোর হইতে মহীশূর হইয়া তিনি যখন মাদ্রাজে ফিরিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব আগতপ্রায়। এই সময়ে মহাপুরুষকে পাইয়া এবং তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া মাদ্রাজবাসীরা চরিতার্থ হইলেন। দক্ষিণদেশে তাঁহার এই অনাড়ম্বর অথচ গভীরপ্রভাবপূর্ণ প্রচারের সংবাদ পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে জানাইয়াছিলেন, "তারকদা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে।" ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপুরুষের তীর্থদর্শনের বাসনা তখনও মিটে নাই; বিশেষত হিমালয়ের আকর্ষণ ছিল বড়ই প্রবল। সুতরাং পুনর্বার তিনি উত্তরকাশীতে গমন করিলেন। পথে লক্ষ্ণৌ-এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছা তাঁহারা মঠে ফিরিয়া যান। উত্তরকাশী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পুনর্বার ফৈজাবাদে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার সহিত মঠে চলিয়া আসেন। পরবর্তী বৎসরেও (১৮৯৫) মহাপুরুষজী উত্তরাভিমুখে বাহির হন এবং ব্রহ্মাবর্ত (বিঠুর) ও কাশীধামে দেবদেবী-দর্শন ও তপস্যায় কিছুকাল কাটাইয়া মঠে ফিরেন। ১৮৯৬ সনেরও কিয়দংশ এইরূপে বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। বস্তুত তপস্যার এক অতৃপ্ত বাসনা তাঁহাকে কয়েক বৎসর যাবৎ ইতস্তত পরিচালিত করিতেছিল; আর সে তপস্যার ঐকান্তিকতা ছিল অপূর্ব। পরে একসময়ে সেই সব তপস্যা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশি সঙ্গে থাকত না।... কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে।...এখন দুপা চলতেও কষ্ট হয়। অথচ এই শরীর, এই পা-ই তো কত পাহাড়-পর্বত চলে বেড়িয়েছে—কত কঠোরতা করেছে।" আর এই তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের সঙ্গে ছিল আড়ম্বরহীন প্রচার, যাহার প্রশংসায় স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "তারকদা চমৎকার কাজ করিতেছেন—সাবাস! এই তো চাই।"

ক্রমে ১৮৯৭ আগতপ্রায়। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপ্রতীক্ষায় সমস্ত ভারত আগ্রহ-চঞ্চল, আর মঠের ভ্রাতৃগণের এক অসীম আনন্দ-হিল্লোল। শিবানন্দ

মহারাজ সেই আনন্দের আলোড়নে মঠে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের বাসনায় মাদুরায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে হইতে তাঁহার সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর স্বামীজী স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করিলে মহাপুরুষ তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গমনকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনাকে তপস্যায় কিছুতেই যেতে দেব না।" কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অগত্যা ছাড়িয়া দিলেন; তবে বলিয়া দিলেন তাঁহার গন্তব্যস্থল আলমোড়ায় যেন একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। আমরা দেখিতে পাইব যে, সুদীর্ঘকাল পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষ সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। দার্জিলিং হইতে স্বামীজী মে মাসে আলমোড়ায় আসিলে মহাপুরুষের সহিত পুনর্মিলন হইল।

আলমোড়া হইতে স্বামীজীর নির্দেশে মহাপুরুষজী সিংহলে বেদান্তপ্রচারে গমন করেন। সাত-আট মাস সেখানে অক্লান্তভাবে স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে বেদান্তপ্রচার করিয়া এবং বেদান্তের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি যখন ফিরিলেন, মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটিতে। মঠের পুরাতন দিনলিপি হইতে জানা যায় যে, মঠে প্রত্যাগত মহাপুরুষ এই সময়ে সাধুদের ও সমাগত ভক্তদের লইয়া নিয়মিতভাবে শাস্ত্রালোচনাদি করিতেন। স্বল্পকাল পরেই কলকাতায় প্লেগ-মহামারী আরম্ভ হওয়ায় শিবানন্দ-প্রমুখ অনেককেই সেবাকার্যে অগ্রসর হইতে হইল।[১] ক্রমে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে শিবানন্দজী দার্জিলিং চলিয়া গেলেন। সেখানে আবার এক নূতন বিপদ। পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড ধস নামিয়া বহুলোকের সর্বনাশ হওয়ায় তাঁহাকে তাহাদের সাহায্যকার্যে নামিতে হইল। ঐ সেবাকার্য শেষ করিয়া তিনি বৎসরান্তে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যভ্রমণান্তে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঠে প্রত্যাবর্তনের পর ২৭ ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দকে লইয়া মায়াবতী যাত্রা করেন। পক্ষাধিককাল মায়াবতীতে কাটাইয়া ফিরিবার পথে তিনি মহাপুরুষকে প্রচার ও অর্থসংগ্রহের জন্য পিলিভিটে রাখিয়া আসিলেন। ঐ কার্য শেষ করিয়া মহাপুরুষজী ৺দুর্গোৎসবের সময় মীরাটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কনখল হইতে স্বামী কল্যাণানন্দের আহ্বান আসায় তিনি তথায় যাইয়া নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারপর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে স্বামীজী বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে আসিতেছেন জানিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে স্বামীজীর সেবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মাসাবধি এই ভাবে

১ "কলকাতায় প্লেগকার্য সম্পাদিকা, ভগিনী নিবেদিতা। —প্রধানকার্যাধ্যক্ষ, স্বামী সদানন্দ। অন্যান্য কার্যকারিগণ ১) স্বামী শিবানন্দ; ২) স্বামী নিত্যানন্দ; ৩) স্বামী আত্মানন্দ।"—"উদ্বোধন", ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। ইহা দ্বিতীয় প্লেগ সেবাকার্য। প্রথম সেবা হয় ১৮৯৮-এর মে মাসে।

চিকিৎসাদির ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তিনি স্বামী শিবানন্দাদির সহিত বেলুড়ে আসিলেন।

কাশীতে থাকা কালে ভিঙ্গার মহারাজা কাশীতে বেদান্তপ্রচারের জন্য ৫০০ টাকা দিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া স্বামীজী সারদানন্দজীকে ঐ জন্য কাশী যাইতে বলিলেন। তিনি সম্মত না হওয়ায় পরে শিবানন্দজীকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। শিবানন্দ মহারাজ তখন একমনে স্বামীজীর সেবা করিতেছেন—উহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে অনুরোধ করিয়া ফল না পাওয়ায় যখন বলিলেন, "টাকা নিয়ে কাজ না করায় আপনার জন্য আমাকে কি শেষে জোচ্চোর বনতে হবে?" তখন শিবানন্দজী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কাশীধামে চলিলেন (১৯০২ খ্রিঃ ২৫ বা ২৬ জুন)।

কাশীতে পৌঁছিয়া তিনি প্রথমে রামাপুরা অঞ্চলে সেবাশ্রমের পুরাতন বাটিতে উঠিলেন এবং দশ টাকা ভাড়ায় অদ্বৈতাশ্রমের বর্তমান বাটিটি পাইয়া ৪ জুলাই সেখানে আশ্রম স্থাপন করিলেন। ভগবানের অচিন্তনীয় বিধান ঐ দিনই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন এবং পরদিন তারযোগে মহাপুরুষ সেই মর্মন্তুদ সংবাদ পান। হৃদয় শোকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইলেও নেতার আদেশ পালন করিয়া তিনি কাশীতে রহিয়া গেলেন এবং রথযাত্রার দিন বিশেষ পূজা ও হোমাদিসমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে স্বামীজীকে বসাইলেন। ইহাই 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে'র আরম্ভ। দ্বৈত হইতে অদ্বৈত—ইহাই ছিল ঠাকুরের ভাব; আশ্রমের নাম তাহারই সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

অদ্বৈতাশ্রমে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অদৃষ্টপূর্ব তপস্যা সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। প্রয়োজনানুরূপ অন্নের সংস্থান না থাকিলেও তিনি অম্লানবদনে দৈনন্দিন কার্য চালাইয়া যাইতেন। দুর্জয় শীতে খোলা হলঘরে ধুনি জ্বালাইয়া ব্যাঘ্রাজিনের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন এবং রাত্রি তিনটার পূর্বেই উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন। অতঃপর চলিত পাঠ, আবৃত্তি ও ভজন। ঠাকুর-তোলা, পূজা, ভোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্তই স্বহস্তে করিতে হইত। আবার এই দুরবস্থার মধ্যেও তাঁহাকে একবার অধিকতর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিঙ্গার রাজার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। অনেক দিন ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালা টাকার জন্য উত্ত্যক্ত করিতেছে। মহাপুরুষ কোনও প্রকারে ভাড়ার জন্য প্রায় একশত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি ভাঙ্গা বাক্সে রাখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক আশ্রমে ছিল। সে টাকার সন্ধান পাইয়া উহা লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের সন্দেহ হইল এবং সন্ধানের ফলে জানা গেল

যে, একটি মাত্র পয়সা ভিন্ন সবই গিয়াছে। সেই এক পয়সা দিয়াই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইল। ছেলেটির সম্বন্ধে মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তার একটু ধর্মবুদ্ধি ছিল, তাই একটা পয়সা রেখে গেছে; তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হলো।" ইহাই সাধুর সাধুত্ব! তাহা হইলে কি হইবে? নির্মম জগতে সাধুকেও লাঞ্ছনা ভুগিতে হয়; তাই ঠিক সেই সময়েই বাড়ি-ওয়ালার দারোয়ান আসিয়া টাকা না পাওয়ায় মহাপুরুষকে মহাজনের গদিতে লইয়া গেল এবং সারাদিন সেখানে আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে কিস্তিবন্দিতে টাকা শোধ করিবেন এই শর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিল।

কাশীতে তখন স্বামীজীর আদর্শে চারি প্রকার কার্য চলিতেছিল—ধর্মদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান এবং অন্নদান। এই প্রত্যেক কার্য স্বামী শিবানন্দের অশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইত। অদ্বৈতাশ্রম, সেবাশ্রম, অদ্বৈতাশ্রমের অবৈতনিক বিদ্যালয় ইত্যাদি সর্বদা তাঁহার উপদেশ ও অর্থসাহায্যের আশা রাখিত; এতদ্ব্যতীত বহু পরিবার অর্থসাহায্য পাইত। স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য তিনি হিন্দিভাষায় পুস্তক ছাপাইয়াও বিতরণ করিয়াছিলেন। কাশীর অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহিতও তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল।

ক্রমে আশ্রম জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং আশ্রমবাসীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল; কিন্তু নিরভিমান আশ্রমাধ্যক্ষ বামুন-চাকরদের সম্বন্ধে আশ্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "তোমরা ওদের চাকর মনে করবে কেন? ভাববে আমাদেরই সহায়ক।" আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলেরই সম্বন্ধে বলিতেন, "এরা সব জাতসাপের বাচ্চা; ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউ কম নয়।" ১৯০৪-এর শীতের প্রত্যূষে জনৈক ব্রহ্মচারী আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। অপর এক অসুস্থ ব্রহ্মচারী স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করিয়া নিজের অক্ষমতা ও লজ্জায় যখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন মহাপুরুষ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া শোয়াইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী প্রয়োজনবশে স্নানাগারের দিকে যাইয়া দেখেন মহাপুরুষজী স্বহস্তে সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছেন; আপত্তি করিলেও তিনি স্বকার্যে বিরত হইলেন না। তখন অদ্বৈতাশ্রমে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মহাপুরুষের বেদান্তিসদৃশ কঠোর এবং জননীসদৃশ কোমল ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আজও মুগ্ধ হন।

কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাই ১৯০৬ অব্দে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীধামে যান। পর বৎসর পরেশনাথ পাহাড়ের নিচে চিড়কিতেও কিছুদিন বাস করেন। ইহাতেও আশানুরূপ

উন্নতি না হওয়ায় ১৯০৭-এর শেষভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন। তখন হইতে ১৯১২-র প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনি প্রায়শ বেলুড়েই ছিলেন। ঐ সময় মঠপরিচালনার ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর অর্পিত ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মহাপুরুষ ঠাকুর-পূজা ও মঠের কার্য পরিচালনা করিতেন।

বেলুড় মঠে তাঁহার অনেকগুলি বিশেষত্ব সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার অনপেক্ষ অনাড়ম্বর সাধু-জীবন—পরিধানে জানু পর্যন্ত সামান্য বস্ত্র, অনাবৃত অঙ্গ ও পাদুকাশূন্যচরণে মঠে ঘুরিয়া বেড়ানো—কখনো গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে নির্লিপ্তভাবে উদাসমনে বসিয়া থাকা, সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও দৃষ্টিতে না পড়া—সকলের প্রতি সমান প্রেম ও সেবাপরায়ণতা—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বটিকে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা ও প্রীতির বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। এক সময়ে স্বামীজীর ভাবে মুগ্ধ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক মহাপুরুষের অমায়িকতা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার আহারান্তে ভৃত্যরা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে অসম্মত হইলে মহাপুরুষ স্বহস্তে উহা করিতেন। আর একবার একজন মাদ্রাজী খ্রিস্টান ভদ্রলোক মহাপুরুষের ব্যবহারে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সব জায়গায়ই খ্রিস্টান বলে আমায় অবজ্ঞা ও দুর-ছাই করেছে। এমন ভালবাসা, এত যত্ন আমি আর কোথাও পাইনি।" মহাপুরুষ একবার আমেরিকা হইতে আগত জনৈক সাধুকে নিজ গড়গড়াটি দিয়া রহস্যপূর্বক বলিয়াছিলেন, "এর ভেতর ব্যাঙ্ রয়েছে, টেনে দেখ।" মার্কিনদেশে গুরুজনের সম্মুখে তামাক খাওয়া দূষণীয় নহে। সুতরাং সাধুটি গড়গড়ার নল ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু শব্দ না হওয়ায় মহাপুরুষ বলিলেন, "ব্যাঙ্ তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না—এই দেখ সে কেমন কথা কয়"—ইহা বলিয়া কিরূপে টানিতে হয় দেখাইয়া দিলেন। অতঃপর সাধুটিও তাহাই করিলেন। ঐ সময়ে তিনি মহাপুরুষের শুধু স্নেহের পরিচয় পাইয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা শুধু স্নেহই নহে; পাছে নবাগতকে কেহ খ্রিস্টান ভাবিয়া কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখায়, এই জন্য মহাপুরুষ তাঁহাকে সেই দিন সেই ধূমপানব্যপদেশে স্বীয় অন্তরঙ্গদের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীর সকলেই পরমহংসদেবকে অবতার, এমন কি স্বয়ং ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বর্তমান যুগে তাঁহার অবদান ও তাঁহার নরলীলার পূর্ণ তাৎপর্য আচার্য বিবেকানন্দ ভিন্ন তদানীন্তন অনেকেরই নিকট অস্পষ্ট ছিল। স্বামী শিবানন্দ এই বিষয়ে কতটা অবহিত ছিলেন? ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও

তাঁহার এই অপূর্ব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের পত্নী লেডি মিন্টো মঠ দেখিতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই সঙ্ঘ প্রথমে স্বামীজীই আরম্ভ করেন! অমনি শিবানন্দ সংশোধন করিয়া দিলেন, "এ সঙ্ঘ আমরা সৃষ্টি করিনি; ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।" তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে জগতে অপূর্ব জাগরণ আসিবে এবং উহা নবভাবে ভাবিত হইবে। সেই রূপায়ণের জন্য কোন মনুষ্যশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে না—যদিও মানুষ সে শক্তির সহায়ক হইবে। শুধু তাহাই নহে; সে শক্তির ক্রিয়া ইতোমধ্যেই বিশ্বের পশ্চাদ্বর্তী সূক্ষ্মস্তরে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন, "এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়—সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে...তাই তো সমগ্র জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।" স্বামীজীর সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সমভাবে সুদূরপ্রসারিত ছিল। স্বামীজীর প্রথম সাফল্যের পর সকলেই সোৎসাহে প্রশংসামুখর হইলেও তাঁহার কার্যপ্রণালী ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন বহু মন সংশয়ান্বিত। কিন্তু ২৩/২/৯৪ তারিখে স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য দেশের সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিণত। ইহারা যদ্যপি হিন্দুধর্মের গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে... তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বস্তুত বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ না হইয়া স্বামী শিবানন্দের দৃষ্টি প্রতিঘটনার অন্তস্তলে প্রবেশপূর্বক উহার মর্মোদ্ঘাটনে সমর্থ ছিল। একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির হইতে তারক যখন ঠাকুরের ঘরের দিকে ফিরিতেছিলেন, তখন ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্ববর্তী হরিকে (তুরীয়ানন্দ) বলিয়াছিলেন, "তারকের উচ্চ শক্তির ঘর—যেখান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হইতেছে।" তাই উক্ত বিকাশোন্মুখ শক্তির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি মহাপুরুষ মহারাজ নীরবসাধনাকে আত্মপ্রসারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যনাথ ধামে নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে যখন তিনি তথায় ছিলেন তখন একদিন পদচারণ করিতে করিতে অকস্মাৎ একাকী সামান্য গৃহকর্মে নিরত এক শিক্ষিত ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সকলেই উৎসব-আনন্দে মগ্ন—শুধু স্বকার্যে নিরত ঐ ব্রহ্মচারী উহাতে বঞ্চিত। স্বামী শিবানন্দ নিকটে আসিয়া স্বতই বলিয়া উঠিলেন, "এখানে শক্তির বিকাশ দেখছি—এখানে কালে মস্ত বড় কাজ হবে।" রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সেই শিশু অবস্থায় এরূপ অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী এতাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। আলমবাজার মঠে অবস্থানকালেও অনেকে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে এই অজ্ঞাত শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষজী স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রেমানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী গুরুদাস (স্বামী অতুলানন্দ) সহ কাশ্মীর-ভ্রমণে যান এবং সেখানে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া কাশীতে আসেন। কাশীতে তাঁহার আমাশয় হয়। উহা হইতে আরোগ্যলাভান্তে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দুই মাস পরে পুনর্বার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলকাতায় 'উদ্বোধন' বাটিতে গমন করেন। এই রোগের মধ্যেও তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত— তিনি অন্যের সেবা গ্রহণ করিতেন না। আর এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল তাঁহার আহার-সংযম। রোগের আক্রমণের পর স্বভাবত সংযমশীল মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন আহার নিরামিষ ঝোল-ভাত মাত্র পর্যবসিত হইল। স্বামী সারদানন্দ সেই স্বাদহীন ঝোলের নাম দিয়াছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। শেষ পর্যন্ত এই ঝোলই ছিল তাঁহার প্রিয় খাদ্য।

১৯১২ অব্দে স্বামী কল্যাণানন্দের অনুরোধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত মহাপুরুষ কনখলে যান। ঐ বৎসর সেখানে প্রতিমায় ৺দূর্গাপূজা হয়। ৺শ্যামাপূজার সময় তাঁহারা সকলেই কাশীতে চলিয়া আসেন। সেখানে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকিয়া মহাপুরুষ ও তুরীয়ানন্দ পুনর্বার কনখলে গমন করেন। এদিকে ঠাকুরের ভক্ত পল্টুবাবু তাঁহার রুগ্ণ পুত্রকে লইয়া আলমোড়ায় বড়ই নিরানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দকে তথায় যাইতে সাদর আহ্বান জানাইলে তিনি জুন মাসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে পল্টুবাবু আলমোড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও মহাপুরুষ সেখানে তপস্যায় নিরত রহিলেন। তিনি কুকারে রান্না করিয়া খাইতেন আর নিজেকে প্রভুর আশ্রিত মনে করিয়া স্মরণ-মনন ও পাঠাদিতে কালাতিপাত করিতেন। বাগানের মালী তাঁহার সাথী ছিল, আর ছিল এক পাহাড়ী কুকুর। নির্জন পর্বতে এই আবেষ্টনীর মধ্যেই তাঁহার সাধকজীবনের প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়াছিল।

১৯১৪ অব্দে ব্রহ্মানন্দ কাশীতে আগমনানন্তর মহাপুরুষকেও সেখানে আসিতে অনুরোধ করিলে তিনি নভেম্বর মাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং প্রেমানন্দও ছিলেন। মহাপুরুষ কাশীতে অল্পদিন থাকিয়া তুরীয়ানন্দের সহিত মিহিজামে আসিলেন। ঐ সময়ে জামতাড়ায় আশ্রমের জন্য প্রদত্ত একখণ্ড ভূমি দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থাদিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বেলুড়ে আসেন এবং তথা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব উপলক্ষে রাঁচিতে যান; রাঁচি হইতে মঠে ফিরিয়া পুনর্বার আলমোড়ায় উপস্থিত হন। তখন ১৯১৫-এর এপ্রিল মাস। স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেকদিন যাবৎ বহুমূত্ররোগে

ভুগিতেছিলেন। গুরুভ্রাতৃগতপ্রাণ শিবানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

দেহত্যাগের পূর্বে স্বামীজী মহাপুরুষকে আলমোড়ায় একটি আশ্রম স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। হিমালয়ের ক্রোড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বেষ্টিত নাতিশীতোষ্ণ আলমোড়া শিবানন্দের প্রিয় স্থান। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে তিনি সেখানে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্রমস্থাপনের সঙ্কল্প মনে জাগে নাই। এবারে সম্ভবত গুরুভ্রাতার প্রয়োজন চক্ষুর সম্মুখে থাকায় স্বামীজীর সেই বাসনা তিনি কর্মে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিসংগ্রহান্তে তাহাতে আশ্রমবাটি আরম্ভ হইল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হইলে মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেলুড়ে পাঠাইলেন।

ঐ বৎসর ৺শ্যামাপূজায় কাশীতে উপস্থিত থাকার জন্য বারংবার অনুরোধপত্র আসিতে থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে আলমোড়ায় রাখিয়া মহাপুরুষ কাশীতে গেলেন। কিছুদিন পরে আলমোড়ায় ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ৺শ্যামাপূজার পরে অসুস্থতাবশত এবং অন্যান্য কারণে আর আলমোড়া যাওয়া হইল না। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি কাশীধামে অবস্থানান্তে প্রয়াগ হইয়া বেলুড় মঠে আগমন করিলেন। ঐ বৎসর তিনি ও বাবুরাম মহারাজ মিহিজামে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সাঁওতালদিগকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। মিহিজাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। সুতরাং মঠের কাজকর্ম অনেকটা স্বামী শিবানন্দকেই চালাইতে হইত। ঐ বৎসর শীতকালে তাঁহারা দুই জনে কাশীতেও গিয়াছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা পরবৎসর ঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়া আসেন। এদিকে আলমোড়ায় আশ্রমবাটির কার্য তুরীয়ানন্দের চেষ্টায় উত্তমরূপেই অগ্রসর হইতেছিল। মহাপুরুষ সমভূমি হইতে পত্রাদিযোগে পরামর্শ দিয়া এবং বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অর্থাদি পাঠাইয়া সাহায্য করিতেছিলেন। যথাকালে (১৯১৬ ইং) কার্য শেষ হইল। ইত্যবসরে বেলুড়ে সমাগত মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে তিনি মঠের কাজকর্ম পরিচালনের দায়িত্ব প্রকাশ্যত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মঠ ও সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য হইল। অতঃপর ঠাকুরের কার্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে তিনি মঠ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই।

আমরা পূর্বে বহুবার মহাপুরুষের গাম্ভীর্য ও ঔদাসীন্যের নিম্নে যে অন্তঃসলিলা স্নেহের ফল্গুধারার পরিচয় পাইয়াছি, মঠ-পরিচালনার দায়িত্ব স্কন্ধে অর্পিত হওয়ায় সে ধারা সমস্ত আবরণ অপসারিত করিয়া পূর্ণবেগে কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামী শিবানন্দ জানিতেন, স্বামী প্রেমানন্দ এক অপূর্ব প্রীতির বন্ধনে সাধু ও ভক্তদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর সেই অভাব অপূরণীয় জানিয়াও তিনি সে বিষয়ে যত্নপর হইলেন। এই সময়ে মহাপুরুষের দৈনন্দিন জীবন বড়ই শিক্ষাপ্রদ ছিল। পূজাপাঠ ও ধ্যানভজনের একটা জমাট ভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন। প্রতিদিন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সহিত সদালাপের দ্বারা তিনি একদিকে যেমন সকলের মন এক অতি উচ্চস্তরে তুলিয়া রাখিতেন, অপরদিকে তেমনি মঠের প্রত্যেকটি কার্য ও বস্তু ঠাকুরের—এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তৎপ্রেরণায় খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতেন এবং স্বহস্তে অনেক কর্ম করিতেন। বাগানের মালী, গোয়ালের গরু, পশু-পক্ষী কেহই তাঁহার স্নেহস্পর্শে বঞ্চিত হইত না। বেলুড়ে তখন খুব ম্যালেরিয়া হইত। ভাদ্র মাসের পরে মঠ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতালে পরিণত হইত। মহাপুরুষজী তখন রোগীদের সেবা ও তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার পথ্যসংগ্রহ এবং উহা প্রস্তুত করার ভারও তাঁহাকেই লইতে হইত কিংবা কাছে দাঁড়াইয়া সযত্নে অপরকে সাগু, বার্লি, ঝোল ইত্যাদি প্রস্তুত করার প্রণালী শিখাইতে হইত।

নিয়মানুবর্তিতা তিনি পছন্দ করিতেন; কিন্তু একটি ঘটনা তাঁহাকে সেই কর্তব্যের আনুষঙ্গিক কঠোরতা হইতে মুক্তি দিল। একদিন অসময়ে আহারের পরে এক ব্রাহ্মণ অন্নভিক্ষা চাহিলে মহাপুরুষ অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুভুক্ষুকে নিরাশ করায় মর্মপীড়িত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। মঠত্যাগের সময় ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবার ভঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণকে কেউ দুটো খেতে দিলে না—এতে কি ভাল হবে?" ইহারই তিন দিন পরে গোয়ালে আগুন লাগিয়া মঠের কিছু ক্ষতি হওয়াতে মহাপুরুষের ধারণা হইল যে, ইহা সেই ব্রাহ্মণেরই অভিশাপের ফল, আর এই জন্য দায়ী তিনি। অতঃপর সম্ভবস্থলে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না।

স্বামী শিবানন্দ যতদিন আপনমনে আপনভাবে ছিলেন, ততদিন লোকব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু যেদিন তিনি সত্যসত্যই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ভক্তগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, সেদিন শ্রীগুরুই স্বকার্যসাধনার্থ তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। মহাপুরুষ সেদিন আপনার অতীতের দিকে

তাকাইয়া সরলভাবে এই শিষ্যস্থানীয় সাধুর নিকট স্বীকার করিলেন, "লোকব্যবহার তো কোনদিন শিখি নাই।" সত্য বলিতে গেলে 'লোকব্যবহার' তিনি পরেও শিখেন নাই; তবে শ্রীগুরুর সেবারই একটা বিশেষ দিক হিসাবে ভক্তসেবাও যথাকালে তাঁহার চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্মশানবাসী শিবই আবার আশুতোষ। সংসার-বিরাগী শিবানন্দকেও আমরা যথাকালে আশুতোষরূপে দেখিতে পাই—সদানন্দময় মহাপুরুষের মুখে তখন আশীর্বাণী ভিন্ন কিছুই নাই। সঙ্ঘের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত স্বামী শিবানন্দের ইহাই শেষ পরিণতি। কিন্তু মঠের পরিচালনভার যখন তিনি প্রথম স্বীকার করেন, আমরা আপাতত সেই সময়েরই আলোচনা করিতেছিলাম।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ যখন কর্মভার লইলেন, তখন ব্যয়াধিক্যবশত মঠের বৃদ্ধগণ চিন্তিত। সুতরাং তাঁহার প্রথম কার্য হইল ব্যয়হ্রাস। ইহার প্রতিকার আয়বৃদ্ধি করিয়াও হইতে পারিত; কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া ব্যয়হ্রাসের পথেই চলিলেন। ইহার ফলে লোকের বিরাগভাজন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্বোক্ত ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্যবহারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ঘটনাই আবার মহাপুরুষের চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতারও পরিচয় দেয়। কারণ ব্রাহ্মণের বাক্যকে কেহ এযুগে অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে না এবং অভিশাপের ফলে তিন দিন পরে গোয়াল ঘরে আগুন লাগে ইহাও আধুনিক যুক্তিবাদী মন মানিয়া লয় না।

গণনারায়ণের প্রতি তাঁহার স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপরায়ণতার সাক্ষ্য আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরূপে উহার পরিচয় তিনি বিবিধ সেবাকার্যে রত কর্মিগণের উপর তাঁহার আশীর্বাদ শতধারায় বর্ষিত হইত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যেরত জনৈক সাধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয়ে সদাসর্বদা প্রভুর শ্রীমূর্তি জাগরূক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁর দীনদরিদ্র মূর্তিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে সমর্থ হও।" এই জাতীয় উৎসাহবাণী বিতরণ ও অর্থাদি-সংগ্রহ করিয়া সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনে ওতপ্রোত ছিল। বাহুল্যভয়ে আমরা আর উহার উল্লেখ করিব না।

জনকল্যাণরত স্বামী শিবানন্দের প্রাণে স্বাধীনতার আন্দোলনও সাড়া জাগাইত; কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেখিতেন মহাপুরুষেরই আত্মিক দৃষ্টিতে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী যখন মতিলাল নেহেরু ও মহম্মদ আলি প্রভৃতি সহকর্মীদিগকে লইয়া বেলুড় মঠে আসেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে সাগ্রহে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন। পরে তিনি মহাত্মাজী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীর চরিত্র সকলের অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হবে।" কিন্তু অনন্যসাধারণ জীবনের

কথা ছাড়িয়া দিলে, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কুটিল রাজনীতি ও শান্ত-সমাহিত আত্ম-সাধনার মিশ্রণের বৃথা প্রচেষ্টায় অথবা বহিঃ-স্বাধীনতাকে অন্তঃ-স্বাধীনতার পদে প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত প্রয়াসে সাধুজীবনকে বিড়ম্বিত করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে জনকয়েক দেশপ্রেমিকের সহিত তাঁহার এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি সেদিন বিরুদ্ধ যুক্তি পর্যুদস্ত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীদের অনুসৃত পন্থা যতই উত্তম হউক না কেন, দেশের অভ্যুত্থানের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত নহে। মঠ-মিশন ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাবলম্বনে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য উহাও অত্যাবশ্যক—এমন কি, অধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগপূর্বক দেশবাসী অন্য পথে চলিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

১৯২১-এর এপ্রিল মাসে ব্রহ্মানন্দজী দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমনকালে স্বামী শিবানন্দকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ঐ সুযোগে তিনি ঐ অঞ্চলের ভক্ত ও আশ্রমগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পর ভুবনেশ্বরে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা ১২/১/২২ তারিখে বেলুড়ে ফিরিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতোমধ্যে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ভক্তদের অনুরোধে মহাপুরুষ তাঁহাকে লইয়া পূর্ববঙ্গে গেলেন। মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত ভাগবতবাণীর আকর্ষণে ঐ সময়ে বহু নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইল। প্রথমে তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইলেন; কিন্তু আকুলপ্রাণ ভক্তবৃন্দ নিরস্ত না হওয়ায় সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত জানাইয়া পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার আন্তরিক অনুমতি পাইয়া বহু ভক্তকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষের মধ্যে অকস্মাৎ এই গুরুভাবের আবির্ভাব একটু বিস্ময়জনক। প্রায় আট বৎসর পূর্বে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস। ...প্রভুই এযুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট।" এইরূপ মনোভাব লইয়া যিনি এতদিন চলিয়াছিলেন, আজ তিনি কিরূপে গুরুর আসনে বসিবেন? ইহার উত্তর পরবর্তী কালে কথাচ্ছলে তিনি নিজেই দিয়াছিলেন, "দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার নেই।...তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন; তিনিই আমার ভেতর বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্মা।" ইহাকে গুরুভাব বলিতে হয় বলুন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা শরণাগতিরই এক চরম পরিণতি। ফলত শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত মহাপুরুষজীর গুরুভাব বিকশিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্ব মুছিয়া গিয়া ক্রমেই সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাধিক প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি ঠাকুর,

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সত্যই লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে।"

ঢাকায় আনন্দের হাট বসিয়াছে—অকাতরে কৃপা পাইয়া বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করিতেছে; এমন সময়ে কলকাতা হইতে সংবাদ আসিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ অসুস্থ। কালবিলম্ব না করিয়া মহাপুরুষ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অচিরেই স্বস্বরূপে লীন হইলেন। সে এক অতি বিষাদের দিন। সেই অপূরণীয় শূন্যস্থান পূর্ণ করিবে কে? মঠের কর্তৃপক্ষ অনেক ভাবিয়া অবশেষে স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকেই সভাপতিত্বে বরণ করিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী তাঁহাকে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী নিযুক্ত করেন; ১৯১০-এর ২৫ আগস্ট তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ হন; অতঃপর ১৯২২-এর ২ মে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন।

আমরা পূর্বে বালক সাধক ও কর্মী শিবানন্দকে দেখিয়াছি; বর্তমানে আমরা তাঁহাকে পাইব প্রধানত সঙ্ঘনেতা, শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃপাপরবশ মহাপুরুষরূপে—অথচ তৎসহ প্রতিপদেই তাঁহার বালকসুলভ সরলতা ও নির্ভর, সাধকসুলভ অদম্য প্রচেষ্টা ও ব্যাকুলতা এবং কর্মিসুলভ উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইব। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়াছিলেন এবং বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; বহু আশ্রম তাঁহার প্রেরণায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনেক কেন্দ্র তাঁহার শুভপদার্পণে নবজীবন পাইয়াছিল। ফলত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আপ্রাণ চেষ্টায় যে সঙ্ঘজীবন সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়মূল হইয়াছিল তাহা মহাপুরুষের ঐকান্তিক সেবায় সুপ্রসারিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া জননারায়ণের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুধু সংক্ষেপে আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইব।

সঙ্ঘজীবনের মূল ভিত্তি হইতেছে—অবিরাম অধ্যাত্মসাধনা। বৃদ্ধ বয়সেও মহাপুরুষের সাধনার শেষ ছিল না। প্রবর্তকের ন্যায় প্রত্যহ শেষরাত্রে শয্যাত্যাগান্তে তিনি ঠাকুরঘরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন। স্তোত্র-পাঠাদিতেও তাঁহার অনেক কাল কাটিত। যতদিন ক্ষমতা ছিল, স্বয়ং ঠাকুর-সেবাদির সর্বপ্রকার সংবাদ রাখিতেন। সময়ের অসদ্ব্যবহার তিনি জানিতেন না; তাই প্রতিক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় বা ভগবদালাপনে ব্যয়িত হইত। অনেক সময় শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দিগকে স্বহস্তে

পত্র লিখিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন। আর সকলকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই জীবনের কেন্দ্র। আরতিতে সকলকে ঠাকুর-ঘরে পাঠাইতেন; ভক্তের আনীত দ্রব্য আগে ঠাকুরঘরে পাঠাইতেন এবং ভক্ত আসিলেই আগে ঠাকুর প্রণামের আদেশ দিতেন। ইহা বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে যে, শেষজীবনে মহাপুরুষ ছিলেন বেলুড় মঠের প্রাণ। মঠবাসীরা এবং মঠে আগত সাধুরা তাঁহাকে শুধু অধ্যক্ষরূপে দেখিতেন না, তাঁহারা তাঁহাকে পাইতেন তাঁহাদের ইহজীবনের অশেষ করুণাময় অবলম্বনরূপে। তাঁহার একটু দৃষ্টি, একটি স্নেহময় কথা, সামান্য প্রীতির দান সারা জীবনে উৎসাহ আনিয়া দিত। শেষজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বেলুড় মঠে কাটাইয়াছিলেন। প্রতিদিন যত ধর্মপিপাসু তাঁহার গৃহে অবাধে সমবেত হইতেন, সকলেই আত্মিক অবদান কিছু না কিছু পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণপদে তাঁহার মনপ্রাণ অর্পিত থাকায়, তাঁহার নিজের বলিয়া কিছু ছিল না। ভক্তদের আনীত অর্ঘ্য ঠাকুর-সেবায় বা সাধুসেবায় অকাতরে ব্যয়িত হইত। আর ভক্তদিগকে তিনি শুধু নিজের শিষ্যরূপে পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না; ঠাকুরের প্রতি ও সঙ্ঘের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেম বর্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং উপদেশ ও নিজ জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের লক্ষ্য ঐ দিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেন। বেলুড়ের বাহিরে যখন যাইতেন তখনও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সর্বত্র ঠাকুর ও সঙ্ঘেরই মহিমা বিঘোষিত হইত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি একবার উত্তর ভারতের কাশী, প্রয়াগ ও কনখল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসর ঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়াছিলেন। সেই বৎসর উৎসবের দিন প্রাতে প্রকৃতি প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিলে সাধু ও ভক্তেরা উৎসব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া মহাপুরুষজীকে সব নিবেদন করিলেন। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া অনাথশরণ ঠাকুরের ঘরে যাইয়া অনেকক্ষণ ধ্যানে রত থাকিলেন। যখন বাহিরে আসিলেন, তখন বদনে এক দিব্য জ্যোতি, আর মুখে এই আশার বাণী উচ্চারিত হইল, "তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেই বারে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর বসন্তকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিপূর্ণ বাঞ্ছা পরিপূরণের জন্য ভুবনেশ্বরে দেবীর আরাধনা হইলে তিনি সেখানে গিয়া প্রায় দেড়মাস কাটাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কলকাতায় গদাধর আশ্রমে ৺জগদ্ধাত্রীপূজাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই গদাধর আশ্রমের সহিত তাঁহার বেশ একটা মধুর সম্বন্ধ ছিল। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হইবার পূর্বে ১৯২১ খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর তিনি ইহার প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরোহিত্য করেন এবং আঠার দিন আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন।

১৯২৪-এর ২৮ জানুয়ারি বেলুড় মঠে সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বামীজীর সমাধির

উপরে ওঁকার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন এবং ৭ ফেব্রুয়ারি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরে এপ্রিল মাসে দাক্ষিণাত্যযাত্রা করিয়া ওয়ালটেয়ার, সিংহাচলম, মাদ্রাজ, কুনুর, উতকামণ্ড, নেত্রম্‌পল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে প্রায় সাত মাস কাটাইয়া বোম্বাই গমন করেন। সেই যাত্রায় মাদ্রাজে এক ভক্তগৃহে তিনি ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় নিম্নে কলরব উত্থিত হওয়ায় বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বুভুক্ষা-পীড়িত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকা শৃগাল-কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট পত্রসমূহ হইতে অন্ন কুড়াইয়া খাইতেছে। ইহাতে ব্যথিত হইয়া তিনি গৃহস্বামীকে তাহাদিগকে ভরপেট খাওয়াইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "এ পুঞ্জীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতদিন না হবে, ততদিন ভারতের কোন আশা নেই।" কুনুরে নীলগিরির উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত পরিবেশে তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ পর্বতে সাধুদের সাধনোপযোগী আশ্রমস্থাপনের বাসনাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্বপ্নাদিষ্ট জনৈক ভক্ত উতকামণ্ডে কিছু ভূমি দান করায় মহাপুরুষ তথায় গমনপূর্বক ১১ জুলাই আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বালক অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে ভ্রমণরত মহাপুরুষজীর চরণে হকি স্টিক দ্বারা আঘাত করে, আঘাতের ফলে তিনি সাত-আট দিন গৃহে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু লজ্জিত, অপ্রতিভ ও সন্ত্রস্ত সেই বালকটির অনুসন্ধান তিনি সর্বদা করিতেন এবং নিকটে ডাকাইয়া সান্ত্বনাবাক্যে তাহার সঙ্কোচাদি দূর করিয়া দিতেন। বাঙ্গালোরে তিনি অস্পৃশ্যদিগের মন্দিরে যাইয়া তাহাদিগকে অবাক করিয়াছিলেন; কারণ দেশের রীতি-অনুসারে এরূপ সম্মানিত ব্যক্তির ঐ পল্লিতে পদার্পণ কল্পনাতীত। ১২ ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

১৯২৫-এর ১২ জানুয়ারি মহাপুরুষ বোম্বাই পৌঁছিয়া আশ্রমের ভাড়াবাড়িতে উঠিলে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, তিনি আশ্রমটিকে নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। তদনুসারে এক খণ্ড ভূমি সংগৃহীত হইল এবং ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি উহাতে ভিত্তিস্থাপন করিলেন। বোম্বাই হইতে বেলুড়ে ফিরিবার পথে তিনি নাগপুরে অবতরণ করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ বৎসর ভারত-পরিদর্শনে আগত বেলজিয়মের রাজা এলবার্ট বেলুড় মঠে আগমনপূর্বক মহাপুরুষজীর মধুর আলাপে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে তিনি এই একমাত্র স্থান দেখিয়াছেন যেখানে লোকে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো কথা বলে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য দেওঘরে যান, তখন ঠাণ্ডায় তাঁহার হাঁপানি বাড়িয়া রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। এই কষ্টের মধ্যে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতে করিতে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—শরীর ও আত্মা পৃথক, একের দুঃখ অপরকে স্পর্শ করে না। পরদিবস সকলকে পূর্বরাত্রের প্রাণসংশয় অবস্থা ও উহার অপূর্ব প্রতিকারের কথা জানাইতে গিয়া যখন বলিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা—অল্পক্ষণেই মন (হৃদয়ের দিকে দেখাইয়া) ভিতরে ডুবে গেল", অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, "ওটা কি মহারাজ?" উত্তর আসিল, "ঐ তো আত্মা।" দেওঘর হইতে তিনি জামতাড়া হইয়া মঠে আসেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কিছু পরেই তিনি পুনর্বার দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন। পথে পুরী ও ভুবনেশ্বরেও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এইবারে উতকামণ্ডে বাসকালে তাঁহার এক অত্যাশ্চর্য দর্শন হয়। নীল পর্বতের তরঙ্গায়িত শিখরশ্রেণীর প্রতি নীরবে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার শরীর হইতে কে যেন বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাই কি বিরাটরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি? অতঃপর পাঁচ মাস তথায় অবস্থানান্তে ২৪ সেপ্টেম্বর উতকামণ্ডের নবনির্মিত আশ্রম যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ২০ অক্টোবর বাঙ্গালোরে গেলেন। বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ হইয়া পুনর্বার বোম্বাই চলিলেন। এইবারে ২৬ ডিসেম্বর নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল; অতঃপর ঐ আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয়েরও ভিত্তিস্থাপনের পর মঠে ফিরিবার পথে তিনি পুনর্বার নাগপুরে অবতরণ করিলেন। তখনও আশ্রমের বাড়ি হয় নাই। অতএব মহাপুরুষ আশ্রমের জমিতেই তাঁবু খাটাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

পরবৎসর (১৯২৭) ১৯ আগস্ট স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে মঠ-মিশনের একটি প্রধান স্তম্ভ খসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শিবানন্দের গুরুদায়িত্ব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইল। কিন্তু সে গুরুভার স্বীকারের মনোভাব তখন তাঁহার নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার 'ডান অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' সেই নিদারুণ আঘাতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে যাইতে হইল। মধুপুরে স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীতে এক দিব্য দর্শনের মধ্যে তাঁহার মন আবার কর্মভূমিতে নামিবার আদেশ পাইল। একরাত্রে তাঁহার অনাবৃত চক্ষের সম্মুখে জটাজূটধারী শুভ্রদেহ ত্রিনয়ন দেবাদিদেব মহাদেব উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া ক্রমে যেন কোন অসীমে বিলীন হইতে চলিল; এমন সময়ে শিবমূর্তির স্থলে অকস্মাৎ

শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া নির্দেশ দিলেন, "তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।" আর একদিন তিনি সেবাশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভ্রমণকালে বিভূতিমণ্ডিত তুষারধবল বিশ্বনাথের দর্শন পাইয়াছিলেন; উহার পর হইতে তিনি সর্বদা এক উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন এবং ঐ সময়ে আহারাদি সম্বন্ধেও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলত সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অধিকতর প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এখন হইতে স্বামী শিবানন্দের দেহ-মনকে একদিকে যেমন কার্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি উহাকে এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধিতেছিলেন। কাশী হইতে তিনি পাটনা হইয়া স্বীয় কর্মকেন্দ্র বেলুড়ে ফিরিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর মর্তধামে ছিলেন।

এই শেষ কয়টি বৎসর বড়ই মধুর, বড়ই অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং উৎসাহ জাগাইয়া তিনি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়'।" কাহাকেও শাসন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে বলিতেন, "সকলেই নির্দোষ হতে এসেছে; নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসেনি!...খালি ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" সর্বক্ষেত্রেই তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলিতেন। মঠের অর্থকৃচ্ছ্রতা যথেষ্টই ছিল। ব্যয়-সঙ্কোচের কথা তুলিলে বলিতেন, "দেখ, আমাদের তো কিছু অপব্যয় হচ্ছে না। কি আর খরচ কমাবে?...তাঁকে জানাও। ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।" ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জনকয়েক স্বার্থপর ব্যক্তি সঙ্ঘের সমূহ ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলে এবং মঠের সকলেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় সংশয়-দোলায়মান হইলে তিনি বিশ্বাস জাগাইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যের জয় নিশ্চয়। সত্যাশ্রয়ী প্রভুর গড়া সঙ্ঘের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তোমরা নিশ্চিত জেনো।" আর একদিন তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে। কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ বাবা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামীজীর কথা।" সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যেমন ঐ কালে নিশ্চিত ছিলেন, শত্রুদের মঙ্গলের জন্যও তেমনি প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন, "প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এদের রক্ষা করো—তোমারই আশ্রিত—এদের মনের গতি ঘুরিয়ে দাও, সুবুদ্ধি দাও। আর যাই কর ঠাকুর, ওদের ত্যাগ করো না।"

তিনি নিজে যেমন স্বীয় পদগৌরবের অভিমান করিতেন না, অপরেরও তেমনি বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদির প্রশ্ন তুলিতেন না—লক্ষ্য রাখিতেন শুধু ভক্তের আগ্রহের প্রতি। জনৈকা দীক্ষাপ্রার্থিনী বিধবা দীক্ষাকালে দেয় দক্ষিণাদির

সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ—প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ওসব কিছু নেই—চাই কেবল প্রাণ" ঠাকুরের দরবারে উচ্চতম আসনে বসিয়াও ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া নিরভিমান আত্মভোলা মহাপুরুষ বলিতেন, "আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই—তুমি বসিয়েছ, তাই বসেছি।" আর পতিতপাবনী ভাগীরথীর ন্যায় নির্বিচারে জীবোদ্ধারে নিরত থাকিয়া বলিতেন, "আমি এখন মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।" তাঁহার শরীর তখন বিশেষ অসুস্থ—হাঁপানির টান প্রায়ই হয়; কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই, আর কৃপারও বিরাম নাই। তিনি বলিতেন, "কেন আছি? খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই—তবু তাঁর ইচ্ছা। এ শরীর থাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয়, আর তাই যদি মায়ের ইচ্ছা হয়, তো হোক। ...শরীর যে আছে, তাই অনেক সময় মনে হয় না। ...এ শরীরকে তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন।"

দেহবোধহীন বিদেহ মহাপুরুষের এই সুর সর্বদা চড়িয়াই থাকিত। প্রণামান্তে একদিন একজন পদধূলি চাহিলে বলিলেন, "পা-ই নেই, তো পায়ের ধুলো।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শরীরের অযত্ন করিতেন না—ডাক্তারের কথা শুনিয়া চলিতেন। উহার কারণ তাঁহার নিজের উক্তিতেই পাওয়া যায়—"এ দেহ তো সাধারণ দেহের মতো নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁকে সেবা করেছে—তাই এত।" সদা আত্মমগ্ন মহাপুরুষ কখনও বা সবই চিন্ময় দেখিতেন। যে সম্মুখে আসিত, তাহাকেই নির্বিচারে প্রথমেই প্রণাম করিয়া বসিতেন। একটি বিড়াল মেঝের উপর মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেই তাহাকে প্রণামান্তে নিকটস্থ সেবককে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর আমায় এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি চিন্ময়, ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সব প্রাণীর ভেতরেই সেই এক চৈতন্যের খেলা!"

সর্বভূতে তখন তাঁহার অসীম প্রীতি; আর সাংসারিক অভাব মিটাইতে তিনি মুক্তহস্ত। এই ব্যক্তির ঘরে অন্ন নাই—"দাও একে দশ টাকা।" উহার কন্যার বিবাহ হইতেছে না—"দিয়ে দাও কুড়ি টাকা"—এই ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম। মঠের প্রাঙ্গণে বসিয়া মুচি কাজ করিতেছে। দ্বিপ্রহরে সকলে আহারান্তে বিশ্রামে চলিয়া গিয়াছেন—তখনও মুচির কাজের বিরাম নাই। দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বাজিল। অমনি তাহাকে খাওয়াইবার আদেশ দিলেন, আর উপর হইতে মুচির অজ্ঞাতসারে একটি আধুলি ছুঁড়িয়া দিলেন। গঙ্গার উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার মাছ ধরিয়াও অন্নসংস্থান করিতে পারে না। কায়েমী হুকুম

হইল, উহার মাছ দরদস্তুর না করিয়া কিনিতে হইবে। হালদার আট আনার জায়গায় দুই টাকা এবং সময়ে সময়ে নূতন বস্ত্রাদিও পাইতে লাগিল।

এইরূপে দুই হাতে সমস্ত বিলাইয়া তিনি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল দীক্ষান্তে আহার শেষ করিতেছেন, এমন সময়ে দারুণ পক্ষাঘাতে তাঁহার বাক্‌শক্তি ও দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়া রুদ্ধ হইল। এই অবস্থায় তিনি এক বৎসর ছিলেন। তখনও প্রতিদিন বাক্‌শক্তি ও চলচ্ছক্তিরহিত মহাপুরুষের চক্ষের চাহনি বা বাম হস্তের ইঙ্গিতে যে স্নেহের ভাষা প্রকটিত হইত তাহা শত শত প্রাণে শান্তি সঞ্চারিত করিত। তখনও ঠাকুরের সেবাদি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইতে হইত। কাশীতে একদিন তিনি ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার জিব কেটে নিলেও আমি তাঁরই কথা ভাবব, আর তাঁরই নাম করব। আমার কাছ থেকে কেউ তাঁকে বা তাঁর নাম কেড়ে নিতে পারবে না।" কে সেদিন ভাবিয়াছিল যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ এমনি নিষ্ঠুরভাবে পরিপূর্ণ হইবে?

অবশেষে শেষদিন আসিয়া পড়িল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি আশু বিষাদের ঘন ছায়াপাতের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে যথাবিধি সমাপ্ত হইয়া গেল। ২০ মঙ্গলবার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটে তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং মস্তকের কেশ ও অঙ্গের লোমরাজি কদম্বপুষ্পের কেশরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। সেই আনন্দ-পুলকের মধ্যেই অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল—মহাসমাধিতে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ হৃদয়দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরমিলিত হইলেন।

# স্বামী সারদানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন পদচারণ করিতে করিতে সহসা এক যুবকের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন এবং কয়েক মুহূর্ত ঐ ভাবে থাকিয়া উঠিয়া যান। উপস্থিত ভক্তদের ঐ বিষয়ে কৌতূহলদর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।" এই যুবককেই স্বামী বিবেকানন্দ যথাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক-পদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহনপূর্বক স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। "স্বামীজীর আদেশ"—ইহাই ছিল তাঁহার কর্মপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। ইনিই আমাদের স্বামী সারদানন্দ।

সারদানন্দের পূর্বনাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতামহ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি হুগলী জেলার জনাই গ্রামে বসতিস্থাপন ও টোলপ্রতিষ্ঠা করিয়া বহু অন্তেবাসীকে শিক্ষা দিতে থাকেন। শরতের পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলকাতায় আসেন এবং একটি ঔষধের দোকানের অংশীদাররূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন। সঙ্গতিসম্পন্ন হইলেও গিরিশচন্দ্র ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং কর্মব্যপদেশে তাঁহার বহু সময় কাটিলেও নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা-পাঠ ও জপধ্যানের ব্যতিক্রম হইত না। মাতা শ্রীযুক্তা নীলমণি দেবীও অনুরূপ ভক্তিমতী ছিলেন। তিন কন্যার পর শরৎচন্দ্র এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার পরে ৬টা ৩২ মিনিটে (৯ পৌষ, ১২৭২ সাল, শুক্লা ষষ্ঠীতিথি) ভূমিষ্ঠ হন। শনিবারে জন্ম হওয়ায় পরিবারের সকলে একটু চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু শিশুর পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি কোষ্ঠীবিচারের পর সকলকে অভয়দানপূর্বক জানাইলেন যে, এই শিশু গণ্যমান্য হইয়া ভবিষ্যতে পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবে।

শৈশব হইতেই শরতের স্বভাব বড় শান্ত ছিল—বয়সোচিত চঞ্চলতা তাঁহাতে মোটেই পরিলক্ষিত হইত না। তাই পরবর্তী জীবনে তাঁহার কার্যকুশলতার অপূর্ব বিকাশদর্শনে শৈশবের অভিভাবকদিগকে বলিতে শোনা যাইত, "এর ভেতর এত ছিল তা তো জানতুম না।" বিদ্যালয়ের পরীক্ষাদিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্রদের আলোচনাসভায়ও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন এবং ব্যায়ামাদিসহায়ে স্বীয় দেহকে সুগঠিত করিয়াছিলেন। স্বগৃহে শান্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতা একত্রে মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্রের বাল্যকালকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। জননী যখন গৃহদেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন, কিশোর শরৎ তখন

পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেন এবং যথাসময়ে সমবয়স্কদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেব-দেবীর স্তোত্রাদি তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। পূজা পাঠে সন্তানের আগ্রহদর্শনে স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎ ঐ সমস্ত পাইয়া ক্রীড়া ভুলিয়া দেবারাধনায় নিরত হইলেন। অবশেষে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়নের পর যখন গৃহদেবতার অর্চনার অধিকার পাইলেন, তখন তিনি অতি আগ্রহসহকারে বিধিপূর্বক নিয়মিত পূজাপাঠ ও জপ-ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

এই বয়সেই গরিব-দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং পাঠশালায় জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। পয়সা এমন কিছু অধিক ছিল না—দিনে দুই-চারি আনা মাত্র। সৎকার্যে ব্যয়ের আশায় উহা হইতেই কিছু কিছু তুলিয়া রাখিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে উক্ত অর্থ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে অনেক স্থলে নিজের ছাতা কিংবা বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেবার স্পৃহাও সমভাবেই জাগ্রত ছিল। একবার এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিচারিকা বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইলে পরিবারের অপর সকলের নিরাপত্তার জন্য গৃহকর্তা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাড়ির ছাদের এক পার্শ্বে বিনা যত্নে ফেলিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার জীবনরক্ষা হইল না। নিষ্ঠুর প্রতিবেশী তখনও শবদাহের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া শরৎচন্দ্র পেশাদার বৈষ্ণবদিগকে ডাকিয়া আনিয়া মৃতসৎকারের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ ঘটনায় শরতের বাল্য ও যৌবন পরিপূর্ণ। বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে তিনি আর্ত ও দরিদ্রদের সেবায় ভবিষ্যতে যে বিপুল মহানুভবতা ও কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সূচনা আমরা তাঁহার জীবনপ্রভাতেই দেখিতে পাই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের আলোচনাসভায় সভ্যদের নিকট ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ পাইয়া শরৎ সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকৃষ্ট অপর অনেক যুবকের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাদি-পাঠ ও ধ্যানাভ্যাসাদিতে রত হইলেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসরের প্রারম্ভে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হইলেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার লাফঁ শরতের ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করেন। নিষ্ঠাবান শাক্ত পরিবারে জাত এবং ভক্তিমতী মাতার ক্রোড়ে লালিতপালিত হইলেও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং বাইবেল-অধ্যয়ন যুগপ্রভাবেই হইয়াছিল সত্য;

কিন্তু এইরূপ করিয়াও নিজ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে শরৎ কখনও স্বধর্মে আস্থাশূন্য হন নাই।

পাঠাভ্যাসের ন্যায় শরৎ অন্যান্য কার্যেও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সৎ-চর্চা, আর্ত-সেবা ও ব্যায়ামাদির জন্য পল্লিতে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। একবার এই সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে যাইয়া ঘটনাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। কিন্তু তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে তখন তেমন ধারণা না থাকায় ঐ দর্শন তাঁহার মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে নাই। অতঃপর কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি শশী ও অন্যান্য সমবয়স্কদের সহিত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদিন পরমহংসদেব-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীমুখকথিত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের উপদেশলাভে কৃতার্থ হন। ইহার সবিশেষ বিবরণ রামকৃষ্ণানন্দ প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ শরৎ ও শশীর ধর্মজীবনে এক অভিনব আলোক-সম্পাত করিল। বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্রেম ব্যবহার তাঁহাদিগকে আরও দৃঢ়তররূপে দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানিতে লাগিল। দুই ভ্রাতার অবসর একই সময়ে হইত না বলিয়াই হউক কিংবা একাকী যাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ স্মরণ করিয়াই হউক অতঃপর দুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতি বৃহস্পতিবারে বন্ধ থাকিত; সুতরাং বিশেষ প্রতিবন্ধ না ঘটিলে শরৎ ঐ দিনই ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন দিন আবার দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও যাইতেন। তখন গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা বা শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাট মন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। একদিন শরৎ নিবেদন করিলেন, কিছুতেই মন স্থির হইতেছে না। ঠাকুর স্বীয় তর্জনীর নখাগ্রদ্বারা শরতের ভ্রূদ্বয়মধ্যে আঘাত করিয়া সেখানে মনকে ধারণ করিতে বলিলেন—অমোঘ বিধানে শীঘ্রই উহা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তথায় স্থির হইয়া গেল।

অপর একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন—শ্রীশ্রীগণপতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ঠাকুর গণেশের চরিত্র, মাতৃভক্তি প্রভৃতি কথার অবতারণপূর্বক উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকিলে শরৎ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমি গণেশের চরিত্র পছন্দ করি, তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।" ঠাকুর অমনি সংশোধন করিয়া বলিলেন, "না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, তোমার আদর্শ শিব—শিবের গুণরাজি তোমাতে বিদ্যমান।" তিনি আরও বলিলেন, "নিজেকে সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে।" সাধারণবুদ্ধি আমাদের পক্ষে এই সমস্ত

রহস্যের মর্মভেদ করা অসম্ভব। তবে পরবর্তী কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে শরৎ যে অদ্ভুত তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নীলকণ্ঠ শিবের পক্ষেই সম্ভবপর—গরল পান করিয়াও অম্লানবদনে আশীর্বাদ করা, নিজের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়াও অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করা শুধু আশুতোষেরই সাধ্যায়ত্ত। আর শরতের সমস্ত শক্তির উৎস ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা—তিনি ছিলেন তাঁহাদের শক্তিপ্রকাশের অস্বতন্ত্র যন্ত্র।

আর একদিনের ঘটনাসম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ''কল্পতরু হওয়ার সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেক সময়ে অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। ঐরূপ একদিন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঠাকুর বললেন, 'কিরে, তুই যে কিছু চাইলি না?' সে সময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কি আর চাইব? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই করে দিন।' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও যে শেষকালের কথা রে!' আমি বললাম, 'তা আমি জানি না, মশায়!' তখন ঠাকুর বললেন, 'তা তোর হবে'।'' এই ঘটনার উল্লেখান্তে শরৎচন্দ্র ইহাও বলিয়াছিলেন, ''তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।''

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া শরৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু তখন এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি আলাপ-পরিচয় করিতে অগ্রসর হন নাই। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার এক বাল্যবন্ধুর স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। সত্যনির্ধারণের জন্য তিনি একদিন বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া এক কক্ষে বন্ধুর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক যুবক অতি পরিচিতের মতো সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক আপনমনে গুনগুন স্বরে একটি হিন্দি গান গাহিতে লাগিল। যুবকের ব্যবহারাদি শরতের মনঃপূত হয় নাই; আবার বন্ধু আসিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া যুবকটির সহিত আলোচনায় রত হইলে বিরক্তির কারণও ঘটিল। তবু তিনি ভদ্রতা হিসাবে বসিয়া আলোচনা শুনিতে শুনিতে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, এই যুবকের সঙ্গদোষেই বন্ধু বিপথে চলিয়াছে; কারণ এই শ্রেণীর অন্যান্য যুবকের ন্যায় এই ব্যক্তিরও কথা এবং কার্যের সামঞ্জস্য নাই—সে মুখে অতি উচ্চভাব প্রকাশ করিলেও, তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই উহার বিপরীত। মাস কয়েক পরে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা শ্রবণান্তে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া নির্বাক বিস্ময়ে দেখিলেন, ''এই তো সেই যুবক! অমূলক ভুল ভাঙ্গিবার পর নরেন্দ্রনাথ শরতের প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত হইলেন এবং

তাঁহাদের সৌহার্দ্য-স্থাপনে প্রয়াসী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় যত্ন সফল হইয়াছে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "গিন্নী জানে, কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।" উভয়ের প্রীতির বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্র একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তানপুরায় সুর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "তুই বাঁয়াটা নে।" শরৎ জানাইলেন, তিনি ঐ বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। "খুব সোজা" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মুখে বোল বলিতে বলিতে হাতে বাজাইয়া তাঁহাকে কয়েকটি ঠেকা শিখাইয়া দিলেন এবং তারপর গান ও বাদ্য চলিতে লাগিল। শুধু গান অবলম্বনেই যে উভয়ের মিলন হইত তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা এতই মগ্ন হইতেন যে, স্থানকাল ভুলিয়া যাইতেন। একবার এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত দুই বন্ধু পরস্পরকে তত্তৎ গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া উভয়গৃহের মধ্যবর্তী পথটুকু একাধিক বার অতিক্রম করিয়াছিলেন; স্বগৃহে পৌঁছিলেও আলোচনা শেষ হয় নাই দেখিয়া নরেন্দ্র শরৎকে লইয়া শরতের গৃহে চলিলেন, আবার অনুরূপভাবে শরৎও স্বগৃহ হইতে নরেন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্র-ভবনে চলিলেন—এইরূপ ক্রমাগত কয়েকবার যাতায়াতের পর সেই দিনের ব্যাপার শেষ হইয়াছিল। আর একদিনের একটি আশ্চর্য ঘটনা। তখন ১৮৮৪ অব্দের শীতকাল। শশী ও শরৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে নরেন্দ্রের গৃহে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এত মগ্ন হইলেন যে, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন তিন জনে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে গেলেন। সেখানেও নরেন্দ্রের সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী চলিতে লাগিল। হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। অগত্যা নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন। সেখানে গল্পের শেষ নাই। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া শরৎ স্থির করিলেন যে, নরেন্দ্রকে জলযোগ করাইয়া দেওয়া উচিত। অনুরোধক্রমে নরেন্দ্র গৃহাভ্যন্তরে চলিলেন; কিন্তু প্রবেশ করিতে না করিতে অকস্মাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ বাড়ি যে আমি পূর্বেই দেখেছি! এর কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, কোথায় কোন ঘর আছে, সে সবই যে আমার পরিচিত—কি আশ্চর্য!" জলযোগান্তে নরেন্দ্র স্বগৃহে ফিরিলেন। শরৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমে সিদ্ধ ব্যক্তি বা ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত এরূপ আলোচনার ফলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিলেন। শুধু তাহাই নহে; নরেন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়া ক্রমে শাস্ত্রোল্লিখিত রহস্যের দ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত করিল—তিনি ভক্তিতে আপ্লুত ও শ্রদ্ধায় নতশির হইলেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করার পর শরতের পিতা তাঁহাকে

মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর ডাক্তার ও উকিলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না—এই কথা ভাবিয়া শরৎ সন্দেহাকুল হইলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত বন্ধু নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায়ই অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথকে শুধু বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াই শরৎ ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ক্রমে তাঁহাকে নেতার আসনও প্রদান করিয়াছিলেন। এমনকি, অনেক বিষয়ে তিনি নরেন্দ্রের অনুকরণ করিতেন। স্বামীজীর নিকট সঙ্গীতশিক্ষার ফলে শরৎ তাঁহার গানের ঢং অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি উহা ভুলেন নাই।

ঠাকুরের কাশীপুরে আগমনের পর সেবকের অভাব হইতেছে দেখিয়া শরৎ ঐ কার্যে সানন্দে অগ্রসর হইলেন। প্রথমত তিনি সর্বদা থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু অবশেষে অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে দিবারাত্র কাশীপুরেই কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতার মনে ভয়সঞ্চার হইল; সুতরাং পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একদিন স্বনামধন্য পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত কাশীপুরে উপনীত হইলেন—মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, এমন পণ্ডিতের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের দৈন্য উন্মোচিত হইয়া পড়িলে বুদ্ধিমান পুত্র নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সলজ্জভাবে আপনা হইতেই গৃহে ফিরিবে। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত গোপনে শরতের পিতাকে জানাইলেন যে, পুত্রের ভাগ্যে এই প্রকার গুরুলাভ হওয়া অতি আনন্দের বিষয়। আর একদিন শরতের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন; "আপনি একটু বললেই ও বিয়ে করবে।" শরৎচন্দ্র শুনিয়াই বলিলেন, উনি বললেই আমি বিয়ে করব কি না! যা কর্তব্য মনে করেছি, উনি বললেও তার অন্যথা হবে না।" শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "শুনেছ ও কি বলে? আমি আর কি করব?"

ক্রমে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি আসিল। সেদিন কল্পতরু হইয়া ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে যাহা চাহিতেছে তাহাই অকাতরে দান করিতেছেন। উদ্যানপথে এই অলৌকিক লীলা চলিতেছে, এদিকে দ্বিতলে লাটু ও শরৎ অবকাশ বুঝিয়া ঠাকুরের শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানি সংস্কারে নিযুক্ত আছেন। তাহারা দ্বিতলের ছাদ হইতে ভক্তদের আনন্দধ্বনি শুনিলেন, মত্তপ্রায় তাহাদের আচরণও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেন কিন্তু অর্ধনিষ্পন্ন হাতের কাজ ফেলিয়া গেলে ঠাকুরের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া মনঃশক্তিপ্রভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার অদম্য বাসনা রোধ করিলেন। পরে শরৎকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে প্রকৃতিসুলভ সঙ্কোচবশত উত্তর দিতেন, "তখন যে ঠাকুরের বিছানা-পত্র

রোদে দিচ্ছিলাম—কখন তিনি উঠে আসবেন, তাড়াতাড়ি বিছানা করতে হবে।" প্রশ্নকর্তার ঔৎসুক্য ইহাতেও না থামিলে বলিতেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।" "আমাদেরই ছিলেন" বলিতে তাঁহার বদনখানি আবেগে আরক্তিম হইয়া উঠিত।

ঠাকুর কখনও কখনও স্বীয় সন্তানদিগকে ভিক্ষায় পাঠাইতেন। প্রথম ভিক্ষার দিনের কথা শরৎচন্দ্র সকৌতুকে এইভাবে বর্ণনা করিতেন, "আমি এক ছোট গ্রামের ভেতর গিয়ে 'নারায়ণ হরি' বলে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। ডাক শুনে একজন বয়স্কা রমণী বেরিয়ে এলেন। এমন সুস্থদেহ ভদ্রলোকের ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখে তিনি ঘৃণার সহিত বলে উঠলেন, 'এমন গতর রয়েছে, ভিক্ষা করে খাচ্ছ কেন? ট্রামের কণ্ডাক্টরি করিতে পার না?'—এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

ঠাকুরের মহাসমাধির পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অভিভাবকের আদেশে পুনর্বার অধ্যয়নে মন দিলেন। পিতা ভাবিলেন, এরূপে পুত্রের মন গৃহেই আবদ্ধ রাখিবেন। কিন্তু বরাহনগরে মঠ স্থাপনের পরে নরেন্দ্রাদি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গৃহে আসিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় ত্যাগবৈরাগ্যের কথা শুনাইতে এবং স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর তাঁহার সন্তানদের নিকট অনেক কিছু আশা করেন। পিতার শাসনে থাকিয়া শরৎ রুদ্ধদ্বার গৃহে অধ্যয়নে বসিতেন; কিন্তু নরেন্দ্রের করাঘাতে সে দ্বার উদ্ঘাটিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রের প্রেরণায় শরতের বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ হইলে পিতা প্রথমে অনুনয়বিনয় করিলেন; কিন্তু উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া দরজায় চাবি দিলেন। এইভাবে তাঁহাকে অধিক দিন কাটাইতে হয় নাই; কারণ একটি ছোট ভাই পিতার অজ্ঞাতসারে দ্বার খুলিয়া দিল এবং মুক্তি পাইয়াই তিনি পূর্ববৎ চলিতে লাগিলেন। অতঃপর যথাকালে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক সারদানন্দ নামে পরিচিত হইলে এবং গৃহের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পিতামাতা বুঝিলেন যে, আর পুত্রের উপর অভিমান করা বৃথা, বরং এক্ষণে তাঁহার ধর্মপথের সমস্ত কণ্টক দূর করার জন্য তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব তাঁহারা একদিন বরাহনগরে আগমনপূর্বক তাঁহাকে জানাইয়া গেলেন যে, আর তাঁহাদের মনে কোনও খেদ নাই; তাঁহারা তাঁহার নবজীবনে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই কামনা করেন।

বরাহনগরে স্বামী সারদানন্দ অপর তপস্বীদেরই ন্যায় সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। দিনে তিনি সকলের সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগ দিতেন; আর গভীর নিশীথে কোন দিন স্বামীজীর সহিত, কোন দিন বা একাকী কাশীপুর-শ্মশানে কিংবা দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটীতে ধ্যানজপে রত হইতেন। এইরূপে কত রাত্রি

যে তিনি অনিদ্রায় কাটাইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক দৈনন্দিন কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? একদিকে নিষ্ঠাপূর্বক গভীর ধ্যান এবং অপর দিকে আশ্রমের যাবতীয় কার্য যথাবিহিত সম্পাদন—ইহা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। আবার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অসুখ হইলে কোমলস্বভাব শরৎ মহারাজ সহানুভূতি ও সেবাপরায়ণতা লইয়া তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল। তিনি যখন গান গাহিতেন তখন দূর হইতে সহসা বামাকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। একদা রাত্রে তিনি বরাহনগর মঠে সুকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, এমন সময়ে পল্লির কেহ কেহ স্থির করিলেন যে, মঠে নিশ্চয়ই নারীর আগমন হইয়াছে। এহেন কঠিন সত্য আবিষ্কার করিয়া মঠের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে তাঁহারা সেদিকে অগ্রসর হইলেন ও বহির্দ্বার রুদ্ধ থাকায় উল্লম্ফনপূর্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। কিন্তু সঙ্গীতসভায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অবশেষে নিজেদের ত্রুটি স্বীকারপূর্বক তাঁহারা সাধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজের স্তোত্রাদি পাঠও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি যখন বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ সুকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃবৃন্দের মন স্বতই ভক্তিরসে আপ্লুত হইত।

অতঃপর তাঁহার অন্তরে তীর্থভ্রমণের আহ্বান ধ্বনিত হওয়ায় ১৮৮৭ অব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবান্তে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও অভেদানন্দের সহিত পদব্রজে নীলাচলে যান। সেখানে কয়েক মাস তপস্যা করিয়া তিনি বরাহনগরে ফিরিলেন এবং স্বল্প বিশ্রামান্তে উত্তর ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনান্তে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে সান্যাল মহাশয়ের সহিত হরিদ্বার হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র তপোভূমি হৃষীকেশে উপস্থিত হইলেন এবং অনুকূল স্থান পাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ইহারই এককালে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তিনি দুর্গম তীর্থ নীলকণ্ঠেশ্বর দেখিতে যান। ফিরিবার সময় অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন—কারণ জনমানবহীন শ্বাপদবহুল এই পার্বত্য অরণ্যে প্রতিপদে জীবনসংশয়। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন যে, একসঙ্গে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাওয়া অপেক্ষা প্রত্যেকে বিভিন্ন পথে যাইয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে চলিয়া তুরীয়ানন্দজী দৈবক্রমে এক নির্জন আশ্রমে স্থান পাইলেন। রাত্রে সারদানন্দের খোঁজ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রভাতে আশ্রয়দাতার সহিত তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া তিনি দেখেন, সারদানন্দজী দূরে এক অত্যুচ্চ

শিলাপৃষ্ঠে ধ্যানমগ্ন। ঐরূপ করার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত সেখানে ত্রস্ত না হয়ে ভগবানের নাম করতে করতে মরাই উচিত।"

পর বৎসর (১৮৯০) বৈশাখ মাসে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্যাল মহাশয় একত্রে ৺গঙ্গোত্রী এবং ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনে যাত্রা করিলেন। তখন পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সরকার বাহাদুর সদর রাস্তায় পাহারা বসাইয়া যাত্রীদিগকে ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন। সারদানন্দ প্রভৃতির কিন্তু তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল—নিঃস্ব, নিঃসহায় সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এইরূপ সুযোগ সর্বদা উপস্থিত হয় না। সুতরাং তাঁহারা সদর রাস্তা পরিত্যাগপূর্বক মুশুরি হইয়া নগ্নপদে বনপথে অগ্রসর হইলেন। তখনকার দিনে পদব্রজে হিমালয়ভ্রমণ অধিকতর কষ্টসাধ্য ছিল—সব সময়ে আহারাদিও পাওয়া যাইত না। বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্তহারী হইলেও শ্বাপদাধ্যুষিত ও বিপদসঙ্কুল জনবিরল পথে চলিতে অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসীরা প্রতিপদে বহু কষ্ট সহ্য করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গোত্রীতে উপনীত হইলেন এবং হিন্দুর এই বহুপ্রার্থিত দুর্গম তীর্থসলিলে অবগাহন ও মন্দিরে দেবীকে দর্শন করিয়া পথক্লেশ সার্থক মনে করিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে কেদার যাইবার উদ্দেশে তাঁহারা পুনর্বার বনপথে চলিয়া ভাটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে এক দুর্গম ও নির্জন পাকদণ্ডী ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। সে পথে প্রথম দিন ভিক্ষায় নির্গত হইয়া তাঁহারা রিক্তহস্তে ফিরিলেন; কারণ গ্রাম জনমানবশূন্য। দ্বিতীয় দিনও অপর এক গ্রামে ঐরূপ ঘটিল। তৃতীয় দিন আর একটি গ্রামে অকস্মাৎ এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বুঝাইয়া দিল যে, ঐ অঞ্চলে ভিক্ষা করিতে হয় সকালে কিংবা সন্ধ্যায়—দিনে গ্রামবাসীরা অন্যত্র কাজে চলিয়া যায়। এদিকে দুই-তিন দিনের অনাহারে সকলেই ক্লান্ত ও ক্ষুধিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ একপ্রকার ঘাস দেখিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উহাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহা উদরস্থ হইবামাত্র বমনের সহিত নির্গত হইয়া গেল। ইহার ফলে তিনি আরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে তখন একজন পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহার নির্দেশে চলিয়া এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে আহারসংগ্রহ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

এই ভ্রমণকালে শরৎ মহারাজ তাঁহার সৎসাহস ও পরদুঃখকাতরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। একদিন তিন জনে এক খাড়া পাহাড় হইতে নামিতেছেন—অপর দুই জন সম্মুখে এবং সারদানন্দ পশ্চাতে চলিয়াছেন। সকলের পশ্চাতে যে পাহাড়িরা চলিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার হস্তে যষ্টি না থাকায় তাহার

পক্ষে পর্বতাবতরণ বড়ই কষ্টসাধ্য হইতেছিল। স্বামী সারদানন্দ জানিতেন যে, এইরূপ পার্বত্য পথে যষ্টি একটি প্রধান অবলম্বন, তথাপি বৃদ্ধার অসহায় অবস্থা দেখিয়া তিনি নিজ যষ্টি তাহাকে দিয়া অম্লানবদনে শূন্যহস্তে চলিলেন। রিক্তহস্তে চলার ফল তিনি শীঘ্রই পাইলেন; কারণ অচিরে এক পার্বত্য নির্ঝরিণী অতিক্রমণকালে তাঁহার পদস্খলন হইল এবং তিনি অসহায়ভাবে জলমধ্যে পড়িয়া গেলেন। ঐ অবস্থা হইতে অপর সঙ্গীরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। পরবর্তী গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি এই ক্ষুধার সময় এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে পাই, তবে বুঝব ঠাকুর সত্যই আছেন।" তাঁহার মনে তাদৃশ ইচ্ছার উদয় হওয়ার অল্প পরেই এক ব্যক্তি একটি জলপূর্ণ ঘটি ও কিছু গরম হালুয়া ও পুরি লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সঙ্গীদিগকে বঞ্চিত করিয়া একা ঐ সকল গ্রহণ করা সারদানন্দের অভিপ্রেত না হইলেও সঙ্গীরা বহু দূরে চলিয়া যাওয়ায় ও দাতা আগ্রহ দেখাইতে থাকায় তাঁহাকে একাই খাইতে হইল।

ভাটোয়ারীর বনপথ-অতিক্রমান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ একাকী অন্যপথে চলিয়া গেলেন। স্বামী সারদানন্দ ও সান্যাল মহাশয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ৺কেদারনাথ দর্শন এবং পরে ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনান্তে জুলাই মাসে আলমোড়ায় আসিলেন। তথা হইতে তাঁহারা স্বামীজীর সহিত ৫ সেপ্টেম্বর হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং টিহিরী, দেরাদুন, হৃষীকেশ, কনখল ও মীরাট ঘুরিয়া দিল্লীতে পৌঁছিলেন। দিল্লীতে আসিয়া স্বামীজী নিঃসঙ্গভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার আমেরিকা গমনের পূর্বে সারদানন্দের সহিত এই শেষ দেখা ( ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১)।

দিল্লী পরিত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কাশীধামে আসিয়া ভেলুপুর অঞ্চলে বাবু সীতারামের উদ্যানবাটিতে আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরেই সেখান হইতে ৺দুর্গাবাড়ির নিকটে অন্নদা দত্তের বাগানে উঠিয়া গেলেন। তথায় ধর্মপিপাসু বৃদ্ধ দীনু মহারাজ তাঁহার দিব্যমাধুরীপূর্ণ ধ্যানগম্ভীর মূর্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। ক্রমে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসে স্বামী অভেদানন্দও তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই তখন ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ; আবার ভক্তির রীতিই এই যে, সে বিবিধ প্রকার প্রকাশের মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব শীঘ্রই তিন জনে পদব্রজে কাশীপরিক্রমায় নির্গত হইলেন। কিন্তু এই প্রকার পরিশ্রমে অনভ্যস্ত তাঁহারা সকলেই পরিক্রমার ফলে জ্বরে পড়িলেন। জ্বর হইতে আরোগ্যলাভের কিছুদিন পরেই স্বামী সারদানন্দের আমাশয় হইল। অগত্যা ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বরাহনগরে আরোগ্যলাভান্তে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও জগদ্ধাত্রীপূজা-অনুষ্ঠানার্থ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, হরমোহন, কালীকৃষ্ণ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত জয়রামবাটী গমন করেন (অক্টোবর, ১৮৯১)। সেখানে মানসিক আনন্দে থাকিলেও পূজার তিন দিন পরে স্বামী সারদানন্দের ম্যালেরিয়া হইল। মঠে ফিরিয়াও ঐ জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছিল। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া আসিলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে সাধনার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। সেখানে একটি মাটির মালসায় ভিক্ষালব্ধ আহার্য সিদ্ধ করিয়া তিনি দিনে একবার খাইতেন এবং পাত্রটি আবার গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিতেন। ইহার পরে তিনি তীর্থদর্শনে নির্গত হইয়া রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্রের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া ও কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে সাধনা করিয়া পুনঃ মঠে ফিরিয়া আসেন।

এদিকে বিদেশে প্রচারকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজীর আহ্বান আসিল এবং তদনুসারে স্বামী সারদানন্দ লণ্ডনে শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডির বাটিতে উপস্থিত হইলেন (১ এপ্রিল, ১৮৯৬)। ইহার অল্প পরেই স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পদার্পণ করিলে নূতন প্রচারকের সহিত তাঁহার মিলন হইল, এবং বিদেশে স্বামী সারদানন্দের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। বক্তৃতায় অনভ্যস্ত সারদানন্দকে স্বামীজী সযত্নে শিক্ষা দিয়া সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সারদানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "কথা বলতে গেলেই আমার হাত-পা ছোঁড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামীজী হাতে একটি ছড়ি নিয়ে বসতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিতে আদেশ করতেন। হাত-পা নাড়লেই স্বামীজীর বেত এসে হাতের উপর আঘাত করে আমাকে সজাগ করে দিত।" কিন্তু এত করিয়াও সভায় বক্তৃতাদানের কথা উঠিলেই সারদানন্দ 'আজ না', 'আজ না' বলিয়া পাশ কাটাইতেন। স্বামীজী প্রথমে ভর্ৎসনাদি করিলেন—বলিলেন, "তবে এসেছিলি কেন? যা ফিরে যা।" কিন্তু ইহাতেও ব্যর্থকাম হইয়া তিনি নিজের নামে আহূত বক্তৃতাসভায় ঘোষণা করিলেন যে, সেদিন বক্তৃতা দিবেন স্বামী সারদানন্দ। অগত্যা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইল এবং উহা বেশ মনোরমই হইল। অতঃপর লণ্ডনে আরও কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানান্তে জুন মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহাকে গুডউইনের সহিত বেদান্ত প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে পাঠাইলেন।

আমেরিকায় তাঁহার কার্য অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি তাঁহার গুণগ্রাহীদের নিমন্ত্রণক্রমে সদালাপ ও বক্তৃতাদির জন্য নিউইয়র্কের বাহিরেও যাইতে লাগিলেন। একসময়ে তিনি নিউইয়র্কের অদূরবর্তী মণ্ট্-ক্লেয়ার নামক স্থানে মিসেস হুইলারের গৃহে ছিলেন। ঐ মহিলাটি এক রাত্রে স্বপ্নে এক শান্ত সৌম্য প্রাচ্য মহাপুরুষের

সাক্ষাৎ পান এবং সে মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে থাকে। একদিন স্বামী সারদানন্দের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখার কালে অতর্কিতে একখানি পুস্তক পড়িয়া গেলে উহার মধ্য হইতে যে চিত্রখানি বাহির হইল, মহিলাটি সবিস্ময়ে দেখিলেন ইনি সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা। পরে স্বামী সারদানন্দের নিকট জানিলেন যে, ইনিই লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তদবধি শ্রীযুক্তা হুইলার শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত ভক্ত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রচারে সুনাম ও সাফল্য অর্জন করিলেও অধিক দিন আমেরিকায় থাকেন নাই। স্বামীজী প্রথমবারে ভারতে ফিরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনান্তে কার্যপরিচালনের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি 'টিউটনিক' নামক জাহাজে আমেরিকা ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে চলিলেন শ্রীযুক্তা ওলি বুল ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড। পথে তাঁহারা ইউরোপে অবতরণপূর্বক লণ্ডন, প্যারিস ও রোম প্রভৃতি দর্শনান্তে ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পৌঁছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকালে তিনি দ্বিতীয়বার রোমে সেন্ট-পিটারের গির্জা দর্শন করিলেন। কথিত আছে যে, লণ্ডনে যাইবার পথে প্রথম বারে এই গির্জায় গিয়া তিনি সেন্ট-পিটারের মূর্তির সম্মুখে সমাধিস্থ হন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "শশী আর শরৎকে দেখছিলাম ঋষি কৃষ্ণের দলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যিশুখৃস্টকে ঋষি কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের উক্ত সমাধি কি ঐ মহাবাণীরই প্রমাণ?

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশাগত শরৎ মহারাজকে স্বামীজী মিশনের সেক্রেটারিপদে নিযুক্ত করিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর সারদানন্দজী ধারাবাহিকরূপে এলবার্ট হলে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন; ঐগুলি সবিশেষ চিত্তগ্রাহী হওয়ায় পরে 'গীতাতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রচার ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণাদির ফলে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কার্যবৃদ্ধি ও দায়িত্ববৃদ্ধি সমভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু অনুপম কর্মযোগী স্বামী সারদানন্দ অম্লানবদনে ও অক্লান্তভাবেই আপন কর্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন; শুধু দেখা গেল যে, তাঁহার স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতা, উদ্বেগশূন্য গাম্ভীর্য, দুর্লভ তিতিক্ষা এবং অতুলনীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রতি পরীক্ষার পরে প্রবলতর হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে সাফল্যের অত্যুচ্চ শিখরে লইয়া যাইতে লাগিল।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, মঠ ও মিশনের এই প্রথমাবস্থায় সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবাহিত হইত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমাহিত চিত্তে

সংস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী হইতে। সেই ভাবসমষ্টিকে মঠ ও মিশনের বিশাল ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রণালীতে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহার গুরুভ্রাতারা। ইঁহাদের মধ্যে আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রধানত সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টি থাকিত সেই ভাবরাশিকে নির্দিষ্ট কার্যধারায় পরিচালনের প্রতি। কিন্তু এই বিভাগটি ইঁহাদের চরিত্রের সহিত পরিচয়লাভের পক্ষে যতই মূল্যবান হউক না কেন, কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গি-সাহায্যে আমরা তাঁহাদের চরিত্রবিশ্লেষণে অগ্রসর হইলে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইব এবং অপরের প্রতিও অন্যায় করিব; কারণ একদিকে যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক ক্ষেত্রে নবীন প্রতিষ্ঠানগঠনে বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সুনিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত থাকিতেন, অপরদিকে তেমনি স্বামী সারদানন্দও সঙ্ঘজীবনকে সুপবিত্র ও ভগবদুন্মুখ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাতেই স্বামীজীর অবদান বড় সামান্য ছিল না। স্বামীজী শুধু ভাবুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। এতদ্ব্যতীত স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিবিধরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে রূপায়িত করিয়া এই বিরাট সঙ্ঘকে পবিত্র, পূর্ণাবয়ব, শক্তিশালী, সুন্দর ও গৌরবময় করিতেছিলেন। ফলত বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁহার অবদান যেরূপই হউক না কেন, আমাদিগকে এই সংহত অন্তর্দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের জীবনী আলোচনা করিতে হইবে।

যাহা হউক, আমরা স্বামী সারদানন্দের জীবনই অনুসরণ করি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি অবিলম্বে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে তিনি এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় পতিত হন। অশ্বযানে যাইতেছিলেন—চালক উন্মত্তপ্রায়, অশ্ব বেগে চলিতেছে, আর কোচোয়ান আপন মনে বলিয়া যাইতেছে, "আজ যদি আল্লা বাঁচায় দেখব!" অকস্মাৎ মোড় ফিরিবার সময় বিপরীত দিক হইতে আর একখানি গাড়ি আসিয়া পড়ায় শরৎ মহারাজের গাড়ি পাশ কাটাইতে গিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া ক্রমে নিচের দিকে গড়াইয়া চলিল। এদিকে আবার একটি বড় পাথরে ধাক্কা লাগায় উহাও গাড়ির পশ্চাতে আসিতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ দেখিলেন, এভাবে নামিতে থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য। তথাপি তিনি উদ্বেগশূন্য হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং ভাবিলেন সম্মুখের বৃক্ষটির নিকটে পৌঁছিলেই উহার শাখা ধরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। ভাগ্যক্রমে ঘোড়াটি আড়াআড়ি ভাবে গাছে ঠেকিয়া থামিয়া গেল এবং তিনি পুর্বসিদ্ধান্তানুযায়ী লাফাইয়া পড়িলেন। ইহাতে পায়ে একটু আঘাত লাগা ভিন্ন তিনি অক্ষতই রহিলেন; ঘোড়াটির উপরে কিন্তু পূর্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড আসিয়া পড়ায় সে প্রাণত্যাগ করিল। এই অজ্ঞাত স্থান হইতে আত্মরক্ষা করা ও কোচোয়ানের

সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনাই হইল তখন তাঁহার প্রধান চিন্তা। যাহা হউক, কোচোয়ান প্রকৃতিস্থ হইয়া নিকটবর্তী গ্রামে গেল এবং সেখান হইতে, গন্তব্য স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আর একবার ইংলণ্ড যাইবার পথে তিনি ভূমধ্যসাগরে তুল্যরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত উত্থিত হইয়া সমুদ্রবক্ষ চঞ্চল করিয়া তুলিলে সহযাত্রীরা প্রাণভয়ে হতাশভাবে ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চলতার মধ্যে কিন্তু তিনি দ্রষ্টা হিসাবে অচঞ্চল রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, সে নিশ্চেষ্টতা তখন সচেষ্ট অনেকেরই মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল—যদিও কেহ তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে নাই। অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে কিন্তু সহযাত্রী ঐ প্রকার নীরব থাকিতে পারেন নাই। সেই বারে মহারাজের একটি ফোড়াতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ ডাক্তার কাঞ্জিলালের সহিত বাগবাজার হইতে নৌকাযোগে বেলুড়ে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠিয়া নৌকা মগ্নপ্রায় হইল। সারদানন্দজী তখন তামাক খাইতেছিলেন; ঝড়ের সময়ও নিশ্চিন্তে তাহাই করিতেছেন দেখিয়া সহযাত্রী কাঞ্জিলাল আর সহ্য করিতে পারিলেন না, মহাক্রোধে ছিলিমটা তুলিয়া লইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি দেখছি মজার লোক। নৌকা ডুবছে, আর আপনি বসে তামাক খাচ্ছেন।" শরৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন, "তামাক খাব না তো নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি?" ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেই নৌকা আসিয়া বেলুড়মঠের ঘাটে থামিল।

শ্রীনগরে স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে লাহোরে আনিয়া স্বামী সদানন্দের উপর সেবাভার অর্পণ করিলেন। তারপর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার সহগামী পাশ্চাত্য ভক্তদিগকে তীর্থাদি দর্শন করাইবার দায়িত্ব লইয়া সদলবলে উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং পরে কাশীধামে আগমনপূর্বক ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে (নীলাম্বরবাবুর উদ্যানবাটিতে) ফিরিলেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই উপলক্ষে সারদানন্দজী কানপুর, আগ্রা, জয়পুর, আহম্মদাবাদ, লিমডি, জুনাগড়, ভাবনগর প্রভৃতি শহরে যান এবং স্থানে স্থানে ইংরেজি এবং হিন্দিতে বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, স্বামীজী পুনর্বার আমেরিকায় যাইবেন বলিয়া তাঁহাদের মঠে প্রত্যাবর্তন আবশ্যক। তদনুসারে তাঁহারা ৩ মে মঠে উপস্থিত হইলেন।

মঠে আগমনের পর স্বামীজীর সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশ যাত্রা করিলেন, এবং স্বামী সারদানন্দ নবাগত সাধুদের শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। তাঁহারা যাহাতে নিয়মিত সাধনভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করে তৎপ্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে, সাধুদিগকে পর্যায়ক্রমে ঠাকুরঘরে সারারাত্রি জপধ্যান চালাইতে হইবে। নিজেও প্রায়ই উদয়াস্ত জপধ্যান করিয়া সকলের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনায়ও তিনি সাধুদের সহিত বহু সময় কাটাইতেন। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বক্তৃতা, বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে উপদেশপ্রদান, পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ এবং মঠ-মিশনের পত্রাদি লিখাতেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এই বৎসরের মধ্যভাগে রাজপুতানার কিষণগড়ে করাল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহার নেতৃত্বে মিশন হইতে সাহায্যব্যবস্থা করা হয়। ঐ কর্মের প্রাথমিক ব্যয়নির্বাহের জন্য হস্তে অর্থ না থাকায় তিনি ঋণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

ইত্যবকাশে পূর্ববঙ্গ হইতে পুনঃপুনঃ আহ্বান আসিতে থাকায় তিনি ডিসেম্বর মাসে ঐ অঞ্চলে গমনপূর্বক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি করেন। বরিশালে তিনি আট দিন ছিলেন। অশ্বিনীবাবুর বাটির নিকটে একখানি নূতন গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ ঐ বাটিতে বিশ্রামাদি এবং অশ্বিনীবাবুর গৃহে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলীর সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। বরিশালে তিনি তিনটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন—একটি ইংরেজিতে এবং অপর দুইটি বঙ্গভাষায়। দুইটি প্রশ্নোত্তর-সভাও হয়। শেষ দিবস অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন এবং অনেকক্ষণ নিঃস্পন্দভাবে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সাধারণভূমিতে নামিয়া আসেন।

প্রচারকার্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তান্ত্রিক সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ও তাঁহার পিতৃব্য সিদ্ধ কৌল ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া ১৯০০ (খ্রিঃ) ২০ নভেম্বর (৫ অগ্রহায়ণ) চতুর্দশী রাত্রিতে পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন। শ্রদ্ধেয়া যোগীন-মারও ঐ রাত্রে পূর্ণাভিষেক হইল। তন্ত্র-সাধনায় রত হইয়া স্বামী সারদানন্দ অচিরেই শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নারীমাত্রে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বরচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে শক্তিপূজার রহস্যোদ্ঘাটন-প্রসঙ্গে নিজ অনুভূতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সিদ্ধির অতি উচ্চ স্তরে আরোহণান্তেই ঐ পুস্তক প্রণয়নে

অগ্রসর হইয়াছিলেন। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।"

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকা হইতে ফিরিলেন, তখন তিনি অসুস্থ; অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যাহাতে দেশ অচিরে গ্রহণ করে তজ্জন্য তাঁহার আগ্রহ বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের অক্ষমতায় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই সব মুহূর্তে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস না পাইলেও কার্যব্যপদেশে সারদানন্দকে যাইতেই হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামীজীর আশীর্বাদ বা ভর্ৎসনায় বিচলিত না হইয়া তিনি নির্বিকারভাবে স্বকার্যসাধনে নিরত থাকিতেন। স্বামীজী একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দকে কার্যোপলক্ষে কলকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মঠে প্রত্যাবর্তনান্তে স্বামী সারদানন্দ যখন স্বামীজীকে জানাইলেন যে, কার্যসম্পাদন হয় নাই, তখন স্বামীজী মনে করিলেন যে, তন্নির্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করায়ই ঐরূপ হইয়াছে; অতএব বিরক্তিসহকারে স্বীয় অনুপম ভাষায় বলিলেন, "ঐ তো এক ছটাক বুদ্ধি—রেখে দে, সুদে-আসলে বাড়ুক, এর পরে কাজে লাগবে।" এমন সময় সেবক আসিয়া উভয়কে চা দিয়া গেলে সারদানন্দ নির্বিবাদে বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাইতে বসিলেন—যেন কিছুই হয় নাই। তখন স্বামীজী যেন হতাশ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এর যেন বেলে মাছের রক্ত; কিছুতেই তাতে না।" তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ মর্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে সারদানন্দ অন্তত প্রতিবাদ জানাইবেন।

আত্মস্থ এই পুরুষের আত্মসংবরণের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। একদিন ঠাকুরঘরে পাচকের কর্দমাক্ত পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় ডাকিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষণিক ক্রোধ অচিরে তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় পাচককে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "না, কিছু নয়, তুমি যেতে পার।" তিনি স্বীয় দৃষ্টি মানুষের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত পূর্ণতার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়া সাময়িক অপূর্ণতার প্রকাশে সহজে ধৈর্য হারাইতেন না। এইজন্য অন্যত্র যাহারা আশ্রয় পাইত না তাহারাও সাদরে ও সসম্মানে তাঁহার নিকট থাকিতে পারিত। শাসন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি বাপু স্কুলমাস্টারের মতো বেত হাতে করে কে কি করছে দেখে বেড়াতে পারব না। কি ভাল কি মন্দ—এ জানবার মতো বয়স তোমাদের সকলেরই হয়েছে।"

শরৎ মহারাজের ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ হইল স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে।

তখনও প্রাথমিক গঠনকার্য চলিতেছে; অতএব অনেকগুলি শিশুপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন মিশনের বাহিরে কাজ চালাইয়া নিজ সাফল্য দেখাইতে পারিলে মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইত। স্বামী সারদানন্দ ইহাদের মূল্য স্বীকারপূর্বক বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন। এই হিসাবে ১৯০২ (খ্রিঃ) ২০ আগস্ট তিনি কলকাতায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরোহিত্য করেন। পরবর্তী বৎসর জানুয়ারি মাসে বাগবাজারে বিবেকানন্দ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার সভাপতি হন। ঐ বৎসরই ১৮ জুন তারিখে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে এক বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া তাঁহার দায়িত্বে একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়—উহার নাম হয় 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির' এবং সারদানন্দজী উহার সভাপতি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর পরে বাটির স্বত্বাধিকারী ছাত্রাবাসটি তথায় রাখিতে অসম্মত হওয়ায় এবং অপর কোনও উপযুক্ত গৃহ সুলভ না হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার আনুকূল্যে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী ও সিস্টার ক্রিস্টীন বোসপাড়ায় একটি মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবৎসর তাঁহার সম্মতিক্রমে বৌবাজারে 'রামকৃষ্ণ-সমিতি অনাথ-ভাণ্ডার' স্থাপিত হয়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গেলে 'উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থাদি লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। অবশেষে কর্তব্যনির্ধারণের জন্য স্বামী সারদানন্দের সভাপতিত্বে পত্রের হিতৈষীরা মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্তত এক বৎসর উহা চালানো হইবে। তদবধি ১৯০৬ অব্দে গিরীন্দ্রলাল বসাক মহাশয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারই ছাপাখানা হইতে উহা প্রকাশিত হইতে থাকে। অনন্তর ৩০নং বোসপাড়া লেনে 'উদ্বোধন' অফিস স্থানান্তরিত হয়; কিন্তু গৃহস্বামী শীঘ্রই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলিলে সারদানন্দজী স্থায়ী বাটির কথা ভাবিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলকাতায় আসিলে থাকার সুব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ছিল—তাঁহারও বাসস্থানের প্রয়োজন। এই সঙ্কটকালে শ্রীযুক্ত কেদারচন্দ্র দাস মহাশয় গোপাল নিয়োগী লেনে একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। স্বামীজীর গ্রন্থবিক্রয় করিয়া স্বামী সারদানন্দের হাতে ২৭০০ জমিয়াছিল; তদ্দ্বারাই গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইল। স্বল্প অর্থ নিঃশেষিত হইতে কতক্ষণ লাগে? তখন বীরভক্ত সারদানন্দজী অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও নিজ দায়িত্বে ঋণ করিয়া বাটির কার্য চালাইতে লাগিলেন। যথাকালে গৃহ সমাপ্ত হইলে উহার এক তলা 'উদ্বোধন'-এর জন্য এবং দোতলা শ্রীশ্রীমায়ের আবাসস্থল ও ঠাকুরঘররূপে নির্দিষ্ট হইল।

ইহার পরে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে মামাদের বিষয়বণ্টনে মধ্যস্থতার জন্য তাঁহাকে

১৯০৯ খ্রিঃ ২৩ মার্চ জয়রামবাটী যাইতে হইল। প্রত্যাগমনকালে তিনি মাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়া ২৩ মে নূতন বাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সেবাধিকার পাইয়া যথাসাধ্য কর্তব্যপালনে অগ্রসর হন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মা একদা বলেন, "শরৎ যে কয়দিন আছে সে কয়দিন আমার ওখানে (অর্থাৎ কলকাতায়) থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না।...শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" অন্য আর একবার শ্রীশ্রীমাকে পিতৃগৃহ হইতে কলকাতায় লইয়া যাইবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে কি কেউ নিয়ে যেতে পারে বাবা? নিয়ে যায় তো এক শরৎ। আমার ভার শরৎই নিতে পারে, আর কেউ পারে না।" বস্তুত 'উদ্বোধন'-বাটি শ্রীশ্রীসারদানন্দের মাতৃভক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

নূতন বাটিতে মায়ের অধিষ্ঠানান্তে স্বামী সারদানন্দ আপনাকে মায়ের সেবক ও দ্বাররক্ষকবোধে গর্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার এই স্বেচ্ছায় গৃহীত দারোয়ানের কার্য সব সময়ে সুখকর ছিল না। একদিন বরিশালের ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় মাতৃদর্শনমানসে হ্যারিসন রোড হইতে পদব্রজে ঘর্মাক্তকলেবরে দুই-তিনটার সময় যখন 'উদ্বোধনে' উপনীত হইলেন, তাহার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্বে মাতাঠাকুরানী বাহির হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম লইতেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "এখন মার কাছে যেতে দেব না; তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।" ভক্তটি ঝোঁকের মাথায় তাঁহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মা কি কেবল একা আপনার?" কিন্তু উপরে যাইয়া কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফিরিবার সময়ে দেখা না হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অবতরণকালে দেখিলেন, সারদানন্দ ঠিক একই স্থানে একই ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। সুরেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অপরাধ আবার কি ? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়?"

সর্বংসহ সারদানন্দ সবই সহ্য করিলেও তাঁহার দুঃখের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর তাঁহার পিতৃদেব বারাণসীধামে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করায় তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং শোকসন্তপ্তা জননী প্রভৃতিকে কলকাতায় লইয়া আসেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র ২৬ নভেম্বর স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৭ অব্দের ২৬ মে তাঁহার গর্ভধারিণী শ্রীযুক্তা নীলমণিদেবীও পরলোকগমন করেন।

নূতন বাটিতে পদার্পণ করিয়া মাতাঠাকুরানী একান্ত শরণাগত সারদানন্দকে উৎফুল্লহৃদয়ে অজস্র আশীর্বাদ করিলেন। এই বাটিতে মায়ের আদেশে সন্ধ্যারতির পরে তিনি প্রায়ই ভজনগান গাহিতেন। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষাও করিত। এইরূপে দিনগুলি আনন্দে কাটিতে থাকিলেও তাঁহার মনে একটি উদ্বেগ প্রবলতর হইতে লাগিল—বাটিনির্মাণে ঋণ হইয়াছে, উহা পরিশোধ করিবেন কিরূপে? অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য এই অমূল্য গ্রন্থরচনার অন্য কারণও তিনি নির্দেশ করিতেন। ঐ সময়ে মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিতেন, "ওরা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্যপথে চলেছে!" ইহার প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু ঐ সময়ে 'উদ্বোধনে'-র জন্য যে সকল প্রবন্ধ আসিত উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে এত ভ্রম-প্রমাদ থাকিত যে, একখানি প্রামাণিক গ্রন্থরচনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ যাহাই হউক, স্বামী সারদানন্দের এই অমূল্য অবদান বাঙালার ধর্ম ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-অনুধ্যানের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাঁহার নিপুণ লেখনীতে পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানিকে ধর্মজীবনের পঞ্চামৃততুল্য করিয়াছে—এই পীযূষপানে বহু পাঠক অমরত্বলাভ করিয়াছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' কিরূপ পরিবেশের মধ্যে রচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন, "যখন 'লীলাপ্রসঙ্গ' লেখা হয়, কত দিকে গণ্ডগোল ছিল—মা উপরে রয়েছেন, রাধু রয়েছে, ভক্তের ভিড়, হিসারপত্র রাখা, আবার বাড়ি তৈরি করায় অনেক টাকা ধার হয়েছে। নিচের ছোট ঘরটিতে 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখছি—তখন আমার সঙ্গে কেউ কথা কইতে সাহস পেত না, সকলেই ভয় করত। আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার সময়ই ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে, 'চট পট সেরে নাও' বলে সংক্ষেপে শেষ করতাম। লোকে মনে করত ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী।" দুঃখের বিষয়, এই অনুপম পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ। তাঁহাকে উহা সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর দিতেন, "ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো হবে।" তিনি এই কথাই সর্বদা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় উহা রচনা করেন নাই—রচনাকালে সর্বতোভাবে ঠাকুরের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; ঠাকুর আপন যন্ত্রকে যেরূপ চালাইয়াছেন, যন্ত্র সেইরূপই করিয়াছে মাত্র। তাঁহার কর্মপ্রেরণার দ্বিতীয় উৎস ছিলেন মাতাঠাকুরানী। মায়ের লীলাসংবরণের পরে তাঁহার কর্মশক্তি সহসা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং গ্রন্থ লিখিবে কে? কিন্তু উহা পরের ঘটনা। আপাতত আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনার তৎকালীন পরিবেশের কথাই আলোচনা করিতেছি।

কর্মে অকর্ম-দর্শনে সিদ্ধকাম শরৎ মহারাজের মন এরূপ উপাদানে নির্মিত ছিল যে, জনকোলাহলের মধ্যেও উহা শান্তভাবে স্বকার্যসাধন করিত। একদিন 'উদ্বোধনে'-র অফিসঘরে জনকয়েক যুবক যৌবনসুলভ উচ্চৈঃস্বরে হাস্যকৌতুক করিতেছে, এমন সময়ে গোলাপ-মা কার্যোপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন, "তোমাদের ধন্যি আক্কেল! উপরে মা রয়েছেন, নিচে শরৎ রয়েছে—আর তোমরা এমন হৈ চৈ করছ?" গোলাপ-মার স্বরও তখন একটু অস্বাভাবিক উচ্চ পর্দায়ই উঠিয়াছিল। উহা শরৎ মহারাজের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "তুমিও বেশ তো, গোলাপ-মা! ছেলেরা অমন হৈ চৈ করে, তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি; আমি কিছুতে কান দিই না কিছু শুনতেও পাই না। কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি 'তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কিছু শুনিস না।' কান তো কই কিছুই শোনে না!" এই অনাসক্তির ভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল বলিয়াই সেরূপ অবস্থায় 'লীলাপ্রসঙ্গের' ন্যায় তথ্যবহুল ও ভাবগম্ভীর গ্রন্থরচনা সম্ভব হইয়াছিল।

এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষপ্রবরের অন্যান্য গুণাবলীও তাঁহার সমস্ত কর্মকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী অতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি নিয়ত প্রাতঃস্নান-সমাপনান্তে ভিজা কাপড়-গামছা রৌদ্রে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ও শ্রীশ্রীমায়ের পদবন্দনা করিয়া নিচে নামিতেন। অনন্তর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখিয়া যাইতেন। ইত্যবকাশে সকলের সহিত চা পান করিতেন এবং কখনো কখনো ধূমপানও করিতেন। এই কর্মব্যস্ততার জন্য কোনদিনই তাঁহার দেড়টার আগে খাওয়া হইত না। আহারান্তে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পর আবার লেখা আরম্ভ হইত এবং সন্ধ্যার সময় তিনি দপ্তর গুটাইতেন। ইহার পর ভক্তসমাগম হইত। প্রয়োজন হইলে তিনি বেলুড় মঠে যাইতেন এবং দুই-এক দিন সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এতদ্ব্যতীত উৎসবাদিতে অবশ্যই যাইতেন।

তাঁহার কর্মজীবনের সাফল্যের একটি কারণ ছিল নিরভিমান এবং স্বীয় পদগৌরবের দ্বারা অপরের মনুষ্যত্বকে অবমানিত না করা। ১৯১৮ অব্দে স্বামী উমানন্দ পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন। ঘটনাক্রমে ঐ লিপিখানি অপঠিত অবস্থায় পুরাতন চিঠির সহিত মিশিয়া যায় এবং স্বামী সারদানন্দের ধারণা জন্মে যে, উমানন্দ না জানাইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। তাই কর্তব্যানুরোধে সেদিন তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু পরে যখন উক্ত লিপি হস্তগত হইল তখন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জানাইলেন যে, তিনি সম্পাদকের কার্যের অনুপযুক্ত এবং ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শিষ্যস্থানীয় উমানন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

কর্মীদিগকে স্বাধীনতাদান, তাহাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস ও তাহাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়াই কার্যসাফল্যের রহস্য। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাই তিনি জনৈক কর্মাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখনো তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।" আর একবার তিনি লিখিয়াছিলেন, "ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ত্রুটিতে অসহনীয়তা, মনমুখ এক রাখিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে বশে রাখিবার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।" এই সব কথা সারদানন্দ শুধু উপদেশচ্ছলে বলিয়াই বিরত হইতেন না—স্বীয় জীবনে কার্যত ইহার প্রমাণ দিতেন। ১৯২০ অব্দে শেষ অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা 'উদ্বোধনে' আছেন। পরিচিত ও অপরিচিত ভক্ত-সমাগমে মায়ের প্রায়ই অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সারদানন্দজী ব্যবস্থা করিলেন যে, বিশেষ বিচারপূর্বক দর্শনের অনুমতি দেওয়া হইবে। একদিন জনৈকা অপরিচিতা মহিলার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি একজন সেবকের সহিত তাহাকে উপরে যাইতে বলিলেন। উক্ত সেবক অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং না যাইয়া নবাগত এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। স্বামী সারদানন্দ ইহা শুনিয়া প্রাগুক্ত সেবককেই পুনর্বার আদেশ করিলেন; তথাপি সেবক গোপনে ঐ ব্রহ্মচারীকেই পাঠাইলেন; অল্প পরেই যোগীন-মা উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "এ কাকে উপরে পাঠালে?" সকলে গিয়া দেখেন, সেই মহিলাটি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। তখনই তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং শরৎ মহারাজ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী সেবককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবাধ্য হইলে তাহার বেলুড় মঠে চলিয়া যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যুত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মায়ের সেবার কর্তব্যানুরোধেই সেখানে আছেন, নতুবা তখনই চলিয়া যাইতেন। শিষ্যস্থানীয়ের এতাদৃশ রূঢ় বাক্যে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও সন্ন্যাসীর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াই স্বামী সারদানন্দ শান্তভাবে বলিলেন, "ঐ জন্যই তো সকলে এখানে আছে, আর ঐ জন্যই একটু-আধটু বলাবলি।"

তাঁহার দৃষ্টিতে কাহারও মতামত অবজ্ঞার বস্তু ছিল না। একদিন তিনি যখন বয়স্ক একজন সাধুর সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তথায় উপস্থিত জনৈক যুবক সাধু নিজের অজ্ঞাতসারেই সহসা কথায় যোগ দিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে শরৎ মহারাজ তাহার দিকে ফিরিয়া উৎসাহদানপূর্বক তাহার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া লইলেন। কার্যে উৎসাহ দিবার ধারাও ছিল তাঁহার অপরূপ। পূর্বোক্ত

যুবককে তিনি একদা অন্যত্র ধর্মোপদেশকরূপে যাইতে আদেশ করেন। যুবক তাহাতে বলে যে, তাহার মতো অল্পজ্ঞান ও অল্পবয়স্ক সাধুর পক্ষে উপদেষ্টা হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামী সারদানন্দ ইহার উত্তরে বলেন যে, নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে এই সচেতন ভাবই তাহার সাফল্যের কারণ হইবে—এই দৈন্যের ফলে সে অধিক শিক্ষা এবং শ্রীভগবানের অধিক কৃপালাভ করিতে যত্নপর হইবে। তাঁহার অপরকে স্বমতে আনিবার কৌশলও লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। এক সময়ে পূর্ববঙ্গে সেবাকার্যের জন্য মঠের সাধুদিগকে প্রেরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখন বেলুড় মঠে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সবেমাত্র পাঠাদি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা বাবুরাম মহারাজের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন। গুরুভ্রাতার এই যুক্তিসম্মত বাধার প্রতিকারকল্পে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া বাবুরাম মহারাজের সহিত বন্ধুভাবে আলাপে অগ্রসর হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তিনি গুরুভ্রাতার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত; কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে হৃদয় বিদারিত হয়। অমনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তিনি স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত। তাঁহাকে কিন্তু যাইতে হইল না—তাঁহার আহ্বান ও উৎসাহে বহু সেবক তখনই পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন।

নিঃসম্বল সন্ন্যাসী সারদানন্দ প্রায় সমস্ত জীবনই অভাবের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন। অর্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার এমন বৈরাগ্য ছিল যে, স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে লব্ধ কিছুই তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না। একসময়ে তাঁহাকে বাতব্যাধিতে ভুগিতে দেখিয়া 'উদ্বোধনের' ম্যানেজার এক জোড়া মূল্যবান পাদুকা অর্পণ করেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অত টাকা শোধ করতে পারব না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" অতঃপর ম্যানেজার যখন জানাইলেন যে, তিনি উহা ক্রমে শোধ করিতে পারেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে টাকা শোধ করিয়া দিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর ভক্তসমাগম ও দীক্ষাদির ফলে যখন অর্থাদির কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইয়াছিল, সে সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জীবন এইরূপ কঠোরতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি কারণও তাঁহাকে তাঁহাদেরই মতন চলিতে বাধ্য করিত। এক সময়ে তিনি সদলবলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া পুরী যাইতেছিলেন। ঐ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী একজন অনুরাগী শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একখানি উচ্চশ্রেণীর টিকেট কিনিতে চাহিলে সারদানন্দ মহারাজ ভদ্রভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি নিজের স্থান ছাড়িয়া দিতে চাহিলে শরৎ মহারাজ বিরক্তিসহকারে জানাইলেন যে, সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া তিনি যাইতে অপারগ। ফলত তিনি শেষ পর্যন্ত তৃতীয়

শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিলেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "শিরদার তো সরদার।" সারদানন্দ 'শির' দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই 'সরদার' হইয়াছিলেন। একদা কাশী সেবাশ্রমের কোন সেবক জানাইলেন যে, তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গরিবদের মধ্যে তণ্ডুল বিতরণে অপারগ। অমনি সারদানন্দ অম্লানবদনে ঝুলি লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। সে অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার সম্মুখে ক্ষুদ্র চিত্তের অভিমান পরাজয় স্বীকার করিল।

স্বামী সারদানন্দের সৎসাহস ও আশ্রিতবাৎসল্যও অপূর্ব। ১৯০৯ অব্দে শ্রীযুক্ত দেবব্রত বসু ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে সাধু হইবার জন্য আসিলেন। দুইজনেই মানিকতলার বোমার মামলার আসামী। এই বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় দিলে ইংরেজ সরকারের কোপ অনিবার্য; আবার পূর্বানুসৃত পন্থা সরলভাবে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ সাধুজীবন যাপন করিতে চাহে, তবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানের ফলে বিবেকের দংশন অবশ্যম্ভাবী। এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া তাঁহার কর্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং একদিকে পুলিসের কর্মচারী এবং অপরদিকে মঠের প্রাচীন সাধুবৃন্দকে তাঁহার সদুদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া যুবকদ্বয়ের ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার কণ্টক দূর করিলেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের আরম্ভে শ্রীযুক্তা যোগীন-মার কন্যার মৃত্যু হইলে মাতৃহীন পুত্র তিনটির পাঠের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাহাদিগকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রাখিলেন এবং সর্ববিধ দায়িত্ব নিজ হস্তে লইলেন। এই গুরুভার তিনি সানন্দে দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন। ছেলেরা রাত্রে তাঁহারই কক্ষে শয়ন করিত। তাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হইত না বলিয়া শয়নগৃহের বাতায়নাদি রুদ্ধ রাখিতে হইত। তিনি নিজে স্থূলকায় বলিয়া তাঁহার পক্ষে বিপরীত ব্যবস্থা আবশ্যক হইলেও বালকদের তথায় অবস্থানকালে তিনি বদ্ধকক্ষেই বাস করিতেন। এই গৃহত্যাগী, সংসারসম্বন্ধহীন সন্ন্যাসীর এত সহিষ্ণুতা, এত সাহসের উৎস কোথায় ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জনৈক ভক্তকে উপদেশচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের উপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না—আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একলা ঐ কাজ করে দেহপাত করবে—এরূপ তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভর নিয়ে যদি কাজ করতে পার তো কর।" স্বামী সারদানন্দ তাহাই করিতেন।

শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—বিশেষত বাতব্যাধিতে প্রায়ই ভুগিতেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের জন্য তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পুরীধামে যাইয়া জুলাই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন। তিনি

নিত্য জগন্নাথদর্শনে যাইতেন এবং বিগ্রহের সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে মহাপ্রভুকে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেন। মন্দিরাদিতে গমন করিলে তিনি যাত্রীদের অনুকরণে খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানটি পর্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পালন করিতেন—যেমন কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে সিংহদ্বারে প্রণাম, দ্বারের শিকল কপালে ঠেকানো, ঘণ্টাবাদ্য ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়িত না। পুরীতে রথযাত্রার দিনেও তিনি স্থূলকায়ে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া রথের দড়ি লইয়া কিছুক্ষণ রথ টানিতেন।

পুরীর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী সারদানন্দ তখন সদলবলে বলরামবাবুদের 'শশিনিকেতন' নামক বাটিতে ছিলেন। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণান্তে রাত্রি আটটায় সেখানে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বুন্দীর রাজা বাড়িটি দখল করিয়াছেন—দ্বারে সান্ত্রী বসিয়াছে, প্রবেশ নিষেধ। সারদানন্দ ইচ্ছা করিলেই নবাগতদিগকে বাড়ি ত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু মার্জিতরুচি সন্ন্যাসী তাহা না করিয়া ভদ্রভাবেই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি কিন্তু প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া উষ্মা দেখাইতেও ত্রুটি করিলেন না। তবু স্বামী সারদানন্দ ধৈর্য না হারাইয়া শুধু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ বুন্দী নয়, ইংরেজ রাজ্য!" অবশেষে সেক্রেটারির চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। অগত্যা সারদানন্দ সমুদ্রতীরে বলরামবাবুদের অপর একখানি বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এক সপ্তাহ পরে রাজা চলিয়া গেলে সকলে আবার পূর্বোক্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া হয়, কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। মাতাঠাকুরানী তখন 'উদ্বোধন'-এর উপরে বাস করিতেছেন; পাছে মা তাঁহার জন্য বিব্রত হন—এই চিন্তায় শরৎ মহারাজ নিঃশব্দে সব সহ্য করিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তীর্থদর্শনোপলক্ষে প্রথমে গয়া ও তথা হইতে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যান এবং অতঃপর দুইদিন মথুরায় ও তিন দিন প্রয়াগে কাটাইয়া প্রায় দুই মাস পরে ফিরিয়া আসেন। কলকাতায় পুনরাগমনের কয়েক দিন পরেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বপ্রাপ্ত আহ্বান শিরোধার্য করিয়া জয়রামবাটী গেলেন। সেখানে মায়ের নূতন বাটির বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যাবর্তন-কালে মাতাঠাকুরানীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে কোতলপুরের সাব রেজিস্ট্রার আসিয়া মায়ের বাড়ির দলিল রেজেস্ট্রী করিলেন—দলিলখানি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে শ্রীমায়ের অর্পণনামা।

এই সময়ে মিশনের সম্মুখে এক ঘোর বিপদ সমুপস্থিত। বাঙলা সরকারের শাসনবিবরণীতে উল্লিখিত হইল যে, বাঙলার বিপ্লবিগণ স্বামী বিবেকানন্দের

জ্বালাময়ী লেখা ও বাণী হইতে প্রচুর উৎসাহ পায় এবং তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তদুপরি বাঙলার গর্ভনর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার দরবারে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মারাত্মক মন্তব্য করিলেন যাহাতে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক জাগিল যে, মিশনের সম্পর্কে থাকিলে রাজরোষে পড়িতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন দাক্ষিণাত্যে; সুতরাং স্বামী সারদানন্দকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি একখানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে সরকারি মহলে মিশনের প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন এবং স্বয়ং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের ভ্রম অপসারিত করিলেন। ইহার ফলে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ কারমাইকেল স্বামী সারদানন্দকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন ও তাহার সভ্যদের কোনরূপ নিন্দাবাদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি জানি মিশনের যাবতীয় কার্য রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। জনসাধারণের যে সেবা তাঁহারা এযাবৎ করিয়া আসিতেছেন, সকলের নিকট আমি তাহার প্রশংসা ব্যতীত কিছুই শুনি নাই।" ইহাতে আশু বিপদ কাটিয়া গেল বটে; কিন্তু অসুস্থ দেহ লইয়াই শরৎ মহারাজকে এই কঠিন শ্রম ও উদ্বেগ বরণ করিতে হইয়াছিল; অতএব ২৯ মার্চ বাত ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একপক্ষকাল পরে তিনি পথ্য পাইলেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্বামী সারদানন্দকে পার্শ্বে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তদনুসারে তিনি পুরীতে যাইয়া একমাস অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবাদি করেন এবং অতঃপর তাঁহাকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রাখেন। তখন প্রেমানন্দও অসুস্থ অবস্থায় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই তত্ত্বাবধান স্বামী সারদানন্দকে করিতে হইত এবং ইহা তিনি সাগ্রহে এবং দক্ষতার সহিতই করিতেন। সেবার সহিত তাঁহার একটা প্রাণের যোগ ছিল। সাধু-ব্রহ্মচারী যিনিই অসুস্থ হউন না কেন, তিনি ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন যে, সে সংবাদ সারদানন্দের কর্ণগোচর হইলে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। সঙ্ঘের বাহিরের অনেকেও এই সেবার অধিকারী হইতেন। একবার গঙ্গাতীরে তপস্যানিরতা গৌরী-মা বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অযত্নে পড়িয়া আছেন—এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবিলম্বে তথায় যাইয়া নিজহস্তে সেবার ভার লইলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে শরৎচন্দ্র একদা জানিতে পারেন যে, স্বামীজীর গৃহে এক ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং বাটির লোক সকলেই সেবা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অমনি তিনি সেই বাটিতে গেলেন এবং সর্বপ্রকার সেবা করিয়া দুই সপ্তাহে রোগীকে সুস্থ করিলেন। রোগীরা তাঁহার স্নেহে সহজেই

বশে আসিত। কেহ হয়তো ইঞ্জেকশন নিতে চায় না; সারদানন্দ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আদরের সুরে নানা কথা বলিয়া সম্মত করাইলেন। আর একজন অহিতকর কিছু খাইবার জন্য ব্যাকুল; সারদানন্দের সৌম্য মূর্তি, সস্মিত বদন এবং সস্নেহ নয়ন দেখিয়া সে চিকিৎসকের নির্দেশ মানিতে সম্মত হইল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়েও এই কারুণ্য রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে বিচলিত করিত। ঐ সময়ের তাঁহার একখানি পত্র শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দুঃখে বিগলিত হইয়া সাশ্রুলোচনে গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "শরতের দিল্ দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই—সমস্ত পৃথিবীতে নাই।" এই সেবার মূল মন্ত্র স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, "পরের টাকা পরকে দিবি; তুই কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।"

শেষবয়সে স্বহস্তে সেবা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না—শুধু খবরাখবর লইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইত। এইরূপ অবস্থায়ও একদিন অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরে অপরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে রাস্তায় নামিতে দেখিয়া সেবকও পশ্চাতে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই শরৎ মহারাজ সেবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে আসিতে বারণ করিলেন; কিন্তু সেবকের আগ্রহদর্শনে আর আপত্তি করিলেন না। ক্রমে তিনি এক হোটেলে উপস্থিত হইয়া দোতলায় এক যক্ষ্মারোগীর বিছানায় বসিলেন। তাঁহাকে পার্শ্বে পাইয়া রোগীর আনন্দ ধরে না—সে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য কত রকমেই না চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে থুথু ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বামী সারদানন্দের উহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সে কিছু ফল কাটিয়া খাইতে দিলে তিনি উহা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দেখিয়া সেবক তো স্তম্ভিত! প্রত্যাবর্তনকালে এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সে অনুযোগ করিতেও ছাড়িল না। সারদানন্দ শুধু সহজভাবে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া জিনিস খেলে কোন ক্ষতি হয় না।" সেবকের বুঝিতে বাকি ছিল না যে, এই কথা যতই সত্য হউক না কেন, রোগীর মনে আঘাত না দেওয়াই তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখানে শুধু গুরুবাক্যানুযায়ী আচরণই উদ্দেশ্য ছিল না, হৃদয়বত্তার স্পর্শে সে আচার মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯১৮ অব্দে শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দকে দুইবার জয়রামবাটী যাইতে হয়। দ্বিতীয়বার (৭ মে, ১৯১৮) শ্রীশ্রীমা তাঁহার সহিত 'উদ্বোধনে' আসেন।

পরবৎসর বাঙলার গভর্নর রোনাল্ডসে মঠদর্শনে আসেন। অভ্যাসবশত তিনি পাদুকাসহ ঠাকুরঘরে যাইতে উদ্যত হইলে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং তাঁহার পাদুকা উন্মোচন করিয়া সৌজন্য, নিরভিমানিতা ও দেবগৃহের প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

১৯২০ (খ্রিঃ) ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীমা শেষ অসুখ লইয়া 'উদ্বোধনে' আসেন এবং সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ২১ জুলাই রাত্রি দেড়টায় স্বস্বরূপে লীন হন। মহাপ্রয়াণকালে শ্রীশ্রীমা আপন সন্তানদিগকে সারদানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং শোক ভুলিয়া তাঁহাকে তাহাদের সান্ত্বনা ও সদুপদেশদানে নিরত হইতে হইল। স্ত্রীভক্তেরাও তাঁহারই নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেন। তিনিও শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি ইঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া সর্বদা তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিকট স্ত্রীভক্তদেরও কোন সঙ্কোচ থাকিত না। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার কর্তব্য ইহাতেই সমাপ্ত হয় নাই। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমন্দিরনির্মাণ এবং (২১/১২/২১ তারিখে) উহার প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে তাঁহারই পরিকল্পনানুযায়ী হইয়াছিল। অতঃপর জয়রামবাটীতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আশ্রমস্থাপন তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল। ইতোমধ্যে ১৯২২ অব্দের ১০ এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করিলে শরৎ মহারাজের সম্মুখে এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা অনেকেই তাঁহাকে মঠ ও মিশনের সভাপতি হইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "স্বামীজী আমায় মঠের সেক্রেটারি করে গেছেন, আমি সে পদ ত্যাগ করব না।" বস্তুত তিনি শেষদিন পর্যন্ত সেক্রেটারিই থাকিয়া গেলেন—সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানন্দ। এই সভাপতিপদ গ্রহণ না করার হয়তো অন্য কারণও ছিল—তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভালবাসার জনেরা একে একে অনেকেই চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মন কার্য হইতে বিশ্রাম লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; এই অবস্থায় আরব্ধ কর্তব্য সমাপন করা চলে, নূতন দায়িত্বগ্রহণ অসম্ভব। ঐ সময়ে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "মা চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন—কোন কাজেই যেন উৎসাহ পাই না, প্রবৃত্তিও জাগে না।" যাহা হউক, জয়রামবাটীর পরিকল্পিত মন্দিরের কার্য তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমাপ্ত হইলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত হইল। সেই দিন সদলবলে সারদানন্দ জয়রামবাটিতে উপস্থিত থাকিয়া কল্পতরু হইলেন—মায়ের অসীম করুণা স্মরণপূর্বক তিনি ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব আর নির্বিচারে দীক্ষা, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য চলিতে লাগিল।

নববঙ্গে নবীন শক্তিপীঠস্থাপনান্তে কর্তব্যমুক্ত স্বামী সারদানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক আত্মচিন্তায় ডুবিয়া গেলেন—কার্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রমেই শিথিলতর হইতে লাগিল। সমাধিমগ্ন হইয়া তিনি নিত্যই অধিকাধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন এবং নিত্য ঐরূপ অবস্থিতির জন্য তাঁহার মন অধিকতর লোলুপ হইতে থাকিল। এদিকে বৃদ্ধশরীরে রোগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা-সন্দর্শনে ভক্তগণ তাঁহাকে বিশ্রামলাভের জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়া ভুবনেশ্বরে পাঠাইলেন (১২ নভেম্বর, ১৯২৪)। সেখানে শরীর সুস্থ হইল; কিন্তু শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার অসুখের সংবাদে তাঁহাকে অচিরে কলকাতায় ফিরিতে হইল। তাঁহার আগমনের নয় দিন পরেই (১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪) গোলাপ-মা দেহরক্ষা করিলেন। তারপর শরৎ মহারাজ কাশীধামে গমন করেন, মার্চ মাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুরীধামে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে সম্পূর্ণ কর্মবিরত বলিলেই চলে। তাঁহার ঐ সময়ের একখানি পত্রে তৎকালীন মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে ঃ "আমি এখন কর্ম হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া রহিয়াছি। আবার যদি কোনও দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ কোনও কার্যের জন্য নিঃসন্দেহে পাই, তাহা হইলে নবীন উৎসাহে লাগিব এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসামর্থ্যও পাইব। যদি ঐরূপ না পাই, তাহা হইলে আমার দ্বারা যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে জানিবে।"

কিন্তু কার্য সমাপ্তপ্রায় হইলেও তিনি জানিতেন যে, তাঁহাদের অবর্তমানে সঙ্ঘের কর্ম ও অধ্যাত্মস্রোত যাহাতে পূর্ণবেগে নির্ধারিত প্রণালীতে প্রবাহিত হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকেই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সকলের সহযোগে ১৯২৬ অব্দে বেলুড় মঠে একটি মহতী সভার আহ্বান করেন। উহাতে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সাধু ও ভক্ত সমবেত হইয়া সঙ্ঘের ভাবী কল্যাণের বিষয় আলোচনা করেন। সভার সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানন্দ এবং সম্পাদক হইলেন স্বামী সারদানন্দ। অতঃপর ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিচালনা একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে জানিয়া অধিবেশনের স্বল্পকাল পরেই সকলের সম্মতিক্রমে তিনি একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনপূর্বক উহার হস্তে দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তুলিয়া দিলেন। এইবার তাঁহার কর্তব্য সত্যই সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবনধারার একটি পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করিলেন—এখন হইতে তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ আত্মস্থ। ইহাতে ডাক্তার ও ভক্তগণ প্রমাদ গণিলেন এবং ধ্যানজপাদি কমাইয়া একটু শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু শরৎ মহারাজ মৌন প্রফুল্লতার সহিত মস্তক আন্দোলনপূর্বক সকলকে নিরস্ত করিলেন।

তাঁহার শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু পরের উদ্বেগ জন্মাইতে তিনি সর্বদা অপারগ; সুতরাং সেবকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় লইয়া যেন বিশেষ আলোচনা না হয়। অর্থাৎ ভক্তদের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট সকালে তিনি যথানিয়মে জপধ্যানে বসিলেন। অন্য দিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও তাঁহার জপধ্যান চলিত; আজ কিন্তু অচিরে আসনত্যাগ-পূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রায় আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সকলে দেখিল—ইহাও অস্বাভাবিক। ফিরিবার পথে দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনর্বার প্রবেশ করিলেন এবং মাতাঠাকুরানীর পটের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ মৌন প্রার্থনা জানাইয়া পুনর্বার দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু দ্বার অতিক্রম না করিয়াই পুনর্বার পূর্বস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনায় রত হইলেন। এইরূপ কয়েকবার হইতে লাগিল। অবশেষে যখন স্বকক্ষে আসিলেন তখন তাঁহার মুখে এক অপূর্ব শান্তি বিরাজিত। সমস্ত দিন সাধারণভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর সন্ধ্যারতির পর সেবক কিছু কাগজপত্র লইয়া ঘরে আসিলে তিনি উহা আলমারিতে রাখিতে গেলেন। অমনি অকস্মাৎ শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় সেবককে একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে এবং কাহাকেও কোন সংবাদ না দিতে বলিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বাণী ও শেষ কার্য। চিকিৎসক আসিয়া স্থির করিলেন, সন্ন্যাসরোগ হইয়াছে, আরোগ্যের আশা নাই। এইভাবে প্রায় ত্রয়োদশ দিন অতিবাহিত হইলে ১৯ আগস্ট রাত্রি দুইটার সময় যোগিবর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন।

# স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামবাসী বাপুলী-উপাধিধারী শ্রীযুত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর তিন পুত্র ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্র বা স্বামী সারদানন্দের পিতা এবং রাজচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শশিভূষণ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র কলকাতায় বাটি নির্মাণ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন; কিন্তু শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে থাকিয়া যান। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক এবং কৌল সমাজে তন্ত্রবিদ্যার জন্য তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন; রাজা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাধনার জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামের অনতিদূরে ৶ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্মশানে, কলকাতায় কেওড়াতলার শ্মশানে, অথবা রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনায় রত থাকিতেন। কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে ৶কালিকাদেবী তাঁহাকে বালিকাবেশে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শশিভূষণের জননী অতিশয় উদারহৃদয়া ও সরলা ছিলেন; তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, নিকট আত্মীয়ের সম্মুখেও ঘোমটা দিতেন। তাঁহার বর্ণ ছিল গৌর এবং শশীও তাহাই পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্যপূজা হইত এবং প্রতিবৎসর কালীপূজা হইত।

শশিভূষণ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৯ আষাঢ়, চান্দ্র আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে রবিবার, শেষরাত্রে ৪টা ৫৬ মিনিটে) স্বগ্রাম ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রগাঢ় ধর্মভাবপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া শশী অতিশয় ভগবৎপরায়ণ হইয়াছিলেন। শৈশবে পূজাদি অভ্যাসের ফলে পরবর্তী কালে একাসনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠসমাপনান্তে তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলকাতায় শরৎচন্দ্রের গৃহে আসেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকারপূর্বক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর আলবার্ট কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. পড়েন। ছাত্রজীবনে শশী ও শরৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। উভয়েই সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন এবং শশী কিছুদিন কেশবচন্দ্রের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শৈশবের ন্যায়

বাল্য ও যৌবনেও শশীর ধর্মভাব সুপরিস্ফুট ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আকৃষ্ট হইয়া তিনি আজীবন নিরামিষাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ও শেষদিন পর্যন্ত তাহা প্রতিপালন করেন।

বাল্যকালে স্বাভাবিক পরিবেশের প্রভাবে এবং বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেনের আকর্ষণে শশীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও সম্পূর্ণ শান্ত হইল না; বরং তাঁহার বুভুক্ষা বৃদ্ধি পাইল মাত্র। অবশেষে সহপাঠী কালী প্রসাদ চক্রবর্তী জানাইলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপূর্ব বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে—একদিন তাঁহার দর্শনের জন্য তথায় যাইতে হইবে। তদনুসারে শরৎ ও শশী বন্ধুসহ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।[১] যুবকদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আছে শুনিয়া শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সাকার ভালবাসেন কিংবা নিরাকার। শশী উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না—তাঁর আবার সাকার না নিরাকার?" সরল ও নির্ভীক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "বাপ-মা আজকাল ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়; যেই তারা স্কুল-কলেজ থেকে বেরোয়, অমনি অনেক ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে পড়ে। তখন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চাকরির সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।" অমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে কি, মশায়, বিয়ে করা অন্যায়? এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ?" গৃহে একখানি বাইবেল সংরক্ষিত ছিল এবং উহার এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল; পরমহংসদেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকখানি খুলিয়া চিহ্নিত অংশটি পাঠ করিতে বলিলেন। উহাতে লিখিত ছিল, "অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে আমি বলিতেছি যে, বিবাহ না করাই ভাল—যেমন আমি নিজে অকৃতদার রহিয়াছি। কিন্তু তাহারা যদি সংযম অবলম্বন না করিতে পারে, তবে বিবাহ করাই ভাল; কারণ বাসনার আগুনে পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উত্তম।" পাঠ শেষ হইলে পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিলেন যে, বিবাহই সর্বপ্রকার বন্ধনের মূল। জনৈক শ্রোতা পুনর্বার আপত্তি তুলিলেন, "আপনি কি তা হলে বলতে চান যে, বিয়ে করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ? বিয়ে না করলে সৃষ্টি থাকবে কি করে?" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

---

১। এই বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা ব্রহ্মচারী প্রকাশ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ' (১৫-১৬ পৃঃ) অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' (৪৭২ পৃঃ) ও ভগিনী দেবমাতা-রচিত 'Sri Ramakrishna and his Disciples' (৯৫ পৃঃ)—এই তিনটি বিবরণের মধ্যে যাথাসাধ্য সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ইহা লিখিলাম।

যারা বিয়ে করতে চায় তারা করবে বইকি? ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল। আমার যা বলবার আমি বলেছি; তুমি ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" সেদিন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে যুবকদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করা হইল না; সুতরাং বিদায়কালে ঠাকুর শশী প্রভৃতিকে বলিয়া দিলেন, "আবার এসো, কিন্তু একা একা; ধর্মের সাধন গোপনীয়।"

প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করিয়া লইলেন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি কলেজের ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রথমত তিনি অনেক কথা বলিতেন; কিন্তু অতঃপর যুবকমনে বহু সন্দেহ উঠিলেও এবং সন্দেহনিরসনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগবৎপ্রসঙ্গে নিমগ্ন ও ভক্তপরিবেষ্টিত দেখিয়া আর বিশেষ বাক্যস্ফূর্তি হইত না। তাঁহাকে দেখিলেই ঠাকুর বলতেন, "বস, বস।" তিনিও বসিতেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই মনের সংশয় বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করিত। ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-মন চিরতরে এক উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইলেন। একদিন বস্তুবিশেষের সন্ধানে শশী দ্রুতপদে ঠাকুরের কক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তুই যাকে চাস—সে এই, সে এই, সে এই ।" চকিতে শশীর দৃষ্টি অনুসন্ধেয় বস্তু হইতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু—আর সব অনুসন্ধান এই বৃহৎ অনুসন্ধানেরই রূপান্তর মাত্র।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের সহিত পরিচিত ও প্রেমসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। একসময়ে নরেন্দ্রের মুখে সুফী কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া মূল কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি ফারসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই মনোযোগসহকারে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতেছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে শশী নিকটে আসিলে তিনি জানিতে চাহিলেন, এত নিবিষ্টমনে কি করা হইতেছিল। ফারসী পড়িতেছিলেন শুনিয়া তিনি সাবধান করিয়া দিলেন, "অপরা বিদ্যায় ডুবে যদি পরা বিদ্যা ভুলে যাস তো তোর হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে।" শশীর ফারসী পড়া আর অগ্রসর হইল না।

ঠাকুর বরফ খাইতে ভালবাসিতেন; তাই এক গ্রীষ্মের দিনে কলকাতায় বরফ কিনিয়া শশী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। বরফ খণ্ডটিকে তিনি এতই যত্নসহকারে গামছা জড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে, উহা গলিতে পারে নাই। ঠাকুর

তাঁহার ঐকান্তিকতা, বুদ্ধি এবং রৌদ্রে দেহ ঘর্মাক্ত ও মুখ শুষ্ক দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে তারিফ করিয়া বললেন, "আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে! দ্যাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কৃপণ বলে; কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নস, তুই দাতা!"

ফলত দক্ষিণেশ্বরে বারংবার যাতায়াত ও ঠাকুরের সেবাদির ফলে শশী তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের অলৌকিক সম্বন্ধ তো ছিলই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের) দলে ছিল।"—('কথামৃত', ৪/৩৩০; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৩)। শশীকে আদর করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বলিতেন; কিন্তু অধ্যয়নে নিরত এবং সাংসারিক অসচ্ছলতাবশত পাঠের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত শশীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হইল যখন সাংসারিক চিন্তাকে ছাপাইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণরূপে উদ্বেলিত হইল। ঠাকুর গলরোগ লইয়া যখন শ্যামপুকুরে আসিলেন এবং পথ্য-প্রস্তুতির জন্য শ্রীশ্রীমাও তথায় আসিলেন, তখন "রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপে আকৃষ্ট করিলেন।"—('লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ—দিব্যভাব', ১৫৬ পৃঃ)। অভিভাবক প্রথমে ততটা আপত্তি করেন নাই; কিন্তু পরে যখন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শশী বাড়িতে আহার করিতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিলেন, তখন তিনি নানাবিধ বাধাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শশী কিন্তু নিজ সঙ্কল্প ছাড়িলেন না। তিনি তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাই জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী যখন উপদেশ দিলেন, "পরীক্ষাটা দিয়েই গুরুসেবা কর না", তখন শশীর উত্তর পাইলেন, "আমি যদি তার আগে মরে যাই? ততদিন আমার মৃত্যু হবে না, একথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন?"

শ্যামপুকুরের পরে কাশীপুর। শশী এখানেও গুরুসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে শশী বলিতেন, "জগতের দুঃখ দেখে যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন; ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগভোগ করছেন।" রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মত যাহাই থাকুক না কেন, সেবাকার্যে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। একদিন ঠাকুরের জামরুল খাইতে ইচ্ছা হইল। তখন শীতকাল—জামরুল কিরূপে পাওয়া যাইবে? শশী সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এক বাগানে উহা আছে; অমনি উহা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জামরুল পাইয়া ঠাকুর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এমন সময় জামরুল কোথায় পেলি রে?" কোথায় আর পাইবেন? সত্যসঙ্কল্প ঠাকুরের যেখানে অভিলাষ আর বীর ভক্ত যেখানে সেবক, সেখানে কোন্ বস্তু অলভ্য হয়?

ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত শশীর আহারাদি পর্যন্ত ভুল হইয়া যাইত। কত দিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন, "নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভাল আছি—আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস।" এমন বহুবার হইয়াছে, যখন শশীকে অবিরাম বীজন করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার হাত হইতে পাখা লইয়া লাটুকে দিয়াছেন। দেহত্যাগের পূর্বে একদিন শশীকে তিনি স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেখানে দেখে আসি।" সকলেই বুঝিলেন, ঠাকুর লীলাসংবরণের ইঙ্গিত করিতেছেন—আর যেন বলিতেছেন যে, ভক্তের আকর্ষণই তাঁহাকে মর্তধামে ধরিয়া রাখিয়াছে।

ঠাকুরের সেবায় শশী কতখানি মগ্ন হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে কতখানি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষদিনের নিদারুণ ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেদিন বৈকালে সাত মাইল ছুটিয়া ডাক্তারের বাড়ি গিয়া যখন জানিলেন যে, ডাক্তার অন্যত্র গিয়াছেন, তখন আবার এক মাইল ছুটিয়া গিয়া পথে তাঁহাকে ধরিলেন এবং ডাক্তার যদিও জানাইলেন যে, তাঁহার তখনই কাশীপুরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্যত্র জরুরি কাজ আছে, তথাপি শশী তাঁহাকে টানিয়া কাশীপুরে লইয়া গেলেন। যথাবিধি পরীক্ষান্তে ডাক্তার চলিয়া গেলে সেদিনও পূর্বানুরূপ দৈনন্দিন সেবাদি চলিতে লাগিল—কেহই ভাবিতে পারিলেন না যে, শেষদিন সমাগত। অথবা অপরে যাহাই ভাবুক না কেন, শশী অন্তত চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, প্রিয়তমের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ আসন্নপ্রায়। সে রাত্রিতে ঠাকুর সাধারণ আহার অপেক্ষা একটু বেশিই খাইলেন, শশী খাওয়াইয়া দিলেন। মহাপ্রস্থানের কোন ইঙ্গিত না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর সে রাত্রে বরং একটু ভালই আছেন। এমন কি, পরিশেষে যখন সত্যই শেষমুহূর্ত আসিল, শশী তখনও মনে করিলেন, ঠাকুরের গভীর সমাধি হইয়াছে; কারণ তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া এক আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে—এত আনন্দোচ্ছ্বাস তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। রাত্রিশেষে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া যখন কহিলেন যে, মস্তক ও মেরুদণ্ডে ঘৃত মালিশ করিলে সমাধিভঙ্গ হইতে পারে, শশী তখন তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর আশা নাই। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের পূতদেহকে মাল্য-চন্দন-

পুষ্পে সাজাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। বাস্তবকে বিশ্বাস করিতে অপটু শশী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। লাটু তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিলেন, নরেন ও শরৎ অনেক প্রবোধ দিলেন—শশী তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়! চিতা নির্বাপিত হইলে তিনি নীরবে ভস্মাস্থি তুলিয়া একটি তাম্রকলসীতে রাখিলেন এবং উহা মস্তকে বহন করিয়া উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের শয্যায় স্থাপন করিলেন। শশীর বিশ্বাস—ঠকুর যান নাই; সুতরাং ঠাকুরের দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত হইল এবং ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসীতে নিয়মিত পূজা চলিতে লাগিল।

ভস্মাবশেষ ঐ অবস্থায় সাত দিন থাকার পর রামচন্দ্র-প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের সিদ্ধান্তানুযায়ী উহা কাঁকুড়গাছিতে লইয়া যাইবার কথা উঠিল। নিরঞ্জন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, আর শশী বলিলেন, "কলসী দেব না।" নরেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তখনকার মতো বিবাদ মিটিল এবং রামবাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইল; কিন্তু অপর সকলের অজ্ঞাতসারে শশী ও নিরঞ্জন অন্য এক পাত্রে "অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া" উহা বলরামবাবুর বাটিতে নিত্যপূজার জন্য পাঠাইয়া দিলেন ('উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ)। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে প্রথম কলসীটি কীর্তনসহ রামবাবুর কলকাতার বাটি হইতে কাঁকুড়গাছির উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল—কীর্তনের পশ্চাতে শশী অধিকাংশ পথ কলসীটি নিজ মস্তকে বহন করিয়া চলিলেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছিতে যথোচিত পূজান্তে যখন উহা সমাহিত করিয়া উহার উপর মাটি ফেলা হইতে লাগিল, তখন শশী কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।" শশীর কথায় সকলেরই চক্ষে জল আসিল—তাই তো, ঠাকুর যে সদা-বিদ্যমান, সদা-সচেতন!

ইহার পর শশীকে গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে হইল; কিন্তু নরেন্দ্রাদির আহ্বান আবার তাঁহাকে কয়েক মাস পরেই বরাহনগর মঠে লইয়া গেল। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদুকা-সম্মুখে অপর কয়েক জনের সহিত সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তিনি 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে পরিচিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বয়ং ঐ নাম গ্রহণ করিবেন; কিন্তু শশীর সেবা ও ভক্তির দাবি মানিয়া লইয়া তাঁহাকেই উহা দিলেন।

বরাহনগরে আসার পর শশী মহারাজ নিত্য শ্রীগুরুর পূজাদি-অবলম্বনে একদিকে যেমন সকলের মনে গভীর ভক্তিভাব জাগাইতেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহাদের কায়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মঠস্থাপনের পরেই দেখা গেল যে তীব্র বৈরাগ্য ও তীর্থদর্শন-অভিলাষে গুরুভ্রাতারা প্রায়ই এদিকে

সেদিকে চলিয়া যাইতেছেন—কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একমনে গুরুসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন অভাবের দিন। এক দ্বিপ্রহরে চারিজন সন্ন্যাসী রিক্তহস্তে ভিক্ষা হইতে ফিরিলেন—মঠের ভাণ্ডারও সেদিন শূন্য। অতএব আহারের আশা ত্যাগ করিয়া সকলে 'দানাদের ঘরে' কীর্তনে মাতিলেন। এদিকে শশী মহারাজের ভাবনা হইল, ঠাকুরকে কিছু না দিলে তো চলে না, তিনি অপরের অজ্ঞাতসারে পরিচিত এক প্রতিবেশীর নিকট গেলেন। ঐ বাড়ির অন্যান্য সকলেই মঠের বিরোধী; কাজেই প্রতিবেশী জানালা গলাইয়া পোয়াটাক চাল, কয়েকটি আলু ও একটু ঘৃত দিলেন। শশী মহারাজ উহা রন্ধনপূর্বক ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং পরে ঐ প্রসাদের দ্বারা গোল গোল পিণ্ড পাকাইয়া 'দানাদের ঘরে' কীর্তনমগ্ন অভুক্ত গুরুভ্রাতাদের মুখে একটি একটি পিণ্ড গুঁজিয়া দিলেন। এই অপূর্ব প্রসাদের আস্বাদে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই শশী, ঐ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?" স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকিলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হত। সন্ন্যাসীরা ধ্যানভজনে প্রায়ই ডুবে থাকত এবং শশী তাদের আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করত; এমন কি, মাঝে মাঝে তাদের ধ্যান থেকে টেনে এনে খাওয়াত।"

বিশেষ কারণ না ঘটিলে শশী মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মৃত্যুশয্যা হইতে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া প্রায় একঘণ্টা ঠাকুরের কথায় কাটাইয়াছিলেন। এই নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, "শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে! তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে যিশুখ্রিস্টের প্রতি ভক্তিপরায়ণ জানিয়া ধর্মান্তরিত করার লালসায় মুক্তিফৌজের (Salvation Army) দুই-একজন বাঙালি প্রচারক একসময় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন; কিন্তু অবশেষে বাইবেলে রামকৃষ্ণানন্দের ব্যুৎপত্তি-দর্শনে যুক্তির পথে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভন দেখান। ইহাতে তাঁহার ধৈর্যের সীমা উল্লঙ্ঘিত হওয়ায় তিনি চিরতরে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেন।

অবসরবিনোদনের জন্য শশী মহারাজ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন—তিনি সময় পাইলেই অঙ্ক কষিতেন বা সংস্কৃত পড়িতেন। মঠে সমাগত যুবকগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়নবিষয়ে প্রচুর উৎসাহ পাইত। ঐ সময় স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। শশী মহারাজ তাঁহাদের সহিত ধর্মালাপ করিতেন এবং ঠাকুরের সেবা ও মঠের খুঁটিনাটি কাজের

সুযোগ দিতেন। বিরজানন্দকে গণিতে কাঁচা জানিয়া তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে থাকিয়া তাঁহার নিকট গণিত শিখিতে বলেন। তদনুযায়ী বিরজানন্দ সেখানে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগবদ্‌ব্যাকুল মন তখন অধ্যয়ন অপেক্ষা ঠাকুরসেবা ও মঠের কার্যেই অধিক মগ্ন হইয়া পড়িল; আর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরও তো খুব বেশি অবকাশ ছিল না। অতএব ছুটির মধ্যে আর বই খোলা হইল না; কিন্তু বিরজানন্দের বৈরাগ্যের উৎস খুলিয়া গেল—তিনি কিয়ৎকাল পরেই মঠে যোগ দিলেন।

মঠে ঠাকুরপূজাদি চালাইয়া যাওয়ার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লইয়াছিলেন। ঠাকুরসেবার কোন প্রকার ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। রঙ্গপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন; তাই মাঝে মাঝে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া মজা দেখিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত ঠাকুরপূজাকে শীতলাপূজাদির সহিত তুলনা করিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ শশী মহারাজ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ঐরূপ ভক্তের অর্থসাহায্য চান না। অমনি স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, "তবে ভিক্ষা করে নিয়ে আয়।" শশীও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাই করব।" স্বামীজী তখন কৃত্রিম কোপসহকারে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন যে, মঠের ভাইদের যে স্থলে অন্নবস্ত্রের অভাব, সে স্থলে পূজার জন্য অধিক খরচা করা অযৌক্তিক। তর্ক বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া লাটু মহারাজ মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলে স্বামীজী তাঁহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি কৌতুকপ্রদ কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে হাসির হিল্লোল উঠিয়া সেদিনকার বিতর্ককে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অনুযায়ী পূজা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন না; তাঁহাকে জীবন্ত জানিয়া তদনুরূপ সেবা করিতেন। গ্রীষ্মে নিজের কষ্ট হইলে তিনি পাখা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন এবং নিজে গলদঘর্ম হইতে থাকিলেও উহাতেই আরাম বোধ করিতেন। ভোরে উঠিয়া দায়ের উল্টা দিক দিয়া তিনি ঠাকুরের জন্য দাঁতনকাঠি থেঁতো করিয়া দিতেন। একদিন বাল্যভোগ দিতে যাইয়া দেখেন যে, সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) উহা ঠিকভাবে থেঁতো করেন নাই। অমনি মনে আঘাত পাইয়া সচ্চিদানন্দের সন্ধানে বাহির হইলেন আর বলিতে লাগিলেন, "আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস!"

আলমবাজারে আগমনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দায়িত্ব বর্ধিতই হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আসিয়া মঠের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এক হিসাবে মঠের কর্ণধার। তবে সুখের বিষয় এই যে, আলমবাজারে আসার পর এক বৎসর পরে মঠের আর্থিক অভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই মঠ হইতেও স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দ বিশেষ কোথাও যাইতেন না—এমন কি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৺কাশীধামও তিনি দর্শন করেন নাই। একবার তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিন্তান্বিত গুরুভ্রাতাদিগকে তাঁহার সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির হইতেই সেবারে তিনি মঠে ফিরিয়াছিলেন। আর একবার তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ধমান জেলার মানকুণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সংবাদ পাইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে লইয়া আসেন।

মঠ-জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যুবক সন্ন্যাসীদের আনন্দের অভাব ছিল না। মঠের বাড়িটি ভূতের বাড়ি বলিয়া ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা হইত এবং কেহ কেহ ভূতও দেখিয়াছিলেন। এক গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় শুনিলেন ছাদে বিকট গড়গড় শব্দ হইতেছে। শব্দ শুনিয়া অনেকে ভয় পাইলেন এবং রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সত্যই ভূতের ভাঁটা-খেলা চলছে।" ইহাতে উত্তেজিত শশী মহারাজ "তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি" বলিয়া একটি বড় লাঠি-হাতে মার মার শব্দে দুপদুপ করিয়া একেবারে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন ডাম্বেল ও লণ্ঠন রহিয়াছে। তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভূতে বুঝি আবার লণ্ঠন নিয়ে ভাঁটা খেলে?" অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা স্বামী সারদানন্দ ও সদানন্দের কীর্তি।

পূজায় প্রীতি থাকিলেও জ্ঞানার্জনের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আলমবাজারে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে অনুষ্টুপছন্দে সংস্কৃতে অনুবাদপূর্বক 'বিদ্যোদয়' নামক পাক্ষিক সংস্কৃতপত্রে ছাপাইতেন। এতদ্ব্যতীত 'ইনোসেন্ট এ্যাট হোম' ও 'ইনোসেন্ট এ্যাব্রড' ইত্যাদি হাস্যরসময় ইংরেজি গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার এমনই প্রীতি ছিল যে, একদা কাশীর প্রমদাদাসবাবুর নিকট হইতে যখন সংবাদ আসিল যে, মাসিক ৪০ টাকায় একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাইতে পারে, তখন দারিদ্র্যবশত ঠাকুরের জন্য চারি পয়সার মিছরি জোটানো কঠিন জানিয়াও তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! অবশ্য অন্য কারণে ঐ প্রস্তাব তখন কার্যকর হয় নাই।

তাঁহার গুণে মুগ্ধ স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে আমেরিকার কার্যের জন্য আহ্বান করেন; কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে চর্মরোগ—চুলকাইলে মাছের আঁশের মতো বাহির হইত এবং শীতকালে উহা বাড়িত। অতএব তাঁহার যাওয়া উচিত কিনা,

এই বিষয়ে আলমবাজার মঠে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন, "শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে, কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাহাই বিচার করছ! ...শশীকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)।" শশীর তবু যাওয়া হইল না; কলকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক জার্মান ডাক্তার সালজার মত দিলেন যে, শীতপ্রধান দেশে তাঁহার যাওয়া চলিবে না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশই ভাল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসীম রুদ্ধ ক্ষমতার দ্বারোদ্ঘাটনে আচার্য বিবেকানন্দ ঐভাবে তখন অসমর্থ হইলেও সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং আমেরিকা হইতে প্রথমবারে মঠে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই স্বীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিলেন। মাদ্রাজের ভক্তগণ সেখানে একটি মঠস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাইলে স্বামীজী তাঁহাদের ব্রাহ্মণসুলভ নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যে তোমাদের সর্বাধিক গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা, শাস্ত্রজ্ঞান, ধ্যানধারণাদিতে অতুলনীয়।" তাঁহার মনে তখন রামকৃষ্ণানন্দের কথাই জাগিয়াছিল। আলমবাজারে আসিয়া তিনি তাঁহাকে প্রথমে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য বলিলেন, "শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না?" শশী মহারাজ যেই বলিলেন, "হাঁ", অমনি স্বামীজী আদেশ করিলেন, "তবে চিৎপুরের ফৌজদারি বালাখানার মোড় থেকে ভাল টাটকা নরম পাঁউরুটি নিয়ে আয়।" শশী মহারাজের নিষ্ঠা থাকিলেও শুচিবাই ছিল না; অধিকন্তু নেতার আদেশে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁউরুটি কিনিয়া আনিলেন। নির্দেশপালনে তৎপর দেখিয়া নেতা তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "ভাই, তোকে মাদ্রাজে যেতে হবে।" দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্মত হইলেন এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে জাহাজে করিয়া স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিলেন।

সেখানে তিনি প্রথমত আইস হাউস রোডে একটা ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন; পরে স্বামীজীর ভক্ত এস বিলগিরি আয়াঙ্গার মহাশয়ের 'আইস হাউস' নামক ত্রিতল ভবনের একতলার ঘরগুলি বিনা ভাড়ায় পাইয়া উহাতে উঠিয়া গেলেন। কলকাতা আসিবার পথে স্বামীজীর পাদস্পর্শে এই ভবনটি পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। বাড়িটির প্রকৃত নাম ছিল 'কাসল্ কার্নান'। কোনও আমেরিকান কোম্পানি বরফ রাখিবার জন্য সমুদ্রকূলে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন; তাই উহার নাম হয় 'আইস হাউস' বা বরফগৃহ। পরন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত না হওয়ায় উহা বাসগৃহরূপেই ব্যবহৃত

হইতে থাকে। বাড়ির প্রাচীরগুলি প্রশস্ত থাকায় উহা গ্রীষ্মকালে বিশেষ আরামপ্রদ ছিল।

মাদ্রাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পটস্থাপনপূর্বক পূজাদি আরম্ভ করিলেন; অব্যবহিত পরেই বক্তৃতাদিও চলিতে লাগিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষসেবাকার্য আরম্ভ করিলে তিনি ঐ কার্যের জন্য পত্রিকায় আবেদন প্রকাশপূর্বক ও অন্যান্য উপায়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। এইরূপে ক্রমেই তাঁহার কার্যক্ষেত্রের প্রসার হইতে লাগিল। আবার মাদ্রাজের 'ইয়ংমেন্‌স হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনে' তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সকল বক্তৃতা দেন তাহা 'ব্রহ্মবাদিন্‌' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইতে থাকিলেন। অধিকন্তু নগরের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রালোচনাও চলিতে লাগিল। এইরূপে ত্রিপ্লিকেন ও মায়লাপুর অঞ্চলে গীতা ও উপনিষদ্‌ব্যাখ্যা, পুরাসোয়াকাম ও চিন্তাদ্রিপেটে গীতাব্যাখ্যা ও ওয়াই এম এইচ অ্যাসোসিয়েশনে 'যোগসূত্র' ব্যাখ্যা চলিত। আবার প্রতি একাদশীতে মঠে ভজন হইত। এই বৎসর একবার ৺রামেশ্বরদর্শনে গমন ব্যতীত তিনি প্রায় সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। উৎসবাদির আয়োজনও তিনিই করিতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ রবিবার মাদ্রাজ শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম জন্মতিথি-উৎসব হয়, উহাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি মুসলমানরাও যোগ দিয়াছিলেন। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার উদ্যমে ও মাননীয় আনন্দ চার্লু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পাচাইয়াপ্পা কলেজে বিবেকানন্দ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। পরবর্তী বৎসর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের ন্যায় বিবেকানন্দোৎসবও নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে ক্লাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া একাদশ হইল। সাধারণত প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হইলে দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ও অতিবাহিত হইত। শ্রোতা সাধারণত ২০ হইতে ৫০ জন হইত। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইতেছেন মনে করিয়াই শাস্ত্রপাঠ করিতেন। কোন দিন দুর্যোগাদিবশত শ্রোতা উপস্থিত না থাকিলেও তিনি যথারীতি পাঠ করিয়া মঠে ফিরিতেন। এইরূপে তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যম ও উৎসাহ তখনকার দিনে পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত দক্ষিণের সমাজে কিরূপ নূতন ভাববন্যা আনিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু অনুমান কেন, প্রত্যক্ষত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই যে, নগরের বহির্ভাগেও বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁহার

তত্ত্বাবধানে চলিতেছে (যথা—বানিয়াম্বাদি, নিকুন্দি, আরাসামুখি, বারুর, কৃষ্ণগিরি ও ধরমপুরী)। এই সকল সমিতিতে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সহিত পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানের কার্য পরিচালিত হইত।

এই সকল উৎসব ও অন্যান্য কাজে তাঁহার ঐকান্তিকতা ও ঠাকুরের প্রতি নির্ভর প্রতিপদে ফুটিয়া উঠিত। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেখিয়া অধীর রামকৃষ্ণানন্দ মধ্যরাত্রে উঠিয়া মঠের অলিন্দে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় রুদ্ধ আবেগে ধীর অথচ গম্ভীর পদক্ষেপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বুঝিলেন, এই নিশীথে তিনি তাঁহার প্রাণের বেদনা অন্তরের দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন; কিন্তু নিকটে যাইতে সাহস হইল না। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন জনৈক অনুরাগী প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া দেওয়ায় উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুসম্পন্ন হইল।

তিনি কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তখন কার্য পরিচালনা করিতেন তাহা অনুধাবন না করিলে তাঁহার এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সহজে উপলব্ধ হইবে না। একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্তকলেবরে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মতো কিছুই নাই। তখন গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বদ্ধদ্বার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পাদচারণ করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিলেন, "পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।" ঠাকুরের দয়ায় সেদিন ততদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই গৃহদ্বারে করাঘাত হইল এবং তিনি দরজা খুলিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুরের ভোগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া এক ভক্ত উপস্থিত। আর একবার ঠাকুরের ভোগের সময় আগতপ্রায়, কিন্তু ঘৃত নাই। শশী মহারাজ চিন্তাকুল হৃদয়ে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ক্লাসের জনৈক ছাত্র আসিয়া জানাইলেন, তিনি মঠের কোনও একটা অভাব মিটাইতে চান। রামকৃষ্ণানন্দ প্রথমত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির আগ্রহ দেখিয়া পরে স্বীকৃত হইয়া ঘৃতের অভাবের কথা জানাইলেন। ছাত্রটি সেইমাসে উহা তো দিলেনই, পরে প্রতিমাসে উহা পাঠাইতে থাকিলেন। বস্তুত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা মিশিতেন তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ এসব কাজের কাহিনী জানিতে পারিতেন না। ভদ্রতা হিসাবে কেহ যদি জানিতে চাহিতেন মঠ চলে কি করিয়া, তিনি নিরুদ্বেগে সহাস্যে উত্তর দিতেন, "ঠাকুর সব জুটাইয়া দেন।" তিনি আরও বলিতেন, "অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি নাই চলে, তবে ভগবানের সাহায্যই চাওয়া উচিত।" সুতরাং তাঁহার মান-

অভিমান সব ছিল ঠাকুর-স্বামীজীকে লইয়া। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজ জীবনের দুঃখ জানাইতে গিয়া তিনি একদিন স্বামীজীর চিত্রের দিকে তাকাইয়া সক্রোধে বলিয়াছিলেন, "তুমিই তো আমায় এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ।" আবার তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্বামীজীর নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

সপ্তাহে একাদশটি ক্লাস চালানো এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাপ্রদান, দারিদ্র্যবশত ও তখনকার দিনে স্বল্পব্যয়ের যানবাহনের অভাবে এইসব কার্যক্ষেত্রে পদব্রজে গমন, আশ্রমে নিজের রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা—এই সমস্তের সহিত প্রাণপণে যুঝিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারে মত্ত হইয়াছিলেন। কর্মক্লান্ত শরীরে মঠে ফিরিয়া সব দিন রন্ধনের প্রবৃত্তি হইত না; তখন বাজার হইতে রুটি আনিয়া তদ্দ্বারাই রাত্রের আহার শেষ করিতেন। ক্লাসে যাইবার সময় তাঁহাকে এক মাইল হাঁটিয়া বাজারে যাইতে হইত এবং তখনকার দিনের বাহন ঝটকাগাড়ি একা ভাড়া করিবার সামর্থ্য না থাকায় দুই জনের সহিত উহাতে উঠিতে হইত। সেই অপূর্ব বাক্সের মতো গাড়িতে তাঁহার সবল, সুদীর্ঘ, স্থূল দেহখানিকে সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকারে ন্যুব্জদেহে বসিয়া থাকিতে হইত; আবার ঢালু বাক্স হইতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইত; এইরূপ কায়িক ও মানসিক ক্লেশের মধ্যে মাদ্রাজ-মঠের গোড়াপত্তন হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "স্বামীজী, এত ক্লেশ আপনি কিরূপে সহ্য করেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "এ শরীরটা তো একটা যন্ত্র মাত্র, তাও আবার অচেতন; আর যন্ত্রীর জন্যই তো যন্ত্র, যন্ত্রীকে বাদ দিলে তার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, 'আমি শত শত চিঠি লিখেছি' তবে সত্যি কি উহা তাই করেছে? উহা তো কিছু লিখেনি, লিখেছে সে ব্যক্তি, যে তাকে ধরে আছে।"

এই নিরভিমান, নীরব কর্মীর সুযশ সুদূরবিস্তৃত হইয়া ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরের উপকণ্ঠে আলসুরে লইয়া গিয়াছিল। আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি পঞ্চাশটি কীর্তনের দল লইয়া তাঁহাকে রেলস্টেশনে স্বাগত জানাইলেন এবং শোভাযাত্রা করিয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন। এই কালে তিনি তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থানপূর্বক প্রায় দ্বাদশটি বক্তৃতা দেন ও প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন। সেই বৎসরই তাঁহাকে মহীশূর নগরেও শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে যাইতে হইল। সেখানে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজে সমাগত পণ্ডিতদের এক সভায় সুললিত সংস্কৃতে নির্ভীকচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুদারপন্থী পণ্ডিতসমাজে ঐ সময়ে ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া

কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙ্গালোরে সে যাত্রায় যে উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহার ফলে তাঁহাকে পরবৎসরও সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি অপর একজন সন্ন্যাসীকে সেখানে রাখিয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন।

১৯০২ বা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিবান্দ্রমে যান এবং একমাস অবস্থানপূর্বক জনসাধারণের মধ্যে চারিটি বক্তৃতা করেন ও নগরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বাটিতে নিয়মিত গীতাব্যাখ্যা করেন। উহার ফলস্বরূপ একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়া ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববর্তিকা দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত রহিয়াছিল। পরে ১৯২৪ অব্দে সেখানে স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয়। ত্রিবান্দ্রম হইতে তিনি কন্যাকুমারী দর্শনেও গিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন মেট্রোপলিটন কলেজে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হয়। কলকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ বৎসর এবং পরবৎসর তাঁহাকে দক্ষিণাঞ্চলের বহু স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের মায়লাপুর নামক পল্লিতে যে 'রামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের এক সুবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহার পশ্চাতে আছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হৃদয়বত্তা, অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা। কোয়েম্বাটোরে একবার প্লেগের আক্রমণে একটি পরিবারের বয়স্ক সকলের প্রাণনাশ হইয়া কয়েকটি নিঃসহায় শিশুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তদ্দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদের লালনপালনের ভার গ্রহণ করলেন এবং ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম' স্থাপন করিলেন এবং তিনি সর্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার এই স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়া বালকগণকে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতি হইতে তাঁহার নিকট আহ্বান আসে। তদনুসারে তিনি ২০ মার্চ রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া পাঁচ দিন অবস্থানপূর্বক পাঁচটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। একদিন ঠাকুরের জন্য চাঁপাফুলের সন্ধানে তিন-চারি মাইল হাঁটিয়া যাইবার পথে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার দেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই বৃথা শ্রমের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝাইয়া দিলেন—

পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি।

রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

২৯ মার্চ মাদ্রাজে ফিরিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি বোম্বে শহরে ঠাকুরের উৎসব করিতে চলিলেন। সেখানে মাত্র প্রতি বুধবারে ঠাকুরের পূজাদি হইত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বহস্তে নিত্যপূজার প্রবর্তন করিলেন, উৎসব সমাপনান্তে তিনি পুনঃ মাদ্রাজে ফিরিলেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম বারে স্বদেশে ফিরিলে স্বামী পরমানন্দের সহিত শশী মহারাজ কলম্বো যাইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার সহিত কাণ্ডী, অনুরাধাপুরম ও জাফনা ভ্রমণান্তে ভারতে আসিলেন। অতঃপর দক্ষিণদেশের কয়েকটি বিশেষ স্থান দেখিয়া জুলাই মাসে মাদ্রাজে পৌছিলেন। আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দকে লইয়া তিনি মহীশূরে গেলেন এবং উভয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই বারেই বাঙ্গালোরে বর্তমান আশ্রমগৃহের ভিত্তিস্থাপন হইল। অতঃপর অভেদানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলনার্থে পুরীধামে চলিয়া গেলেন। দুই দিন পরে শশী মহারাজও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে এই অতিবাঞ্ছিত গুরুভ্রাতৃমিলনের আনন্দ কয়েক দিন উপভোগান্তে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসর প্রেমানন্দজী তীর্থদর্শনমানসে মাদ্রাজে আসিলে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে কাঞ্চী, পক্ষিতীর্থ ও রামেশ্বরে গেলেন।

ইহার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান কার্য হইল মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে দুইটি স্থায়ী মঠ গড়িয়া তোলা। বাঙ্গালোরে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে মার্কিনদেশীয়া মহিলা ভগিনী দেবমাতা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য মাদ্রাজে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অর্থসংগ্রহার্থ তাঁহাকে লইয়া বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন। মাসাধিক কাল অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বাটির কার্য আরম্ভ করার মতো যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে মহীশূর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহযোগিতায় আশ্রমনির্মাণ আরম্ভ হইল। এই কঠোর পরিশ্রমের সময়ও তাঁহার চিরাচরিত জীবনধারা অব্যাহতভাবেই প্রবাহিত হইত। নগরে সব সময়ে তাঁহারা সফলকাম হইতেন না; অনেক ক্ষেত্রেই কুবাক্য শুনিতে হইত। ইহা সত্ত্বেও ধৈর্যসহকারে কার্যসমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভোগের জন্য তরকারি কুটিতে বসিতেন অথবা কোন কোন দিন সুগন্ধি পুষ্প চয়নান্তে দেবমাতার দ্বারা মালা গাঁথাইয়া সাদরে ঠাকুরকে পরাইয়া দিতেন। এইরূপে দিনের কর্ম প্রভুর চরণে অর্পণপূর্বক তিনি আপন মনকে মান-অভিমান ও সাফল্য-বৈফল্য হইতে মুক্ত রাখিতেন।

মাদ্রাজ মঠের জন্যও তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্থায়ী বাড়ির জন্য কিছু

সর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল। এদিকে বিলগিরির দেহত্যাগের পরে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বাড়িটি নিলামে উঠিল। উহা ক্রয় করার মতো অর্থ মঠে নাই; অতএব বন্ধুরা চেষ্টা করিলেন যাহাতে অন্তত কোনও ভক্তের হাতে উহা যায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মূল্য ক্রমেই বর্ধিত হইয়া ভক্তটির ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন নিকটেই একখানি বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন এবং জনৈক ভক্ত মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিলামের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতেছে দেখিয়া ভক্তটি স্বভাবতই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যেমন সাক্ষিস্বরূপে বসিয়াছিলেন তেমনি রহিলেন এবং অনুদ্বেগে বলিলেন, "তুমি ভেবো না; বাড়ি কে কিনবে বা কে বেচবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার অভাব অল্প। যে-কোন জায়গায় মাথা গুঁজে আমি ঠাকুরের নাম ও গুণগান করে দিন কাটাতে পারি।" বাড়ি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। নিরুপায় শশী মহারাজ ঠাকুরকে লইয়া প্রাসাদেরই ক্ষুদ্র বহির্বাটিতে উঠিয়া গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ভক্ত ব্রডিজ রোডের উপর একখণ্ড ভূমি দান করিলেন এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা বাটিনির্মাণ আরম্ভ হইল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজস্ব বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। ঠাকুরের একটু স্থায়ী স্থান হওয়ায় সেদিন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই বাটি, উহাকে সর্বথা ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং দেয়ালে পেরেক প্রভৃতি পুঁতিয়া কোনও প্রকারে উহার সৌন্দর্য নষ্ট করা চলিবে না। মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিকটস্থ ৺কপালীশ্বর শিবের মন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হইল, মঠে ভক্তদের মধ্যে পরিতোষপূর্বক প্রসাদবিতরণ হইল এবং অপরাহ্নে সভায় স্যার পি এস শিবস্বামী আয়ার প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের উহা এক অতি গৌরবময় দিন, আর ঐ দিবসই দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাফল্যের জন্য প্রায় সবটুকু প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য। ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, বরাহনগর ও আলমবাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধজীবন শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ পূজারির হৃদয়ে কত শক্তিই লুক্কায়িত ছিল! অন্তর্দ্রষ্টা বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন, "শশী খুব executive (কাজের লোক)।"

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ আসিয়া দেখিল তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তিনি মোটেই গর্বানুভব করিলেন না। তিনি জানিতেন, তিনি ঠাকুরের শ্রীহস্তের যন্ত্রমাত্র এবং সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় তাঁহার প্রাণ সমর্পিত। এই ভাবটি সকলের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের

সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে দক্ষিণদেশে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াস ভ্রমণের জন্য অকাতরে শ্রম ও অর্থব্যয় করেন। এদিকে বাঙ্গালোরের আশ্রমবাটির কার্য সমাপ্ত হওয়ায় মহারাজ সেখানে যাইয়া ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পৌরোহিত্যে একটি বৃহতী সভা হয় এবং উহাতে রাজ্যের দেওয়ান, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ভগিনী দেবমাতা বক্তৃতা করেন। পরবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে নির্গত হইলে রামকৃষ্ণানন্দ সর্বপ্রযত্নে তাঁহার দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। মাদ্রাজ ও মাদুরা দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে যান এবং শশী মহারাজের আগ্রহে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্রের দ্বারা মহাদেবের পূজা করেন। পরে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া নূতন মঠবাটিতে বাস করেন। ঐ সময় রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সদ্যপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প মাতৃচরণে অর্পণান্তে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণস্পর্শে দক্ষিণদেশ পবিত্র হইবে এবং তাঁহাদের দর্শন ও উপদেশ প্রারব্ধ কার্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। এই উভয় সাধ তাঁহার পূর্ণ হইল। অতঃপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এই আমার শেষ।" সে কথার অর্থ কত গভীর তাহা তখন কেহ অবধারণ করে নাই। কিন্তু বিধাতা অচিরেই তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কলকাতা ফিরিবার স্বল্পকাল পরেই শশী মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইতঃপূর্বেই চতুর্দশ বৎসর আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল; এখন বহুমূত্র, কাসি ও জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য বাঙ্গালোর আশ্রমে গেলেন; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। প্রত্যুত ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। অগত্যা গুরুভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁহাকে কলকাতায় আনা হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীধামে ছিলেন। তিনি স্টেশনে যাইয়া ট্রেনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও বলিলেন, "শশী, এসব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" কে জানে কোন্ ভাষায় কি বলা হইল? মহারাজ ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করিলে শশী মহারাজও তাহাই করিলেন। তারপর নানা প্রকারে সমবেদনাপ্রদর্শনান্তে মহারাজ বলিলেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে।" শশী মহারাজ এই আদেশ যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আদেশ অনুযায়ী সংসারের সমস্ত মায়িক সম্বন্ধও অচিরেই 'ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন'।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন রোগী কলকাতায় উদ্বোধন মঠে পৌঁছিলে অবিলম্বে

বিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া তাঁহাকে দেখানো হইল। চিকিৎসক অভিমত দিলেন—শরীর তিন মাসের বেশি থাকিবে না। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও আসিয়াছিলেন। সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "ও সব দেখি না; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি।" সবিস্ময়ে ভাবি, কি উচ্চসুরেই না তাঁহার অবচেতনাও বাঁধা ছিল!

রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে শুষ্ক বিখাউজ হওয়াতে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট করিতেন; কিন্তু তখনও তাঁহার মুখে নির্গত হইত "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব"। সেবক যথারীতি কাজ না করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন সত্য, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার অসীম স্নেহের অভাব ছিল না। জনৈক সেবকের গামছা ও মাদুর নাই দেখিয়া উহা আনাইয়া দিয়া তিনি তাহাকে সস্নেহে বলিলেন, "এই মাদুরে তুমি একটু শোও।" রাত্রিজাগরণে নিদ্রালু সেবক অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও নিদ্রিত হইলেন; নিদ্রান্তে সেবককে বলিলেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও একটু ঘুম হলো।" "ভক্তের জাতি নাই"—ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবংশজাত শশী মহারাজ এই সময়ে অব্রাহ্মণ সেবকের হস্তেও বিনা দ্বিধায় আহার করিতেন; বলিতেন, "তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী; তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।" রথযাত্রার দিনে সেবকের হাতে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, "রথ দেখে এসো এবং দু-চার পয়সার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে আপত্তি করিলে কহিলেন, "কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথযাত্রার দিন ঐরূপ করতে বলেছিলেন। ...রথযাত্রা দেখে তাঁর জন্য দুপয়সা দামের একটি ছুরি (লেবু কাটার জন্য) এনেছিলাম। তাতে প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরিব লোকে দুপয়সা পাবার জন্য দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু-চার পয়সা কিছু কেনা উচিত'।"

বস্তুত শেষ কয়দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের সর্বপ্রকার মহত্ত্ব যেন অনাবৃতসৌন্দর্যে সকলের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছিল। স্বামী প্রেমানন্দ দুই-একদিন অন্তর বেলুড় হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন তিনি আসিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে শশী মহারাজ তাঁহার হাত-পা টিপিয়া দিয়া সেবা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জন্য সেবককে শুষ্ক মেওয়া দিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ নিঃশেষে উহা খাইয়া চলিয়া গেলে শশী মহারাজ পাত্রটি হাতে লইয়া দেখিলেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা—মনের ভাব, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। কিছুই

নাই দেখিয়া সেবককে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে, তিনি প্রেমানন্দকে যথেষ্ট ফল না দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অতঃপর শূন্য পাত্রটি তিনি মুছিয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন।

চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার তাঁহাকে জানাইলেন যে, অপর একজন ডাক্তার একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহেন। উত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়া পাঠাইলেন, "এ দেহমন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি। তাঁর প্রতিনিধি রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আছেন; তাঁদের নির্দেশ মতো চিকিৎসা যেন হয়। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।"

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্বে সকালে আট-নয়টার সময় তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন; আসন পেতে দে;" সেবক কিছুই না বুঝিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শশী মহারাজ আবার বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর এসেছেন—মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" সেবক আদেশ পালন করিলে শশী মহারাজ কোন অদৃশ্য দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া তিনবার প্রণাম করিলেন এবং পরে বলিলেন, "তাঁরা চলে গেছেন।" শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। শশী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই স্বামী ধীরানন্দ তাঁহাকে আনিতে যান; কিন্তু মা আসিতে পারেন নাই। এক অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা তিনি পরদিন পুলিনবাবুকে বলেন এবং ঐ বিষয়ে একটি গানরচনার অনুরোধ জানাইয়া গিরিশবাবুকে গানের এই প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বলিতে বলেন, "পোহাল দুঃখরজনী।" মহাকবি গান রচনা করিয়া দিলেন এবং সুগায়ক পুলিনবাবুর মুখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুদ্রিতনয়নে আবিষ্টমনে বেহাগরাগিণীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সঙ্গীতটি শুনিলেন—

"পোহাল দুঃখরজনী
গেছে 'আমি'-'আমি' ঘোর কুস্বপন;
নাই আর ভ্রম জীবন-মরণ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়;
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়;
বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয়; মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা;
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি।' "

২১ আগস্ট (৪ ভাদ্র) মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। একটার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। ১টা ১০ মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একটা দিকপাল চলে গেল; দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" আর মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে শোকসভায় নগরবাসীরা সমবেত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন—"দক্ষিণ ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনপাত করিয়াছেন। মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে যে, তাঁহার মহাপ্রয়াণে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাস্যভক্তির এক অপূর্ব অত্যুজ্জ্বল আদর্শ এ যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কি ঠাকুরঘরে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি লোক-ব্যবহারে—সর্বত্র অনন্যসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস। ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করিতেন এবং পুষ্পচয়ন, পূজা, আরাত্রিক, প্রণামাদি প্রত্যেক কার্যে এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে, উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যেও সে গভীর ভাব প্রসারিত হইত। একদা এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, পূজান্তে তিনি ঠাকুরকে নিবিষ্টমনে পাখা করিতেছেন এবং গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিতেছেন—'সৎ গুরু', 'সনাতন গুরু', 'পরম গুরু'। দীর্ঘকাল যাবৎ যদিও পূজারির দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি আকৃষ্ট হইল না, তথাপি ভদ্রলোকের অন্তর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অতএব ভাবভঙ্গ না করিয়াই তিনি উদ্দেশে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। আরাত্রিকের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন 'জয় গুরু' উচ্চারণপূর্বক দীপারতি করিতেন, তখন দর্শকের হৃদয়েও ভক্তির হিল্লোল উঠিত, আর সে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তিনি অসীম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মাদ্রাজের অসহ্য গরমে স্থূলকায় শশী মহারাজের কষ্ট হইত; কিন্তু ইহার প্রতিকার ছিল অপরাহ্নে ও রাত্রে পাখা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করা। ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন তিনি কিছু গ্রহণ করিতেন না। বহুমূত্র-রোগের সময় ডাক্তাররা রুটি খাইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে রুটি নিবেদন করা হয় না বলিয়া তাঁহার উহা খাওয়া হইল না। মঠের নূতন বাড়ি হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই ছাদ ফাটিয়া বর্ষার জল পড়িতে লাগিল। একরাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ঠাকুরের শয়নঘরে যাইয়া রামকৃষ্ণানন্দ দেখিলেন, তাহার উপর জল পড়িতেছে। সেই সময়ে স্থানান্তরিত করিলে পাছে ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে তিনি সারারাত্রি উপরে ছাতা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন এবং ভোরে বৃষ্টির বিরাম

হইলে ঠাকুরকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। ইহাই কি 'মৃন্ময়ে চিন্ময়দর্শন?' একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া রামকৃষ্ণানন্দ দেখিলেন, মশারির মধ্যে মশা ঢুকিয়াছে। তখনই মনে হইল, ঠাকুরেরও তো ঐরূপ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; অতএব সেখানেই মশা তাড়াইতে চলিলেন। প্রসাদবিতরণে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল; সমাগত ব্যক্তিকে উহার কিছু না কিছু তিনি অবশ্যই দিতেন—এমনকি, মুটে-মজুর পর্যন্ত উহাতে বঞ্চিত হইত না।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূজার আকারেই আত্মপ্রকাশ করিত। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের জাহাজ মাদ্রাজে নোঙ্গর করিবে জানিয়া শশী মহারাজ তাঁহাদের জন্য পনেরো সের ময়দা কিনিয়া স্বহস্তে নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য প্রস্তুত করিলেন। তখন পাচক বা ভৃত্য ছিল না, রাখিবার সামর্থ্যও ছিল না। অতঃপর ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া কয়েকজন ভক্তের সহিত তিনি নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন কলকাতায় প্লেগের আশঙ্কা ছিল বলিয়া জাহাজের কাহাকেও নামিতে বা কাহাকেও উঠিতে দেওয়া হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, "মহাত্মাদ্বয়ের পদস্পর্শ হইল না; অন্তত তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই—মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে বল।" আর একবার এর্ণাকুলমে জনৈক ভক্তের বাটিতে উপস্থিত হইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানিতে চাহিলেন, স্বামীজী যখন ঐ বাটিতে আসিয়াছিলেন, তখন কোথায় শয়নোপবেশনাদি করিয়াছিলেন। যখন জানিলেন যে, তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন উহাই সেই স্থান, তখন তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ও মস্তকে ধূলি ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহা পবিত্র স্থান।" স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিবার পূর্বেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেই রাত্রে ধ্যানযোগে শুনিলেন, স্বামীজী সুপরিচিত স্বরে বলিতেছেন, "শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মতো ফেলে দিয়েছি।" স্বামীজীর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে (১৯১১ খ্রিঃ, ২৯ জানুয়ারি) তিনি তাঁহার স্মরণে 'অনিত্যদ্রব্যেষু বিবিচ্য নিত্যং' ইত্যাদি যে সংস্কৃত স্তব রচনা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি তাঁহাকে নরহিতার্থ অবতীর্ণ নরাবতাররূপে অভিনন্দন জানাইয়া সর্বশেষে অমর প্রণামমন্ত্র সংযোজিত করিয়াছিলেন—

**নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ-সূরয়ে।**
**সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে ক্লেশহারিণে ॥**

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাদ্রাজ আগমন-উপলক্ষে স্বীয় কক্ষটি তাঁহার উদ্দেশে সুসজ্জিত করিয়া শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ও তাঁর মানসপুত্র

এ ঘরে থাকবেন; আমি প্রবেশপথে হলঘরে থেকে তাঁদের সেবা করব—এর চেয়ে আর অধিক কি চাই?" মহারাজের আগমনান্তে জনৈক ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন স্বামীজীর বক্তৃতাদি হবে কি?" তখন সহাস্যবদনে শশী মহারাজ জানাইলেন, "বক্তৃতায় আছে কি? এঁর মতো মানবের দর্শন-স্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয়।" ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজ মঠে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণানন্দ প্রত্যহ আরাত্রিকের পর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারী ও অপর সকলের মনে এই বিশ্বাস অঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, মহারাজের সেবার দ্বারা ঠাকুরেরই সেবা করা হয়। জনৈক ভক্ত একদা ঠাকুরের জন্য কিছু ফল ও ফুল আনিলে রামকৃষ্ণানন্দ উহা মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটিকে পরে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুরই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন। একবার তিনি নবাগত একজন সাধুকে বলিয়াছিলেন, "শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বৎসর কাটাও, তাহলে সাধুজীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।"

শশী মহারাজ বাহিরের সৌন্দর্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্তরের সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য সূর্যের শোভা কেহ তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর সৃষ্টির নহে।" হিমালয় সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "হিমালয় কি?—পাহাড়ের উপর পাহাড় স্তূপীকৃত! ... পৃথিবীতে দর্শনযোগ্য এমন কি আছে? ঈশ্বরই এই বিশ্বে একমাত্র দর্শনীয় বা চিন্তনীয়।" আর ছিল তাঁহার বিনয় ও ঈশ্বরনির্ভর। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ব্রহ্মানন্দজীকে মাদ্রাজে আনিবার জন্য পুরীধামে যাইতেছিলেন, তখন গাড়িতে তাঁহার জন্য আসন সংরক্ষিত হয় নাই। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় এক প্রকোষ্ঠে উপরের একটি আসন পাওয়া গেল। ঐ কামরার নিচের আসনদ্বয়ে দুইজন ইংরেজ ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার স্থূলতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধ ও সরহস্য সমালোচনা করিতে থাকিলেন, যেন এইরূপ স্থূলকায় একজন উপরের আসন গ্রহণ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। স্টেশনে উপস্থিত দেবমাতা ইহাতে প্রতিবাদ করিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "তুমি ভেবো না, জগদম্বাই আমায় দেখবেন।" এদিকে যাত্রার সময় অতীত হইলেও ট্রেন ছাড়িল না; শোনা গেল, ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়াছে, যাত্রীদিগকে গাড়ি বদলাইতে হইবে। নূতন গাড়িতে রেলকর্মচারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর নিচের আসন স্থির করিয়া দিলে তিনি তথায় উপস্থিত দেবমাতাকে সহাস্যে বলিলেন, "আমি তোমায় বলেছিলাম না, মা-ই আমার সব সুখ-সুবিধা করে দেবেন?"

তিনি সহজে কাহারও দোষগ্রহণ করিতেন না। মাদ্রাজে জনৈক ধনবান ব্যক্তি কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উহা আনিবার জন্য তাঁহাকে বহুবার ধনীর গৃহে যাতায়াত করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। সঙ্গী জনৈক ভক্ত ইহাতে ধনীর প্রতি রুষ্ট হইলে তিনি অম্লানবদনে কহিলেন, "আমরা আমাদের কর্তব্য করছি মাত্র।" শেষ যেবারে ভদ্রলোক স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, "আপনারা আর আসবেন না, যদি পারি কিছু পাঠিয়ে দেব," সেবারে সঙ্গীর ক্রোধ চরমে উঠায় তাঁহার মুখ রক্তিম হইল। পরন্তু পথে আসিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "ভেতরে যদি আমরা ক্রোধ পোষণ করি, ওর অনিষ্ট হবে; অর্থ না দেওয়াতে আমাদের মনে যেন তার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না জাগে।" একবার এক ভদ্রলোক তাঁহাকে ও একজন ব্রহ্মচারীকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে উভয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহস্বামী অনুপস্থিত। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া সলজ্জভাবে যখন বলিলেন যে, নিমন্ত্রণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কোন আয়োজন হয় নাই, অদোষদর্শী রামকৃষ্ণানন্দ তখন তাঁহার দ্বারা বাজার হইতে কিছু খাদ্য আনাইয়া উহাই গ্রহণপূর্বক অম্লানবদনে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বহির্গমনের সুযোগে দেবমাতা একবার তাঁহার গৃহ পরিষ্কার করিয়া ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিলেন। মঠে ফিরিয়া তিনি যখন অনুসন্ধানানন্তর ইহা দেবমাতার কার্য বলিয়া জানিলেন, তখন সন্তুষ্ট না হইয়া বরং এই বলিয়া দেবমাতাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য শয্যা বা বস্ত্রাদি নারীর স্পর্শ করা অনুচিত—স্ত্রীলোক ভক্ত হইলেও সন্ন্যাসী তাহার নিকট কোন ব্যক্তিগত সেবা লইবে না। অর্থসম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ সাবধান ছিলেন—তিনি উহা স্পর্শ করিতেন না, তাঁহার প্রতিভূস্থানীয় অপরে অর্থগ্রহণ বা ব্যয়াদি করিত।

মঠে যোগদান-জন্য যেসব যুবক আসিত তাহাদের প্রতি একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সদয়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রে সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য তিনি ছিলেন কঠোর। জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি একদিন আন্দামানের একখানি পত্রে 'পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ' এই ঠিকানা লিখিতে বলিলে সন্ন্যাসী শুধু 'পোর্ট ব্লেয়ার' লিখিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লেখকের সমুচিত শাস্তিবিধান করিলেন। কিন্তু পরদিনই মঠে পাকা আম আসিলে যখন সর্বোত্তম আমটি পরিবেশক তাঁহার পাতে দিল, তখন তিনি উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বা, বেশ মিষ্টি" এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা উক্ত সন্ন্যাসীর পাতে তুলিয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু বা গুরুতুল্য ব্যক্তির নির্দেশ

পালন না করিলে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি হয় না—এই জন্যই পূর্বদিন তাঁহার কল্যাণার্থ তিনি ক্রোধ করিয়াছিলেন। একটি যুবক ভবঘুরে বৈরাগীর দলে যোগ দিবার পর দুর্ব্যবহারে জর্জরিত হইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আশ্রয়ভিক্ষা করে। তিনি আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু সে দিন কয়েক পরেই পূর্বাভ্যাসবশত অনুমতি ব্যতিরেকেই অন্যত্র চলিয়া গেল। পুনর্বার পূর্বেরই ন্যায় আশ্রমে আসিয়া ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে আবার সুযোগ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ স্নেহের স্পর্শে যুবকটির মতিগতি পরিবর্তিত হইল এবং সে সুসংযত সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নবাগতদের অন্তর দেখিতেন, শুধু বাহিরের আচরণে ভ্রান্ত হইতেন না। নবাগত এক যুবককে মঠের সকলেই ভালবাসিতেন। তিনি তাহাকে স্নেহ করিলেও তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে সকলেই অবাক হইতেন। অবশেষে একদিন সে মঠ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি মনোভাব খুলিয়া বলিলেন, "ছেলেটা তমোগুণী। সে উপোস করে লুকিয়ে খায় আর ধ্যানের নাম করে মাদুর পেতে ঘুমায়। মন মুখ এক না হলে ধর্মপথে উন্নতি হয় না।" এক নবীন সাধু পূর্বাশ্রমে মাতৃদর্শনে যাইয়া বাড়ি হইতে কিছু নূতন বস্ত্র ও একখানি সিল্কের চাদর লইয়া আসেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে ঐ সকল ফেলিয়া দিতে বলেন; কারণ স্বগৃহের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসীর মনকে বিজড়িত রাখা অন্যায়।

তাঁহার নিজজীবনও সর্ববিষয়ে বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সকালে তিনি গীতা ও বিষ্ণু-সহস্রনাম নিয়মিত পাঠ করিতেন। স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তীর্থভ্রমণকালে মঠের বাহিরে গিয়া প্রথম রাত্রিতেই তিনি দেখিলেন যে, গ্রন্থ দুইখানি আনা হয় নাই। অমনি একজনের সাহায্যে তখনই বই দুইখানি সংগ্রহ করাইলেন। তিনি সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং অপরেও উহাতেই মগ্ন থাকুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত চেষ্টা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন দেবমাতাকে লইয়া তিনি বাঙ্গালোরে যান তখন দেবমাতার অসুখ হইলে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পুরাণাদি কথা শুনাইতেন। তখন তাঁহারা মহীশূররাজের অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। একদিন জনৈক রাজকর্মচারী আসিয়া ভগিনী দেবমাতার সহিত নানা বিষয়ে গল্প জুড়িয়া দিলেন। এদিকে শশী মহারাজ কি এক অস্বস্তিতে অবিরাম উসখুস করিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া দেবমাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অসুস্থ বোধ কচ্ছেন?" তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "আমি ভালই আছি; কিন্তু তোমাদের আলোচনা আমার আদৌ ভাল লাগছে না।" সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এই স্বাভাবিক বিরক্তিতে আগন্তুক ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ না হইয়া প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন।

উপদেশগ্রহণ বা শাস্ত্রব্যাখ্যাদি শ্রবণার্থ আগত ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি থাকিত এবং জিজ্ঞাসুসমুচিত ব্যবহারে ত্রুটি হইলে তৎক্ষণাৎ উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। জনৈক আগন্তুক মঠে আসিয়া একদিন সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "রেখে দাও তোমার কাগজ-পড়া। এসব পড়ার জায়গা তো ঢের আছে। মঠে এসেছ, এখন ভগবানের চিন্তা কর।" ধর্মপিপাসুদের কোনপ্রকার দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি লটারিতে কিছু অর্থলাভ করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা মঠের সাহায্যে দান করিতে চাহিলে উহা তিনি গ্রহণ করিলেন না। নিন্দনীয় উপায়ে লব্ধ অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করা তাঁহার মতে গর্হিত ছিল।

পরধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল। বাইবেল তিনি অতি মনোযোগসহকারে অধ্যয়নপূর্বক উহার সমস্ত ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাইবেল-ব্যাখ্যাকালে প্রতি বাক্যে এত তেজ ও ভাব অনুস্যূত থাকিত যে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ হইতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্ন্যাসী বলিয়া সুপ্রথিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনেক ক্ষেত্রে গির্জায় গিয়া বেদির সম্মুখে খ্রিস্টানী রীতিতে নতজানু হইয়া প্রার্থনাদির দ্বারা মাদ্রাজবাসীকে চমৎকৃত করিতেন। এক সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টিতে আক্রান্ত কতিপয় মুসলমান ছাত্র মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাদের সহিত মহম্মদের বাণী লইয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আরম্ভ করিলেন যে, ছাত্রেরা উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি সন্ধ্যায় ঐ বিষয়ে আরও আলোচনা শুনিতে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। উহার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রণীত 'রামানুজচরিত' তাঁহার প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বঙ্গভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুত রামানুজ ও তাঁহার শ্রীসম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহাই উক্ত ভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজিতে যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'Universe and Man' (বিশ্ব ও মানব), 'Sri Krishna the Pastoral and King-maker' (রাখাল ও নৃপতিস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ), 'The Soul of Man' (মানবাত্মা) ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের আলোচনা, দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা এবং তৃতীয় পুস্তকে মানবের স্বরূপ আলোচনা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দীর্ঘজীবী ছিলেন না—উনপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই

তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনের মূল্য শুধু দীর্ঘতার পরিমাপে স্থিরীকৃত হয় না। বিশেষত অধ্যাত্মজগতে সময় অপেক্ষা ভগবদনুরক্তির গভীরতাই অধিক আদরণীয়। শশী মহারাজের জীবনে প্রতিভা ও অনুভূতি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাই এই অমর জীবন চিরপ্রেরণা প্রদান করিবে।

# স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দের পূর্ব নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্র উত্তর কলকাতার ২১নং নিমু গোস্বামী লেনে বাস করিতেন। ইংরেজিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রসিকলালের প্রথমা পত্নী বিহারীলাল নামক একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হন। এই পুত্র দুর্ভাগ্যক্রমে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও স্বীয় সহপাঠী কালীচরণ ব্যানার্জী প্রভৃতির প্ররোচনায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে বিপত্নীক রসিকলাল নয়নতারা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণা নয়নতারা মা কালীর নিকট একটি পুত্রসন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়া ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর মঙ্গলবার (১২৭৩ সালের ১৭ আশ্বিন, কৃষ্ণা নবমী তিথিতে) কালীপ্রসাদকে লাভ করেন। সন্তানটি আঙ্গিনাতে প্রসূত হয়। নবজাত পুত্র সর্বাঙ্গে নাড়ীবিজড়িত হইয়া যেন পদ্মাসনে মৃতপ্রায় বসিয়া ছিল। অবশেষে চক্ষে লঙ্কাচূর্ণ দিলে সে কাঁদিয়া উঠিল। মা কালীর প্রসাদে লব্ধ তাঁহার নাম হইল কালীপ্রসাদ।

মাত্র দেড় বৎসর বয়সে আমাশয়রোগের আক্রমণে কালীপ্রসাদের প্রাণসংশয় হইয়াছিল। ভগবৎকৃপায় কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতেখড়ি হয় এবং যথাসময়ে তিনি লাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় প্রবেশপূর্বক দুই বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর আহিরীটোলায় যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের পরে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। মেধাবী, ধীর ও শান্তস্বভাব কালীপ্রসাদ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন এবং কখনও কখনও ডবল প্রমোশনও পাইতেন।

পাঠাভ্যাসকালে কালীপ্রসাদ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ সামান্য শিক্ষাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি হাতিবাগান টোলে হেরম্ব পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক তাঁহার সংস্কৃতানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি 'ছন্দোমঞ্জরী' পড়িতে দেন। বলা

বাহুল্য যে, বাল্যের এই ছন্দোজ্ঞানের ফলেই তিনি পরবর্তী কালে বহু সুললিত সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কালীপ্রসাদের মনে পণ্ডিত ও দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। দৈবক্রমে চৌদ্দ বৎসরের বালক কালীপ্রসাদ পিতার পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানি গীতা পাইয়া উহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং চূড়ামণি মহাশয়ের পরামর্শানুসারে পাতঞ্জল যোগসূত্র পড়িবার উদ্দেশ্যে কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। কর্মব্যস্ত বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে স্নানের পূর্বে তৈলমর্দনকালে আসিয়া যোগসূত্রের মর্ম শুনিয়া যাইতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ ইহাতেই সম্মত হইলেন এবং যোগসূত্রপাঠান্তে ঐ ভাবেই 'শিবসংহিতা'ও পাঠ করিলেন। যোগশাস্ত্রপাঠে তিনি জানিলেন যে, উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগাভ্যাস করা আবশ্যক। তদনুসারে গুরুর সন্ধানে মন আকুল হইয়াছে এমন সময় সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহে তিনি (সম্ভবত ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে) একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। পথ অজ্ঞাত। অনেক দূর চলার পর যখন জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তখন আবার বিপরীত দিকে হাঁটিয়া দ্বিপ্রহরে কালীবাড়ির উত্তরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমপূর্বক বেলতলা ও পঞ্চবটীর পার্শ্ব দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কলকাতায় গিয়াছেন, রাত্রে ফিরিবেন। অগত্যা তিনি হতাশমনে ক্লান্তদেহে পরমহংসদেবের গৃহের উত্তরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় আর একজন যুবক সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইনিই শশী বা পরবর্তী কালের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শশীর সঙ্গলাভ করিয়া কালীপ্রসাদের বিশেষ সুবিধা হইল। কালীবাড়ির কর্মচারীদের সহিত পরিচয় থাকায় শশী উভয়ের জন্য প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন এবং পরমহংসদেবের কথাপ্রসঙ্গে সময়ও সুন্দর কাটিয়া গেল।

রাত্রি নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুর সহিত ফিরিয়া নিজকক্ষে ক্ষুদ্র শয্যাটিতে উপবেশন করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে আহূত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া জানাইলেন, "আমার যোগসাধনার ইচ্ছা আছে। আপনি আমায় শিখাবেন কি?" পরমহংসদেব এই প্রশ্নে স্বল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তোমার এই অল্প

বয়সেই যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে—এ অতি ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে। কিন্তু তোমার একটু বাকি ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমায় যোগশিক্ষা দেব। আজ বিশ্রাম কর; কাল এসো।" অনুরাগের নবোদয়ে বিনিদ্ররজনী-যাপনান্তে কালীপ্রসাদ পরমহংসদেবের আহ্বানে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীগুরুসকাশে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছেন এবং যোগশাস্ত্রের সহিত পরিচিত আছেন। তৎপরে তিনি সানন্দে কালীপ্রসাদকে উত্তরের বারান্দায় লইয়া গিয়া একখানি তক্তপোশে যোগাসনে বসাইলেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল হইতে শক্তিকে উর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার শক্তিকে আকর্ষণপূর্বক অধোদিকে নামাইয়া দিলে তিনি বাহ্যভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং ধ্যানে যে সব দর্শনাদি হয় তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন; অধিকন্তু কালীপ্রসাদকে অবিবাহিত জানিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ কালীমন্দিরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানান্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বিদায়কালে ঠাকুর তাঁহাকে মিষ্টি প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "আবার এসো। যদি পয়সা জোগাড় না হয়, তবে এখান হতে দেওয়া হবে।" সেদিন এক ভদ্রলোক গাড়ি করিয়া কলকাতায় ফিরিতেছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে তিনি কালীপ্রসাদকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন।

বাড়িতে আসিয়া ঠাকুরের উপদেশানুসারে কালীপ্রসাদ প্রত্যহ সকাল ও রাত্রিতে ধ্যান করিতে এবং ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া স্বীয় অনুভূতি নিবেদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বভাবত পড়াশুনায় অমনোযোগ আসিল ও বাড়ির লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা বাধা দিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ কিন্তু তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া সাধনায় রত থাকিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে গমনাগমনের ফলে তাঁহার অনেক ভক্তের সহিত পরিচয় ঘটিল এবং ঠাকুরের বিবিধ সেবার সুযোগ পাইয়া তিনি ধন্য হইলেন। ঠাকুর ঝাউতলায় গমনকালে অনেক সময় তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া চলিতেন, আবার কখনও কখনও ঐ ভাবে ভ্রমণকালে অনেক উচ্চ তত্ত্ব শিখাইতেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তদের বাড়ি যাইয়া সদালোচনা করিতেও উপদেশ দিতেন। একদিন কালী দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিবেদন করিলেন যে, ধ্যানে তিনি ঈশ্বরের সর্বতঃপ্রসারী চক্ষুর্দ্বয় দর্শন করিয়াছেন। অপর একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি অনুভব করিলেন যেন, পরমহংসদেব জগন্মাতারূপে তাঁহাকে স্তন্যপান করাইতেছেন। অন্যদিন রাত্রে ধ্যানকালে তিনি বোধ করিলেন, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া উর্ধ্বলোকে চলিয়াছে। বহু মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটি সুন্দর

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় সর্বধর্মের প্রতীক ও মূর্তবিকাশ রহিয়াছে। সেই প্রাসাদের এক বিরাট কক্ষে প্রবেশান্তে দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে বেদিতে বিভিন্ন ধর্মের দেব, দেবী ও অবতারগণ বসিয়া আছেন; আর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে সব দেব, দেবী ও অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে একীভূত হইলেন। এই সমস্ত শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল; এখন হতে তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবি না।"

কালীপ্রসাদ যে শুধু দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের দর্শনে যাইতেন তাহাই নহে; ঠাকুর কলকাতায় ভক্তগৃহে আসিলে তিনিও সেখানে মিলিত হইতেন। এইরূপে তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর উদ্যানে গিয়াছিলেন; ৩ জুলাই রথযাত্রার দিনে বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে রামবাবুর কলকাতার গৃহে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শেষোক্ত দিনে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার আদেশে নিরঞ্জনের সহিত নরেন্দ্রনাথকে ডাকিবার জন্য নরেন্দ্রভবনে গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই ঠাকুরের গলার ব্যথা আরম্ভ হইল—ঢোক গিলিতে, আহার করিতে, কথা বলিতে কষ্ট হয়, আর গয়ারে দুর্গন্ধ। গোলাপ-মা বলিলেন, "কলকাতার দুর্গাচরণ খুব বড় ডাক্তার; তাঁকে দেখালে রোগ সেরে যেতে পারে।" বালকস্বভাব ঠাকুর উহাতেই রাজি হইলেন। কালীপ্রসাদ সেই দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপনান্তে পরদিন প্রাতে লাটু ও গোলাপ-মার সহিত নৌকারোহণে পরমহংসদেবকে ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরাইয়া আনিলেন। ঐ বৎসর ঠাকুর যেদিন পানিহাটির মহোৎসবে যান, কালী সেদিনও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন এবং মহোৎসবান্তে নৌকাযোগে একই সঙ্গে সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পর শ্যামপুকুর। লাটু ও কালী সেবক হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের প্রথমভাগে কলকাতায় আসিলেন এবং দিন সাতেক বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া ৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে গেলেন। কালী তদবধি গৃহসম্পর্কশূন্য হইয়া পরমহংসদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্যামপুকুরের পর তিনি ঠাকুরের সহিত কাশীপুরে চলিলেন (১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫)। এখানে পরমহংসদেবের আদেশে নরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকের কার্যক্রম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কালী দুই ঘণ্টা দিনে ও দুই ঘণ্টা রাত্রে সেবা করিতেন। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া গাড়ি-বারান্দার ছাদের উপর রৌদ্রে জলচৌকিতে বসাইয়া স্নান করাইতেন এবং ঐ সুযোগে শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনিতেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রের প্রভাবে কালীর ভাবধারা কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল আমরা তাহার বিবরণ 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম। "আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন-চারি জন স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে।...দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন; সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার তামাক সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটির দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অদ্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক তো।' ইতোমধ্যে তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাঁহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই-এক মিনিট কাল ঐ ভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'ব্যস, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি?' অভেদানন্দ—'ব্যাটারি ধরলে যেমন কি-একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।'...পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐ কালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাঁহাকে ইতঃপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। ... রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর ডাকিতেছেন।' শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটির দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কিরে? একটু জমতে না জমতেই খরচ?...ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল। ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল। ...যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।' ফলে দেখা গেল, অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখনও কখনও সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল।"[১]

---

১ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী শংকরানন্দ-প্রণীত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' গ্রন্থে (৪৭ পৃঃ) মূল ঘটনা স্বীকৃত হইলেও এই ভাবসঞ্চারণ অস্বীকৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিবেকানন্দ স্বামীজী তখনও ঐরূপ শক্তি অর্জন করেন নাই—প্রত্যুত ঐ সময়ে শুধু কুণ্ডলিনীর জাগরণে ঐরূপ কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কালী একবার ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব মানা করিলেও তিনি "আত্মা কাহাকেও মারেন না, কাহারও দ্বারা হতও হন না।" ইত্যাদি গীতাবাক্য আবৃত্তি করিয়া নিজ কার্যের সমর্থন করিলেন। অতঃপর একদিন ঠাকুর শয্যায় শয়ন করিয়া কালীর সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বিষম যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখ, বাইরে ওকে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে বারণ কর; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" কালী সেদিন প্রকৃত বেদান্তানুভূতির মর্ম বুঝিলেন। কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাত তত্ত্বের অনুভূতিক্ষেত্রে আত্মলাভ করা সময়সাপেক্ষ। তাই 'অষ্টাবক্রসংহিতা'-পাঠে কালীকে নেতিপরায়ণ দেখিয়া বুড়োগোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "কালী নাস্তিক হয়ে গেছে, কিছুই মানে না।" তারপর ঠাকুর কালীকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস?" কালী নির্বাক! কিন্তু ক্রমে তিনি জানাইলেন যে, তিনি ঈশ্বর, শাস্ত্র, লোকাচার কিছুই মানেন না। ঠাকুর তাঁহার সরল ও নির্ভীক উত্তরে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "একদিন তুই সব মানবি! তুই একঘেয়ে হোসনি—আমি একঘেয়ে ভালবাসি না" অবশেষে সেবা করার সুযোগে কালী একদিন ঠাকুরের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" পরে ধ্যানযোগে তিনি একদা ঐ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া ঠাকুরের নিকট সবিশেষ জানাইলে তিনি বলিলেন, "এই ঠিক ঠিক জ্ঞান।" ইহার পর কালীর মন হইতে নাস্তিকতা চিরতরে বিদূরিত হইল।

কাশীপুরে কালীর বৈরাগ্য একবার বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ঠাকুর সেদিন বলিলেন, "আজ তোর বাবা এসেছিল, বল্লে তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তা আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুই বাড়ি গিয়ে থাক।" কালী আদেশপালন করিয়া বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে পিতা-মাতার নিকট প্রচুর আদরযত্নও পাইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণেই যেন মনে হইল—এই বিজাতীয় আবহাওয়ায় তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বাধ্য হইয়া একরূপ দৌড়াইয়াই কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে এত শীঘ্র স্বসকাশে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই বাড়ি যাসনি?" কালী সব খুলিয়া বলিলে ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছিস।"

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সন্ন্যাসিবেশে কাশীপুরে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি গয়াধামের নিকট বরাবর পাহাড়ের এক গুহায় একজন হঠযোগী সাধু দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হঠযোগশিক্ষায় উৎসুক কালী কাহাকেও না জানাইয়া

একাকী গয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গয়া স্টেশনে নামিয়া নগ্নপদে দীর্ঘ পাহাড়ি সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের নিচে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে শিবমন্দিরের ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিলেন। ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে বিরজাহোমের মন্ত্র ও পুরীনামা সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের পরিচায়ক 'মঠ' 'মড়ি' প্রভৃতি সংকেতগুলি লিখিয়া লইলেন। অবশেষে হঠযোগীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলে গ্রামবাসীরা নিষেধ করিল; কারণ আগন্তুক দেখিলেই হঠযোগীর চেলা পাথর ছুঁড়িয়া মারে। ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া কালী সন্তর্পণে চলিয়া অকস্মাৎ একেবারে যোগী ও তাঁহার চেলার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমত যোগী ও শিষ্য তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার সন্ন্যাসোচিত পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে শিক্ষার্থী জানিয়া থাকিতে দিলেন। কালী কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারা অঘোরপন্থী এবং যোগসম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান নাই; সুতরাং তিনি ফিরিবার চেষ্টায় রহিলেন। এদিকে যোগী এমন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া ছাড়িতে চাহেন না। তখন কালী জল আনিবার ভান করিয়া কলসীহস্তে গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং দূরে গিয়াই কলসী পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতপদে নিচে নামিয়া গেলেন। অবশেষে কাশীপুরে ফিরিয়া ঠাকুরকে সবই জানাইলেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধ যোগী যে যেখানে আছে আমি সব জানি। চার খুঁট ঘুরে আয়; কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস এমনটি আর কোথাও পাবিনি।" অতঃপর মাস্তুলের পাখির দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তুলনা না করিলে প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায় না।

কাশীপুরে নরেন্দ্রের সহিত তারক, কালী প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতেন ও গ্রন্থাদি পড়িতেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধু অঘোরনাথ প্রণীত 'বুদ্ধচরিতে' 'ললিত-বিস্তরের' যেসব শ্লোক উদ্ধৃত ছিল, কালী তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথায়' (১৯৭ পৃঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—"একদিন তো কালী-ভাই ঠাকুরকে বুদ্ধদেবের কথা জিগগেস করলে। কালীভায়ের তখন ধারণা ছিল যে, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানতেন না। একদিন তাই নিয়ে খুব তর্ক হল। তাতে তিনি (ঠাকুর) বল্লেন, 'বুদ্ধদেব নাস্তিক কেন হবে গো। তিনি যে স্বরূপকে দেখেছিলেন, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা'।" যাহা হউক, বুদ্ধের আলোচনায় মত্ত কালী একবার নরেন্দ্র ও তারকের সহিত বুদ্ধগয়ায় গমনপূর্বক তিন-চারি দিন তপস্যায় কাটাইয়া আসিলেন (শিবানন্দ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

কালীর সর্বদাই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তিনি পরমহংসদেবের সেবার অবসরকালে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতা শুনিতে

যাইতেন এবং কাশীপুর উদ্যানে বসিয়া ইংরেজ পণ্ডিতদের ধর্ম, ন্যায় ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্তলীলা-সমাপনান্তে ১৫ ভাদ্র শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দাদির সহিত কালী বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় অবস্থানের সুযোগে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে বৃন্দাবনপরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রায় একুশ দিন পরে পরিক্রমা শেষ হইল। অতঃপর কলকাতায় ফিরিয়া তিনি বরাহনগর মঠে উঠিলেন।

মঠের একটি ছোট ঘরে বাস করিয়া কালী মহারাজ অধিকাংশ সময় ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কাটাইতেন। তাই ঐ ঘরটির নাম হইয়াছিল 'কালী-তপস্বীর ঘর'। এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তোত্ররচনায়ও মন দিয়াছিলেন। ফলত তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনই এই সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, জুতা পরিতেন না, নিমন্ত্রণে যাইতেন না, কাহারও সহিত মিশিতেন না এবং গীতা ও উপনিষদাদির এক-একটি শ্লোকের উপর দিনের পর দিন ধ্যান করিয়া উহার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিতেন। তিনি আহারের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া শশী মহারাজ দরজায় ধাক্কা দিয়া ও ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে আহারে প্রবৃত্ত করিতেন। অতঃপর বরাহনগর মঠে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল স্বামী অভেদানন্দ। সন্ন্যাসের পরেও তাঁহার তপস্যাদি সমভাবেই চলিতে থাকিল। একদিন মধ্যাহ্নের পরে মাস্টার মহাশয় আসিয়া দেখিলেন, বারান্দায় তপ্ত ধূলির উপর অভেদানন্দের দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "কালী মঠের কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছে।" যোগানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "ও কি মরে? ঐ শালা অমনি করে ধ্যান করে।"

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের পরে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সহিত কালী মহারাজ পুরীধামে যান এবং এমারমঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বৈষ্ণববাবাজীদের পরিত্যক্ত এক গুহায় তিনি কিছুদিন ধ্যান করিয়াছিলেন। ছয় মাস ঐ অঞ্চলে কাটাইয়া তাঁহারা ভাদ্রমাসে বরাহনগরে প্রত্যাগমন করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বামী অভেদানন্দ ও অদ্ভুতানন্দ একবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নবীন সন্ন্যাসীদের আদর্শ ও প্রবীণদের ভাবধারা লইয়া এক তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হয়। রামবাবুর বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিলেই সব হইল, শাস্ত্রাভ্যাসাদি নিষ্প্রয়োজন; আর নবীনদের মুখপাত্ররূপে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিয়া ধ্যানভজনাদি তো করিতেই হইবে; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শাস্ত্র ও মতবাদের সহিতও

পরিচয় আবশ্যক। এই বিষয় লইয়া পরে অভেদানন্দকে ভক্তমহলে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইলেও তিনি বিচলিত হন নাই। ফলত মঠস্থাপনের প্রথমাবস্থায় তাঁহাদিগকে এরূপ বহু প্রতিকূল ভাবের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ এবং অপর কোন কোন গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যান। সেখানে অভেদানন্দের মনে উত্তরাখণ্ড গমনের অভিলাষ জন্মে এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। উভয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া নগ্নপদে চলিলেন। অভেদানন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল—অর্থ স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জুতা বা জামা পরিবেন না, কাহারও বাড়িতে নিদ্রা যাইবেন না এবং তিন অথবা পাঁচ বাড়িতে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিয়া একাহারে থাকিবেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা গাজীপুরে পৌঁছিয়া পওহারী বাবার সহিত আলাপাদি করিলেন। এখানে হরিপ্রসন্নবাবুর (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তাঁহারা অযোধ্যা, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগাদি তীর্থভ্রমণান্তে বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ৺বদরীনারায়ণ দর্শনান্তে কেদারনাথে চলিলেন। এখানে এক পর্বতগুহায় কিয়দ্দিবস একাকী তপস্যা করিয়া অভেদানন্দ মহারাজ এক উদাসী সাধুর সহিত গোমুখী যাত্রা করেন। গোমুখীদর্শনান্তে তিনি আবার উত্তরকাশী হইয়া যমুনোত্রী যান এবং তথা হইতে দেরাদুনের পথে হৃষীকেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হৃষীকেশে অবস্থানকালে তিনি ঝুপড়িতে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং ধনরাজ গিরির নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ধনরাজ গিরি পরে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, "অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা!" দৈবক্রমে স্বামী অভেদানন্দ অচিরেই ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তখন স্বামী সারদানন্দ ও সান্যাল মহাশয় সেখানে ছিলেন; তাঁহারা সেবার ভার লইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুসারে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে গোপনে হরিদ্বারে লইয়া গিয়া কাশীর ট্রেনে তুলিয়া দিলেন (মার্চ, ১৮৯০)।

কাশীতে আসিয়া তাঁহার রক্তামাশয় হইল এবং তিনি ডাক্তার প্রিয়বাবুর বাড়িতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, অধিকন্তু তাঁহার সেবার জন্য একজন গুরুভাই স্বামীজীর নির্দেশে গাজীপুর হইতে তথায় গেলেন। পরে স্বামী সদানন্দ সেবাভার গ্রহণ করেন। কালী মহারাজ আরোগ্যলাভান্তে সদানন্দের সহিত এলাহাবাদে ঝুসীতে যাইয়া তপস্যা করেন। ঐ সময়ে তিনি সদানন্দকে বেদান্ত পড়াইতেন। অতঃপর সম্ভবত জুন মাসে তিনি বরাহনগরে যান।

মঠে তিনি রাতদিন কেবল পড়াশুনা করিতেন। ফুরসত পাইলে নরেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন। তর্কে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তবে একদিন নরেন্দ্রনাথ একটু কোণঠাসা হইয়া বলিলেন, "আজ এই পর্যন্ত, কাল ঠিক এখান থেকে শুরু হবে।" পরদিন নরেন্দ্রনাথ এইরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিলেন যে, অভেদানন্দ হার মানিয়া বলিলেন, "নরেনকে একদিনও যুক্তি দিয়ে হারাতে পারলুম না।" যুক্তিবিচারের ক্ষেত্র যাহাই হউক না কেন, নরেন্দ্রের হৃদয় সর্বদাই অভেদানন্দের প্রতি প্রেমপূর্ণ ছিল। ঐ দারিদ্র্যের দিনে সাধুদিগকে যথেষ্ট কায়িক শ্রম করিতে হইত। কিন্তু কালী মহারাজের অধ্যয়নপ্রবণ মন ঐ সব ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহিত না। ইহাতে কেহ কেহ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে একদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তোদের একটা ভাই যদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে, তো তোদের এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হাণ্ডা আছে; আমি মেজে দিচ্ছি।" ইহার কিছু পরেই স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত স্বামীজী হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং অভেদানন্দও কিছু পরে তীর্থ-ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ তখন বরাহনগর মঠে ছিলেন; তিনি ও অপরেরা তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।[১]

কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, চিত্রকূট, সরযূ, জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গিরণার প্রভৃতি তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ জুনাগড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে পোরবন্দরে শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীজী ঐ অঞ্চলেই আছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে তিনি অবিলম্বে জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মন্‌সুখরাম সুর্যরাম ত্রিপাটী মহোদয়ের ভবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। জুনাগড়ে কিছুদিন একসঙ্গে কাটাইয়া অভেদানন্দ দ্বারকাভিমুখে চলিলেন এবং স্বামীজী বোম্বাইয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারকা ও প্রভাস-দর্শনান্তে অভেদানন্দ মহারাজ জাহাজে বোম্বাই গেলেন এবং তথা হইতে মহাবালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের গৃহে আবার স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুণা, বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণ্য দর্শন এবং তাপ্তী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করিয়া ক্রমে ৺রামেশ্বরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী,

---

১ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা'র (৮৭ হইতে ৯৬ পৃঃ) সহিত এই বিবরণের অমিল আছে জানিয়াও আমরা স্বামী শিবানন্দের ৮/১/৯০ তারিখের পত্র, ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রণীত স্বামী সারদানন্দের জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দের ১৯/২/৯০, ৮/৩/৯০, ১৫/৩/৯০, ৩১/৩/৯০, ১০/৫/৯০, ৪/৬/৯০, ৬/৭/৯০ তারিখের পত্র ও স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'র অনুসরণ করিলাম।

কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি তীর্থদর্শনান্তে মাদ্রাজে জাহাজে উঠিয়া কলকাতায় আসিলেন। তখন মঠ আলমবাজারে উঠিয়া আসিয়াছে।

গুজরাতে ভ্রমণকারী স্বামী বিবেকানন্দ যদিও তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, পাদুকাব্যবহার করা আবশ্যক, তথাপি তিনি এ অঞ্চলে রিক্তপদেই চলিতেন। আহার ও জলপান সম্বন্ধেও তিনি বিরাগী সাধুর ন্যায় উদাসীন ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার পায়ে গিনিওয়ার্ম হয় এবং আলমবাজার মঠে আগমনের পর পা দুইটি ফুলিয়া রোগ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এই রোগে তিনি চারি মাস শয্যাশায়ী ছিলেন এবং সাতবার তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তখন স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা তাঁহার বিশেষ সেবা করিয়াছিলেন। রোগমুক্তির পর এইবারে তাঁহার নিকট মঠজীবন বেশ আনন্দময় ছিল। তীর্থভ্রমণান্তে অনেকেই তখন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মঠের উঞ্ছবৃত্তির অবসান হইয়া কতকটা সচ্ছলতা আসিয়াছিল। নূতন শতরঞ্চিতে বসিয়া রিডিং ল্যাম্পের সাহায্যে পাঠ করা তখন কঠিন ছিল না। স্বামী অভেদানন্দ এই পরিবর্তিত অবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিলেন।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যলাভের পর বিদ্বেষপূর্ণ অনেক স্বদেশ ও বিদেশবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে উহার প্রতিকারকল্পে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময় প্রাণপণ খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন।" এইরূপে কিছুকাল মঠে বাস করিয়া ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের কিছুদিন পরে তিনি পুনর্বার তীর্থ-পর্যটনে নির্গত হন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার জীবনের এক নূতন পর্যায় আরম্ভ হইল—দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি যে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিকাশের সুযোগ ঘটিল। বিদেশে বেদান্তপ্রচারার্থে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ঐ বৎসর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে লণ্ডনে পৌঁছিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাসস্থান উইম্বল্ডনে মিস মূলারের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনে প্রায় একমাস অবস্থানের পর স্বামীজী অকস্মাৎ একদিন জানাইলেন যে, 'খ্রিস্ট-থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'তে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোন পরিবর্তন অসম্ভব। অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন; অথচ স্বামীজী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না জানিয়া তাঁহারই নির্দেশমতো 'পঞ্চদশী'-অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা আয়ত্ত

করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২৭ অক্টোবর তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা হইয়া গেল। উহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং স্বামী অভেদানন্দের ভাবী প্রচারকজীবন যে অতি সমুজ্জ্বল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আর সকলেই বুঝিলেন যে, স্বামীজী লোক চিনিতে পারেন এবং তাহাদিগকে কার্যের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন—"আশ্চর্যো জ্ঞাতা, কুশলানুশিষ্টঃ।"

নভেম্বর মাসে কার্যের সুবিধার জন্য স্বামীজী, অভেদানন্দ ও গুডউইন ১৪নং গ্রে কোর্ট গার্ডেন্‌সে ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া আসিলেন এবং বক্তৃতার জন্য ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে একটি হল ভাড়া লইলেন। স্বামীজী এই গৃহে তিন মাস অবস্থানের সুযোগে অভেদানন্দকে ইংরেজ-জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ শিখাইয়া দিলেন। অভেদানন্দও স্বামীজীর সাহায্যে ডয়সন, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি মনীষীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং স্বামীজীর নির্দেশে লণ্ডন ও নগরোপকণ্ঠে বক্তৃতাদি-সাহায্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন।

স্বামীজীর লণ্ডনত্যাগের পর স্বামী অভেদানন্দ স্টার্ডি মহোদয়ের আবাসে উঠিয়া আসিলেন। স্টার্ডি নিজে নিরামিষাশী ও কঠোরী ছিলেন; অভেদানন্দও উক্ত ভবনে তদনুরূপ জীবনই অবলম্বন করিলেন। তিনি হর্ম্যোপরি একটা উত্তাপহীন ও গবাক্ষশূন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপাধানবিহীন কঠিন শয্যায় শয়ন করিতেন ও নিচের এক কক্ষে অধ্যয়নাদি করিতেন। এই আবাসস্থানকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি হইতে রীতিমত বেদান্তের বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ হইল। পরন্তু লণ্ডনের কার্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। ঐ বৎসর মধ্যভাগে তাঁহার আমেরিকাগমনের আহ্বান আসিল। স্বামীজী তখন ভারতে—এই প্রস্তাবে তাঁহারও সমর্থন ছিল। অতএব লণ্ডনের কার্যপরিচালনার্থে স্বামীজী যে অর্থ রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহার দ্বারা টিকেট কিনিয়া স্বামী অভেদানন্দ ৩১ জুলাই আমেরিকাগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন।

৯ আগস্ট নিউইয়র্কে উপনীত হইয়া তিনি বেদান্তসমিতির সম্পাদিকা মিস মেরি ফিলিপ্‌সের বাড়িতে উঠিলেন। পূর্ব বৎসর লণ্ডনে জাহাজ হইতে অবতরণকালে ঘটনাক্রমে অভ্যর্থনার জন্য আগত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি একাকী গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; নিউইয়র্কেও অনুরূপ অবস্থায় অভেদানন্দ নিজেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাবলম্বনে বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া মিস ফিলিপ্‌সকে অবাক করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কে তিনি প্রথম এক পক্ষকাল নগরপরিদর্শন করিয়া আমেরিকার জীবনের সহিত সুপরিচিত হইলেন। অবশেষে ২৫ আগস্ট বেদান্তসমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকা অবস্থানের প্রথমাবধিই অভেদানন্দ স্বীয় কার্যক্ষেত্রকে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সর্বত্র বিস্তার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। নিউইয়র্কে আসার পথে কাউণ্ট দাদ্‌মারের পত্নীর সহিত তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, সেই পরিচয়ের সুযোগে ২৭ আগস্ট কেরোলিনায় দাদ্‌মার-দম্পতির গৃহে গমনপূর্বক তিনি পাঁচ দিন কাটাইয়া আসিলেন। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী যতিমাতার (মিস ওয়াল্ডোর) গৃহে গমনান্তে তিনটি সন্ধ্যায় ২০/৩০ জন শ্রোতার সম্মুখে বেদান্তালোচনা করিলেন। ১৪ অক্টোবর শ্রীযুক্তা ওলি বুলের কেম্ব্রিজ (মাস)-স্থিত ভবনে যাইয়া সেখানেও পাঁচ দিন থাকিলেন।

স্বামী সারদানন্দ তখন আমেরিকায় ছিলেন। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর স্বীয় কর্মকেন্দ্র বস্টন হইতে নিউইয়র্কে আসিয়া অভেদানন্দের সহিত দেখা করিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা হুইলারের আমন্ত্রণে অভেদানন্দ মন্ট-ক্লেয়ারে উপস্থিত হইলে সেখানেও উভয় গুরুভ্রাতার পুনর্মিলন হইল। এই সুযোগে উভয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত এডিসনের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করেন। উভয় গুরুভ্রাতারই তখন বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকার কার্যের সাফল্যের জন্য নিরামিষাহার অত্যাবশ্যক এবং তাঁহারা ঐরূপই করিতেন।

ইত্যবসরে ২৯ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে যে প্রথম বক্তৃতা দিলেন উহাতে উপস্থিত সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। বক্তৃতান্তে তিনি ব্রুক্‌লিনে যাইয়া যতিমাতার আতিথ্য স্বীকারপূর্বক সেখান হইতেই নিউইয়র্কের কার্য চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই লেক্সিংটন এভিনিউর একখানি বাড়ি সংগৃহীত হওয়ায় তিনি সেখানে চলিয়া আসিলেন। নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহাকে নিয়মিতভাবে মন্ট-ক্লেয়ারেও বক্তৃতা দিতে হইত। মন্ট-ক্লেয়ারে তিনি নরওয়েনিবাসী ও উত্তরমেরু-অভিযানকারী মিঃ নান্‌সেনের সহিত পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে বহুবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হন। ইঁহাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ববিদ মিঃ গেট্‌স্ অন্যতম। এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দ 'রাজযোগে'র ক্লাস করিতে এবং স্বয়ং শুধু দুধ ও ফলমূল খাইতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভায় নিউইয়র্কে বেদান্তপ্রচার ক্রমেই দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। এই কার্যে তিনি উদারচেতা ধর্মযাজক ডাঃ হিবার নিউটনের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। নিউটন তাঁহাকে স্বীয় পুস্তকালয় ব্যবহার করিতে দিতেন, নিজের গির্জার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনের সহিত তাঁহার বিজ্ঞাপন পাঠাইতেন, নিজে বেদান্ত-সমিতির অবৈতনিক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, গির্জায় সমাগত উপাসকদিগকে স্বামী অভেদানন্দের নিকট পাঠাইতেন এবং অপরাপর ধর্মযাজকদের সহিত তাঁহার

আলাপ করাইয়া দিতেন। ইহার পরে তিনি ধর্মযাজক ম্যাক্ আর্থারের সহিতও পরিচিত হন। অচিরেই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাক্সনের সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কার্যের সাফল্যের জন্য এই সকল আলাপ-পরিচয় অতি মূল্যবান হইলেও, স্বামী অভেদানন্দের অনুপম উৎসাহ ও উদ্যমই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিস। স্বীয় প্রচারব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য তিনি কোন কষ্টই গ্রাহ্য করিতেন না; প্রচণ্ড শীতের তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়াও নিয়মিত ক্লাস চালাইয়া যাইতেন।

আবার এই সাফল্যদর্শনে ইহাও সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, বেদান্তপ্রচার সর্বত্র নির্বিবাদেই চলিতেছিল। বস্তুত এই সময়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায় তো তাঁহার বিরোধিতা করিতেনই, শিক্ষিত অথচ ভারতীয় উদার ভাবের সহিত অপরিচিত সমাজও মাঝে মাঝে এই বিরোধিতায় যোগ দিতেন। কিন্তু সত্যের জয় সর্বত্র—অভেদানন্দও গুরুকৃপায় এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই চলিলেন। তাঁহার কার্যপদ্ধতি ছিল সর্বাপেক্ষা অল্প বাধার পথে চলা। এই জন্য তিনি বাইবেল-শাসিত খ্রিস্টান সমাজে ধর্মযাজকদের অতুল প্রভাব আছে জানিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতাস্থাপনকেই স্বীয় সাফল্যের উপায় স্থির করিলেন। কার্যতও দেখা গেল যে, তাঁহার ধারণা অমূলক নহে। ধর্মযাজকদের বন্ধুত্বের সাহায্যে তিনি সহজেই গণ্যমান্য-সমাজে প্রবেশের সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বেদান্তপ্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রচার প্রণালী শুধু বক্তৃতা বা ক্লাস করাতেই আবদ্ধ ছিল না; তিনি বহু ক্ষেত্রে বন্ধুদের বাড়িতে অবস্থানপূর্বক তাঁহাদের প্রীতির সম্বন্ধকে আরও নিবিড়তর করিয়া তুলিলেন। বক্তৃতাতেও বাগ্মিতার প্রতি তাঁহার তেমন দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল যুক্তি ও তথ্য উদ্‌ঘাটনপূর্বক বিশ্বাস-উৎপাদনের প্রতি।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৯৮-এর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সাত মাস সুকঠিন পরিশ্রমান্তে স্বামী অভেদানন্দ তখনকারমত কাজ বন্ধ করিলেন এবং গ্রীষ্মে বিশ্রামলাভের জন্য ওয়াশিংটনে গেলেন। সেখানে অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যাকিন্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ডাঃ জেম্‌সের আমন্ত্রণে কেম্ব্রিজ কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য তথায় গমন করিয়া শ্রীমতী ওলি বুলের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তিনি একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার জেম্‌সের বক্তৃতা শুনেন। জেম্‌স বেদান্তের একত্ববাদ খণ্ডন করিয়া বক্তৃতান্তে অভেদানন্দকে কেম্ব্রিজ কনফারেন্সে একত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে

বলেন। অভেদানন্দ ইহাতে সম্মত হন। কনফারেন্সে বক্তৃতাশেষে প্রশ্নোত্তর হইল; প্রশ্নগুলি জেম্‌সের ছাত্ররাই করিলেন। সভার শেষে জেম্‌স তাঁহার করমর্দনপূর্বক তাঁহার যুক্তিগুলির প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উক্ত ভোজে আরও অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ভোজের প্রায় চারি ঘণ্টা ধরিয়া 'বহুতে একত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং জেম্‌স মহোদয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, একত্ববাদের পক্ষেও প্রবল যুক্তি আছে।

তখনও নিউইয়র্কের বক্তৃতা-কাল আরম্ভ হয় নাই; অতএব অভেদানন্দ এই সুদীর্ঘ অবকাশে বস্টন, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে হুইলার-দম্পতির আমন্ত্রণক্রমে মন্ট-ক্লেয়ারে তাঁহাদের নবপরিণীতা কন্যা ও জামাতাকে আশীর্বাদ করিতে গেলেন এবং তদনন্তর নায়েগ্রা জলপ্রপাত প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়া তৃপ্তিলাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। অবশেষে তিনি বাফেলো শহর হইয়া গ্রীনএকারে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে গীতা ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তখনও তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু বিদেশে উপযুক্ত রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী লিখিয়া পাঠাইলেন, "আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে।" ডাঃ জেম্‌সও তাঁহার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এভাবে এদেশে চলবে না। যখন যে দেশে থাকা যায়, সে দেশের রীতি মেনে চলতে হয়। আপনার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।" এইসব উপদেশের ফলে তাঁহার কঠোরতা কিঞ্চিৎ শিথিল হইল।

গ্রীনএকার ছাড়িয়া তিনি বস্টন (ম্যাস) নগরে গেলেন। উহা দর্শনান্তে রোড-দ্বীপের নিউপোর্ট দেখিয়া ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন। সেই রাত্রেই আবার লঙ্‌ আইল্যাণ্ডের ইস্টহ্যাম্পটনে যাইয়া এপিস্কোপেল চার্চের মাননীয় ধর্মযাজক হিবার নিউটন-এর অতিথি হইলেন। সেখানে সপ্তাহকাল বাসের পর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বপরিচিত অধ্যাপক হার্শেল পার্কারের সহিত হোয়াইট পর্বত-আরোহণে চলিলেন। অতঃপর ৩০ সেপ্টেম্বর প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মিঃ লেগেটের অতিথি হইলেন। লেগেটদের স্টোনরিজের বাড়িতে সতেরো দিন বাস করিয়া তিনি তাঁহাদের নিউইয়র্কের বাড়িতে আসিলেন এবং একটি বোর্ডিং হাউসে বাসস্থান ঠিক করিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার মানসে মিঃ লেগেটের সভাপতিত্বে সংগঠিত বেদান্তসমিতিকে ২৮ অক্টোবর দেশের আইন অনুসারে রেজেস্ট্রি করাইলেন। সমিতির জন্য ২২তম স্ট্রিটের ১০৯ নং পূর্ব এসেম্বলি

হলটি ভাড়া করা হইল। এই হলে প্রথম বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা হইল ১৫৩। অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন—তিনি আমেরিকানদের হৃদয় জয় করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত আমরা স্বামী অভেদানন্দের প্রাথমিক কার্যের একটা ধারাবাহিক ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিলাম। অতঃপর এই প্রবন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হইবে না; কিন্তু পাঠক বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে এতদপেক্ষাও কঠিনতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি বিজয়মণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-শিষ্যা ও পরিচিতদের পূর্ণ সাহায্য পাইলেও নিজের উদ্যমে বহু নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে আহারাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইলেও তিনি সর্বদা সর্বত্র সসম্মানে আহূত হইতেন এবং অতি সম্ভ্রান্তপরিবারেও সাদরে গৃহীত হইতেন। তিনি প্রচারকার্যের জন্য সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য লইতেন। আর তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কবি, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, পর্বতারোহক ইত্যাদি। এইরূপে ঘরোয়া আলোচনা, ক্লাস, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সাহায্যে তিনি স্বামীজীর প্রবর্তিত বেদান্তপ্রচারকে বহুবিস্তৃত করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা এত সুন্দর হইতেছিল যে, উহা দুই বা ততোধিক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হওয়ায় জনৈক শ্রোতা নিজব্যয়ে উহার ২০০০ খানি ছাপিয়ে বক্তাকে উপহার প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার পুস্তক প্রকাশের ভিত্তি হইল। এই সকল গ্রন্থাদির আলোচনায় দেখা যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি শ্রোতাদের চিরবদ্ধ সংস্কারে অযথা আঘাত না দিয়া এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাহারা জানিতেই পারিত না—তাহারা কখন স্বমত পরিত্যাগ করিয়া নবমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত সুপরিচিত থাকায় তিনি তাহাদের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারায় চলিয়া তাহাদিগকে ক্রমে অজ্ঞাতসারে বেদান্তমতে অধিরূঢ় করাইতেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল তিনি ছয়জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বক্তৃতার কাল শেষ হইলে বোর্ডিং-হাউস ছাড়িয়া পূর্ববারের অবকাশকালের ন্যায় বিভিন্ন স্থানে বন্ধুদের বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বন্ধুলাভ, বক্তৃতা ও ভাববিনিময়ে যত্নপর হইলেন। এই অবকাশকালেই তিনি লিলি ডেলে প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের সভায় যোগদান করেন ও বক্তৃতা দেন; অধিকন্তু কয়েকটি প্রেতাবতরণ-চক্রেও উপবেশন করেন। তারপর

গ্রীনএকার কনফারেন্সে বক্তৃতাপ্রদানান্তে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে বস্টনে পৌঁছিয়া খবর পাইলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্বার আমেরিকায় আসিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া রিজলি ম্যানরে মিঃ লেগেটের বাড়িতে স্বামীজী ও তৎসহ নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং দশদিন ইঁহাদের সঙ্গসুখ-উপভোগান্তে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন।

নিউইয়র্কের বেদান্তপ্রচারের সঙ্গে অভেদানন্দ আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—উহা হইতেছে বালক-বালিকাদের ক্লাস। তিনি হিতোপদেশাদি গ্রন্থ হইতে কাহিনী-বিশেষ মনোনীত করিয়া তদবলম্বনে একঘণ্টা কাল তাহাদের সহিত প্রতি শনিবার অপরাহ্নে গল্পগুজবে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঐভাবে তাহাদের সুকুমার মনগুলিকে গড়িয়া তুলিতেন। ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল এবং কোন কোন বালক-বালিকা ইহার লোভে কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর দূর স্থান হইতে হাঁটিয়াও আসিত। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন।

অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিয়া প্রথমে মট্ মেমোরিয়াল হলে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৮৯৮-৯৯ এ পাঁচমাস তিনি এসেম্বলী হলে বক্তৃতা দেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর হইতে ম্যাডিসন এভিনিউতে অবস্থিত ৫৯ নং স্ট্রিটের টাক্সেডো হলে বক্তৃতা হয় এবং ১৪৬ নং ইস্ট ৫৫ স্ট্রিটের বাড়িতে বেদান্ত-সমিতির কার্যালয়াদি স্থাপিত হইয়া উহাতেই বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস চলিতে থাকে।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভে বেদান্ত-সমিতি ১০৩ নং ইস্ট ৫৮ স্ট্রিটের বাড়িতে উঠিয়া গেল। এখানেই স্বামীজী ইউরোপ যাইবার পথে আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত বাস করিতে থাকিলেন। সমিতির নামে সমস্ত বাড়িটাই ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এই কার্যে অভেদানন্দের অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই বাড়িতে আসার আগে অকস্মাৎ ৩০ এপ্রিল তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পূর্বের বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। তদনুসারে ২ মে বাড়ি ছাড়িয়া পরিচিত জনৈক বন্ধুর নিকট গিয়া জানিলেন যে, তাঁহার হাতে ৫৮ স্ট্রিটের বাড়িখানি আছে; উহার ভাড়া মাসিক ৭৫ ডলার। হাতে টাকা নাই; তথাপি ঠাকুরের উপর ভরসা করিয়া এবং মাত্র ১০ ডলার টাকা অগ্রিম দিয়া তিনি তখনই সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের বক্তৃতাগুলির কোন কোনটিতে শ্রোতৃসংখ্যা ৬০০ পর্যন্ত উঠিল এবং যোগের ক্লাসেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দুইবার করিয়া ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সভাসমিতি প্রভৃতিতেও অভেদানন্দ বহু মনীষীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতে আহূত হইতেন। এই সময় হইতে বক্তৃতা-ঋতুতে এত অর্থ-

সমাগম হইতে লাগিল যে, আগের মতো বক্তৃতার কয় মাস হইতেই বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হইত না। এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি বিভিন্ন স্থান-দর্শনান্তে পশ্চিম উপকূলে 'শান্তি আশ্রমে' স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট গমন করেন। অভেদানন্দ এখানে ছয়দিন অবস্থান করিয়া ১২ আগস্ট আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক স্যানফ্রান্সিস্কো আসিলেন এবং ঐ শহরেও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ, ঘরোয়া বৈঠক ও আলাপাদি-সাহায্যে বেদান্তপ্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি অধ্যাপক হাউইসনের আমন্ত্রণে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফিক্যাল ইউনিয়নে প্রায় চারিশত শ্রোতার সম্মুখে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। এই ঋতুর ভ্রমণকালে ইহাই তাঁহার একমাত্র বক্তৃতা। ইহার পর পশ্চিমাঞ্চল-ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন এবং ৩ নভেম্বর হইতে আবার যথারীতি বেদান্তসমিতির কার্য আরম্ভ করিলেন। এবারে বক্তৃতা ও ক্লাস কার্ণেগী লাইসিয়ামে চলিতে লাগিল।

অভেদানন্দ এখন দার্শনিক বলিয়া পরিচিত এবং রয়েস, জেম্স, হাউইসন, ল্যান্ম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রণী অধ্যাপকদের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত। মিঃ লেগেটের পদত্যাগের পর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্শেল সি পার্কার বেদান্ত-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। রবিবাসরীয় বক্তৃতা, শিশুক্লাস ও যোগক্লাস নিয়মিত চলিতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বেদান্ত-সমিতি হইতে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে এবং সমিতির সভ্য ও বন্ধুসংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগেও অনুরূপ কার্য-পরিচালনা করিয়া ৭ আগস্ট তিনি ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

প্রথমত ইংলণ্ডে অবতরণ করিয়া তিনি স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো প্রভৃতি নগর ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিলেন। অতঃপর ফ্রান্স অতিক্রম করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জেনেভা হ্রদ দর্শন ও বিভিন্ন পর্বতশিখরে আরোহণজনিত অপূর্ব আনন্দানুভব করিয়া তিনি প্যারি হইয়া লণ্ডনে আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন।

নিউইয়র্কে আগমনান্তে তাঁহার প্রথম কার্য হইল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া বীর সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ও আমেরিকাবাসী সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন। সেদিন উদ্বেলিতহৃদয়ে অভেদানন্দ জানাইলেন, স্বামীজীর নিকট তাঁহারা কত ঋণী এবং সভায় স্বামীজীকে নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা হইল। স্মৃতিতর্পণের পর নিয়মিতভাবে বেদান্তসমিতির কার্য চলিতে লাগিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত কার্যবিবরণ হইতে দেখা গেল যে, সমিতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে—সভ্য ও বন্ধুসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও কোষে কিছু সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ৫২৫০ খানি পুস্তিকা ও ২৫০০ খানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। অতঃপর বক্তৃতাকার্য সমাপ্ত করিয়া অভেদানন্দ ১৫ মে ইটালিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এবারে ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম প্রভৃতি দর্শনান্তে তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকাগামী জাহাজে উঠিলেন।

অতঃপর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের যে প্রচার-ঋতু আরম্ভ হইল, উহাতে যোগশিক্ষাদানাদিকার্যে তিনি এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া শিশুক্লাসটি বন্ধ করিতে হইল। ঐ বৎসর ১৮ নভেম্বর স্বামী নির্মলানন্দ নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া ১২ ডিসেম্বর হইতে সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য কার্যেও অভেদানন্দকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পর বৎসর ৪ মে বেদান্ত-সমিতি ৬২ নং ওয়েস্ট ৭১ স্ট্রিটের প্রশস্ত বাড়িতে উঠিয়া গেল। এই বাড়ির হলে ৩০০ শ্রোতার বসিবার আসন ছিল। সুতরাং এখন হইতে বাহিরে হল ভাড়া করার প্রয়োজন হইত না। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন অভেদানন্দ পুনর্বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন। এইবার উদ্দেশ্য অস্ট্রীয়া ও বাভেরিয়ার টাইরলের হাই আল্পস্ আরোহণ করা। ইউরোপ হইতে তিনি ১৬ অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিলেন

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ৩০ জানুয়ারি ব্রুক্লিনে একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপনানন্তর উহার কার্যভার স্বামী নির্মলানন্দের উপর অর্পিত হইল। ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে স্বামী অভেদানন্দ কানাডায় বক্তৃতা উপলক্ষে গেলেন এবং কানাডার বিভিন্ন স্থান, আমেরিকার পশ্চিমোপকূল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতাদি করিয়া ২৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিলেন। এই বৎসর ১৪ নভেম্বর হইতে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রতি মঙ্গলবার ব্রুক্লিন ইনস্টিটিউটে ভারত সম্বন্ধে তিন চারি শত শ্রোতার সম্মুখে যে সকল বক্তৃতা দেন, উহাই পরে 'ইণ্ডিয়া এণ্ড হার পিপল' (ভারত ও ভারতবাসী) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া স্বদেশ ও বিদেশে তাঁহাকে ভারতীয় জাতীয়তা ও কৃষ্টির অন্যতম প্রতিনিধিরূপে সুপরিচিত করিয়া দেয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হইল যে, সমিতির নিজস্ব বাটিনির্মাণ আবশ্যক। ঐ বৎসর ২৭ জানুয়ারি স্বামী নির্মলানন্দ ভারতে ফিরিয়া গেলেন; ইহার কয়েক মাস পরে ১৬ মে স্বামী অভেদানন্দ ভারতযাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্কের কার্যপরিচালনের জন্য স্বামী বোধানন্দ ১৫ এপ্রিল বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিলেন এবং ১ জুন হইতে তাঁহার

নেতৃত্বে নিউইয়র্কের কার্য আবার আরম্ভ হইল। এদিকে এই কয় বৎসরের বিপুল সাফল্য লইয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৬ জুন কলম্বোতে পদার্পণ করিলে কলম্বোবাসীরা তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাইল। অতঃপর তিনি কাণ্ডি, জাফনা ও অনুরাধাপুরম দর্শন এবং নানা স্থানে বক্তৃতাদি করিয়া জাহাজে টিউটিকোরিন পৌঁছিলেন। সেখানেও অনুরূপ অভ্যর্থিত হইয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দর্শনে নির্গত হইলেন, অধিকন্তু সর্বত্র বেদান্তের মহিমাও প্রচার করিলেন। ঐ অঞ্চলের মধ্যে বাঙ্গালোরেই জনসাধারণের সর্বাধিক উৎসাহ দেখা গেল। দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ-সমাপনান্তে ২৩ আগস্ট তিনি পুরীধামে উপস্থিত হইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও প্রেমানন্দ তাঁহাকে স্টেশন হইতে ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং পরে 'শশিনিকেতনে' উপস্থিত করিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তীর্থদর্শন, ভক্তদের সহিত আলাপ-পরিচয়, বক্তৃতার আয়োজন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন; কিন্তু একসঙ্গে নীলাচলে আসিতে পারেন নাই। দুই-তিন দিন পরে তিনিও আসিলেন। তীর্থশ্রেষ্ঠ জগন্নাথধামে এই গুরুভ্রাতৃসম্মিলনে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল অভেদানন্দ তাহাতে কিয়দ্দিবস যথাভিরুচি অবগাহন করিয়া ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা যাত্রা করিলেন। স্বদেশাগত অভেদানন্দকে বঙ্গবাসীরাও সমুচিত সংবর্ধনা জানাইল এবং তাঁহার মুখে বেদান্তের মহিমা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল। অনন্তর ৫ অক্টোবর তিনি পাটনা যাত্রা করিলেন এবং পাটনার পরে কাশী, আগ্রা, আলোয়ার ও আহমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই পৌঁছিলেন। পথে বহু স্থানেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১০ নভেম্বর (১৯০৬) তিনি স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

বেদান্ত-সমিতির নিজস্ব গৃহসংগ্রহের জন্য পূর্বসঙ্কল্পানুযায়ী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ১০৫ ওয়েস্ট, ৮০ নং স্ট্রিটের ভবনটি ক্রয় করা হইল। সমকালেই অপর একটি আশ্রম-স্থাপনের জন্য ওয়েস্ট কর্ণওয়াল স্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে ১৫০ একর পরিমিত এক মনোরম স্থান ও তৎসহ বাটি ক্রীত হইল। উহা বার্কশায়ার জেলার অন্তর্গত ও নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে। উদ্দেশ্য রহিল যে বেদান্ত-প্রচারে নিরত স্বামীজীদের ইহা একটি বিশ্রামস্থান হইবে, বেদান্তের ছাত্র-ছাত্রীরাও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া নির্জনে সাধন করিতে পারিবেন এবং সেখানে গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষাও চলিতে থাকিবে। ইতোমধ্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাবর্তনানন্তর স্বামী বোধানন্দ পিটস্‌বার্গের বেদান্তকেন্দ্রের ভার লইয়া তথায় চলিয়া গেলেও নবাগত স্বামী পরমানন্দকে নিউইয়র্কে রাখিয়া অভেদানন্দের পক্ষে ইউরোপ-ভ্রমণাদির অসুবিধা হইল না। এই ভাবে ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি

ইংলণ্ডে উপস্থিত হন এবং ২৯ আগস্ট পর্যন্ত তথায় অবস্থানান্তে আমেরিকায় ফিরিয়া আসেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তিনি পুনর্বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এই যাত্রায় বক্তৃতা ব্যতীত যোগের ক্লাসও চালাইতে হইল। ক্রমে ১ জুলাই ২২নং কণ্ডুইট স্ট্রিটে বেদান্তসমিতির উদ্বোধন হইল। এই উদ্বোধনকার্যে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর লণ্ডনের কার্য-সমাপনান্তে তিনি ২১ আগস্ট নিউইয়র্কে পদার্পণ করিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভেও তিনি পুনর্বার লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় তিনি প্যারিতে একমাস ছিলেন এবং যথারীতি গীতা, রাজযোগ ও ধ্যানের ক্লাস চালাইয়াছিলেন। ঐ বৎসর জুন মাসের শেষে তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ হইল 'ইন্দো-আমেরিকান' (ভারত-আমেরিকান) ক্লাব-সংগঠন। ইহাতে একদিকে যেমন ভারতীয় ছাত্রগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহারা আমেরিকানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিবার সুযোগ পাইলেন।

বেদান্ত-সমিতির বাড়িটি ক্রয় করিতে ঋণ হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ বিগত কয়েক বৎসর অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকায় সমিতির সভ্যসংখ্যা ও আয় কমিয়া গেল; সুতরাং ধারশোধ করিবার জন্য অধিকাংশ কক্ষই ভাড়া দিয়া ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মে মাস হইতে তিনি বার্কশায়ারের আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতে ব্রহ্মানন্দজীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ নাই, অতএব অপর কেহ যেন ঐ কার্যের জন্য আসেন। স্বামী পরমানন্দ ইতঃপূর্বেই নিউইয়র্কের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বস্টনের কার্যে মন দিয়াছিলেন। কাজেই ১৯১২ হইতে স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের কার্যভার প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বার্কশায়ারে সমাগত অভেদানন্দেরও কার্যের প্রসার হইতে লাগিল; সেখানেও নিত্য লোক-সমাগম নিতান্ত অল্প ছিল না।

এই ভাবে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত বেদান্তপ্রচার চালাইয়া কর্মক্লান্ত অভেদানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেইজন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই আমেরিকার কাজ গুটাইতে লাগিলেন। নভেম্বরে আশ্রম বিক্রয়ের জন্য বায়না হইয়া গেল এবং ১৫ ডিসেম্বর তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে অচিরে সানফ্রান্সিস্কোতে উপনীত হইলেন। এই শহরে তিনি পূর্ণ এক বৎসর বেদান্ত-আন্দোলন চালাইয়া ১৯২০ অব্দের ২১ ডিসেম্বর লস এঞ্জেলেস যাত্রা করিলেন। পরবর্তী বৎসরের ১৯ জুন পর্যন্ত সেখানে নিয়মিতভাবে প্রচারকার্য চালাইয়া ২৭ জুলাই (১৯২১) তিনি সানফ্রান্সিস্কো হইতে শেষ বারের মতো ভারতে চলিলেন। পথে হনলুলুতে ১১ হইতে ২১ আগস্ট পর্যন্ত প্যান প্যাসিফিক এডুকেশন

কনফারেন্সে যোগদান করিয়া আবার জাহাজ ধরিলেন এবং জাপান, হংকং ইত্যাদি দেখিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে অভিনন্দিত হইয়া এবং বক্তৃতাদি করিয়া ১০ নভেম্বর কলকাতায় অবতরণ করিলেন।

বেলুড় মঠে বাসকালে তাঁহাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অভিনন্দিত করিলেন। পরবৎসরের প্রারম্ভে তিনি জামসেদপুরে বক্তৃতা করিতে গেলেন এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি স্বামী শিবানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরেই বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া শিলং ও ৺কামাখ্যাদর্শনে নির্গত হইলেন। আমেরিকা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত প্রথিতযশা শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য অভেদানন্দ যেখানে যাইতেন সেইখানেই উৎসাহ উদ্দীপিত হইত এবং তাঁহাকেও বক্তৃতা ও উপদেশাদির দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইত। শিলং এবং গৌহাটীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিলং হইতে ফিরিয়াই তিনি তিব্বত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিব্বতযাত্রার পথে তিনি কাশী, লাহোর ও রাওলপিণ্ডি দেখিয়া শ্রীনগরে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় দুই মাস পরে হেমিস গুম্ফায় পৌঁছিলেন। এখান হইতে শ্রীনগরে ফিরিতে তাঁহার আরও একমাস লাগিয়াছিল। তদনন্তর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার-দর্শনান্তে তিনি হৃষীকেশে গেলেন। পুণ্যস্মৃতিপূত এই ক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কনখল হইয়া তিনি কলকাতায় ফিরিলেন।

পূর্ণোদ্যমী প্রচারকের পক্ষে সর্ববিষয়ে অনুকূল আমেরিকার নগরসমূহে দীর্ঘকাল বেদান্ত-আন্দোলনে নিযুক্ত অভেদানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, মহানগরী হইতে দূরে, চিরাভ্যস্ত জীবনযাপনের প্রতিকূল ও প্রচারের উপযুক্ত সুযোগ-বিহীন ক্ষুদ্র গ্রাম বেলুড়ে পড়িয়া থাকিলে তাঁহার জীবনকে পঙ্গু করা হইবে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও বহুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া স্বল্পপরিসর মঠবাটিতে বাস করাও আয়াসসাধ্য ছিল। অতএব ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, কলকাতায় একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই অভিপ্রায়ানুসারে ১৯২৩ অব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি ৪৫-বি মেছুয়া বাজারের ভাড়াটে বাড়িতে পরিকল্পিত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বাড়িতে আড়াই মাস বাস করিয়া তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও দীক্ষাদির সাহায্যে বেদান্ত-আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি ১ মে হইতে ১১ নং ইডেন হসপিটাল রোডের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে ক্রমে ত্যাগী শিষ্যদের আগমন হইতে থাকিল এবং এখানেই বেদান্ত-সমিতির যথার্থ গোড়াপত্তন হইল। ১৯২৪ অব্দে দার্জিলিং যাইয়া তিনি একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার

জন্য 'রুবি কটেজ' নামক দুইখানি গৃহসমেত একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন। পরে গৃহাদির আবশ্যক পরিবর্তনান্তে ১৯২৫ অব্দের কার্তিক মাসে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে কলকাতার বেদান্ত-সমিতির কার্য প্রসার পাইয়াছে; সুতরাং বৃহত্তর বাটির আবশ্যক হওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ সদলবলে ৪০ নং বিডন স্ট্রিটে উঠিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে ভারতীয় জীবনের সহিত পুনঃ সংযোগস্থাপনের ফলে জনসাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি অধিক অবহিত হওয়ায় তাঁহার কর্মধারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে সমিতির কর্মিবৃন্দকে বেদান্ত-প্রচারের সহিত শিক্ষা ও সমাজসেবায়ও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে দার্জিলিং ও কলকাতার কেন্দ্রদ্বয় সমাজকল্যাণেও যথাসম্ভব আত্মোৎসর্গ করিল। বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সমিতির শুধু ভাবগত ঐক্যই রক্ষিত হইল না, কার্যতও সহযোগিতা চলিতে থাকিল। এতদ্ব্যতীত স্বামী শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সমিতিতে আগমন ও অভেদানন্দের বেলুড় মঠে প্রায়শ গমনের দ্বারা সংযোগসূত্র দৃঢ়ীকৃত হইল। ১৯২৬-এর মার্চ মাসে এই হৃদ্যতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপে বেদান্ত-সমিতিতে একটি সাধুসম্মিলন হইল এবং স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের ও কলকাতাস্থ অপর সব মঠের সাধুগণ বেদান্তমঠে আসিয়া আহার করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেদান্ত-সমিতি ক্রমেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল—পরিশেষে শুধু স্বামী অভেদানন্দের সহিত মঠ ও মিশনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রক্ষিত হইল।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'র প্রকাশ এবং ১৯২৯-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—সমিতির জন্য ১৬ নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে ১১ কাঠা জমি ক্রয় করিয়া বাটি-নির্মাণের সুবিধার জন্য সমিতিকে ঐ রাস্তার ১৩ নং বাড়িতে তুলিয়া আনা। এই সময় হইতে দেখা গেল যে, স্বামী অভেদানন্দের দৈনন্দিন কার্যে আর তেমন মন নাই—তিনি যেন স্বীয় সন্তানদিগকেই সর্বকার্যে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজে পশ্চাতে চলিয়া যাইতে সচেষ্ট। অতঃপর তিনি প্রধানত দার্জিলিং-এ বাস করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তদের আহ্বানে কলকাতায় আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কালী যখন তার বাইরের কাজ কমিয়ে দেবে, তখনই তার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ লোকে বুঝতে পারবে।" বর্তমানে তাহাই ঘটিল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আজ সরল শিশুর ন্যায় সকলের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহাদেরই একজন। দূর হইতে বক্তৃতার ছটায় মুগ্ধ করা আজ

তাঁহার কাজ নহে, এখন ভক্তগণের অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার জীবনের শেষ ব্রত।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নূতন মঠের একতলা সম্পূর্ণ হইলে সমিতি উহাতে উঠিয়া আসিল। কিন্তু স্থানের অপ্রাচুর্যবশত স্বামী অভেদানন্দ তখনও দার্জিলিংয়েই রহিয়া গেলেন। ১৯৩৪-এর শেষভাগ হইতে তিনি কলকাতার অর্ধসমাপ্ত আশ্রম-ভবনে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক মাস পরেই (৬ মার্চ, ১৯৩৫) আশ্রমের ভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কলকাতা ও দার্জিলিং-এর আশ্রম দুইটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু কলকাতার সম্পত্তি ঋণভারে জর্জরিত থাকায় উহাকে আপাতত দেবোত্তর করিতে পারিলেন না, ১৯৩৬-এর মে মাসে দার্জিলিং-এর আশ্রমটিকে ঐরূপ করিয়া দিলেন।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব চলিতেছিল। ১৯৩৭ অব্দের ১ মার্চ তিনি টাউন হলে 'পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নে'র উদ্বোধন-সভায় সভাপতিত্ব করিলেন। সেদিন তাঁহাকে দুইবার বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরদিন তিনি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ অভিভাষণ। ইতোমধ্যে বেদান্ত-সমিতিতে মন্দিরের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি কলকাতার আশ্রমে বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। দার্জিলিং-এর আশ্রমে তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তাই তিনি সেখানে যাইয়া ২৯ আগস্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের পটে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ দার্জিলিং-গমন। অতঃপর কলকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আর মাত্র দেড় বৎসর তিনি মর্তধামে ছিলেন।

কলকাতায় ফিরিবার কিয়ৎকাল পরেই সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নামে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল এবং তিনিও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথিতে উহা দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার জীবনের আর একটি অসমাপ্ত কার্য ছিল তাঁহার অপ্রকাশিত বক্তৃতাবলী একবার দেখিয়া দেওয়া; সুতরাং আহারের পর প্রতিরাত্রে প্রধান প্রধান বক্তৃতাগুলির পাঠ চলিতে লাগিল—তিনি শুনিয়া মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন।

জীবনের কর্মসমাপনান্তে শেষ দেড় বৎসর তিনি প্রায় শয্যাগত ছিলেন বলিলেই চলে। তবে সমাগত কাহাকেও তিনি ফিরাইয়া দিতেন না; শয্যায় শুইয়াই সকলকে অমায়িক ব্যবহার ও আলাপে আপ্যায়িত করিতেন। নন্দোৎসবের পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) সকালে ৮-১৬ মিনিটে তিনি সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যেরা সমাগত হইলেন। বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনাদি কলকাতার মঠগুলি হইতেও সাধুরা আসিয়া শেষ দর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষকৃত্যে যোগ দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে কাশীপুরের শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিমন্দিরের ঠিক উত্তরেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া তাঁহার দেহ চন্দনকাষ্ঠে সজ্জিত চিতাগ্নিতে আহুত হইল।

# স্বামী অদ্ভুতানন্দ

লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি—এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম; লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম; লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না—তাহাকে একটিমাত্র ভাব অবলম্বনেই চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

লাটুর শৈশবের নাম ছিল রাখ্‌তু-রাম। কথিত আছে যে, শৈশবে বসন্তরোগের আক্রমণে তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। অতঃপর শিশু সুস্থ হইলে মাতার ধারণা জন্মিল, শ্রীরামচন্দ্রই পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁহার ঐ নাম হয়। রাখ্‌তু-রাম ছাপরা জেলার কোন পল্লিগ্রামে এক মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই; কারণ যখনই তাঁহাকে এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইত, তিনি বিরক্তি-সহকারে বলিতেন, "আরে, ঈশ্বরতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তোরা কি আমার কথা নিয়ে সময় কাটাবি? আমার কথা জানবার কি দরকার আছে? তোরা আমায় ঝুট মুট দিক করিস নি!" [১] এইরূপ সন্ন্যাসোচিত উদাসীনতা বা নির্বাক গাম্ভীর্যের সম্মুখে জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল এককালে নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। তবে অপরের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শৈশবের যে দুই-চারিটি ঘটনা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিতেন, তদবলম্বনেই আমরা ঐ কালের সামান্য কিছু পরিচয় পাই। তিনি বলিতেন, "আমি তো রাখালদের সঙ্গে থাকতাম।" সরলমতি রাখালদের সঙ্গে ক্রীড়া ও গোচারণাদিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রই ছিল তাঁহার বিদ্যালয়। আর সে

---

১ লাটু মহারাজ বিহারী ও বাঙলা মিশাইয়া এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাষায় কথা বলিতেন। বর্তমান গ্রন্থে উহাকে প্রধানত বঙ্গভাষায় পরিণত করা হইল।

সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পটভূমিকা স্বভাবতই তাঁহার ভগবৎপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করিয়া সঙ্গীত জাগাইত, "মনুয়ারে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।" তাঁহার জনকজননী অতি দরিদ্র ছিলেন—দুই বেলা পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত তাঁহাদের জুটিত না। আহারসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা উভয়েই অকালে দেহত্যাগ করেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে রাখ্‌তু-রাম অনাথ হন। ইহার পর তাঁহার নিঃসন্তান খুল্লতাত বালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল; সুতরাং ইহার বাড়িতে রাখ্‌তু-রাম কিছুদিন পূর্বাপেক্ষা সুখেই ছিলেন।

এই আনন্দের দিনগুলির কিন্তু শীঘ্রই অবসান হইল পিতৃব্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে। শীঘ্রই মহাজনের পীড়নে নিঃসম্বল খুল্লতাত রাখ্‌তু-রামকে লইয়া জীবিকার্জনের জন্য কলকাতায় আসিলেন। দেশের মাটিকে ছাড়িয়া আসিতে রাখ্‌তু-রামের কোমল প্রাণে কতটুকু ব্যথা বাজিয়াছিল তাহা তিনি একদা কথাচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ওরে, দেশ ছেড়ে চলে আসতে কি মন চায়? আমার তো কান্না পেয়েছিল। তোদের আত্মীয়-স্বজন সব রয়েছে, তাদের ছাড়তে পারবি কেন? আমার তো কেউ ছিল না, আমি তবু পারি নি।" কলকাতায় আসিয়া রাখ্‌তু-রামের পিতৃব্য তাঁহাকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আরদালি ও স্বগ্রামবাসী ফুলচাঁদের সাহায্যে দত্ত পরিবারে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

প্রভুগৃহে রাখ্‌তু-রামের কাজ ছিল—বাজার করা, মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাওয়া, ফাই-ফরমাশ খাটা, রামচন্দ্রের টিফিন লইয়া যাওয়া ইত্যাদি। এসব কাজ তিনি অতি তৎপরতার সহিত করিতেন। ফলত কর্মঠ, আদেশ-পালনে উন্মুখ ও সচ্চরিত্র বালক শীঘ্রই সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আদরের নাম হইল 'লালটু'। এই লালটু নামই পরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহময় মুখে 'লাটু' 'লেটো' বা 'নেটো'তে পরিণত হইয়াছিল।

কাজের অবসরে লাটু কুস্তি ও কসরৎ প্রভৃতি করিতেন। ইহাতে রামবাবুর জনৈক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধু একদিন রামবাবুকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বাড়িতে কুস্তিগির ভৃত্য রাখিলে আহারাদির ব্যয়বৃদ্ধি পায়। তদুত্তরে উদারমনা রামবাবু বলিয়াছিলেন, "তোমরা তো বোঝো না যে, কুস্তি লড়লে কাম কমে যায়।" পুনশ্চ আর একদিন অপর বন্ধুর মনে সন্দেহ উঠিল, চাকর লাটু বাজারের পয়সা চুরি করে। ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি স্পষ্টই লাটুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "হাঁরে, ছোঁড়া, ঠিক করে বল তো আজ কটা পয়সা সরালি?" এরূপ হীন কটাক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া লাটু দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "জানবেন বাবু আমি নকর বটে, কিন্তু চোর নই।"

এই সদম্ভ উক্তিতে হৃতমান বন্ধু রামবাবুকে অভিযোগ জানাইলেন। সব শুনিয়া রামবাবু শুধু বলিলেন, "দেখুন, লাটু চোর নয়। ওর যখন যা দরকার হয়, ওর মার (দত্তগৃহিণীর) কাছ থেকে চেয়ে নেয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামচন্দ্রের মুখে তখন প্রায়ই ঠাকুরের এই সকল উপদেশ শুনিতে পাওয়া যাইত—"ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না;" "যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তার কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হন;" "নির্জনে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়, তবে তো তাঁর দয়া হয়;" ইত্যাদি। সরল বালক লাটুর মনে এই সকল জ্বলন্ত উপদেশ আগুন ধরাইয়া দিল এবং তখনই তাঁহার গোপন সাধক-জীবন আরম্ভ হইল। তখন প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি দ্বিপ্রহরে একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিত, আর অমনি তিনি বামহস্তে উহা মুছিয়া ফেলিতেন। পরিবারের লোকেরা মনে করিতেন, পিতৃব্যের জন্য লাটুর মন খারাপ হইয়াছে এবং তদনুযায়ী প্রবোধও দিতেন। তখন কে জানিত যে, 'এত মিঠে যাঁর কথা, সেই সাধুটি'র চিন্তায় আজ লাটু আত্মহারা?

লাটু সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন; একদিন এক রবিবারে রামচন্দ্রকে বলিয়াও ফেলিলেন, "আপনি আজ সেখানে যাবেন; আমায় নিয়ে চলুন।" রামচন্দ্র বিশ্বস্ত বালকের এই স্নেহের আবদার উপেক্ষা না করিয়া লাটুকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইহা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের অবসানের কিংবা ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভের কথা। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত রামচন্দ্র ঠাকুরকে স্বগৃহে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন; লাটু পশ্চিমের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে ঠাকুর শ্রীরাধিকার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিলেন এবং লাটুকে দেখিতে পাইয়াই রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ, রাম? একে কোথায় পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" তারপর সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। লাটুর মনই তাঁহাকে জানাইয়া দিল, ইনিই তাঁহার বহু-বাঞ্ছিত সাধু। তিনি তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন—ঠাকুর বলিতেছেন, "যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর করে জল বেরুতে থাকে।" এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর হঠাৎ লাটুকে ছুঁইয়া দিলেন। সহসা লাটুর রোমাঞ্চ হইল, ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—লাটু তখন আর এই জগতে নাই! অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে আবার

স্পর্শ করিলে লাটুর ভাবসংবরণ হইল। স্বীয় লীলাসহচরকে এক আঁচড়েই চিনিয়া লইয়া ঠাকুর রামচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন, "এখানে ওকে মাঝে মাঝে পাঠিও।" আর লাটুকে বলিলেন, "ওরে, আসিস। এখানে মাঝে মাঝে আসবি, জানিস।"

অপর একদিন ঠাকুরের নিকট কোন একটি দ্রব্য প্রেরণের কথা উঠিতেই লাটু সাগ্রহে বলিলেন, "আমায় দিন, আমি আপনার সব ওখানে পৌঁছে দেব।" সেদিন (সম্ভবত ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০) লাটু একাই ফল-মিষ্টান্নাদি লইয়া প্রায় ১১টার সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং উদ্যানপথে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া শ্রীপাদপদ্মে দীর্ঘ প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরে ৺কালীমাতার ভোগারতিদর্শনান্তে প্রসাদধারণের জন্য ঠাকুরের পার্শ্বে বসিলেন। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, ৺কালীমন্দিরের আমিষ প্রসাদ-গ্রহণে লাটুর বিহারদেশীয় সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে; তাই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ ও গঙ্গাজলে রান্না হয়—তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। লাটু অত-শত না বুঝিয়া সরলভাবে বলিলেন, "আপনি যা পাবেন, আমি তাই খাব—আমি তো আপনার প্রসাদ পাব, তা ছাড়া আর কিছু খাব না।" ঠাকুর ইহাতে সহাস্যে পার্শ্ববর্তী রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "শালা কেমন চালাক দেখছিস? আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।" যাহা হউক, আহারান্তে সমস্ত দিনটিই দক্ষিণেশ্বরে কাটাইবার পর সন্ধ্যায় ঠাকুর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কলকাতায় ফিরিতে হইবে। ফিরিবার পয়সা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে লাটু মুখে উত্তর না দিয়া পকেট নাড়িয়া জানাইয়া দিলেন, আছে। ঠাকুর হাসিলেন মাত্র।

দ্বিতীয় দর্শনের পর লাটু স্বকার্যে উদ্যম হারাইলেন। দক্ষিণেশ্বরে কথাচ্ছলে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, "এমনটি হয়ে থাকে। এখানে আসবার জন্য মন কেমন করে—একদিন পাঠিয়ে দিও।" তদনুসারে লাটু পুনর্বার যেদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন কবিরাজ আসিয়া বিধান দিয়া গেলেন যে, বায়ুপরিবর্তনের জন্য ঠাকুরের কামারপুকুরে যাওয়া উচিত। এদিকে লাটু ধরিয়া বসিলেন, "আমি আপনার এখানে থাকব; আমি আর নকরি করব না।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই প্রবোধ দেন, লাটু ততই ক্রন্দনের সুরে বলেন, "আমি আর ওখানে যাব না, আমি এখানে থাকব।" অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "আমিও এখানে থাকছি না রে!" অগত্যা লাটুকে ফিরিতে হইল; কিন্তু তৎপূর্বে ঠাকুরের নিকট মনিবগৃহে অনাসক্তভাবে অবস্থানের কৌশলটি শিখিয়া আসিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁর কত কৃপা! তিনি দেশে যাবার আগে আমায় কেমন সুন্দর শুনিয়ে গেলেন, মনিবের সংসারে কেমন করে থাকতে হয়। কিন্তু আমার মনের দুঃখ যাবে কেন?"

হাঁ, মনের দুঃখ যাবে কেন? মনিবের সংসারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকা চলে, সকলকে আপনার বলা চলে, সমস্ত কর্ম করা চলে, হাস্য-কৌতুক পর্যন্ত চলে—কিন্তু মনের দুঃখ চাপা থাকিলেও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাই লাটু নিজেই বলিয়াছিলেন, "জান! তাঁর জন্য আমার ভারী মন কেমন করত—বড় অস্থির হয়ে পড়তুম। রামবাবুর ওখানে থাকতে পারতুম না—লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম। কিন্তু সেখানেও আনন্দ মিলত না। তাঁর ঘরে যেতুম না—সব ফাঁকা লাগত।" দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, গঙ্গাতীরে বসিয়া কাঁদিতেন; পঞ্চবটীতে নীরবে কাল কাটাইতেন। পরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁহার আর্তি বুঝিতে পারিতেন না—মনে করিতেন, রামবাবু বকিয়াছেন, তাই মনের দুঃখে বালক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছে। এই সময়ে এক সন্ধ্যায় রামলাল-দাদা লাটুকে প্রসাদ দিবার জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন, তিনি কাহাকে যেন প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে মাথা তুলিয়া লাটু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংস মশায় কোথায় গেলেন?" "পরমহংস মহাশয়! মাথা খারাপ হইল না কি?"—নির্বাক রামলাল-দাদা ভাবিতে লাগিলেন। লাটু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, ঠাকুর দেশে থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন—সেখানে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র লাটুর পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারই গুরুর প্রতি তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ভক্ত রামচন্দ্র লাটুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন না; অধিকন্তু লাটুকে বিদায় না দিয়া গৃহকর্মের জন্য অপর একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। ইহার পর লাটুর কার্য হইল, উৎসবাদিতে ভক্তদের ডাকিয়া আনা ও ফল-মিষ্টান্নাদি দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাওয়া।

ইহারই পরে একসময়ে দত্তগৃহে জ্ঞানানন্দ অবধূত টাইফয়েড-রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রামবাবু লাটুকে অবধূতের সেবা করিতে বলিলেন। লাটু ঐ কার্য সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তখন অবধূতের মুহুর্মুহু ভাব হইত এবং তাঁহাকে নাম শুনাইতে হইত। ফলত রোগীর সেবা করিতে যাইয়া লাটুকে অবিরাম নামোচ্চারণ করিতে হইত। অবধূতের সেবায় চারি মাস রত থাকার কালে লাটু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; তখন রামবাবু সন্ধ্যাকালে অবধূতকে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুনাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরের উক্তি ও গল্প-অবলম্বনে কঠিন অংশগুলিকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেন।

দীর্ঘ আট মাস পরে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর একদিন সন্ধ্যাসমাগমে লাটু তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর স্নেহভরে তাঁহাকে সেখানে থাকিয়া যাইতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, লাটু সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। রাত্রে প্রসাদগ্রহণান্তে

তিনি সেই দিন ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সেই দিব্যস্পর্শে প্রথমে তাঁহার অশ্রুবিসর্জন হইতে লাগিল; ক্রমে তিনি নির্বাক, নিস্তব্ধ ও স্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সে ধ্যান-তন্ময়তার পরিবর্তন ঘটিল না। যখন মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বাজিল তখন ঠাকুরের আহ্বানে ব্যবহারিক জগতে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রণাম ও স্নানাহার সমাপন করিলেন। সেবারে লাটু তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিপ্রবণ মনকে সাধারণ স্তরে নামাইবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে অবিরাম নানা কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিন দিন পরেও লাটুকে প্রভুগৃহে ফিরিতে অসম্মত দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত হইয়া সব জানিতে পারিলেন। অনন্তর অনেক চেষ্টায় ও মার (দত্ত-গৃহিণীর) স্নেহের আকর্ষণে সেযাত্রা লাটু গৃহে ফিরিলেন।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে স্বীয় নির্বুদ্ধিতার জন্য শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের মন্দিরে আগমন নিষিদ্ধ হইলে সেবকাভাবে ঠাকুর বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। এমনকি মন্দিরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ভৃত্যও সে অভাব দূর করিতে পারিল না। তাই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত রামবাবুকে ঠাকুর একদিন বলিলেন, "দেখ, রাম, এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসত্ত্ব, আর এখানে থাকতেও ভালবাসে।" তদবধি ঠাকুরের সেবক হইয়া লাটু দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে লাগিলেন।

লোকদৃষ্টিতে এই নবীন সম্বন্ধ যেরূপই হউক না কেন, ঠাকুর লাটুকে শুধু সেবকরূপেই গ্রহণ করিলেন না, তিনি তাঁহার সব দায়িত্বই স্বহস্তে লইলেন। তাই দেখিতে পাই, ঠাকুর পুত্রনির্বিশেষে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্যই সচেষ্ট। বর্ণপরিচয়কালে ব্যঞ্জনবর্ণে আসিয়া লাটু তাঁহার বিহারী সংস্কারানুসারে 'ক'-কে বলেন 'কা', 'খ'-কে বলেন 'খা'। ঠাকুর যতই বলেন, "ওরে, ওটা 'ক' " লাটু ততই বলেন "কা"। ঠাকুর বলেন, "আরে এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি?" তবু লাটুর সেই এক কথা—"কা"। বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুর তখন কহিলেন, "যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।" লাটুর বিদ্যাভ্যাস এখানেই শেষ হইল। পুঁথিগত বিদ্যা আরম্ভেই সমাপ্ত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর আমায় কত শিখাতেন, কত বুঝাতেন। বলতেন, 'যা না নরেনের কাছে।' সেখানে বসে বসে আমি কত শুনেছি। ঠাকুর আবার তাঁহাকে 'নেশা করিতেও' শিখাইতেন—'যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা!' তিনি তাঁহাকে 'ভগবানের নেশা' করাইয়া দিলেন। লাটু বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে টেনে নিলেন।

...তিনি আমায় বলতেন, 'দেখ, দিল্ সাফ রাখবি, আর গরদা ঢুকতে দিবি না।' ...অহঙ্কারের ব্যাপারকে তিনি গরদা বলতেন। অহঙ্কারী মানুষ কেমন জড়িয়ে পড়ে দেখ না—'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার টাকা' এসব বলে বলে কেবল নিজের জাল নিজে বুনতে থাকে।" একদিন ঠাকুরের পদসেবায় নিযুক্ত লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন?" লাটু 'রামজীর ব্যাপার' তখন আর কি বুঝিবেন—তিনি নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই কহিলেন, "ওরে, এখন তোর রামজী সুচের ভিতর হাতি চালাচ্ছেন।" লাটু উহার তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "আমার এতটুকু আধার; আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"

কুস্তিগির লাটু খুব খাইতে পারিতেন—এক একবারে অনেক আটা উদরস্থ হইয়া যাইত। ইতোমধ্যে ঠাকুর একদিন যোগীনকে আহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন শুনিয়া লাটুও আহারের পরিমাণ কমাইতে থাকিলেন। ইহাতে প্রথমে খুবই কষ্ট হইত, 'খিদের চোটে পেটে ব্যথা লাগত।' ইহারই মধ্যে একদিন লাটু ও রাখাল কুস্তি লড়িতেছিলেন—কেহই কাহাকেও হারাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের যে গজকচ্ছপের মতো লড়াই হচ্ছে—কেউ কাউকে হারাতে পারছ না।" কৌতুক করিলেও ঠাকুরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সাধনের সহিত অধিক শ্রম ও অল্প আহারের মিশ্রণে লাটুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে; তাই বলিলেন, "দুটো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।" উহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া কিয়দ্দিবস লাটুকে পার্শ্বে বসিয়া খাওয়াইলেন এবং স্বহস্তে পাতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তদবধি আহারবিষয়ে লাটু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন এবং অতঃপর কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া অভ্যাসবশত একটু ঠেলাঠেলি করিতেন মাত্র।

ঈর্ষা ও অভিমানাদি-জয় সম্বন্ধেও ঠাকুরের দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। একদা রাখালকে পান সাজিতে বলিলে তিনি বারংবার অস্বীকার করিলেন। লাটু এরূপ আচরণের অন্তর্নিহিত নিবিড় প্রেমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু ব্যবহারিক বিচারদৃষ্টিতে বলিয়া ফেলিলেন, "ওকি কথা, রাখালবাবু, আপনি উনার আদেশ শুনছেন না, আবার তার উপর কথা বলছেন—এ আপনার কেমন ব্যবহার!" ক্রমে দুইজনের বচসা আরম্ভ হইল। ঠাকুরের ইহাতে ভারী আমোদ—তিনি পান-সাজার কথা ভুলিয়া গিয়া রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও রামনেলো, রাখাল-নেটোয় যুদ্ধ দেখবি আয় রে!" রামলাল আসিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন; তাই ঠাকুর যখন রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করিলেন, "এদের মধ্যে বড় ভক্ত কে?"—তিনি সহাস্যে

উত্তর দিলেন, "মনে হয় রাখাল।" অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও তখন সকৌতুকে বলিলেন, "রাখালেরই ভক্তি বেশি। দ্যাখ দিকিনি, রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর (লাটুকে দেখাইয়া) ঐ দ্যাখ, কেমন রেগে আছে। ক্রোধ তো চণ্ডাল—ক্রোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা উবে যায়।" জোঁকের মুখে নুন পড়িল—লাটু অপরাধ স্বীকারপূর্বক চুপ করিলেন। তখন ঠাকুর বুঝাইয়া বলিলেন, "পান খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল দেহের; তাই রাখাল অমান্য করতে পেরেছে। দেহের ভেতর যিনি, তাঁর ইচ্ছা হলে রাখালের সাধ্য ছিল না, অমান্য করে।" বিতণ্ডার পরে অবশেষে লাটুই পান সাজিলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে জনৈক ভক্তের অসভ্যতা দেখিয়া লাটুর ধৈর্যচ্যুতি হইল এবং উক্ত ভক্তকে বেশ একটু ভর্ৎসনা করিলেন। ভক্তের প্রাণে ইহাতে ব্যথা বাজিল কিনা জানি না; কিন্তু ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, "এখানে যারা আসে তাদের ওরকম কড়া কথা বলতে নেই। একে তো তারা সংসারের জ্বালায় জ্বলছে; এখানে এলে তোরা যদি তাদের বেআদবিতে এত কড়া কথা বলে দুঃখ দিবি, তা হলে তারা যায় কোথায় বলতো?" ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পরদিন লাটুকে ভক্তটির নিকট পাঠাইলেন যাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট দূরীভূত হয়। ভক্ত গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে লাটুকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যারে, এখানকার প্রণাম দিয়ে এসেছিস?" ঠাকুরের প্রণাম ভক্তকে দেওয়া—ইহা আবার কিরূপ? লাটু কী আর উত্তর দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের প্রণাম জানাইতে তাঁহাকে পুনর্বার ভক্তগৃহে যাইতেই হইল। এদিকে প্রণামের কথা শুনিয়াই ভক্তটি কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং লাটুও তখন তাঁহার ভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

এক সময় লাটু ঠাকুরের সাবধানবাণী শুনিয়াছিলেন, "ওরে দেখিস, একে (নিজেকে দেখাইয়া) যেন ভুলিস নি।" 'একে' বলিতে লাটু পাছে দেহমাত্রকে বুঝেন, এই জন্য ঠাকুর সেদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহারই প্রতি স্পষ্টত লাটুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লাটুও তদবধি ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবনসর্বস্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবত্তার জ্ঞান থাকিলে সেব্য-সেবক লীলার স্ফূর্তি হয় না। লাটুও তাই পরে এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তা হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না তাঁর ধারে থাকা যায়?" গুরুসেবা সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরুকে যেদিন মা-বাপের মতো ভাবতে পারবে, সেদিন সে তাঁর কিছু সেবায় লাগবে; কিন্তু তার আগে তাঁর সেবা করতে পারবে না।" সেবায় তাঁহার তন্ময়তা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। একরাত্রে ঠাকুর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। কেন যেন সে রাত্রে লাটুর জপে মন বসিল না—প্রাণে

একটা অভাব বোধ করিয়া তিনি ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সেখানে নাই। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর হয়তো শৌচে গিয়াছেন; সুতরাং ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঐ দিক হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, যার সেবা করবি, তার কখন কি দরকার হয় হুঁশ রাখবি।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাকে বড় নির্জন জীবনযাপন করিতে হইত; আবার ভক্তদের আহারাদির জন্য পরিশ্রমও করিতে হইত অনেক। একদিন গঙ্গাতীরে লাটু নিশ্চল উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নহবতে রুটি-বেলার লোক পাচ্ছেন না।" ইহার পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব।... তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।" সেদিন হইতে লাটু সানন্দে শ্রীশ্রীমার সেবায়ও নিযুক্ত হইলেন।

সাধনরহস্য সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, "যাগে-যোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর সেবায় লাগবি।" ঠাকুরের কৃপায় তিনি জিতনিদ্র হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের কোন একদিন কীর্তনের পরিশ্রমান্তে রাত্রে ঠাকুরকে ব্যজন করিতে যাইয়া লাটু নিদ্রাবেশে ঢুলিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "ওরে, বলতে পারিস ভগবান ঘুমান কি-না?" লাটু জানাইলেন, উহা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব। তখন ঠাকুর বলিলেন, "ভগবানের ঘুমাবার জো নাই; ...তিনি সারাদিন সারারাত জেগে জেগে জীবজন্তুর সেবা করছেন—তাই নির্ভয়ে জীবজন্তু ঘুমোতে পারছে।" আর একদিন ক্লান্ত ও স্বভাবত নিদ্রাপরবশ লাটু সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাকে জাগাইয়া ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন, "ও কিরে! এই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘুম কি রে?...সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ডাকবি, তা না, শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস।" ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে নিদ্রোত্থিত লাটু অপ্রতিভ হইয়া এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "আমি আর এমন সময় কোন দিন ঘুমোব না।" তিনি এই প্রতিজ্ঞা চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন। একবার কঠিন নিউমোনিয়া-রোগের সময় সন্ধ্যাকালে তিনি সেবারত স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে; কিন্তু রোগের প্রকৃতি বুঝিয়া এবং চিকিৎসকের নিষেধ স্মরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ ঐ কথা কর্ণে না তুলিয়াই কার্যান্তরে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন লাটু মহারাজ বলিতেছেন, "তোমরা যদি আমায় বসিয়ে না দাও, আমায় মহাবীরের শরণ নিতে হবে।" ইহার তাৎপর্য সারদানন্দ তখন জানিতেন না। তিনি বহির্গত হইবামাত্র লাটু মহাবীরকে স্মরণ করিয়া স্বচেষ্টায় উঠিয়া বসিলেন এবং ফিরিয়া

আসিয়া স্বামী সারদানন্দ অনুযোগ করিতে থাকিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি অতশত জানি না; এ তাঁর হুকুম—আমায় তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে।"

ইহাও কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-জয়ের পরাকাষ্ঠা নহে। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে নিদ্রাভিভূত হওয়ায় ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কার করেন। লাটু তাই স্বীয় মনকে খুব কশাঘাতপূর্বক সেই রাত্রি হইতেই নিদ্রার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি অতঃপর প্রায় সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন।

অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের সামান্য বস্তু-অবলম্বনেও আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ অব্দে একদিন লাটু সমবয়স্কদের সহিত গোলোকধাম খেলিতে বসিয়া সৌভাগ্যক্রমে প্রথমবারেই সাত চিৎ ফেলিয়া ঘুঁটি একেবারে গোলোকধামে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ! এই সময়ে ঠাকুরও সেখানে আসিয়া পড়েন এবং মুক্তিকামী লাটুর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা এইভাবে সামান্য ক্রীড়া-অবলম্বনে উন্মেষিত হইয়াছে দেখিয়া তিনিও ঐ আনন্দে যোগ দেন।

ঠাকুরের সাহচর্যে লাটুর এক লাভ এই হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত কলকাতায় বহু শিক্ষিত গৃহে যাইয়া ঐ সমাজের সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং আক্ষরিক বিদ্যা না থাকিলেও সর্ববিষয়ে মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছিলেন। লাটু ছিলেন বড়ই সরল। তিনি নিজের দুর্বলতার কথা অকপটে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন যে, এই সর্বজ্ঞের নিকট বস্তুত কিছুই গোপন থাকে না। ঠাকুরও সরল শিষ্যকে সরল পথে লইয়া যাইতেন। জৈব সংস্কার সহজে সাধককে ছাড়িতে চায় না। একদিন লাটুর অন্তরে আসক্তির আগুন এমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, তিনি নামজপে এককালে অসমর্থ হইয়া ঠাকুরের শরণ লইলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন, "তাও আসবে যাবে; কিন্তু নামকে ছাড়িস নি।" ঠাকুরের উপদেশে তিনি মনোজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের মুখে ভিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া লাটু মধ্যে মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। একবার স্থানমাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তাঁহার তীর্থদর্শনেও অভিলাষ হয়। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখানকার প্রসাদী অন্ন ছেড়ে কোথায় যাবি? একান্তই যদি কোথাও যেতে চাস, তা যা না কলকাতায় রামের ওখানে।" লাটু কলকাতায় গেলেন, কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়িয়া বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন। পরন্তু ইহার পরও লাটুকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং লাটুর মনকে আরও অন্তর্মুখীন করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে যেন দূরে দূরে রাখিতে লাগিলেন।

এ দুঃখে লাটুর বুক ফাটিয়া যাইত। অবশেষে শ্রীশ্রীমায়ের শরণ লইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে আবার পূর্ববৎ গ্রহণ করিলেন।

লাটুর অনেক আচরণ ছিল অদ্ভুত; কিন্তু স্নেহময় ঠাকুর উহা স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে লাটু নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই ঠাকুরকে দর্শন করিতেন এবং ঠাকুর স্বগৃহে না থাকিলে অপর কাহাকেও প্রথম দেখিয়া ফেলার ভয়ে চক্ষু আবৃত করিয়া ডাকিতেন, "আপনি কোথায় গেলেন?" অগত্যা ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন।

ঠাকুরের আহ্বানে যুবক ভক্তগণ কীর্তনে যোগ দিতেন এবং নাচিতেন। তিনি একদিন জগদম্বাকে জানাইলেন, "মা, তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই ছেলেদের একটু ভাব-টাব হোক।" ইহার পরেই বিষ্ণুঘরে কীর্তনকালে ভাবাবেশে লাটু এমন হুঙ্কার তুলিতেন যে, সারা মন্দিরটি গমগম করিত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে কীর্তন খুব জমিয়াছিল। কীর্তনান্তে খোকা মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হলো, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল?" ঠাকুর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর সবার অল্প-স্বল্প।" তবে ঠাকুর বাড়াবাড়ি ভালবাসিতেন না; তাই একদিন লাটুকে সাবধান করিয়া দিলেন, "ওরে, বেশি নাচুনি-কুঁদুনি ভাল নয়; ওতে সময় সময় ভাবভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে ভাব অন্তর্মুখী হতে চায় না।"

এক ব্রাহ্মমুহূর্তে সকলকে আপন প্রকোষ্ঠে ধ্যানে বসাইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন, "জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী" ইত্যাদি। হঠাৎ লাটু 'উঁহু'-রবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপনপূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু যেন আসনে থাকিতে পারিতেছিলেন না—শীঘ্রই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল।

অপর একদিন লাটু শিবমন্দিরে ধ্যানে প্রেরিত হইয়া অল্প পরেই ধ্যানযোগে কালাতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন। অপরাহ্ন উপস্থিত, তবু তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সংবাদ পাইয়া ঠাকুর শিবমন্দিরে গেলেন এবং পাখা লইয়া লাটুকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শীতল বায়ুস্পর্শে লাটুর শরীর ক্রমে কাঁপিয়া উঠিল; তখন ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, বেলা যে গড়িয়ে এল! সন্ধ্যে-টন্ধ্যে সাজাবি কখন?" ধ্যানোত্থিত লাটু ঠাকুরকে বীজন করিতে দেখিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং অপরাধীর ন্যায় জানাইলেন যে, শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে রাখিতে তাঁহার সম্মুখে একটি জ্যোতি আবির্ভূত হয়; উহাতে সমস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া যায়—তারপর তিনি আর কিছুই অবগত নহেন। ঠাকুর শুধু বলিলেন, "বেশ বেশ। এ রকম

আরো কত দেখবি। এখন এক গ্লাস জল খা দিকিন”—ইহা বলিয়া সস্নেহে জল দিলেন।

এক সময় লাটু ধ্যান করিতে গিয়া অল্প পরেই মাটিতে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই ঠাকুর তথায় আসিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন এবং বুকে ডলিয়া সহজাবস্থায় আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, “চুপ কর শালা, চুপ কর! তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস?” অপর এক গভীর রাত্রে ঠাকুর ত্যাগী সন্তানদিগকে ধ্যানের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, ধ্যানান্তে লাটু বেলতলা হইতে ফিরিলে বলিলেন, “আজ লেটোর পুনর্জন্ম হয়েছে।” একবার লাটু পঞ্চবটীতে ধ্যানে ডুবিয়া আছেন—ঠাকুর বিষ্ণুঘরের পুরোহিতের দ্বারা লাটুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু লাটু নিশ্চল, নিথর! তখন নরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া বৃক্ষশাখায় সজোরে আঘাত করিতে থাকিলেন—লাটু তথাপি ভ্রূক্ষেপহীন! অবশেষে ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া লাটুর অবস্থা জ্ঞাত হইলেন এবং নরেন্দ্রকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে লাটু সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগেও উহার রেশ চলিত। ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন, “লেটো চড়েই আছে—ক্রমে লীন হবার জো!”

ইতোমধ্যে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে আসিলেন। সেবক লাটুও সঙ্গে আসিলেন। এখানে একদিন লাটু ভাবাবেশে গায়ের জামা ছিঁড়িতে থাকিলে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বোতাম খুলিয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। ক্রমে লাটুর ভাব শান্ত হইল। কিন্তু এইরূপ ভাবসমাধি চলিতে থাকিলেও লাটু ঠাকুরের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকিতেন—স্বেচ্ছায় অবহেলা করিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, “তাঁর সেবাই তো আমাদের উপাসনা—আমাদের কি আর অন্য উপাসনা আছে?” ঠাকুর তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, কিরূপে নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, কোন্ দিকে মুখ রাখিতে হয়, কত মন্ত্র জপ করিতে হয়, কিন্তু লাটু জানিতেন—আসল উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়।

অতঃপর কাশীপুরের অধ্যায় আরম্ভ হইল। সেখানেও লাটু সেবার সহিত সাধনায় রত রহিলেন। একদিন ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অকস্মাৎ লাটুর হাত থামিয়া গেল—দেহ স্থির, চক্ষু নিস্পন্দ; দুই-চারি বার ডাকিয়া কিংবা গায়ে হাত দিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না। এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করিয়া লাটু মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, “একদিন তো কাশীপুরে ওনার মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম; তখন আমার সামনে সেই মুল্লুক খুলে গেল। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি; যা আস্বাদন করেছি, তা জিব নিতে পারে নি।”

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবনযাত্রার সময় অনেকেই সঙ্গে চলিলেন; লাটু তাঁহাদের অন্যতম। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে লাটুর আহারাদির কিছুই ঠিক থাকিত না—অনেক সময় নিজের রুটি বানরকে দিয়া আবার মায়ের নিকট রুটির জন্য আবদার করিতেন। ঐ সময় তিনি কিছুদিন অপরের অজ্ঞাতসারে যমুনাপুলিনে তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের একটি কন্যা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমা লাটুকে কলকাতায় পাঠাইয়া দেন।

কলকাতায় পৌঁছিয়া লাটু দুই-চারি দিন দত্তগৃহে অতিবাহিত করিয়া বরাহনগর মঠে চলিয়া গেলেন। তথায় সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাসী অদ্ভুতানন্দ একাদিক্রমে দেড় বৎসর বরাহনগরে কঠিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। তাঁহার অনেক আচরণই অনন্যসাধারণ ছিল। অসুখের সময়ের একটি ঘটনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটি ঘটনা এই—একদিন শীতনিবারণের জন্য ঘরে মালসা করিয়া আগুন দেওয়া হইলে এবং ঘরের চারিদিক বন্ধ করা হইলে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে রে বাপ! আমি আর কারুর কথা শুনব না, ছাদে গিয়ে শোব"—সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা মালসা সরাইতে হইল এবং চারিদিক খুলিতে হইল। আরোগ্যলাভান্তে তিনি রামচন্দ্রের গৃহে যাইয়া কয়েক মাস ছিলেন। অতঃপর মঠে পুনরাগমন করেন এবং তথায় তিন-চারি মাস বাস করিয়া বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর উদ্যানবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট চলিয়া যান। নীলাম্বরবাবুর বাটি হইতে মা পুরীধামে গমন করিলে (নভেম্বর, ১৮৮৮) লাটু মহারাজ পুনর্বার বরাহনগর মঠে আগমন করেন।

এই বিভিন্ন সময়ে তিনি বরাহনগরে কিরূপ জীবনযাপন করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস কয়েকটি ঘটনা ও উক্তি হইতে পাওয়া যায়। সারদানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "রাত্রে লেটো ঘুমায় না। সে প্রথম রাত্রে ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকায়। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে উঠে মালা জপ করতে বসে।" এই তথ্য-আবিষ্কারের ইতিহাস বড়ই উপভোগ্য। একরাত্রে খট খট শব্দ শুনিয়া সারদানন্দজী ভাবিলেন, ইঁদুর আসিয়াছে। তিনি তাড়া দিলে—আওয়াজ বন্ধ হইল। আবার অল্প পরে সেই খট খট—সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ তাড়া ও তাহার ফলে শব্দ বন্ধ হওয়া। বার বার এরূপ হওয়াতে স্বামী সারদানন্দের মনে সন্দেহ জাগিল। তাই তথ্য আবিষ্কারের জন্য পরের রাত্রে লণ্ঠনাদির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন এবং যেই ঐরূপ শব্দ হইল, অমনি ঝটিতি আলো জ্বালিয়া দেখেন লাটু মহারাজ জপে নিরত—তাঁহারই

ঘূর্ণায়মান মালার শব্দ হইতেছে ঐরূপ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, "লাটুকে ডেকে না খাওয়ালে তার খাওয়ার হুঁশ থাকত না। এমন কতদিন হয়েছে যে, আমাদের সকলকার খাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পেয়ে ঘরে তার খাবার দিয়ে আসা হয়েছে। দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেছে, সেই রাত্রে তাকে ডাকতে গেছি—লাটু সেই একই ভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আর দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি হাঙ্গামা-হুজ্জত করে তবে তাকে খাওয়ানো হত।"

১৮৯২ অব্দে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গেল। এখানে লাটু মহারাজ থাকেন নাই বলিলেই চলে—মাঝে মাঝে আসিতেন মাত্র।

আলমবাজার মঠের একটি ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি এবং ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করার প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের কোনও একদিন স্বামী অভেদানন্দ-রচিত "নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ, ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি"—ইত্যাদি স্তোত্রপাঠকালে 'ঈশাবতারং' শুনিয়া লাটু মহারাজ ভাবিলেন, ঠাকুরকে ঈশার অবতার বলা হইয়াছে; তাই স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেলে দেখছি! ঈশাকে পুজো করছ!" তখন স্বামী অভেদানন্দ ঠিক অর্থ বুঝাইয়া দিলেন আর গুণগ্রাহী লাটু অমনি ঐ স্তোত্রটি ভক্তদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। আলমবাজারে তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের একটি দৃষ্টান্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ দিয়াছিলেন—"সেদিন সেই প্রথম আমরা আলমবাজার মঠে গেছি। দেখি, একজন টান হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, অপর দুইজন তাঁকে টানাটানি করছেন।...অনেক দিন পরে তাঁকে ঐরূপ শুয়ে থাকবার কারণ আর তাঁদের ঐরূপ টানাটানি করবার উদ্দেশ্য কি ছিল জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, "মনে করেছিলুম আর খাব না, অন্ন-ত্যাগ করব—তাই পড়েছিলুম।" ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লাটু মহারাজের প্রকৃত বাসস্থান ছিল গঙ্গাতীর। এই কয়বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে গিরিশবাবুর ভাষায় বলা চলে, "গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখগে।" লাটু তখন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'—জগতের কাহারও সহিত বাধ্যবাধকতা নাই, কোন বিষয়ে রাগদ্বেষ নাই, কোন বস্তুতে লোভমোহ নাই, তাঁহার মুখে অভিসম্পাত বর্ষিত হইত না, আশীর্বাদও উচ্চারিত হইত না, অন্য জগতে মন রাখিয়া তিনি তখন পূর্ব সংস্কারবশে লৌকিক আচার-ব্যবহার, আহার-বিহারাদি করিতেন মাত্র।

এই কয়বৎসর স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রায়ই ভিক্ষালব্ধ অর্থে চালভাজা বা ছোলাভাজা কিনিয়া দিবসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। বস্ত্রের জন্য তিনি রামবাবুর দ্বারে উপস্থিত

হইতেন এবং কম্বলাদি গিরিশবাবুর নিকট হইতে লইতেন। এতদ্ব্যতীত বলরামবাবু, হরমোহনবাবু, খগেনবাবু, উপেনবাবু, খোড়ো কেদারবাবু প্রভৃতির গৃহেও মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। সালকিয়ার একজন মুদি সাত-আট মাস রুটি ও ছোলাভাজা দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল। তখন তিনি বাগবাজারের পোলের নিচে তপস্যা করিতেন। গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে অনেক দিন তিনি ভিজা ছোলা খাইয়া দিন কাটাইতেন। একদিন গামছার খোঁটে বাঁধা ছোলা গঙ্গার জলে ডুবাইয়া ইট চাপা দিয়া ধ্যানে বসিলেন—তখন ভাঁটা ছিল। জোয়ার আসিয়া জল যখন অনেক উচ্চে উঠিয়াছে তখন তাঁহার আহারের স্পৃহা জাগিলে দেখিলেন, খাদ্য পাওয়া অসম্ভব। উপায়ান্তর না থাকায় আবার জল নামিয়া যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ভাঁটার সময় ভিজা ছোলা তুলিয়া অবেলায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল।

আহারাদি বিষয়ে এইরূপ স্বচ্ছন্দগতি অবলম্বনপূর্বক তিনি আপনভাবে ধ্যানভজনে মগ্ন থাকিতেন অথবা গঙ্গাতীরে অপর দশজনের সঙ্গে বসিয়া ভাগবতাদি ব্যাখ্যা শুনিতেন। ধ্যানাদির কোন কাল বা স্থান নির্ধারিত ছিল না—স্বাধীন মহাপুরুষ কখনও তীরভূমিতে, কখনও পোলের নিচে, কখনও পার্শ্ববর্তী নৌকায় ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বাগবাজারে একদা খড়ের নৌকায় বসিয়া আছেন—কখন নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে জানেন না। যখন ঐ বিষয়ে সচেতন হইলেন তখন দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছেন। অগত্যা মাঝিদের বলিয়া দক্ষিণেশ্বরেই নামিয়া পড়িলেন। গঙ্গাতীরে বাসকালে কিছুদিন দ্বিপ্রহরে ৺শ্মশানেশ্বরের ঘাটের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন এবং রাত্রিযাপন করিতেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আবার চাঁদনির ছাদে উঠিয়া জপধ্যানে মগ্ন হইতেন। বৃষ্টি হইলে ঘাটের ধারেই অবস্থিত রেলের মালগাড়িতে উঠিয়া বসিতেন। একরাত্রে ঐ ভাবে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে কখন যে ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া চলিয়াছে তিনি জানেন না। পরদিন দেখেন, অনেক কুলি আসিয়া তাঁহাকে নামিতে বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গাড়ি তখন চিৎপুরে। অতঃপর বৃষ্টি হইলে আর তিনি গাড়িতে উঠিতেন না—চাঁদনির ছাদ হইতে নামিয়া উহারই এক কোণে বসিয়া থাকিতেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের এই অন্তর্মুখীন ভাব অন্যূন আড়াই বৎসর একই ভাবে চলিয়াছিল। তদনন্তর ১৮৯৫ অব্দের কোনও একসময়ে তিনি পুরী ও ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা জানাইতেন, "যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, আপনি দয়া করে সেই রূপটি একবার দেখান।" ৺জগন্নাথ তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে

পুরীত্যাগকালে তিনি ৺জগন্নাথের নিকট দুইটি অদ্ভুত বর চাহিলেন, "বেশি ঘুরতে-টুরতে পারব না, আর যা খাই তাই যেন হজম হয়ে যায়।" দ্বিতীয় বরের কারণ নির্দেশচ্ছলে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষান্নের কোন ঠিক তো নেই, জান তো! হজমশক্তি ভাল না হলে দেহ ভেঙ্গে যায়। শরীর ভেঙ্গে পড়লে সাধন-ভজনে মন লাগে না।" দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট লাটু যেমন সরল বালক ছিলেন, পরিণত বয়সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সম্মুখেও আজ তিনি সেই একই সরল বালক।

১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত অর্থদ্বারা পুরি ও আলুর তরকারি সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; কিন্তু অনুরুদ্ধ হইয়াও মুখোপাধ্যায়-গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন না। ১৮৯৬ অব্দে তাঁহাকে একাদিক্রমে আট মাস প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে দেখা যাইত—সেখানে তিনি নীরবে বসিয়া পাঠ শুনিতেন। ইহার পর তিনি বলরামবাবুর বাটিতে চলিয়া আসেন। সেখানে যাইতে তাঁহার প্রথমে আপত্তি ছিল; কারণ বিধিবদ্ধ জীবনপ্রণালী তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক। কিন্তু গৃহকর্তা যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, তখন তিনি সম্মত হইলেন।

লাটু মহারাজের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত স্বামীজীর ভাবধারা ও কার্যপ্রণালীর পার্থক্য খুবই বেশি ছিল। ১৮৯৭ অব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই পশুপতিবাবুর গৃহে তাঁহার সংবর্ধনায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু লাটু মহারাজকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি তখন ভাবিতেছেন, "ওদেশে সাহেব মেমদের সঙ্গে মিলে নরেনের কি আমার কথা মনে আছে?" নরেন কিন্তু ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন, "তুই আমার সেই লাটু ভাই, আর আমি তোর সেই নরেন ভাই।" ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ আপাতত নিবৃত্ত হইলেও স্বামীজীর আচার-ব্যবহার ও মিশন-প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়া সন্দেহ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং একদিন বলিয়াও ফেলিলেন, "ভাই, এত ঝঞ্ঝাট কেন আনছ? এতে যে ধ্যান-ধারণা সব ঘুলিয়ে যাবে।" সেদিন স্বামীজীর যুক্তি লাটু মহারাজকে আশ্বস্ত করিলেও এরূপ আচরণ পূর্ববৎই দুর্বোধ্য থাকিয়া তাঁহার জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিল। মঠে আসিয়া স্বামীজী নিয়ম করিলেন, প্রত্যূষে ঘণ্টা বাজিলেই নিদ্রাত্যাগ করিতে হইবে। অমনি একদিন দেখা গেল, খেয়ালী লাটু কাপড়-গামছা লইয়া মঠ ছাড়িয়া যাইতেছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছিস?" লাটু বলিলেন, "কলকাতায়।" "কেন?" "তুমি ও দেশ থেকে এসেছ, কত নূতন নিয়ম করছ—আমি ওসব মানতে পারব না। আমার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয় নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর আমার মন অমনি ধ্যানে বসে যাবে।"

নবীন ও প্রাচীন ধারার এই বিষম সংঘর্ষস্থলে নিরুপায় স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, "তবে তুই যা।" কিন্তু ফটক পার হইতে না হইতেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কহিলেন, "তোকে এ নিয়ম মানতে হবে না—যারা নূতন এসেছে তাদের জন্য এ নিয়ম করা হয়েছে।" আর একবার স্বামীজী মঠে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা করিলে অদ্ভুতানন্দ বলিলেন, "এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই! এ বয়সে আমাদের ডাম্বেল ভাঁজতে হবে নাকি? আমি তো তোমার ডাম্বেল ভাঁজতে পারব না।" কথা শুনিয়া স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপে সঙ্ঘজীবনের সহিত সর্বক্ষেত্রে আপনাকে মিলাইতে অপারগ হইলেও এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, লাটু মহারাজ নিয়মভঙ্গে আনন্দ পাইতেন বা এরূপ করার সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেন, "মঠে থাকলে নিয়ম মানতে হবে। সেখানে থেকে নিয়ম মানব না—এ তো ভাল নয়।" একদা জনৈক সাধু তাঁহার নিকট কোন এক মঠের মহন্তের নামে অভিযোগ করিলে তিনি সাধুটিকে অধ্যক্ষের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এখন দেখছি বিবেকানন্দ ভায়ের মঠ করা সার্থক হয়েছে।"

মতের অমিল থাকিলেও বিবেকানন্দ-ভাই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ-তে তিনি যখন উত্তর-ভারতভ্রমণে নির্গত হন, তখন স্বামী অদ্ভুতানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান। কাশ্মীরে যে 'হাউস-বোটে' স্বামীজী ছিলেন, উহাতে দেশপ্রথানুযায়ী মাঝি সপরিবারে বাস করিত। নৌকায় উঠিয়া ইহা দেখিয়াই লাটু ঝটিতি তীরে নামিয়া বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বোটে থাকব না।" পরে স্বামীজী যখন আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে ভয় নাই, তখন লাটু পুনঃ উঠিতে সম্মত হইলেন। একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের এক প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে বলিলেন যে, উহা দুই-তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। অমনি লাটু এতাদৃশ অনুমানের কারণ জানিতে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝলে কি করে? আমায় বোঝাও। ওখানে কি সে কথা লিখা আছে?" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "তোকে সে কথা বোঝাতে পারব না। যদি তুই লেখা-পড়া শিখতিস তাহলে হয় তো তোকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।" লাটু মহারাজের বুদ্ধির তারিফ করিবার জন্য স্বামীজী কখনও কখনও তাঁহাকে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকের নামানুসারে প্লেটো বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এরূপ মূর্খত্বের অপবাদেও পশ্চাৎপদ না হইয়া বুদ্ধিমান প্লেটো উত্তর দিলেন, "ও বুঝেছি। তুমি এমন বিদ্বান যে, আমার মতো গণ্ড-মুক্খুকেও বোঝাতে পার না"—চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। কাশ্মীরভ্রমণান্তে খেতড়িতে পৌঁছিয়া স্বামীজী রাজপ্রাসাদে

অতিথি হইলেন। কিন্তু স্বামী অদ্ভুতানন্দ রাজার অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চুপি চুপি বাহিরে খাইয়া আসিতেন। একদিন রাজবাড়ির দারোয়ানের নিকট হইতে প্রায় বলপূর্বক রুটি ও বেগুন-পোড়া আদায় করিয়াছিলেন—দারোয়ান সন্ত্রস্ত ছিল, পাছে রাজ-অতিথিকে ভিক্ষা দিয়া রাজরোষে পড়ে। সেবারে তিনি স্বামীজীর সহিত জয়পুর পর্যন্ত বেড়াইয়া কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি কিছুদিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। তখন মঠ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে। স্বামী অদ্ভুতানন্দকে মধ্যে মধ্যে সেখানেও দেখা যাইত। আমেরিকা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত স্বামী সারদানন্দ তখন শয্যাদি বেশ ফিটফাট রাখিতেন, আর লাটু মহারাজ তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্বক কৌতুকচ্ছলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিতেন। স্বামী সারদানন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "দেখছি, ওদেশ থেকে এসে তুমি কতখানি সাহেব বনেছ।" কথা শুনিয়া সারদানন্দ শুধু হাসিতেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে রামবাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া লাটু মহারাজ আপ্রাণ সেবা করেন। রামবাবু ২৪ ঘণ্টা পাখার বাতাস চাহিতেন—লাটু সারা রাত্রি সে কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও উপকারীর প্রতি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ-গমনের পর লাটু মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে বিডন স্ট্রিটে 'বসুমতী' পত্রিকার ছাপাখানায় চলিয়া যান। ঐ সময় তাঁহাকে সমাজের নিম্নস্তরের অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইত। কেহ যদি পরে প্রশ্ন করিত, "যারা চরিত্রহীন তাদের সঙ্গে আপনি মিশতেন কেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "কিন্তু তারা তো কপট ছিল না।" সাধুর লোক-পরীক্ষার মানদণ্ড অদ্ভুত! ছাপাখানার কর্মচারীদিগকে তিনি খুব খাওয়াইতেন; ছোলা-সিদ্ধ, রাঙাআলু-সিদ্ধ, চা, মোহনভোগ—এই সব স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন। মাঝে মাঝে আবার হিং-এর কচুরি কিনিয়া আনিতেন। তখনও দিনের বেলা গঙ্গার ধারেই কাটাইতেন; সেখানে যে যাহা দিত তাহারই দ্বারা দৈনন্দিন ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য—দুই-তিন বাটি চা ও তৎসহ ছোলা-সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ অনুরোধে এক-আধখানি কচুরি হয়তো গ্রহণ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন যাপনের পর ১৮৯৯-এর শেষাশেষি, 'বসুমতী'র ছাপাখানা গ্রে স্ট্রিটে উঠিয়া গেলে তিনি অন্যত্র চলিয়া যান।

পরবৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, স্বামী অদ্ভুতানন্দ তখন সেখানে থাকিলেও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান নাই—

স্বামীজীই তাঁহাকে খুঁজিয়া গঙ্গাতীর হইতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রণালীবদ্ধ সঙ্ঘজীবনের মধ্যে তিনি আবদ্ধ হন নাই। এমন কি, ১৯০১ অব্দে স্বামীজী তাঁহাকে মঠের ট্রাস্টী করিতে চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আমার ওসব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। আমি ওসবের মধ্যে থাকব না।"

লাটু মহারাজ নিরক্ষর হইলেও শাস্ত্রের বাণী তাঁহার নিকট শুধু 'কথার কথা' না হইয়া 'প্রাণের ব্যথা'-স্বরূপ ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দের (সুধীর মহারাজের) সহিত একদিন তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির উপনিষদ্ ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত কঠোপনিষদ্ হইতে যখন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।।"

—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন,[১] তখন লাটু মহারাজ স্বানুভূতির সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়া সোৎসাহে পার্শ্ববর্তী শুদ্ধানন্দকে কহিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিকই বলেছে।" কথাটি তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, অপরের যে ইহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং বিপরীত মন্তব্যের অবকাশ ঘটিতে পারে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একবার বলিয়াই কিন্তু তৃপ্তি হইল না—অন্তরের উদ্বেলিত আনন্দ তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, আর স্বামী শুদ্ধানন্দের গা ঠেলিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" অগত্যা সুধীর মহারাজ ভাবিলেন, উপস্থিত লোকেরা তো এই ভাবগাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং সভাগৃহ-পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। আবাসস্থলে ফিরিবার পরেও স্বামী অদ্ভুতানন্দের আনন্দের রেশ একই ভাবে চলিতে লাগিল; এমন কি, রাত্রেও শুদ্ধানন্দজীকে জাগাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন; "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" একই উচ্চভাবে এইরূপ দীর্ঘকাল তন্ময় থাকার দৃষ্টান্ত ধ্যানসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যত্র বড়ই বিরল। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন তাঁহার সহিত একই গৃহে থাকিতেন এবং শাস্ত্রালোচনা করিতেন। লাটু মহারাজের এই শাস্ত্রপ্রীতি গভীররাত্রেও অপূর্বরূপে প্রকটিত হইত—অকস্মাৎ নিশীথকালে তিনি হয়তো আদেশ করিতেন, "এই সুধীর, সুধীর, গীতাপাঠ কর।" শুদ্ধানন্দ সানন্দে তাহাই করিতেন।

সাধারণত মঠের বাহিরে সাধনাদিতে রত থাকিলেও সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা ছিল। বিশেষত স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিত বা আদেশ মানিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত অধিক মেলা-মেশা করিতে চাহিতেন না—

১ শস্যের শীষকে যেমন অতি সাবধানে খড় হইতে পৃথক করিতে হয়, তেমনি হৃদয়ে সর্বদা অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকেও স্বদেহ হইতে পৃথক করিতে হয়।

সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেন। একবার বলরাম-মন্দিরে এক স্ত্রীভক্ত তাঁহার ঘরে আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। লাটু মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইতে বলিলেও তিনি বসিয়াই রহিলেন। অধিকন্তু কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন যে, স্বামী সারদানন্দের আদেশে তিনি আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের নাম শুনিয়াই লাটু মহারাজ বলিলেন, "শরৎ আমার কাছে কেন পাঠালে? আমি রাজাকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) জানাব। রাজার হুকুম হলে তোমায় ঠাকুরের কথা শুনাব; কিন্তু তাঁর হুকুম না পেলে তোমায় কোন কথা বলব না।" যেই কথা, সেই কাজ—তিনি মহারাজের নিকট গেলেন। মহারাজ তখন বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন। তিনি সব শুনিয়া মহিলাটিকে বলিলেন, "শরতের কথায় ওকে এমনভাবে বিরক্ত করো না—ওতে তোমারই অকল্যাণ হবে।" ফলত লাটু মহারাজ একাই ঘরে ফিরিলেন। নিবারণচন্দ্র দত্ত প্রায়ই ঠাকুরদের গান রচনা করিয়া মঠের সাধুদের শুনাইতেন। লাটু মহারাজ ইহাতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরদের গান তৈরি করতে নেই—ওতে দরিদ্দির বাড়ে।" এই নিষেধ মহারাজের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি লাটুকে বলেন, "ও গানের ভেতর দিয়ে ঠাকুরের নাম প্রচার করছে—তাতে নিষেধ করা কেন?" অমনি সে কথা শিরোধার্য করিয়া লাটু মহারাজ নিবারণকে জানাইলেন, "তুমি রাখালকে খুশি করবার জন্য গান বাঁধতে পার।"

বলরাম-মন্দিরে থাকা কালেও তিনি যাহা কিছু পাইতেন, ভক্তসেবায় লাগাইতেন। ঐরূপ অর্থভিক্ষার সময় তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপমান-সূচক কথা শুনিতে হইত। তাই জনৈক ভক্ত একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে, গৃহস্থের জন্য সাধুর ভিক্ষা করা অনুচিত; যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে অতঃপর ভক্তরাই দিবেন। তর্ক বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অকস্মাৎ লাটু মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "এসব কথা তোমায় কে শিখিয়ে দিয়েছে?" "আপনারই একজন গুরুভাই"—এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ও! তাই তোমাদের এত জেদ। আচ্ছা, তারই কথা থাকবে। রাজাকে (ব্রহ্মানন্দজীকে) অনেক দিক ভেবে চলতে হয়—মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষা করতে হয়।" পরে তিনি আর যেখানে-সেখানে ভিক্ষা চাহিতেন না এবং পরিচিত ক্ষেত্রেও বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত তাঁহাকে কিছু দিলে তিনি না লইয়াই চলিয়া গেলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "আরে, ও এখন নেশার ঝোঁকে আছে; নেশা ছুটে গেলে বলবে—শালা আমায় ঠকিয়ে নিয়েছে।"

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশীধাম যাওয়া পর্যন্ত লাটু মহারাজ প্রায়শ বলরাম-মন্দিরেই

ছিলেন। মধ্যে একবার রামবাবুর স্ত্রীর শেষ অসুখের সময় (এপ্রিল ১৯০৩) রামবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং ১৯০৩-এর ৺দুর্গাপূজার পরে কয়েক জন ভক্তসহ উত্তর-ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

বলরাম-মন্দিরে লাটু মহারাজের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে সহ্যগুণটি বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এক মাতাল তাঁহাকে একদিন খুব কটূক্তি করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তেরা মাতালকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। লাটু মহারাজ বারণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ? কার শাস্তি দেওয়া উচিত বল তো? ওকে তোমরা আর কি মারবে? মদই ওকে মেরে রেখেছে।" এইরূপ বিচারের সম্মুখে সমস্ত শাসন পরাজিত হয়! কলকাতায় এরূপ উচ্ছৃঙ্খল লোকের অভাব নাই; কিন্তু লাটু মহারাজের সহানুভূতিরও কোন অপ্রাচুর্য ছিল না। রাত্রি এগারটায় জনৈক মাতাল দোকান হইতে মাংস কিনিয়া আনিয়া উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে তিনি অম্লানবদনে পাত্রটি সম্মুখে রাখিতে নির্দেশ দিয়া মাতালকে তাহার প্রিয় গান, "জগৎ দেখ না চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সোনার তরণী; তরীর উপর শ্যামকলেবর রাম রঘুমণি" ইত্যাদি গাহিতে বলিলেন। গান শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "প্রসাদ হয়ে গেছে, তুলে নাও।" মাতালও সানন্দে মাংসপাত্র লইয়া চলিয়া গেল।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি বড়ই উদার ছিলেন। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম উপলক্ষে তিনি পীরের দরগায় পূজা পাঠাইতেন। খ্রিস্টমাস ও গুডফ্রাইডের দিনে স্বহস্তে যিশুখ্রিস্টকে ভোগ নিবেদন করিতেন বা মালা পরাইয়া দিতেন। খ্রিস্টান ডি মেলো ধ্যান সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে ভালবাস?" সাহেব বলিলেন, "যিশু ও ঠাকুর উভয়কে।" "বরাবর কাকে ভালবেসে এসেছ?" ডি মেলো যিশুর নামই করলে লাটু মহারাজ বিধান দিলেন, "দেখ, যিশুকেই ধরে থেকো।"

ঠাকুরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লাটুর সত্যনিষ্ঠা ছিল চমকপ্রদ। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, জনৈক ভক্তের বাড়িতে বিগ্রহ দেখিতে যাইবেন। সেদিন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় জল দাঁড়াইয়া গেল; তথাপি লাটু এক-হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া ভিজা-কাপড়ে যথাসময়ে বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের একটি অভ্যাস ছিল এই যে, শাসনের প্রয়োজন হইলে অপরকে শাসন না করিয়া নিজেকেই শাসন করিতেন আর উপদেশদানকালে অভিমান দূর করিবার জন্য নিজের নিরক্ষরতার স্মৃতি সর্বদা জাগাইয়া রাখিতেন। একদিন এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেয়াড়া ভাবে তর্ক করিতে থাকিলে মৃদু ভর্ৎসনায় কাজ

হইতেছে না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এমন বকুনি খেলে, হাসতে তোমার লজ্জা করছে না—এমন বেহায়া তুমি?" তার্কিক 'সর্বভূতে একই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ করিয়া উপহাসক্রমে বলিলেন, "আপনি তো আমায় ধমক দেন নি, নিজেই নিজেকে ধমকাচ্ছেন। এতে কে না হাসবে?" লাটু মহারাজ তখন আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, লাল কাপড় পরেছি—ভারী সাধু বনে গেছি আর কি! একটা ছোট কথা শুনলে এখনও ভেতর থেকে ফোঁস বেরোয়!" কাহাকেও কোন উপদেশ দিবার পর তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতেন, "ভারী সাধু হয়েছি যে, বাপ! পরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি। আরে, তুই কি উপদেশ দিবি? ওরা তোর চেয়ে কত বড়, কত শিক্ষিত!" এই পদ্ধতিকে তিনি বলিতেন, "উলটো পাক দিয়ে মনের পাকগুলোকে খুলে দেওয়া"—আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে উল্টা পাক দেখাইয়া দিতেন।

লাটু মহারাজ একদিন কোন এক ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। বাড়ির লোকেরা অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন না; সুতরাং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে পঙ্‌ক্তি হইতে পৃথক করিয়া বসাইলেন এবং পরিবেশনকালে তেমন মনোযোগও দিলেন না। অকস্মাৎ গৃহকর্ত্রী সেখানে আসিয়া এবং অবস্থা দেখিয়া কান্নার সুরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কি হবে গো! সন্ন্যাসীকে খেতে বসিয়ে দেখলুম না!" নিরভিমান স্বামী অদ্ভুতানন্দ যতই সান্ত্বনা দেন, গৃহিণী ততই গৃহের অকল্যাণের ভাবনায় বিলাপ করেন। ইহা দেখিয়া তিনি সেই আসনে বসিয়াই গৃহের মঙ্গলের জন্য দুই-চারি মিনিট জপ করিলেন।

শ্লীলতার জ্ঞান ছিল তাঁহার আবার অপূর্ব! ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আসিয়া বলরাম-মন্দিরে একমাস ছিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি প্রিয় সন্তান লাটুকে দেখিয়া যেই বলিলেন, "বাবা লাটু, কেমন আছ?" লাটু অমনি উত্তর দিলেন, "তুমি ভদ্দর ঘরের মেয়ে, সদর বাড়িতে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? আমাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতে।" খেয়ালী সন্তানের ভব্যতা দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন। কখনও কখনও তিনি আবার মায়ের সম্বন্ধে বেদান্তবিচারও করিতেন। মা জয়রামবাটী ফিরিবেন! লাটু মনের বিষাদ ঢাকিবার জন্যই বোধ হয় নিজের ঘরে দ্রুত পদচারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বেদান্তবিচার করিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসীর কে পিতা, কে মাতা?—সন্ন্যাসী নির্মায়া।" মা নিচে নামিয়া উহা শুনিলেন এবং দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বলিলেন, "বাবা লাটু, তোমায় আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা!" আর যায় কোথায়? স্নেহের স্পর্শে বেদান্ত ভাসিয়া গেল—লাটু মায়ের পদতলে লুটাইয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। মাও তখন অশ্রুসিক্তা। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া লাটু আবার তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাঁদতে কি আছে?"—ইহা বলিয়া স্বীয় উত্তরীয়ে মায়ের অশ্রুমোচন করিলেন। মায়ের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ একদিন অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাকে মানা কি সহজ কথা রে?—তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী!"

লাটু মহারাজ সাধারণত গাম্ভীর্যপূর্ণ হইলেও তাঁহার রহস্যবোধ যথেষ্ট ছিল। বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই গিরিশবাবুর বাড়িতে যাইতেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, গিরিশবাবু স্বরচিত 'কালাপাহাড়' নাটকে প্রচ্ছন্নভাবে লাটুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একদিন গিরিশবাবুর কি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন—

**"মনকে ছাঁদো মনকে বাঁধো, মনকে দিও না লাই।**
**আগুর কথা পিছু করো, হুঁশিয়ার রহিও ভাই ॥"**

গিরিশবাবু কথাটার উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া কহিলেন, "বড় ঠারেঠোরে কথা হয়ে যাচ্ছে যে সাধু!" লাটু 'কালাপাহাড়' রচনার প্রতিশোধের সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "সেই ভাল, না হলে 'কালাপাহাড়' জমবে কেন?"—অর্থাৎ তুমিও তো কম ঠারেঠোরে কাজ সার নাই!

ঐ সময় প্রায় ছয় মাস কাল লাটু অনিদ্রারোগে ভুগিয়াছিলেন। গিরিশবাবুর বাটিতে উপস্থিত হইলে মহাকবি তাঁহাকে গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইতেন। বস্তুত গিরিশবাবুর সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। অথচ গিরিশবাবুর অসুখের সময় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি যাইতেন না। কেহ নেহাত পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "দেখ, গিরিশের কষ্ট আমি দেখতে পারি না।" তাঁহার অনুরাগ কত গভীর ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল গিরিশবাবুর দেহত্যাগের দিনে (১৯১২ খ্রিঃ, ৮ ফেব্রুয়ারি)। সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ শোকদমনের জন্য দিবসব্যাপী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরদিন মৌন ভাঙ্গিলেও সব সময় শুধু গিরিশের প্রসঙ্গেই অতিবাহিত হইল। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াও তিনি অনুরূপ কারণেই বেলুড়ে যান নাই, যদিও তিনি কলকাতায়ই ছিলেন। অথচ দুঃখবোধ ছিল তাঁহার সুগভীর। কাশীতে থাকাকালে বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তিনি তিন দিন স্তব্ধবৎ অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশী হইতে একবার আলমোড়ায় যাইবার জন্য হরি মহারাজ সাদর আমন্ত্রণ জানাইলে লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন, "জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানে বিরাজ করছেন। তাঁদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

যাহা হউক, গিরিশবাবুর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণবাবুর একমাত্র পুত্র ঋষি

অকস্মাৎ কলেরা রোগে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মন কলকাতা হইতে উঠিয়া গেল। তিনি হয়তো তখনই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু বাবুরাম মহারাজের বিশেষ অনুরোধে ৺দুর্গাপূজা পর্যন্ত থাকিয়া ৺বিজয়াদশমীতে কাশীযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে বাসগৃহখানির দিকে তাকাইয়া তিন বার বলিলেন, "মায়া, মায়া, মায়া!" পথে বৈদ্যনাথ-দর্শনান্তে কাশীতে সদলবলে পৌঁছিয়া তিনি অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন; কিন্তু সেখানে স্থানাভাব দেখিয়া টেড়িনিমে কুণ্ডু মহাশয়দের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। এই বাটিতে সপ্তাহখানেক থাকিয়া সোনাপুরায় বংশী দত্তের বাটিতে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর বাড়িওয়ালার আত্মীয়েরা আসিতেছেন শুনিয়া ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্বেই ৬৮ নং পাঁড়ে হাউলির বাড়িটি ভাড়া লইয়া তথায় উঠিয়া গেলেন। প্রায় চারি বৎসর এই বাড়িতে অবস্থানান্তে তিনি ৯৬নং হাড়ার-বাগের ভাড়াবাটিতে উঠিয়া যান এবং সেখানেই স্বধামে গমন করেন।

কাশীতে বাসকালে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার সুগুপ্ত ভক্তি হঠাৎ নিজ পূর্ণ সৌষ্ঠবে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভাসাভাসা মাতৃভক্তির প্রতিবাদকল্পে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে না!" কিন্তু সেদিন ৺বিশ্বনাথের পূজার জন্য পুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া রাস্তায় নামিয়া অকস্মাৎ বলিলেন, "চল, আগে মার কাছে যাই।" মা তখন কাশীতে। সেখানে গিয়া কম্পিতকলেবরে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক লাটু মহারাজ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

পাঁড়ে হাউলির বাড়িতে লাটু মহারাজ জপধ্যানে এতই তন্ময় থাকিতেন যে, আহারাদির কোন নিয়মিত সময় ছিল না; গৃহে থাকিলেও তাঁহার জীবনে পর্বতকন্দর বা অরণ্যোচিত শৃঙ্খলাহীনতা লক্ষিত হইত—আজ যদি দৈনিক আহার হইল দশটায়, তো কাল রাত্রি একটায় এবং পরশ্ব রাত্রি তিনটায়! এইরূপ ধ্যান ও কঠোরতাদি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "আরে, আমরা আর কি কঠোর করছি? কঠোর করেছিল দস্যু রত্নাকর। সংস্কারের দাগ যেন পাথরের আঁক—সহজে উঠে না। কর্ম না হলে কি কৃপা মিলে?"

কাশীতে তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার দুশ্চিকিৎস্য (সম্ভবত যক্ষ্মা) রোগে আক্রান্ত একটি দরিদ্র যুবক তাঁহার পাঁড়ে হাউলির বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাঁহারই বিধানানুসারে মাত্র ৺বিশ্বনাথের পূজা ও চরণামৃত পানপূর্বক নিরাময় হইয়াছিল। একসময়ে গৃহনির্মাণের জন্য কিছু টাকা তাঁহারই আশ্রিত কেহ চুরি করিলে পুলিসে খবর দিবার কথা উঠে। অমনি বাধা দিয়া তিনি বলেন, "দেখ, সে বেচারী লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করেছে সত্য; কিন্তু যাকে আশ্রয় দিয়েছি তাকে পুলিসে দেওয়া কি ভাল দেখায়?" একবার জনৈক

নিঃসম্বল ভক্তের অভিলাষ হয় যে, তিনি কলকাতা হইতে কাশীতে ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইবেন, কিন্তু একান্ত দরিদ্র তাঁহার পক্ষে উহা কিরূপে সম্ভব হইবে? সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোনও প্রকারে এক পিঠের রেল-ভাড়া সংগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিলেই আর সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই আশ্বাস পাইয়া ভক্তটি আসিলেন বটে; কিন্তু নিজেকে কপর্দকশূন্য দেখিয়া বড়ই মনঃক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৺বিশ্বনাথদর্শনে যাইয়া সেই কষ্ট আরও বর্ধিত হইল। কারণ সামান্য ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করিলেও বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন সকলেই দান করিতেছে, আর নিঃস্ব তিনিই মাত্র সেই পুণ্যার্জনে বঞ্চিত, তখন তাঁহার মনে এইরূপ ধিক্কার আসিল—"একে তো তীর্থে আসিয়া সাধুর অন্ন ধ্বংস করিতেছি, অধিকন্তু পুণ্য-অর্জনের জন্য একটি পয়সারও ক্ষমতা রাখি না।" গৃহে ফিরিয়া তিনি রুদ্ধকক্ষে অশ্রুপাত করিতে থাকিলে অদ্ভুতানন্দ সব জানিতে পারিয়া বিধান দিলেন, "তুমি গঙ্গাস্নানান্তে ভগবানের উদ্দেশে গঙ্গাজল অর্পণ করে এই বলে প্রার্থনা করো, 'জগতের সমস্ত দুঃখ দূর হোক'।" ভক্তটি ভাবিলেন, 'ইহা অক্ষমের সান্ত্বনার জন্য একটা অনুকল্প ব্যবস্থা মাত্র, প্রকৃত পুণ্যলাভ ইহাতে হয় না।" তথাপি মহাপুরুষের আদেশ মান্য করিয়া তাহাই করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঐরূপ করিবামাত্র তাঁহার মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

লাটু মহারাজ অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। এক সময়ে জনৈক ভক্ত স্বীয় পরিবারের মহিলাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে লইয়া গেলেন না; বলিলেন, "ও পাথর দেখে কি হবে!" ভাবিলেন, তিনি খুব বেদান্তবাদী হইয়াছেন। ঐ দিন লাটু মহারাজের দর্শনার্থে যাইয়া তিনি যখন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন, তখন শুনিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেছেন, "পাথর! আমি দেখছি, সাক্ষাৎ শিব; আর তুই বলছিস পাথর!" এই ঘটনাটিকে শুধু কাকতালীয়-ন্যায়ে বিভিন্ন ব্যাপারের আকস্মিক মিলন বলিয়া যুক্তিবাদী উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি তিনি কতবার প্রয়োগ করিবেন? কারণ লাটু মহারাজের জীবনে এইরূপ ঘটনা অহরহ ঘটিত। এক রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত এক ভক্ত কুস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় তিনি ঐ ভক্তকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখানে এসেও এই সব চিন্তা?" তাঁহার নিকট যে সব ভক্ত বা সেবক থাকিতেন, তাঁহাদের মনে ধ্যানকালে অপবিত্র ভাব উদিত হইলে অন্তর্দ্রষ্টা লাটু মহারাজ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, "পবিত্র হও, পবিত্র হও। সৎ না হলে সৎ-স্বরূপকে জানতে পারবে না" ইত্যাদি। জনৈকা মহিলা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া আত্মীয়গণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি যেন কেমন করিয়া সে

গোপন রহস্য অবগত হইয়াছেন; কাজেই প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র কহিলেন, "স্ত্রীলোকদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। যে মানে না, তার সংসারে খিটি-মিটি লেগেই থাকে।" বিধবা সঙ্গিনী দুইজন তাঁহার পদপ্রান্তে দুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "গরিব আর বিধবার টাকা সন্ন্যাসীকে নিতে নেই।"

লাটু মহারাজকে নিত্য বহু ভক্তের বিবিধ আধ্যাত্মিক অভাব মিটাইতে হইত। নিরক্ষর তাঁহার মুখে অবিরাম উচ্চ ধর্মতত্ত্ব-শ্রবণের জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এই সময়ের উপদেশাবলী সংগৃহীত হইয়া 'সৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর অনুভূতি ও অপরের মনে প্রেরণা জাগাইবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

শেষবয়সে তাঁহার দেহে বহুমূত্ররোগ দেখা দিল। এই সময় পায়ে একটা ফোসকা হইয়া যথোচিত যত্নের অভাবে বিষাক্ত পচাঘায়ে (গ্যাংগ্রীনে) পরিণত হয়। অস্ত্রোপচারের ফলে সে যাত্রা উহা সারিলেও পুনর্বার বহুমূত্রজনিত বিষাক্ত ক্ষত দেখা দিল। ইহার চিকিৎসাকল্পে শেষ চারিদিন প্রত্যহ তাঁহার দেহে দুই-তিন বার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল; কিন্তু কি অপূর্ব তিতিক্ষা—দেখিয়া মনে হইত না যে, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন! অস্ত্রোপচারে কোন ফল হইল না। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার শেষসংবাদ স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে (২৫।৪।২০) সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন দেখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন—ভ্রূমধ্যবদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত! সদা সচেতন, অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না।...মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন; প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প—বলিত, 'তবে আমিও কিছু খাব না।' অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প—বলিল, 'খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না।' লাটুমহারাজ এবার বলিলেন 'মৎ খা'—একেবারে মায়া-নির্মুক্ত উক্তি! পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২°৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোন বাহ্য চেষ্টা নাই।...দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। বেলা ১০ টার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত

হইব বলিয়া আসিলাম।...বাটি আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম লাটু মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।... আমি তাঁহাকে শেষদর্শন করিবার জন্য ৯৬ নং হাড়ার-বাগ বাটিতে উপস্থিত হইলাম।

"যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। এমন শান্ত, সকরুণ, আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতঃপূর্বে অর্ধ-নিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা, কি সাম্য ও মৈত্র-ভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে—সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন।...ধন্য গুরু মহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!"

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

কলকাতার বাগবাজার-অঞ্চলে বসুপাড়া পল্লিতে শ্রীযুত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; আর তাঁহার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাই আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাঁহাকে বলিয়া রাখিতেন, "শেষ সময়ে ভুলো না; হাড় কখানা যাতে গঙ্গায় যায়, তার ব্যবস্থা করো।" চন্দ্রনাথ ডবলিউ ওয়াটসন কোম্পানির গুদাম-সরকার ছিলেন। এই সামান্য আয়েই তিনি সহধর্মিণী প্রসন্নময়ীর সহিত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও হরিনাথ নামে চন্দ্রনাথের তিনটি পুত্র ছিল। তাঁহার কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভিন্ন সকলেই অকালে গতাসু হয়। হরিনাথ আমাদের উত্তরকালের স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি (১২৬৯ সাল, ২০ পৌষ, শনিবার, চান্দ্র পৌষ, শুক্লা চতুর্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্রে বেলা ৯টায়) জন্মগ্রহণ করেন। ঠিকুজির ফলে জানা যায় যে, হরিনাথ বিদ্বান, তপোনিষ্ঠ, স্বধর্মপরায়ণ সন্ন্যাসী হইবেন। বালকের জন্মগ্রহণের পর চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ এসেছেন।" হরিলুটের সন্তান বলিয়া চন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম রাখিলেন হরিনাথ।

হরিনাথ যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু, তখন অকস্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত শৃগাল তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলে শিশুকে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া প্রসন্নময়ী তাহাকে দুই হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন। এইরূপে সন্তান রক্ষিত হইলেও মাতা শৃগালদংশনে অচিরে দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার ওপর হরিনাথের লালনপালনের ভার অর্পিত হইল। মহেন্দ্রনাথ হরিনাথ অপেক্ষা বিশ বৎসরের এবং উপেন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বড় ছিলেন। স্নেহপরায়ণা ও কোমলপ্রাণা ভ্রাতৃবধূর আদরযত্নে হরিনাথ জননীর অভাব অনেকটা ভুলিলেন বটে; কিন্তু অজ্ঞাতে সে শূন্যতা তাঁহার কিশোরচরিত্রে একটু পরিবর্তন আনিয়া দিল। সহিষ্ণুতার প্রতিমা মাতার নিকট যে হরিনাথ দুরন্ত ছিলেন, ভ্রাতৃজায়ার নিকট তিনি বড় শান্ত ও বাধ্য হইয়া পড়িলেন। আহারে তাঁহার তেমন বিচার রহিল না, যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। তথাপি তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আকারে বাহির হইয়া পড়িত; তখন তিনি অপরকে প্রহারাদি পর্যন্ত করিতেন। বড় বউদির স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বড় বউদির কাছেই মানুষ হয়েছিলুম। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। ভয়ানক নেওটা ছিলুম। বড়

বউদিও আমায় খুব স্নেহযত্ন করতেন, মার মতো মানুষ করেছিলেন। সাধু হয়ে গেলেও তাঁর জন্য চিন্তা ছিল। তাঁর শরীর না যাওয়া পর্যন্ত চিন্তিত ছিলুম। তাঁর শরীর যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হলুম।" বুদ্ধিবিকাশের পরেই হরিনাথ কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয়গণ যখন তাঁহার পিতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইলেন, তখন হরিনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। হরিনাথের দিদি পিতাকে বলিলেন, "হরি কাঁদছে, ওকে একটু সান্ত্বনা দিন।" পরলোকে প্রসারিতদৃষ্টি সপ্ততিপর বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, "হরিকে আর কি বলব? হরি জগতের, জগৎ হরির।"

বাল্যকালে শরীরচর্চা ও ব্রহ্মচর্যপালনে হরিনাথের একটু মাত্রাধিক্য দেখা যাইত। তিনি প্রত্যহ আখড়ায় যাইয়া কুস্তি লড়িতেন এবং একসঙ্গে একশত ডন ও পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন। সঙ্গী ছেলেরা বলিত, "অত করিস নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস; শেষে মরে যাবি।" বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হরিনাথ উত্তর দিতেন, "আমি একাই মরে যাব; আর তোরা বেঁচে থাকবি!" ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বালব্রহ্মচারী হরিনাথ গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যারাধনা তো নিয়মিত করিতেনই, তদুপরি প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাক হবিষ্যান্ন-ভোজন ও কঠিন শয্যায় শয়নাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রপাঠাদিও যথেষ্ট ছিল। বেদান্তবিচারে তিনি অল্পবয়সেই পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার চাল চলনের অসাধারণতা-দর্শনে হিতকামী প্রতিবেশীরা মহেন্দ্রনাথকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু উপার্জনক্ষম জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসনের দ্বারা তখনই সংসারে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন না; বরং বলিলেন, "হরিনাথ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সদাচারেই তো লিপ্ত আছে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?" এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হরিনাথকে একদিকে যেমন কখনও কখনও বিপদগ্রস্ত করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি সুপ্রবৃত্তিগুলিকে পল্লবিত করিয়া এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল।

গঙ্গাস্নানে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। নিজের নিকট ঘড়ি না থাকায় অনেক দিন তিনি ভুলক্রমে অধিক রাত্রে উঠিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন এবং যথাসময়ে গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে ফিরিতেন। এইরূপে এক জ্যোৎস্না রাত্রে প্রত্যূষের পূর্বেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। একটু পরে একগলা জলে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, যেন খড়ের তালের মতো কি একটা তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। তীর হইতে শব্দ হইল, "কুমীর, কুমীর! উঠে এস।" অমনি সংস্কারবশে হরিনাথ তৎক্ষণাৎ জল ছাড়িয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মরণ হইল, "আমি না

বেদান্তবিচার করি? এই বুঝি আমার 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' বলা?" কাজেই পুনঃ গঙ্গায় নামিয়া বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার দেহ নাই, মৃত্যু নাই।" সৌভাগ্যক্রমে জলে নাড়া পড়ায় বা যে কোনও কারণেই হউক কুমীরটাকে আর দেখা গেল না।

আচারনিষ্ঠ হইলেও হরিনাথ গুণগ্রাহী ছিলেন। তখন জেনারেল এসেম্বলিতে বাইবেল-পাঠ অপরিহার্য হইলেও পাঠকালে কক্ষটি প্রায়ই শূন্য থাকিত। অথচ হরিনাথ স্বহস্তে নারায়ণপূজা-সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল-পাঠ শুনিতেন। কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' ও তুলসীদাসের দোঁহাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া মহিলাকাব্যের 'মাতা'র অংশটি কিংবা দোঁহাবলী অনর্গল আবৃত্তি করিতেন এবং উহাতে সন্ধ্যাকিরণোদ্ভাসিত পবিত্র জাহ্নবীতীরে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইত।

পিতার দেহত্যাগের পরে আহারাদি-সম্বন্ধে হরিনাথের কঠোরতা যেন ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল। কিন্তু শরীর অত সহিতে পারিবে কেন? ফলে শীঘ্রই তাঁহার আমাশয় হইল এবং আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে এই বিষয়ে কতকটা শিথিলতা অবলম্বন করিতে হইল। এইরূপে বাহিরের কঠোরতা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলেও একটি ঘটনায় অন্তরের বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রিয়নাথ ও কেদারনাথ নামীয় দুইটি খুল্লতাতপুত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন। কেদারনাথ অল্পবয়সেই বিসূচিকারোগে দেহত্যাগ করিলেন। হরিনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন—মানুষের জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর, আর মৃত্যুর সম্মুখে মানুষের সর্বপ্রকার চেষ্টা, সর্বপ্রকার স্নেহের আকর্ষণ কত অকিঞ্চিৎকর!

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে চিৎপুরে ৺সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধুর আগমন হয়। বাল্যবন্ধু গঙ্গাধরের (অখণ্ডানন্দজীর) সহিত হরিনাথ প্রায়ই সেখানে যাইতেন; কিন্তু সকাম অপর দর্শকদের ন্যায় তিনি বাক্‌সিদ্ধ সাধুর নিকট কোনও প্রার্থনা না জানাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। সাধু ইহা লক্ষ্য করিয়া হরিনাথকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আস যাও, কিছু তো চাও না? তোমার কি চাই?" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "সাধন-ভজন ও ভগবানলাভ।" সাধু আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "বেশ বেশ! তোমার হবে। তবে এখন নয়, একটু দেরি আছে। এখন ঘরে থেকে সাধন কর।" হরিনাথ সাধুর বাক্য শিরোধার্য করিয়া গৃহে থাকিয়াই সাধন-ভজনে ডুবিলেন।

হরিনাথের মনে তখন ধর্মপিপাসা জাগিয়া তাঁহাকে উহার সন্ধানে সর্বত্র লইয়া

যাইতেছে। এই সময়ে পল্লিতে প্রচার হইল যে, দীননাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিবেন। সংবাদ পাইয়া তিনি গঙ্গাধরের সহিত সেখানে গেলেন। হরিনাথের বয়স তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর। সেই প্রথম সন্দর্শনের কথা তাঁহার একখানি চিঠি ( ১৯।৯।১৭ তাং) হইতে জানা যায়। কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের তখন 'সবে পরিচয় হইয়াছে'। হরিনাথ ও গঙ্গাধর সেখানে গিয়া দেখিলেন, একখানি গাড়ি হইতে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি (হৃদয়) অপর একজন সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তিকে নামাইতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখকান্তি ও অঙ্গের ভাব যেন শাস্ত্রবর্ণিত শুকদেবের ন্যায়। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলে তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মধুরকণ্ঠে "যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি" ইত্যাদি গান গাহিলেন এবং অনেক পরমার্থপ্রসঙ্গ করিলেন। ইহার পর হরিনাথ আরও দুই তিন বৎসর পূর্বেরই ন্যায় সাধন-ভজনে ব্যাপৃত রহিলেন। তবে তিনি স্থির করিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া কেহ আসিলে বরের মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া আলাপ-আলোচনা সেইখানেই শেষ হইত। পড়াশুনার দিকেও আর তাঁহার তেমন মন রহিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি দিলেন না। জিজ্ঞাসিত হইয়া শুধু বলিলেন, "কি হবে ইংরেজি বিদ্যা শিখে?"

দীননাথ বসুর বাটিতে প্রথম সন্দর্শনের দুই-তিন বৎসর পরে (সম্ভবত ১৮৭৯ বা ১৮৮০ খ্রিঃ) হরিনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ হয়। ঠাকুর তাঁহাকে ছুটির দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাইতে বলিয়া দেন। অধিকন্তু তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন যে, হরিনাথ অদ্বৈতবিচার করেন এবং 'রামগীতা' তাঁহার প্রিয় পুস্তক। ঠাকুর তাঁহাকে কিরূপে এই শুষ্ক জ্ঞানপথ হইতে সরস জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথে আনিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিব (১ম ভাগ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ ৩৭-৩৮ পৃঃ)—

"আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনাথ একসময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যানভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। যে বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, তুই যে একলা, সে আসে নি?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, 'সে মশাই আজকাল খুব বেদান্ত চর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার-তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময়

নষ্ট হবে বলে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। উহার কিছুদিন পরেই আমরা যাহার কথা বলিতেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; না আর কিছু?' বন্ধু—'আজ্ঞা হাঁ, আর কি?' বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্তসম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল।'...কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার (হরিনাথের) ধারণা ছিল—উপনিষদ্, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিলগ্রন্থ না পড়িলে, সাংখ্যন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদান্ত কখনও বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধন-ভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।...

"পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটিতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাটির দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন। শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—'কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর

দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সে শক্তি দিয়ে সে কতটুকু ধারণা করতে পারে?' এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'একটা ঠিক করিতে পারে না, আবার আর একটা চায়।' ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে!'

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হলেন। বন্ধু বলেন, 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার অন্তরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে'।"

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, কামটা একেবারে যায় কি করে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না!" হরিনাথ জানিতেন, যুদ্ধ করিয়াই সমস্ত মনোবৃত্তিকে পরাজিত করিতে হয়; তাই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক হইলেন। আবার আরও অবাক হইলেন, যখন তিনি উহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য-সম্বন্ধে তাঁহার আরও শিক্ষার অবকাশ ঘটিয়াছিল। বাল-ব্রহ্মচারী হরিনাথ নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এমন কি, মাতৃকল্পা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর হস্তে আহার করিতে পর্যন্ত তাঁহার মন সঙ্কুচিত হইত। বালিকাদিগকে তিনি নিকটেও আসিতে দিতেন না। উক্ত বিষয়ে ঠাকুর একদিন উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় হরিনাথ বলিলেন, "উঃ আমি তোদের হাওয়া সহ্য করিতে পারি না।" ঠাকুর অমনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুই বোকার মতো কথা বলছিস। নারীমূর্তিদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি? তারা জগন্মাতার মানবী মূর্তি। তাদের মায়ের মতো দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়। তা না করে যতই তাদের অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি।"

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "মশাই, যখন আমি এখানে আসি তখন বেশ উদ্দীপনা পাই; কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন?" ঠাকুর স্নেহসিক্ত-স্বরে শিষ্যের মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মাইয়া বলিলেন, "তা কি করে হতে পারে? তুই হরিদাস, হরির দাস; তোর পক্ষে ঈশ্বরবিস্মৃতি

অসম্ভব।" হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন "আমি তো তা বুঝতে পারি না।" সদ্‌গুরুও তেমনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "কোন বস্তু বা বিষয়ের সত্যতা কারুর জানা বা না জানার ওপর নির্ভর করে না। তুই জানিস আর নাই জানিস, তুই হরির সেবক, হরির ভক্ত।"

হরিনাথ জানিতেন, মুক্তি বা নির্বাণলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই বিষয়েও ঠাকুর একঘেয়ে ভাব সরাইয়া তাঁহার মনকে আরও উদার করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নির্বাণকে আদর্শ করেছিস কেন? নির্বাণ অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা লাভ করা যায়। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হীনবুদ্ধি, ভয়তরাসে—যেমন দশ-পাঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে—কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়, আবার তখনই কচেবারো বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলো।"

হরিনাথ আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর একজন বেদান্তের পণ্ডিতকে বলিতেছেন, "কিছু বেদান্ত শোনাও।" পণ্ডিত চমৎকার বুঝাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ঠাকুরও প্রীতিসহকারে শুনিতে লাগিলেন। পরে কিন্তু তিনি পণ্ডিতের সুখ্যাতি করিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্চে কিন্তু—মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" ঠাকুরের কথার ভঙ্গিতে বেদান্তের ত্রিপুটী অপেক্ষা ঠাকুরের 'মা আর আমি' হরিনাথের নিকট সেদিন বড় সহজ, সরল ও মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাই অবলম্বনীয়।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন, হরিনাথ এবং অপর কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে ভাতের থালা এবং চারিদিকে ছোট ছোট বাটিতে ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হইয়াছে। শিষ্যদের মনে পাছে কোন সংশয় জাগে এই জন্য লোককল্যাণকামী ও সন্দেহভজন ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, "মনটা সদাই অখণ্ডের দিকে ছুটে। তোমাদের সঙ্গে কথা কইব বলে মনটাকে নিচে নামিয়ে রাখবার জন্য এটা খাই, ওটা খাই—ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দিই।"

হরিনাথ ঠাকুরকে অবতার বলিয়া জানিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার রোগযন্ত্রণাদিকে লীলা মনে করিয়া ঐ জন্য তত উদ্বিগ্ন হইতেন না। কাশীপুরে একদিন ঠাকুরকে

দেখিতে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর বলিলেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না; অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা হচ্ছে।" হরিনাথ কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখিলেন—ঠাকুর আনন্দের সাগর ও রোগযন্ত্রণার অতীত। ঠাকুর যতই নিজের যন্ত্রণার কথা বলেন, হরিনাথ ততই ঐরূপ অনুভূতি করেন। বারংবার এইরূপ হওয়ায় তিনি ঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর মৃদুহাস্যে আপনমনে বলিলেন, "শালা ধরে ফেলেছে রে!"

দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে নরেন্দ্রের সহিত হরিনাথের একটা বেশ শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল! দুইজনে অনেক সময় একই সঙ্গে হাঁটিয়া বা গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একদিন হাঁটিয়া বরাহনগরের পথে ফিরিবার সময়ে নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল।" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "কি আর বলব?" এই বলিয়া তিনি "অসিতগিরিসমং স্যাৎ"[১] ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। নরেন্দ্রনাথও নানাকথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "ওঁর কথা আর কি বলব? আমাকে যদি বল, তিনি এল-ও-ভি-ই (love) personified (মূর্তিমান প্রেম)।" আর একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হরি-ভাই, ভগবান কি শাক-মাছ, যে এত দাম দিয়ে (অর্থাৎ এত জপ-তপ করে) তাঁকে কিনবে? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—পরমাত্মা যাঁকে কৃপা করেন তাঁরই কাছে তিনি লভ্য হন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্প পরেই হরিনাথ প্রবল বৈরাগ্যের আকর্ষণে একমাত্র বস্ত্র পরিয়া এবং উত্তরীয়রূপে একখানি লেপের ওয়াড় স্কন্ধে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং আসামের শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন; অতঃপর চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণান্তর স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাসের পরও সহোদরদের প্রতি তাঁহার ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ একদিন দেখেন, এক মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রু। উপেন্দ্রনাথ চিনিলেন, ইনিই হরিনাথ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন? এই তো তুমি চাও।" উত্তর আসিল, "আপনাদের নিকট আমি অনেক প্রকারে ঋণী।" দাদা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তা হোক; বড় ভাইদের যা কর্তব্য

---

১ "সাগররূপ মসীপাত্রে যদি নীলপর্বতসদৃশ মসী রাখা হয়, কল্পতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্রিকা হয়, আর ৺সরস্বতী অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণরাশির সীমা করা যায় না।" —শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

তা আমরা করেছি। কিন্তু তুমি যখন গৃহী হলে না, তখন এই পথই ভাল! আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক।" অমনি মেঘমুক্ত শারদাকাশ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হইল—হরিনাথের অশ্রুসিক্ত মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু বরাহনগরের পরিবেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না—পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি চলিলেন তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে। এইরূপে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামী সারদানন্দাদির সহিত হৃষীকেশে তপস্যা করেন এবং পর বৎসর গ্রীষ্মকালে গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গমন করেন। ইহার সবিশেষ বিবরণ সারদানন্দপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া তিনি একাকী ভ্রমণপূর্বক মুশুরী পাহাড়ের সানুদেশে রাজপুরে উপস্থিত হইয়া তপস্যামগ্ন হন। এখানে সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের এক কর্মচারী তাঁহার অনুসরণ করে এবং বিবিধ প্রশ্নে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকে। হরি মহারাজ ইহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইলে গোয়েন্দা বলে, "আপনি পুলিসকে ভয় করেন না?" দৃপ্ত সিংহের পুচ্ছ পদদলিত হইলে সে যেমন বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া গর্জন করে, পুরুষসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্দও তেমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি যমকেও ভয় করি না, পুলিস তো দূরের কথা।" হিংস্র জন্তুকেও ভয় না করিয়া যিনি গভীর অরণ্যে বিচরণ করেন, তিনি কি সংসার-অরণ্যের ক্ষুদ্র হিংস্র মানবের নিকট পরাজিত হইবেন? বস্তুত পরাজয় হইল পুলিসের। সে পরে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিল।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে কিয়দ্দিবস বিভিন্ন স্থানে যাপনান্তে হরি মহারাজ দিল্লী হইতে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বহুস্থান-দর্শনান্তে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তিনি বোম্বে আসিয়া আমেরিকাগামী স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। তথায় একদিন স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নহে; সুতরাং সমাগত ভদ্রলোকদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ হরি মহারাজকেই করিতে হইবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরি মহারাজ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে স্বামীজী তাঁহাকে একান্তে বলিলেন যে, গৃহস্থদিগকে এরূপ উচ্চাঙ্গের বৈরাগ্যের উপদেশ দিলে অযথা তাহাদের মন বিচলিত হয়—তাহারা উহার মোটেই অনুসরণ করিতে পারে না। অমনি হরি মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "আমার মাথায় ছিল যে, আপনি উপস্থিত আছেন; কাজেই যা-তা বলা চলে না। বেশি ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল।"

ইহার স্বল্পকাল পরে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে গমনপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যায় কাটাইয়াছিলেন। হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন

ও ভালবাসিতেন। সুতরাং তাঁহাকে ভিক্ষার্থে যাইতে না দিয়া স্বয়ং দ্বারে দ্বারে খণ্ড খণ্ড রুটির সন্ধানে ঘুরিতেন। এই কঠিন শ্রমের ফলে কোন দিন উদরপূর্তি হইত, কোন দিন বা হইত না। একদিন কূপের পার্শ্বে দুইজনে বসিয়া জলে ভিজাইয়া শুষ্ক রুটি খাইতেছেন, এমন সময়ে হরি মহারাজ সকাতরে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত স্নেহযত্ন করতেন এবং ক্ষীর সর ননী খাওয়াতেন; আর আজ আমি শুকনো রুটি খাওয়াচ্ছি"—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে হরি মহারাজ রাধারানীর দর্শনমানসে কখনও কখনও নিধুবনে যাইতেন। একদিন তমালবৃক্ষের শাখায় রাধারানীর আলুলায়িত বেণী দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন উহা ময়ূরপুচ্ছ; কিন্তু অচিরেই নয়নপথে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে চমকিত করিল। একদিন বহু গৃহে ভিক্ষাটনে ক্লান্ত হইয়াও পূর্ণকাম না হওয়ায় শরীরের উপর তাঁহার অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। জলে-ভেজানো রুটি মুখে দিতে দিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "শালা শরীর, তোর জন্যই তো আমার এত কষ্ট—এই খা।" ইহার পর তাঁহার স্পষ্ট অনুভূতি হইল, "আমি দেহ নহি—আমি স্বতন্ত্র, ক্ষুধাতৃষ্ণাবর্জিত আত্মা—দেহটা ত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পৃথক পড়িয়া আছে।" এই অনুভূতির পর অতৃপ্ত ক্ষুধায় ও পর্যটনে ক্লান্ত দেহ ভূশয্যায় লুটাইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখেন, শরীরের ক্লান্তি বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে দেহমন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে এক অসীম আনন্দ। অতঃপর তিনি অযোধ্যাদি দর্শনান্তে ১৮৯৪-এর শেষে মঠে ফিরিয়া প্রায়শ সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তবে মধ্যে একবার দেওভোগে নাগ মহাশয়কে দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬-এর শেষে মুঙ্গের ও মিথিলা প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন।

হরি মহারাজের পরিব্রাজকজীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কালনির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ চরিত্রাঙ্কনের পক্ষে তাহারা অপরিহার্য। একদা গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে নগ্নপদে ভিক্ষাটনের পর প্রয়াগের নিকটবর্তী কোন আম্রকাননে কূপের শীতল জলে স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে যাইয়া তিনি মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ অঞ্চলের কোন সাধুভক্তের সেবায় দুই দিন পরে সংজ্ঞালাভ হয়।

পথ চলিতে চলিতে তাঁহার একদা মনে হইল, "জগতে সকলেই কোন-না-কোন কর্তব্যসম্পাদনে রত; শুধু আমিই ভবঘুরের মতো ব্যর্থ জীবনযাপন করছি।" তারপর কেশীঘাটে শায়িতাবস্থায় ধ্যান করিতে তাঁহার অনুভূতি হইল—সুবিশাল ভূমিতলে তিনি শায়িত আছেন এবং তাঁহার দেহ আকাশ-পাতাল জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে; আর সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশরীরী বাণী উঠিতেছে, "দেখ,

তুমি কত মহান! কেন তুমি ভাব তোমার জীবন ব্যর্থ? ওঠো, জাগো, পরম সত্য লাভ কর—সে সত্যের কণামাত্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে। ইহাই মহত্তম জীবন।" তুরীয়ানন্দ চমকিত হইয়া জাগিলেন—সে গ্লানি চিরতরে তিরোহিত হইল।

সৌরাষ্ট্রে গীর্নার পাহাড়ে শরীর অসুস্থ হইলে তিনি বৈদ্যের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। অমনি স্মৃতিতে জাগিল "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ"—আর বৈদ্যগৃহে যাওয়া হইল না; ভগবানে নির্ভর করিয়া গঙ্গাজলে রোগনিবারণের আশায় কুঠিয়ায় ফিরিলেন।

উপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অভীঃ লাভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক প্রত্যূষে উত্তরকাশীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার পথে দেখেন, এক ব্যাঘ্র মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। অমনি প্রাচীন সংস্কার জাগিয়া তাঁহার গতি প্রতিহত করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়া দিল, "বাঘ মৃতদেহ খাচ্ছে তো খাক; এতে আমি ভীত হই কেন?" তিনি পুনর্বার স্বপথে অগ্রসর হইলেন। আর একবার টিহিরী-গাড়োয়ালে তপস্যাকালে রাত্রে গ্রামে রব উঠিল ব্যাঘ্র আসিয়াছে। অমনি তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্বীয় ভগ্নগৃহের দ্বারে ইষ্টক সজ্জিত করিয়া ব্যাঘ্রের পথরোধে তৎপর হইলেন। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে দেহবুদ্ধি পরাজিত হইয়া আত্মবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় পদাঘাতে সেই ইষ্টকস্তূপ অপসৃত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

স্বামীজীর প্রথমবারে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর হরি মহারাজ তাঁহারই ইচ্ছায় রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্র-ভ্রমণান্তে মঠে ফিরিয়া জানিলেন যে, গুরুভ্রাতাদের আগ্রহে স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বামীজী পুনর্বার এই সর্তে সমুদ্রযাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন যে, হরি মহারাজকেও তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে হইবে। স্বামীজী পূর্বেও তাঁহাকে এই প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। আজও তিনি সম্মত ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর সে অসম্মতির উত্তরে করুণ-স্বরে বলিলেন, "হরিভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমায় এ কাজে সাহায্য করবে না—কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?" আদেশ যখন আর্তির আকারে সম্মুখে আসে, তখন কাহার না মন টলে? তুরীয়ানন্দ এই যুক্তির কাছে পরাস্ত হইয়া ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজীর সহিত কলকাতা-বন্দরে জাহাজে উঠিলেন।

ক্রমে তিনি ইংলণ্ড হইয়া আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া কিয়দ্দিবস বেদান্ত-সমিতি-ভবনে অবস্থানান্তে রিজলি ম্যানরে শ্রীযুক্ত লেগেটের গৃহে স্বামীজীর সহিত অতিথি হইলেন। এখানে অনতিবিলম্বেই স্বামীজী জানাইলেন, "হরি ভাই, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে; আমি আর তোমার ভার নিতে পারব না। এখন তুমি কি

করবে দেখ।" হরি মহারাজ তো ভাবিয়া আকুল—কি করবেন এই বিদেশে? তিনি স্বামীজীকে জানিতেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কৌতুক নহে; পরন্তু কৃত্রিম কঠোরতার আবরণে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার কঠোরতর কৌশল। তিনি ভাবিয়া মন্ট্-ক্লেয়ারে বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা হুইলারের গৃহে যাওয়াই স্থির করিলেন। পরন্তু স্বামীজী যখন পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে যেন শাস্ত্রাধ্যাপন চলে, তখন তুরীয়ানন্দ অস্বীকৃত হইলেন। অগত্যা সৎপ্রসঙ্গ মাত্র করার উপদেশ দিয়া স্বামীজী বলিলেন, "ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। হরিভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভুলে যাও।" কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া ভাবী কার্যাবলীকে নবরূপ দান করিয়াছিল। যাহা হউক, মণ্ট্-ক্লেয়ারে উপস্থিত হইবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বহু কর্মে বিজড়িত হইতে হইল; কারণ তাঁহাকে পাইয়া শ্রীযুক্তা হুইলারের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল এবং তিনি বহু ব্যক্তিকে নবাগত সন্ন্যাসীর সকাশে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু মণ্ট্-ক্লেয়ারে থাকিলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ শনি ও রবিবারে নিউইয়র্কের কার্যে অভেদানন্দজীকে সাহায্য করিতেন। পরবর্তী গ্রীষ্মকালে অভেদানন্দ মহারাজ অন্যত্র গমন করিলে স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঐ সময়ের জন্য পূর্ণ কার্যভার লইতে হইল।

নিউইয়র্কের বেদান্তানুরাগীরা তাঁহার নাম ও যশ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতররূপে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বেদান্তসমিতির বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি অন্ধকার গৃহে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত ব্যক্তিদের সহিত সদালাপ করিতে নির্গত হইতেন। তখন তাঁহার হাস্যময় মুখ, সৌজন্য ও বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার আগ্রহ আগন্তুককে মুগ্ধ করিত। অন্তররাজ্যে মগ্ন থাকা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ের কথা ভুলিয়া অনেক ক্ষেত্রে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রসঙ্গ চালাইতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাঝে মাঝে "হরি ওঁ", "হরি ওঁ তৎ সৎ" বা "শিব শিব" উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা আপনমনে অনেকক্ষণ ধরিয়া সংস্কৃতশ্লোক আবৃত্তি করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তি ইহার অর্থ না বুঝিলেও গুরুগম্ভীর সুললিত উচ্চারণে আকৃষ্ট হইতেন এবং বক্তার অন্তর্মুখিনতা লক্ষ্য করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। প্রশ্নোত্তরদানকালে তিনি অকস্মাৎ যেন আনমনা হইয়া সুদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন এবং নিজেই এই প্রকার আচরণের ব্যাখ্যাকল্পে বলিতেন, "প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুভাবে হতে পারে—একটি হচ্ছে উত্তর দিচ্ছি মনে করে উত্তর দেওয়া; আর অপরটি হচ্ছে অন্তর থেকে স্বতঃ উত্তর আসা। আমার উত্তর অন্তর হতে আসে।"

অন্তরঙ্গের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি কিরূপে স্থান-কাল ভুলিয়া যাইতেন একদিনের ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন গুরুদাস মহারাজের সহিত একটি সম্ভ্রান্তপল্লির পথে চলিতে চলিতে তিনি আলোচ্য বিষয়ে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিবাক্যে যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে এবং মনোযোগী শ্রোতাও একমনে শুনিতেছেন। ভাবের আতিশয্যে কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চতর এবং গতিবেগ দ্রুততর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তিনি শূন্যে হস্ত প্রসারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদাস, সিংহতুল্য হও, সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত হও। একটা বড় লাফ মার, আর কাজ ফতে কর।" এরূপ ঘটনায় আকৃষ্ট পথচারী শুধু মুচকি হাসিয়া চলিয়া যাইত। ব্যক্তিগত সৎপ্রসঙ্গের সহিত তিনি ধ্যানপ্রণালীও শিখাইতেন এবং সপ্তাহে একদিন গীতাব্যাখ্যা করিতেন। বক্তৃতা তিনি কদাচিৎ দিতেন; কারণ তাঁহার মতে "বক্তৃতাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় ঘনিষ্ঠ মিলনে। অবশ্য দুই-ই দরকার।"

দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমাঞ্চলে বেদান্তপ্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু স্বয়ং দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিবেন না জানিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে কার্যভার দিবেন স্থির করেন এবং ভক্তমণ্ডলীকে বলেন, "আমি তো তোমাদের কাছে শুধু বক্তৃতা করছি; এরপর তোমাদের কাছে আমি আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যার মধ্যে কি করে আমার বাক্যগুলিকে জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে।" ভারত হইতে যাত্রার পূর্বে তিনি হরি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "আমি পাশ্চাত্য জগৎকে ক্ষাত্রবীর্য দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও।" বস্তুত পাশ্চাত্য বেদান্তানুরাগীর জীবনগঠনের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীর বাণীতে মুগ্ধ হইয়া কুমারী মিনি বুক আশ্রমস্থাপনের জন্য সান আন্টোন উপত্যকায় ১৬০ একর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই আশ্রম গঠনের দায়িত্ব পড়িল হরি মহারাজের উপর।

তাঁহার নিকট পশ্চিমাঞ্চলে আহ্বান আসিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। সেখানে আসিয়া বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনি ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত প্রথমে লস এঞ্জেলেসে ও পরে ২৬ জুলাই সান ফ্রান্সিস্কো নগরে উপনীত হইলেন। উভয় স্থলেই নবাগত স্বামী একজন প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারকরূপে খ্যাতিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে (২ আগস্ট, ১৯০০) দ্বাদশজন ছাত্র-ছাত্রী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থাপনার্থে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল।

মিনি বুকের দান গ্রহণ করিলেও উহার স্বরূপ বা অবস্থান সম্বন্ধে গ্রহীতারা কিছুই

জানিতেন না। তাঁহারা সান ফ্রান্সিস্কো হইতে রেলযোগে শেষ স্টেশন সান হোজেয় উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে চারি-ঘোড়ার গাড়িতে চল্লিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সান আন্টোন উপত্যকায় অবতরণপূর্বক দেখিলেন—উপত্যকার একাংশ বন্ধুর এবং উহা ওক, পাইন ইত্যাদি বৃক্ষে সমাকীর্ণ, অপরাংশ সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত; সুদূরে চির-তুষারাবৃত সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা; উপত্যকাটি শীতে অতীব শীতল এবং গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ; শীতে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, পরে সব শুকাইয়া যায়—আশ্রমভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নির্ঝরিণীতে এক বিন্দুও জল থাকে না; পানীয় জল চারি মাইল দূর হইতে আনিতে হয়; আশ্রমের বিস্তীর্ণ ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৫ বিঘা; উহাতে একখানি কাঠের ঘর ব্যতীত কিছুই নাই। আশ্রয়হীন, জলহীন এই বিজন প্রদেশে সুখে লালিত আমেরিকার নগরবাসীরা বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য—এই দুর্বিষহ চিন্তায় ভগ্নহৃদয় তুরীয়ানন্দ জনৈক ছাত্রকে বলিয়াই ফেলিলেন, "এ তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ?" তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি ছাত্রী বলিল, "স্বামীজী, আপনি হতাশ হলেন যে! আপনি কি জগন্মাতার ওপর বিশ্বাস হারালেন?" সারাজীবন কঠোর তপস্যায় যে সন্ন্যাসী জীবনপাত করিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁহার হৃদয়ের করুণা আমেরিকান মহিলা বুঝিবে কিরূপে? হরি মহারাজ শুধু ছাত্রীটির কথাই অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস! আজ হতে তোমার নাম হলো শ্রদ্ধা।" শান্তি আশ্রমের সূত্রপাত হইল। নবাগতারা কয়েকটি তাঁবু খাটাইলেন; উহারই একটির মেঝেতে কাঠের পাটাতন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ক্রমে কাঁচা ইট ও কাঠের সাহায্যে আরও কয়েকটি গৃহ নির্মিত হইল। আশ্রমের সকল কার্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ উৎসাহ দিতেন ও যোগদান করিতেন এবং কেহ বাধা দিলে বলিতেন, "আমি নিজে না করলে ওরা শিখবে কিরূপে? সকলে মিলে কাজ করলে শীঘ্র হয়ে যায়।" একদিন কাঠ কাটিতে গিয়া অনবধানতাবশত তাঁহার নাক আহত হইয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ভাল কাঠুরিয়া হইতে হইবে!"

স্বামী তুরীয়ানন্দের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় শান্তি আশ্রমের সকলে তপস্যা ও অধ্যয়নাদিতে মগ্ন হইলেন। প্রত্যূষে স্নানান্তে শীতকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গৃহমধ্যে কিংবা গ্রীষ্মকালে বৃক্ষতলে ধ্যান চলিত। ধ্যানের পূর্বে সংস্কৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। এক ঘণ্টা ধ্যানের পর সকলে গৃহকার্য ও রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হইতেন। আটটায় প্রাতরাশের পর পুনর্বার কার্য আরম্ভ হইত এবং ১০টা-১১টায় 'রাজযোগ' বা গীতাদিপাঠের পর পুনর্বার এক ঘণ্টা ধ্যান চলিত। বেলা একটায় মধ্যাহ্নভোজন ও সন্ধ্যা সাতটায় সান্ধ্যভোজন হইত। তৎপরে সান্ধ্য ধ্যান। মাতৃভাবে মাতোয়ারা হরি মহারাজ সর্বাবস্থায় সকলকে মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। জাগতিক

আলাপ-আলোচনায় কেহ রত থাকিলে শুনিতেন তাঁহার 'হরি ওঁ' শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে; অমনি চিন্তা মায়ের দিকে ধাবিত হইত। তিনি বলিতেন, "আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলিতে থাকুক।"

এই ভগবৎপ্রবণতা তিনি শুধু মুখেই শিক্ষা দিতেন না; জীবনেও তাহা প্রতিপন্ন করিতেন। একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার একটি হস্ত কীটদষ্ট হইলে তিনি বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া পূর্ববৎ ধ্যানমগ্ন রহিলেন। কিন্তু পরে বিষের প্রতিক্রিয়ায় হাতটি ক্রমেই ফুলিয়া উঠিয়া জীবনসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তির তথায় আগমন হইল। তিনি বেদান্তের আকর্ষণে ৪০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া শান্তি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন—সঙ্গে কিছু ঔষধও আছে। ঐসব প্রয়োগের ফলে সকলে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

সর্বকর্মে ভারতসুলভ ভাবগতদৃষ্টি পাশ্চাত্যজীবনে সংক্রামিত করিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। একবার ভক্তের প্রদত্ত পুষ্প স্বয়ং আঘ্রাণ না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে দাতা জানিতে চাহিলেন, "আপনি কি ফুল ভালবাসেন না?" উত্তর আসিল, "নিশ্চয়ই! তা না হলে কি ঠাকুরকে দিতে পারতাম?" একদিন তিনি দেখিলেন রন্ধননিরতা ছাত্রী দেশাচার অনুযায়ী ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া লবণের পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছেন; অমনি তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, ভারতে দেবোদ্দেশে রন্ধন করা হয় এবং ভোগের পূর্বে কেহ গ্রহণ করে না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের শিক্ষায় এখন সকলেই অহিংস ও নিরামিষাশী। একদিন তাঁহার তাঁবুর পাটাতনের নিম্নে একটি র‍্যাটল-স্নেক (ঝুমঝুমে সাপ) প্রবেশ করিল। উহা ভয়ানক বিষাক্ত এবং চলার সময়ে ঝুমঝুম শব্দ করে। অহিংস আশ্রমবাসীরা সর্পটির প্রাণবধ করিলেন না, পরন্তু তাহাকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দূরে লইয়া গিয়া রজ্জু ছোট করিয়া কাটিয়া মুক্তি দিলেন। দুই-একদিন পরে দেখা গেল, সেই নেকটাই (গলাবন্ধ)-পরা সাপটি পুনর্বার যথাস্থানে সমুপস্থিত! এই দিনও পূর্ববৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করা হইল।

কথাপ্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দজী একদিন জানাইলেন যে, ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন, "আমার আরো সব ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চালচলনও ভিন্ন।" অতঃপর গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই সেই ভক্তমণ্ডলী।" এমন অচিন্তনীয় শুভসংবাদে সেখানে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজিত হইল। অবশেষে একটি ছাত্রী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার ন্যায় অযোগ্যা নারী এবংবিধ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "কে যোগ্য? ঈশ্বর কি যোগ্যতার মাপ

করেন?" ইহার অল্পকাল পরেই ঐ ছাত্রীটি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় দুই বৎসর শান্তি আশ্রমে ছিলেন। ইতোমধ্যে সান ফ্রান্সিস্কো, ওকল্যাণ্ড, লস এঞ্জেলেস প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের অনুরোধে কয়েক মাস ঐসব স্থানে গিয়া বাস করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সান ফ্রান্সিস্কোতে অবস্থানকালে তিনি পিত্তকোষের পাথুরিরোগে কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। ঐ নগরের এক ভক্ত মহিলা একদা জানাইলেন যে, তাঁহার পতি তাঁহার বেদান্তালোচনার বিরোধিতা করেন। প্রতিকারকল্পে হরি মহারাজ উপদেশ দিলেন, সতীর পতির আদেশ পালনীয়; সুতরাং বেদান্তচর্চা একটু কম করিলেও ক্ষতি নাই। পরন্তু ইহাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তিনি ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। ভক্ত মহিলা নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, এই উগ্রপ্রকৃতির লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অপমানমাত্র লাভ হইবে। তিনি তথাপি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া সহাস্যে তাঁহার করমর্দন করিলেন। অমনি সমস্ত বিরোধ তিরোহিত হইয়া বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠিত হইল ও ভদ্রমহিলার ধর্মপথের কণ্টক বিদূরিত হইল।

শান্তি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনর্বার আশ্রমের কার্যে মন দিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য পরিবেশের মধ্যে অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হইয়া পড়িল। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার এক প্রবল আগ্রহও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। অতএব চিকিৎসকের পরামর্শে স্থির হইল যে, তিনি ভারতে যাইবেন। অনুমতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতে পত্র লেখা হইল। উত্তর তারযোগে না আসিয়া চিঠিতে আসায় যাত্রার একটু দেরি হইয়া গেল। বিদায়মুহূর্তে জগন্মাতা তাঁহাকে দেখাইলেন যে, তিনি ভারতে না গেলে আশ্রমের সমৃদ্ধি ও শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তুরীয়ানন্দ সে কথা না শুনিয়াই সান ফ্রান্সিস্কো বন্দরে জাহাজে উঠিলেন (জুন, ১৯০২)। হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকায় বিদায়কালে গুরুদাসকে বলিলেন, "জগন্মাতার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমি ভুল করেছি। এখন আর উপায় নেই।"

ভারতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই রেঙ্গুনে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীজী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এত আগ্রহ, এত চেষ্টা সবই ব্যর্থ হইল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, আর বিদেশে ফিরিবেন না, অবশিষ্ট জীবন ভগবচ্চিন্তায়ই কাটাইবেন। তদনুসারে বিদেশী পোশাক ও ঘড়ি চিরতরে পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর মঠে কিয়দ্দিবস যাপনান্তে তপস্যার উদ্দেশ্যে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন; সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আদেশে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল।

বৃন্দাবনে ইঁহারা প্রায় তিন বৎসর ছিলেন; তৃতীয় বৎসরের শেষদিকে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আরোগ্যলাভান্তে তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে মায়াবতী গমন করেন ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মঠে ফিরিয়া যান। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে হরি মহারাজ আলমোড়া ও নৈনিতালের পথে উত্তরাখণ্ডে যাইয়া পুনর্বার তপস্যায় নিরত হন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কনখল, পরে হৃষীকেশ ও তৎপরে উত্তরকাশীতে দেখিতে পাই। উত্তরকাশীতে দেবী-গিরিজীর নিকট তিনি কিছুদিন শাস্ত্রালোচনা করেন। এই শীতপ্রধান অঞ্চলেও হরি মহারাজ অতি অল্প বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন, এমন কি, শীতকালে দেবী-গিরিজীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও শীতবস্ত্রাদি গ্রহণ করিতেন না। এই ধীর, স্থির, তেজপুঞ্জময় সন্ন্যাসীর পূত পদক্ষেপে তখন ঐ অঞ্চল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার সুযশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পাঠাদিকালে তিনি সর্বদা জ্ঞানমুদ্রা-অবলম্বনে পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতেন এবং অল্পই কথা কহিতেন। এই তপস্বীর গুণে মুগ্ধ দেবী-গিরিজী তাঁহার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি ও গীতার শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া ও প্রতিশ্লোকের ওপর দীর্ঘকাল মনঃসংযম করিয়া উহাদের মর্মকথা অবগত হইয়াছিলেন; সাধনার ফলে মন্ত্রার্থ তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। নয়মাস এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি ৺বদরীনারায়ণ ও কেদারনাথ দর্শনে গমন করেন।

অতঃপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে গুরুদাস মহারাজের সহিত পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাই। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি গড়মুক্তেশ্বরে তপস্যানিরত ছিলেন। সম্ভবত গড়মুক্তেশ্বর হইতেই ঐ বৎসরের শেষে কিংবা পরবৎসরের আরম্ভে নাঙ্গলে যান এবং তথায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ অবধি তপস্যা করেন। নাঙ্গলে শাস্ত্রামোদী তুরীয়ানন্দজীর 'তুলসী রামায়ণ' পাঠ শুনিতে বহু ব্যক্তির সমাবেশ হইত। তিনি প্রত্যহ নদী পার হইয়া এক মাইল দূরবর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। উহাতেই দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যবস্থা হইত। রাত্রে এক পোয়া দুগ্ধ পান করিতেন; কিংবা কোন সাধু উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত ভাগ করিয়া উহার কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করিতেন। বস্ত্রাভাবে তিনি কৌপীনমাত্র পরিধান করিতেন। একসময়ে উহারও অভাব ঘটিলে সমাগত ভক্তদের নিকট লজ্জানিবারণের জন্য এক মৃতদেহের পরিত্যক্ত বস্ত্র ছিন্ন করিয়া কৌপীনাকারে পরিধান করেন। এবম্প্রকার তপস্যায় ক্লিষ্ট তাঁহার শীর্ণদেহ একদিন ভিক্ষার্থে বহির্গমনকালে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া অকস্মাৎ ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে ব্যথিত জনৈক জাঠ-ভক্ত অতঃপর নিজব্যয়ে রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১৯০৯ সনের শেষে কঠিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার দেহ অতীব শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহাতে জনৈকা বৃদ্ধা সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন, "আমি দেহকে ভুলতে চেষ্টা করছি; আর তুমি খালি তারই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ।" প্রতিকারশূন্য ও চিন্তাবিলাপরহিত হইয়া তিনি স্বীয় দুঃখ ভোগ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক বিদ্যালয়-পরিদর্শক তাঁহার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কনখল সেবাশ্রমে সংবাদ পাঠাইলেন। অমনি গঙ্গারাম মহারাজ তথা হইতে আসিয়া সেবাভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যথোচিত সেবা করা সম্ভব ছিল না; কারণ হরি মহারাজের উহা মনঃপূত ছিল না। এমন কি, গুরুদাস মহারাজ তাঁহার সেবার জন্য কিছু অর্থ দিলে উহার মূল বা সুদ কিছুই তিনি গ্রহণ করিলেন না। দাতা যখন বলিলেন যে, সুদটা অন্তত ব্যয় করা উচিত, তখন তিনি উহা কাশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইতে লাগিলেন। ফলত অবহেলায় দেহের অবস্থা এরূপ শঙ্কাজনক হইল যে, নাজিমাবাদের জনৈক ভক্ত তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং পরে তাঁহাকে কনখল সেবাশ্রমে আনা হইল। এখানে আসিয়া তিনি নিরাময় হইলেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি বেলুড় মঠে আগমন করেন এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আহ্বানে পুরীধামে গমনপূর্বক কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া বৎসরের শেষে বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। পুরীতে থাকা কালে এক সাধু তাঁহার চক্ষে প্রত্যহ গোলাপজল ঢালিয়া দিতেন। একদিন ফোঁটা ফেলিবামাত্র হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "এ তো গোলাপজল নয়!" সাধু শিশির লেবেল দেখিয়া বুঝিলেন, উহা নাইট্রিক এসিড। তখনই গোলাপজলে চক্ষু ধৌত করা হইল। অতঃপর ভয় ও দুঃখে অভিভূত সাধুকে সান্ত্বনা দিয়া হরি মহারাজ শুধু বলিলেন, "তোমার কোন দোষ নাই, সব মায়ের ইচ্ছা।" ঔষধ চক্ষে পড়িবামাত্র মনে হইল, "তবে কি, মা, আমার চক্ষুটি নেবার ইচ্ছা হয়েছে তোমার?" এই সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসায় তিনি সেবারে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির পথে চলিল।

১৯১২ অব্দের আরম্ভে তিনি কাশীতে ছিলেন। অতঃপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিবানন্দের কনখল-গমনকালে তিনিও তাঁহাদের সহিত তথায় যান। সেবারে সেখানে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হয়। চণ্ডীপাঠক ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। সমস্ত চণ্ডীখানিই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; সুতরাং এক ঘণ্টায় পাঠ সমাপ্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তখনও আশানুরূপ উন্নত না হওয়ায় কনখল হইতে তিনি দেরাদুনে যান। সেখানে শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইলেই তাঁহার তপস্যাপ্রবণ মন তাঁহাকে পুনর্বার হৃষীকেশে লইয়া যায়। হৃষীকেশ হইতে তিনি কিছুদিন পরে কনখলে উপস্থিত হন।

অতঃপর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সাদর আহ্বানে ১৯১৪ খ্রিঃ-এ ৺কালীপূজা দেখিবার জন্য কাশীধামে উপনীত হন এবং তথায় পাঁচ-ছয় মাস অবস্থান করেন।

১৯১৫ অব্দের গোড়াতে স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে বলেন যে, আলমোড়ায় থাকিলে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে; তদনুসারে এপ্রিল মাসে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হন। ক্রমে তাঁহাদের এই অবস্থানকে উপলক্ষ করিয়া আলমোড়ায় একটি ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। এই কার্যে হরি মহারাজকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইলে তিনি ১৯১৬-র ২২ মে তারিখে পূজাহোমাদি-সমাপনান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে' প্রবেশ করিলেন। এই নবনির্মিত আশ্রমে কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই। স্বামী প্রেমানন্দের সপ্রেম আহ্বানে ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে কাশীধামে আগমনপূর্বক তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও শিবানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। মিলন হইবামাত্র তুরীয়ানন্দজী বাবুরাম মহারাজকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন; তখন প্রেমানন্দজীও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন। অগত্যা পরাজিত হইয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "নিরভিমানিত্বে আপনাকে পরাভূত করা কি আমার সাধ্য?" তাঁহার শরীর তখনও বিশেষ সুস্থ নহে, পায়ে বাত ও গলা ফোলা দেখিয়া প্রেমানন্দজী যখন বলিলেন যে, দুই-এক দিন দেরি করিয়া সুস্থ হইয়া আসা উচিত ছিল, তখন দেহজ্ঞানহীন জীবন্মুক্ত পুরুষ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমার আর কি?—আপনাদের হুকুম তামিল করেছি।" মহাপুরুষজী বাবুরাম মহারাজকে লাল কাপড়ের একজোড়া নেপালী জুতা দিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ উহা হরি মহারাজকে ব্যবহার করিতে দিলে তিনি সাগ্রহে মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, "আপনার দান মাথায় রাখবার, পায়ে দেবার নয়।"

১৯১৭-এর জানুয়ারি মাসে মঠে আসিয়া জুন মাসে তিনি পুরীধামে যান। পুরীধামে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। তথাপি ৺জগন্নাথ-দর্শনের আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে, নিয়মিত তথায় যাইতেন—সঙ্গে থাকিতেন অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ)। সূর্যোদয়ের পূর্বে একদিন মন্দিরে গমনকালে স্বামী শঙ্কারানন্দের মনে হইল, হরি মহারাজ যেন নিদ্রিত; অতএব ধীর পদক্ষেপে একাই মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বহির্দ্বার-অতিক্রমের পূর্বেই পশ্চাৎ হইতে শব্দ আসিল, "কি অমূল্য, যাচ্ছ নাকি।" পরমুহূর্তেই হরি মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত! এক উৎসবের দিন পরস্পরের অজ্ঞাতসারে ইঁহারা বহুবার ৺জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। দিনান্তে অমূল্য মহারাজ সহাস্যে হরি মহারাজকে জানাইলেন যে, তিনি তিনবার দর্শন করিয়াছেন। হরি মহারাজ মুখে কিছু না বলিয়া হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণপূর্বক

জানাইয়া দিলেন, তিনি গিয়াছেন পাঁচবার! একদিন হরিমহারাজ ৺জগন্নাথদর্শন-মানসে অরুণস্তম্ভের পার্শ্ব দিয়া সোপানশ্রেণীতে আরোহণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, অন্য পার্শ্ব দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অবতরণ করিতেছেন। অমনি দ্রুতবেগে যাইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন; কিন্তু উঠিয়া দেখেন, ঠাকুর নাই। তিনি বুঝিলেন, ইহা অলৌকিক দর্শন—ঠাকুরই অন্যরূপে মন্দিরে ৺জগন্নাথমূর্তিতে পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

সেইবারে তাঁহার কানের কাছে একটি বিস্ফোটক হয়। বহুমূত্রের জন্য রক্ত দূষিত হওয়ায় উহা ভীষণাকার ধারণ করে এবং অস্ত্রোপচার করিতে হয়। তিতিক্ষাশক্তিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ এত উচ্চাধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, এই অস্ত্রপ্রয়োগকালে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন ও সজ্ঞানে কোন মুখবিকৃতি পর্যন্ত না করিয়া এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেন। আর একদিন তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন, জীবনের আশামাত্র নাই। অকস্মাৎ তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যাত্রা আর যাওয়া হল না।" উক্ত ঘটনার অনেক পরে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কাশী সেবাশ্রমে তিনি স্বামী নির্বেদানন্দ প্রভৃতির নিকট এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"পুরীতে সেদিন বাইরের জগতের হুঁশ চলে যাওয়ার পর বহু সাধু ও পরে বহু দেবদেবী দেখতে থাকি! তারপর হঠাৎ দেখি প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে; কিন্তু আর একটা শক্তি ভেতর থেকে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। প্রাণের সঙ্গে এবং সেই শক্তির সঙ্গে একটা টাগ-অব-ওয়ার (টানাটানি) লেগে গেছে দেখলুম। খানিক পরে প্রাণ জয়ী হয়ে উৎক্রমণ করতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি স্বামীজী এসে বলছেন, 'হরি-ভাই, এখন কোথায় যাচ্ছ? এখনও তো সময় হয় নি।' সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের পরাভূত শক্তিটির তেজ যেন অনেক বেড়ে গেল এবং সে ঊর্ধ্বগামী প্রাণকে এক হেঁচকায় টেনে এনে স্বস্থানে বসিয়ে দিলে। তারপরই আমার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরে এল এবং চোখ মেলে বললুম, 'এ যাত্রা যাওয়া হল না'।"

পাঁচ-ছয় মাস পুরীধামে অতিবাহিত হইলে তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সহিত ১০ নভেম্বর কলকাতায় আসিয়া 'উদ্বোধনে' উঠিলেন। এখানে তাঁহার দেহে পুনর্বার অস্ত্রোপচার হয়। তখনও তিনি ক্লোরোফর্ম-ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, স্বীয় মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইয়া তিনি স্বাত্মানন্দে মগ্ন রহিলেন এবং দ্রষ্টা হিসাবে দেখিতে লাগিলেন, কে যেন কাহার দেহে অস্ত্রচালনাদি করিতেছে। স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সার্ধ তিন বৎসর ৺বিশ্বনাথের পুণ্যক্ষেত্রেই যাপিত হইয়াছিল। হরি মহারাজের জীবনে এই কয়টি বৎসর অধ্যাত্মমহিমায় ভরপুর।

তাঁহার অধ্যয়ননিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। অসুখের মধ্যেও নিয়মিত পড়া চলিত। নিবিষ্টমনে তিনি যখন অধ্যয়নে বসিতেন তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তিনি সাধারণত প্রতিকার্য যথাসময়ে করিতে অভ্যস্ত ছিলেন; প্রাতঃকৃত্য, ধ্যান, ভ্রমণ, পাঠ, স্নান, আহার—এই ক্রম ঘড়ির মতো পালিত হইত। কিন্তু অধ্যয়নরত হরি মহারাজকে সেবক সময়ের কথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেও "এই উঠি", "এই উঠি" বলিয়া ক্রমেই দেরি করিয়া ফেলিতেন। পাঠের পর তৈলমর্দনাদির সময় আবার পঠিত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন, "স্বামীজীও এরূপ করিতেন—এতে অধীত বিষয় চিরকালের জন্য আয়ত্ত হয়ে যেত।" শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণেও তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট সাধুপাঠক উপনিষদ্ বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠ শেষে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া পঠিত বিষয়ে নবালোকপাত করিতেন কিংবা শ্রোতাদিগের সন্দেহাদি নিরাস করিতেন।

নিজের ধ্যানাভ্যাস ও অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, একবার তিনি নিদ্রাত্যাগপূর্বক সমস্ত সময় ধ্যানে অতিবাহিত করার সঙ্কল্প করেন। নিদ্রা কমিতে কমিতে যখন সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে পড়িল, নিদ্রার অভাবে স্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাঁহারও নিদ্রা একেবারে চলিয়া গেল নাকি? ইহাতে দৈহিক পীড়াদি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া আবার নিদ্রাকে ফিরাইয়া আনিলেন। জিতনিদ্রাবস্থায় তিনি সাত-আট দিন ছিলেন।

এই যোগিরাজকে গুরুভ্রাতারা কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। তখন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের এক প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ গঙ্গাস্নানান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, শরৎ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করতে। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। দুরারোগ্য ব্যাধির কথা ভুলে তিনি কেমন সুস্থ আছেন!" অতঃপর হরি মহারাজের ঘরের পার্শ্ব দিয়া ফিরিবার পথে স্বামী সারদানন্দের মনে হইল, "এই সুযোগ ত্যাগ করা উচিৎ নয়।" অমনি অতর্কিতে গৃহে ঢুকিয়া হরি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" যখন জানিলেন স্বামী সারদানন্দ, তখন ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আমি রোগে অন্ধপ্রায় হয়েছি; তাই তুমি আমায় অপ্রস্তুত করলে! আমি কি তোমার মহিমা জানি না?"

গুরুভ্রাতাদের প্রতি হরি মহারাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। তাঁহার কাশীবাসকালে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগ হয়। তখন হরি

মহারাজের শরীর দুর্বল ছিল, চলিতে কষ্ট হইত। তথাপি তিনি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তখন রাস্তা মেরামত হইতেছে; তাই পথের ওপর খোয়া পড়িয়া আছে। একদিন কোন যানবাহন না পাওয়ায় তিনি ঐ বন্ধুর রাজপথের ওপর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লাটু মহারাজের মহাসমাধির পরে ঐ সময়ের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া হরি মহারাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে শুধু লাটু মহারাজের অতি উচ্চ অনুভূতি-মহিমাই খ্যাপিত হয় নাই, পত্রের প্রতিছত্রে হরি মহারাজেরও উচ্চভাব-ধারণার ক্ষমতা, গুরুভ্রাতৃপ্রেম ও পরগুণগ্রাহিতা দৃঢ়াঙ্কিত রহিয়াছে। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এবং আচরণ ছিল অপূর্ব। এই বিষয়টি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথার অনুধাবন করিলেই সম্যক উপলব্ধ হইবে। একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা যখন কোনও সেবক সম্বন্ধে মহারাজের নিকট সমালোচনা করেন তখন তিনি এই বলিয়া উত্তর দেন যে, সেবকদের নিকট শুধু সেবা দাবি না করিয়া তাহাদিগকে কিছু ধর্মভাব দেওয়া আবশ্যক। হরি মহারাজের নিকট তাহারা ঐরূপ পায় বলিয়া সেখানে পড়িয়া থাকে। বস্তুত সেবকগণ যতক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহাদের মন এক উচ্চ রাজ্যে বিচরণ করিত। ইহার মহিমা উপলব্ধি না করিতে পারিয়া তাঁহারা ঘটনাক্রমে অন্যত্র চলিয়া গেলেও এই আকর্ষণ তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দূরদূরান্ত হইতে তৎসকাশে লইয়া আসিত। তিনি সেবকদিগকে বলিতেন, "তোদের দায়িত্ব আমার ওপর; তাই তোদের কল্যাণের জন্যই বকি।" তিনি একদিকে যেমন অতি কঠোর ছিলেন, অপরদিকে ছিলেন তেমনি কোমল। একদিন যথাসময়ে সেবক তৈলমর্দনের জন্য না আসায় হরি মহারাজ অপরের দ্বারা কার্য সমাধা করাইতেছেন, এমন সময়ে সেবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ভর্ৎসনা নামিয়া আসিল বজ্রনির্ঘোষে। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেবক কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ হরি মহারাজের সেই ক্রোধের অভিনয় কোথায় ভাসিয়া গেল। অতঃপর আশীর্বাদচ্ছলে সেবকের মাথায় হস্তস্থাপনমাত্র সেবক সেদিন অনুভব করিলেন যেন স্নেহের সহিত সেই হস্ত-অবলম্বনে বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ এক অধ্যাত্মশক্তি দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে!

হরি মহারাজকে সাধারণত শুষ্কজ্ঞানী বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাগুণে তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শরীর দুর্বল হইলেও তিনি পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সোপান বাহিয়া জল পর্যন্ত অবতরণ করা শক্তিতে কুলাইত না বলিয়া পরিচিত কাহারও দ্বারা গঙ্গাবারি আনাইয়া উহা সযত্নে মস্তকে ও দেহে ছিটাইতেন। কোনও আধুনিক শিক্ষায় গর্বিত যুবক গঙ্গাস্নানকে কুসংস্কারমাত্র বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে, যে বিদেশের দুই-

চারি পাতা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, স্বামীজী সেইসব পাশ্চাত্য দেশবাসীকে সেইসব স্বদেশী শাস্ত্রাবলম্বনেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। শিবরাত্রিতে কেহ উপবাস করিলে কিংবা ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেছে শুনিলে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। একদিন শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে পাঠক পুস্তকাধারের উপর কোনও আবরণ না দেওয়ায় তিনি সারাক্ষণ অতি গম্ভীর হইয়া রহিলেন এবং পাঠান্তে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত অভিন্ন; ভাগবতকে গ্রন্থমাত্র মনে না করিয়া আরও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আবশ্যক।

হরি মহারাজকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া মনে হইত। ভক্তগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবার জন্য যে অর্থাদি দিতেন তাহা যথেষ্ট ছিল বলিয়া সেবকগণ ব্যয়সম্বন্ধে একটু মুক্তহস্ত হইবেন—ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হরি মহারাজ সর্বপ্রকার ব্যয়ের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখিতেন। অথচ আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। জনৈক সেবক একদিন রহস্যচ্ছলে কৃপণতার দোষ আরোপ করিলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গৃহস্থরা অতি পরিশ্রমপূর্বক অর্থ উপার্জন করেন; অতএব তাঁহাদের দানের টাকা বৃথা ব্যয় করা অনুচিত। এই ব্যয়সংক্ষেপ ও অর্থাগমের ফলে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইলে সেবক একবার প্রস্তাব করিলেন যে, উহার কিয়দংশ হরি মহারাজের অতি আদরের আলমোড়া আশ্রমে দেওয়া যাইতে পারে। অমনি তিনি বাধা দিয়া কহিলেন যে, ঐ অর্থ তাঁহার নামে জমা থাকিলেও উহা তাঁহার নিজস্ব নহে, উহা সঙ্ঘের; সঙ্ঘাধ্যক্ষ এই বিষয়ে যাহা করিবেন, তাহাই চরম।

সংসারবিরাগী মোক্ষপথচারী সন্ন্যাসীর মনেও কল্যাণকামনা জাগ্রত থাকে। হরি মহারাজ সাধুদিগকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, স্বামীজীর নির্ধারিত পথই তাঁহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ; আর সমাগতদিগকে নিজের রোগজীর্ণ শরীর দেখাইয়া প্রায়ই বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিনি বলে এত ভুগতে হচ্ছে।" সেবাশ্রমের সাধুদের বলিতেন, "তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যায়। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।"

প্রৌঢ়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন, বৃদ্ধকালে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সময়ও তেমনি তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রতিকথায় বহুধা আত্মপ্রকাশ করিত। তিনি মনে করিতেন যে, গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাই শেষশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার মুখে কখনও কখনও চিত্তরঞ্জনের নাম উচ্চারিত হইত।

দেশের বালকদের চরিত্র-গঠন ও সৎশিক্ষার জন্য প্রাচীন আদর্শে ব্রহ্মচর্য-

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। তাই যুবক সাধুদিগকে সর্বদা এই কার্যে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই উদ্দীপনায় স্বামী সন্তাবানন্দ মিহিজামে 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেন; পরে উহা দেওঘরে স্থানান্তরিত হয়।

বৃদ্ধবয়সে কোন কার্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া তিনি সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা অপরের সেবা করিতেন। ইহাতে যথেষ্ট ক্লান্তি হইলেও তিনি কর্তব্যবোধে বিরত হইতে পারিতেন না। একদিন সেবকের সহিত নীরবে বসিয়া আছেন; অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আর পারি না।" সেবক অবাক হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, হরি মহারাজ কোন কাজ না করিয়াও 'আর না-পারা'র কথা তুলেন কিরূপে? হরি মহারাজ শান্তভাবে সেদিন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জাগতিক অর্থে তিনি কোন কার্য না করিলেও যেসব সেবক ও ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে কিংবা যাহারা দুইটি সৎকথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট বসিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা তাঁহাকে করিতে হয় এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নরাজি অকাতরে অবিরাম বিলাইতে হয়। যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারাই মাত্র জানেন, এই কার্য কত শ্রমসাধ্য—অপরে বুঝিবে কিরূপে?

দীর্ঘ কঠোর তপস্যায় হরি মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে উহা ব্যাধির আকারে পরিণত হইল। বহুমূত্ররোগ তো তাঁহার ছিলই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার দুইবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল। তদুপরি পুরাতন হাঁপানিও দেখা দিল। রক্ত দূষিত হওয়ার ফলে গায়ে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে উহা বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হইতে লাগিল এবং বারংবার অস্ত্রোপচার করিতে হইল। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও এই বিদেহ মহাপুরুষের তিতিক্ষাদর্শনে লোক অবাক হইত।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পৃষ্ঠভাগে দুষ্টব্রণ হইলে চিকিৎসকগণ একটি বড় মাংসখণ্ড অপসারিত করেন। হরি মহারাজের নির্দেশে এবারেও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হয় নাই। এই পীড়াদায়ক অস্ত্রোপচারকালেও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে না দেখিয়া চিকিৎসক অনেকটা ভরসা পাইলেন এবং পরদিন ঐ অংশের বন্ধনাদি খুলিয়া যখন দেখিলেন যে, এক খণ্ড মাংস ঝুলিতেছে, উহা সরাইয়া ফেলা কর্তব্য, তখন হরি মহারাজকে কিছুই না বলিয়া কাটিতে উদ্যত হইলেন। অমনি তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ডাক্তার কারণ বুঝিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হরি মহারাজ তখন বুঝাইয়া দিলেন যে, ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে দেহ হইতে মন উঠাইয়া লইলে যন্ত্রণাবোধ থাকে না, কিন্তু সেদিন পূর্বে কিছু না বলায় মন দেহেই আবদ্ধ ছিল; অতএব প্রাকৃতিক নিয়মে যন্ত্রণাবোধও ছিল।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে তাঁহার পৃষ্ঠে একটি সামান্য ব্রণ হইয়া ক্রমে

বৃহৎ দুষ্টব্রণে পরিণত হইল। কলকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া সর্বশেষ অস্ত্রোপচার করিলেন। এবারেও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হইল না। কিন্তু ডাক্তার বলিয়া রাখিলেন, "আপনাকে সাধারণ রোগীর মতো চিৎকার করিতে হইবে, তাহা হইলে আমিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিব।" কার্যত অস্ত্রপ্রয়োগকালে তিনি কোনও শব্দ করিলেন না; শুধু ডাক্তারের কথা রাখিবার জন্য যেন সর্বশেষে "মা রে" বলিয়া কৃত্রিম সুরে চিৎকার করিয়া সকলকে একটু হাসাইলেন মাত্র।

এই তিতিক্ষার ব্যাখ্যা একদিন তাঁহার স্বমুখে শোনা গিয়াছিল। সেবাশ্রমেই একবার তাঁহার হাতের তালুতে অস্ত্রোপচারের সময় যন্ত্রণার লক্ষণ না দেখিয়া পরদিন স্বামী নির্বেদানন্দ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "দ্যাখ, মনটা ছেলেমানুষের মতো। তাকে ধরে রাখলে ক্রমাগত বলতে থাকে, 'ছাড়, ছাড়।' তাই একবার একটু ছেড়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তখনও ডাক্তারের কাজ শেষ হয়নি দেখে আবার ধরে ফেললাম।" তারপর খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় হঠাৎ তাঁহার নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গিতে গীতার শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" (যাঁহাতে অবস্থিত হলে যোগী গুরুদুঃখেও বিচলিত হন না)। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ভাষ্যকার (আচার্য শঙ্কর) বলেছেন, 'শস্ত্র-সম্পাত-জনিতেনাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে' (শস্ত্রাঘাতজনিত দুঃখেও বিচলিত হন না)।" ফলত প্রথম ব্যাখ্যায় তিনি যেন যৌগিক প্রত্যাহার-সিদ্ধির উল্লেখ করিলেন এবং দ্বিতীয়টিতে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের স্বরূপ দেখাইলেন।

মহাসমাধির দুই-এক দিন পূর্বে আবাল-সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কৌপীন ও কমণ্ডলু কোথায়?" ঐ গুলি ঠিক ঠিক আছে জানিয়া বলিলেন, "আমি সাধু, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষা করে খাব। এখানে কি? এখন কোথায় আছি?" স্থানকালাতীত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমায় কৌপীন পরিয়ে দাও, কমণ্ডলু দাও—আমি গাছতলায় থাকব।" চিরযোগীর আর এক ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিত—তিনি বসিয়া ধ্যান করিবেন। সেই অবস্থায় ঐরূপ করিতে দেওয়া মারাত্মক। তবু দৃঢ়স্বরে বারংবার আদেশ করিতেন, "আমায় বসিয়ে দাও।" উপেক্ষা না করিতে পারিয়া কেহ সেই আদেশপালনান্তে উপবিষ্ট দুর্বল শরীরকে ধরিয়া রাখিলে বলিতেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—গায়ে হাত দিও না।"

দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় দিন খুব আনন্দ করে নাও।" পূর্বরাত্রের শেষে আবার বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষদিন, কাল শেষদিন!" শেষদিন আসিল। প্রাতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত

যথারীতি সদালাপ হইল। অতঃপর যতই সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হইতে লাগিল ততই মায়ামুক্ত মহাপুরুষ প্রিয়জনের শেষ বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।" সকলের নিকট এইরূপে বিদায় লইয়া বলিলেন, "তবে যাই, তবে যাই!" মহাপ্রয়াণের দিনে আহার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন—চরমমুহূর্তের পূর্বে শুধু চরণামৃত পান করিলেন। অতঃপর বসাইয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সে কার্যে অগ্রসর হইল না দেখিয়া খেদোক্তি করিলেন, "সব বোকা, কেউ বুঝতে পারছে না—শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।" সকলকে তখনও নিশ্চল দেখিয়া অগত্যা পদদ্বয় টানিয়া লম্বা করিয়া দিতে বলিলেন এবং প্রণামের উদ্দেশে হস্তদ্বয় তুলিয়া ধরিতে বলিলেন। তারপর করজোড়ে বলিলেন, "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! বল, বল, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" স্বামী অখণ্ডানন্দ উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" হরি মহারাজ উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন, আর বলিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।" ক্রমে বাক্ নিরুদ্ধ হইল। অনন্তশয্যায় শায়িত মহাপুরুষ বিকচ-কমলসদৃশ চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি সন্দর্শন করিতে করিতে ২১ জুলাই, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় মায়ার জগৎ হইতে বিদায় লইলেন। সমস্ত রাত্রি ভজন-কীর্তনে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে সেই পূতদেহ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়া মণিকর্ণিকার পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জিত হইল।

# স্বামী অদ্বৈতানন্দ

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ অধিক বয়সে ঠাকুরের নিকট আসেন। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ; এমন কি, ঠাকুরের অপেক্ষাও তিনি কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। এই জন্য ঐ নামীয় অপরের সহিত পার্থক্য রক্ষার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' আখ্যা দিয়াছিলেন; আর ভক্ত-মহলে তাঁহার নাম ছিল 'গোপাল-দাদা' বা 'গোপাল-দা'। সন্ন্যাসের পর তাঁহার নাম হয় স্বামী অদ্বৈতানন্দ; কিন্তু সে নাম তত প্রচলিত ছিল না।

ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বে গোপাল-দার স্ত্রীবিয়োগ হয়। সেই দারুণ শোকে পতিত গোপাল-দা প্রথম জানিতে পারেন সংসার কত অনিত্য। সেই বৈরাগ্যের ফলে তাঁহার মন এক সংসারাতীত নিত্যসত্যের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। ঐ সময় তাঁহার বন্ধু সিঁথিনিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্র কবিরাজ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। তিনি গোপাল-দাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠাকুরের কথা শুনাইলেন। অতঃপর

> "গোপাল বিশ্বাস-সহ আইলা দেখিতে।
> শান্তিদাতা রামকৃষ্ণে মহেন্দ্রের সাথে॥ (পুঁথি)[১]

কবিরাজ মহেন্দ্র পালের সহিত এই প্রথমদর্শন কালে কিন্তু গোপাল-দা স্বীয় শোকনাশ-বিষয়ে আশার আলোক পাইলেন না; অতএব সেদিন ঠাকুরের ওপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাও জন্মিল না—মনে করিলেন, ইনি সাধারণ সাধুদেরই মতো একজন। কিন্তু বন্ধু ছাড়িলেন না, আর গোপাল-দার অশান্ত মনও এই হতাশাকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বন্ধুর যুক্তিগুলিও নেহাৎ অসার ছিল না—মহাপুরুষকে কি একদিনে চিনিতে পারা যায়? ভিতরের সন্ধান পাইতে হইলে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হয়। সুতরাং গোপাল-দা পুনর্বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।

আত্মীয়বিয়োগের ক্ষত কত গভীর তাহা বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও প্রথমে ধারণা করিতে পারেন না; কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক যখন তাঁহাকে ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহার বুঝিতে বাকি থাকে না যে, এতাদৃশ সুচিকিৎসক ভিন্ন ঈদৃশ রোগের উপশম সুদূরপরাহত। দ্বিতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া গোপাল-দা তাঁহার ভালবাসায় বাঁধা পড়িলেন এবং উহাই ক্রমে নিবিড়তর হইয়া তাঁহার সমস্ত

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি,' পৃঃ ৪৩০। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের কাল অনিশ্চিত। ইহারও পূর্বে সম্ভবত সিঁথিতে প্রথম দর্শন হইয়া থাকিবে। 'কথামৃত' ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠায় (অখণ্ড সং, পৃঃ ৫) আছে, প্রথম দর্শন হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

সংসারবন্ধন দূর করিয়া দিল। ঠাকুরকে পাইলেন তিনি তাঁহার ব্যথার ব্যথিরূপে; আর তাঁহার মুখে অবিরাম ভাগবতী কথা শুনিয়া ও বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা পাইয়া তিনি জানিলেন যে, এই সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের পক্ষে বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ। সংসারের সকল সম্বন্ধই মায়িক; কেবল শ্রীগুরুর যে চরণস্পর্শ মানবকে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারের অতীতে লইয়া যায়, উহাই জীবনের একমাত্র ভরসা। গোপাল-দা এখন হইতে সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আশ্রয় লইলেন। ইহাতে ঠাকুরের মহিমার যেমন পরিচয় পাই, গোপাল-দার শুদ্ধসত্ত্ব ভাবেরও তেমনি আশ্চর্য প্রমাণ পাই। কারণ স্ত্রীবিয়োগ অনেকেরই হয়; কিন্তু উহার ফলে গুরুর সান্নিধ্যলাভ ও সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের জন্য উন্মত্ত হওয়া বড়ই বিরল। তবে ইহাও সত্য যে, উপযুক্তকালে বাহিরের পরিবেশ ও মানসিক অবস্থার সামঞ্জস্য না ঘটিলে তাদৃশ নবজীবন-লাভ সম্ভব হয় না। গোপাল-দার জীবনে তাহাও ঘটিয়াছিল।

গোপাল-দার পিতার নাম শ্রীগোবর্ধন ঘোষ। তাঁহারা জাতিতে সদ্গোপ এবং তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত জগদ্দল (রাজপুর) গ্রামে। সম্ভবত ইং ১৮২৮-এর এক শুভদিনে ঐ গ্রামে গোপাল-দার জন্ম হয়।[১] কিন্তু তিনি প্রায়শ কলকাতার উত্তরে সিঁথিতে বাস করিতেন এবং সিঁথির বেণীমাধব পালের চিনাবাজারে বুরুশ, ম্যাটিং, খড়রা, পাপোশ ইত্যাদির একটি দোকানে কাজ করিতেন। বেণী পাল ব্রাহ্ম ভক্ত হইলেও শরৎ ও বসন্তকালের উৎসবাদিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণের পূর্বে এই বাটিতে গোপাল-দা একবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রাণের নিরীক্ষণ নহে—চক্ষের দর্শন অথবা ঔৎসুক্যের উদাস ঈক্ষণ মাত্র। উহা গোপাল-দার চিত্তে বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগায় নাই বা ভগবানলাভের জন্য কোনও গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করে নাই। তবে তিনি সেই দিনই চিনিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসত্যই ভগবৎ প্রেমিক।

যাহা হউক, ঠাকুরের সহিত গোপাল-দার পরিচয় ক্রমে গভীর শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিণত হইল এবং উহা পরিপূর্ণাবস্থায় গোপাল-দাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া লাটুর সহযোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত করিল। শ্রীপ্রভুর সহিত তাঁহার সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আংশিক বিবরণ সংগ্রহ করাও বর্তমানে

---

১ 'পুঁথি'তে শূর উপাধির উল্লেখ থাকিলেও বেলুড় মঠের ট্রাস্ট-ডিড্ দৃষ্টে আমরা ঘোষ উপাধিই গ্রহণ করিলাম। পুঁথিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোপাল-দার নিজস্ব কাগজের দোকান ছিল। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত; তবে বেলুড় মঠে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা বা অঘোর চতুর্দশীতে জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়।

অসম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে যতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

গোপাল-দার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা লইবেন; কিন্তু ঠাকুর কখনও সাধারণ অর্থে গুরুগিরি করিতেন না বলিয়া গোপাল-দা একটা অভাব বোধ করিতেছিলেন। অথচ সকলের সম্মুখে এইরূপ অনুরোধ জানাইতেও পারিতেন না। তাই এক দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বে ঠাকুরকে একাকী বাগানে ভ্রমণরত দেখিয়া গোপাল-দা তাঁহার শ্রীচরণে মনের ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। দূর হইতে লাটু লক্ষ্য করিলেন, গোপাল-দা নতজানু হইয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের চরণ ধরিয়া খুব কাঁদিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন—তখনও গোপাল-দার চক্ষে জল। অতঃপর কি হইল লাটু জানেন না; কিন্তু ইহার পর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোপাল-দাকে বিষ্ণু-মন্দিরে কীর্তন করিতে দেখা যাইত। ইহা সম্ভবত ১৮৮৫ অব্দের কথা।

আর একদিন দুই সেবককে লইয়া ঠাকুর কৌতুক করিয়াছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় লাটুকে বলিলেন, "এখানকার কথা মানতে হবে।" সরল লাটু অমনি কহিলেন, "এখানকার কথা তো আমি জানি না। আপনি আমাকে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।" অমনি ঠাকুর গোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো গোপাল, শোনো লেটো কি বলে। বলে, 'এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' এখানকার কথা কি বোঝান যায়? তুমিই বল তো বাপু? এ কেমন আবদার?" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আপনার তো জানা আছে, বলে দিন না।" মধ্যস্থকে বিপক্ষে যোগ দিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার এ কি রকম কথা! এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে?" মধ্যস্থ বলিলেন, "এখানকার কথা শুনবার জন্যই তো আমরা সব এসেছি। আমাদের না বললে আমরা জানব কেমন করে?" হার মানিয়া ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিলেন, "এখন নয়, এখন নয়; এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে একদিন তোমরা সব বুঝবে।"

'কথামৃত'-পাঠে জানা যায় যে, করুণানিধান ঠাকুর একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গোপাল-দাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সেদিন (১৮৮৫ খ্রিঃ, ১১ ডিসেম্বর) কাশীপুরে প্রেমের ছড়াছড়ি—নিরঞ্জন ও কালীপদকে ঠাকুর কৃপা করিলেন; পরে দুইটি ভক্তমহিলাও কৃপালাভ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর অতঃপর গোপাল-দাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন।

ঠাকুরের সেবা করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া গোপাল-দা নিজেকে চরিতার্থ মনে করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন স্বতই সাধনার জন্য ব্যাকুল হইত। সেই প্রেরণায়

তিনি কখনও কখনও নরেন্দ্রাদির সহিত কাশীপুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ধ্যানজপ ও তপশ্চর্যা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে (১৮৮৪ খ্রিঃ, ৫ এপ্রিল) একবার তাঁহার মনে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে-ঘেরে আসি।" ঠাকুর তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।" তিনি আরও বলিলেন, "যা চায়, তা কাছেই; অথচ লোকে নানা স্থানে ঘোরে।" সেইবারেই গোপাল-দার তীর্থভ্রমণ হইয়াছিল কি-না জানা নাই; কিন্তু ইহা সত্য যে, কাশীপুরে থাকাকালে (১৮৮৬) তিনি একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। অতঃপর কলকাতায় সমবেত গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদিগকে গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন যে উহা ত্যাগী ভক্তদিগকে দান করিলেই উত্তম হইবে; কারণ ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের সাধু আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? গোপাল-দা ঠাকুরের কথায় সম্মত হইয়া দ্বাদশখানি গেরুয়াবস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালাদি ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিলে ঠাকুর উহা নরেন্দ্রাদি-ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উহা এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভাবী ত্যাগি-সঙ্ঘের অমোঘ বীজ নিহিত ছিল। সেই ত্যাগীদের নাম নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটু। উদ্বৃত্ত গেরুয়াখানি পরে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

গোপাল-দা নিজে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন এবং অপরের জিনিসপত্র পরিপাটি দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার প্রতিকার্যে সুশৃঙ্খলা লক্ষিত হইত। তাই তিনি গোপাল-দার সেবা পছন্দ করিতেন। গোপাল-দার সেবার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে। তবে আমরা জানি যে, কাশীপুরে ঠাকুরকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার ছিল গোপাল-দার ওপর। কিন্তু তখন দিবারাত্র একটানা পরিশ্রম চলিয়াছে। একদিন ঔষধ দিবার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?" গোপাল-দা ঘুমাইতেছেন শুনিয়া ঠাকুর খুব আনন্দসহকারে অপর একজনকে বলিলেন, "আহা, কত রাত জেগেছে! একটু ঘুমুক—তাকে আর জাগিও না। তুমি বরং ওষুধটা ঢেলে দাও।" ঠাকুর জানিতেন, সেই গুছানো বৃদ্ধলোকটির এই অনুপস্থিতি স্বেচ্ছাকৃত নহে—প্রকৃতির বিধানে ক্লান্ত শরীরের ইহা অনিচ্ছাকৃত অপারগতা। শ্রীশ্রীমা গোপাল-দার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা

---

১ 'পুঁথি'র (৬২০ পৃঃ) মতে দেহত্যাগের পূর্বে ঠাকুর এই একাদশ জনকে অন্যভাবেও সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

বলিতেন; অতএব গোপাল-দা ডাক্তারের নিকট বিশেষ পথ্য প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া উহা যথাসময়ে তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেন। গোপাল-দা নিম-জল দিয়া ঠাকুরের গলার ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিতেন। একদিন ঐরূপ করিতেছেন এমন সময় ঠাকুর "উঃ! উঃ!" করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিয়া গোপাল-দার নিজেরও কষ্ট হইল এবং বলিলেন, "থাক, আর ধোয়াব না।" ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "না, না, তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ, আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না।" এই বলিয়া তিনি দেহ হইতে নিজের মন উঠাইয়া লইলেন এবং ইহার পর মুখে কোন শব্দ উঠিল না বা কোন মুখবিকৃতিও দেখা গেল না। স্বেচ্ছায় ধৃতবিগ্রহ অবতারপুরুষে কি না সম্ভবে?

গৃহহীন ও আত্মীয়স্বজন হইতে বিছিন্ন গোপাল-দার অবলম্বন তখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় সেবক ও ভক্তবৃন্দ। তাঁহার সুখ-দুঃখ সহানুভূতি তখন গুরুভ্রাতাদেরই সহিত বিজড়িত এবং তাঁহার আবেদনস্থল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ একবার নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলে তাঁহার দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোপাল-দা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "নরেন মরে গেছে।" ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এখন ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাক। আমায় সমাধির জন্য বড় জ্বালিয়েছিল।" সেদিন নরেন্দ্রের ব্যহ্যজ্ঞানলাভের পরও দেহজ্ঞান ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তাই তিনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ কোথায়?"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গোপাল-দার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান রহিল না; সুতরাং বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি সেখানেই আসিলেন।[১] তবে তিনি সব সময়েই মঠে থাকিতেন না; অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় প্রায়ই তীর্থদর্শনে যাইতেন বা তপস্যায়

১ বরাহনগর মঠে ত্যাগীদের যোগদানের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের সন্ন্যাসগ্রহণের পারম্পর্য সুপরিজ্ঞাত নহে। 'কথামৃতে'র মতানুসারে ১৮৮৭ খ্রিঃ, ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্বেই নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, গোপাল-দা ও সারদার সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু "যোগীন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই" (৪র্থ ভাগ, ৩৪২ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১২৮)। তারক ও গোপাল-দাই সর্বপ্রথম মঠে যোগ দেন। "কুমারবৈরাগ্যবান ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রহিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সুবোধ ও প্রসন্ন (সারদা) আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন; এক বৎসর পরে আসিয়া জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। ...তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ...হরি...মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। ...পরে মঠে থাকিয়া যান।" (ঐ, ৩য় ভাগ, ৩২০-২১ পৃঃ; ঐ, ২য় ভাগ, ২৮৫-৮৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১৩১ দ্রষ্টব্য)। প্রথম দল সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আঁটপুর হইতে ফিরিবার পর (১৮৮৭-এর জানুয়ারির শেষে) মাঘের প্রারম্ভে।

নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঐ কালের পূর্ণ ইতিহাস অজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (২০।৮।৮৮ তারিখ) হইতে পাই যে, ১৮৮৮ অব্দে গোপাল-দা ৺কেদার ও বদরিকাশ্রম দর্শন করেন এবং ঐ সময়ে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। ঐ তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া গোপাল-দা কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৯০ খ্রিঃ-তে মীরাটে পুনর্বার গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে হরিদ্বার-কুম্ভে যান।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশীতে বংশীদত্তের বাটিতে থাকিয়া যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) মহারাজ কাশীধামে যাইয়া প্রমদাদাসবাবুর বাগানে স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ ও সচ্চিদানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন এবং পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সহিত পঞ্চকোশীভ্রমণে নির্গত হন। ইহাতে তাঁহাদের তিন দিন লাগিয়াছিল।

১৮৯৬ অব্দেও আমরা স্বামী অদ্বৈতানন্দকে ৺কাশীধামে বংশী দত্তের বাটিতে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিতে পাই। তাঁহার সহিত বাসের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল এমন এক ব্যক্তি বলেন যে, সেখানে প্রাত্যহিক সাধনা ও জীবনপ্রণালীতে তাঁহার চিরাচরিত নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খলা প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সব কার্যে তিনি যেন ঘড়ির মতো চলিতেন। প্রচণ্ড শীতের সময়েও তিনি অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে বাসস্থলে ফিরিতেন। মাসের পর মাস এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি মাধুকরীর দ্বারা যাহা পাইতেন তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত। এক শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বাস করিতেন। ঐ কক্ষটি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত যে, লোকে দেখিয়া অবাক হইত। ব্যবহার্য সামগ্রী বিশেষ কিছুই ছিল না—দুই-একখানি পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অতি পরিপাটিভাবে রক্ষিত হইত। শরীর ধারণের জন্য এই সব আবশ্যকীয় বিষয়ে ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য হইয়া তখন তিনি সাধন-ভজনেই মগ্ন থাকিতেন। বস্তুত জীবনের একমাত্র কর্তব্য সাধনের অনুকূল হইবে বলিয়াই তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে সর্বত্র তাদৃশ একটা নিখুঁত ভাব প্রকাশ পাইত।

ইহারই একসময়ে পায়ে কাঁটা ফুটিয়া তিনি বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত স্বামী শিবানন্দের (১৩।৮।৯৬ তারিখের) পত্রে জানিতে পারা যায়—"আমাদের বৃদ্ধ স্বামী, যিনি ৺বারাণসী-পুরী সেবা করিতেছেন, তাঁহার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, লিখিয়াছেন। দুইবার

অস্ত্র করিতে হইয়াছে—উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রপাঠ মাত্রেই সংবাদ লইবেন। তিনি কুচবিহারের ৺কালীবাড়ির পশ্চাদ্ভাগে বাবু সাগরচন্দ্র সুরের বাটিতে আছেন। বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।" যাহা হউক, সেবারে সকলের বিশেষ যত্নে গোপাল-দা শীঘ্রই সারিয়া উঠিয়া পুনর্বার কাশীধামেই তপস্যায় মগ্ন হইলেন।

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য-বিজয়ান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক গুরুভ্রাতা-দিগের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ যদিও সুদীর্ঘকাল কাশীতেই তপোনিরত ছিলেন এবং তখনই ঐ স্থানত্যাগের কোনও সঙ্কল্প পোষণ করিতেন না, তথাপি স্বামীজীর সপ্রেম আহ্বানে অচিরে আলমবাজারের মঠে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার আদেশে বৃদ্ধ বয়সে 'লঘুকৌমুদী' পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন সবেমাত্র নূতন মঠনির্মাণের জন্য বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। অতঃপর গৃহনির্মাণাদি-কার্যের তত্ত্বাবধানের সুবিধা হইবে মনে করিয়া (১৮৯৮-এর প্রথম ভাগে) মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে উঠাইয়া আনা হইলে তপস্বী বৃদ্ধ গোপাল-দার শেষ অক্লান্ত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। নবসংগৃহীত ভূমিতে পূর্বে নৌকা ও জাহাজ-সংস্কার হইত বলিয়া উহা তখন বড়ই বন্ধুর ছিল এবং গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করার অনুপযুক্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রথম কর্তব্য হইল, শ্রমিকদের সাহায্যে ভূমি সমতল করা। তপস্বী সাধকগণ এরূপ কার্যে সাধারণত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অপারগও হন। গোপাল-দা কিন্তু এই কর্মকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের ভিত্তি ও তপস্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ইহাতে তাঁহার একান্ত মনোনিবেশ দেখিয়াও আশ্চর্যবোধ হয় না। দ্বিপ্রহরে মঠে আহার করিতে গেলে যাতায়াতে অনেকটা সময় নষ্ট হয় দেখিয়া তিনি কার্যস্থলেই খাবার আনাইয়া খাইতেন। এইরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম স্থায়ী মঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে মঠের নূতন বাটির কার্য শেষ হইলে তিনি তাহাতেই বাস করিতে থাকিলেন। ঐ সময়ে মঠের আভ্যন্তর অনেক কার্যের তত্ত্বাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত। তবে তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সবজিবাগান। মঠ নির্মিত হইলেও দৈনন্দিন অভাব তখন যথেষ্টই ছিল; সুতরাং খাদ্যোৎপাদনও একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই সম্বন্ধে লাটু মহারাজ এক সময় বলিয়াছিলেন, "আরে, বুড়ো গোপাল-দা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের ওপর তরকারি জুটত না। সবজিবাগান করতে বুড়ো গোপাল-দাকে কতই না খাটতে হয়েছে!"

শ্রীশ্রীমাও একবার গোপাল-দার এই আন্তরিকতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেদিন কলকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে গিয়া গোপাল-দা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার শরীর বাতগ্রস্ত হইলেও তিনি মঠের প্রয়োজনবোধে বাগানে খুব খাটেন; মঠের জমিতে যা কিছু হওয়া সম্ভব—ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা—সবই করিয়াছেন; অতএব তরকারি আর বড় একটা কিনিতে হয় না; অধিকন্তু শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন; অথচ নূতন ধারায় লালিত ও শিক্ষিত নবাগত ব্রহ্মচারীরা এ সবের মর্যাদা বা প্রয়োজন না বুঝিয়া প্রায় নিশ্চেষ্ট থাকেন। সব শুনিয়া মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি সেকেলে লোক—তুমি তো আর ছেলেদের মতো থাকতে পারবে না। মঠও তো একটা সংসার, খাওয়াদাওয়া তো আছে—তুমি থাকতে পারবে কেন? তাই দেখে থাক!"

মঠের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার দায়িত্ব ঐ সময়ে প্রধানত স্বামী প্রেমানন্দের ওপর ন্যস্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাঁহাকে সর্বকার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন এবং বাবুরাম মহারাজ অনুপস্থিত থাকিলে স্বহস্তে ঠাকুরপূজা করিতেন। পূজা তিনি অতি নিষ্ঠাসহকারেই করিতেন। একটি ঘটনায় তাঁহার মনোভাব সুন্দর ধরিতে পারা যায়। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক পূজারিকে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন, "ঠাকুরের ভোগ, নৈবেদ্যাদি খুব সাবধানে রেখ।" শুনিয়াই গোপাল-দা ইহার সমর্থনে কহিলেন যে, কাশীপুরে তিনি একদিন অনবধানতাবশত ঠাকুরের আহার্যের ওপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে ঠাকুর আর উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তদবধি গোপাল-দা ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

সাধারণ বাঙালির তুলনায় গোপাল-দার বয়স তখন খুবই হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্ঘের সেবাজ্ঞানে তখনও তাঁহার দেহকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম কর্মের স্রোত চলিতেছে। সাধ্যানুযায়ী স্বীয় ক্ষীয়মাণ শক্তির সদ্ব্যবহারে তিনি কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁহার স্বভাবোচিত সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার যত্নে তখন মঠের বাগান পূজার ফুল এবং ভোগের ফল ও তরকারিতে পূর্ণ থাকিত। আর তাঁহার অন্যতম কর্ম ছিল গো-সেবা। সেখানেও তাঁহার অনিন্দনীয় পারিপাট্য আত্মপ্রকাশ করিত।

নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে তখন গোপাল-দার সহিত এই সকল কাজ করিতে হইত; কিন্তু আধুনিক স্কুল-কলেজ হইতে সদ্য-আগত এবং এই প্রকার কাজে ও পরিপাটিতে অনভ্যস্ত নবাগতরা তাঁহার সহিত সমতালে চলিতে পারিত না। ফলে গোপাল-দা সাতিশয় বিরক্ত হইতেন এবং সময়ে সময়ে ভর্ৎসনা করিতেন। কিন্তু

একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, সর্বভূতে তিনিই বিদ্যমান। এই অনুভূতির পরে তাঁহার ঐ স্বভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি বলিলেন, "সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান; কাকে নিন্দা করি, আর কারই বা সমালোচনা করি?" ঠাকুরের সংসার, আর ইহারা ঠাকুরেরই সন্তান—এই মনোভাব লইয়াই তিনি বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন।

ইহারই মধ্যে আবার রসিকতারও অভাব ছিল না। একসময়ে গোপাল-দা সবজিবাগান ও অপর একজন সাধু ফুলবাগান দেখিতেন। ফুলবাগানে সব ব্রহ্মচারীরা কাজ করিতেছে—তরকারিবাগানের ব্যবস্থা হইতেছে না দেখিয়া গোপাল-দা বলিলেন, "আহা, নূতন ছেলেদের অত খাটাতে নেই—ফুলবাগানের মাটি বড় শক্ত। ওরে ছেলেরা, তোরা এখানে এসে কাজ কর—এই মাটি নরম।" উপস্থিত সকলেই জানিতেন যে, বস্তুত সবজিবাগানের কাজ অনেক অধিক শ্রমসাধ্য। সুতরাং এরূপ মন্তব্যে হাস্যেরই উদ্রেক হইল। প্রাচীনভাবে ভাবিত বুড়োমানুষ গোপাল-দার চা-এর সম্বন্ধে অদ্ভুত বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। তিনি চা পান করিতেন না এবং অপরকেও পান করিতে নিষেধ করিতেন। ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে বেশ রসিকতা জমিয়া উঠিত। গোপাল-দা একবার একজনকে বলিলেন, "ওরে, চা খাস নি, খাস নি—রক্ত হেগে মরবি।" সম্বোধিত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "গোপাল-দা, যত ফোঁটা চা তত ফোঁটা রক্ত।" গোপাল-দাও তখন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "খুব খা, খুব খা"। অমনি হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বয়স তাঁহার বেশি ছিল; সেইজন্য জনসাধারণের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠিত সমস্যাবহুল সেবাদি-কার্যে তিনি যোগ দিতেন না। ফলত বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ ছিল, ততদিন তাঁহার চিত্তে ঠাকুরের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিবার এক আকুল প্রচেষ্টা ছিল। ইহাতে যদিও তিনি কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই আদর্শকে আরও নিকটে পাইবার জন্য সাধকোচিত অতৃপ্তি ও আক্ষেপ তাঁহার জীবনকে বড়ই মধুর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিত। গীতাপাঠ তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং নিয়মিত পাঠের জন্য স্বীয় সুন্দর হস্তাক্ষরে পঞ্চগীতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা—আর ইহা তিনি অনেকটা ঠাকুরের নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। পেটের অসুখের জন্য একবার জনৈক কবিরাজ ঠাকুরকে তিনটি লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর গোপাল-দাকে উহা সংগ্রহ করিতে বলিলে তিনি অনেকগুলি লেবু আনিয়া হাজির করিলেন। সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর কিন্তু তিনটি মাত্র লেবু রাখিয়া বাকি সব ফিরাইয়া দিলেন। গোপাল-দা চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন, তিনি যাঁহাকে

জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কথা ও কার্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। ইহা স্বতই তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মঠের ব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সত্যপরায়ণ হইতে বলিতেন এবং ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

তাঁহার তীর্থভ্রমণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। শরীর বৃদ্ধ হইলেও মন ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ। সেই মনোবলে তিনি ৺কেদারনাথ হইতে কন্যাকুমারী এবং দ্বারকা হইতে কামাখ্যা পর্যন্ত প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গয়াধামে যান। ১৮৯০-৯১-এর শীতকালে তিনি হরিদ্বারে কুম্ভোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কোন্নগরের নবাইচৈতন্যবাবুর সহিত তিনি ১৮৯৭-এর নভেম্বরে রায়পুরে পৌঁছেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ১৮৯৮-এর ২৩ মার্চ স্বামী সুবোধানন্দ ও নির্মলানন্দের সহিত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৯-এর শেষে তিনি দার্জিলিং-এ যান এবং ৫ নভেম্বর মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পরে অদ্বৈতানন্দজী জনকয়েক গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত দ্বারকায় যান এবং পরবৎসর ৭ ফেব্রুয়ারি মঠে উপস্থিত হন।

শেষবয়স পর্যন্ত সামান্য ব্যায়ামাদি-সহায়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালই ছিল বলিতে হইবে। অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা তাঁহার মনঃপূত ছিল না এবং ভগবানও তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় খুব কমই ফেলিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেহ সেবা করিতে অগ্রসর হইলেও স্বাবলম্বী গোপাল-দা তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন—নিজের সমস্ত নিজেই করিতেন এবং উহাতেই ছিল তাঁহার তৃপ্তি। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং বাঁয়া-তবলায় হাত খুব মিষ্ট ছিল।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি প্রত্যহ একটু ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু এইভাবে জরাজীর্ণ শরীরকে ধরিয়া রাখা কষ্টকর হওয়ায় এবং প্রতিকারের চেষ্টাসত্ত্বেও রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকায় একদিন তিনি ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমায় এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।" ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনিলেন, মুক্তি তাঁহার শীঘ্রই আসিল।

শোনা যায় যে, অন্তিম অসুখের সময় তাঁহার এক অলৌকিক দর্শনলাভ হয়। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর গদাহস্তে সম্মুখে উপস্থিত। গদা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত গোপাল-দা ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি এবারে গদাধররূপে আবির্ভূত।" ঠাকুরের আগমনে সর্বপ্রকার বিবাদ-বিচ্ছেদ দূরীকৃত

হইবে—ঠাকুর কি গদাধরমূর্তিতে সেদিন এই ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন? মনে রাখিতে হইবে—ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম ছিল গদাধর। কে জানে, অবতারপুরুষের সর্বপ্রকার সার্থক ক্রিয়াকলাপ ও নামাদির পশ্চাতে কোথায় কোন্ অর্থ লুক্কায়িত থাকে?

অবশেষে শেষের দিন আগত। সেই দিনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের একখানি পত্রে আছে—"২৮ ডিসেম্বর (১৯০৯) মঙ্গলবার বেলা ৪টা-৩০ ঘটিকার সময় গোপাল-দাদা স্বধামে গমন করেছেন।[১] সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র। কেহ ঠাওরাইতে পারে নাই যে, এত শীঘ্র তিনি দেহরক্ষা করিবেন। শেষসময়ের মুখকান্তি অতি সুন্দর! শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি-ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু-দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ!" একাশী বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ বাঞ্ছিতধামে চলিয়া গেলেন; কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন পরবর্তী সন্ন্যাসিসঙ্ঘের জন্য একখানি অনুকরণীয় আদর্শ জীবন।

---

১ ১৩ পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অপরাহ্ন ৪টা ১৫ মিঃ বেলুড় মঠে দেহত্যাগ হয় ('উদ্বোধন')।

# স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পূর্ব নাম ছিল শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্র। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর কৃপায় এই পুত্রটি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পিতা পুত্রের ঐরূপ নাম রাখিয়াছিলেন। ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত পাইকহাটীর নাওরা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি (১৮ মাঘ, ১২৭১, চান্দ্র শুক্লা চতুর্থী তিথিতে) সোমবার, রাত্রি ৯টা ২৬ মিনিটের সময় সারদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ ৺নীলকমল সরকার পাইকহাটীর বিশেষ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতা বাবু শিবকৃষ্ণ মিত্র কলকাতার নন্দনবাগানে বাস করিতেন। তিনি সাধুতা ও চরিত্রবলে প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিবকৃষ্ণের চারি পুত্র—বিনয়, সারদা, অনুকূল ও আশুতোষ।

বাল্যকাল হইতেই দেবতাপূজাদিতে সারদার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর প্রায় ১০৮টি স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং অতি সুললিত সুরে ভগবদ্গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহাকে কলকাতায় পিতৃভবনে আনিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। বালকের স্বভাব সরল ও সুমিষ্ট; অধিকন্তু পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম হওয়াতে তিনি শিক্ষক ও সহপাঠীদের স্নেহ ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেন। নিম্নবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য শ্যামপুকুরের 'মেট্রোপলিটান-ইনস্টিটিউশনের' চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। এখানে চারি বৎসর কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়নান্তে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার নিজের আশা ছিল এবং সকলেই ভাবিতেন যে, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারপূর্বক তিনি বৃত্তিলাভ করিবেন। কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডাইবে? পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন জলখাবার খাইবার সময়ে অসাবধানতাবশত তাঁহার বড় সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়াতে তিনি এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, অবশিষ্ট পরীক্ষা আর ভাল করিয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং তিনি পাশ করিলেন দ্বিতীয় বিভাগে। ইহাতে দুঃখের মাত্রা বর্ধিতই হইল। এত আশা আজ ব্যর্থ হইল! প্রত্যুত এই বিফলতাই আবার ঈশ্বরের বিধানে তাঁহাকে আর এক অপূর্ব সাফল্য আনিয়া দিল। 'কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় তখন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রিয় ছাত্রকে মাসাধিক যাবৎ বিমর্ষ দেখিয়া একদিন (১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া গেলেন। অতঃপর ঠাকুরের আকর্ষণে তিনি স্বতই তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সারদার পিতাকে সাধুসঙ্গের বিরোধী জানিয়া ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সারদা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য শেয়ারের

গাড়িভাড়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লইবেন। লজ্জাশীলা মা-ও সারদার আগমন বুঝিতে পারিলেই পূর্ব হইতে আবশ্যকীয় পয়সা দ্বারদেশে রাখিয়া দিতেন—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইত না।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।" কিন্তু তখন তাঁহার নিশ্চয়ই দীক্ষা হয় নাই; কারণ শ্রীশ্রীমা বলিতেন যে, স্বামী যোগানন্দই তাঁহার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গগুণে সারদার জীবন কিরূপ নবভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শৈশব হইতে স্বগৃহের ব্যবস্থা দেখিয়া সারদার ধারণা হইয়াছিল যে, ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি ঝি-চাকরদের কাজ। তাই ঠাকুর যখন একদিন আদেশ করিলেন, "কিছু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দে," তখন লজ্জায় আরক্তিম-বদন সারদা শুধু চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর সব বুঝিয়াও যেন বুঝিতে পারেন নাই এমন ভাবে পুনরায় বলিলেন, "জল নিয়ে আয়।" সারদা কি করিবেন? উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে আদেশ পালন করিতে হইল। কিন্তু সেই সংস্কার অনিচ্ছা সেইদিনই পূর্ণ ইচ্ছায় পরিণত হইল। আমরা পরে ইহার পরিচয় পাইব।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেখানেও অল্পদিনে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে তাঁহাকে আর বিশেষ পড়াশুনা করিতে দেখা যাইত না—তখন তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি শ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থ-পাঠাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ঠাকুর শ্যামপুকুরে আগমন করার পর হইতে সারদা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। কাশীপুরেও তিনি খুব যাতায়াত করিতেন এবং গৃহের কঠিন শাসন সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে সেখানে রাত্রিযাপন করিতেন।[১] কাজেই তাঁহার পিতার বুঝিতে বাকি রহিল না যে,

১ বর্তমান গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় যে ত্যাগীদের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহারা কাশীপুরে "সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।" অপরদের সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ'—দিব্যভাবের ১৯৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে—"সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েকদিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি ও গঙ্গাধর বাটিতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সারদার মন ক্রমেই সংসারবন্ধন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে। অতএব তিনি পুত্রকে সংসারে আকর্ষণের জন্য নানাবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। ঐ চেষ্টা কত ঐকান্তিক ও দৃঢ় ছিল তাহা মাস্টার মহাশয়ের এই কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, “ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন সারদা মহারাজের বাপ একজনকে হাসতে হাসতে বলেছিল, ‘আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, তবে তো হলো!’ ছেলেকে তিনি কিছুতেই ঠাকুরের কাছ থেকে বাগ মানাতে পারছিলেন না।”

সারদার পিতা পুত্রকে সংসারে বাঁধিবার অন্য উপায় না দেখিয়া গোপনে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অবশেষে সারদার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়াতে সারদা প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি স্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলেন। অবশেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহ হইতে ধীর পদবিক্ষেপে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় একখানি পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন; তাহাতে লিখা ছিল—“শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্নেহময়ী জননী আমার! আমি বিবাহ করতে পারব না। চোখের দৃষ্টি যে দিকে নিয়ে যায়—সেই দিকে আজ চললুম আমি। সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হতে আমার ইচ্ছা নেই” ইত্যাদি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সাড়ে এগারটার সময় বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়া তিনি প্রথমত কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন এবং গৃহ হইতে পলাইতেছেন ইহা না জানাইয়াই তাঁহার শুভাশীর্বাদ লইয়া পদব্রজে পুরী রওয়ানা হইলেন। কিছুদিন পর সারদা পাঁশকুড়া হইতে বাড়িতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—“শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্নেহময়ী মা আমার! আপনাদের অকৃতজ্ঞ সন্তান দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে আপনাদের ছেড়ে চলে এসেছে—পারেন তো ক্ষমা করবেন। আমার দেশের ভাইবোন নানাবিধ দুঃখকষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছে—এ অবস্থায় আমি কুঁড়ের মতো বাড়িতে বসে থাকতে পারি নে। মানসিক অবস্থা পূর্ববৎই আছে। আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না—শরীর খুব ভালই। বৃথা আমাকে খুঁজতেও এখানে আর আসবেন না; কারণ এই চিঠি ডাকে ফেলেই ফের রওনা দিচ্ছি। কোথায় যে যাই, এখনও কিছু ঠিক নেই। মা ও বড় ভাইবোনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। আপনিও নেবেন। ছোট ভাইবোনদের আমার ভালবাসাদি জানাচ্ছি। ইতি—আপনাদের অধম সন্তান সারদা।”

সারদা গন্তব্যস্থানের সংবাদ না দিলেও কাশীপুরে অনুসন্ধান করিয়া পিতা জানিলেন যে, তিনি পুরী গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য পুরী রওয়ানা হইলেন (২৭ জানুয়ারি, ১৮৮৬)। পুরীতে উপস্থিত

হইয়া জনকজননী সারদার সাক্ষাৎ পাইলেন। জননীর স্নেহময় কুশলপ্রশ্নের উত্তরে সারদা আবেগভরে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত জানাইলেন ঃ

"পাঁশকুড়া হতে আপনাদের চিঠি লিখে চলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু দুদিন যাবৎ কোথাও কিছু খেতে পেলুম না। বড়ই ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় চলতে বড় কষ্ট হলো। সন্ধ্যার পূর্বে নিশ্চয়ই কোন লোকালয় পাব—এই ভরসায় অগ্রসর হলুম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় দেখি সামনে বিরাট জঙ্গল! ওরই মধ্যে একটি ছোট রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। সর্বশক্তিমান ভগবানের উপর নির্ভর করে ঐ রাস্তায় চললুম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যতই যাই, ততই দেখি নিবিড় বন নিবিড়তর হয়ে আসছে। অবশেষে অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেলুম! কি করব? আমার গুরুদেব পরমহংসদেবের নাম করতে লাগলুম এবং সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে প্রার্থনা জানালুম। নিরুপায় হয়ে সামনের একটি বড় গাছে উঠে ডালের ওপর ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ কে আমায় ডাকছে শুনতে পেলুম। কে, রাত্রির অন্ধকারে চেনা দায়। কণ্ঠস্বর কানে এল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই যে বাতাসা রয়েছে, খাও।' এই বলে লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এক ঘটি জল আমাকে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নিবিড় বনে হঠাৎ একটি লোকের আগমন এবং তার সহানুভূতিতে অভিভূত হয়ে গেলুম। কি করে এ হলো বুঝতে পারলুম না। তবে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা মনে করে অনেকক্ষণ যেখানে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। যাক, সামান্য জিনিস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলুম। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হলো। সকালবেলা উঠে বনের এদিক-ওদিক নানাস্থানে খুঁজতে লাগলুম; কিন্তু এই নিবিড় বনে লোকালয় কিংবা লোকের চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুম না।"

পুরীযাত্রাকালে কাশীপুরে তাঁহাকে নিঃসম্বল দেখিয়া তারক (স্বামী শিবানন্দ) পাঁচটা টাকা দিয়াছিলেন; কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। এমনি ছিল তখন তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য।

কিছুদিন তিনি পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। অতঃপর আরও কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া সদলবলে কলকাতা ফিরিলেন। এদিকে কলেজে এফ. এ. পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা কেহ আশা করে নাই; কারণ সারা বৎসর পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। কিন্তু তিনি আশাতীত ভাবে পাশ করিলেন।

ইহার পর আবার সারদার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বাড়ি হইতে মাঝে মাঝে কোথায় চলিয়া যান—কেমন যেন আপনভাবে চলেন আর সংসারের প্রতি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়বাবু এইসব দেখিয়া সারদাকে সংসারে

ফিরাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমত তিনি একটি বশীকরণ যজ্ঞ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য মন্ত্রের প্রভাবে সারদা মহারাজের মন সংসারে ফিবাইয়া আনা। একমাস বারদিন ধরিয়া বারজন ব্রাহ্মণদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। পরন্তু যজ্ঞের ব্রাহ্মণগণ স্পষ্ট বলিলেন যে, তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব। ইহাতেও বিনয়বাবু হতাশ হইলেন না; পরন্তু অন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। এইজন্য তাঁহাকে নানাভাবে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু কোন ফলই হইল না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের শিষ্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া সব খুলিয়া বলিলেন এবং সারদা যাহাতে সংসারে ফিরিয়া যান, তজ্জন্য তাঁহার গুরুভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাসখানেক পরে সারদা সব জানিতে পারিলেন এবং ইহাতে তাঁহার সংসারবিতৃষ্ণা বর্ধিতই হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্র প্রমুখ অনেকে যখন আঁটপুরে যান, তখন সারদাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আঁটপুরে তাঁহারা যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিন সেখানে বাবুরামের গৃহটি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মধ্যে আবার একদিন সারদাকে শিব ও গঙ্গাধরকে পার্বতী সাজাইয়া হরগৌরী-উৎসব করা হইল। এইরূপ অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সকলে একদিন এক পুষ্করিণীতে স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় অনবধানতাবশত সন্তরণে অপটু সারদা ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন নিরঞ্জন তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই সারদা বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন—তাঁহার নাম হইল ত্রিগুণাতীতানন্দ, সংক্ষেপে ত্রিগুণাতীত। সাধারণত তিনি সারদা মহারাজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী তখন প্রায়ই তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলেন, আর ভগবানলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং প্রায়োপবেশন করিবেন বলেন। শুনিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজের মনে আগুন জ্বলিল—একদিন তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। স্বামীজী তখন কলকাতায় ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিলেন এবং অন্বেষণান্তে তাঁহারই নামে লিখিত একখানি পত্র পাইলেন—"আমি হেঁটে বৃন্দাবনে চললুম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। আগে বাপ-মা ও বাড়ির সকলের স্বপন দেখতুম। তারপর মায়ার মূর্তি দেখলুম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, 'তোর বাড়ির ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস নে'।" কিন্তু সেবারে তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে

যান; সেখানে এক রাত্রি কাটাইয়া পর দিন কোন্নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিল এক-আধখানি কাপড় ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কোন্নগরে তিনি একদিন থাকিয়া রেলভাড়া সংগ্রহের চেষ্টা করেন; কিন্তু অত টাকা দিতে কেহই রাজি নহেন দেখিয়া অগত্যা তিনি বরাহনগরেই ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর তিনি কলকাতাস্থ নিজ ভবনে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে সারদা মহারাজ কয়েকদিন বিশেষ শোকগ্রস্ত ছিলেন। বস্তুত সন্ন্যাসী হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ জনকজননীর প্রতি ভালবাসা বিসর্জন দেন নাই। তাই তিনি স্বীয় গর্ভধারিণীর সংবাদ রাখিতেন এবং তাঁহার কল্যাণার্থে তাঁহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া যাইতেন। তাঁহার জননী ১৮৯৫ খ্রিঃ ২৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

বরাহনগর মঠে বাসকালে স্বামীজী একদিন স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ থেকে বেড়িয়ে এস না, শরৎ।" শরৎ মহারাজ বাহির হইবেন এমন সময় মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ) বলিলেন, "শরৎ, আমিও যাব।" শুনিয়া শরৎ মহারাজ দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে তীর্থদর্শন-মানসে ত্রিগুণাতীতজীও রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাপুরুষ ও সারদানন্দ মহারাজ রাস্তায় বাহির হইয়া আর সারদা মহারাজকে দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তাঁহাকে ফেলিয়াই তাঁহারা গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেলা বাড়িয়া সূর্য মাথায় উঠিলে তাঁহারা বিশ্রামের জন্য এক বাগানের সম্মুখে বসিলেন। অকস্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজী ঐ বাগান হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "দুপুর হয়েছে কিনা, তাই স্নান করে পিত্তিরক্ষা করে নিলাম।" "পিত্তিরক্ষা?"...উভয়ে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুকুরে স্নান করে ভাবলুম, কি করে পিত্তিরক্ষা করি? দেখলুম কচি দূর্বা রয়েছে, তাই খেয়েছি।"

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে এমনই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের! একসময়ে পেটের অসুখে ভুগিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভক্ত ডাক্তারবাবু সাধুকে স্বগৃহে পাইয়া এবং আহারে তাঁহার রুচি আছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাবে বল?" সাধু বলিলেন, "রসগোল্লা।" তখনকার দিনের দুই টাকার রসগোল্লা একখানি থালায় সজ্জিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি নির্বিবাদে সমস্ত শেষ করিলেন। অতঃপর কুশল প্রশ্নাদিচ্ছলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি প্রয়োজনে এলে?" তিনি বলিলেন, "আমার পেটের অসুখ হয়েছে, তাই মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" ডাক্তার অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "অত

রসগোল্লা খেলে কেন?" সহজ উত্তর আসিল, "তা আপনি দিলেন—আমি কি করব?" পাঠক কি ইহাকে লোভ বলিবেন? সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু রসগোল্লার সঙ্গে ঘাসের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে, আর ভাবিতে হইবে সিদ্ধপুরুষ প্রেমানন্দজীর বাণী। পূর্বোক্ত চিকিৎসাপর্ব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ওর সিদ্ধাই ছিল। আমি একবার সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে দিতে লাগলুম—বেশ খেয়ে যেতে লাগল। আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না।" স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া এক শিবরাত্রির পরদিন বলিয়াছিলেন, "রোজ একটা করে কলা খেয়ে (সারদা) ঐ বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।"

তীর্থদর্শন ও সেবাকার্যাদির সময় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিনাতিপাত করিতেন। আবার সম্ভবস্থলে প্রচুর অন্ন গ্রহণ করিয়া উদরপূর্তি করিতেন বা পরিহাসচ্ছলে ভোজ্য-পরিবেশনের দৈন্য প্রমাণ করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতেন। একদা জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার সময় একটি ছোট হোটেলে উঠিয়া সারদা মহারাজ মালিককে জানাইলেন যে, তিনি অপরের তুলনায় অধিক আহার করেন; সুতরাং পরিবেশনে যেন কার্পণ্য করা না হয়—তিনি সাধারণ হার অপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন। ধর্মভীরু মালিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই যথানিয়মে অভ্যাগতকে আহারে বসাইল। সারদা মহারাজ ক্ষুধিত ছিলেন, তাই বারংবার ডালভাত চাহিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্রমে মালিকের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হইল। কিন্তু সাধুকে স্বীয় চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী আহার করাইয়া তাহার একটা আত্মতৃপ্তি লাভ হইয়াছিল; আর সেই সস্তার দিনে খরচও তেমন বেশি কিছু হয় নাই; সুতরাং ত্রিগুণাতীত মহারাজ অধিক অর্থ দিতে গেলেও সে গ্রহণ করিল না—শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সাধুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। একবার তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া জয়রামবাটীতে যাইতেছিলেন—মা ছিলেন গো-যানে এবং তিনি চলিয়াছিলেন পদব্রজে। রাত্রে গাড়িখানি রাস্তায় এমন এক গভীর গর্তময় স্থানে আসিয়া পড়িল, সেখানে উহা উল্টাইয়া যাইতে পারে কিংবা ঝাঁকানিতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে। অবস্থা বুঝিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজ রাস্তার গর্তে শুইয়া পড়িয়া তাঁহার দেহের উপর দিয়া গাড়ি চালাইতে আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে তিনি কাণ্ড দেখিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া সারদা মহারাজকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আর একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বাজার হইতে ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনিতে বলিলে তিনি বাগবাজার হইতে লঙ্কা চাখিতে চাখিতে পায়ে

হাঁটিয়া বড়বাজারে গিয়া ঠিক ঠিক ঝাল লঙ্কা পাইয়া কিনিয়া আনিলেন। ততক্ষণে জিহ্বা ফুলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে ছিলেন, তখন সেবক সারদা মহারাজ সন্ধ্যাবেলায় একখানি পরিষ্কার কাপড় শেফালিকা গাছের তলায় পাতিয়া রাখিতেন, যাহাতে শেষরাত্রে-ঝরা শিউলি ফুলে মা ঠাকুরের পূজা করিতে পারেন। কলকাতা ও জয়রামবাটীতে তিনি অন্য বহুভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছেন।

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহার অদ্ভুত সাহসের কথা। কোন্ সময়ের ঘটনা জানা নাই—তবে উহা তাঁহার যৌবনপ্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভূত আছে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। অথচ সকলের মুখেই ভূতের গল্প শুনিতে পান। একদিন শুনিলেন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একটি পুরাতন বাড়িতে গেলে অবশ্যই ভূত দেখা যাইবে। অমনি সেখানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মধ্যরাত্রিতেও কিছু না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে এক ক্ষীণ আলো উঠিতে দেখিলেন। উহা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ডচক্ষু যেন তাঁহার দিকে ভীষণভাবে অগ্রসর হইতে থাকিল। ইহা দেখিয়াই তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, আর রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তিনি প্রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সেসব কাজ বোকার মতো কেন কর? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে।"

বরাহনগর মঠে এক রাত্রে ব্রহ্মানন্দজী, সুবোধানন্দজী ও ত্রিগুণাতীতজী একশয্যায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় ত্রিগুণাতীতের মনে নির্জন শ্মশানে যাইয়া তান্ত্রিক সাধনা করিবার বাসনা জাগিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহের বাহিরে চলিলেন। এদিকে ব্রহ্মানন্দজী স্বপ্নযোগে অকস্মাৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে সারদা, যাসনি, যাসনি।" সে শব্দে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তাহারা দেখিলেন যে, সারদা মহারাজ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মানন্দজী কহিলেন যে, স্বপ্নে ঠাকুর ঐভাবে ত্রিগুণাতীতকে নিষেধ করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের তন্ত্রসাধনার এখানেই পরিসমাপ্তি হইল।

বরাহনগরে একসময়ে ত্রিগুণাতীত মহারাজ একবার একটি ছোট ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এরূপ অবিরাম জপধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, আহারনিদ্রাও ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং অপর সকলে তাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, এমন কি জোর করিয়াও ধরিয়া আনিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে

তিনি বলিলেন যে, মহাপুরুষ শিবানন্দজী যদি আহারের সময় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন, তবে উহাই তাঁহার জপের সদৃশ হইবে এবং ঐ ভাবে তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন। অগত্যা তাহাই হইল।

আঁটপুরে বড়দিনের রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ ত্যাগ-বৈরাগ্যের আলোচনায় যে অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিলেন, উহার স্মরণার্থে এবং যিশুর প্রতি ভক্তি-নিবেদনের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজ অতঃপর প্রতি বৎসর বড়দিনের পূর্ব রাত্রে একটি ছোট উৎসব করিতেন। ফলত তাঁহার অনুকরণে আজও বেলুড় মঠে ও মঠের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আশ্রমে যথারীতি যিশুর এই জন্মরাত্রিটি প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তীর্থদর্শনবাসনা তাঁহার মনে সর্বদাই ছিল। তাই তিনি সুযোগ পাইয়া ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কোন এক দিন উত্তর ভারতের তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেইবারে তিনি কাশীধাম, চুনার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, কানপুর, বিঠুর (ব্রহ্মাবর্ত) প্রভৃতি স্থানে তত্রত্য দেবদেবীর পুণ্যদর্শন লাভ করেন। প্রয়াগে তিনি দশ-বারো দিন জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। ক্রমে এটোয়াতে আসিয়া তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গে আগ্রা ও মথুরা দর্শনানন্তর গোবর্ধনে 'দীপমালার মেলা' দেখিতে গেলেন এবং তদনন্তর যতিপুরে 'অন্নকূটের মেলা' দেখিয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শনান্তে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। ইহার পরে মথুরা পর্যন্ত একসঙ্গে থাকিয়া অখণ্ডানন্দজী আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত করোরী ও জয়পুর হইয়া পুষ্করাভিমুখে চলিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৯১)। পুষ্করে তাঁহাদের পুনর্মিলন হইল এবং দুই জনে একসঙ্গে আজমীরে আসিয়া তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন। কিন্তু একদিনে সমস্ত দেখার কঠোর পরিশ্রমে ত্রিগুণাতীত মহারাজ জ্বরে শয্যাগত হইলেন; সে জ্বর সারিতে সতেরো-আঠারো দিন কাটিয়া গেল। আরোগ্যান্তে তিনি একাই বোম্বাই যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আপাতত চিতোরের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

একমাত্র ভগবানের ওপর নির্ভর করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবানও তাঁহাকে বহু আপদবিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। একবার অন্ধকার রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে পথ দেখিতেও অক্ষম হইয়া তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন। নিকটেই রেলস্টেশন থাকিলেও তিনি জানিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই স্টেশনের দারোয়ান লণ্ঠনহস্তে বাড়ি যাইবার পথে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া নিজগৃহে লইয়া গেল।

নানাস্থানে ভ্রমণান্তে ত্রিগুণাতীত মহারাজ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায়

মন্দিরাদি-দর্শনানন্তর জাহাজে পোরবন্দর বা সুদামাপুরী দর্শনে চলিলেন। সেখানে ৺হাটকেশ্বর মন্দিরে একদল হিংলাজ-যাত্রী সন্ন্যাসী অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ এই বাঙালি সাধুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন; কারণ এখন তাঁহার সাহায্যে রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী অপর বাঙালি সাধুকে ধরিয়া রাজার নিকট হইতে আবশ্যকীয় পাথেয় সংগ্রহের পথ সহজ হইয়া গেল। কে এই দ্বিতীয় বাঙালি সাধু? সাধুদের কথায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুমান হইল, হয়তো বা ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। তথাপি সন্ন্যাসীদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি ভিক্ষার্থী হিসাবেই তাঁহাদের সহিত ঐ রাজপ্রাসাদনিবাসী সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, তাঁহার অনুমান সত্য। কিন্তু স্বামীজী দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "পয়সার জন্য আমি কাকেও বলতে পারব না। তোর কাছে যা আছে, সব দিয়ে দে।" স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাই করিলেন এবং সাধুদের বিদায় দিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া তিনি হাটকেশ্বর মন্দিরে ফিরিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে অন্যত্র যাইবার জন্য পুঁটুলি বাঁধিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নিজ আবাসস্থলে লইয়া গেলেন এবং দুই-তিন দিন পরে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের বাটিতে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ বাটিতে কয়েক দিন থাকিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজ আবার ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হন এবং তীর্থদর্শন করিতে করিতে ক্রমে কলকাতায় উপনীত হন।

এই সময় একটি ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সদ্বংশসুলভ অমায়িক ব্যবহারের পরিচয় পাই। কালীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) মঠে যোগদান করিলে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে বাড়িতে ফিরাইবার জন্য একদিন মঠে আসেন। পরন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতের আসন ও তামাকপ্রদান এবং মধুর আলাপনে তিনি বুঝিতে পারেন যে, নাতিটি সাধুপ্রকৃতির যুবকদের সহিতই আছে। ইহাতে তাঁহার খেদ মিটিয়া যায় এবং তিনি নির্বিবাদে গৃহে ফিরিয়া যান।

ত্রিগুণাতীত মহারাজের তীর্থভ্রমণস্পৃহা তখনও চরিতার্থ হয় নাই। সুতরাং কয়েক বৎসর পরে তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানসসরোবর-দর্শনে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গম রাস্তায় তাঁহাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যেন দৈবসহায়েই উদ্ধার পাইয়াছিলেন। একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক সন্ধ্যাসমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্য একটি পুরাতন বাঁধমাত্র আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। জ্যোৎস্নার আলোকে কোন প্রকারে উহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ভগ্নস্থানগুলি উল্লম্ফনপূর্বক

অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলিয়া সবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় একখানি কালোমেঘ উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায় অমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাঁধের উপর দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; মনে মনে শুধু ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "আমায় অনুসরণ কর।" হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কলের পুতুলের মতো চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে চাঁদের আলো পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

আর একবার পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণকালেই তিনি একদিন চলিতে চলিতে একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহার পার্শ্বেই একটি বহু পুরাতন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্দিকে প্রাচীরাবৃত একটি ছোট প্রাঙ্গণ। তিনি শুনিতে পাইলেন, সূর্যাস্তের পরে এই মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কেন না রাত্রিতে কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কেহ মন্দিরের মধ্যে থাকিলে মশকদংশনে তাহার জীবনসংশয় হয়। এইরূপ অদ্ভুত কথার সত্যতা-পরীক্ষার জন্য তিনি গ্রামবাসীদের নিষেধ সত্ত্বেও সূর্যাস্তে মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার পর সত্যসত্যই কৃষ্ণমেঘসদৃশ মশকপুঞ্জ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কম্বলাবৃত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলেন।

কৈলাস, মানসসরোবর ও লাদাখ হইতে ফিরিয়া তিনি প্রায়শ কলকাতায় থাকিতেন; কারণ প্রথমে তাঁহার জ্বর হয়; তারপর ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতে হয় এবং অতঃপর 'উদ্বোধন' পত্র-প্রকাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রয়াসের সংবাদে আনন্দিত হইয়া স্বামীজী আমেরিকা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে—সে মতলবটা মন্দ নয়।" অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পত্র-প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় নাই—উহা বাহির হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে। কলকাতায় অবস্থানের এই সুযোগে ত্রিগুণাতীত মহারাজ নানাস্থানে পর্যায়ক্রমে গীতা-উপনিষদাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ২২।১২।৯৫ তারিখ হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে তাঁহার তিব্বতভ্রমণ কাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই মধ্যে তিনি আবার যুবকদের

চরিত্রগঠনের জন্য কলকাতার তিনটি পাড়ায় তিনটি 'ব্রহ্মচর্য কেন্দ্র' স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতে থাকেন। তিনি তখন খুব পড়াশোনা করিতেন। অথচ অবকাশ বেশি ছিল না। তাই গুছাইবার সময়াভাবে তাঁহার শয্যার চারিপার্শ্বে বহু শাস্ত্রাদি গ্রন্থ স্তূপাকার হইয়া থাকিত।

কলকাতায় ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের বাড়িতে থাকার সময় স্বামী ত্রিগুণাতীতের ভগন্দর হয় এবং ক্লোরোফর্ম-সংযোগে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন দেখা যায়; কিন্তু তিনি সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারিবেন বলায় ডাক্তার উহাতেই স্বীকৃত হন। তদনুসারে তাঁহার দেহে প্রায় অর্ধঘণ্টা অস্ত্রচালনা করা হয় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ কাটা হয়; তথাপি তিনি কোন যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি প্রকটিত হইলে অখণ্ডানন্দজী মহুলায় সেবাকার্যে ব্রতী হন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেব ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি সভা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ঐ উপলক্ষ্যে মিশনের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজ মহুলায় প্রেরিত হন। মহুলা হইতেই তাঁহাকে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য দিনাজপুরের নিকটবর্তী বিরোল গ্রামে যাইতে হয়। সেখানে তিনি নিজে ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিতেন এবং গৃহে গৃহে যাইয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিতেন। সাফল্য ও সুনামের সহিত কার্যসমাপনান্তে তিনি কলকাতায় আসেন।

এদিকে স্বামীজী প্রথমবারে (১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে) স্বদেশে ফিরিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্র পরিচালন আবশ্যক। দৈনিক পত্র স্বামীজীর মনঃপূত হইলেও অর্থাভাবে পাক্ষিক পত্র-প্রকাশের প্রস্তাবই গৃহীত হইল। উহার নাম রাখা হইল 'উদ্বোধন'। স্বামীজী উহার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র আর এক সহস্র ধার দিলেন। অতঃপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ (১৮৯৯ খ্রিঃ, জানুয়ারি) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পরিচালনায় 'উদ্বোধনের' নিজস্ব ছাপাখানা'[১] হইতে ঐ পত্র বাহির হইল। এই কার্যে তাঁহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীজীর আদেশ ছিল যে, মূলধন ভাঙ্গা চলিবে না। এদিকে অর্থাভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা চলে না, নিজের আহারাদিরও সুব্যবস্থা অসম্ভব। পরিস্থিতি এইরূপ প্রতিকূল হইলেও অক্লান্তকর্মা ত্রিগুণাতীত মহারাজ কখনও ভক্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া, কখনও অনশনে থাকিয়া অথবা পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া একাই সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন। ছাপাখানায় দক্ষ কর্মচারী নাই; যাহারা আছে, তাহারাও নিয়মিত আসে

১ স্বামীজীর জীবদ্দশায়ই ছাপাখানাটি বিক্রয় হইয়া যায়।

না। ত্রিগুণাতীত মহারাজ অনেক সময় তাহাদিগকে গৃহ হইতে ছাপাখানায় টানিয়া আনিতেন, অথবা নিজেই ছাপার অক্ষরসন্নিবেশ ও অশুদ্ধিসংশোধন প্রভৃতি করিতেন। ক্লান্ত দেহ পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, এই ভয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তিনি কাজ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বাড়ি বাড়ি যাইয়া প্রবন্ধ জোগাড় করা, কাগজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া, নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করা—ইত্যাদি যাবতীয় কার্যে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। রোগের সময়েও তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। জ্বর-গায়ে সকালে উঠিয়াই হয়তো বাহিরে গেলেন। নানা প্রয়োজনে ইতস্তত ঘুরিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন হয়তো জ্বর এত বাড়িয়াছে যে, শয্যাগ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। অথচ পর দিবস আবার একই ভাবে কাজ চলিতে থাকিত।[১]

এত ব্যস্ততার মধ্যেও বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কাহারও অসুখ হইলে তিনি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অম্লানবদনে সেবা করিতেন। যোগানন্দজীর শেষ অসুখের সময় তিনি দিনে কম্বুলিয়াটোলায় 'উদ্বোধন' প্রেসের কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রে গুরুভ্রাতার সেবা করিতেন। ছাপাখানায় একজন কর্মচারীর হঠাৎ কলেরা হইলে তিনি তাহার চিকিৎসাদির সমস্ত ব্যবস্থা তো করিলেনই, অধিকন্তু স্বহস্তে সেবাভার গ্রহণপূর্বক তাহাকে নিরাময় করিলেন।

এদিকে তুরীয়ানন্দজী ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। তদনুসারে যাইবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন সময়ে স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন। তাই আকস্মিক বিপদে সকলে মুহ্যমান হইয়া পড়ায় তাঁহার বিদেশযাত্রা আপাতত স্থগিত রহিল। পরে ঐ বৎসর নভেম্বরের প্রারম্ভে মাদ্রাজ, কলম্বো ও জাপান হইয়া তিনি সানফ্রান্সিস্কো অভিমুখে চলিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, আমেরিকায় দেশী পোশাক ব্যবহার এবং নিরামিষ আহার করিবেন। এমন কি, সে দেশে শাকসব্জি পাওয়া যাইবে কি না ইহা জানা না থাকায় শুধু রুটি ও চিনি খাইয়াই থাকিবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হইলেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি জাহাজ সানফ্রান্সিস্কো শহরে পৌঁছিলে স্থানীয় বেদান্ত-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাকে সাদরে সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম. এইচ. লোগানের গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সি. এফ. পীটার্সন-দম্পতির গৃহ তাঁহার প্রধান কার্যকেন্দ্র হইল এবং সেখানে পুরাতন ও নূতন ছাত্রদিগকে লইয়া

---

১ স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন কাশীধামে তপস্যা করিতেছিলেন, পরে কর্তৃপক্ষের আহ্বানে কলকাতায় আসিয়া তিনি ত্রিগুণাতীত মহারাজের অধীনে ঐ কার্যে যোগদান করেন। তদবধি দীর্ঘকাল তিনি ঐ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং পরে সম্পাদনাদিরও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিয়মিতভাবে বেদান্তালোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে কার্য বর্ধিত হওয়ায় ৪০ স্টুনার স্ট্রিটের একটি ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে গীতা ও উপনিষদাদি-ব্যাখ্যার সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মসঙ্গীতেরও ব্যবস্থা হইল। তাঁহার সুনাম প্রচারিত হওয়ায় অচিরেই দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত (৪২৫ মাইল দূরবর্তী) লস এঞ্জেলেস নগর হইতে তাঁহার নিকট বেদান্তপ্রচারের আহ্বান আসিল। অতএব ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে সেখানেও তিনি বক্তৃতাদি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একা উভয় কার্য চালানো অসম্ভব জানিয়া ঐ বৎসরের শেষে স্বামী সচ্চিদানন্দকে বেলুড় মঠ হইতে আনাইয়া তাঁহার ওপর লস এঞ্জেলেসের কার্যের ভার দিলেন।

ঐ বৎসর সানফ্রান্সিস্কোর কাজ এত বৃদ্ধি পাইল যে, নিজস্ব ভূমিতে বেদান্ত-সমিতির গৃহাদি নির্মিত না হইলে আর চলে না। সেজন্য বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভূমিসংগ্রহান্তে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট তথায় হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য জগতে ইহাই প্রথম হিন্দু-মন্দির। কাজটা আজ যেরূপ সহজ সরল মনে হইতেছে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের সময় সেরূপ ছিল না। পাশ্চাত্যের প্রতিকূল বা উদাসীন মনোভাবের সম্মুখে এইরূপ একটা প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হওয়া তখন দুঃসাহস বা কল্পনাবিলাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অথচ ত্রিগুণাতীত মহারাজের অতুলনীয় উদ্যম ও উদ্দীপনায় আমেরিকার নরনারীই প্রচুর অর্থব্যয়ে বৈদেশিক ও অপরিচিত ভাবধারার স্থায়ী প্রতীকস্বরূপে গড়িয়া তুলিল এই হিন্দু-মন্দির, আর তাহারাই হইল ইহার পৃষ্ঠপোষক। স্বামী ত্রিগুণাতীতের কিন্তু ইহার উপর কোন দাবি-দাওয়া ছিল না। তিনি বলিতেন, "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর এই মন্দির-নির্মাণে আমার যদি এতটুকু স্বার্থ থাকে, তবে এ নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ হয়, তবেই টিকে থাকবে।" আর বলিতেন, "এটি ভোগ করতে আমি বেশি দিন থাকবো না; পরে যারা আসবে তারাই ভোগ করবে।" ত্রিগুণাতীত মহারাজ আজ নাই; কিন্তু আজও এই মন্দির মার্কিন দেশে সগৌরবে মস্তক তুলিয়া বেদান্তের সার্বভৌমিকতা ও প্রতিষ্ঠাতার গুরুভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি প্রায় তিন শত নরনারীর উপস্থিতিতে হিন্দুপ্রথানুযায়ী পূজা ও আরাত্রিকের পর মন্দিরটি মানব-কল্যাণার্থে উৎসর্গীকৃত হয় এবং ১৫ জানুয়ারি সর্বপ্রথম উপাসনা আরম্ভ হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতের ইচ্ছা ছিল যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে আমেরিকায় লইয়া যাইবেন, কিন্তু নানা কারণে মহারাজের যাওয়া হয় নাই।

মন্দির-নির্মাণের পর বেদান্ত-সমিতি নিঃস্ব হইয়া গেল। তদুপরি ১৯০৮ খ্রিঃ মে মাসে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নগরবাসী, বন্ধুবান্ধব ও সমিতির সভ্যগণ বিশেষ

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমিতির আয় হ্রাস পাইল। ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাতেও দমিলেন না। এমন কি, অভেদানন্দজী সংবাদ পাইয়া নিউইয়র্ক হইতে যখন সাহায্যের প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন: "আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে জানাইব। ...আমরা আমাদের সকল খরচ কমাইয়া দিয়াছি এবং এখানকার রিলিফ কমিটির (সাহায্য-সমিতি) নিকট হইতে প্রচুর খাদ্য পাইতেছি।" বস্তুত আত্মনির্ভরশীল ত্রিগুণাতীত ঐ দুরবস্থার মধ্যেও সমিতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং উহার উন্নতিসাধন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, ঐ বৎসর আগস্ট মাসে প্রকাশানন্দজী সানফ্রান্সিস্কো উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে থাকিলে কার্যের সর্বাঙ্গীণ প্রসারই হইতে লাগিল।

ইহার পর তাঁহার লক্ষ্য হইল, মন্দিরের সংলগ্ন বাসকক্ষগুলিকে অবলম্বন করিয়া আশ্রম-জীবন গড়িয়া তোলা এবং তাহাতে পাশ্চাত্যবাসীকে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। ক্লাস ও বক্তৃতাদিতে যে সকল ছাত্র আসিত তাহাদেরই প্রায় দশজনকে লইয়া আশ্রমের সূত্রপাত হইল। এই সংখ্যা মধ্যে মধ্যে বর্ধিত হইলেও গড়ে দশজনই আশ্রমে থাকিত। সুশৃঙ্খলাপ্রিয় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাদের জীবন হিন্দুভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নপর ছিলেন। ছাত্রেরা পূর্বেরই ন্যায় জীবিকা অর্জন করিত এবং আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের জন্য যথাশক্তি অর্থসাহায্য করিত। তদুপরি আশ্রমের যাবতীয় কার্য তাহারাই সম্পন্ন করিত। প্রত্যূষে চারিটায় উঠিয়া তাহারা ধ্যানে বসিত; তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করা, ফুলবাগানে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত হইত। এই সমস্ত কার্য যাহাতে তাহারা একটা উচ্চভাবের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং ঐ সকল করিয়া যাহাতে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎপ্রতি ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আহারের সময় তিনি তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মচারীরাও বিভোর হইয়া শুনিত। কখনও বা ধুনি জ্বালাইয়া মুক্তাকাশের নিম্নে গভীর ধ্যান চলিত। আবার সপ্তাহে একদিন উপবাস ও নির্জনে সাধনেরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক ছিল না। ঐ সময়ে অনেকের বিবিধ অনুভূতি হইত। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও যত্নবহুল ঈদৃশ জীবন কঠোর হইলেও ছাত্রগণ ইহা স্বেচ্ছায় বরণ করিত। এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শ্রীমুখ হইতে বহু মূল্যবান বাণী নির্গত হইয়া তাহাদিগকে সাধনপথে শক্তিপ্রদান করিত। তিনি বলিতেন, "Live like a hermit, but work like a horse" (সাধুর মতো জীবন যাপন কর, কিন্তু ঘোড়ার মতো খাট); "Do or die, but you will not die" (মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন, কিন্তু শরীর যাবে না নিশ্চয়); "Do it now" (এখনই এটা কর); "Watch and pray"

(সদা সাবধান থেকে প্রার্থনা কর)—এইসব কথা লিখিয়া তিনি ব্রহ্মচারীদের গৃহের প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং মনে করিতেন যে, উহা সাধনার এক উত্তম সহায়। অতি প্রত্যূষে তিনি ব্রহ্মচারীদের লইয়া নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গান ও স্তোত্রাদিতে সময় কাটাইতেন। কখনও কখনও ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরতীরে উপস্থিত হইতেন এবং অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহাদের মিলিতকণ্ঠ হইতে উত্থিত সঙ্গীতলহরী সমুদ্র-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রসারিত হইত। তখন হয়তো কোন ধীবর মৎস্য ধরিতে মাত্র যাত্রা করিয়াছে, হয়তো কোন অর্ণবপোত ঐ পথে গমনে উদ্যত হইয়াছে। প্রাতঃসমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতশ্রবণে ধীবর ও নাবিকেরা ক্ষণেকের জন্য এক অলৌকিক রাজ্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রবণ করিত আর মৌনবিস্ময়ে আশীর্বাদ করিত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত শুধু কথায় নহে, নিজের জীবন দিয়া দেখাইতেন, সাধুর চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। তিনি সকলের সঙ্গে বিবিধ কার্য করিতেন এবং ব্রহ্মচারীদের জন্য স্বহস্তে রান্না করিতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সাধুর স্পর্শে অন্নের মধ্য দিয়া অপরের হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চারিত হয়। সমস্ত দিন এইভাবে পরিশ্রমের পর তিনি সকলের শেষে অফিসের মেঝেতে সামান্য বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু সকালবেলা ছাত্রেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিত যে, তাহাদের শয্যাত্যাগের বহু পূর্বে তিনি উঠিয়া নিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা একদিনের কথা নয়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিয়াছিল। কিভাবে এই নবাগত ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়, কিভাবে তাহাদের ভিতর প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়—এই সব চিন্তাই যেন তাঁহাকে একেবারে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের বলিতেন, "তোমাদের টেনে হিঁচড়ে সেই অমৃতসাগরের তীরে নিয়ে যেতে এবং তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই—তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু তাতে যদি তোমাদের হাড়গুলি এক একটি করে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তবুও আমি এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না।" কিন্তু কার্যত তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। পাছে এরূপ উচ্চ ভূমিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে অবসাদ উপস্থিত হয়, সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে বিবিধ চিত্তবিনোদনেরও আয়োজন করিতেন এবং স্বয়ং উহাতে যোগদান করিয়া ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ের গুরুভার দূর করিতেন। তাঁহার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ও রঙ্গপ্রিয়তা মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিত। একদা তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইবে। উৎসুক জনতা সে রহস্য ভেদ

করিতে সমবেত হইয়া দেখিল যে, যথাকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণকীর্তন করিয়া তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। তাঁহার তদানীন্তন জীবন সর্বদাই এই প্রকার ভাবসংক্রমণে ব্যাপৃত থাকিত। সন্দেহাকুল মন লইয়া যাহারা আসিত, অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিদ্বারা তাহাদের সন্দেহের নিরসন না হইলেও তাঁহার ঐকান্তিকতায় তাহারা অভিভূত হইত; তাহারা অবাক হইয়া দেখিত যে, এই একটি জীবন সর্বতোভাবে ভগবান-লাভের জন্য এবং অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই উৎসর্গীকৃত। অধিকারিভেদে তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, সে নির্জনে সাধুজীবন যাপন করিতে চায়। ব্যবস্থা হইল, ঐ ব্যক্তিকে কয়েক মাস আশ্রমের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে অবস্থানপূর্বক নির্জন বাসের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। তাহাকে হয়তো একই ঘরে অপর অনেকের সহিত থাকিতে হইল। সে ভাবিল, এ আবার কিরূপ বিধান? শুধু তাহাই নহে, দিনে দুইবার উত্তম স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের ব্যবস্থা হইল। ফলত তাদৃশ জীবনে কঠোরতার কিছু নাই দেখিয়া যখন সে বিফলমনোরথ হইতে বসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ তাহার চিত্তে অনুভূতি জাগিল যে, সাধকজীবনের কঠিনতম সাধনা হইতেছে দশের সংসর্গে দশবিধ সংঘর্ষে আসিয়াও আপন অহমিকাকে সংযত রাখা। অপর কেহ হয়তো এতটা সহ্য করিতে না পারিয়া অভিযোগ জানাইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিতেন, "তুমি না সংযম শিখতে চেয়েছিলে?" উত্তর আসিত, "ঠিক বটে; কিন্তু এতটা নয়।" তারপর সে হয়তো মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত যাহারা টিকিয়াছিল, তাহারাই মাত্র জীবনে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে ঐ দিনগুলির স্মৃতি সানন্দে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল।

ভোগমগ্ন পাশ্চাত্যে এইরূপ উচ্চ আদর্শ কয়জন বুঝিতে বা ধরিয়া থাকিতে পারে? সুতরাং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে নানা কারণে ব্রহ্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অবশেষে অতি অল্পমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ঐ বিভাগের কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। নারীদের জন্যও তিনি একটি মহিলাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ আশ্রমেও পুরুষদের ন্যায় নারীরা সাধনায় রত থাকিতেন। কিছুদিন পরে উহাও উঠিয়া যায়।

উল্লিখিত ছাত্রগণের মধ্যে একজন পূর্বে ছাপাখানায় কাজ করিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; ছোট প্রেস কিনিয়া ঐ ছাত্রের সাহায্যে রবিবারের বক্তৃতাদি ও বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে 'ভয়েস অব্ ফ্রিডম' (মুক্তির বাণী) নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই পত্র বাহির হইতে থাকে।

ইহাতে বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নানাবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি থাকিত। 'কথামৃতের' অনুবাদও তখন ঐ কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। তিন বৎসরের মধ্যেই কাগজখানি চারিদিকে খুব প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সান আন্টোন্ উপত্যকায় যে 'শান্তি-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীত উহাকেও ভুলেন নাই। সানফ্রান্সিস্কো আগমনের অল্পকাল পরেই তিনি কয়েকজন ছাত্রকে লইয়া সেখানে গমন করেন এবং নানাবিধ উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি প্রতি বৎসর সেখানে যাইয়া কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার একজন শিষ্য সূত্রধরের কাজ জানিত। সে তাঁহার আদেশে শান্তি-আশ্রমে বাস করিতে থাকে এবং দুই-একটি নূতন বাটিনির্মাণের দ্বারা ও অন্যান্য ভাবে আশ্রমের উন্নতিসাধন করে। স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত যাঁহাদের শান্তি-আশ্রমে বাস করার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারা উচ্চাঙ্গের সাধনার আস্বাদ পাইয়া এবং বিবিধ অনুভূতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শান্তি-আশ্রমের দিনগুলি ছিল একটানা একনিষ্ঠ সাধনায় পরিপূর্ণ। তিনি সর্বতোভাবে তুরীয়ানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

হিন্দু-মন্দিরেই হউক, কিংবা শান্তি-আশ্রমেই হউক, স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রতিকার্য ভগবদ্ভাবে ভাবিত ছিল—তিনি যাহা কিছু করিতেন সমস্তই ঠাকুরের জন্য। তিনি তাঁহার কয়েকটি শিষ্যকে প্রচারকরূপে গড়িবার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কার্যপ্রণালীরও কতক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ধারণা ছিল এই যে, প্রত্যেকটি বক্তৃতা বা পাঠ হইবে বেদান্তকে জীবনে পরিণত করার অবলম্বনমাত্র; ঐ বক্তৃতাদির সাহায্যে প্রচারক স্বীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সেবা করিবেন; তাঁহার নিজের মনে কোনরূপ অহমিকা স্থান পাইবে না। প্রচারককে ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহারই দানস্বরূপে তাঁহারই নিকট হইতে প্রতিদিনের বক্তব্য শিখিয়া লইতে হইবে। ইহার উপায় হইতেছে প্রার্থনা ও শরণাগতি। পুস্তকাদির স্থান এবংবিধ প্রস্তুতির পক্ষে অতি নিম্নে। অকপট হৃদয়ে বৃত্তিশূন্য হইয়া এবং সাফল্য ও বৈফল্যে উদ্বেগ বিদূরিত করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তবেই চিত্তে যথার্থ তত্ত্বালোক উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ণ অর্ধঘণ্টা এইভাবে ধ্যানের পর লব্ধ তথ্যগুলিকে শ্রীভগবানেরই পাদপদ্মে অর্পণান্তে তাঁহারই আশীর্বাদস্বরূপে আবার তাঁহারই নিকট উহা চাহিয়া লইতে হইবে। বিষয় নির্ধারণের জন্য এই পথই অবলম্বনীয় এবং নির্ধারিত বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্যও ইহাই অনুসরণীয়। সর্বশেষে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া মনে করিতে হইবে যে, ভগবানকেই শোনানো

হইতেছে। ইহাই হইল স্বামীজীর প্রদর্শিত 'কার্যে পরিণত বেদান্তে'র এই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রায়ই বলিতেন, "বিক্ষিপ্ত মন কখনও লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে না।" "চারিদিকে ভগবানকেই দেখতে সচেষ্ট থাক; সর্ব বস্তু ঈশ্বরীয় রসে অনুলিপ্ত দেখ, তাহলেই তোমার মন শুধু তাঁরই চিন্তা করবে।"

১৯০৭ অব্দের মধ্যেই তিনি সানফ্রান্সিস্কোর বিদ্বৎসমাজে কিরূপ সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এক বিশিষ্ট ঘটনায় প্রমাণিত হয়। ঐ বৎসর ১১ এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক থিয়েটারে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' অভিনীত হয়। থিয়েটারে দশ সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গ্রীসীয় প্রথানুসারে পাহাড়ের সানুদেশে মুক্ত আকাশতলে মঞ্চের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে প্রস্তরনির্মিত আসনগুলি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বেঞ্জামিন আইডি হুইলার দক্ষিণ দিক দিয়া এবং ত্রিগুণাতীতানন্দ ও প্রকাশানন্দ বাম দিক দিয়া স্টেজে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রির প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। এই থিয়েটারে প্রথমবারে অতিথি ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত থিয়োডোর রুজভেল্ট। প্রধান অতিথি প্রবেশ করিলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

এইরূপে পাশ্চাত্যের আদরে এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রাণপণ উদ্যমে কার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকিলেও কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং উহা নানা ব্যাধির আকর হইয়াছিল। শেষ পাঁচ বৎসর বাত প্রভৃতি কোন না কোন অসুখ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু অসুখ হইলেও কর্মের বিরাম ছিল না। অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায়ও তিনি ছাত্রদের সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাঁহাকে রুগ্ণদেহেও কার্য করিতে দেখিয়া জনৈক ছাত্র ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "অত্যধিক দৈহিক যন্ত্রণার সময় ভাবি, 'এই শরীর যাক, সব শেষ হয়ে যাক!' কিন্তু শেষ তো হলো না! যখনি মনে পড়ে যে মায়ের কাজ করতে হবে, তখনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে শরীরটাকে ধরে রাখি। এ শরীরটা যেন একটা খোলসের মতো হয়ে গেছে—যে কোন সময়ে এটা খসে পড়তে পারে। গত তিন বৎসর যাবৎ শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে একে ধরে রেখেছি। যেই ছেড়ে দেব, অমনি এটা আপনা-আপনি পড়ে যাবে।"

এই বৎসর বড়দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু-মন্দিরে সঙ্গীত, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই, কারণ খ্রিস্টীয় সমাজে ইহাই প্রধানতম পর্ব। এই

সময়ে তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না; তথাপি প্রত্যেক কার্যে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এদিকে বিধির বিধানে দিন ফুরাইয়া আসিল। বড়দিনের পরবর্তী রবিবার (২৭ ডিসেম্বর, ১৯১৪) যথারীতি ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিকালের বক্তৃতার সময় সকলেই উপস্থিত। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভাবরা নামক এক ব্যক্তি একটি সাংঘাতিক বোমা তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বে ফেলিয়া দিল। বোমা তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া আততায়ী ভাবরাকে প্রথমেই নিহত করল। স্বামী ত্রিগুণাতীতও গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। ভাবরা একান্ত অপরিচিত ছিল না। পূর্বে সে হিন্দু-মন্দিরে যাতায়াত করিত, কিন্তু পরে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। অতঃপর কিয়দ্দিবস স্বামী ত্রিগুণাতীতের সান্নিধ্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ইতোমধ্যে রোগের পুনরাক্রমণবশত হঠাৎ হিন্দু-মন্দিরে আসিয়া উন্মত্তাবস্থায় এই অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। ত্রিগুণাতীতজীকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার সময় তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়, কোথায় সে? আহা নির্বোধ বেচারা!" শেষ সময়েও এই নির্বোধ নরঘাতীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সে যে উন্মাদ! তাহার কি দোষ! হাসপাতালে তাঁহার অশেষ যন্ত্রণার উপশমকল্পে মর্ফিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহার ক্রিয়া কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি কিছু কিছু কথা বলিতেন। এইরূপে ২৯ ডিসেম্বর যখন তাঁহাকে ভাবরার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখনও তিনি জানাইলেন যে, তাহার সহিত কোন মনোমালিন্য ছিল না এবং বোমা-বিস্ফোরণের কোন কারণও তিনি অবগত নহেন।

তিনি প্রায় পনেরো দিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রতিমুহূর্তেই অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোন দিন এতটুকু কষ্টের কথা কাহাকেও বলেন নাই। বরং এই সময় তাঁহার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিবে, কিভাবে তাহারা পরার্থে সব উৎসর্গ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে—ইত্যাদি বহু উপদেশদানে তিনি তাহাদের সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। ৯ জানুয়ারি বিকালে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত যুবক শিষ্যটিকে নিকটে ডাকিয়া নানাবিধ আলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পরদিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দিনে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। সত্যসত্যই পরদিন (১৯১৫ খ্রিঃ, ১০ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি শ্রীগুরুপদে মিলিত হন। তাঁহার ছাত্রেরা এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে শেষদর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। অবশেষে উপাসনাদি কার্য যথারীতি সমাপ্ত হইলে বহু লোক সমবেত হইয়া সেই পূত দেহের সৎকার করিলেন। কিছুদিন পর একদল ভক্ত ও ছাত্রেরা স্বামী ত্রিগুণাতীতের সুপবিত্র ভস্মাবশেষ লইয়া শান্তি-আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় 'সিদ্ধগিরি'তে উহা প্রোথিত করিলেন।

# স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বনাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় টোলে অধ্যয়ন করিয়া 'তর্করত্ন' উপাধিলাভ করেন এবং কুলাচার্যের কাজ করিতেন বলিয়া 'ঘটক ঠাকুর' নামে পরিচিত হন। এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল যশোহরের নড়াইল মহকুমার ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে, কিন্তু গঙ্গাধরের জন্মের প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইঁহারা কলকাতা-প্রবাসী হন। তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। গঙ্গাধরের জন্মকালে তিনি আহিরীটোলা পল্লিতে মাণিক বসুর ঘাট স্ট্রিটে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেন। এখানে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ আশ্বিন (১৮৬৪ খ্রিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর), অমাবস্যা তিথিতে (মহালয়ায়) শুক্রবার ভাবী সন্ন্যাসী অখণ্ডানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিষ্ঠাবান পরিবারে জাত বালক গঙ্গাধর বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনাদিতে রত হইলেন এবং উপনয়নের পরে স্বপাকভোজন, গীতা-উপনিষদ্-পাঠ এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি বাল্যবন্ধু হরিনাথের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) সহিত বাগবাজারের দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে রামকৃষ্ণের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন। ইহার পর ১৮৮৩ কিংবা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের প্রকৃত দর্শন লাভ করেন। এই কয় বৎসর গঙ্গাধরের ধর্মভাব আরও গভীর এবং দৃঢ়মূল হইয়াছে। তিনি তখন ব্রহ্মচর্যের সমস্ত নিয়ম পালন করেন, তিনবার গঙ্গাস্নান করেন, স্বহস্তে রন্ধন-পূর্বক একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন, মস্তকে তৈলমর্দন করেন না, আর প্রাণায়াম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গে স্বেদ ও পুলক হয়—এমন কি, গঙ্গায় ডুব দিয়া তিনি অনেকক্ষণ কুম্ভক করেন। এতদ্ব্যতীত হরিনাথের নিকট হরীতকীর প্রশংসাসূচক দুইটি শ্লোক[১] শুনিয়া ঐ বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করিতেন যে, ওষ্ঠদ্বয় সর্বদা সাদা দেখাইত।

---

১ হরীতকীং ভুংক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।।
হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজলম্।
অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেদ্ ভক্ষেজ্জপেৎ পিবেৎ।।

—হে রাজন, হরীতকী ভক্ষণ কর; উহা মাতার ন্যায় উপকারী। মাতা বরং কখনও ক্রুদ্ধা হন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কদাপি অনিষ্ট করে না। অন্তরের মলিনতা দূর করিবার জন্য শ্রীহরির স্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাজল পান করিবে।

ব্রহ্মচারী গঙ্গাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের সন্নিকটে গেলেন, ঠাকুর সেদিন সস্মিতবদনে তাঁহাকে বড়ই যত্নপূর্বক নিজ সমীপে বসাইলেন এবং প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?" উত্তরে গঙ্গাধর বলিলেন, "হাঁ, একেবারে খুব ছেলেবেলায় আপনাকে একবার দীনু বোসের বাড়িতে দেখেছিলাম।" বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে অদূরবর্তী গোপাল-দাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, শোন শোন, এ বলছে কিনা আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উঃ, এর আবার ছেলেবেলায়।" ঠাকুরের নির্দেশে গঙ্গাধর সেদিন সন্ধ্যায় ৺কালীমন্দির ও ৺বিষ্ণুমন্দিরে প্রণামান্তে পঞ্চবটীতে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিলেন এবং তাঁহার আগ্রহে সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইলেন। পরদিন গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার আসিস শনিবারে।" গঙ্গাধর পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যাকে ভালবাসতেন, তাকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলতেন, শনি-মঙ্গলবারে ধ্যানজপ অধিক করতে বলতেন। বলতেন—শনিবার মধুবার।"

অল্প কয়েক দিন পরেই গঙ্গাধর এক শনিবারে ঠাকুরের নিকট দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গাধরকে একখানি মাদুর দিয়া উহা পশ্চিমের বারান্দায় পাতিতে বলিলেন। পরে একটা বালিশ আনিয়া উহাতে শুইলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গাধরকে সুখাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। আসনের উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, "একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার এমনি (টান) হয়েও বসতে নেই।" তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "বাড়া ভাত পেলে তুই যেমন করেই খা, পেট ভরবে।" অবশেষে গঙ্গাধরের জিহ্বায় কি যেন একটা লিখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শয়ন করিয়া গঙ্গাধরের ক্রোড়ে শ্রীচরণ স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে পদসেবা করিতে আদেশ দিলেন। গঙ্গাধর তখন একটু একটু কুস্তি লড়েন; সুতরাং এমন জোরে চাপ দিলেন যে, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, করিস কি? করিস কি? ছিঁড়ে যাবে যে! এমনি করে, আস্তে আস্তে।" গঙ্গাধরের তখন হুঁশ হইল যে, ঠাকুরের শরীর অতি কোমল, যেন হাড়ের উপর মাখন মাখানো রহিয়াছে।

গঙ্গাধর অতঃপর প্রায়ই অপরাহ্ণে আসিয়া সকালে চলিয়া যাইতেন। তিনি তখন মালসা পোড়াইয়া হবিষ্যি করেন—বহু সাধাসাধিতে ব্রাহ্মণের বাটিতে পর্যন্ত বিষ্ণুর প্রসাদও কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারে না। দ্বিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে পাছে ঠাকুরের আদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এইজন্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকুমার সেরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াইয়া চলেন। তীক্ষ্নদৃষ্টি ঠাকুর কিন্তু সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই কঠোরতার আধিক্য কমাইবার জন্য কোন দিন বলিতেন, "তুই ছেলেমানুষ, তোর অত বুড়োটেপনাভাব কেন?" কোনদিন বা প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হইতে

পারে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে বলিতেন। ইতোমধ্যে গঙ্গাধর গ্রীষ্মকালের কোন এক একাদশীর দিনে কোঁচার খুঁট গলায় ফেলিয়া ও একটা তরমুজ লইয়া ঠিক দ্বিপ্রহরের পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একে বালক, তাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্রে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তরমুজটি সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেই তিনি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আজ তুই আবার এখনি যাবি নাকি?" গঙ্গাধর বলিলেন, "আজ্ঞে না।" সেরাত্রি দক্ষিণেশ্বরে কাটিল। সকালে উঠিয়া ঠাকুর তাঁহাকে এক গাড়ু জল লইয়া তাঁহার সঙ্গে পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে বলিলেন এবং পঞ্চবটীর পূর্বদিকে পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধরকে সোজা করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু বেঁকে যাস।" তারপর উভয়ে শয়নগৃহে ফিরিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। স্নানের পর ঠাকুর মা-কালীর স্মরণান্তে বিষ্ণুঘর ও কালীঘর হইতে প্রেরিত প্রসাদাদি ধারণ করিলেন এবং বেলপানা ও অন্যান্য ফল মিষ্টি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধরকে খাইতে দিলেন। গঙ্গাধরও আপত্তি না করিয়া সবই গ্রহণ করিলেন। ভোগারতির পরে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "যা, গঙ্গাজলে পাক, মা-কালীর প্রসাদ, মহা হবিষ্যি—যা, খেগে যা।" দ্বিরুক্তি না করিয়া গঙ্গাধর সেদিকে অগ্রসর হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর বিষ্ণুঘরে যাইতে না বলিয়া কালীঘরে যাইতে বলিলেন কেন? সেখানে তো মাছ রান্না হয়। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর সেখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতেছেন। অগত্যা সেদিন তিনি ৺কালীর প্রসাদই গ্রহণ করিলেন—অবশ্য সবই নিরামিষ। আহারান্তে ফিরিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার হাতে পানের খিলি দিয়া বলিলেন, "খা, খাওয়ার পর দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়। দ্যাখ, নরেন একশটা পান খায়, যা পায় তাই খায়। এত বড় বড় চোখ—ভেতর দিকে টান। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায় আর বাড়ি, ঘরদোর, ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস।" কলকাতায় ফিরিয়াই গঙ্গাধর নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুনর্বার যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন সোৎসাহে তাঁহাকে সব জানাইলেন। ঠাকুরও শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "খুব যাবি, খুব তার সঙ্গ করবি।"

গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করেন, অথবা শ্রীমুখের কথামৃত উৎকর্ণ হইয়া পান করেন। কোনদিন ঠাকুর "বৃন্দাবন-বিহারিণী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাই-এর" ইত্যাদি দীর্ঘকাল গাহিয়া নয়নজলে ভাসেন, কোনদিন "এস মা, এস মা, ও হৃদয়-রমা" ইত্যাদি সঙ্গীত শুনিয়া সমাধিমগ্ন হন। কোনদিন গঙ্গাধর দেখেন, ঠাকুর কাহারও সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন আছেন; কোনদিন বা শোনেন, তিনি কিরূপে সরযূতীর-বিহারী রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইয়াছিলেন।

এইরূপ গৌণ শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের সুযোগও যথেষ্ট ঘটিত। গঙ্গাধরকে একদিন শৌচার্থে গঙ্গায় যাইতে দেখিয়া ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি! যা হাঁসপুকুরে যা।" ঠাকুর তাঁহার বুড়োপনার নিন্দা করেন দেখিয়া একসময়ে গঙ্গাধরের ভুল ধারণা হইল যে, ঠাকুরের মতে ঐসব আচার সর্বদা বর্জনীয়। এমন সময় একদিন জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন অনুযোগ করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকগণের সংসারবিমুখ হওয়া অনুচিত, তখন ঠাকুর বলিলেন, "হবিষ্যি করা, তেল না মাখা, নিরামিষ খাওয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি পূর্বজন্মের সৎকর্মের ফলে হয়" এবং গঙ্গাধরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ঐ যে ছেলেটি একটু বড় হতে না হতে সব ত্যাগ করতে চায়, তার সত্ত্বগুণ বেশি। সত্ত্বগুণের যখন উদয় হয়, তখনই এই সব হয়।" গঙ্গাধর সেদিন বুঝিয়া লইলেন যে, সংযম নিন্দনীয় নহে, পরন্তু আচারের মাত্রাধিক্যই অন্যায়!

একদিন গঙ্গাধর ধ্যানান্তে ফিরিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে তোর চোখে জল এসেছিল?" গঙ্গাধর যখন উত্তর দিলেন, "এসেছিল," তখন ঠাকুর খুশি হইয়া বলিলেন "প্রার্থনা কি করে করতে হয় জানিস?" এবং ছোট ছেলের মতো হাত-পা ছুড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে ও বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি কিছুই চাইনে, মা। আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে পারি না, মা!" যেন একটি ছোট ছেলে কাঁদিতেছে। ঠাকুর গঙ্গাধরকে আরও শিখাইয়া দিলেন "অনুতাপাশ্রু চোখের কোণ (নাকের দিক) দিয়ে আসে আর প্রেমাশ্রু চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।"

আর একদিন ঠাকুরের নিকট তিনি শিখিলেন কাঞ্চনে আসক্তিত্যাগ। সেদিন একটি লোক আসিয়া পয়সা চাহিলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে কোণের দিকে তাকের উপরে যে চারিটি পয়সা ছিল, উহা লোকটিকে দিতে বলিলেন। পয়সা দিয়া ফিরিলে তিনি গঙ্গাধরকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিলেন এবং মা-কালীর পটের সম্মুখে লইয়া গিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলাইতে ও অনেকবার হাত ঝাড়াইতে লাগিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে গঙ্গাস্নানে গিয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন যে, ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ কালীবাড়ির খাজাঞ্চীর সহিত বৈষয়িক আলোচনা করিতেছেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরে আসিয়া হরিশের খোঁজ লইলে ঠাকুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া গঙ্গাতীরে বিষয়চিন্তার জন্য তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ব্রাহ্মণের চৈতন্য না হইয়া বিরক্তিরই উদয় হইল এবং তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বিদায় লইলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে বিষয়ীর স্পর্শযুক্ত ঐস্থান গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন।

তারপর স্বধর্মনিষ্ঠা। বিখ্যাত থিয়োসফিষ্ট কর্ণেল অলকট কলকাতায় আসিলে উক্ত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদিন ঠাকুরকে সগর্বে জানাইলেন যে, সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর কিন্তু ইহাতে খুশি না হইয়া উপস্থিত গঙ্গাধর ও অপর সকলকে অবাক করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "তার নিজের ধর্ম সে ছাড়লে কেন?"

একবার আহারের পর ঠাকুর ছোট চৌকিখানিতে শয়নান্তে গঙ্গাধরকে পদসেবা করিতে বলিলেন, সেই সুযোগে গঙ্গাধর শ্রীগুরুর শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা নিজ কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে জানিতে চাহিলেন, "কি হচ্ছে রে?" গঙ্গাধর উত্তর দিলেন, "আপনি যে বলেন, যারা সাত্ত্বিক, তারা গঙ্গাস্নান করতে করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়; আমি আজ সেই সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।" ঠাকুর তো শুনিয়া হাসিয়া আকুল।

গঙ্গাধর তখন কলকাতায় সাধুদর্শনে ঘুরিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরুৎসাহ না করিয়া প্রত্যেকের ভাল দিকটার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে কর্তাভজাসম্প্রদায়ের দিগম্বর বাউল, থিয়োসফিস্ট কর্ণেল অলকট ইত্যাদি অনেকের সহিত গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়।

একবার ঠাকুর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই দ্যাখ চৈতন্যময় শিব"। গঙ্গাধরের অমনি অনুভূতি হইল, যেন চৈতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। মৃন্ময়ে সেদিন তিনি চিন্ময়ের দর্শন পাইলেন।

গঙ্গাধরের সময় কাটাইবার এক উপায় ছিল বাল্যবন্ধু হরিনাথের সহিত অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্মপ্রসঙ্গ করা। তখন তাঁহারা মাঝে মাঝে গঙ্গাতীরে ধ্যানরত নাগমহাশয়ের অবিকম্প মূর্তি সোল্লাসে দর্শন করিতেন। কোন কোন রাত্রে গঙ্গাধর বাগবাজার খালের পোর্ট কমিশনারদের তোলা-সেতুর পশ্চিম দিককার গোল স্তম্ভের খাটালে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার ঐরূপ ধ্যানকালে পাহারাওয়ালার মুখে একটি প্রেমা-ভক্তির গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং উহা লিখিয়া লইয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলে তিনিও গানটির প্রশংসা করেন।

গঙ্গাধরের জীবনের পরবর্তী অংশে আমরা তাঁহাকে পাই পরিব্রাজকরূপে; সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানে তখন তিনি হিমালয়, তিব্বত, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠার পরে "গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন; নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না ('কথামৃত', ৩ ভাগ, পরিশিষ্ট; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১৩১)।" অবশেষে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭) বৈদ্যনাথের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠিলেন। পরন্তু

বুদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈদ্যনাথে না নামিয়া বাঁকিপুর হইয়া বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি পদব্রজে রাজগৃহে যান এবং সেইভাবে বুদ্ধগয়ায় ফিরিয়া আসেন। এই পথে পায়ে চলিয়া আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হওয়ায় অতঃপর প্রায়শ তিনি পদব্রজেই তীর্থভ্রমণ করেন। এইরূপে সহায়হীন, গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর ভারতের বহুতীর্থ ভ্রমণান্তে হৃষিকেশে পৌঁছিয়া উত্তরাখণ্ডের মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, আর তাঁহার মনে হইল, "উত্তরাখণ্ডের প্রারম্ভেই যদি এইরূপ, তবে না জানি অন্তে কি আছে!" হৃষিকেশে পর্ণকুটিরে (ঝাড়িতে) ৫ এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থানপূর্বক তিনি হিমালয়ের আকর্ষণে দেরাদুন ও রাজপুর হইয়া রিক্তহস্তে মুশুরী পাহাড়ে আরোহণপূর্বক দাক্ষিণাত্যের জনৈক লিঙ্গায়েৎ জঙ্গম সাধুর মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া সাধুর স্নেহের উদ্রেক হইল এবং তিনি তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডের পথকষ্টের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তথাপি নিরস্ত না হইলে সাধু তাঁহার নিকট একটি কম্বলের আলখাল্লা ও একখানি লুই ব্যতীত আর কিছুই নাই দেখিয়া অর্থ ও কম্বলাদি দিতে চাহিলেন; কিন্তু ত্যাগী গঙ্গাধর শুধু একগাছি লাঠি চাহিয়া লইয়া ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী টিহিরীর পথ ধরিলেন। এই পথে নূতন জুতা ব্যবহারের ফলে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়ে এবং ঐজন্য তাঁহাকে কিছুদিন টিহিরীতে অপেক্ষা করিতে হয়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে তিনি প্রায় এক বৎসর পাদুকা ব্যবহার করেন নাই।

টিহিরী হইতে যমুনোত্রী পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সহিত চলিয়া অতঃপর যমুনোত্রীদর্শনান্তে উত্তরকাশীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে তখন তিব্বতভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। কিন্তু আপাতত তিনি গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন। পথে ভাটোয়ারী গ্রামের নিকটে পথিপার্শ্বে এক মুমূর্ষু সাধুকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে বহু আয়াসে ধর্মশালায় লইয়া আসিলেন। সাধু পরদিনই দেহত্যাগ করিলেন। তখন গঙ্গাধর মহারাজকেই অগ্রণী হইয়া সাধুর দেহের সলিল-সমাধির ব্যবস্থা করিতে হইল। গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করার উদ্দেশ্যে তিনি যে গুহায় আশ্রয় লইলেন, উহারই সম্মুখে একটি বৃহৎ গুহায় একজন ব্রাহ্মণ তিন দিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। অতএব স্বভাবত সেবাপরায়ণ গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ এক সপ্তাহ পরে তাঁহারই সহিত তীর্থপর্যটনে চলিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ নিঃসঙ্গ ভ্রমণেরই পক্ষপাতী। সুতরাং ধরারী গ্রাম পর্যন্ত একসঙ্গে চলিয়া তিনি একাকী ৺চন্দ্রবদনীর পীঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। টিহিরী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী এক বনাকীর্ণ উচ্চ পর্বতশিখরে এই মন্দির। এখানে দাক্ষায়ণী সতীর হৃদয় পতিত হইয়াছিল। উত্তরকাশী ও টিহিরী হইয়া এক সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপনীত গঙ্গাধর মহারাজ জানিলেন যে,

সেই নির্জন দুর্গম স্থানে ভিক্ষার ব্যবস্থা নাই; সুতরাং তপস্যাদির জন্য সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব। উপায়ান্তর না দেখিয়া দুই দিন মন্দির-চত্বরে থাকিয়া তিনি অন্যত্র যাত্রা করিলেন। অবতরণপথ বলিতে কিছুই নাই—যাহা আছে তাহাও বনাচ্ছাদিত। অতএব শীঘ্রই তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছ নামিতে লাগিলেন। ক্রমে উতরাই এমনই বিষম হইয়া উঠিল যে, হামাগুড়ি দিয়া কিংবা বৃক্ষলতাদি ধরিয়া অকস্মাৎ এক শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। সেখানে এক পাহাড়ি চাষি তাঁহাকে দেখিয়া অবাক—সাধু আসিল কোথা হইতে? আর বলিয়া উঠিল, "ধন্য মাই চন্দ্রবদনী! তিনি তোমায় বাঁচিয়েছেন—এ পথে শিকারীরাও চলে না।"

ইহার পরে শ্রীনগরে যাইয়া তিনি ৺কমলেশ্বর-মঠে আশ্রয় লইলেন। মঠের মোহান্তজী তাঁহাকে একখানি কম্বল দিলেন। তারপর তিনি অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম এবং কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথদ্বয়ের মিলনস্থল রুদ্রপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যমুনিতে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত মিলিত হন। ঐ সাধুকে নিঃসম্বল দেখিয়া ধ্যানস্তব্ধ তাঁহার দেহে নিজ কম্বলখানি জড়াইয়া দিয়া তিনি উখিমঠে চলিয়া যান। এখানে মোহান্তের নিকট আর একখানি কম্বল পাইলেন। অতঃপর তিনি কেদারনাথের পথে চলিলেন। গুপ্তকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধু উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি স্বীয় মোটা কম্বলখানি সাধুর স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাঁহার পাতলা কম্বলখানি চাহিয়া লইলেন। এখন হইতে উহাই হইল তাঁহার বৎসরব্যাপী পর্বতভ্রমণের সাথী। ক্রমে কেদারনাথের সন্নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার মনে যে অপূর্ব ভাবোদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীকেদারশৈলের পাদমূলে আমি যে পরমাদ্ভুত মহান বিরাট মূর্তি দর্শন করিলাম, এতদিন হিমালয়ে আর কোথাও আমি সেরূপ দেখি নাই। হরপার্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদারশৈলের মহত্ত্ব ও চমৎকারিতায় আমি যেরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম এবং কেদারে পৌঁছিয়াই যেমন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাম, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।" ৺কেদারনাথের পর ৺বদরীনারায়ণ দর্শনান্তে তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত তিব্বতভ্রমণ আরম্ভ হইল।

তিব্বতে তিনি 'মানা' গিরিবর্ত্ম হইয়া যান এবং তিন মাস পরে 'নীতি'-ঘাটের পথে ফিরিয়া আসেন। 'মানা'র মধ্যভাগে পার্বতীদেবীর জন্মস্থান ও পিত্রালয়দর্শনে তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন। প্রথমবারে তিব্বত হইতে ফিরিয়া ৺বদরীনারায়ণদর্শনান্তে তিনি কিছুদিন তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সহিত হিমালয়ে বাস করেন এবং পরে হৃষিকেশে নামিয়া আসেন। দ্বিতীয়বারে তিব্বত গিয়াছিলেন তিনি

বদরিকাশ্রম হইয়া 'ছিপ্ ছিলাম' গিরিবর্ত্মের পথে এবং ঐ সময়ে পাঁচ মাস তিব্বতে অবস্থানের সুযোগে কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দ্বিতীয়বারেও তিনি 'নীতি' ঘাটের পথে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। পরে তিনি আলমোড়া ও নৈনিতালের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণান্তর ৺কেদারনাথ দর্শন করেন। বদরীনারায়ণের পথে শ্রীনগরে (টিহিরী) স্বামী শিবানন্দজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (১৮৮৮-র শেষে)। গঙ্গাধর মহারাজ তখন তিব্বতী-বেশ-পরিহিত এবং তাঁহার মুখ তিব্বতীদের ন্যায় তুষারঝলসানো; তাই অকস্মাৎ শিবানন্দজী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু 'দাদা, দাদা' আহ্বান-শ্রবণে তিনি গঙ্গাধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে কিছুদিন একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে অবতরণকালে শিবানন্দজী গঙ্গাধর মহারাজকে পুনঃ তিব্বতে যাইতে নিষেধ করিলেও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে তথায় লইয়া গেল। প্রত্যাগমনকালে লাদাখ হইয়া তিনি শ্রীনগরে (কাশ্মীর) উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট তাঁহাকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দি করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৮৯)। সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ দিন পরে তিনি মুক্তি পাইলেন।

তিব্বত-ভ্রমণকালে তাঁহার যে সকল অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বৎসর তিনি থুলিং মঠে থাকিয়া তিব্বতী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লামাদিগের ঐশ্বর্য, বিলাসিতা ও দরিদ্রপীড়নের প্রতিবাদ করার ফলে তাঁহার স্কন্ধে খাপসমেত তলোয়ারের আঘাত পড়ে; অধিকন্তু পাহাড়িরা মত্তাবস্থায় লামাদিগের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে লামারা পরামর্শ দেয়, "উহার গাল বাড়াইয়া দাও"—উদ্দেশ্য, গাল কাটিয়া দিলে আর কথা বলিতে পারিবেন না। অবস্থা বুঝিয়া গঙ্গাধর মহারাজ পলাইয়া যান। দ্বিতীয়বারে তিনি লাসা যাইতে উদ্যত হইলে তিব্বতী পুলিশ তাঁহাকে বন্দি করে। পরে পরিচিত তিব্বতী ব্যবসায়ীরা জামিন দিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনে। বস্তুত এইসব ব্যবসায়ীরা তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। ইহাদের এক ব্যক্তি একসময়ে তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র দেখিয়া এতই মুগ্ধ হয় যে, তারপর সে যতদিন তাঁহার সহিত ছিল, ততদিন ঐ চিত্রকে বুদ্ধের সমাসনে বসাইয়া পূজা করিত। তিব্বতী পুলিসের নিকট মুক্তি পাইয়া কৈলাস ও মানস-সরোবর-দর্শনকালে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং গুড় ও চালভাজা দিয়া কোনপ্রকারে রক্ষা পান। তৃতীয়বার তিনি লাসায় যাইতে উদ্যত হইলে বন্ধুরা পর্যন্ত বিরোধী হইল; কাজেই তিনি ঐ আশা পরিত্যাগ করিলেন।

এ যাবৎ তিব্বত ও হিমালয়ের আকর্ষণে তিনি ইতস্তত ছুটিতেছিলেন। ইহার পরবর্তী পর্বে আমরা তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের অনুসরণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ঘুরিতে দেখিতে পাই। কাশ্মীরে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে লাঞ্ছনার পরে

স্বামীজী তাঁহাকে গাজীপুরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই আহ্বান অনুসারে কাশ্মীর পরিত্যাগপূর্বক তিনি যখন কিছুদিন পরে এপ্রিল মাসে গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন স্বামীজী সেখানে নাই। পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবাজী গঙ্গাধরকে সত্বর স্বামীজীর নিকট চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি তখনই মঠে রওয়ানা হইতে পারিলেন না। সুস্থ হইয়া জুনের প্রারম্ভে মেলট্রেনে হুগলি পর্যন্ত আসিয়া তিনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেই বালীতে নামিলেন, অমনি পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া হাওড়ায় লইয়া গেল; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য কিছু না পাওয়ায় বরাহনগরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

মঠে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজ যথারীতি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার নাম হইল অখণ্ডানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দকে মঠে ডাকিয়া আনার পশ্চাতে স্বামীজীর এই অভিপ্রায়ও লুক্কায়িত ছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া নৈনিতালে পৌঁছিলেন। ইহার পরবর্তী বিবরণ আমরা মীরাট হইতে লিখিত অখণ্ডানন্দজীর ১৪।১১।৯০ তারিখের পত্রে পাই। নৈনিতালের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাঁহার বাম দিকের পাঁজরায় এক দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনা আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় তিনি স্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া সারদানন্দজীর ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ভাগীরথীতীরে বাস করিবেন। সুতরাং তথা হইতে চারি জনে একসঙ্গে কর্ণপ্রয়াগে আসেন। এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের জ্বর হওয়ায় তিন দিন অপেক্ষা করিতে হয়। পরে শ্রীনগরাভিমুখে চলিয়া সলড়কাড় চটিতে আসিয়া স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজী জ্বরগ্রস্ত হন। তিন দিন পরে তথা হইতে পাঁচ-ছয় মাইল নিচের দিকে চলিয়া তাঁহারা এক ধর্মশালায় উপনীত হইলেন। জ্বর তখন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে পরদিন ডান্ডি করিয়া শ্রীনগরে যাইতে হইল। এখানে তাঁহারা পক্ষাধিক কাল ছিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দের পুনরায় জ্বর হওয়ায় সিভিল সার্জনকে দেখানো হইল; তিনি বলিলেন যে, ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছে, সমভূমিতে নামিয়া যাওয়া আবশ্যক। তদনুসারে তাঁহারা দেরাদুনে চলিলেন। পথে রাজপুরে তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইহার পরে স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ হৃষিকেশে চলিয়া গেলেন; অখণ্ডানন্দ মহারাজের সহিত রহিলেন শুধু সান্যাল মহাশয়।

এইরূপ তপঃক্লেশ ও ভ্রমণক্লেশের মধ্যেও আনন্দের অভাব ছিল না। একবার এক সন্ধ্যায় কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে তামাক খাওয়াইবার জন্য অখণ্ডানন্দজী গ্রামের মধ্যে আগুনের অন্বেষণে গেলেন। কিন্তু কেহই আগুন দিল

না! ইহাতে সকলেই একটু চিন্তিত হইলেন—যে গ্রামে আগুনই দুর্লভ, সে গ্রামে ভিক্ষার তো কথাই উঠিতে পারে না। এমন সময়ে অখণ্ডানন্দজী বলিলেন, "এক প্রবাদ আছে, 'গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী; লঠা বগর দেতা নহী'।" (অর্থাৎ গাড়োয়ালীদের সদৃশ দাতা নাই—তবে লাঠি না দেখাইলে তাহারা কিছুই দেয় না)। প্রবাদ-বাক্যানুসারে বিকট চিৎকার-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন, "লক্ড়ী লে আও, আগ্ লে আও।" অমনি দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠ ও অগ্নির সহিত রুটি, তরকারি, তামাক—সবই আসিয়া পড়িল।

দেরাদুনে উকিল পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ অখণ্ডানন্দ মহারাজের চিকিৎসাদির ভার লইলেন। পরে ইনি সমস্ত পাথেয় খরচ দিয়া তাঁহাকে সাহারানপুরের পথে এলাহাবাদে যাইতে বলিলেন। সাহারানপুরে তিনি দুই-তিন দিন উকিল বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতে ছিলেন। সেখান হইতে উকিলবাবুর পরামর্শানুযায়ী তিনি এলাহাবাদ না যাইয়া মীরাটে ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এ্যাসিস্টান্ট সার্জন মহাশয়ের বাটিতে আশ্রয় লইলেন। শীঘ্রই স্বামীজী তাঁহার মীরাটে অবস্থানের খবর পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই চারি পাঁচ মাস থাকিয়া গেলেন। পরে স্বামীজী একাকী ভ্রমণমানসে সকলকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও; আর সেখান থেকে তোমায় খুঁজে বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।" তারপর গঙ্গাধর মহারাজ বৃন্দাবনে গেলেন। তথায় চারি মাস অবস্থানের পর পুনর্বার ব্রঙ্কাইটিস হওয়ায় তিনি জুন মাসের প্রারম্ভে এটোয়ায় চলিয়া যান; সেখানেও তাঁহাকে পাঁচ মাস রোগে ভুগিতে হয়।

এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কিরূপে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এটোয়ায় আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন এবং কিয়ৎকাল একত্র ভ্রমণের পর কিরূপে তাঁহারা আজমীঢ় হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন, তাহা আমরা ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর নিঃসঙ্গ অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর সন্ধানে আহমেদাবাদ, আবু, ডাকোর, বরোদা, বরোচ, নর্মদাসঙ্গম, জুনাগড়, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া কচ্ছভুজের অভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে স্বামীজীকে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার নিজ ভাষাতেই সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, "স্বামীজীকে এত অন্বেষণেও খুঁজিয়া না পাইয়া আমার আগ্রহ এত বাড়িয়াছে যে, এ সকল তীর্থে দেখাশোনা কিছু না করিয়াই মাণ্ডবী যাত্রা করিলাম, সেখানে শোনা গেল, স্বামীজী নারায়ণসরোবর যাত্রা করিয়াছেন। মাণ্ডবীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পদব্রজে নারায়ণসরোবর গমন করিলাম।"

মাণ্ডবী হইতে নারায়ণসরোবর যাইবার গাড়ির পথটি বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল—চুরি-ডাকাতি সেখানে প্রায়ই হইত। পায়ে হাঁটা পথ অল্পতর ও নিরাপদ হইলেও তিনি ভাবিলেন, স্বামীজী যখন গাড়িতে গিয়াছেন তখন গাড়িতেই ফিরিবেন। অতএব দীর্ঘতর, জনমানবশূন্য ও ভয়াবহ পথেই তিনি অগ্রসর হইলেন—সঙ্গী পাইলেন একজন পশ্চিমদেশবাসী তৈর্থিক 'ভকত'। স্বামী অখণ্ডানন্দ নিঃসম্বল, আর তৈর্থিকের থলিতে আটা, লবণ, তাওয়া সবই আছে। ঐ পথের অর্ধেক অতিক্রম করার পূর্বেই চারিজন দস্যু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ভকত বিপদে সন্ত্রস্ত হইলেও অখণ্ডানন্দজী অবিচলিত রহিলেন। দস্যুরা দেখিল যে, লইয়া যাইবার মতো কিছুই নাই; সুতরাং তাহারা ফিরিয়া চলিল। তখন অখণ্ডানন্দজী স্বীয় জামা প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো নিয়ে যা, তোরা গরিব।" কিন্তু একটি লোক তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "দুয়া করো, মহারাজ; কাপড়া পিন্হ্ লেও," এবং ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, কিছু যেন প্রকাশ না পায়। পরে নারায়ণসরোবরে উপস্থিত হইলে সেখানকার মহান্ত সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে। সঙ্গে পাঁচটি টাকা থাকলেও আপনার আর প্রাণ থাকত না।" এত কষ্টের পরেও নারায়ণসরোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, স্বামীজী অন্য পথে আশাপুরী নামক দেবীস্থানদর্শনে গিয়াছেন। অখণ্ডানন্দজী যখন সেখানে গেলেন স্বামীজী তখন মাণ্ডবীতে ফিরিতেছেন। অবশেষে অখণ্ডানন্দজী মাণ্ডবীতে স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলে স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি একাকী থাকিতে চাহেন, অতএব গঙ্গাধর মহারাজ যেন পশ্চাদনুসরণ না করেন। গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর দিলেন, "তোমার কাজের বিঘ্ন আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম; সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে—এখন তুমি একলা যেতে পার।" ইহার পর স্বামীজী ভুজে গেলেন; গঙ্গাধর মহারাজ সত্যবাদিতার পরিচয় দিবার জন্য একদিন পরে তথায় যাইয়া স্বামীজীর সঙ্গে এক পক্ষকাল কাটাইলেন। অতঃপর পোরবন্দর পর্যন্ত আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পোরবন্দরে পুনর্মিলনের পর অখণ্ডানন্দজী একাকী জিৎপুর, গোণ্ডাল এবং রাজকোট হইয়া জামনগরে গেলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের মতে "জামনগরে (তাঁহার) সেবাব্রতের সূচনা, রাজপুতানায় খেতড়িতে ক্রমোন্নতি এবং মুর্শিদাবাদে উহার প্রসার ও পরিণতি।" জামনগরে তিনি 'ধন্বন্তরি-ধাম' নামক ভবনে কবিরাজ মণিশঙ্কর বিঠ্ঠলজীর অতিথি হইয়া তিন-চার মাস ছিলেন। সেখানে তিনি চরক ও সুশ্রুত-সংহিতাদি অধ্যয়ন শেষ করেন এবং ধন্বন্তরি-ধামের সংলগ্ন এক বৈদিক চতুষ্পাঠিতে বেদপাঠ শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে এক ঐশ্বর্যপূর্ণ মন্দিরের বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী মহান্তের সহিত আলাপ হইলে ব্রহ্মচারী

তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গদিনশীন হইতে বলেন; কিন্তু বৈরাগ্যবান স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাকে জানান, "জল তো চল্‌তা ভালা, সাধু তো রম্‌তা ভালা। আমি মহান্ত হতে পারব না।" জামনগরে উদরাময় হওয়ায় তিনি মণিশঙ্করজীর চিকিৎসাধীনে একমাস ছিলেন। ঐ চিকিৎসা ও পথ্যাদির ফলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়ায় শ্রীযুক্ত শঙ্করজী শেঠ (ব্যাঙ্কার) তাঁহাকে নিজ বাড়িতে লইয়া গিয়া প্রায় চারি মাস রাখেন।

শেঠভবনে অবস্থান বড়ই বৈচিত্র্যময় ছিল। গুণমুগ্ধ শেঠজী অখণ্ডানন্দের পথ্যের জন্য দুগ্ধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া খাওয়াইতেন, অপরাহ্ণে গাড়ি করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন এবং মূলজী নামক একজন গায়কের গান শুনাইতেন। শেঠজী প্রত্যহ একজন সাধুকে ভোজন করাইতেন। একদিন জনৈক সাধু ভোজন প্রার্থনা করিলে ভৃত্য জানাইয়া দিল যে, গৃহে অপর সাধু আছেন, আর কাহারও ব্যবস্থা হইবে না। শুনিয়া অখণ্ডানন্দ মহারাজ নিজের ভোজ্য সাধুকে দিতে উদ্যত হইলে শেঠজী আদেশ দিলেন যে, অতঃপর কোন সাধুকে বিমুখ করা চলিবে না। শেঠভবনে তিনি বেদ ও উপনিষদাদি দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অধ্যয়ন করিতেন। পরে চাতুর্মাস্য শেষ হইলে তিনি অন্যত্র যাইতে চাহিলেন; কিন্তু শেঠজী ছাড়িলেন না। এদিকে শেঠজীর উপর সাধুর প্রভাব ও অর্থক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বামী অখণ্ডানন্দের কফিতে জয়পাল মিশাইয়া প্রাণহরণে উদ্যত হইল। বিশেষ প্রয়োগজনিত ভেদ আরম্ভ হইলে চিকিৎসার্থে আগত শ্রীঝণ্ডু ভট্ বিঠ্‌ঠলজীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা বিষেরই প্রতিক্রিয়া; সুতরাং তিনি সাধুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

সদাশয় ভট্‌জী অর্থ না লইয়া বহু রোগীর গৃহে যাইতেন, দরিদ্রদিগকে বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন এবং অনেককে স্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়শ দুইটি শ্লোক[১] শোনা যাইত; উহার ভাবার্থ এই—"এমন কি কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাঁহাদের দুঃখভারের ভাগী হইতে পারি? আমি রাজ্য, স্বর্গ অথবা মুক্তি চাহি না। আমি শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশ করিতে চাই।" ভট্‌জীর জীবনদর্শনে ও তাঁহার আলাপশ্রবণে অখণ্ডানন্দ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, "মানুষের সেবা করা ও মানুষকে ভালবাসা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

---

১। কো নু স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভবেয়ং সততং দুঃখভারভাক্॥
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

জামনগরে প্রায় একবৎসর থাকিয়া গঙ্গাধর মহারাজ কুণ্ডলাগ্রাম, কাঠিয়াওয়াড় ও বরোদা হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। ভাবনগরে তিনি স্বামীজীর আমেরিকা-গমনের সংবাদ পান। পুনা ও বোম্বাই দেখিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর আহ্বানে আবু রোডে গমন করেন (১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর) এবং তিন জনে এক সঙ্গে আজমীঢ়ে যাইয়া সর্দার হরিসিং লাড্‌খানির গৃহে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ইহার পরে মহারাজের উপদেশে অখণ্ডানন্দজী খেতড়িতে যান। খেতড়ি-জীবনের কিয়দংশ আমরা তাঁহার নিজ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম—"খেতড়িতে প্রথমবার দেড়মাস কাল রাজার অতিথিরূপে অবস্থিতি করিয়া রাজার পুস্তকাগারে থিওডোর পার্কারের সমগ্র গ্রন্থ পাঠ এবং ভারতেতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য আলোচনা করি।...পরে খেতড়িরাজের জ্ঞাতি সর্দার ভুরিসিং-এর আহ্বানে মালসিসরে গমন করিয়া তাঁহার বাটিতে চাতুর্মাস্য যাপন করি এবং দুই মাস একটি জৈন সাধুর সমাধিমন্দিরে বাস ও মাধুকরী করি। চাতুর্মাস্যকালে বেদান্ত, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আলোচনা এবং জৈন সাধুর মন্দিরে পণ্ডিত সীতারামের নিকট নিয়মিত 'শঙ্করদিগ্বিজয়'-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতাম।...এই রাজপুতানা প্রদেশে আট মাস বাস করিয়া নানা গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও গরিব প্রজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করি, গরিব প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি।"

মালসিসর হইতে ফিরিয়া তিনি নিত্য খেতড়ি-রাজসভায় বেদান্তব্যাখ্যা করিতেন। মালসিসরে অবস্থানের সুযোগে তিনি হিন্দী ভাষা শিখিয়া লওয়ায় তাঁহার বক্তব্য সকলেরই নিকট সহজবোধ্য হইত। ইতোমধ্যে দারিদ্র্য-মোচন সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ চাহিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লিখিলেন, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" কার্যক্ষেত্র সম্মুখেই ছিল; নেতার নির্দেশে উহাতে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর দ্বিধা রহিল না। রাজার একটি এন্ট্রান্স স্কুলে মাত্র আশিটি উচ্চবর্ণের ছাত্র ছিল। নানা আপত্তি সত্ত্বেও তিনি রাজার অনুমতিক্রমে গোলা (অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের ভৃত্য) জাতীয় ছাত্রদিগকেও সেখানে ভর্তি করাইলেন এবং ক্রমে ছাত্রসংখ্যা দুই শততে উঠিল।

খেতড়ি হইতে জয়পুর এবং জয়পুর হইতে উদয়পুর—ইহাই তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণের ক্রম। উদয়পুরে তিনি রামবাগ নামক বাগানে পালাগণেশজীর মন্দিরে আশ্রয় পাইলেন। রাজদরবার হইতে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ন্যায় তাঁহারও ভোজনাদির ব্যবস্থার প্রস্তাব আসিলে তিনি জানাইলেন যে, রাজ্যের কেহ অভুক্ত না থাকিলেই

তিনি মহারানার সিধা লইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূপ উত্তরে রাজ্যের অমাত্যগণের শুধু ক্রোধবৃদ্ধিই হইল। আর একদিন এক নিরক্ষর নাগা সাধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ, লঙ্কায় এখন কার রাজ্য?" অখণ্ডানন্দজী বলিলেন, "কেন, ইংরেজের।" নাগা রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "কভী নহী; ওহ্ বিভীষণকা রাজ্য হ্যায়।" নাগা ধরিয়া লইয়াছিল যে, রামচন্দ্রের বরে অমর বিভীষণ এখনও লঙ্কার রাজা! এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে খ্রিস্টানী পুস্তকলব্ধ বিদ্যা পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। ফলত তিনি উদয়পুরে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কিছুই করিতে না পারিয়া অন্যত্র চলিলেন। বিদায়কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রে পড়িলেন, "স্বামীজী সকল গুরুভাইকে জীবসেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

উদয়পুরের পর ৺একলিঙ্গদর্শনান্তে শ্রীনাথদ্বারায় পৌঁছিয়া তিনি রঘুনাথজী ভাণ্ডারীর গৃহে অতিথি হইলেন এবং গৃহস্বামীর পুত্রকে অশিক্ষিত দেখিয়া তাহার শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। এই একান্ত ব্যক্তিগত অধ্যাপনাকে অবলম্বন করিয়াই অচিরে সেখানে এক মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ওঁকারনাথ, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, রাথ্লাম, চিতোর ও জয়পুর ইত্যাদি দেখিয়া খেতড়িতে ফিরিলেন। তাঁহার খেতড়িতে অবস্থানের ফলে স্থানীয় সংস্কৃত পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হয় এবং উহার নাম হয় 'খেতড়ি আদর্শ বৈদিক বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ে বেদের অর্থবোধের জন্য বেদাঙ্গপাঠেরও প্রচলন হয় এবং ছাত্রদের পুস্তকাদির জন্য তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া দেন। রাজ্যের বাৎসরিক মহা-দরবারে এযাবৎ কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইতেন। সাধারণ প্রজারা নিকটে আসিতে উদ্গ্রীব, অথচ বারংবার সান্ত্রীদের দ্বারা দূরীকৃত হইতেছে দেখিয়া অখণ্ডানন্দ মর্মাহত হইলেন এবং অবসর বুঝিয়া রাজাকে সমস্ত জানাইলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষে প্রজার জন্য অশ্রু দেখিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "আগামী বৎসর থেকে আমি সমস্ত প্রজাদের নিয়ে দরবার করে স্বয়ং সকলের নজর নেব।" রাজ্যের এইসকল উন্নতি ব্যতীত তিনি কৃষির উন্নতিরও চেষ্টা করিতেন এবং রাজার হাসপাতালে রোগীদের লইয়া গিয়া সেবা করাইতেন। পাঁচ-ছয় মাস খেতড়িতে অবস্থানান্তে তিনি চিড়ারা গ্রামে যান এবং সেখানে একটি বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে রাজপুতানার আরও কয়েকটি গ্রামের উন্নতিসাধনান্তে তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে জয়পুরে পৌঁছিলে তথায় উপস্থিত স্বামী অভেদানন্দ ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের আগামী জন্মোৎসব দর্শনের জন্য আলমবাজারে যাইতে হইবে। তদনুসারে তিনি সেখানে চলিয়া গেলেন।

আলমবাজারে অবস্থানের সুযোগে অখণ্ডানন্দজী ও শিবানন্দজী স্বামী

অভেদানন্দের নিকট ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করেন। পরে বঙ্গদেশে বেদবিদ্যালয়-স্থাপনের অভিলাষ প্রবল হওয়ায় ঐ বিষয়ে পরামর্শ করার ও উৎসাহ জাগাইবার জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাটপাড়া, মূলাজোড় ও নৈহাটীর পণ্ডিতবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সহিতও আলোচনা করেন। মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তখন কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার সেবাভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন গঙ্গাস্নানান্তে মঠে ফিরিবার পথে একটি বিসূচিকা রোগগ্রস্তা বৃদ্ধাকে দেখিয়া তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরেই খড়দহে ৺শ্যামসুন্দরদর্শনার্থে যাইয়া তিনি যে বাড়িতে উঠিলেন, উহাতেই গোলোক শিরোমণি নামক এক কথক ঠাকুর রাত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে তিনি সারারাত্রি তাঁহার সেবা করিলেন এবং সকালে রোগীর দেহত্যাগ হইলে সৎকারেরও সুব্যবস্থা করিলেন।

একবার ঠাকুরকে নাগেশ্বর চাঁপাফুল দিবার আগ্রহে তিনি স্বামী সুবোধানন্দের সহিত পদব্রজে ডি. গুপ্তের বাগানে আসিয়া জানিলেন যে, উহা সেখানে নাই, মল্লিকদের সাতপুকুরের বাগানে আছে; কিন্তু সেখানেও ফুল ফুটিবে সতর-আঠার দিন পরে। ফুল না লইয়া মঠে যাওয়া চলে না। সুতরাং আপাতত তিনি একাই পল্লিজীবনের অভিজ্ঞতালাভের জন্য বারাসত-অঞ্চলে অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে পুষ্পহস্তে মঠে আসিলেন।

আলমবাজারে তাঁহার এক অপূর্ব দর্শন হয়—ইহা তাঁহার "জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।" ম্যালেরিয়াজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন; কিছুতেই উহার উপশম হয় না দেখিয়া তিনি অদ্বৈতচিন্তায় মনকে ডুবাইয়া দিলেন। সারা রাত্রি এই ভাবে কাটাইয়া শেষ রাত্রে যেমন একটু চোখ বুজিয়াছেন, অমনি দেখেন "সম্মুখে একটি হামা-দেওয়া সজীব নাড়ু গোপাল—যেন একখানি বড় নীলকান্তমণি কুঁদিয়া গঠিত। কি সুন্দর সুঠাম মূর্তিখানি! গোপালের শ্রীঅঙ্গের বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে ঘর আলোকিত।" তাঁহার বোধ হইল তাঁহার অন্তরে অবস্থিতা ও ব্রজবাসিনীদের ন্যায় দিব্যবসনভূষণে শোভিতা মা যশোদা গোপালকে সুখাদ্য দেখাইয়া ডাকিতেছেন, "আয় বাপ গোপাল আমার, যাদুমণি, নীলমণি, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, আয়রে।" এইরূপ লীলা চলিতেছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ দিব্য দৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ্ দেখি, এ কি ভাব!" অমনি অখণ্ডানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "নির্বাণে আমার কাজ নাই, প্রভু! আহা-হা! এই ভাব নিয়ে আমি শত-শত বার জন্মাতে চাই।" এই বলিয়া তিনি ঠাকুর, গোপাল

ও মা যশোদাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলেন—অমনি চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আর একদিন দ্বিপ্রহরে সকলে ঘর্মাক্তকলেবরে বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ পাখা লইয়া সকলকে আধঘণ্টা ধরিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। সকলেই তখন আরামে নিদ্রিত, কিন্তু একি! স্বামী অখণ্ডানন্দেরও যে তাপিত অঙ্গ বেশ শীতল হইয়া গেল! তখন তাঁহার বোধ হইল, "দশের সুখে-দুঃখে আমারও সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা একটু জন্মিয়াছে।" আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল।

স্বামীজীর প্রথমবার দেশে প্রত্যাগমনের কয়েক মাস পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন মাদ্রাজে যান, তখন স্বামী সদানন্দও তাঁহার সহকারিরূপে সঙ্গে যাত্রা করেন, কিন্তু বিদায়মুহূর্তে একটি কুকুর সদানন্দকে দংশন করিলে ঔষধসংগ্রহের জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দ চন্দননগরের নিকটবর্তী গোঁদলপাড়ায় যান। ঔষধপ্রেরণান্তে তিনি তখনই মঠে না ফিরিয়া নবদ্বীপাদি দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে একদিন জনকয়েক পণ্ডিত তাঁহাকে ঘিরিয়া জ্ঞানানন্দ অবধূতের নাম উল্লেখপূর্বক বলিলেন, "শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধূলা দেওয়া যায় কি?" অখণ্ডানন্দজী প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার ব্রাহ্মণ না হলেও শত শত ঋষি, মুনি ও ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতারূপে পূজা পেলেন কি করে?" পণ্ডিতরা বলিলেন, "আরে সব এস, এই আর একজনকে পাওয়া গেছে—ইনিও ঐ দলের অথবা জগবন্ধুর।" বাক্যবাণে জর্জরিত অখণ্ডানন্দজী অগত্যা রণে ভঙ্গ দিলেন। নবদ্বীপে আর এক মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে ঘটনাক্রমে তিনি একরাত্রি যাপন করেন এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন অথচ আত্মপরিচয় দিতে অসম্মত হন। ইহাতে লোকের ধারণা হইয়া গেল যে, ইনিই ছদ্মবেশী বিবেকানন্দ। গঙ্গাধর মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, সেইদিন ভোরেই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; কিন্তু বাজারে এই গুজব শুনিয়া তাঁহাকে আবার মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া ভ্রমসংশোধন করিতে হইল।

অতঃপর কাটোয়া হইয়া পদব্রজে মুর্শিদাবাদ গমনকালে তিনি পথে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলেন। ক্রমে কালীগঞ্জ ও পলাশী হইয়া দাদপুর আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা স্বয়ং এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"খুব সকালে গঙ্গায় হাত-মুখ ধুইয়া বাজারের দিকে আসিতে পথে দেখিলাম অতিশয় ছিন্নমলিনবস্ত্রপরিহিতা প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি মুসলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহার কাঁকালে একটি মাটির কলসী; তলাটি খসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, 'বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই। মা আমাকে মারবে, সেই ভয়েই কাঁদছি।' আমি তাহাকে লইয়া গিয়া দুই পয়সার একটি মাটির কলসী কিনিয়া দিলাম

এবং দুই পয়সার চিঁড়ে-মুড়কিও দেওয়া হইল। (সঙ্গে আমার মাত্র একটি সিকি অবশিষ্ট ছিল)। আমার তিন আনা পয়সা ফেরত লইতে না লইতেই সমীপবর্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায় দশ-বার জন ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দোকানে আসিয়া আমার কাছে সকাতরে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তাহারাও অকালের জন্য খাইতে পায় না। আমি তখনই সেই দোকানীকে তিন আনার চিঁড়ে-মুড়কি প্রত্যেককে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর আমি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী।" এই আর্তির কোন প্রতিকার না দেখিয়া তিনি পরদিন প্রাতে অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় এক অর্ধবয়স্কা নারী তাঁহাকে বলিল, "প্রায় আশি-নব্বই বছরের বুড়ি গয়া বৈষ্ণবীর তুমি যদি একটা কিনারা করে না যাও, তবে সে দু-এক দিনের মধ্যেই মারা যাবে।" সুতরাং উদরাময়-রোগগ্রস্তা বৃদ্ধার পথ্য, বস্ত্র ও সেবাদির ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ থাকিতেই হইল। এই কার্যসমাপনান্তে তিনি দাদপুর হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি ততই তাঁহার মনকে পীড়া দিতে লাগিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া রিক্তহস্ত সন্ন্যাসী ক্রমে ভাবতা গ্রামে পৌঁছিলেন। তথায় রাত্রিযাপনান্তে প্রাতে বহরমপুরের পথে চলিতে গিয়া তিনি দেখেন, কে যেন তাঁহাকে নিচের দিকে টানিয়া ধরিতেছে। তিন-চারি বার এইরূপ হইলে তিনি ঐ অঞ্চলে থাকিয়া সেবাকার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আলমবাজার মঠে দুর্ভিক্ষের বিবরণসহ পত্র লিখিলেন। অতঃপর তিনি চৈত্র-সংক্রান্তিতে (১৩০৩) চকের মাঠ মহুলা হইতে কেদারমাটি বহুলায় যাইয়া মঠের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে এক শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিছুদিন বাস করিয়া দুই-এক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে 'দণ্ডী ঠাকুর' বলিত এবং স্বামী অখণ্ডানন্দকেও তদনুরূপ সন্ন্যাসী মনে করিয়া 'দণ্ডী ঠাকুর' নামে অভিহিত করিতে লাগিল।

১৩০৪ সালের ১ বৈশাখ হইতে দণ্ডী ঠাকুর প্রত্যহ বৈকালে গীতা পাঠ করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। "কর্মপ্রেরণায় তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তখন চুপচাপ বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়।" কিছুদিন পরে 'যোগবাশিষ্ঠের' প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—"কর্ম ও পুরুষকার 'যোগবাশিষ্ঠে'র মেরুদণ্ড। কর্মই মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্তির একমাত্র উপায়।" তিনি ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্ন কিন্তু সবদিন তাঁহার রুচিত না; নিকটে উপস্থিত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে কিছু না দিয়া তিনি তৃপ্ত হইতেন না। ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহে ঠাকুরকে নিঃসহায়ের সহায় হইতে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন—ঠাকুর যেন বলিতেছেন, "দ্যাখ না, কি হয়?" এদিকে গুরুভ্রাতাদের সহিত পত্রবিনিময়ের ফলে

স্বল্পদিনেই বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁহার আন্তরিকতায় আকৃষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কষ্টে বিচলিত হইলেন। সাহায্যও আসিল। মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বামীজী দুই জন সেবককে স্বামী অখণ্ডানন্দের সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। ইঁহারা বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহুলা পৌঁছিলেন এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে সেবাকার্য আরম্ভ হইল। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য। অখণ্ডানন্দজী বা তাঁহার সহকর্মীরা দুর্ভিক্ষ-ফাণ্ড হইতে নিজেদের জন্য অর্থাদি না লইয়া অন্যত্র উহা সংগ্রহ করিতেন। ঐ সময়ে আবার ভূমিকম্পের ফলে ঐ অঞ্চলের লোকের প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা উহার প্রতিকারকল্পেও যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

দুর্ভিক্ষ শেষ হইল, কিন্তু মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীবসেবাব্রতের তখন মাত্র প্রারম্ভাবস্থা। দুর্ভিক্ষের ফলে বহু অনাথ বালককে গৃহবিচ্যুত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবও তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অনাথদিগকে লইয়া আশ্রম গঠন করিলে দেশের এক প্রকৃত অভাব দূরীভূত হইবে এবং ঐ কার্যে সরকারি সাহায্যেরও অভাব হইবে না। এইরূপ একটি কার্যের জন্যই তখন তাঁহার প্রাণ আকুল; সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মতিক্রমে তিনি ১৮৯৭-এর শেষার্ধে দুইটি বালকের ভার লইলেন। পর বৎসর মে মাসে দার্জিলিং-এর চারিটি বালক লইয়া অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৮-এর শেষ পর্যন্ত আশ্রম মহুলায় ভট্টাচার্যদের চালাঘরে থাকিয়া পরে সারগাছি গ্রামের প্রশস্ত পথের উপর একখানি পুরাতন দ্বিতল গৃহে উঠিয়া আসিল। উহার ত্রয়োদশ বৎসর পরে আশ্রমটি ১৯১৩ অব্দের মার্চ মাসে সারগাছির বর্তমান নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়।

প্রথমাবধিই দণ্ডী ঠাকুর আশ্রমের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু অনাথ বালকের প্রাণরক্ষা, সুশিক্ষা এবং সদ্ভাবে জীবনযাত্রানির্বাহের সুব্যবস্থা হইল। আশ্রমে বালকদের বাসাহারের সহিত সাধারণ শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। এতদ্ব্যতীত পল্লির উন্নয়ন ও সাহায্যকল্পে দাতব্যচিকিৎসালয়, নৈশবিদ্যালয় ইত্যাদিও স্থাপিত হইল। ফলত স্বামী অখণ্ডানন্দের অন্তরের আকুতি আশ্রমের বিবিধ কার্যাবলম্বনে ক্রমেই মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। এই সকল কার্যে তিনি দীর্ঘকাল একাই ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মৌলিক চিন্তার বা কর্মোদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনেরও পূর্বে তিনি আশ্রমে চরকা এবং তাঁতের প্রবর্তন করেন এবং খাদির মর্যাদাবৃদ্ধির বহু পূর্ব হইতে স্বয়ং তাঁতের মোটা কাপড় পরিতে থাকেন। আশ্রমে কার্পাসের চাষ হইতে লব্ধ তুলা গ্রামে বিতরিত হইত। পরে গ্রাম হইতে আনীত সূত্রদ্বারা আশ্রমে

বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহার প্রারম্ভে স্বহস্তে একটু কাপড় বুনিয়া এই আদর্শবাদী সন্ন্যাসী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন সামান্য সন্ন্যাসী; এই সামান্য পল্লিতে চার আঙ্গুল কাপড় বুনেছি; কিন্তু এর দ্বারা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর নগ্নতা কিঞ্চিৎ আবৃত হবে।" এতদ্ব্যতীত তিনি পল্লিবাসীর শিক্ষার জন্য ছায়াচিত্রসহায়ে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রমকে প্রচুর অর্থ দিতেন। এই সকল প্রশংসা ও সাফল্যমাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অখণ্ডানন্দজী সর্বদা স্বীয় আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই তৎপর থাকিতেন। তাই কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়াও মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তিনি অপরাহ্ণ দুই-তিনটা অবধি কৃষকের মতো অবিরাম পরিশ্রমান্তে লেবু দিয়া পান্তা-ভাতমাত্র খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

এরূপ নিরলস, স্বার্থগন্ধশূন্য, একনিষ্ঠ শ্রমকে সফল করিয়া ক্রমে দুইটি কক্ষযুক্ত ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা-বিশিষ্ট একটি হর্ম্য নির্মিত হইল। উহারই একটি প্রকোষ্ঠে অখণ্ডানন্দজী বাস করিতেন; অপর কক্ষে পুস্তকাবলী রক্ষিত ও পূজাদি অনুষ্ঠান হইত। বালকগণও এই বাটিতে বাস করিত। মন্দিরনির্মাণ তাঁহার তেমন মনঃপূত ছিল না, কারণ শিবজ্ঞানে জীবসেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি কেন শুধু প্রতিমাতেই দেববুদ্ধি করিবেন? আশ্রমের বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুরকে সাজাইয়া পূজার আনন্দ প্রাপ্ত হউক; কিন্তু তিনি তো পূজা করিবেন বালক-নারায়ণদের। এই ভাবকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি একবার এক ক্ষতদুষ্ট অনাথ বালককে ঋগ্বেদোক্ত পুরুষসূক্তের মন্ত্রে স্নান করাইয়া দেবজ্ঞানে আহার করাইয়াছিলেন। আর একদিন অপর এক বালক রাত্রে লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া চলিতে থাকিলে তিনি আপনাকে সেবাপরাধী মনে করিয়া আলোকটি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক বালকের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবধারার সহিত মন্দিরের সামঞ্জস্য না থাকিলেও পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় অবশেষে ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল দেবালয় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত করিল এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৺অন্নপূর্ণা পূজাদিবসে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। ক্রমে গোশালা, বিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, শিল্পশিক্ষায়তন ইত্যাদি সমস্তই নির্মিত হইয়া গেল।

এই অনাথ-আশ্রমের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত হৃদয়ের প্রসারের জন্য বালকগণ পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলে বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত হইত। একবার ঐ অঞ্চলে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইলে আশ্রম-বালকগণ সেবাদ্বারা ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাবলম্বনে শত শত গ্রামবাসীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

মনে রাখিতে হইবে যে, আশ্রমস্থাপনের পর স্বামী অখণ্ডানন্দের কার্য আপাতত

একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইলেও তিনি অবকাশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যত্র যাইতেন এবং তাঁহার অন্তর সর্বদাই পরদুঃখে ম্রিয়মাণ হইত। বিহারের ভাগলপুর জেলায় ঘোঘা নদীর বন্যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামসকল প্লাবিত হইলে তিনি পঞ্চদশটি গ্রামকে দশ সপ্তাহ যাবৎ বিবিধ প্রকারে সাহায্যে করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে বহু বিসূচিকাগ্রস্তের সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিহারের বহু নগর যখন বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি পঞ্চষষ্ঠী বর্ষের বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ধ্বংসাবলী পরিদর্শন করিয়া সেবাকার্যে নিরত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। একবার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইলে উহার বর্ণনাপাঠে তিনি এতই বিচলিত হন যে, দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের ন্যায় গাছের পাতা, শাক ও পটলসিদ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়া প্রায় পাঁচ-ছয়মাস অতিবাহিত করেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীরব কর্মী; তাই তিনি নগরের কোলাহল ও বৃথা ব্যস্ততা পরিহারপূর্বক পল্লির শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে আপন ভাবধারাকে রূপদান করিতেই ভালবাসিতেন। কি স্বাস্থ্য, কি উচ্চপদ, কিছুই তাঁহার এই তপস্যাভঙ্গে সক্ষম হইত না। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপ-সভাপতি ও ১৯৩৪-এর মার্চমাসে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি বালকদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক আশ্রমের সর্ববিধ কার্য পর্যবেক্ষণ ও বহুযত্নে রোপিত ও বর্ধিত বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকাই অধিক গৌরবজনক মনে করিতেন। বাঁধা-ধরা নিয়মে চলা এই স্বাধীনচেতা মহাপুরুষের পক্ষে দুর্বিষহ ছিল। এই প্রকার পল্লিজীবনযাপনের পশ্চাতে তাঁহার স্বকীয় আদর্শবাদের সহিত ছিল স্বামীজীর অনুপ্রেরণা। স্বামীজীর চিন্তায় বিভোর থাকায় তিনি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বামীজী আসিয়া আশ্রমের গাছের লঙ্কা-সহ মুড়ি চাহিয়া লইয়া খাইতেছেন। আর স্বামীজীর মহামন্ত্র, "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর," তিনি অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপ্রেমও তাঁহার এতাদৃশ সঙ্কল্পের সহায়ক ছিল। ইটালীর দেশভক্ত ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্ ও নিগ্রোজাতির সেবক বুকার টি. ওয়াশিংটন তাঁহার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করিতেন এবং বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বদেশসেবা ও ত্যাগ তাঁহার চিত্তে সাড়া জাগাইত।

দীর্ঘ অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান, অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং রসবোধের মিশ্রণে তাঁহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ষক হইত। তাঁহার কপর্দকহীন জীবনযাত্রা, বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ এবং দুর্গম তীর্থপর্যটনের কাহিনী শাস্ত্রীয় বাক্য ও অনুভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে কখনও রোমাঞ্চিত, কখনও হৃষ্ট,

কখনও নবভাবে উদ্বোধিত করিয়া দীর্ঘকাল তৎসমীপে বসাইয়া রাখিত। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'উদ্বোধন' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পরে 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' ও 'স্মৃতিকথা' নামে গ্রন্থাকারে সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার বলার ভঙ্গী যেমন সজীব ছিল, লেখার ধারাও ছিল তেমনি সতেজ ও সাবলীল। বাগ্মী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না বটে; কিন্তু সময়বিশেষে স্বীয় বক্তব্য এমনই প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন যে, অভিজ্ঞ বক্তাও চমৎকৃত হইতেন। একবার নফরচন্দ্র কুণ্ডুর[১] এক স্মৃতিসভায় দধীচির ত্যাগমাহাত্ম্য-অবলম্বনে তিনি এমন একটি ভাষণ দিয়াছিলেন যে, গুণমুগ্ধ স্বামী সারদানন্দ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ভাই, তোমাকে আর সারগাছিতে যেতে দেওয়া হবে না—এখানে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে।" অখণ্ডানন্দজী সর্বোপরি ছিলেন রসিক—গুরুগম্ভীর নীরস পরিবেশের মধ্যেও তিনি অকস্মাৎ কোনও হাস্যোদ্দীপক ঘটনার অবতারণা করিয়া আনন্দের স্রোত বহাইতে পারিতেন। একবার একজন যুবক সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে সাধুর বুক-পকেট হইতে পয়সাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাধু ভাবিলেন, এখনই ভর্ৎসনা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "ও প্রণামী পড়েছে ছুঁয়ো না।" গঙ্গাধর মহারাজের এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া গুরুভ্রাতারাও তাঁহার সহিত রঙ্গরস করিতেন। ইহার একটি ঘটনা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহাকে সস্নেহে গঙ্গার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'গ্যাঞ্জেস' নামে সম্বোধন করিতেন।

মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহাকে অনেককে দীক্ষা দিতে হইয়াছিল। প্রথমত তিনি বিনয়বশত ইহাতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরে যখন সম্মত হইলেন, তখন শিষ্যদিগকে একটা গতানুগতিকতা অনুসরণপূর্বক মন্ত্র না লইয়া ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র ও সুসংযত থাকিবার উদ্দেশ্যেই উহা গ্রহণ করিতে বলিতেন। ফলত মন্ত্রদীক্ষা তাঁহার মতে শুধু একটা বাহ্য সংস্কার নহে; উহা জীবনের আমূল পরিবর্তনের অমোঘ উপায়।

মহাসমাধির একবৎসর পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বেশিদিন তিনি ইহজগতে থাকিবেন না। শেষ কয়টি দিন ভগবদচিন্তায় ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমে রামায়ণপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৺বাসন্তীপূজা করার স্বপ্নাদেশ তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইত, যেহেতু পূর্ববর্তী অধ্যক্ষদ্বয়

---

১ কলকাতার নর্দমার ভিতরে ঢুকিয়া ময়লা পরিষ্কার করার কালে জনৈক ধাঙ্গড় বিষাক্ত বায়ুতে অজ্ঞান হইয়াছে জানিয়া ইনি তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য নর্দমায় প্রবেশ করেন, কিন্তু নিজেও প্রাণ হারান। ঐ পথ এখন তাঁহারই নামে পরিচিত।

৺বাসন্তীপূজার অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প লইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটিতে পারে। কাজেই ঐ উদ্দেশে নির্মিত মণ্ডপটি দেখাইয়া আশ্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "পূজা দেখার সৌভাগ্য যদিই বা না ঘটে, তবু মায়ের জন্য এই মণ্ডপ করেছি ভেবেই আমার আনন্দ হয়। বাকি সব তোমরা করবে।" বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা স্বামী অখণ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতেন—তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার অধিকার বা অভিপ্রায় তাঁহার নাই। অথচ বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও যুবক ভক্তদের আগ্রহনিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ করিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি ব্যথিতহৃদয়ে অনেক সময় বলিতেন, "এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।" সারগাছিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন; অথচ ইহাও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, গুরুভ্রাতাদের সহস্রস্মৃতি-বিজড়িত এবং বিবেকানন্দাদির পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত বেলুড় মঠে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে তাঁহার দেহপাত হয়। মহাসমাধির পূর্ব রাত্রে তাঁহাকে বেলুড়ে লইয়া আসায় এই বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বহুমূত্রাদি রোগে তাঁহার শরীর অতীব পীড়িত হইয়া পড়ায় সুচিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কলকাতায় লইয়া আসা হয়; কিন্তু পথে ট্রেনেই তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং কলকাতায় পৌছিলে চিকিৎসক বলেন যে, অবস্থা প্রতিকারের অতীত। সুতরাং দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে বেলুড়ে লইয়া আসা হয়। এখানে পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বিকাল তিনটা সাত মিনিটের সময় তাঁহার লীলাবসান হয়।

# স্বামী সুবোধানন্দ

সার্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে কলকাতায় তদানীন্তন বৃক্ষলতাগুল্মাদিআচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্রহ্মচারী ৺সিদ্ধেশ্বরী-কালীমাতার মূর্তিস্থাপনপূর্বক সাধনায় রত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী জগদম্বাকে জানাইলেন, "মা, আমি তো আর এখানে থাকতে পারি না।" ঠিক এমনই সময়ে মায়ের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট শ্রীযুক্ত শঙ্কর ঘোষ ৺কালীমাতার সেবাভার গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মচারীকে অব্যাহতি দিলেন। ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধা ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী তদবধি ঘোষবংশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ অঞ্চলের শঙ্কর ঘোষ লেন এখনও সেই বংশতিলকের নাম বহন করিয়া ধন্য হইতেছে। স্বামী সুবোধানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ ছিলেন শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র; আর তাঁহার মাতার নাম ছিল নয়নতারা। ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ইঁহাদের ভদ্রাসন অবস্থিত। কৃষ্ণদাসের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল এবং সময় সময় তিনি পুত্রদিগকেও তথায় লইয়া যাইতেন। অধিকন্তু উত্তম ধর্মগ্রন্থ আনিয়া তিনি সন্তানদিগকে পড়াইতেন। সুবোধানন্দ মহারাজ বলিতেন, "ছেলেবেলায় সাধুদের জীবন-চরিত বেশি পড়তুম, দেখতুম কেমন করে কার জীবনের গতি ফিরে গেল।" ভক্তিমতী মাতা নয়নতারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সন্তানদিগকে পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেন ও ধর্মে উৎসাহ দিতেন। সম্ভবত ইহারই ফলে সুবোধানন্দ শেষ বয়সেও বেলুড় মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় দীর্ঘকাল অধ্যাত্মরামায়ণাদি পাঠে নিরত থাকিতেন এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, "বেশ একটা সদ্ভাব নিয়ে থাকা যায়।"

স্বামী সুবোধানন্দের পিতৃদত্ত নাম সুবোধচন্দ্র ঘোষ। বয়সে তিনি অনেকেরই কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গুরুভ্রাতাদের নিকট তাঁহার আদরের নাম ছিল খোকা; শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'খোকা মহারাজ' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার গর্ভধারিণীর বিশ্বাস ছিল যে, দেবতার আশীর্বাদরূপেই এই পুত্রটি তাঁহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছে, এইজন্য তিনি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকিতেন। সুবোধের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর (২৩ কার্তিক, ১২৭৪),শুক্রবার, চান্দ্র কার্তিক শুক্লা দ্বাদশীতে রাত্রি সাড়ে দশটায়। তাঁহার জন্মের পূর্বে কলকাতায় প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল বলিয়া বাড়িতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ঝড়ো' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন।

শৈশব হইতেই সুবোধের প্রতি আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা সরলতা ও তেজপূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ পাইত, যাহা সমবয়স্ক ও গুরুজনদিগের চিত্ত সহজেই জয়

করিত। অধিকন্তু ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বীয় মেধার জন্য শিক্ষকদিগের প্রশংসা অর্জনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনান্তে তিনি এ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন; পরে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি দেখা গিয়াছিল।

এই সময়ে সুবোধের পিতা তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন এবং কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের কিরূপে মিলন হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করেন। কেশবের পত্রিকা পড়িয়াও সুবোধ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারেন। পরে পিতার আনীত পুস্তকাবলীর মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্তের প্রণীত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামক পুস্তক-পাঠান্তে ঐ মহাপুরুষকে দর্শনের আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হওয়ায় তিনি পিতাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। পিতা সম্মত হইলেন, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। সুবোধের কিন্তু বিলম্ব অসহ্য; সুতরাং সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের রথযাত্রার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে একযোগে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।[১] পথ উভয়েরই অজ্ঞাত; অতএব গন্তব্যস্থান অতিক্রমপূর্বক আড়িয়াদহে আসিয়া জানিলেন যে, পুনঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে হইবে। নগরনিবাসী সুবোধের এই প্রথম পল্লিগ্রাম ও ধান্যক্ষেত্রের সহিত পরিচয়। ইহাতে আনন্দ-প্রাচুর্য থাকিলেও বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া পিতামাতার উদ্বেগ ও ক্রোধবৃদ্ধির ভয়ে সুবোধ বলিলেন, "ক্ষীরোদ, চল ফিরে যাই; বেলা দুপুর হলো রাত হবার আগে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।" কিন্তু ক্ষীরোদ ধৈর্য ধরিতে বলিলেন এবং তাঁহারা শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগত সুবোধ ক্ষীরোদকে আগে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ক্ষীরোদ প্রবেশান্তে প্রণাম করিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছ?" ক্ষীরোদ কহিলেন, "কলকাতা থেকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না।" সুবোধ নিকটে যাইয়া পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ইহার পরবর্তী ঘটনা স্বামী সুবোধানন্দের ২৩।৬।২৫ তারিখের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে—"ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত লোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন; বলিলেন—তুই এখানকার; কাপড়ে কি আসে যায়! পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনা-আপনি হাসিতে লাগিলেন।

১ আমরা 'শ্রীশ্রীস্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র'-অবলম্বনে ইহা লিখিলাম। 'কথামৃতের' মতে (৪র্থ ভাগ, ২৯১ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা; ১ ভাগ, ৬ পৃষ্ঠা) খোকা মহারাজ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন।

আরও কত কথা হইল। ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন, 'তুই এখানকার', তার মানে আমি তাঁর।...আমি একজনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি; অন্য লোক উপলক্ষ্য মাত্র। যার জিনিস, যার লোক—সে-ই টানিয়া লয়।" সেদিন ঠাকুর সুবোধকে বলিয়াছিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদের ৺সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি। তুই তখন জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি, জানতুম। যাদের হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।" সুবোধ জানিতে চাহিলেন যে, তিনি যদি তথাকারই হন, তবে মা আরও আগে আনিলেন না কেন? ঠাকুর কহিলেন, "দেখ, সময় না হলে হয় না।" অতঃপর সুবোধ ও ক্ষীরোদ বিদায় চাহিলে ঠাকুর শনি কি মঙ্গলবারে আসিতে বলিয়া দিলেন।

পরবর্তী শনিবারে সুবোধ ও ক্ষীরোদ পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলে স্বকক্ষে ভক্তসহ উপবিষ্ট ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইঙ্গিতে বাহিরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে লইয়া গেলেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ সেখানে তাঁহার উপদেশানুসারে সুখোপবিষ্ট হইলে ঠাকুর সুবোধের বুকে ও মুখে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং অতঃপর জিহ্বায় মন্ত্রবিশেষ লিখিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানে বসিয়া সুবোধের মনে হইল, যেন মেরুদণ্ড অবলম্বনে কি একটা তাঁহার মাথায় উঠিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞালোপ করিতেছে। ক্রমে তিনি দেখিলেন, ঠাকুর নাই—তৎস্থলে রহিয়াছে বহু দেবদেবীর মূর্তি; আবার ইঁহাদের মধ্যে কখনও কখনও ঠাকুরের মূর্তিরও প্রকাশ হইতেছে। অবশেষে সমস্তই অসীমে বিলীন হইয়া এক অপূর্ব আনন্দসাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মাথায় ও বুকে হাত বুলাইয়া ঠাকুর সুবোধকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং কহিলেন, "খুব কি ভয় হয়েছিল?" সুবোধ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "তুই কি বাড়িতে ধ্যান-ট্যান করতিস?" সুবোধ কহিলেন, "বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার বিষয় যা শুনেছিলাম, তাই একটু-আধটু ভাবতুম।" ঠাকুর বলিলেন, "তাই তোর এত শিগ্‌গির হলো।"

ইহার পর হইতে সুবোধ স্বীয় অধ্যাত্মজীবন পরিচালনের ভার শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে অর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিপ্রহরে ঘর্মাক্তকলেবরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুকে বীজন করিতে করিতে দেখিতেন যে, তাঁহার নিজের শ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে। কোন দিন বা সুবোধের দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শয্যায় বসাইয়া পাখা করিতে বলিতেন এবং পরমুহূর্তেই পার্শ্বে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া সুবোধকে বাতাস করিতেন—ইহা এক অদ্ভুত স্নেহসিক্ত লীলা। অন্যান্য সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে ক্রীড়া বা গল্পচ্ছলে জপ, ধ্যান, ব্রহ্মচর্য এবং

অন্য উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সুবোধের ভক্তি-বিশ্বাস কিরূপ বর্ধিত হইতেছে। সুবোধ ঠাকুরকে প্রথমে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর যখন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়?" তিনি বলিলেন, "লোকে কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় না। আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব বিশ্বাস করছি নি।" এতদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা ঠিক কবে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল জানা যায় না। তবে পূর্বোদ্ধৃত পত্রেই আছে, "তাঁরা (শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর) যদি ধরা না দেন, কার সাধ্য তাঁদের ধরতে পারে, কিংবা তাঁদের চিনতে পারে?... আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তই তাঁদের হাতে।" আর ২৫।২।২৮ তারিখের পত্রে আছে, "ঠাকুর আমাদের সকলের জন্য—ইহকাল ও পরকাল।"

বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে তিনি যখন যে ভাবেই অধিরূঢ় হইয়া থাকুন না কেন, শ্রীগুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা তাঁহার ধর্মজীবনের প্রারম্ভেই মুকুলিত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একবার যখন তাঁহাকে ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "ধ্যান-ট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলত—আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?" ঠাকুর তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলেন, "আচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই করতে হবে না; তুই দুবেলা একটু স্মরণমনন করে নিস।" এই সঙ্গে ছিল তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মীয়তাবোধজনিত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। ঠাকুর একদিন বলিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাস্টার আছে। সে এখানে আসে, বেশ লোক। তার কাছে যাস, আর এখানে মাঝে মাঝে আসিস।" সুবোধ দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁহার কাছে যাইবেন না; কারণ তিনি কি শিখাইবেন? তিনি শিখাইবার লোক হইলে নিজে ওরূপ এলোমেলো সংসার করিতেন না। তিনি সংসার ছাড়িয়া দিতেন। কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও রাখাল, শুনছিস খোকাশালা কি বলছে? ওরে, সে-কি আর নিজের বানানো কিছু বলবে? এখানকার কথাই সব বলবে।" অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ পালন পূর্বক তিনি মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং বিনা দ্বিধায় পূর্বধারণা পরিত্যাগপূর্বক মাস্টার মহাশয়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিলেন। নিরভিমান মাস্টার মহাশয় সব শুনিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন, "তাই তো, সমুদ্রে যায় লোকে—কেউ জালা নিয়ে, কেউ কলসী নিয়ে, কেউ ঘটি নিয়ে। যার যার পাত্র ভরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলের একটু একটু দেয়।... লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে ফেলেছি। ওমা, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম, সব বিদ্যা অবিদ্যা। যে বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিদ্যা-

অন্ধকার দূর হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। তাঁর একটি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হল—কি আশ্চর্য, এই বিদ্যা নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার!"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে আকৃষ্ট হইবার পর সুবোধ ভ্রূমধ্যে একটি জ্যোতি দর্শন করিতেন। তাঁহার মাতা উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তিনি যেন উহা কাহাকেও না বলেন। কিন্তু সুবোধ ইহাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ না দেখিয়া সহজভাবে কহিলেন, "এতে আমার কী অপকার হবে, মা? আমি তো এ আলোটা চাই না, আমি চাই আলোর মূল যে তাঁকে।"

ঠাকুরের নিকট তিনি ঈশ্বরদর্শন ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরে ৬।১২।২৬ তারিখে জনৈকা ভক্তিমতী শিষ্যাকে লিখিয়াছিলেন, "একবার আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কত পুস্তক পড়িয়াছি ও কত লোকের নিকট গল্প শুনিয়াছি; ঠাকুর-দেবতা দেখিতে পাওয়া যায় কি না?' তিনি বলিলেন, "যেমন দুই জনে এক সঙ্গে বসে গল্প করে, বেড়াইয়া বেড়ায়, এই রকম দেখিতে পায়। তবে ঠিক ঠিক অন্তরের সহিত ডাকিতে হয়। ঠাকুরকে কাঁদাকাটি করিয়া ডাকিতে হয়; তাঁর কাছে আবদার করিতে হয়—যেমন ছোট ছেলেমেয়ে মার কাছে কাঁদাকাটি করিয়া কোন জিনিসপত্র চায়, সেই রকম ডাকিতে হইবে। মন হইতে অন্য পাঁচরকম বাসনাকামনা সমস্তই তাড়াইতে হইবে—'শুধু আমার মা আছেন, আমি আছি'।" অন্যান্য বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন (২২।২।২৮ তারিখের পত্র)—"ঠাকুর বলিতেন, 'যাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধে কিছু হইবার, এখানকার হাবভাব তাহাদের সমস্তই ভাল লাগিবে।' আমি ঠাকুরের কাছে ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াছি।...ঠাকুর আরও বলিতেন, 'যার হেথায় আছে, তার সেথাও আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথাও নাই'।"

সরল সুবোধের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি দ্বিধাশূন্য-হৃদয়ে প্রশ্ন করিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরও বিরক্ত না হইয়া যথাযথ উত্তর দিতেন। এক সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের ঘরে কীর্তন জমিয়াছে। অনুপম রসমাধুর্যে বিভোর ভক্তবৃন্দের সেদিন অপূর্ব হাবভাব—কেহ অনুভূতিপ্রাচুর্যে আত্মহারা হইয়া উন্মাদপ্রায় ক্রন্দন করেন, কেহ আনন্দে তন্ময় হইয়া হাস্য করেন, কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া পুত্তলিকাপ্রায় স্তব্ধভাবে অবস্থান করেন, কেহ বা অর্ধবাহ্যদশায় ভক্তদের পদতলে লুটাইয়া চরণরজ গ্রহণ করেন। সুবোধও সে কীর্তনোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এরূপ ভাববিহ্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলেন; তাই ভক্তগণ চলিয়া গেলেও ঠাকুরকে প্রশ্ন করিবারই জন্য তিনি বসিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই এখনও বসে রইলি যে?" সুবোধ অমনি বলিয়া বসিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক

ভাব কার হয়েছিল?" ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "আজ লেটোরই (লাটু মহারাজের) ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে—আর সব অল্পস্বল্প।"

কণ্ঠরোগের নিরাময়ার্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন কাশীপুরে আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং চিকিৎসক, সেবক ও ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার আহারাদি সর্ববিষয়ে সতর্ক আছেন, তখন সরল সুবোধ একদিন পরমহংসদেবকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে স্যাঁৎসেঁতে ঘরে থাকতেন তাই আপনার গলা-ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান। আমাদের গলা-ব্যথা হলে আমরা চা খাই, আমাদের গলা-ব্যথা সেরে যায়।" ততোধিক সরল ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন, "তবে চা-ই খাই। ও রাখাল, এ বলছে চা খেলে নাকি গলা-ব্যথা সেরে যাবে।" রাখাল উত্তর দিলেন, "সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিস।" পরমহংসদেব অমনি কহিলেন, "না বাবু, তাহলে আবার উলটে গরম হয়ে যাবে।" আর সুবোধকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন, "ওরে, সইল না।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালভক্তদের অনেকেই গৃহত্যাগপূর্বক বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। সে আকর্ষণ সুবোধকেও নিশ্চয়ই চঞ্চল করিয়াছিল; কারণ বৈরাগ্য ছিল তাঁহার স্বভাবগত জিনিস। জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্বেই যখন তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন তিনি পিতাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। যদি বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়, তথাপি সংসারের দায়িত্ব লইয়া গৃহে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। পিতা অবশ্য ইহা ছেলেমানুষি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, "কেন বিয়ে করবি না? ভাল করে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে।" পিতা হয়তো এই কথা পাঠে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। সুবোধের ধারণা হইল যে, পাঠে উৎকর্ষ দেখাইলে এই অবাঞ্ছিত বিবাহ অনিবার্য হইয়া পড়িবে; কাজেই তিনি অতঃপর পাঠে অমনোযোগী হইলেন। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন; ঐ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যান। অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে সে কুমারবৈরাগ্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। বিশেষত ঠাকুরের দেহত্যাগে সংসার তাঁহার নিকট শূন্যপ্রায় প্রতিভাত হইল। অতএব ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পরে কোনও এক সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে ঠনঠনিয়ার ৺কালীমাতাকে প্রণাম করিলে তাঁহার মনে হইল, যেন বরাভয়করা জগদম্বা স্মিতহাস্যে বলিতেছেন, "ভয় কি? আমি তোর সঙ্গে আছি। তোর কোন ভয় নাই।"

এই পরিব্রাজক-জীবনের বিবরণ তিনি একখানি পত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন, "আমি যখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, মন কি করিয়া স্থির করিব। সেইজন্য টাকা-পয়সা হাতে না রাখিয়া হাঁটিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলাম। রাস্তায় কিংবা অন্য জায়গায় যদি কথাবার্তা হইত, শুধু ধর্মসম্বন্ধে। সুতরাং মনে বাজে কোন রকম চিন্তা আসিতে পারিত না; কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই। কখনও গাছতলায়, কখনও কোন নদীর ধারে, কখনও ফাঁকা ময়দানে—এই রকম রাত্রি কাটিত। দুপুর বেলায় ভিক্ষা যাহা মিলিত, খাইতাম। বৃষ্টি পড়িলে ভিজা কাপড় গায়ে শুকাইত। জামা, জুতা, ছাতি কিছুই ব্যবহার করিতাম না। সুতরাং এ অবস্থায় কোন রকম রিপু আর প্রশ্রয় পাইত না।"

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে তিনি ক্রমে কাশীধামে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্নান এবং ৺অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—আত্মীয়-স্বজন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া স্বগৃহে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু মন যাঁহার গৃহছাড়া, গৃহ তাঁহাকে বাঁধিবে কিরূপে? অতএব কিয়ৎকাল পরেই সুবোধ বরাহনগর মঠে যোগদানপূর্বক সন্ন্যাসী হইলেন।

স্বামী সুবোধানন্দ বরাহনগরে কিয়ৎকাল অবস্থানান্তর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শন ও তপস্যায় নির্গত হন। ইহা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজের সহিত বৃন্দাবনে কিয়ৎকাল তপশ্চর্যার পর তিনি ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনে নির্গত হন। অতঃপর কিছুদিন হিমালয়ে কাটাইয়া মঠে আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্যটনে নিষ্ক্রান্ত হন। এই তীর্থদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদির সহিত সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ধর্মপ্রসঙ্গমধ্যে ঐগুলির সন্নিবেশ করিয়া উহা অতীব চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন।

তাঁহার তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের দুই-একটি চমকপ্রদ ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে। একবার তিনি ভাদ্রমাসে ফল্গুনদী পার হইতেছিলেন। নদীতে তখন কোমর জল। একজন পার হইল দেখিয়া তিনিও অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে আর এক ব্যক্তি চলিলেন। স্বামী সুবোধানন্দ সন্তরণপটু নহেন। নদী অতিক্রমের সময় অকস্মাৎ জলবৃদ্ধিনিবন্ধন তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি পশ্চাদবর্তী ব্যক্তিকে গুরুভ্রাতাদের নিকট সংবাদপ্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "এই নাও, ঠাকুর, শেষ প্রণাম।" ততক্ষণে তিনি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু পরে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে টানিয়া নিরাপদ স্থলে উপস্থিত করিয়াছে।

আর একবার হরিদ্বারে তপস্যার সময় তিনি দুইমাস জ্বরে ভুগিতেছেন। একদিন এমন হইয়াছে যে, কমণ্ডলুটি ধরিয়া জল খাইবেন এমন সামর্থ্যও নাই—কমণ্ডলু ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। তাই অভিমানভরে ঠাকুরকে বলিলেন, "তাই তো এমন ভুগছি।—এমন কেউ নেই যে, একটু খোঁজখবর করে।" ক্ষীণদেহে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, "কি চাস? লোকজন চাস না টাকা-পয়সা চাস?" সুবোধানন্দ বলিলেন, "কিছুই চাই না। শরীর থাকলে রোগ হবেই; কিন্তু তোমায় যেন না ভুলি।" পরদিন হইতে এক সাধু তাঁহার দেখাশোনা করিতে লাগিলেন; অপর এক সাধুর নিকট পঞ্চাশ টাকার মানিঅর্ডার আসিলে তিনি উহা তাঁহার সেবার জন্য দান করিলেন। স্বামী সুবোধানন্দ উভয় সাহায্যই প্রত্যাখ্যান করিলেও সাধুদ্বয় তাঁহাদের সঙ্কল্প ছাড়িলেন না ('উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৩৯)। রোগ যন্ত্রণামধ্যে এইরূপ অলৌকিক দর্শন তাঁহার জীবনে বিরল নহে। প্রসঙ্গক্রমে জানা যায় যে, তিনি যখন জামতাড়া আশ্রমে আমাশয়রোগে ভুগিতেছিলেন, তখনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও মহারাজ প্রভৃতির দর্শন পাইয়া পার্শ্বস্থ সেবককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীর আর কিছুকাল থাকিবে ('উদ্বোধন', আষাঢ়, ১৩৪৫)। যাহা হউক, উত্তর ও দক্ষিণে পরিব্রাজক-জীবন সমাপনান্তে তিনি ইং ১৮৯৮ সনের ২৩ মার্চ মাদ্রাজ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

ইতোমধ্যে স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নবযুগের নবমন্ত্র-প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। আলমবাজার মঠে বক্তৃতা-শিক্ষার জন্য তখন প্রতিসপ্তাহে অধিবেশন হইত এবং সন্ন্যাসীদিগকে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতে হইত। স্বামী সুবোধানন্দ তখন মঠে ছিলেন। একদিন তাঁহার পালা আসিলে তিনি অব্যাহতি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মত পরিবর্তিত না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া কম্পিতহৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একি! পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আর দূরে ঐ শঙ্খধ্বনিই বা উত্থিত হইল কেন? ক্রমে পুষ্করিণীর জল পর্যন্ত তীর অতিক্রম করিয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ততক্ষণ কাহারও বুঝিতে বাকি ছিল না যে, ইহা প্রচণ্ড ভূমিকম্প (১২ জুন, ১৮৯৭)। সভা ভাঙ্গিয়া গেল এবং খোকা মহারাজ নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইহাতেও গুরুভ্রাতারা আনন্দোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কম্পান্তে স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, "খোকার বক্তৃতায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।" সে মন্তব্যে খোকা মহারাজ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল হইলেন।

স্বামীজী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহাকে লইয়া কৌতুকাদিও করিতেন। সরল খোকা মহারাজেরও স্বামীজীর সহিত ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ দেখা

যাইত না। স্বামীজীকে গম্ভীর, চিন্তান্বিত কিংবা বিরক্ত দেখিলে তাঁহার নিকট অপরে অগ্রসর হইতে না পারিলেও খোকা মহারাজ নিঃসঙ্কোচে যাইতেন এবং স্নেহপাত্রের সন্দর্শনে স্বামীজীর ভাবও সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইত। অতএব বয়োজ্যেষ্ঠেরা অনেকক্ষেত্রে 'খোকার' সাহায্যে কার্যোদ্ধার করিতেন।

একবার খোকা মহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্বামীজী বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "এমন বর দিন যাতে কোন দিন আমার সকালের চা বাদ না পড়ে।" স্বামীজী ইহাতে সহাস্যে কহিলেন, "তাই হবে।" সে অমোঘ বর নিষ্ফল হয় নাই। চা-এর প্রতি তাঁহার একটা সহজাত প্রীতি ছিল—ইহা যেন ক্ষুদ্র শিশুর লজেন্স প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণেরই অনুরূপ; আর এই ভালবাসা তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। চা ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বরোগহর মহৌষধি সদৃশ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ঠাকুরকে পর্যন্ত তিনি চা খাওয়াইতে চাহিয়াছিলেন। কোন বিলাস-দ্রব্য তিনি চাহিতেন না; কিন্তু চা না হইলে তাঁহার চলিত না।

মঠে অবস্থানকালেও খোকা মহারাজ প্রায়ই তীর্থভ্রমণাদিতে নির্গত হইতেন। আলমোড়া হইতে তাঁহার লিখিত ১০।৮।৯৯ তারিখের পত্রে জানা যায়, "পুনরায় কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে এবং পাহাড়ে (মায়াবতীতে) আমাদের যে মঠ আছে, সেখানেও গিয়াছিলাম।" ঐ বৎসর ২৫ অক্টোবর তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবৎসর স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত তিনি নবদ্বীপে যান এবং সম্ভবত উহার পরে দার্জিলিং-এ গমনান্তে তথা হইতে ৺কামাখ্যা দর্শন করিয়া আসেন। পুরাতন পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভবত কালাজ্বরের প্রতিকারকল্পেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের পর অপর গুরুভ্রাতাদের ন্যায় স্বামী সুবোধানন্দও নবপরিকল্পিত কার্যধারার সাহায্য করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ডিড সম্পাদন করিয়া স্বামীজী যে একাদশজন গুরুভ্রাতাকে[১] ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন, স্বামী সুবোধানন্দও তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিশিষ্ট অঙ্গরূপে তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হইত—

> **"মন করো না কাজে হেলা;**
> **সঙ্গী জোটে বা না জোটে—একাই করো মেলা।"**

তাঁহার ২১।৮।২৫ তারিখের পত্রেও আছে, "সৎকর্ম করিতে কখনও পেছপা

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অখণ্ডানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ।

হইবে না। ভাল কাজের বাধা বিঘ্ন অনেক। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করা ভাল। মনের মতো সঙ্গী জোটে ভাল, না জোটে একলাই ভাল। যাহার মন সন্দেহপূর্ণ, তাহার দ্বারা ভাল কাজ হইবার আশা নাই।" শুধু কথায় নহে, কার্যেও শ্রীভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন সৎকার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

পরদুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন; কারণ তাঁহার কথাই ছিল এই— "লোকের আপদে-বিপদে একটু দেখা ভাল!" ১৯০৮-৯ খ্রিস্টাব্দে চিল্কাহ্রদ-অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ ও ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের সহিত তথায় গিয়া সেবাকার্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময় কোঠার হইতে একটি দুঃস্থ বালককে কলকাতায় আনিয়া তাহার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে বেলুড়ের একটি নিঃস্ব পরিবার তাঁহার নিয়মিত সাহায্যে অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বস্তুত আর্তের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে সহজেই আঘাত দিয়া উহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিত।

রোগশয্যা-পার্শ্বে তাঁহার আবির্ভাব প্রায়ই হইত এবং রোগীও তাঁহার দর্শনে অশেষ সান্ত্বনা পাইত। এই বিষয়ে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পাচক-ভৃত্য কেহই বঞ্চিত হইত না; তাহাদের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থার জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর হইয়া থকিতেন। একবার এক যুবক ছাত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অপর সকলে যখন প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া গেল, তখন খোকা মহারাজ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সযত্নে সেবাদিদ্বারা তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের জন্য তিনি অপরের নিকট ভিক্ষার্থী হইতেন। বেলুড় গ্রামের অনেকে চাল ও অর্থাদির জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী থাকিত। ভক্তদের অসুখের সময়ও তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিতেন।

তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনদর্শনে সহসা কেহ তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইত না। ইহাতে লাভ ছিল এই যে, সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত এবং নিজ নিজ জাগতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদলাভে চরিতার্থ হইত। অথচ স্বীয় অধ্যাত্মশক্তি-গোপনের কোন বৃথা প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনে ছিল না। তাই সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যেও অধ্যাত্মস্তরের যে দ্যোতনা আপনা হইতেই স্ফুরিত হইত তাহাতেই আগন্তুকগণ ধন্য হইত। ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে, এইরূপ উচ্চশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ কিরূপে বালক-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই সহিত সমভাবে মিশিতে পারিতেন—তখনকার মতো বয়স, বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্যাদি যেন মুছিয়া যাইত।

মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার এক প্রধান কার্য ছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত উদ্যানের তত্ত্বাবধান করা। অধিকন্তু অন্যান্য কর্মেও তাঁহাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। কখনও তিনি হয়তো অখণ্ডানন্দজীর সহিত ঠাকুরপূজার জন্য নাগেশ্বর চাঁপার সন্ধানে ফিরিতেন, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের আয়োজনে ঘুরিতেন, কখনও রুগ্‌ণ গুরুভ্রাতাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, আবার কখনও এটোয়ায় যাইয়া গুরুভ্রাতা হরিপ্রসন্নকে (বিজ্ঞানানন্দজীকে) মঠের অবস্থা বুঝাইয়া অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

উত্তরকালেও মঠের সর্ববিধ বিভাগের সহিত তাঁহার একটা প্রাণের সংযোগ ছিল। একদিন অপরাহ্নে দেখা গেল, তিনি একটা বালতি লইয়া হন হন করিয়া চলিয়াছেন, উহাতে আছে কিছু নারিকেলছোবড়া, পাটের দড়ি ও একখানি ছুরি। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) অনেক কষ্ট করে নানা জায়গা থেকে এইসব গাছ যোগাড় করেছেন। কলম করে এদের চারা রাখলে, নানা জায়গায় বসানো যাবে। এই সব গাছ যদি মরেও যায়, তাদের কলমগুলি থাকবে।" কলম তিনি স্বহস্তে বাঁধিতেন এবং তজ্জন্য অনেক সময় গাছেও উঠিতেন। বয়স তাঁহার তখন ষাটের উপর।

তাঁহার কর্মজীবনে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, তিনি সর্বদা আপনাকে 'খোকা' বলিয়াই ভাবিতেন এবং সকলের সহিত তদনুরূপ অকপট ও নিরভিমান ব্যবহার করিতেন; আর তাঁহার প্রত্যেক আচরণের সহিত মিশ্রিত থাকিত একটা হৃদয়স্পর্শী সরসতা। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সমুদয় কার্য নিজেই করিতেন—অপর কেহ সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেও সরিয়া দাঁড়াইতেন না। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার অন্যথা হইত। একদিন অন্যত্র বস্ত্রাদিতে সাবান দেওয়ার পরে উহা পুষ্করিণীতে ধুইতে গিয়া তিনি দেখেন, স্বল্পপরিসর ঘাটে একজন ব্রহ্মচারী সাবান দিয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে। তাই তিনি ব্রহ্মচারীকে স্বীয় কাপড়গুলিও ধুইয়া দিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি রেখে যান, আমি ধুয়ে দেব।" কিন্তু খোকা মহারাজ বলিলেন, "না হে, আমি নিজেই ধুতে পারতাম; কিন্তু তুমি কাপড়ে সাবান দিয়েছ। আমি ঘাটে নামতে গেলে তুমি পথ ছেড়ে দেবে; আর তার ফলে তোমার সাবান নষ্ট হবে, কাজও মাটি হবে। তাই তোমাকে ধুতে বলেছি। এখন তোমার কাছে কাপড় ফেলে গেলে তুমি গেরুয়া রঙ করা প্রভৃতিরও ভার নেবে—আমি তা চাই না।"

তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে একটা স্বভাবসুলভ ত্যাগের ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার পায়ে চটি ভিন্ন কিছু দেখা যাইত না; একটি গেঞ্জি গায়ে

দিয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন; পরনের কাপড় দুই-চারিখানি মাত্র থাকিত। ময়লা হইলে বস্ত্রাদি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। কোথাও যাইতে হইলে এই সামান্য পোশাকের উপর একটি জামা ও চাদর শোভা পাইত। শয্যাও ছিল অনুরূপ অতি সামান্য। কিন্তু মুখখানি ছিল তাঁহার সদা হাস্যময় ও সারল্যমণ্ডিত।

খোকা মহারাজের ছেলেমানুষির একটি দৃষ্টান্ত এই—তিনি নৌকায় উঠিতেন না, পাছে উহা জলমগ্ন হয়। অতএব পূর্বতীরবর্তী কলকাতার কোনও স্থানে যাইতে হইলে শালকিয়া পর্যন্ত পদব্রজে যাইয়া ট্রামে উঠিতেন এবং ঐভাবেই প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিতে হইত; কিন্তু পরিশ্রমে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বৃদ্ধকালে তাঁহার মঠপ্রীতি বহুভাবে প্রকটিত হইত। তিনি বলিতেন, "শাকভাত খেয়ে মঠে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।" স্বামীজীর সমাধিস্থল ও বেলতলার প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ ছিল। অত্যন্ত দুর্বলশরীরেও তিনি একবার সেখানে ঘুরিয়া আসিতেন; আর স্বামীজী সম্বন্ধে বলিতেন, "ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজী হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিব।"

শেষ বয়সে তিনি মঠের দোতলায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর গৃহের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতেন। মহাপুরুষজীকে তিনি এতই সমীহ করিয়া চলিতেন যে, পাছে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন; মঠ হইতে স্বল্পক্ষণের জন্যও কোথাও যাইতে হইলে শুধু জানাইবার জন্য নহে, পরন্তু যথাবিধি মঠাধ্যক্ষের আদেশ গ্রহণার্থে তিনি মহাপুরুষজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন, কখন ফিরিবেন ইত্যাদি সমস্ত নিবেদন করিতেন এবং যেরূপ নির্দেশ পাইতেন, বিনা আপত্তিতে সেরূপ করিতেন; অধিকন্তু নিজে যাহা যেরূপ করিবেন বলিয়া যাইতেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে দিতেন না। মহাপুরুষজীও এই ছোট ভাইটিকে অতি স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সুখসুবিধাদি বিষয়ে সংবাদ রাখিতেন। একবার খোকা মহারাজের জ্বর হইয়াছে। মহাপুরুষজীর শরীর তখন ভাল নহে; তাই ডাক্তার আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছোঁড়াকে দেখেছ? ও কেমন আছে?" গৃহে সমবেত সকলে অবাক—কাহার কথা ইনি বলিতেছেন? অবশেষে তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া মহাপুরুষজী কহিলেন, "ঐ যে পাশের ঘরে আছে, খোকা ছোঁড়া। ও নেহাত খোকা। নিজের শরীরের যত্ন নিতে পারে না। ওকে দেখে পথ্যাদি সম্বন্ধে ভাল করে বলে যেও।" খোকা মহারাজের বয়স তখন একষট্টি; সুতরাং মহাপুরুষজীর কথার রকম দেখিয়া কেহ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। খোকা মহারাজ কিন্তু সবই শুনিয়াছিলেন;

অতএব ডাক্তার উপস্থিত হওয়ামাত্র সুবোধ বালকের মতো ডাক্তারকে বলিলেন যে, তিনি যেন মহাপুরুষজীর কথানুসারেই পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনও বক্তব্য নাই।

পরিণত বয়সেও তিনি দীক্ষা দিতেন না; দীক্ষার্থী আসিলে বলিতেন, "আমি কি জানি? আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে নিও—তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উঁচু।" শ্রীশ্রীমা অবশ্য বলিয়াছিলেন, "খোকা কেন মন্ত্র দেয় না? যে কদিন তাঁর (ঠাকুরের) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।" তথাপি খোকা মহারাজ সহজে স্বীকৃত হন নাই। তবে অতি আগ্রহবান কেহ ধরিয়া বসিলে বিরল স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। এইরূপে ১৯১৫-১৬ খ্রিঃ হইতে দুই-চারিটি ক্ষেত্রে হৃদয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে দিতে সম্মত ছিলেন না। এমন কি, ইহারও অনেক পরে দীক্ষার্থী আসিলে শিবানন্দজী বা সারদানন্দজীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন; তাঁহারা তাঁহাকেই দীক্ষা দিতে বলিলেও ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া বা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া পড়িতেন। অবশেষে শিবানন্দজী মঠাধ্যক্ষ হইবার পরে খোকা মহারাজ যেবারে পূর্ববঙ্গে যান (১৯২৫), সেবারে শিবানন্দজী বলিয়া দিলেন, "ও অঞ্চলের লোকেরা ঠাকুরের নাম শুনবার জন্য লালায়িত—খুব নাম দেবে; লোকদের বঞ্চিত করো না।" অধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া খোকা মহারাজ পূর্ববঙ্গের প্রার্থীদিগকে মুক্তহস্তে কৃপা করিয়া যখন মঠে ফিরিলেন, তখন একটি অল্পবয়স্ক বালক দীক্ষিত হইয়াছে জানিয়া মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট ছেলেরা ধ্যান-জপ করবে কি করে?" খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, "আপনি আদেশ দিয়েছেন, তাই তাদের বঞ্চিত করিনি।"

দীক্ষা-দানকালেও তিনি আপনাকে গুরু মনে করিতে পারিতেন না। দীক্ষার্থীকে প্রথমে বিরত করিবার জন্য বলিতেন, "বাবা, আমি মূর্খ, জানি না। মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না—ভয় হবে দেখলে।" অনেক আকুতি-মিনতির ফলে দীক্ষালাভে সমর্থা কোন শিষ্যা হয়তো বলিলেন, "মহারাজ, আমি গায়ত্রী জানি না, আহ্নিক জানি না, স্তব জানি না। লোকে ন্যাস করে, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা করে। আমায় সব বলুন।" অকপট খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, "মায়ী, আমি ওসব কিছুই জানি না—আমি যে খোকা! তবে আমি যা পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি। শুধু ধ্যান, জপ, মনঃসংযম করে যাও।"

পূর্বে তিনি মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বলা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসে, তুমি বলবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে

চল তবে তারা কার কাছে যাবে? এরা ৺জগদম্বার রূপ, মা ও মেয়ের মতো এদের সঙ্গে মিশবে।" তদবধি তিনি এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা উদারতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং মাতা অথবা কন্যাজ্ঞানেই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বা পত্রবিনিময় করিতেন। মহিলাদিগকে লিখিত তাঁহার প্রতিপত্রের আরম্ভে থাকিত মধুর 'মায়ী' সম্বোধন।

কাজে ছিল তাঁহার অতীব সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। মঠবাটির দ্বিতলে স্বামীজীর ঘরের পার্শ্বে যখন তিনি থাকিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অবতরণপূর্বক মঠভবন হইতে অতিথিশালা পর্যন্ত গঙ্গার তীরে কয়েকবার পদচারণ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্টা পড়িতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তিনি ভাঁড়ারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেদিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে; অমনি বলিলেন, "ঠাকুর রাক্ষসী বেলায়—বারোটার পরে—খেতে ভালবাসতেন না। তাঁকে ঠিক সময়ে ভাতেভাত্ যা কিছু হয় দিয়ে তার পর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করলেই পার।"

নবাগত ব্রহ্মচারীরাও তাঁহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিত। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন, প্রয়োজনস্থলে তাহাদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতেন এবং সাধ্যানুসারে অসুবিধাদির প্রতিবিধান করিতেন। একবার এক ব্রহ্মচারীকে তাহার অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয় যে, তাঁহাকে মঠের বাহিরে থাকিয়া ভিক্ষান্নে উদর-পালন করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী ভিক্ষায় যাইয়া শুধু দুইটি ডালভাজা ছাড়া আর কিছুই পাইল না। অভুক্ত অবস্থায় সে মঠের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল; কিন্তু দ্বার অতিক্রম করিতে সাহসে কুলাইল না। খোকা মহারাজ সব জানিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন এবং ঐরূপে তাহাকে পুনঃ মঠে লইয়া আসিলেন। নবাগতদের উপর বহু কর্তব্য ন্যস্ত হইত। কিন্তু সেরূপ কার্যে অনভ্যস্ত অনেকের পক্ষে উহা এক সমস্যা হইয়া পড়িত। তখন খোকা মহারাজ সস্নেহে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের জন্য পান-সাজা, তামাক-সাজা, তরকারি-কোটা ইত্যাদি শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, সমস্ত মঠটি ঠাকুরের এবং সমস্ত কার্যই তাঁহার সেবা।

আহারবিহার বা সাজসজ্জাদি বিষয়ে প্রয়োজন তাঁহার অল্পই ছিল; অতএব কাহারও নিকট তিনি কিছু চাহিতেন না; অযাচিতভাবে যাহা আসিয়া পড়িত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। আহারকালে পাত্রে যাহা পড়িত তাহাই সানন্দে খাইতেন। এই অস্পৃহার সঙ্গে আবার ছিল তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা। এই বিষয়ে তাঁহার মুখে প্রায়ই গীতাভাগবতের টীকাকার পরম ভক্ত শ্রীধর স্বামীর জীবনের এই ঘটনাটি শোনা যাইত ঃ

একটি সন্তান প্রসবান্তে শ্রীধরগৃহিণী গতাসু হইলে শ্রীধরের মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল; অথচ তাঁহার ভাবনা হইল সদ্যোজাত শিশুকে পালন করিবে কে? অতএব সঙ্কল্প আপাতত গোপন রাখিয়া সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেন। কিন্তু অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্যার অন্ত নাই—একটির পর একটি জটিলতার আবির্ভাবে তাঁহার সঙ্কল্প চিরপ্রতিহত হইতে বসিয়াছে। শ্রীধর চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি টিকটিকির ডিম পড়িয়া ফাটিয়া গেল এবং উহা হইতে এক শাবক নির্গত হইল। তখনই একটি পোকা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইল আর সেও তাহা গলাধঃকরণ করিল। তদ্দর্শনে শ্রীধরের অনুভূতি হইল যে, সৃষ্টির পশ্চাতে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং জন্মের পূর্ব হইতে ভগবান সকলের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। দুশ্চিন্তানির্মুক্ত শ্রীধর তখনই সংসার ছাড়িয়া চলিলেন।

খোকা মহারাজের পূর্বাশ্রমের অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল। একবার তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পত্তির আয়ের একটা অংশ খোকা মহারাজকে দিবেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী, আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ঐ টাকা দিয়ে সাধু-গরিব-দুঃখীর সেবা করো।"

সুবোধানন্দজীর জীবনাপরাহ্ণ ব্যয়িত হইয়াছিল জনসাধারণকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনাইতে এবং বিশেষ আগ্রহবান ভক্তদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে। ভগবৎ-প্রেরণায় অঙ্গীকৃত এই কঠিন বর্ত্মে চলিয়া তাঁহাকে উৎসবাদি উপলক্ষে পূর্বভারতের বহু স্থানে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেবাবুদ্ধিতে বহু প্রাণে শান্তিবারি-সিঞ্চনব্যপদেশে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে প্রায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ হইতেই এই কর্মধারার সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসরের শেষে তিনি রাঁচিতে যাইয়া প্রায় চারি মাস ছিলেন। অতঃপর কাশী হইয়া মঠে ফিরেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের শেষেও তিনি রাঁচিতে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ের একখানি পত্রে (২১।৯।১৬) আছে—"সন্ধ্যা থেকে রাত্রি আটটা অবধি শরৎবাবুর (শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তীর) বাসায় ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, যেমন তোমাদের বৈঠকখানায় হইত।" এইবারে তিনি মিহিজাম হইয়া মঠে ফিরেন। ইহার পরেও তিনি অনেক বার রাঁচি গিয়াছিলেন। বস্তুত রাঁচির সহিত তাঁহার একটা বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্তু সুযোগ বুঝিয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কাশী, ভুবনেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানেও যাইতেন।

জীবনসন্ধ্যার কয় বৎসর পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ঐ অঞ্চলে গিয়া কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। ১৯২৫

খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে ঢাকা যাইবার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ বৎসরের শেষে তিনি পাঁচজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে লইয়া ঢাকা হইতে বালিয়াটী গ্রামে গিয়াছিলেন। পরবৎসর জানুয়ারি মাসে তিনি সোনারগাঁ গ্রামে যান এবং মার্চ মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন।

অধিক পরিশ্রম ও অনিয়মাদির জন্য এই সময় হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সোনারগাঁ হইতে তিনি ৩১।১।২৬ তারিখে লিখিতেছেন, "শরীর ভাল নহে।" ইহারই পরে ২১।৩।২৬ তারিখে বেলুড় হইতে লিখিতেছেন, "পূর্বাপেক্ষা আমার শরীর ভাল, এখন দুইবেলা ভাত খাই। ডায়াবেটিস, পরে আমাশয় হইয়াছিল। তাহাও সারিয়াছে। শারীরিক দুর্বলতা আছে।...আমার অসুখের কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম। এমন কি, একটু বেড়াইবার সময় পাইতাম না। স্নান, আহার ও রাত্রে নিদ্রা—সেই সময় বিশ্রাম। সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া শোনানো—মেয়ে-পুরুষ সমানভাবে দলে দলে অনেকে আসিত।" পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকি নাই যে, এরূপ পরিশ্রমের পরিণতি কোথায়? কিন্তু খোকা মহারাজের কার্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—এখন বিশ্রামের অবকাশ নাই। সুতরাং পরিণাম জানিয়াও তিনি আরব্ধকার্য সমাপনেই নিরত রহিলেন। একদিকে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে অসুস্থ শরীরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে গতায়াত হইতে থাকিল, অন্যদিকে তেমনি চলিতে লাগিল দীক্ষা ও উপদেশদান—বঞ্চিত কেহ হইল না। ইহারই মধ্যে ১৯২৭-এর দ্বিতীয় পাদে কাশীতে একবার জ্বর ও পৃষ্ঠে ব্যথার দরুন কিছুদিন শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে ভাল-মন্দ লইয়াই শরীর চলিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, মূল রোগ ক্রমেই দেহকে দুর্বলতর ও কৃশতর করিয়া ফেলিতেছে। অতএব অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া আয়ুর্বেদমতে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা আরম্ভ হইল এবং কিছুদিন উহাতে বেশ সুফলও দেখা গেল। কিন্তু ১৯২৯-এ পুনর্বার আমাশয়ের আবির্ভাব হওয়ায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য তিনি রথযাত্রার পরে ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন।

এবারে ভুবনেশ্বর হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়াই ফিরিলেন এবং কিছুকাল মঠে বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু ১৯৩০-এর শেষভাগে তাঁহার শরীর-বিশেষ অসুস্থ হইল এবং ১৯৩১ এর প্রারম্ভ হইতে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিল। সব বুঝিয়াও তিনি নির্বিকার চিত্তে লিখিলেন (৫।২।৩১), "আরও কতদিন এই

শরীরের দ্বারা কাজ করাবেন, তিনিই জানেন। শরীর থাক বা যাক—আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।" ইহারই আড়াই মাস পরে (১৮।৪।৩১) তিনি পুনঃ লিখিলেন, "গত শনিবার হইতে আমার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।" বেলুড়ে রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে একবার জামতাড়ায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি অন্তরে আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনও পাইয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার আমাশয় সারিয়া যায়। কিন্তু ক্ষয়রোগের অবনতি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে বেলুড়ে লইয়া আসা হয়।

দিন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, খোকা মহারাজ ততই যেন অন্তরে ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন—একেবারে মায়ামুক্ত পুরুষ! মহাসমাধির কিয়দ্দিবস পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষ (শিবানন্দজী) বলেছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আরো অনেক দিন থাক।' আমার কিন্তু আর থাকতে ইচ্ছা হয় না। সেদিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখছিলুম, দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ—এঁদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁরা বললেন, 'বসো বসো।' আমি বললুম—'না, আগে বল স্বামীজী কোথায়?' ওঁরা বললেন,'তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন।' 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁর কাছে'—এই বলে রওনা হলুম। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দনগরে তাঁরা বাস কচ্ছেন, মহা আনন্দে আছেন সব। সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এখানে—এই পৃথিবীতে।" এই কষ্টবোধ অবশ্য তাঁহার অল্পই ছিল। কারণ তিনি বলিতেন, "তাঁর কথা যখন স্মরণ করি তখন সব দেহযন্ত্রণা ভুলে যাই।" আর সে স্মরণ-মনন অবিরাম চলিত। এই সময়ে তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে উপনিষৎ-পাঠ হইত। উহা শুনিতে শুনিতে ভগবৎপ্রেরণায় তিনি স্বতঃই বহু অধ্যাত্মানুভূতির কথা বলিতে থাকিতেন। এইরূপ এক মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "জগতে যতই সুখ থাকুক না কেন, সব একটা ছাই-এর গাদা বলে মনে হয়। এসবের জন্য মনে কোন আকর্ষণ নেই।" ফলত দেহরক্ষাকাল সমাগত জানিয়াও এই মায়ামুক্ত পুরুষপ্রবরের আচরণে কোনও উদ্বেগ দেখা গেল না; বরং মনে হইল, তিনি যেন প্রস্তুত হইয়াই আছেন। শেষক্ষণের পূর্বরাত্রে তিনি কহিলেন, "আমার এই শেষ প্রার্থনা—ঠাকুর চিরকাল সঙ্ঘে অধিষ্ঠিত থাকুন।" অনন্তর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর (১৩৩৯ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ) শুক্রবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে তিনি প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন।

# স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্ব নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়ায়। কর্মব্যপদেশে তিনি যখন এটোয়াতে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর, শুক্রবার (১৫ কার্তিক, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে) হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কাশীধামে পিতৃগৃহে থাকিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন; পরে (১৮৭৮?) বেলঘরিয়ায় আদি পিতৃগৃহে আসেন। তাঁহার পিতা ইংরেজ সরকারের কমিশারিয়েটে কাজ করিতেন; দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় (১৮৮১ খ্রিঃ) কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাল্যে পিতৃবিয়োগে হরিপ্রসন্ন বিশেষ কাতর হইলেও আত্মীয়স্বজনের যত্নে সান্ত্বনা লাভ করিয়া বেলঘরিয়া হইতে কলকাতায় ট্রেনে গমনাগমনপূর্বক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে রত থাকেন। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং উহার তিন বৎসর পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাস করেন। এই কলেজে স্বামী সারদানন্দ, কুমিল্লার বরদাসুন্দর পাল এবং 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

বি. এ. পড়িবার জন্য হরিপ্রসন্নকে পাটনায় যাইতে হইল। তথায় পাঠ শেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য তিনি পুনায় গমন করিলেন। পুনায় ব্যয়বাহুল্য ছিল না বলিয়া তখন অনেক বাঙালি ছাত্র তথায় মেসে অবস্থানপূর্বক অধ্যয়ন করিতেন। হরিপ্রসন্ন অপর ছয়টি ছাত্রের সহিত সেখানে থাকিয়া জ্যেষ্ঠতাতের প্রেরিত মাসিক পঁচিশ টাকায় ব্যয়নির্বাহ করিতেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার ধর্মভাব বিশেষ লক্ষিত হইত। তিনি প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিতেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ছাত্রগণ স্থির করেন যে, তাঁহারা নিজ প্রয়োজনে যখন যে পুস্তক বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিবেন তাহা মেসের অপর সকলেও ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং কেহ চলিয়া গেলে পরবর্তী ছাত্রদের জন্য উহা রাখিয়া যাইবেন।

বাল্যে তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন। একবার তাঁহার মাতা নকুলেশ্বরী দেবী তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতেও মাতার প্রত্যয় হইল না দেখিয়া ক্ষোভসহকারে কহিলেন, "আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই" এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলেন। মাতা ইহাতে ভীত হইয়া বলিলেন, "কি মহা অকল্যাণ করলি?" দৈবদুর্বিপাকে ইহার পরদিবসই পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তখন সদ্যোবিধবা মাতা দারুণ শোকে

বলিলেন, "তোর অভিশাপেই এমনটি হল।" আর এক ঘটনায় তাঁহার আস্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শুনিয়াছিলেন, বানর মৃত্যুকালে 'রাম' নাম করে। একদিন তিনি বাড়ির বাঁশঝাড়ের দিক হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, গুলিতে আহত এক বানর নিচে চিৎ হইয়া পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতেছে। তাঁহার মনে হইল, বানর সত্যই 'রাম'-নাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

পুনা কলেজের এই নিয়ম ছিল, যে দুই জন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা যথাক্রমে বোম্বাই ও ভারত সরকারের চাকরি পাইতেন, মেধাবী ছাত্র হরিপ্রসন্ন প্রথম না হউক অন্তত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী রাধিকাপ্রসাদ একান্ত দরিদ্র ও তাঁহার চাকরির বিশেষ প্রয়োজন আছে দেখিয়া হরিপ্রসন্ন তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আমি এ বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে আগামী বৎসর দেব।" রাধিকাপ্রসাদ দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করিতে পারিলেও হরিপ্রসন্নের সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহা স্মরণ রাখিয়া পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। পরবর্তী বৎসরের (১৮৯২) পরীক্ষায় হরিপ্রসন্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম না হইবার কারণস্বরূপে জানা যায় যে, তাঁহাদের কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক একজন খ্রিস্টান পাদ্রী হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতে বেশ পটু ছিলেন। একদিন তিনি জন্মান্তরবাদের বিদ্রূপ করিলে হরিপ্রসন্ন সমুচিত উত্তর দিলেন। ইহাতে অধ্যাপক নিরস্ত হইলেন; কিন্তু ছাত্রের এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইলেন প্রশ্নোত্তরপরীক্ষার কালে। ভূতত্ত্বে কম নম্বর পাইয়া হরিপ্রসন্নকে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করিতে হইল।

বাল্যে বেলঘরিয়ায় পিতৃগৃহে বাসকালেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইদিন বিকালে চারিটার সময় তিনি সমবয়স্কদের সহিত এক পরিচিত বালকের বাটিতে খেলা করিতেছেন, এমন সময় একটি সঙ্গী সংবাদ আনিল, পরমহংস মহাশয় বেলঘরিয়ার উদ্যানে আসিয়া (১৮৭৯ খ্রিঃ, ১৫ সেপ্টেম্বর) কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ক্রীড়ারত হরিপ্রসন্নের পরিধানে একখানি মাত্র ধুতি। ঐ অবস্থায় তিনি 'নূনকোট' খেলা ত্যাগ করিয়া সঙ্গীদের সহিত পরমহংসকে দেখিতে চলিলেন। তখন পরমহংস সম্বন্ধে কৌতুক ব্যতীত তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; আর গেরুয়ার প্রতি একটু ভীতিও ছিল। তাই এই দর্শনের স্মৃতি তাঁহার মনে অতি অস্পষ্ট ছিল এবং বর্ণনাকালে অন্যান্য দর্শনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িত। তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন হয় দেওয়ান গোবিন্দ মুখার্জির গৃহে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩)। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গিয়ে দেখি, ঠাকুর

সাদা কাপড় পরা, দাঁড়িয়ে আছেন। এক অদ্ভুত দৃশ্য! মুখের ভাব যেন কিরকম! পাকা ফুটি যেমন ফেটে যায়, এ যেন সেই রকম। মুখ বিকৃত বলা চলে না। শরীরের সব শক্তি যেন উপরের দিকে উঠে গেছে। মুখে দিব্যভাব আর ধরছে না। দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে। চোখ যেন কি দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে।... ঠাকুর রামপ্রসাদী গান গেয়েছিলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐরকম ভাব দেখে মনে হলো, তিনি যেন মা কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন আর আনন্দেতে মেতে আছেন।...কিছু পরে ঠাকুর বসলেন। ঠাকুর যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন যেন মা কালীর ভাব, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের ভাব।" সেই দিন সন্ধ্যার পরে তাঁহারা বাড়িতে ফিরিলেন।

অতঃপর ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে তিনি সহপাঠী সারদানন্দ ও বরদা পালের সহিত নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জানাইলেন যে, তিনি তখনই কলকাতা যাইতে উদ্যত—গাড়ি আনিতে গিয়াছে। ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর বসিয়া তাঁহারা তথায় উপস্থিত বাবুরামের নিকট হইতে গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের নিকট ইহাও অবগত হইলেন যে, তাঁহাদের তথায় যাইতে আপত্তি নাই। তদনুসারে তাঁহারা নৌকাযোগে মণি মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে অপরাহ্ণ চারিটায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের লীলাবিলাস-দর্শনে তৃপ্ত হইলেন। সেদিন গৃহে ফিরিতে দেরি হইল; তাই জননী হরিপ্রসন্নকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছিলেন শুনিয়া মাতা ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন, "সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?" গর্ভধারিণীর এই কথার উল্লেখ করিয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ পরে বলিতেন, "সত্যই মাথা খারাপ বটে—এখনও মাথা গরম আছে!"

তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত হরিপ্রসন্ন গৃহকোণে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও তাঁহার বচনসুধা পান করিতে থাকেন। ক্রমে ভক্তগণ উঠিয়া গেলেন—শুধু এক কোণে হরিপ্রসন্ন, আর ছোটখাটটিতে উপবিষ্ট ঠাকুর মৃদুহাস্যে হরিপ্রসন্নকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হরিপ্রসন্নও বিদায় লইতে উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই কুস্তি লড়তে পারিস? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? দেখি, লড়তো এক হাত!" এই বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিপ্রসন্নের তখন পালোয়ানের মতো চেহারা—সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। তিনি খুব ব্যায়াম করিতেন—২০০ ডন ও ২৫০ বৈঠক দিতে পারিতেন। আর কুস্তি লড়াটাকে তাঁহার ন্যায় যুবকেরই কর্ম মনে করিতেন। তাই অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল রে ভাল, এ কেমন সাধু দেখতে এলাম—সাধু কুস্তি লড়তে চায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "লড়তে জানি!" ততক্ষণে ঠাকুর হাস্যসহকারে

পালোয়ানের মতো তাল ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রমেই হরিপ্রসন্নের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার দুই হস্ত স্বীয় করদ্বয়ে গ্রহণপূর্বক ঠেলিতে লাগিলেন। অগত্যা হরিপ্রসন্নও তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ঘরের দেওয়ালে চাপিয়া ধরিলেন। ঠাকুরের মুখে তখনও মৃদু হাসি আর হস্তে হরিপ্রসন্নের করদ্বয়। হরিপ্রসন্নের মনে হইল, যেন কি একটা অলৌকিক শক্তি ঠাকুরের দেহ হইতে সিড়সিড় করিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশপ্রায় হইল। ঠাকুর তখন তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলিলেন, "কেমন, হারিয়েছিস তো?" তারপর নিজের খাটটিতে গিয়া বসিলেন। এক অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজিত হরিপ্রসন্ন তখন অননুভূত আনন্দে বিভোর। স্বল্পক্ষণ পরে ঠাকুর আসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে এখানে আসিস। একদিন এলে কি হয়?" ইত্যাদি।

আরও কয়েকবার হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন—দুই-একবার সেখানে রাত্রিবাসও করিয়াছিলেন। রাত্রে ঠাকুর অল্পই আহার করিতেন, দুই-একখানি প্রসাদী লুচি, একটু পায়েস ও একটি সন্দেশ। কেহ উপস্থিত থাকিলে সেও উহার কিয়দংশ পাইত। প্রথম রাত্রে হরিপ্রসন্ন আহারের এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া খুবই চিন্তিত হইয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, সে রাত্রি উপবাসেই কাটিবে। কিন্তু ঠাকুর নহবত হইতে রুটি ও তরকারি আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন; অবশ্য হরিপ্রসন্নের মতো কুস্তিগিরের পক্ষে উহাও যথেষ্ট ছিল না।

হরিপ্রসন্ন মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট যান; আসিতে দেরি হইলে ঠাকুরও শরৎ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। একদিন সংবাদ পাইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "কিরে, কেমন আছিস? আজকাল আসা-যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস—ডেকে পাঠালেও কেন আসিস না?" উত্তরে হরিপ্রসন্ন সরলভাবে জানাইলেন যে, ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আসেন না। ঠাকুর ইহাতে হাসিলেন মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান-ট্যান করিস তো?" হরিপ্রসন্ন জানাইলেন যে, ধ্যানের চেষ্টা করেন বটে, ধ্যান হয় না। ঠাকুর তখন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া জিহ্বায় কি একটা লিখিয়া দিলেন এবং পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন যেন তিনি বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, পা যেন আর চলে না। কোনপ্রকারে তিনি পঞ্চবটীতে গিয়া বসিলেন, তাহার পর আর কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সাধন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, সেদিন সেখানে আর কেহ ছিল না—শুধু ঠাকুর ও হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, অতঃপর প্রত্যহ ধ্যান

হইবে। অধিকন্তু স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না রে। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।...সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।"

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গিরিশবাবু সদলবলে আসিয়া সন্ধ্যার পর স্বরচিত "কেশব কুরু করুণা দীনে" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের ভাব হয় এবং দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতে থাকে। তিনি ভাবাবস্থায় গিরিশবাবুকে আলিঙ্গন করেন ও তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। গিরিশবাবু চলিয়া গেলে অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর হরিপ্রসন্নকে বলিলেন, "রাত অনেক হয়েছে; আর যেয়ে কাজ নেই। আজ এখানেই থেকে যা।" হরিপ্রসন্ন সেরাত্রি কালীবাড়িতেই থাকিয়া গেলেন। মাঝ রাত্রে জাগিয়া দেখেন ঠাকুরের ঘুম নাই, 'মা-মা' করিতেছেন আর মশারির চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছেন। হরিপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি কি পাগল হলেন নাকি? ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল 'মা-মা' করছেন। লোকে যে বলে পাগলা বামুন, এতো দেখছি সত্যই।" পরদিন বাড়ি যাইতেই তাঁহার এক দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কোথায় ছিলি?" কালীবাড়িতে ছিলেন শুনিয়া বলিলেন, "ঐ পাগলা বামুনটার কাছে বুঝি? ওরে, তার কাছে যাসনি, যাসনি। সে লোকটা পাগল। আমি প্রায়ই ঐ ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যাই। তার সব দেখেছি, সব জানি।" হরিপ্রসন্ন সব শুনিয়া হাসিলেন।

হরিপ্রসন্ন প্রথম যেদিন ঠাকুরের মুখে শুনিলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ"—সেদিন তাঁহার তেমন বিশ্বাস হয় নাই। মনে বরং এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল, "তা একটু আবোলতাবোল বললেই বা, লোকটি তো ভাল, সরল!" পরে একদিন স্বকক্ষে দণ্ডায়মান ঠাকুর গম্ভীরভাবে রাসলীলা ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাচ্ছলে যখন বলিলেন, "যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে," সেদিন ঠাকুরের মুখ-চক্ষুর ভাব ও কথার ভঙ্গিতে এমন একটা সংক্রামক দৃঢ়প্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রসন্ন উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে আদিষ্ট হইয়া হরিপ্রসন্ন এরূপ সবলে টিপিতে লাগিলেন যে, ব্যথিত সুরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আস্তে আস্তে।" সম্ভবত ঐ দিনেই কোন্নগর হইতে আগত এক ভদ্রলোক প্রসঙ্গান্তে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি সকলের অন্তর কাঁচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে

পাই।" কথা শুনিয়া ভীতমনে হরিপ্রসন্ন ভাবিলেন, "তা হলে তো আমার ভেতরও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন।" এরূপ চিন্তা বড়ই অস্বস্তিকর; তবে হরিপ্রসন্নের এইটুকু ভরসা ছিল যে, ঠাকুর প্রত্যেকের ভালটাই বলিতেন, মন্দটা বলিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেন না।

যুবক হরিপ্রসন্নের মনে প্রশ্নের অবধি ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" শ্রীগুরু উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর সাকারও নিরাকারও—আবার সাকার নিরাকারের পারও। যা কিছু দেখছিস, সবই ঈশ্বর।" সেই অপূর্ব বাণী শুধু শব্দরাশিরূপেই শিষ্যের কর্ণে প্রবেশ না করিয়া একটা অজ্ঞাতশক্তি-মিশ্রিত হইয়া তাঁহার মনোরাজ্যে প্রবেশপূর্বক সেখানে আবাস স্থাপন করিল। এই জ্ঞানকে তিনি পরে অতি উচ্চ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতেন এবং ঘটনাটি এইরূপ আবেগভরে বর্ণনা করিতেন যে, স্বতই মনে হইত যেন উহা শুধু পুনরুল্লেখমাত্র নহে, পরন্তু অনুভূত সত্যের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। মনে রাখিতে হইবে যে, হরিপ্রসন্ন কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ অবগত ছিলেন এবং স্বয়ং তর্ক করিতে ভালবাসিতেন। একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি জানেন? আপনি কি এসব বই পড়েছেন?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "তুই কি বলছিস? বই-টই সব ফেলে দে—ওতে জ্ঞান নেই, ওগুলো সব অবিদ্যা।"

হরিপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ দর্শন করেন এক রাত্রে। তখন ঠাকুরের গলরোগের প্রারম্ভাবস্থা। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে পড়িতে চলিয়া যান এবং সেখানেই ঠাকুরের লীলাবসানের সংবাদ প্রাপ্ত হন। খবর বাঁকিপুরে পৌছিবার পূর্বদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, ঠাকুর সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। অবশ্য তখন তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরদিবস সংবাদপত্রে সবিশেষ জানিতে পারিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজীর দেহত্যাগকালেও তাঁহার অনুরূপ দর্শন হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন তখন এলাহাবাদে গুড্‌স্‌শেড রোডের উপর 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' থাকেন। ঠাকুর-ঘরে ধ্যানকালে তিনি দেখিলেন, স্বামীজী ঠাকুরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট। দেখিয়া ভাবিলেন, "এ আবার কি!" যথাসময়ে বেলুড় হইতে সংবাদ আসিল, স্বামীজী মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন।

পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া হরিপ্রসন্ন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। গাজীপুরে অবস্থানের সুযোগে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। গাজীপুর ব্যতীত এটোয়া, বুলন্দশহর, মীরাট ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থলেও তিনি কার্যোপলক্ষে অবস্থান করেন। যখন যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন। এইরূপে একবার

এটোয়াতে তিনি স্বামীজীর দর্শন পান। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ছুটির শেষে বাঁকিপুর হইতে কর্মস্থলে ফিরিবার পথে বক্সার স্টেশনে তিনি অকস্মাৎ শিবানন্দজীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পরে কাশীধামে বংশী দত্তের বাটিতে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে যান। গাজীপুরে একবার অভেদানন্দজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। এটোয়াতে এক সময়ে সুবোধানন্দজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঠের আর্থিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলে তিনি তদবধি মঠের সাহায্যকল্পে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ৬০ টাকা করিয়া পাঠাইতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিরজানন্দজী ব্রঙ্কাইটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবন হইতে এটোয়া শহরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। পরে প্রেমানন্দজীও সেখানে যান। হরিপ্রসন্ন স্বভাবতই অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে বিরজানন্দ এক মাসের মধ্যেই পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

ইহার স্বল্পকাল পরেই হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাতার ভরণপোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পাঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাকে এতদিন চাকরি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে এই দুই প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি সাংসারিক কর্তব্যভার হইতে মুক্ত হইলেন। আলমবাজার মঠে তিনি অতি নম্র ও দীন ব্রহ্মচারিবেশে থাকিতেন—হঠাৎ দেখিলে কেহই মনে করিতে পারিত না যে, ইনিই একদা উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মঠের আবশ্যকীয় কর্মসমাপনান্তে তিনি নিজের ঘরে নিবিষ্টমনে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ১৮৯৭ অব্দে স্বদেশপ্রত্যাগত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেরাদুন, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। অতঃপর মঠে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে স্বামীজীর নির্দেশানুসারে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন।

আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দও তথায় আগমনপূর্বক স্বামীজীর আদেশে মঠের জন্য ক্রীত ভূমিতে গৃহনির্মাণকার্যের ভার গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে জমির মাপ, বাড়ির নক্সা, আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণনির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত কার্যই স্বহস্তে করিতে হইত; অতএব গল্পগুজবের বড় একটা সময় পাইতেন না, আর তিনি উহা ভালও বাসিতেন না। নীলাম্বরবাবুর বাটিতে অবস্থানকালে তাঁহার জননী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে শিশুপ্রায় সরল বিজ্ঞান মহারাজ বড়ই বিব্রত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে মা না জানি কি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন; কাজেই আত্মগোপনই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার সহিত

মাতার প্রতি শৈশবোচিত ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চরিত্রকে সেদিন গুরুভ্রাতাদের নিকট বড়ই চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে সকলের একান্ত আগ্রহে তিনি এক নিভৃত স্থানে জননীকে প্রণতি জানাইলেন।

স্বামীজীকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। স্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি নিকটে না যাইয়া দূরে দূরে থাকিতেন—আহ্বান করিলে বলিতেন, "এখন মশায় কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব।" বেলুড়ের নবনির্মিত মঠের দ্বিতলে স্বামীজীর পাশের ঘরেই তাঁহার শয়ন-স্থান ছিল। রাত্রে পদশব্দে পাছে স্বামীজীর অসুবিধা হয়, এই ভয়ে তিনি পা-টিপিয়া চলিতেন। তাঁহারই ঘরের সম্মুখে গঙ্গার দিকের বারান্দায় স্বামীজী ভ্রমণ করিতেন। এক রাত্রে তিনি এইভাবে পদচারণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল গুনগুন করিয়া গাহিয়াছিলেন, "মা ত্বং হি তারা; তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা" ইত্যাদি। এই সকল স্মৃতি বিজ্ঞান মহারাজের মনে এতই জাগরূক ছিল যে, পরবর্তী কালেও তিনি ঐ স্থানগুলিতে স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করিয়া বলিতেন, "স্বামীজী এখনও তাঁর ঘরে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পা-টিপে টিপে চলি, যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়; আর তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাই নে, পাছে চোখা-চোখি হয়ে যায়।" এমনি কৌতূহলী কোন শ্রোতা যদি প্রশ্ন করিতেন, "এখনও স্বামীজীকে দেখতে পান?" তবে নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর আসিত, "তিনি রয়েছেন, আর দেখতে পাব না?"

এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের পশচাতে ছিল আরও বহু অনুভূতি। এক রাত্রে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যেন স্বামীজীর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, হয়তো স্বামীজী নিশীথে অধ্যয়নাদি করিতেছেন। ঔৎসুক্যবশত দ্বারের মধ্য দিয়া অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাতপূর্বক তিনি দেখিলেন স্বামীজী ধ্যানস্থ, আর তাঁহারই অঙ্গের আভায় কক্ষ উদ্ভাসিত। আর একটি ঘটনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও স্থাপত্যকৌশলে মঠের মূল বাটি এবং পূজাগৃহ সমাপ্ত হইলে তাঁহার প্রস্তাবে স্বামীজী গঙ্গার ধারে পোস্তানির্মাণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে এক দ্বিপ্রহরে ভাঁটার সময় রৌদ্রে দণ্ডায়মান বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গলদঘর্ম হইয়া নিবিষ্টমনে কার্য পরিচালনা করিতেছেন, যাহাতে জোয়ার আসিবার পূর্বেই আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইয়া যায়; তাই জল-পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও স্থানত্যাগ অসম্ভব। উপরে দ্বিতলে অসুস্থ স্বামীজী চিকিৎসকের বিধিমত বরফ দিয়া দুধ পান করিতেছিলেন; পাত্র নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় পোস্তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেবকের হস্তে শূন্য পাত্রটি দিয়া বলিলেন, "পেসনকে গিয়ে দে।" গ্লাসটি পাইয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ দুঃখিতমনে ভাবিলেন, "এই অবস্থায়ও

স্বামীজী ব্যঙ্গ করিতেছেন!” তথাপি আদেশপালন ও প্রসাদধারণ করা উচিত, এই বিবেচনায় অবশিষ্ট দুই-চারি ফোঁটা যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুখে যেন কে সুধা ঢালিয়া দিল—পিপাসা তখনই দূর হইয়া গেল এবং শরীর স্নিগ্ধ হইল!

বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা প্রথমে তত অনুভব করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটই উহা শিক্ষা করেন। ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—“আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বেশি যেতাম না। তা স্বামীজী কি করে জানতে পারেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?’ আমি বললাম, ‘না, মশায়।’ স্বামীজী বললেন, ‘এক্ষুনি যাও, প্রণাম করে এস।’ আমি তো মাকে প্রণাম করতে চললাম। মনে মনে ভাবছি কোন প্রকারে একটা ঢিপ করে প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বললেন, ‘সেকি পেসন! সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর—মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।’ আমি আবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারি নি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।”

স্বামীজীকে এতটা সমীহ করিয়া চলিলেও উভয়ের মধ্যে সহজ সরল রসিকতারও অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, “পেসন, দেশকালের উপযোগী করে নূতন স্মৃতি লিখতে হবে, বুঝলে? পুরানো স্মৃতি আর চলবে না।” হরিপ্রসন্ন মহারাজ অমনি উত্তর দিলেন, “মশাই, আপনার স্মৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?” স্বামীজী যেন অভিমান-ভরে ছোট ছেলেটির মতো মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, “রাখাল, শোন শোন! পেসন বলে, আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।” মহারাজ উপযুক্ত মধ্যস্থের মতো বলিলেন, “পেসন কি জানে? ও ছেলেমানুষ। তোমার কথা দেশ একদিন নিশ্চয়ই নেবে।” স্বামীজীর তখন কত আনন্দ! বলিলেন, “শুনলে, পেসন? দেশ আমার কথা নেবেই।”

মঠের কার্য-সমাপনান্তে স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মুঠিগঞ্জে তাঁহার বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের অতিথি হন। কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত হইলে শরৎ চন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন যুবকের অনুরোধে গুড্‌স্‌শেড রোডের উপর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে’ চলিয়া যান। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তাঁহার যে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, উহা তপস্যা ও সাধনায় পরিপূর্ণ। রন্ধন ও পাত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি দৈনন্দিন গৃহকর্ম তাঁহাকেই করিতে হইত; বাটিতে জলের কল না থাকায় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল আনিতে হইত। ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে

তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে কাটাইয়া পূর্বাহ্ণের অবশিষ্টাংশ পূজা ও অধ্যয়নাদিতে ব্যয় করিতেন। অধ্যয়নে তিনি এতই তন্ময় হইতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকিত না বা কাহারও আগমনে উহার ব্যাঘাত হইত না। ইহারই এক সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবদ দত্তের নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। গ্রন্থাদির জন্য শ্রীশচন্দ্র বসুর পুস্তকাগার তাঁহার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অপরাহ্ণও প্রধানত ধ্যানেই কাটাইয়া তিনি সন্ধ্যায় ক্লাবের কার্যে মন দিতেন এবং ঐ সময়ে আগন্তুক বালকদিগকে গীতা পড়াইতেন। ক্লাব তখন তাঁহারই যত্ন ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে পরিচালিত হইত। উপদেশ চাহিলে স্বল্পভাষী বিজ্ঞান মহারাজ দু-চার কথায় উত্তর দিতেন কিংবা নীরব থাকিতেন। পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "ছেলেবেলায় 'বর্ণপরিচয়ে' যা যা পড়েছ, তাই জীবনে সাধন কর—অর্থাৎ 'সদা সত্য কথা কহিবে,' 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়'—এই দুইটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।" আপনাতে ডুবিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য। তিনি প্রতি কার্যে ছিলেন নীরব, নিয়মানুবর্তী ও একনিষ্ঠ। বৃথা গল্পগুজবে তিনি সময় নষ্ট করিতেন না, কিংবা বিনা-প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের বা ভক্তদের গৃহে যাইতেন না। ক্লাবে তাঁহার তিন বৎসর বাসের পর গৃহস্বামী উহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া বিজ্ঞানানন্দজীর অকৃত্রিম বন্ধু মেজর বামনদাস বসু তাঁহার প্রয়াগবাস নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং গৃহখানি ক্রয় করিয়া সামান্য ভাড়ায় ক্লাবকে ব্যবহার করিতে দেন এবং জলের কলের অভাব আছে দেখিয়া তাহাও দূর করেন। পরে ইহা স্মরণ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, "শ্রীশবাবুরা (শ্রীশবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা রামদাসবাবু) এলাহাবাদে না থাকলে আমার এখানে থাকা অসম্ভব হত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদাই অতি সাবধান ছিলেন। আশ্রমের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একবার তাঁহার সহোদরা তাঁহাকে দেখিতে আসিলে আশ্রমের বাহিরে ধর্মশালায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আর একদিন আশ্রমকর্মে নিযুক্ত মেথর স্বয়ং না আসিয়া তাহার কন্যাকে পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে বলিয়া দিলেন, সে যেন তাহার পিতাকে জানাইয়া দেয় যে, আশ্রমের আর মেথরের আবশ্যক নাই। পরে মেথর আসিয়া অনুনয়বিনয় করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন যে, অতঃপর হয় সে নিজে কাজ করিবে কিংবা পুরুষ কাহাকেও পাঠাইবে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পালন করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের স্বল্পকাল পূর্বে জনৈকা ভক্তিমতী মার্কিন মহিলা প্রয়াগে আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার জন্য আশ্রমেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে উক্ত মহিলা বৃদ্ধ স্বামীজীকে আনিবার জন্য রেল স্টেশনে উপস্থিত হইতেই তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তিনি আশ্রমে থাকিতে পারিবেন

না। লোকাচারে এইরূপ অনমনীয় মনোভাব প্রকাশিত হইলেও মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না; এমন কি, ভগবানের মাতৃভাবেই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হইতেন। আশ্রমে তিনি বহুবার ৺কালী, ৺দুর্গা, ৺জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি তাঁহার যে প্রীতি ছিল, তাহা তদীয় ভক্তদের প্রতিও প্রসারিত হইত। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব হইতেই (১৯০৮) ভক্তরাজ মহারাজকে (স্বামী সদাশিবানন্দ) রাত্রিতে আশ্রমে থাকিতে দিয়া বিজ্ঞান মহারাজ বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর কোন চেলা যদি আরামে থাকতে পারে, তা দেখা আমার একান্ত কর্তব্য।" স্বামী সদাশিবানন্দ পরে অসুস্থ হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পদব্রজে প্রায় দুই মাইল দূরে কর্ণেলগঞ্জে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য চারি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে মুঠিগঞ্জে একটি বাড়ি করা হয় এবং উহারই সম্মুখে সদর রাস্তার অপর দিকে এক খণ্ড পতিত জমিও সেবাশ্রম-স্থাপনের জন্য তিন শত টাকায় ক্রয় করা হয়। পরে উহার উপর দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে উক্ত নিজস্ব ভবনে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই বিজ্ঞানানন্দজীকে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনির্মাণাদির জন্য তথায় যাইতে হয়।

১৯১৬-১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রক্তামাশয়ে খুব ভুগিয়াছিলেন। অপরকে কষ্ট দিতে পরাঙ্মুখ ও সর্বদা আপনভাবে থাকিতে অভ্যস্ত বিজ্ঞান মহারাজের ঐ সময়ের অবস্থা যেমন কষ্টদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণায় ভুগিতে থাকিলেও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজ কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক ইঙ্গিতে জানাইতেন, "কথা কহিও না।" আবার অল্প পরেই হস্তসঞ্চালনপূর্বক আদেশ দিতেন, "চলিয়া যাও।" আহার প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘরে এক কুঁজা জল থাকিত; পিপাসা পাইলে নিজেই জল গড়াইয়া পান করিতেন। প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে আরোগ্য না হওয়ায় হোমিওপ্যাথি আরম্ভ হয় এবং উহাতেই রোগের উপশম হয়। তদবধি হোমিওপ্যাথির উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। তবে অসুখ হইলেও তিনি সহজে ডাক্তারের সাহায্য লইতেন না। এই ভাব তাঁহার চিরকালই ছিল। শেষ বয়সে তাঁহার পা ফুলিয়াছে দেখিয়া বেলুড় মঠে জনৈক সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একজন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়।" তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার ডাক্তারের উপর মোটেই বিশ্বাস নেই।" সাধুটি জানাইলেন যে, একজন খুব বড় ডাক্তার মঠে যাতায়াত করেন, তাঁহাকেই ডাকা হইবে।

বিজ্ঞানানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?" উত্তর হইল, "নীলরতনবাবু তাঁর চেয়ে বড়।" আবার প্রশ্ন হইল, "তাঁর চেয়ে বড়?" উত্তর, "তাঁর চেয়ে বড় এখানে আর কেউ নেই।" বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বলিলেন, "একজন আছেন, তিনিই হচ্ছেন ঠাকুর; তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।" বস্তুত ঠাকুরের উপরই তিনি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং কথাবার্তায় উহাই প্রকাশ করিতেন।

তিনি পূর্বে আশ্রম হইতে বড় একটা বাহিরে যাইতেন না। কিন্তু আরোগ্যলাভান্তে তাঁহার ভ্রমণের মাত্রা এতই বাড়িয়াছিল যে, সুস্থ হইবার কয়েক মাস পরে তিনি যখন বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে যান, তখন একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সারনাথে উপস্থিত হন। সারনাথের মিউজিয়ামে গাইড (প্রদর্শক) বিভিন্ন বস্তু-প্রদর্শন-ব্যপদেশে তাঁহাকে একটি বিশেষ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে লইয়া আসিলে তিনি সেখানে এক দিব্যদর্শন লাভ করেন। সেই মূর্তিতে বুদ্ধের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত ছিল। বৃত্তান্তটি স্তরে স্তরে অনুধাবন করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তিনি নিজে যেন একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় এক নিরাকার জ্যোতিসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া ঐ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সত্তা যেন সেই সমুদ্রে বিলীন হইল—রহিল শুধু শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। এই ভাব কতক্ষণ ছিল তাহা তিনি জানেন না। গাইড তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলে তিনি যন্ত্রবৎ চলিলেন বটে; কিন্তু তখন তিনি এক নেশায় বিভোর। এই ভাবের নেশা তাঁহার তিন দিন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অন্যত্র তীর্থাদিতে বহু অনুভব হইয়া থাকিলেও এই রকমটি পূর্বে কখনও হয় নাই। আর একবার তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, সারনাথ দেখিয়া পরে ৺বিশ্বনাথদর্শনে যাইবেন। কিন্তু সারনাথ হইতে ফিরিবার পথে মনে হইল, "কি হইবে যাইয়া? বিশ্বনাথ তো এক পাথরের ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নন।" যাহা হউক, পূর্ব অভিপ্রায়ানুসারে শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথমন্দিরে যাওয়া হইলে তিনি দেখিলেন, সেখানে বিশ্বনাথ-লিঙ্গ নাই, জীব জগৎ কিছুই নাই—এক নিরাকার সত্তা মাত্র বিদ্যমান।

কাশীতে আর এক সময়ে তিনি ৺বিশ্বনাথের দর্শন পান। সেবারে সেবাশ্রমের বাটিনির্মাণের জন্য তিনি এলাহাবাদ হইতে কাশীতে যান এবং স্টেশন হইতে এক্কা করিয়া সেবাশ্রমের দিকে অগ্রসর হন। পথে এক মোড়ে গাড়ি উল্টাইয়া তিনি পড়িয়া যান। তাঁহার এক পা চাকার মধ্যে ঢুকিয়া যায় ও উহার উপর একটি ভারী বাক্স পড়ে। আঘাত খুবই লাগিয়াছিল। তিনি কোন প্রকারে সেবাশ্রমে ফিরিয়া

আসিয়া ডাক্তার দেখাইলেন। আঘাতের ফলে তাঁহার জ্বর হইল এবং বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্য তোমার রাজত্বে এলাম—নিঃস্বার্থ কাজ। তা এ রকম হলো? কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" পরে দ্বিপ্রহর রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, জটাজূটমণ্ডিত শিব মৃদুমন্দ-হাস্যসহকারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন শিব তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাই বলিলেন, "কি শিবঠাকুর, আমাকে কি নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের কাজ আছে, তাই আগে করতে হবে।" কিন্তু সে কথা কে শুনে? শিব হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে হিমস্পর্শে তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। শিবকে তিনি বলিলেন, "এখন তবে এস; ঠাকুরের কাজ করতে হবে।" পরদিন উঠিয়া দেখেন জ্বরও নাই, পায়ের ব্যথাও নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্গে এলাহাবাদের একটি দর্শনের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাইব। তখন শীতকাল। প্রত্যহ শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন। সেই দিনও ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গঙ্গার স্তব করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক দিব্যশ্রীমণ্ডিতা বালিকা তিনটি বেণী দুলাইয়া তাঁহার সম্মুখে চলিতেছেন। প্রথমে তিনি উহা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ সেই মূর্তি অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, ইনিই ত্রিবেণীমায়ী—অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন।

১৯১৮ অব্দে তাঁহার মাতা প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভস্নান করিতে আসেন। সেইবার পুত্রের সেবায় প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করেন। মায়ের আশীর্বাদ কত দুর্মূল্য তাহা বিজ্ঞানানন্দজী জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "গর্ভধারিণী খুশি থাকিলে ঠাকুরও শীঘ্র কৃপা করেন।" কুম্ভ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরেই, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার জননী দেহত্যাগ করেন।

বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কেবল বিশেষ কার্যোপলক্ষেই আসিতেন এবং ঐ ভাবেই কাশী ও কনখলে যাইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রয়াগে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও গভীরতা ছিল—ধ্যান, জপ, তপস্যা ও বিদ্যানুশীলনে উহার প্রতিমুহূর্ত পরিপূর্ণ ছিল। প্রয়াগের গরমে দ্বিপ্রহরে 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে'র দোতলার এক কক্ষে বসিয়া তিনি বাঙলাতে 'জলসরবরাহের কারখানা' ও 'সূর্যসিদ্ধান্ত' লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়েই সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর হিন্দী অনুবাদ এবং উহার কয়েক বৎসর পূর্বে 'দেবী ভাগবত' ও 'বৃহজ্জাতক' ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া

ছাপাইয়াছিলেন। শরীরত্যাগের দশ-বার দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'রামায়ণের' ইংরেজি অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন এবং উহার কিয়দংশ প্রকাশিতও হইয়াছিল। কার্যটি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়; আর সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে তিনি স্বামীজীর মন্দির-নির্মাণার্থে বেলুড়ে আগমন করেন। স্বামীজীর প্রতি অসীম ভক্তির সহিত মহারাজেরও প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্যে প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের সহিত তাঁহার ভাবগত সাদৃশ্যও ছিল—তাঁহাদের উভয়েরই বহু দর্শনাদি হইত। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আধুনিক অবিশ্বাসীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন রহস্যপ্রিয় বিজ্ঞান মহারাজ মুচকি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "তবে কি জান, দুজনেরই রাত্রিতে ঘুম কম হত কিনা—তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা Young Bengal (তরুণ বাঙালি) ওসব বিশ্বাস করো না।"

জীবনের অন্তিমভাগে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, পেশোয়ার, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও যাইতে হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত পূর্ববঙ্গেও তাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি দক্ষিণভ্রমণে গমনপূর্বক ক্রমে কাঞ্চী ও মাদুরা-দর্শনান্তে ত্রিবান্দ্রম হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। সেখানে স্বামীজীর এক গভীর অনুভূতির সহিত চিরবিজড়িত ভারতের শেষ প্রস্তরখানিকে তিনি প্রায় অর্ধঘণ্টা যাবৎ নির্নিমেষনয়নে নিরীক্ষণান্তে মন্দিরে দেবীকে দর্শনপূর্বক পুনর্বার ত্রিবান্দ্রম হইয়া ৺রামেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি এই যাত্রায় বাঙ্গালোর, মহীশূর এবং উতকামণ্ডেও গিয়াছিলেন। পরবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট দর্শন করিয়া তাঁহার দীর্ঘকালের একটি সাধ মিটাইলেন। অতঃপর ঐ বৎসরই শীতকালে দ্বারকাধাম-দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হন।

১৯৩৩ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দিল্লী ও লাহোর হইয়া পেশোয়ার ও লাণ্ডিকোটালে গমন করেন। তিনি সিংহল ভ্রমণেও গিয়াছিলেন ঐ বৎসরই। সিংহলে অবস্থানকালে তিনি কেলানিয়া মন্দির, কাণ্ডির দন্ত-মন্দির এবং অনুরাধাপুরমের বোধিবৃক্ষ—বৌদ্ধদের এই তিনটি প্রধান তীর্থ, সিংহলের গ্রীষ্মাবাস নুয়ারা ইলিয়া এবং বাটিকালোয়া ও ত্রিন্‌কোমলীতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী দর্শন করেন।

১৯৩৫ অব্দের মার্চ মাসে তিনি প্রয়াগ হইতে বেলুড় হইয়া ভুবনেশ্বরে গমন

করেন এবং তথা হইতে মোটরে কোণারকের সূর্যমন্দির দেখিয়া আসেন। এতদ্ব্যতীত ঐ বৎসর তিনি দিনাজপুর, তমলুক, কামারপুকুর, জয়রামবাটি প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ২৭ অক্টোবর নিজস্ব ভূমিতে কানপুরের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঢাকা, বরিশাল ও পাটনায় ১৯৩৫ অব্দেই তাঁহার শুভ পদার্পণ হয়। এই সমস্ত স্থলে দীক্ষা ও উপদেশাদি দ্বারা তিনি বহু ভক্তকে কৃপা করেন। পরবৎসর তিনি ঘাটশিলা ও জামশেদপুরে গমনপূর্বক অনুরূপ কৃপা বিতরণ করেন। ঐ বৎসরের বিশেষ ঘটনা রেঙ্গুনগমন। রেঙ্গুন হইতে তাঁহাকে পেগু শহরে শায়িত বুদ্ধমূর্তি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। সেই মূর্তিসমক্ষে তিনি বিহ্বলচিত্তে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে সকলেই ফিরিতে উদ্‌গ্রীব; কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ তখন কালাতীত। অতঃপর তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চল, চল, তাড়াতাড়ি যাই।" মোটরে উঠিয়া তিনি আপনমনে নীরবে বসিয়া রহিলেন; অপর এক বুদ্ধমূর্তি দেখিতে লইয়া গেলেও গাড়ি হইতে নামিলেন না। রেঙ্গুনের পথে অনেক পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "বুদ্ধদেব কৃপা করে আজ আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলুম শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি যেন জীবন্ত। তাঁর সৌন্দর্যের কি অপূর্ব বিভা!"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরে ঐ মন্দিরে মর্মরমূর্তিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত বিজ্ঞানানন্দ যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের স্থাপত্য-শিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেলুড়ে ফিরিবার পর স্বামীজী নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া মন্দিরটি কোথায় কিভাবে হইবে সেইসব কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে একটি নক্সা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন এবং কহিলেন, "এ দেহটা তত দিন থাকবে না; তবে আমি উপর থেকে দেখব।"

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরে মন্দিরের স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হওয়ায় বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩৫ অব্দের গুরুপূর্ণিমাতে নিরূপিত স্থানে পুনঃ তাম্রফলক স্থাপন করেন। পর বৎসর ১০ মার্চ হইতে মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মন্দিরটি যাহাতে সুচারুরূপে অথচ শীঘ্র সমাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বিজ্ঞানানন্দজী বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং বেলুড়ে বাসকালে কার্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, স্বয়ং দেখিতে যাইতেন। ১৯৩৭ অব্দের জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল এবং তিনি ঐ জন্য বেলুড়ে আসিয়াছিলেন; কিন্তু

গর্ভমন্দিরের কার্য সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা বাপু বড় দেরি কর! যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠার কার্য শেষ করে ফেল; আর বেশি দেরি করো না।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী মন্দিরের প্ল্যান করেন; কিন্তু মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ ভিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে নাও, দেরি করো না।" এই কথার তাৎপর্য সকলেই বুঝিতে পারিলেন; সুতরাং নাটমন্দিরের সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরবিগ্রহ স্থাপনপূর্বক ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পৌষ-সংক্রান্তির দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য সমাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠার দুইদিন পূর্বেই তিনি এলাহাবাদ হইতে আসিলেন। অতঃপর শুভদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে 'আত্মারামের কৌটা' পুরাতন ঠাকুর-ঘর হইতে নিচে নামাইয়া আনা হইল এবং উহা লইয়া অতিবৃদ্ধ বিজ্ঞান মহারাজ মোটরগাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি লাল সালুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে নূতন মন্দিরের সিঁড়ির নিচে উপস্থিত হইলে তিনি নামিলেন এবং 'আত্মারামের কৌটা' লইয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্বক বেদিতে স্থাপন করিলেন। পরে পূজা, ভোগনিবেদন ও আরতি সমাপ্ত হইলে তিনি নিজ কক্ষে ফিরিলেন। কক্ষে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর হতে দেখবেন বলেছিলেন; আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন।' তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "এবার আমার কাজ শেষ হলো। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।"

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাস্টি এবং সমগ্র মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন; অতঃপর স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৩৮ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের সময় তিনি শেষবার বেলুড় মঠে আগমন করেন। উৎসবান্তে ৮ মার্চ এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার পর হইতেই তাঁহার শরীর ক্রমে অসুস্থ হইতে থাকে। চিরকাল স্বাবলম্বী ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি জাগতিক প্রতিকার ও চিকিৎসাদিতে বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হইতে থাকিলেও কাহারও সেবাগ্রহণ বা কোনরূপ চিকিৎসায় সম্মত হইলেন না, বরং বাহিরের লোকের আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে আবার যথাসময়ে চেয়ারে বসিয়া দৈনন্দিন কার্যের নির্দেশও দিতে থাকিলেন। কিন্তু ৯ এপ্রিল তাঁহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তখন সেবকদের একান্ত অনুরোধে তিনি সামান্য

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্মতি জানাইলে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, বেরি-বেরি হইয়াছে। ঐ সময়ে রাত্রে প্রায়ই তিনি 'মা-মা' শব্দ উচ্চারণ করিতেন। আহারাদি সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে জল পান করিতেন মাত্র। অবশেষে ২৫ এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটের সময় তিনি লীলাসংবরণ করিলেন। পরদিন কাশী, হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রাসহকারে তাঁহার পূতদেহ ত্রিবেণীসঙ্গমে লইয়া গিয়া সেখানে সলিল-সমাধি দিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর অনাড়ম্বর সাধুবৃত্তিতে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। এইরূপে মদনমোহন মালব্য, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র বসু, মেজর বামনদাস বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আবার বালকদিগের সহিতও তিনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। কিন্তু ছেলেদের সহিত হাসি-তামাসা ও ক্রীড়াদি করিলেও তিনি কখনও নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন না; অনিচ্ছাস্থলে তাঁহার গাম্ভীর্য দেখিয়া বালকেরা সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া যাইত। বৃদ্ধবয়সে দীক্ষিত শিষ্যদের সহিত ব্যবহারকালেও তাঁহার এইরূপ চরিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার উপদেশগুলি অনেকক্ষেত্রে হাস্যরসসমন্বিত হইয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইত। বিজ্ঞান মহারাজের উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়তো কোন শ্রোতা কথাচ্ছলে সাহসভরে বলিয়া ফেলিলেন, "আমরা আর আপনার কথার মূল্য কি বুঝব? আমাদের কাছে ওসব গল্পই বটে—ঠাকুরমার গল্প।" অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ হে, সবই গল্প, বাস্তবিকই গল্প। পৃথিবীটাকে যদি গল্প মনে করে নেওয়া যায় তাহলে কত আনন্দ! আর যাই এটাকে বাস্তবিক মনে করলে অমনি কষ্ট!" ধর্মজগতে বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে শুনিয়া একজন বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ, আমাদের যে বিশ্বাসের অভাব!" এই উক্তির ভ্রম দেখাইয়া তখনই বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "জগতে এমন কোন মানব নাই, যার বিশ্বাস আদৌ নাই। বিশ্বাস ব্যতীত আপনি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেন না।" জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এখানে এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।" অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়, তিনি তো আপনাদের ভেতরও আছেন।" এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত দেখেছ?" শিষ্য 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "তোমার শরীরেই পঞ্চভূত আছে। ভয় নেই, রাম-নাম করবে—ভূত পালাবে। যেখানে রাম-নাম হয় সেখানে আর ভূত থাকতে পারে না।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাধারণ ব্যবহারাদি-দর্শনে মনে হইত, তিনি যেন অত্যন্ত খামখেয়ালী লোক। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মিশিলে তাঁহার অন্তরের মহত্ত্ব, ঔদার্য ও কোমলতা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইত। স্বেচ্ছায় অবলম্বিত তাঁহার অদ্ভুত বেশভূষাদি

সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বিশাল জামা, কান-ঢাকা টুপি, মোজা ইত্যাদি দেখিয়া পথিক কখনও কৌতূহলে চাহিয়া থাকিলে তিনি বলিতেন, "ক্যা দেখতে হ্যায়? হাম বান্দর হ্যাঁয়, রামজীকা বান্দর"—কথাগুলি কত সরল, অথচ আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর। সীতারামের প্রতি তাঁহার একটা প্রাণের টান ছিল। একবার এক ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামায়ণ পড়েছ, সীতার দুঃখের কথা কিছু জানো?" এই বলিয়া সীতার দুঃখের কথা এমন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে নিজেই কাঁদিয়া আকুল।

উচ্চ আত্মরাজ্যে বিচরণ করিলেও তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈতিক দিকটার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। দেশসেবকদের ত্যাগ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অহিংস যুদ্ধ তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগাইত। ১৯৩১ অব্দের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল বন্দি হইলে ভারতব্যাপী হরতাল হয়। সেইদিন নিদ্রাত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এইমাত্র স্বপ্নে স্বামীজীকে দেখলাম; তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।" দেশনেতার অবমাননায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মন তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে তিনি ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেস দেখিতে কানপুরে গিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "যেখানে সৎ কাজের জন্য এত লোকসমাগম হয়, জানবে সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পূজা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পূজা। ...হাজার হোক, দেশের মঙ্গলবিষয়ে চিন্তা তো হচ্ছে! একতাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ হয়। আমাদের দেশ আবার উঠবে মনে হয়।"

সদা সচ্চিন্তায় মগ্ন বিজ্ঞানানন্দজী অপরের গুণরাশিই দেখিতেন—এমন কি নিজের যশ-কীর্তনকেও অপরের সদ্‌গুণেরই পরিচায়ক মনে করিতেন। রেঙ্গুনে জাহাজঘাটে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার থাকারও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একজন যখন বলিলেন, "আপনি মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট; আর রেঙ্গুনে মিশনের বড় কেন্দ্র," তখন বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "না হে, না! আমি তো ভারী একটা লোক! এখানকার লোকেরাই ভাল। ...আরে ভায়া, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী। আমাদের যে এরা যত্ন করে, এরা ভাল লোক বলেই তো করে!"

ব্রহ্মানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "হরিপ্রসন্ন হচ্ছেন গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী।" 'গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী' বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বীয় জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবানন্দজী সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইবার কয়েক মাস পরে তিনি হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ হইতে মঠে আসিলেন। তিন দিন মঠে বাসের পর তিনি মহাপুরুষজীর

নিকট বিদায় লইতে যাইলে মহাপুরুষজী স্বীয় সক্রিয় বাম হস্তখানি তাঁহার মস্তকে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যে অনুভূতি হইল তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, "সেদিন থেকে মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাব।" তাই তিনি মুক্তহস্তে বহু ধর্মপিপাসুকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের অবলম্বন ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা। তিনি বলিতেন, "সব রকমই করা গেল; এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপর নির্ভর করে পড়ে আছি।"

# পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে 'ঈশ্বরকোটি' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ঐতিহ্যে তিনি ঈশ্বরকোটি বলিয়াই স্বীকৃত হন। সঙ্ঘের প্রাচীনগণ ঈশ্বরকোটিদের মধ্যে এই ছয়জনকে গণনা করিয়া থাকেন—স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতের' বিভিন্ন উক্তিতে পূর্ণের এই উচ্চাধিকারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—ঠাকুর "আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের নিচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের (শ্রেণীর) ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না!" ("লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৯৮ পৃঃ); 'কথামৃতে'ও আছে—"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম" (৪র্থ ভাগ, ২৪৮ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৫৬-৬৯); "অংশ শুধু নয়, কলা" (ঐ ২৪৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৫৬); "ওদের কেমন জান? ফল আগে। তারপরে ফুল। আগে দর্শন, তারপর মহিমা-শ্রবণ। তারপর মিলন" (ঐ, ২৬৯ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৭২)।

এখানে ঈশ্বরকোটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুর ভক্তদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন—ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি—যেমন শ্রীচৈতন্যাদি অবতারপুরুষ, কিংবা প্রহ্লাদাদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ভক্ত বা লীলাসহচর। ঈশ্বরকোটি না হইলে মহাভাব, প্রেম হয় না; ইঁহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্ত হইতে পারেন—ইঁহারা প্রারব্ধের অধীন নহেন; ইঁহাদের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদের; এবং ইঁহাদের কোনও অপরাধ হয় না। ঈশ্বরকোটির প্রেম হইলে জগৎ মিথ্যা বোধ তো হয়ই, অধিকন্তু শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাও ভুল হইয়া যায়।[১] "যাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল কোনওরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এজন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায়

---

১ 'কথামৃত'—২য় ভাগ, (৯ম সং) ১৫৯ পৃঃ; ৩য় ভাগ (৮ম সং) ৭৩, ১৩১, ২০৪, ৩১৫ পৃঃ; ৪র্থ ভাগ (৬ষ্ঠ সং), ১৩৬ পৃঃ। 'কথামৃত'—১ম ভাগ (১৫শ সং), ১২০। অখণ্ড সং, ২৫৬ পৃষ্ঠায় আছে "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"

বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এজন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না—ইঁহারাই জীবকোটি বলিয়া অভিহিত হন" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ১ম ভাগ—গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ২৪ পৃঃ)। 'লীলাপ্রসঙ্গে' ২য় ভাগ; (দিব্যভাব ১০১ পৃঃ) ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঠাকুর "ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলেন।"[১]

পূর্ণচন্দ্র পূর্ণজ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন; তাই বলরাম বসু মহাশয় ঠাকুরকে যখন একদিন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, সংসার মিথ্যা একেবারে জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হলো?" তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "জন্মান্তরীণ—পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয়, আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইরূপ নয়।" পূর্ণের প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া ঠাকুর আর একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা, কি অনুরাগ!" আর একদিন তিনি মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ?" মাস্টার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে করে যাচ্ছি—ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌড়ে এল, আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।" ঠাকুর অমনি সাশ্রুনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! আহা!—কি না, ইনি আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না। এ তিন জনের পুরুষসত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ।... পূর্ণর যে অবস্থা এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হল, আর কেন? বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবে। দৈব স্বভাব, দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপধুনার গন্ধ দেওয়া যায়, তাহলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহধারণ করে এসেছেন" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৬-২৪৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৫৫)। পূর্ণ আবার লীলাসহচর। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের এত ভালবাসি? জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল—জানিয়ে দিলে, তুমি শরীরধারণ করেছ, এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাক।"

---

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-তে অন্যরূপ বিবরণ আছে (৬০৪পৃঃ)-

কোন্ কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বরকোটির।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির॥
নিরঞ্জন বাবুরাম ছোট শ্রীনরেন্দ্র।
শ্রীরাখাল শ্রীযোগীন আর পূর্ণচন্দ্র॥

বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর।
শ্রীতারক বেলঘরিয়ায় ঘর যাঁর॥
প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
ঈশ্বরকোটির থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর॥

উপরের উদ্ধৃতিতে পূর্ণচন্দ্রের জীবনের দুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে; প্রথম, মাস্টার মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন এবং দ্বিতীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ। অধুনা আমরা ঐ দুই ঘটনারই বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইব। পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করেন তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর হইবে। ঐ সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজার শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ইতঃপূর্বেই বহু ভক্তিমান বিদ্যার্থীকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আনয়নপূর্বক 'ছেলে-ধরা মাস্টার' খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; এখন পূর্ণচন্দ্রের মিষ্ট ভাষা, সুন্দর মধুর স্বভাব, উজ্জ্বল নয়ন, সুঠাম দেহ ও উজ্জ্বল শ্যামকান্তি-দর্শনে তাঁহার প্রতিও আকৃষ্ট হইলেন; অধিকন্তু আলাপ করিয়া যখন জানিলেন যে, বালক আবাল্য ভগবদ্ভক্ত, তখন তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠের উপদেশ দিলেন এবং একান্তে ডাকিয়া নানা ধর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখিয়া একদিন বলিলেন, "চৈতন্যদেবের মতো একজনকে যদি দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে চল।" পূর্ণচন্দ্রের মন তো ইহারই জন্য আকুল; অতএব তিনি সাগ্রহে সম্মত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে থাকেন এবং সেখানে যাতায়াতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে, তখন তিনি অতীব চিন্তিত হইলেন। কারণ পূর্ণচন্দ্রের পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ মহাশয় ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পারিবারিক সুশৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আভিজাত্যের গৌরবও তাঁহার কম ছিল না; কারণ সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করায় এবং রাজসরকারের সম্মানলাভ হওয়ায় তিনি তদানীন্তন কলকাতা-সমাজে স্বনামধন্য লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এমন সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র পূর্ণচন্দ্র যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। পূর্ণ পিতার এই মনোভাব জানিতেন বলিয়াই চিন্তাকুল হইলেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। প্রয়োজনস্থলে ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসের এক শুভদিনে মাস্টার মহাশয়ের সহিত গাড়ি করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইলেন।[১]

---

১ "পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করে, তখন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই চলে। বোধ হয়, তখন তাহার বয়স সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—দিব্যভাব, ৯৭ পৃঃ)। ইহা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের কথা; অতএব পূর্ণের জন্ম ১৮৭১-এর শেষে কিংবা ১৮৭২-এর প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে।

সুবৃহৎ দেবালয়-দর্শনে মুগ্ধ এবং দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে চরিতার্থ পূর্ণচন্দ্র ভক্তিবিহ্বলচিত্তে পরমহংসদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৺জগদম্বা এই উচ্চকোটি ভক্তটির আগমনের কথা ঠাকুরকে পূর্বেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহাকে সাদরে আপনার নিকটে বসাইয়া ফল-মিষ্ট খাওয়াইলেন। এদিকে স্নেহমুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া নীরবে একদৃষ্টে সেই সৌম্য, শান্ত, মাধুর্যঘন, প্রেমময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে কি তখন অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতি জাগিয়া তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে লইয়া গেল এবং এই লোকোত্তর মহামানবের সহিত তাঁহার দিব্যসম্বন্ধ জানাইয়া দিল? নিবিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে তিনি অলৌকিক আনন্দে বিভোর হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া কপোলদ্বয় ভাসাইয়া দিল। সে অপার্থিব লীলায় চমৎকৃত মাস্টার কিয়ৎক্ষণ সতৃষ্ণনয়নে উহা নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকে জানাইয়া দিলেন যে, গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। প্রত্যাগমনের জন্য পূর্ণ সুপ্তোত্থিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে ঠাকুর জননীর ন্যায় তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "তোর যখন সুবিধা হবে চলে আস্‌বি—গাড়িভাড়া এখান থেকে নিবি।" কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদদ্বয়কে টানিয়া লইয়া পূর্ণ গাড়িতে উঠিলেন এবং যথাসময়ে গৃহে পৌঁছাইলেন—অভিভাবক জানিতেও পারিলেন না যে, আজ পুত্রের নবজীবনের সুপ্রভাত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র এখন হইতে কখনও মাস্টার মহাশয়ের সহিত, কখনও একাকী দক্ষিণেশ্বরে যান। প্রথম পরিচয়ের পর ঠাকুরকে দেখিবার জন্য যেমন পূর্ণের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত, বাড়ির শাসন বা তিরস্কারের ভয় অকস্মাৎ তিরোহিত হইত, সহপাঠীদের সঙ্গও বিষবৎ মনে হইত এবং অবিরাম নির্জনে ভগবানের নাম করিতে ভাল লাগিত, ঠাকুরও তেমনি পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল থাকিতেন, সুবিধা পাইলেই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লুকাইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন, সময়ে সময়ে দরদরিতধারে চক্ষের জল ফেলিতেন এবং কেহ এইরূপ ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিতেন, "পূর্ণের উপর এই টান দেখেই তোরা অবাক হয়েছিস, নরেন্দ্রের জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যে রকম ব্যাকুল হত ও যে রকম ছটফট করতাম তা দেখলে না জানি কি হতিস!" অথবা বলিতেন, "পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে! কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, 'আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য'।"

দক্ষিণেশ্বরে পূর্ণচন্দ্র একদিন আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, পূর্ণকে যেন মাল্য ও

চন্দনাদিতে ভূষিত করিয়া খাওয়ানো হয়। মাতাঠাকুরানীও ঠিক তাহাই করিলেন। পূর্ণ ঐ ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"আমাকে নহবতখানার ভিতর নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বললেন, 'এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম।' স্ত্রীলোকটি আমার ঠিক মায়ের মতো স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওগো, এই তরকারিটা বেশি করে দিও।' আবার যান, আবার আসেন—দাঁড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন! আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে হাতে মুখ-ধোয়ার জল ঢেলে দিতে বললেন। পরে তাঁকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো, ষোল আনা দিও।' স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি তখন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠাকুরের কোন মেয়ে-ভক্ত। পরে যখন মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করতে যাই তখন দেখি—সেই তিনি, আমাদের মা!" পূর্ণ না বলিলেও ঠাকুরের পূর্বোদ্ধৃত কথা ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৫৫) হইতে অনুমান করিতে পারি যে, মালাচন্দনপরিহিত পূর্ণ সেদিন ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুর অন্যসময়ে একটি অলৌকিক দর্শনের উল্লেখ করিয়াছিলেন—"এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? তিন-চার ক্রোশ ব্যাপী শিওড়ে যাবার মেঠো রাস্তা। সেই মাঠে আমি একলা! সেই যে পনেরো-ষোল বছরের ছোকরার মতো পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম। চারিদিকে আনন্দের কুয়াশা। তারই ভিতর থেকে তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে উঠল। মুখটি দেখা যাচ্ছে—পূর্ণের রূপ! দুজনেই দিগম্বর। তারপর আনন্দে মাঠে দুই জনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেলা! দৌড়াবার পর পূর্ণর জলপিপাসা পেল। সে একটি গ্লাসে জল পান করলে। পরে আমাকে দিতে এল। আমি বললাম, 'ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না।' তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।"

পিতার ভয়ে পূর্ণ ইচ্ছামত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না; তাই ঠাকুর প্রাণের টানে স্বয়ং কলকাতায় আসিতেন। এইরূপে একবার এক ভক্তগৃহে মিলিত হইয়া তিনি স্বহস্তে পূর্ণকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?" অপূর্ব প্রেরণায় অবশহৃদয় পূর্ণ ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, বালক পূর্ণ প্রথম পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরকে কিরূপে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন! ইহার উত্তর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনান্তে

স্বয়ং দিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি—সে কেমন করে ঐ কথা বুঝল, বল দেখি! ...নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধসাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবত পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

একদিন বলরাম-মন্দিরে পূর্ণকে নিজসকাশে ডাকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্নে কি দেখিস?" পূর্ণ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আপনাকে দেখেছি—বসে আছেন, কি বলছেন।" ঠাকুর শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "খুব ভাল। তোর উন্নতি হবে, তোর ওপর আমার টান আছে।" একরাত্রে পূর্ণচন্দ্র পাঠগৃহে বসিয়া একাকী পড়িতেছেন—সহসা মাস্টার আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্র বাহিরে আসিলে মাস্টার মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন—সঙ্গে এস।" পূর্ণচন্দ্র কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের উপর বাস করিতেন। সেখান হইতে মাস্টারের সহিত শ্যামপুকুর ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ে উপস্থিত হইলে তথায় অপেক্ষারত ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা।" এই বলিয়া মুখে তুলিয়া দিলেন। পরে তিনজনে পল্লির মধ্যে মাস্টারের গৃহে গেলেন এবং ঠাকুর সেখানে পূর্ণকে সাধনসম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। অপর একদিন দেবেন্দ্র মজুমদারের হাতে পূর্ণের জন্য কয়েকটি আম পাঠাইয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহাকে খাওয়াইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হইবে।

আর একদিন মাস্টারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর জানিতে চাহিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পর পূর্ণের কোন উন্নতি হইতেছে কি-না। মাস্টার কহিলেন, "সে চার-পাঁচ দিন ধরে বলছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে—রোমাঞ্চ এই সব হয়।" অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, "খুব আধার। তা নাহলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ওতো ঐসব কথা জানে না।" আবার সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয় কি?" মাস্টার যখন জানাইলেন যে, বাহিরে ঐরূপ কোন প্রকাশ দেখেন নাই, তখন ঠাকুর কহিলেন, "বাইরে তার ভাব তো হবে না—তার আকর আলাদা। আর আর লক্ষণ সব ভাল।"

পূর্ণ বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ইহাতে প্রধান শিক্ষকের সমর্থন আছে—এ সংবাদ অভিভাবকের অবিদিত রহিল না; সুতরাং বিদ্যালয় পরিবর্তিত হইল। তথাপি দেখা গেল যে, অন্য সর্ব বিষয়ে পিতার বাধ্য হইলেও ঠাকুরের কলকাতায় আগমনের সুযোগে পূর্ণ অতি সংগোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং স্বগৃহে পূর্ববৎ সাধনায় রত থাকেন। অধিকন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে

যুবক ভক্তদিগকে সন্ন্যাসী সাজিতে দেখিয়া পিতার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কাজেই অপরিণত বয়সেই পুত্রের উদ্বাহ-বন্ধনের আয়োজন চলিতে লাগিল। ঠাকুরের দেহত্যাগের দুই বৎসর পরে ষোল বৎসর বয়সে একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে গৃহস্থ সাজানো হইল। যথাকালে ভারত সরকারের অধীনে চাকরির ব্যবস্থাও হইয়া গেল। পূর্ণ এখন পুরা সংসারী! স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতি পূর্ণের অধ্যাত্ম-বিকাশের পথ সহসা সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িল। সর্বপ্রকার বিরাট সম্ভাবনা লইয়া আগত যে ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ সত্ত্বগুণের আধিক্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়মাধুর্যের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র এইভাবে সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া ভাবিতে হয়, "এ কী দৈবী মায়া! ইহা কি পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ পরিবেশের নিকট অন্তঃশক্তির পরাজয়, অথবা ভগবল্লীলার সমস্ত অংশ মানববুদ্ধির অতীত?" শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, অবতার যখন যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্য ধরাধামে আগমন করেন, তখন দুই শ্রেণীর নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহার অনুগমন করেন। একদল তাঁহার যুগধর্মপ্রচারে ব্রতী হন, অপরেরা শুধু লীলা আস্বাদন করেন বা লীলাবিলাসের সহায় হন—বাউলের দলের ন্যায় আপন মনে নাচিয়া-গাহিয়া চলিয়া যান! পূর্ণ কি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত?

সে যাহাই হউক, পূর্ণের পরবর্তী জীবন ভক্তের নিকট যেমন উপভোগ্য, সদ্গৃহস্থের নিকট তেমনি শিক্ষাপ্রদ। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার সত্যই লিখিয়াছেন, "ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে ('লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—দিব্যভাব, ৯৯ পৃঃ)।" তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করিতে গিয়া 'উদ্বোধন'-সম্পাদকও লিখিয়াছেন ('উদ্বোধন', পৌষ, ১৩২০)—"সন্ন্যাসপ্রবণ অন্তর লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া কর্মবিপাকে যাঁহাদিগকে সংসার করিতে হয়, গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহারা কখনও সুখলাভে সমর্থ হন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রকে তাহাই করিতে হইয়াছিল এবং ফলও তজ্জন্য তদনুরূপ হইয়াছিল। সমগ্র চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আজীবন তিনি যেন সকলের নিকট অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন।"

পূর্ণচন্দ্র সরকার বাহাদুরের অর্থবিভাগের কর্মচারী ছিলেন; সেজন্য বৎসরে অর্ধেক সময় তাঁহাকে সিমলা শৈলে থাকিতে হইত। ভারত-রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কর্মস্থলও তথায় চলিয়া যায়। দিল্লীতে অবস্থানের

কাল হইতে তাঁহার জ্বর হইতে থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ বায়ুসেবনেও সে জ্বরের হ্রাস না হইয়া দিন দিন উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিমলা হইতে তাঁহাকে কলকাতায় আনা হয়। এখানে তিনি প্রায় ছয় মাস শয্যাগত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তরে সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র এই সময়ে সহধর্মিণীকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা কি সংসারের অন্যলোকের ন্যায়? আমরা যে সর্বতোভাবে ঠাকুরের; আমার জন্মিবার পূর্বে যিনি তোমাদের আহার দিয়ে রক্ষা করেছেন, আমার মৃত্যু হলে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন, দেখবেন।" অশেষ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার দেহমনে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজিত থাকিত; তিনি বলিতেন যে, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদা বসিয়া আছেন।

গৃহস্থজীবনের কর্তব্য তিনি যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন—পুত্রকন্যাদের শিক্ষা ও লালনপালন, কন্যাদিগকে সৎপাত্রে দান, বন্ধুবান্ধবদের যথোচিত সাহায্য ও সম্বর্ধনা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের স্নেহ—ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই তিনি নিখুঁতভাবে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুরূপে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বা গুরুভ্রাতাদিগকে ভুলেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিয়াছেন, "কি প্রাতঃকালে, কি সন্ধ্যাকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। আবার অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার মতো থাকিতেন—মাঝে মাঝে দুই-একটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গের মাধুর্যবৃদ্ধি করিতেন। কলকাতায় অবস্থানকালে পূর্ণবাবু প্রতি রবিবারে বেলুড় মঠে যাইতেন। সেখানে প্রায়ই একাকী বসিয়া হাসিমুখে চুরুট টানিতেন—মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই-একটি বাক্যালাপ করিতেন—তাও ভাসাভাসা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, যেন অন্তর্মুখভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার বাড়িতে অধিকাংশ যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত। শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় অনেক যুবক ছাত্রভক্তকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং পূর্ণবাবু তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বিশেষ যে সব যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হইবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতেন, তাঁহাদের দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না" ('উদ্বোধন', ১৩৫৪, ৩৬১ পৃঃ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তানগণ পূর্ণবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং নবাগতদের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদানকালে পূর্বকথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। স্বামীজীর আমেরিকা বিজয়ের সংবাদে যখন দেশ উল্লসিত, তখন পূর্ণবাবু প্রত্যহ অপরাহ্নে বলরাম মন্দিরে যাইয়া সংবাদপত্রগুলির খবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতিকে সাগ্রহে শুনাইতেন এবং তাঁহারাও স্বামীজীর পত্রাদি তাঁহাকে পড়িয়া

শুনাইতেন। ঐ প্রসঙ্গে পূর্ণবাবু হয়তো কিছু বলিতেছেন, এমন সময় অপর কেহ ব্যস্ত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলেন; অমনি মহারাজ প্রভৃতি বাধা দিয়া কহিলেন, "পূর্ণ যখন কথা বলবে, তোমরা চুপ করে শুনবে।" ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী কলকাতায় ফিরিলে তাঁহাকে যখন শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে পূর্ণবাবুর গৃহের সম্মুখে গাড়ি থামাইয়া পূর্ণবাবুকে ডাকিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাঠাইলেন। পূর্ণবাবু সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড়ের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার আড়ম্বর ও স্বামীজীকে দর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া অফিসে যাইবার আগে স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে ঐ অবস্থায়ই বাহিরে আসিলে স্বামীজী সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দিল্লী ও সিমলায় থাকাকালেও তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার কাশ্মীর-ভ্রমণান্তে তাঁহার সিমলার বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপর অনেকেও তথায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল। কাহাকেও অর্থাদি দ্বারা তিনি সাহায্য করিতেন। গিরিশবাবুর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে পূর্ণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে গিরিশ করজোড়ে বলিলেন, "ভাই, আশীর্বাদ কর, যেন প্রতিমুহূর্তে ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারি। জয় রামকৃষ্ণ।" পূর্ণ কোমল-স্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

বিবেকানন্দ সমিতির সদস্যবৃন্দের অনুরোধে তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে উহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাসমাগমে শঙ্কর ঘোষ লেনে সমিতি-ভবনে যাইয়া স্বয়ং ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিতেন এবং অপর সকলকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালেই মাদাম কালভে কলকাতায় আসেন। পূর্ণবাবু সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সভ্যগণসহ গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের ফটো তাঁহাকে উপহার দেন। ঐ পদে তিনি এক বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন; অতঃপর সিমলা চলিয়া যাওয়ায় উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

অফিসের ছুটির পর তিনি সিমলা পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন—গৃহে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। সেখানে গুরুভ্রাতারা ছিলেন না, আশ্রমাদিও ছিল না; সুতরাং শ্রীগুরুর স্মরণ-মননের উপায় এতদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে বাহিরে ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও অন্তরে উহা সর্বদাই ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইত এবং কোন কারণে উপরের আবরণ একটু সরিলেই স্বচ্ছ জলধারা বাহির হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে,

প্রফুল্লকুমার ব্যানার্জী মহাশয় একদিন সিমলার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত পুলিন মিত্র ভগবৎ-সঙ্গীত করিতেছেন এবং পূর্ণবাবুর দুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। ইহার পরেও অনেকক্ষণ তাঁহার চক্ষু লাল হইয়াছিল। অপর একদিন ভ্রমণের সময় তাঁহাকে আনমনা দেখিয়া পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহবোধ আছে কিনা। ইহার উত্তরে পূর্ণবাবু গলায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, উপরের অংশটিরই শুধু আছে, নিম্নের কোন বোধ নাই। ফলত তিনি অধ্যাত্মভূমিতেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনেরও একটা ধারা ছিল। অবসর সময়ে তিনি পড়াশোনা যথেষ্ট করিতেন এবং সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। ব্যায়ামাদির ফলে তাঁহার শরীর বেশ সবল ও সুদৃঢ় ছিল; সিমলা পাহাড়ে গোরাদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে তাঁহাকে দুই-একবার এই শক্তিপ্রয়োগও করিতে হইয়াছিল এবং জয় হইয়াছিল তাঁহারই।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়সে কঠিন রোগে পূর্ণবাবুর জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হন। তদবধি রোগের গতি পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি শীঘ্রই সুস্থ হন। প্রেমানন্দ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "ছেলেমেয়েরা খুব কম বয়সী বলে ঠাকুর ওঁর পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন।"

পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা বুঝিতেন। যাঁহারা দেশের জন্য কারাবরণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীর তুল্য মনে করিতেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ ছিল, দোষদর্শন না করিয়া গুণগ্রাহী হওয়া। ধনী জমিদার ও সুপুরুষ শ্যাম বসু মহাশয়ের সর্বপ্রকার বৈষ্ণবোচিত বাহ্য সদাচারের সহিত চরিত্রগত দুর্বলতাও ছিল। তিনি পূর্ণবাবুর নিকট খুবই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জনৈক যুক্তিবাদী যখন পূর্ণবাবুকে ঈদৃশ অসঙ্গতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "শ্যামবাবুর দোষ আছে বটে; কিন্তু সে যা করে একাই করে—দল নিয়ে করে না। কিন্তু তার যা গুণ আছে, তা খুব কম লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—সেটা সত্যানুরাগ। সে যদি কোন বিষয়ে কোন কথা দেয়, তা সে রাখবে—হিমালয়ের মতো অচল অটল! আর কেউ বিপদে পড়লে বা কারুর কষ্ট দেখলে সে সাহায্য করে—অবজ্ঞা করে না।" পূর্ণবাবুর সাহচর্যে এই গুণরাশি বর্ধিত হইয়া শ্যামবাবুর চরিত্রে অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়াছিল এবং তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল।

পূর্ণবাবু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ অল্প বয়সে দেহত্যাগ করবে, তা না

হলে সন্ন্যাস নিয়ে সংসারত্যাগ করবে;"..."ওকে যদি সংসারে আবদ্ধ করা হয়; ওর বেশিদিন দেহ থাকবে না।" ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংক্রান্তি, ৩০ কার্তিক, (১৬ নভেম্বর ১৯১৩) রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি মাত্র বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই জ্বরে ভুগিয়া তাঁহার শরীর অতি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে তাঁহার অফিসের অধস্তন কর্মচারী আশুবাবু একদিন তাঁহার রোগক্লিষ্ট দেহ দেখিয়া আক্ষেপসহকারে বলেন, "ঠাকুর যদি এখন থাকতেন, তা হলে আপনার এই অবস্থায় তিনি কী করতেন!" এই কথা শুনিয়াই পূর্ণবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং আশুবাবুর উপর তাঁহার জ্বলন্ত দুইটি বড় বড় চক্ষু রাখিয়া সতেজে বলিলেন, "তিনি গেছেন কোথায়?" অপ্রস্তুত আশুবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলে তিনি একটু শান্ত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, কাল রাত্রে প্রস্রাব করতে বারান্দায় কোনরকমে দেয়াল ধরে ধরে গেছলাম। ঘরে অবশ্য লোক থাকে; কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল বলে তাকে আর জাগাই নি। একাই ঐ ভাবে বারান্দায় যাই। কিন্তু ফেরার সময় উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন।"

দেহত্যাগ তাঁহার অতি শান্তভাবেই হইয়াছিল—বাড়ির কেহ বুঝিতেই পারেন নাই। মুখে তখন তাঁহার দিব্য কান্তি ও শান্তি—ব্রহ্মতালু তখনও গরম। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, দুইতিন ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হইয়াছে। ঠাকুরের লীলা যেমন অদ্ভুত—তাঁহার সহচরবৃন্দের জীবনও তেমনি অপূর্ব ও মানববুদ্ধির অগম্য!

# মথুরানাথ বিশ্বাস

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্বার্ধ ও সাধকভাব) সবিস্তারে মথুরানাথের[১] চরিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত হওয়ায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের যাঁহারা অনুধ্যান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ভক্তপ্রবরের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-অবলম্বনেই ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলনে অগ্রসর হইলাম।

সাধনকালে একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা জাগিয়াছিল, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, রসেবসে রাখিস।" মথুরানাথের সহিত ঠাকুরের যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা উক্ত প্রার্থনারই পরিণতিবিশেষ। কারণ এই প্রার্থনার উত্তরস্বরূপে ৺জগন্মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদদার তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছেন এবং মথুরানাথই তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। ইঁহাদের সম্বন্ধ বড়ই মধুর অথচ চমকপ্রদ ছিল। পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার দেখাইয়াছেন যে, একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপর দিকে তেমনি আবার তিনি ঠাকুরকে অনভিজ্ঞ বালকপ্রায় জানিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণাদিতে তৎপর থাকিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মথুর শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইহকাল ও পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন; অন্যপক্ষে আবার ঠাকুরের কৃপাও মথুরের প্রতি অপরিমিত ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও অচিরে উহা ভুলিয়া গিয়া আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের চেষ্টা করিতেন। বস্তুত ইঁহাদের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট এবং অতীব প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, এবং দৈবনির্দিষ্ট ছিল বলিয়াই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্পবয়স মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল।

মথুরবাবু রানী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করিয়া রানীরই গৃহে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পকাল পরে একমাত্র পুত্র ভূপালকে রাখিয়া করুণাময়ী পরলোকগমন করিলে রানী এই উপযুক্ত জামাতাকে পরিবারের সহিত চিরসম্বদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহার হস্তে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বাকে অর্পণ করেন।

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গে' মথুরানাথ নামের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; স্থলবিশেষে মথুরামোহন নামও ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতঃপর রানীর পতি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্ম-পরিচালনের জন্য মথুরবাবু রানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মথুরবাবুর জাগতিক অভ্যুদয়ের দিক লক্ষ্য না করিয়া প্রধানত তাঁহার ধর্মজীবনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে যতই দেখিতেছিলেন, ততই অধিক আকৃষ্ট হইতেছিলেন। একদিন ঠাকুরের শ্রীহস্তে গঠিত এক সুন্দর শিবমূর্তিদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং রানীকে উহা দেখাইলেন। তদবধি তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিল, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবপূজায় লাগাইতে হইবে। এইরূপে মথুরেরই আগ্রহে তিনি ৺ভবতারিণীর পূজকপদে ব্রতী হন। ইহার পরে তিনি কিরূপে ৺রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা আমরা রাসমণি-প্রসঙ্গে বলিব।

বিবাহান্তে পূর্ণযৌবন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া যেভাবে গৃহসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া দিব্যোন্মাদে সাধনায় ডুবিলেন, তাহা দেখিয়াও মথুরবাবু মুগ্ধ হইলেন; তাদৃশ আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মর্মোপলব্ধিতে অসমর্থ কর্মচারীরা অবশ্য অভিযোগ জানাইলেন, "ছোট ভট্‌চাজ সব মাটি করলে! মার পূজা-ভোগ-রাগ কিছুই হচ্ছে না; ওরকম অনাচার করলে মা কি কখনও পূজা-ভোগ গ্রহণ করেন?" ইহাতেও মথুর বিচলিত না হইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য একদিন অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের ভাববিহ্বলতা দেখিলেন এবং যাইবার সময় আজ্ঞা দিলেন, "ছোট ভট্‌চাজ মশায় যেভাবে যাই করুন না কেন, তোমরা তাঁকে বাধা দিবে না। আগে আমাকে জানাবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করবে।" ইহারও পরে ঠাকুর আরও কিছুদিন পূজা চালাইলেন; কিন্তু পরে স্বীয় ভাবাবেগকে বৈধীভক্তির সীমার ভিতর রুদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া একদিন ভাগিনেয় হৃদয়কে পূজাসনে বসাইয়া মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে হৃদয় পূজা করবে। মা বলছেন, আমার পূজার মতো হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করবেন।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সাধনাদির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কর্তব্যনির্মুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরের প্রয়োজন জানিয়া তিনি তাঁহার জন্য মিছরির সরবতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অন্য বিবিধরূপে তাঁহার সাধকজীবনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেদিন রানী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিলেন[১] সেদিন মথুরেরও মনে সন্দেহ জাগিল যে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ ঘটিয়াছে। অতএব কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার

১ 'রানী রাসমণি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বন্দোবস্ত করাইলেন। অধিকন্তু তর্কযুক্তিসহায়ে ঠাকুরের মনকে অধিকতর সুসংযত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্তু এই ক্ষেত্রে মথুরেরই পরাজয় ঘটিল। একদিন যুক্তিবাদী মথুরবাবু বলিলেন, "ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে উত্তর দিলেন, "ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।" মথুর সে কথা না মানিয়া বলিলেন, "লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি করুন দেখি।" পরদিন শৌচে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুইটি ফেঁকড়িতে দুইটি ফুল—একটি লাল, অপরটি ধপধপে সাদা। অমনি উহা আনিয়া মথুরকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ!" মথুরও স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।"

এই-সকল উপায় ছাড়া মথুরবাবু অন্যভাবেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তথাকথিত রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সময়ে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে। তাই ব্রহ্মচর্যভঙ্গের জন্য একদিন কলকাতার মেছুয়াবাজার পল্লিস্থ একভবনে তাঁহাকে বারনারীকুলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরন্তু ঠাকুর "মা, মা" বলিতে বলিতে বাহ্য চৈতন্য হারাইলেন এবং ঐ সকল নারীর হৃদয় তাদৃশ পবিত্রতা-দর্শনে বিগলিত হইল। তাহারা সশঙ্কচিত্তে সে মহাপুরুষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল।

মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশালী এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংরেজি-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না—এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন আর গুরুই হউন বা অন্য যে-কেহই হউন। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ। ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও এই মনোভাবের আশ্রয়েই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে মথুরবাবু প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য ঘটনাবলী ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে ঠাকুর শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ভাবাধিক্যে স্তবপাঠে অসমর্থ হইয়া সাশ্রুনয়নে কেবলই বারবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!" মন্দিরের কর্মচারীরা ভাবিলেন যে ছোট ভট্টাচার্যের পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে—হয়তো শিবের উপর চড়িয়া বসিবেন; সুতরাং হাত ধরিয়া সরাইয়া দেওয়াই ভাল। গোলমাল শুনিয়া মথুরবাবু তথায় আসিলেন এবং ঠাকুরের ভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন এখন ভট্চাজ মহাশয়কে স্পর্শ করতে যায়।" শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরকে পাছে কেহ বিরক্ত করে, এইজন্য তিনি বাহ্য ভূমিতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মথুর তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন তখন ঠাকুরের গুরুভাবের অধিকাধিক বিকাশ হইতেছে এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিবিধ তান্ত্রিক সাধনে তাঁহার অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়া ও শাস্ত্রের সহিত সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া লইয়া দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছেন যে, ঠাকুর অবতার। ব্রাহ্মণীর নিকট উহা শ্রবণপূর্বক বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণী বলে যে, অবতারদের যে সকল লক্ষণ থাকে, তা এই শরীর-মনে আছে।" মথুর শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তিনি যাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই। সুতরাং তাঁর কথা সত্য হবে কি করে? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হয়েছে, একথা সত্য।" বলিতে না বলিতেই ভৈরবী তথায় উপস্থিত! অমনি সরলতার প্রতিমূর্তি ঠাকুর তাঁহাকে মথুরের অবিশ্বাসের কথা জানাইলেন। ভৈরবী তখন ভাগবতাদি শাস্ত্রাবলম্বনে প্রমাণ করিলেন যে, অবতারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই; অধিকন্তু ইহাও বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত ঠাকুরের দেহমনে প্রকাশিত লক্ষণসমূহের সৌসাদৃশ্য আছে। সমস্ত শুনিয়া মথুরকে সেদিন নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু ঠাকুর উহাতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি এই বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে থাকায় মথুরবাবু অগত্যা পণ্ডিতসভার আহ্বান করিলেন। তাহাতে বৈষ্ণবচরণাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণী শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বনে এমন ভাবে স্বপক্ষ প্রতিপাদন করিলেন যে, অবশেষে তাঁহারই জয় হইল। মথুরের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির অতঃপর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কথাটার একটা গুরুত্ব আছে—উহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মথুরবাবু শুধু পরীক্ষা করিয়া, যুক্তিতে পরাজিত হইয়া বা জ্ঞানী ও সিদ্ধদের কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নাই। ঠাকুরের অসাধারণ

ত্যাগ-বৈরাগ্যাদিও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজ বাটিতে লইয়া যাইতেন এবং নানাভাবে তাঁহার সেবা করিতেন। কোন দিন হয়তো তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক প্রস্থ বাসন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দিলেন এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি পরাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিই তো এই সকলের (বিষয়ের) মালিক; আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়।" কোন দিন হয়তো তিনি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক জোড়া বেনারসী শাল ক্রয় করিলেন এবং "এমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব" ভাবিয়া নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের ন্যায় আহ্লাদে এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকেরই ন্যায় পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, ঐ শালখানি পঞ্চভূতের বিকার বই কিছুই নহে, উহাতে সচ্চিদানন্দলাভ হয় না; বরং অভিমানের বৃদ্ধিবশত মন ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যায়। অমনি উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন; এমন কি, পোড়াইবারও উপক্রম করিলেন। এমন সময় কে একজন আসিয়া উহা রক্ষা করিল। মথুরবাবু যথাকালে শালের দুর্দশার সংবাদে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, "বাবা বেশ করেছেন।" তিনি বিষয়ী হইলেও ঠাকুরের সান্নিধ্যগুণে তখন বৈরাগ্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মানুষ নন; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করবে? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান।" তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন তাহা নহে—কার্যতও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মথুরের এই প্রকার একান্ত বিশ্বাস গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই অনুভূতির ইতিহাস 'লীলাপ্রসঙ্গ'কারের নিপুণ লেখনীমুখে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রানী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে আগমন হইয়াছিল। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের প্রারম্ভ হইতেই মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার

পূর্ণভাবে পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি বারংবার বিবিধভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কিনা, তদ্বিষয়ে তিনি তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তন্ত্রসাধনকালে মথুরের মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই সময়ে অলৌকিক বিভূতি সকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ-অবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী করিতেছেন। নিম্নোক্ত দর্শনটি মথুরের মনে এইপ্রকার বিশ্বাসোৎপাদনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

তখনও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট ঠাকুরের চিকিৎসা চলিতেছে; অথচ রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন, "ইঁহার দিব্যোন্মাদ-অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি; ঔষধে সারিবার নহে।" এই সময়ে ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় গোঁভরে পদচারণ করিতেছিলেন আর এদিকে কুঠির একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু আপনমনে বসিয়া কখনও বিষয়চিন্তা করিতেছিলেন, কখনও-বা ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া ঠাকুরের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু মথুর সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও—আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই। এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই বুঝান, মথুর ততই কাঁদেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখান্তে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীরধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত। একবার ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে

পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেমন পাঁইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ হইলে মথুরবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন। আর একবার বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব সাধনকালে ঠাকুরের মনে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবার ইচ্ছা জাগিলে মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক প্রস্ত ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। পাণিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে তাঁহার অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমাদিগকে চমৎকৃত করে, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎভাবের উদয় হয় কিনা পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুরের ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করতে চাস?"—বলিয়া শ্রীযুত মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারকামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকারপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া শ্রীযুত মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সম্বল এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্যাদালাভের মূলীভূত কারণ। ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরবাবু যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালে অনুষ্ঠিত কার্যে পাইয়া থাকি। তিনি এই সময়ে (১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটি কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহার পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তদনুসারে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তদ্‌গতপ্রাণ মথুরবাবু দেবদেবীসেবার ন্যায় সাধুভক্তের সেবায়ও বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাই ঠাকুর যখন এইকালে সাধুভক্তদিগকে অন্নদানের সহিত দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্রকম্বলাদি ও নিত্য ব্যবহার্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্রদানের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বলিলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটির একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিলেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দিলেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে জাগ্রত হইলে, মথুরবাবু উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবত ১২৬৯-৭০ সালেই ঐরূপ সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ভক্তির একটা সংক্রামিকাশক্তি আছে। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি তিনি একবার দেখিবেন ও বুঝিবেন; তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, আমার যাতে ভাবসমাধি হয় তা তোমায় করে দিতেই হবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস—এদিক ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হলে এদিকে থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বারো ভূতে সব যে লুটে খাবে! তখন কি করবি?" ঠাকুর আরও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মথুর তথাপি ছাড়িলেন না দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, "তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।" তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীযুক্ত মথুরের একদিন ভাবসমাধি হইল! ঠাকুর বলিতেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়, চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে! আর বুক থর থর করে কাঁপছে। আমাকে দেখে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—'বাবা, ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না। সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে'।" তখন ঠাকুর হাসেন আর বলেন, "তোকে তো একথা আগেই বলেছি।" উত্তরে মথুরবাবু বলিলেন, "হাঁ, বাবা; কিন্তু তখন কি অত শত জানি যে, ভূতের মতো এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ-ঘণ্টা ফিরতে হবে? ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না।" তখন ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

আর একবার শ্রীযুক্ত মথুরকে ভাববিহ্বল হইতে দেখা গিয়াছিল। সেবার ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্তা জগদম্বা দাসীর দ্বারা পুরনারীর ন্যায় বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যারতির সময়ে চামরহস্তে দেবীকে বীজন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রকৃতিভাব এত সুব্যক্ত হইয়াছিল যে, মথুরবাবু পর্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সখীভাব-সাধনকালে ঠাকুর স্ত্রীবেশে অনেক সময় মথুরানাথের বাড়ির অন্তঃপুর-চারিণীদের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রী-আচারাদিতে পর্যন্ত যোগ দিতেন যে, অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া মনে হইত না; পুরনারীদের মনেও তাঁহার উপস্থিতিজনিত কোন সঙ্কোচ হইত না। সে যাহা হউক, পূজা সেবারে খুব জমিয়াছিল এবং মথুরবাবু আনন্দে ভাসিতেছিলেন। এদিকে বিজয়া দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমাবিসর্জনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইলেন, "বাবুকে নিচে এসে প্রণাম-বন্দনাদি করে যেতে বল।" মথুরের নিকট সংবাদ পৌঁছিলে আনন্দচিন্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাটা বুঝিতেই পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাবিলেন, "না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না। মাকে বিসর্জন! মনে হলেও যেন প্রাণ কেমন করে ওঠে।" তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বার বার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা হবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হবে—খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। একে একে বাটিরগণ্যমান্য অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি তখনও অটল। অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া বসিলেন যে, বাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে। অথচ হঠকারী মথুরের ভয়ে কেহ বিসর্জনের নির্দেশ দিতেও সাহস পাইলেন না। অবশেষে মথুরগৃহিণী ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর যাইয়া দেখেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি মাকে বিসর্জন দিতে পারিবেন না—প্রাণ থাকিতে নয়। ঠাকুর তখন তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ! এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনও থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।" সে অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে মথুরবাবু অচিরে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমা-বিসর্জনও নির্বিবাদে হইয়া গেল।

মথুরের যেমন ঠাকুরের নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, ঠাকুরেরও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখনও কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে অমনি তিনি মথুরকে বলিতেন। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হলো, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর ঠাকুর মথুরের উপাস্য হইলেও বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরতার ঘনমূর্তি সেই ঠাকুরকেই আবার সময়ে সময়ে মথুর নানা কথায় ভুলাইতেন ও বুঝাইতেন। বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত। তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া ঠাকুর একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এ কি ব্যারাম হল বল দেখি? দেখলুম প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার এ কি হলো?" মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে কুভাবের উদয় করে, কুকাজ করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল। এতে ভাবনা কেন?" ঠাকুর শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় একথা বললুম; জিজ্ঞাসা করলুম!" বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর কথায় কথায় মথুরকে বলিলেন যে, ৺জগদম্বার কৃপায় তিনি অবগত হইয়াছেন, ঈশ্বরীয় বিষয় জানিবার জন্য ও প্রেমভক্তিলাভের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুরের নিকট আসিবে। বলিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি বল? এসব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি?" মথুর কহিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরি করছে কেন? শিগ্‌গির শিগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

ইহারই মধ্যে শ্রীযুক্ত মথুরের মনে তীর্থদর্শনের বাসনা জাগিল এবং প্রায় সাত মাস কামারপুকুরে অবস্থানের পর ১২৭৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ উন্নততর স্বাস্থ্য লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলে মথুর স্থির করিলেন যে, তাঁহার পূর্বসঙ্কল্পিত তীর্থদর্শন গমনকালে ঠাকুরকেও সঙ্গে লইবেন। এই প্রস্তাবে ঠাকুর

সম্মত হইলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭ জানুয়ারি, ১৮৬৮) তীর্থযাত্রা করিলেন।[১] দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি রেলগাড়ি রিজার্ভ করিয়া মথুরবাবু পত্নী ও শতাধিক বন্ধুবান্ধবসহ 'বাবা'কে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে বৈদ্যনাথে দর্শন ও পূজাদির জন্য কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে ঘটিয়াছিল। দেওঘরের এক দরিদ্র পল্লির স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মার দেওয়ান। এদের একমাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর প্রথমে একটু পেছপাও হইলেন; বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?" সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া তাঁহার কথামত সকল কার্য করিলেন। বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত কাশী গমন করিলেন।

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশীধামে পৌঁছিয়া মথুরবাবু কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটি ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ কারণে এবং বাটির বাহিরে কোনস্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কৃপণ মথুর ঠাকুরের কথায় কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন; আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। ঠাকুরকে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় তিনি কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না; বলিলেন, "একটি কমণ্ডলু দাও।" তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল। কাশীতে থাকা কালে মথুরের ব্যবস্থানুসারে ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ পানসিতে চাপিয়া বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবী-দর্শনেরও সমুচিত ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন।

---

১ "ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান...(১৮৬৩ খ্রিঃ)। দ্বিতীয় তীর্থগমন...১৮৬৮ খ্রিঃ—মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে" ('কথামৃত' ১ম ভাগ, ৫ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪)।

পাঁচ-সাত দিন কাশীতে অবস্থানের পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রিবাস করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে মথুরবাবু পুনরায় কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং একপক্ষকাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটিতে উঠিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থান-সকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। একপক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশদর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুরের গয়াধামে যাইবার বাসনা ছিল; কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কলকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটির-মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলেন, "আজ হতে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হলো।" উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত তীর্থসকল-দর্শনের পর ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সহিত কালনা ও নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। কালনায় ঠাকুর একদিন ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া মথুরবাবুর নিকট বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করেন। মধুরবাবুও উহা শুনিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যান এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা এবং একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা সম্ভবত ১২৭৭ বঙ্গাব্দের কথা।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি-মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। মথুরের জমিদারি-মহলের একস্থানে পল্লিবাসী স্ত্রীপুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন' দান করান। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া চুর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন তাঁহার জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তিনি এই সময়ে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। এখান হইতে তাঁহার গুরুগৃহ অধিক দূরে ছিল না। বিষয়-সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগরো। মথুরবাবু তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কামভাবে উপনীত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট। এক সময়ে শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হওয়ায় মথুরবাবু শয্যাগত ছিলেন। ঠাকুরের দর্শনের জন্য ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি গিয়ে কি করব—তার ফোড়া আরাম করে দেবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া শ্রীযুক্ত মথুর লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। তিনি উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধুলা দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধুলা নিয়ে কি হবে, ওতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হবে?" মথুরবাবু তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি? তোমার পায়ের ধুলা কি ফোড়া আরাম করবার জন্য চাচ্ছি? তার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধুলা চাচ্ছি।" এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত মথুরকে বলিলেন, "মথুর, তুমি যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে থাকব।" মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, "সে কি, বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।" মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারী যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।" ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল।

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ-সমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়ের অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশ উহা বৃদ্ধি পাইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাঁহার ভক্তকে স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন মথুরকে দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাঁহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন। ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন; তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠালেন—তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গেল।" পরে গভীর রাত্রে কালীঘাটের কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় (১৬ জুলাই, ১৮৭১; ১ শ্রাবণ, ১২৭৮) দেহরক্ষা করিয়াছেন।

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর মথুরের কি হলো মশায়? তাঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য অন্য কথা পাড়িলেন।

# শম্ভুচরণ মল্লিক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ[১] মল্লিক মহাশয়ের পিতার নাম ছিল সনাতন মল্লিক। ইনি পিতার একমাত্র পুত্র এবং ইঁহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইঁহাদের বাড়ি ছিল কলকাতার সিদুরিয়াপটি পল্লিতে। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দিরের নিকটে তাঁহার যে উদ্যানবাটি ছিল, সেখানেও তিনি প্রায়ই বাস করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত, এবং বিশেষত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক বিদেশী সওদাগরের অফিসে মুৎসদ্দী কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দান, চরিত্রবল ও ভক্তিমত্তার জন্য তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ধনী হইলেও বাগবাজার হইতে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাটিতে আসিতেন। একজন বলিয়াছিলেন, "অত রাস্তা; কেন গাড়ি করে আস না? বিপদ হতে পারে।" ইহাতে শম্ভুবাবু মুখ লাল করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "কি? তাঁর নাম করে বেরিয়েছি—আবার বিপদ?" এমনি ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার দান ছিল অজস্র—প্রার্থী কেহ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না। ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্কবশত ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মন বেশ উদার ছিল; তিনি বাইবেলাদি গ্রন্থ পড়িতেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে তিনি একবার সঙ্গে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ৺কালীমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থানের ফলে ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় সহজেই হইয়াছিল। ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার উদ্যানবাটিতে যাইয়া দীর্ঘকাল ভগবদালাপনে কাটাইতেন; তাই গর্ব করিয়া মল্লিক মহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস।" ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি সে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে এই চিন্তায় যে, ভগবানও তাহার অন্বেষণে ফিরেন।

শম্ভুবাবুর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ৺জগদম্বার বিধানে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি সেবায়ত বা রসদদার নিযুক্ত হইবেন—"তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ, তাঁহার মাথায় তাজ।"

যখন অনেক দিন পর মল্লিক মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল তখন ঠাকুর বুঝিলেন, "একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি।" শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' ১ম ভাগ সাধকভাবে (২২৩ পৃঃ) শম্ভুচরণ এবং উহার গুরুভাব—পূর্বার্ধে (২৯ পৃঃ) শম্ভুচন্দ্র নামের উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারীদের হস্তগত দলিলে শম্ভুনাথ নামও দেখা যায়।

দেহত্যাগের পর (১৬ জুলাই, ১৮৭১) পানিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অচিরে শম্ভুবাবু ঐ কার্য স্বহস্তে তুলিয়া লওয়ায় মণিমোহন অধিক সেবার সুযোগ পান নাই। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ পর্যন্ত শম্ভুবাবু একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন। তাঁহাদের কোনরূপ অভাব—যথা খাদ্যসামগ্রী বা কলকাতা যাতায়াতের গাড়িভাড়া ইত্যাদি—জানিতে পারিলেই তিনি উহা অকাতরে মিটাইয়া দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু।" শম্ভুবাবু তথাপি বিরত না হইয়া আপনভাবেই গুরুজীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। মল্লিকজায়াও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি অশেষ ভক্তিবিশ্বাস পোষণ করিতেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের অবস্থানকালে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা করিতেন।

শ্রীমা ৺কালীমন্দিরের সংশ্লিষ্ট স্বল্পপরিসর নহবতে কষ্টে দিনযাপন করেন দেখিয়া শম্ভুবাবু ৺কালীবাটির উদ্যানের পার্শ্বে একখণ্ড জমি ২৫০ টাকা ব্যয়ে মৌরসী করিয়া লন। তিনি পরে নেপাল সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত কাপ্তেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সাহায্যে ঐ জমিতে শ্রীমায়ের বাসের জন্য একখানি কুটির প্রস্তুত করেন এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল ঐ জমি ও বাটির দানপত্র লিখিয়া দেন। অন্যভাবেও তিনি মাতাঠাকুরানীর সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একবার শ্রীমা আমাশয়ে আক্রান্তা হইলে শম্ভুবাবু তাঁহার চিকিৎসার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

শম্ভুবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে তিনি আধ্যাত্মিক পথে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণার্থে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহাদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেন, "আমার ইচ্ছা, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি"; বা "আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।" ঠাকুর তাঁহার অনুগত ভক্তকে শুধু সমাজসেবার স্তরে ফেলিয়া না রাখিয়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই শম্ভুবাবুর ঐরূপ প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের সাক্ষাৎকার হলে কি হাসপাতাল ডিস্পেনসারী চাইবে?"

আর বলিয়াছিলেন, "এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি। ... সম্মুখে যেটা পড়ল—না করলে নয়—সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশি কাজ জড়ানো ভাল নয়।" বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুকে তাঁহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দিতে বলেন নাই, বা তাঁহার অনুসৃত কর্মযোগমার্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবানলাভ, সেই বিষয়েই তিনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার দোষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ফলত ঠাকুরের উপদেশ কখনও কেবল নেতির পথ অনুসরণ করিত না—দুর্বল মানবকে তিনি ইতির পথেই চালাইতেন। শম্ভুবাবুকে ঐরূপ উপদেশদানের কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "লোকটা ভক্ত ছিল, তাই আমি বললুম...।" আর তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন, "এসব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ—হাসপাতাল ডিস্পেনসারী করা নয়। ...কর্ম আদিকাণ্ড, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব অমূল্য উপদেশ যে সফল হইয়াছিল, তাহা আমরা শম্ভুবাবুর আলাপ-আলোচনা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি শ্রীযুক্ত হৃদয়কে একদিন বলিলেন, "হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি।" ইহাতে ঠাকুর যখন আপত্তি করিতেন, "কি অলক্ষণে কথা কও", তখন শম্ভু বলিতেন, "না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।" ভগবানে তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একদিন রাঙ্গা মুখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

শম্ভুবাবুর দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব লীলাবিলাস হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যিশুর দর্শনলাভের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুরই নিকটে "বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের ও সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে শম্ভুবাবুর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঠাকুরের একবার পেটের অসুখ হইলে শম্ভুবাবু তাঁহাকে একমাত্রা আফিম খাইতে এবং যাইবার সময় উহা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইয়া যাইতে বলেন। ঠাকুর ঐ উদ্যানে গেলে প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা সদালাপে কাটাইতেন। সেদিনও অনেক সময় ঐভাবে কাটিয়া গেলে উভয়েই আফিমের কথা ভুলিয়া গেলেন। পথে আসিয়া ঠাকুরের উহা স্মরণ হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভুবাবু অন্দরে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কর্মচারীর নিকট উহা চাহিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। কিন্তু শম্ভুবাবুর নিকট না চাহিয়া

কর্মচারীর নিকট চাহিয়া লওয়ায় যে সত্যচ্যুতি হইল তাহারই ফলে ঠাকুর পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন কারণ বুঝিতে পারিয়া আফিম ফিরাইয়া দিতে আসিয়া তিনি দেখেন, কর্মচারীও নাই, দরজা বন্ধ। অগত্যা জানালা গলাইয়া মোড়কটি ভিতরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রইল।" তারপর দেখেন, চোখ সাফ হইয়া গিয়াছে, স্বকক্ষে ফিরিতে আর কোনও কষ্ট হইল না।

আর একদিন ঠাকুরের সতীর্থ শ্রীযুক্ত গিরিজা ও শম্ভুবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেলে ঠাকুর যখন মন্দিরে ফিরিবার জন্য রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন গভীর অন্ধকারে দিক ঠিক করিতে পারিলেন না। ঐসময় গিরিজা স্বীয় যোগশক্তিবলে পৃষ্ঠভাগ হইতে ছটা বাহির করিয়া মন্দিরোদ্যানের প্রবেশপথ পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিলে ঠাকুর উহার সাহায্যে স্বস্থানে ফিরিলেন।

শম্ভুবাবুর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। চারি বৎসরকাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের সেবা করিয়া শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শম্ভুর প্রদীপে তেল নাই।" বহুমূত্ররোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভু শরীররক্ষা করিলেন। পীড়িতাবস্থায়ও তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। শম্ভুবাবুর পৈতৃক বাড়ি যে রাস্তার উপর ছিল, উহার নাম ছিল কমলনয়ন স্ট্রিট; কিন্তু পরে শম্ভুবাবুর স্মরণার্থে উহার নামকরণ হয় শম্ভু মল্লিক লেন।

# নাগ মহাশয়

'নাগ মহাশয়' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের পর্ণকুটির আলোকিত করিয়া ১২৫৩ সালের ৬ ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে (১৮৪৬ খ্রিঃ, ২১ আগস্ট) জন্মগ্রহণ করেন। নাগ মহাশয়ের আট বৎসর বয়সের সময় মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদামণিকে বিধবা ননদিনী ভগবতীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। বালবিধবা অতি যত্নে ভ্রাতৃসন্তানদ্বয়ের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পিসিমাকে নাগ মহাশয় মা বলিয়াই জানিতেন।

পিতা দীনদয়াল কলকাতায় কুমারটুলিতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল চৌধুরীদের গদিতে চাকরি করিতেন। তাঁহার বাসাবাটি ছিল একখানি খোলার ঘর। পালবাবুরা দীনদয়ালকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। নির্লোভ দীনদয়াল একবার নৌকাযোগে বাবুদের নুন লইয়া কলকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিলেন। তখন জাহাজ-চলাচল আরম্ভ হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আর অগ্রসর না হইয়া তিনি তীরে একখানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ি ও তন্নিকটে দুইখানি কৃষকের গৃহ দেখিয়া রাত্রিযাপনের জন্য নৌকা নঙ্গর করিতে বলিলেন। প্রভাতে উঠিয়া শৌচের জন্য তিনি ভাঙ্গাবাটির পার্শ্বে বসিয়া অভ্যাসবশত নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতেছেন, এমন সময় মনে হইল টাকার মতো কি যেন হাতে ঠেকিতেছে। উৎসুক হইয়া আরও মাটি সরাইয়া দেখিলেন পুরাতন আমলের মোহরপূর্ণ একটি ঘড়া প্রোথিত রহিয়াছে। অমনি বিষধর-সর্পবৎ উহাকে দ্রুত পরিহারপূর্বক—দীনদয়াল নৌকায় গিয়া উঠিলেন এবং মাঝিরা শৌচাদির জন্য বিলম্ব করিতে চাহিলেও বলিলেন যে, সেখানে ভয়ের কারণ আছে, নৌকা অবিলম্বে ছাড়িতে হইবে। অগত্যা তাহাই হইল।

মিষ্টভাষী, সুশীল, হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকেশ বালক দুর্গাচরণকে দেওভোগের প্রতিবেশিনীরা সকলেই ক্রোড়ে তুলিয়া আনন্দ করিতেন; কিন্তু কেহ কোন খাবার দিলে সে উহা গ্রহণ করিত না। সন্ধ্যার সময় তারাখচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালক কখন পিসিমাকে আবদার করিয়া বলিত, "চল মা, আমরা ওদেশে চলে যাই—এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না;" চন্দ্র উদিত হইলে সে আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিত; বাতাসে দোদুল্যমান বৃক্ষ দেখিয়া বলিত, "মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলব;" আর অমনি হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের অনুকরণে মধুর অঙ্গসঞ্চালনপূর্বক পিসিমার মনোহরণ করিত। পিসিমা পুরাণের গল্প বলিতে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। গল্প শুনিয়া বালক রাত্রে দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখিত। বাল্যক্রীড়ায়

তাহার তেমন মন ছিল না; তবে সঙ্গীদের আগ্রহে কখনও কখনও ক্রীড়ায় যোগ দিত। দলের জয়লাভের জন্য অন্য বালকেরা তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে বলিলে বালক অস্বীকার করিত; কিন্তু ইহার ফলে সময়বিশেষে প্রহার খাইয়া শরীর রক্তাক্ত হইত, অথচ বাড়িতে আসিয়া পিসিমার নিকট সে কোন অভিযোগ করিত না। তবে তাহার সত্যবাদিতা ও শান্তস্বভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে হইত এবং প্রায়ই তাহার ঐ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইত।

নারায়ণগঞ্জে একটিমাত্র বাঙলা বিদ্যালয়ে কেবল তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপন চলিত। এই সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নান্তে পাঠ বন্ধ হইয়া গেলে নাগ মহাশয় জ্ঞানস্পৃহা-পরিতৃপ্তির জন্য একদিন পিসিমার অজ্ঞাতসারে কোঁচার খুঁটে চারিটি মুড়কি বাঁধিয়া পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ দূরে ঢাকা নগরীতে বিদ্যালয়ের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সেখানে নর্ম্যাল স্কুলে পড়া ঠিক হইল। এদিকে পিসিমা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মহা উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন; সন্ধ্যার সময় গৃহাগত বালকের মুখে যখন শুনিলেন যে, পরদিন হইতেই তাঁহাকে আটটায় ঢাকা যাত্রা করিতে হইবে, তখন তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তিনি সহজেই সম্মত হইলেন এবং প্রত্যহ যথাসময়ে রন্ধন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে দেড় বৎসর পাঠ চলিয়াছিল। ইহার ভিতর মাত্র দুই দিন নাগ মহাশয় কামাই করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত বড় সহজসাধ্য ছিল না। সন্ধ্যায় বাটি ফিরিবার সময় এক স্থানে তিনি কয়েকবার একটি ভূত দেখিয়াছিলেন। প্রথমবারে দেখিলেন, ভূতটি একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নাগ মহাশয় তো বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু পরে ভাবিলেন, আমি যখন তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই, সেই বা আমার অনিষ্ট করিবে কেন? সুতরাং সাহসভরে অগ্রসর হইয়া ভূতকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। ভূত অনিষ্ট করিল না; কিন্তু তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইলেন এক বিকট অট্টহাস্য। তখন আর ফিরিয়া দেখার সাহস তাঁহার ছিল না। আর একবার পথে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—পথ অন্ধকার, আশ্রয়ের স্থান নাই। একটি মোড় ফিরিতে গিয়া তিনি অন্ধকারে এক পুকুরে পড়িয়া গেলেন। উহা হইতে উঠিয়া আসিতে তাঁহাকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নাগ মহাশয় অল্প দিনেই বাঙলা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো। পরে তিনি যখন পড়িবার জন্য কলকাতায় যান, তখন চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত এই রচনাগুলি 'বালকদিগের প্রতি উপদেশ' নাম দিয়া নিজব্যয়ে ছাপাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

কলকাতায় আসিবার পূর্বে পিসিমাতার আগ্রহে একই রাত্রে গোধূলিলগ্নে নাগ মহাশয়ের ও শেষরাত্রে ভগিনী সারদার বিবাহ হইয়া গেল। নববধূর নাম প্রসন্নকুমারী। বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয়ের এক অদ্ভুত আচরণে পিসিমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পাছে বধূর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, এই ভয়ে নাগ মহাশয় সন্ধ্যা হইলেই বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিতেন এবং পিসিমা যতক্ষণ তাঁহাকে নিজ কক্ষে শয়নের অনুমতি না দিতেন ততক্ষণ নামিতেন না। পিসিমা ভাবিয়াছিলেন, কালে এই সৃষ্টিছাড়া মনোভাব পরিবর্তিত হইবে; কিন্তু তাহার পূর্বেই বধূ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন নাগ মহাশয় কলকাতায়।

কলকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া নাগ মহাশয় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট তিনি সকাল-সন্ধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং তাঁহার সহিত রোগীদের গৃহে গৃহে যাইয়া এই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে দীনদয়াল পুত্রকে লইয়া দেশে গেলেন—ইচ্ছা, আর একটি বধূ গৃহে আনেন; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী না পাইয়া অচিরে পুত্রসহ কলকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে নাগ মহাশয় একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স কিনিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিনা অর্থে পাড়ায় পাড়ায় দীন-দুঃখীদের চিকিৎসায় রত হইলেন। বস্তুত পরোপকার করিবার সুযোগ তিনি কদাচিৎ পরিহার করিতেন। তিনি পিতৃবন্ধুগণের অনুরোধে অম্লানবদনে তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং গৃহে বহন করিয়া আনিতেন। প্রেমচাঁদ মুনশি নামক এক কৃপণের ভ্রাতৃবিয়োগ হইলে ঐ ব্যক্তি শবদাহের জন্য কাহারও সাহায্য না পাইয়া নাগ মহাশয়ের দ্বারস্থ হইলেন; অগত্যা পিতাপুত্র মৃতের সৎকার করিয়া মুনশি মহাশয়কে বিপন্মুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সহিত নাগ মহাশয়ের পরিচয় হয়। সুরেশবাবু তখন সাকার ভগবান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ; কিন্তু নাগমহাশয় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতেন, "আছে বস্তু লয়ে আবার বিচার করা কেন?" সুরেশবাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হইলেও সমাজের আচারাদি তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সমাজ হইতে প্রকাশিত সাধুচরিত্রসমূহ তিনি আগ্রহসহকারে পড়িতেন এবং পুরাণের অনুবাদেও আকৃষ্ট হইতেন। প্রায়ই তিনি শ্মশান-ঘাটে বা গঙ্গাতীরে সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গে লিপ্ত হইতেন বা আপনমনে দীর্ঘকাল ঐসকল স্থলে বসিয়া থাকিতেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে শ্মশানে বসিয়া মহানিশায় জপ করিতে

করিতে তিনি এক শুভ্রজ্যোতি দর্শন করেন এবং পরে নিয়মিত জপধ্যান আরম্ভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাগ মহাশয় তখন সংসার ভুলিয়া ক্রমেই ধর্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

দীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পাত্রী ঠিক করিয়া নাগ মহাশয়কে বিবাহের জন্য দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগ মহাশয়ের পক্ষে ইহা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! একবার তো বিবাহ হইয়াছিল—সে নবকুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে; আবার পরের মেয়ের উপর এই অবিচার কেন? পিতা কিন্তু কিছুতেই মানিলেন না; পুত্রের অসম্মতি দর্শনে অভিমানপূর্বক অন্নত্যাগ করিলেন ও নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র বলিলেন, তিনি পুত্রবধূ অপেক্ষাও অধিক স্নেহভরে পিতৃসেবা করিবেন। কিন্তু কথা দিয়া কথা থাকিবে না, পিতৃপুরুষের পিণ্ড লুপ্ত হইবে—ইত্যাদি ভাবিয়া পিতা তখন ম্রিয়মাণ। অবশেষে পিতারই জয় হইল। বিষবৎ বোধ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া দেওভোগে গেলেন এবং যথাকালে শ্রীমতী শরৎকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

নাগ মহাশয় এখন গৃহস্থ; সুতরাং কলকাতায় ফিরিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও প্রয়োজনের তাড়নায় দর্শনী লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এই নবীন পরিস্থিতি সত্ত্বেও অধ্যয়নসুখ, রোগীর পরিচর্যা, সুহৃৎ-সঙ্গ ও ভগবদালাপে দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল। পরন্তু এইভাবে সাত বৎসর অতীত হওয়ার পর অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, মাতৃকল্পা পিসিমা অসুস্থা। নাগ মহাশয় অবিলম্বে দেওভোগে যাইয়া পিসিমার সেবায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাম-মন্ত্রে দীক্ষিতা পিসিমা পুত্রস্থানীয় নাগ মহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোর যেন রামে মতি থাকে।" তারপর "রা—"বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিলিয়া গেল। মাতৃশোক কি, তাহা শৈশবে মাতৃবিয়োগকালে নাগ মহাশয় পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিল। গৃহবাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় তিনি চিতাভূমিতে অধিক সময় কাটাইতে লাগিলেন। কাজেই ইহার অন্য কোন প্রতিকার না দেখিয়া দীনদয়ালকে দেওভোগে আগমনপূর্বক পুত্রকে কলকাতায় লইয়া যাইতে হইল।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনান্তে পুনর্বার চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করিলেও সদ্যশোকগ্রস্ত নাগ মহাশয় অর্থবৃদ্ধির চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর, বাহ্য পরিপাটি ইত্যাদি না থাকিলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তেমন অর্থাগম হয় না বলিয়া পিতা তাঁহাকে পোশাক কিনিয়া দিলেন; কিন্তু পুত্র জানাইলেন,

"আমার পোশাকের কোন দরকার নাই; ঐ টাকা দিয়া গরিবদুঃখীর সেবা করিলে যথার্থ কাজ করা হইত।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পিতা বলিলেন, "তোর কাছ থেকে আমার বহু আশা ছিল; এখন বুঝেছি, আমি আত্মবঞ্চিত হয়েছি। তুই যে দরবেশ হতে চলেছিস।" শুধু কি তাহাই, পুত্র রোগীর নিকট অর্থ লইতেন না; অপিচ নিজব্যয়ে পথ্য ও ঔষধাদি কিংবা নিজের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পর্যন্ত দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। সংসারানভিজ্ঞ পুত্রের সবই সৃষ্টিছাড়া। এক শীতে একটি রোগীকে দেখিতে গিয়া তিনি নিজের গায়ের ভাগলপুরী খেশ রোগীর গায়ে জড়াইয়া দিয়া আসিলেন। আর এক ভূমিশয্যায় শায়িত রোগীকে নিজের বাটির অতিরিক্ত তক্তপোশ দিয়া আসিলেন। বিসূচিকাগ্রস্ত এক ক্ষুদ্র শিশুর পার্শ্বে বসিয়া সারাদিন চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু শিশুকে বাঁচাইতে পারিলেন না—সন্ধ্যায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিলেন।

অর্থের ভাগ্য যেরূপই হউক না কেন, চিকিৎসক হিসাবে নাগ মহাশয়ের বিশেষ সুনাম হইতে অধিক দিন লাগে নাই। ক্রমে তাঁহার পিতার মনিব পালবাবুরা তাঁহাকে গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের নিকট হইতেও তিনি অর্থগ্রহণ করিতেন না। একবার বিসূচিকাক্রান্তা এক রোগিণীকে আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করায় বাবুরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে মুদ্রাপরিপূর্ণ একটি রৌপ্যপাত্র উপহার দিলেন। কিন্তু নাগ মহাশয় উহা গ্রহণ না করায় বাবুরা ভাবিলেন, উপহার আশানুরূপ হয় নাই; সুতরাং আরও পঞ্চাশ মুদ্রা দিলেন। তাহাও প্রত্যাখ্যানপূর্বক নাগ মহাশয় জানাইলেন যে, ঔষধের মূল্য ও পারিশ্রমিক কুড়ি টাকার অধিক হইতে পারে না; তিনি উহাই মাত্র লইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন। স্বোপার্জিত অর্থ যাচককে অকাতরে দিয়া দুই-এক পয়সার মুড়ি খাইয়া দিন কাটানো তাঁহার জীবনে বিরল ঘটনা নহে। এইরূপ অবস্থায় যেক্ষেত্রে মাসিক তিন-চারি শত টাকা আয় হওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে গৃহে আসিত মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বিনা প্রচেষ্টায় যাহা আসিয়া পড়িত, তাহা পিতাকে দিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহারই নিকট চাহিয়া লইতেন। ধর্মের জন্য সংসারবুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলেও তিনি ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামিতে ভুলিতেন না। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বা ভৈরব-ভৈরবী একসঙ্গে ভিক্ষায় আসিলে তাঁহার সমালোচনার কশাঘাতে তাহারা অবিলম্বে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইত।

সদ্‌গৃহস্থ দীনদয়াল ও ধার্মিক পুত্র নাগ মহাশয়ের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য থাকায় কার্যত একটু মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা হইলেও দীনদয়াল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না, নিজেই রন্ধন করিতেন। সুপুত্র পিতার স্বাধীন ব্যবহারে বাধা না দিয়া স্বীয় কর্তব্যবোধে পিতা রন্ধনশালায় যাইবার পূর্বে

স্বয়ং রন্ধনে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে উভয়েই সুযোগের অনুসন্ধানে থাকিতেন এবং যিনি পরাজিত হইতেন তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও অপরকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেন। সেই সময়ে কোন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে হইত। অবশেষে এই মতান্তর নিরোধের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নাগ মহাশয় স্বীয় সহধর্মিণীকে কলকাতায় আনাইলেন এবং ক্ষুদ্র বাসা-বাটিতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া সুরেশবাবুর বাটির নিকট একখানি দ্বিতল বাটি ভাড়া লইলেন। বধূ গৃহে আসায় দীনদয়াল একদিকে যেমন সুখী হইলেন, অপর দিকে তেমনি সংসারবিমুখ পুত্রকে সংসারে বিজড়িত করিতে পারিলেন না দেখিয়া দুঃখীও বড় কম হইলেন না; কারণ ঘটনাচক্রে সহধর্মিণীকে কলকাতায় আনিলেও নাগ মহাশয় পূর্বেরই মতো ভাগবতাদি পাঠ করিয়া ও পিতাকে উহা শুনাইয়া অবসরকাল কাটাইতে লাগিলেন—পারিবারিক আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ তাঁহার ঘটিল না।

এই সময়ে সুরেশবাবু কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে কীর্তন হইত। নাগ মহাশয় উপাসনাকালে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং কীর্তনে মাতিয়া মধুর নৃত্য করিতেন, কখনও বা বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইতেন; এমন কি , একদিন ভাবাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তবু ইহা মনে করা চলিবে না যে, সকল সময়েই তিনি এইরূপ ধর্মোন্মত্ততা প্রকাশ করিতেন—ভাব চাপিয়া রাখাই ছিল তাঁহার স্বভাব; তিনি বলিতেন, "যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত। যত হয় ব্যক্ত তত হয় ত্যক্ত ॥" এইরূপ ব্যক্তির ভাবের বহিঃপ্রকাশ ভাবাধিক্যেরই সূচনা করে মাত্র।

স্বাধীনভাবে সাধনায় রত থাকিয়া উন্নতিলাভ করিলেও নাগ মহাশয় জানিতেন যে, ইষ্টলাভ করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন। ঐজন্য তিনি যখন বিশেষ ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার কুলগুরু কৌল-সন্ন্যাসী শ্রীকৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিক্রমপুর হইতে নাগগৃহে উপস্থিত হইলেন। পরদিনই নাগ মহাশয় সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার পর সাধনা আরও নিবিড়তর হইল। জপধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত, অমাবস্যায় উপবাসপূর্বক গঙ্গাতীরে জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জোয়ারের স্রোত তাঁহার দেহকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। জ্ঞান-লাভান্তে তিনি সন্তরণপূর্বক তীরে উঠিলেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া তিনি কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল রাগমার্গের সাধনা; কিন্তু সম্ভবক্ষেত্রে তিনি যে বৈধী সাধনাও করিতেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। এই সময়ে তিনি শ্যামাবিষয়ক অনেকগুলি পদাবলীও রচনা করেন।

এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়া অনিবার্য। এদিকে দীনদয়ালের শরীরও ক্রমে অপটু হইয়া পড়ায় তাঁহারও আয়-হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটিল। তথাপি পিতার শ্রমলাঘবের জন্য এবং পিতা যাহাতে বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া ধর্মে মন দেন, এই বিষয়ে সুযোগদানের জন্য নাগ মহাশয় স্বয়ং সংসার-বিমুখ হইলেও কর্তব্যবোধে পিতার ব্যবসায়গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। দীনদয়াল পালবাবুদের অধীনে কুতের কার্য করিতেন; পুত্র উহা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন আবার সহধর্মিণীকেও বলিলেন, "আমাকে ভুলে মহামায়ার শরণাপন্ন হও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হবে।" পিতা বুঝিতে পারিলেন, পুত্র স্বাধীনভাবে স্বীয় ভাগ্যপরিচালনে বদ্ধপরিকর—বৃদ্ধবয়সে এই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সুতরাং কিছুদিন পরে পুত্র যখন দীনদয়ালকে দেশে পাঠাইতে চাহিলেন এবং শ্বশুরের সেবার জন্য বধূকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন, তখন প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া তিনি বধূর সহিত দেওভোগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর নাগ মহাশয় কলকাতার দ্বিতল গৃহ ত্যাগ করিয়া পূর্বের ক্ষুদ্র বাটিতে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনের ফলে সুরেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী এবং সদা ভগবৎপ্রসঙ্গে উন্মত্ত। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারান্তে এই দুর্লভ সাধুদর্শনে চলিলেন। দক্ষিণেশ্বর কোথায় জানেন না—শুধু জানেন উহা উত্তরে। অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছেন; তখন আবার দক্ষিণে চলিয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময় মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও বিপদ—সাধু কোথায় থাকেন তাহা তাঁহারা জানেন না। অবশেষে এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকোষ্ঠের পূর্বদ্বারে একজন শ্মশ্রুধারী পুরুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পরমহংসদেব চন্দননগরে গিয়াছেন—সেদিন আর দেখা হইবে না। পরে তাঁহারা জানিয়াছিলেন, ইনিই প্রতাপচন্দ্র হাজরা। হতাশায় অবসন্নমনে বিদায় লইবেন, এমন সময়ে নাগ মহাশয় দেখিলেন, ভিতরে উত্তরাস্য এক ব্যক্তি একখানি ছোট তক্তপোশের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে ভিতরে আহ্বান করিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় ইনি পবিত্রতার মূর্তি। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা মেজেতে পাতা মাদুরে বসিলেন। সুরেশবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলেন ; নাগ মহাশয় ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলে সাধু চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। কথাবার্তায় তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইনিই ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সংসারে পাঁকাল মাছের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে পঞ্চবটীতে ধ্যান

করিতে পাঠাইলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও কালীমন্দিরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাবান্তর দেখিয়া আগন্তুকদের সত্যসত্যই অনুভব হইল যে, মায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কোন জাগতিক কল্পিত বস্তু নহে, ইহা দিব্য সহজ সরল অবস্থা। পাঁচটার সময় বিদায় লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "আবার এসো; এলে গেলে তবে তো পরিচয় হবে।"

ঈশ্বরলাভ-লালসায় উন্মাদপ্রায় নাগ মহাশয় এক সপ্তাহ পরেই শ্রীযুক্ত সুরেশের সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বহুদিন পরে আত্মীয়মিলনে যেরূপ হয়, সেইরূপ উৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ, তা বেশ করেছ; আমি যে তোমাদের জন্য এতদিন হেথায় বসে আছি।" তারপর নাগ মহাশয়কে নিকটে বসাইয়া বলেন, "ভয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা।" সেই দিনও ঠাকুরের আদেশে তাঁহারা পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুরের সহিত মিলন হইলে নাগ মহাশয়ের সেবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবারই জন্য যেন তিনি তাঁহাকে দিয়া পর পর তামাক সাজা, গামছা ও বটুয়া আনা, জলের গাড়ু আনা, জল ভর্তি করা ইত্যাদি কাজ করাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয়ের সেদিন আনন্দের অবধি নাই, শুধু ক্ষোভ রহিল, ঠাকুর পদধূলি দেন নাই। ঠাকুরও উপযুক্ত ভক্ত পাইয়া সোল্লাসে সুরেশবাবুকে বলিলেন, "দেখছ, এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন!"

তৃতীয় বারে নাগ মহাশয় একাই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সেদিন ভাবাবস্থ ঠাকুর অস্ফুটস্বরে কি বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর—দেখ দিকি, আমার পায়ে কি হয়েছে।" ডাক্তার নাগ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কৈ, কোথাও তো কিছু দেখছি না ।" ঠাকুর বলিলেন, "ভাল করে দেখ না, কি হয়েছে।" ভাল করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু সাধ মিটাইয়া চরণধূলি লইবার আকাঙ্ক্ষা ভক্ত নাগ মহাশয়ের ছিল। তিনি তাহাই পূর্ণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এটা কি বোধ হয়?" নাগ মহাশয় বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার বক্ষে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। সহসা নাগ মহাশয় অন্য এক অনুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সর্বত্র এক দিব্য জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে যাতায়াত চলিতে লাগিল। এক দারুণ গ্রীষ্মকালে নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বিপ্রহরে আহারান্তে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার হস্তে পাখাখানি দিয়া ঠাকুর নিদ্রিত হইলেন। এদিকে বাতাস করিতে করিতে নাগ মহাশয়ের হাত ব্যথা করিতে থাকিলেও পাখা থামিল না; কারণ উহাতে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে; আর আদেশ না পাইলে থামেনই বা কিরূপে? ক্রমে ব্যথা এতই অধিক হইল যে, হাত আর চলে না। ঠিক সেই সময়ে অন্তর্যামী ঠাকুর হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ করিলেন।

আর একদিন নাগ মহাশয় ঠাকুরের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্" ইত্যাদি শঙ্করাচার্য-বিরচিত স্তোত্রটি আবৃত্তি করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ তথায় প্রবেশ করিলেন। সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ—একদিকে শরণাগত ভক্ত, অপর দিকে বিচারপরায়ণ অদ্বৈতবাদী; আর মধ্যে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ! ঠাকুর নাগ মহাশয়কে দেখাইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "এরই ঠিক ঠিক দীনতা—একটুও ভান নাই।" নরেন্দ্র বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইলেন, "আপনি যখন বলছেন, তা হবে।" উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। ভক্ত বলেন, "তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে না।" জ্ঞানী বলেন, "আমি তিনি-টিনি বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ আত্মা—আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে।" বিচারের আর শেষ নাই। অবশেষে যবনিকাপাতচ্ছলে ঠাকুর সহাস্যে নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "কি জান, ও খাপ-খোলা তলোয়ার, ওর ও কথা শোভা পায়; নরেন ওকথা বলতে পারে।" অমনি নাগ মহাশয়ের ধারণা হইল, ঠাকুরের লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেব নরেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ—নরেন্দ্র মানুষ নহেন। অতএব শিবাবতার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে উপনীত নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন।...এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে—তাহলে কি করে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?" তখনি নাগ মহাশয়ের সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল; তিনি গৃহে ফিরিয়াই ঔষধের বাক্স, চিকিৎসার পুস্তকাদি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া সংসারের একটি পাশ হইতে চিরতরে মুক্ত হইলেন। বাকি রহিল স্বেচ্ছাবৃত পিতার কুতের কার্য। উহাতে তাঁহাকে অধিক শ্রম করিতে হইত না; তবে কার্যোপলক্ষে খিদিরপুর বা বাগবাজারের খালে উপস্থিত থাকিতে হইত। যেদিন বাগবাজারে যাইতেন, সেদিন যতক্ষণ কার্যক্ষেত্রে থাকা একান্ত আবশ্যক ততোধিক এক মুহূর্তও না থাকিয়া খালের অপর পারে নির্জন বনে জপে বসিয়া কাল কাটাইতেন। অন্যদিন স্বগৃহে একটা গঙ্গাজলের জালার পার্শ্বে জপ চলিত।

নাগ মহাশয়ের অন্তরে তখন ত্যাগের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলেও ঠাকুরের আদেশ ভিন্ন উহার বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে; তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।" সুতরাং নাগ মহাশয় ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মনকে আসক্ত করিয়াই বা রাখিবেন কিরূপে? আসক্তি তো ধর্মপথের অন্তরায়! সহধর্মিণী দূরে অবস্থিত থাকায় একটি অন্তরায় আপাতত নাই। কিন্তু অর্থ? ভাবিয়া স্থির করিলেন—কুতের কার্যও ত্যাগ করিবেন। রণজিৎ হাজরা নামে এক ধর্মভীরু ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ কাজে সাহায্য করিত। এখন রণজিৎকে ঐ কাজ বুঝাইয়া দিয়া তিনি অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন—এখন তাঁহার অবলম্বন রহিলেন শুধু ভগবান। পালবাবুরা সব শুনিলেন, নাগ মহাশয়কে বুঝাইতেও চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সব বিফল হইল। তথাপি একটি ধার্মিক পরিবারের অচিরে অন্নকষ্টে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা রণজিৎকে ডাকাইয়া ব্যবস্থা করাইলেন যে, লাভের অর্ধাংশ নাগ মহাশয়কে দিতে হইবে। রণজিৎ নাগ মহাশয়ের প্রকৃতি জানিত বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য অংশের অর্ধেক মাত্র তাঁহাকে দিয়া বাকি অর্থ দেওভোগে দীনদয়ালকে পাঠাইয়া দিত।

উক্ত ঘটনার পূর্বে নাগ মহাশয় একবার যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন দীনদয়াল একদিকে যেমন পুত্রের উদাস ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অপরদিকে পুত্রও তেমনি পিতাকে কেবলমাত্র ভগবানের স্মরণ-মনন লইয়া থাকিতেই বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব লীলা। একটি লাউগাছের নিকটে একটি গাভী বাঁধা আছে এবং সে বহু চেষ্টা করিয়াও গাছটি খাইতে পারিতেছে না দেখিয়া পুত্র গাভীটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "খাও মা খাও।" গাভী সাধ মিটাইয়া গাছটি নিঃশেষ করিল। দেখিয়া পিতা বলিলেন, "সংসারের যাতে হিত হয়, সে রকম করা দূরে থাক—এরকম অনিষ্ট করা কেন? ডাক্তারি ছাড়লি, এখন কি খেয়ে, কি করে দিন কাটাবি?" পুত্র উত্তর দিলেন, "যা হয় ভগবান করবেন।" অমনি পিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হাঁ, তা জানি। এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ খেয়ে থাকবি।" পুত্র কোনও উত্তর না দিয়া পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং উঠান হইতে একটি মৃত ব্যাঙ লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, "এখন আপনার দুই আদেশই পালিত হলো। ...অতঃপর আপনার পায়ে ধরে বলছি—এ বয়সে আর সংসারচিন্তা করবেন না, বসে বসে ইষ্টনাম জপ করুন।"

দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ছিন্নপাশ নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত

আরম্ভ করিলেন। পাছে ঠাকুরের বিদ্বান বুদ্ধিমান ভক্তদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় মূর্খের উপস্থিতি অশোভন হয়, এই চিন্তায় বিনয়ের অবতার তিনি পূর্বে ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না। এখন সেই সব দিনেও যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। এদিকে তপস্যাও উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল। চরণ হইতে পাদুকা অপসারিত হইল; গাত্রাবরণ রহিল মাত্র একখানি ভাগলপুরী খেশ। আহার দিনান্তে গ্রাস দুই অন্নে পর্যবসিত হইল। খাদ্যের সহিত লবণ মিষ্ট থাকিত না; কারণ তিনি বলিতেন, "তাতে জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।" তাঁহার অর্ধেক বাটির ভাড়া লইয়াছিল মেদিনীপুরের কৃত্তিবাস-নামক একজন চাউলের ব্যবসায়ী। তাহার ঘরে অনেক কুঁড়া পড়িয়া থাকিত। নাগ মহাশয় স্থির করিলেন, এই অযত্নলব্ধ কুঁড়া খাইয়াই জীবনধারণ করিবেন। গঙ্গাজলে উহা ভিজাইয়া অন্য কোন উপকরণ ব্যতিরেকে দুই দিন গলাধঃকরণ করার পরে কৃত্তিবাস সব জানিতে পারিল। ইহার পরে অপরাধ হওয়ার ভয়ে সে আর গৃহে কুঁড়া জমাইয়া রাখিত না। সে সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল; তাই নিঃসম্বল নাগ মহাশয়ের নিকট ভিখারি আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিলে অকাতরে ভিক্ষা দিত। তবে সাধারণত তাহার প্রয়োজন হইত না; কারণ নিজের আহারের জন্য রক্ষিত শেষ তণ্ডুলমুষ্টি পর্যন্ত ভিখারির হস্তে তুলিয়া দিতে নাগ মহাশয় কুণ্ঠিত ছিলেন না। বাহ্য সংযমবিষয়ে শিরঃপীড়াও তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। ঐ পীড়ার জন্য তাঁহাকে বাকি জীবন স্নান বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে শরীর অতি রুক্ষ দেখাইত। 'জিহ্বার সুখেচ্ছা' হইবে মনে করিয়া তিনি কোন ভাল আহার গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু প্রসাদ সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার ছিল না। প্রসাদ বলিয়া কেহ কিছু হস্তে দিলে তিনি উহা নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন। তবে দ্রষ্টব্য ছিল এই যে, সন্দেশাদি যেমন উদরস্থ হইত, তেমনি তৎসহ প্রসাদের পাতাখানিও উদরে চলিয়া যাইত। এইজন্য কেহ তাঁহাকে পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না; অথবা লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে প্রসাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতাটা কাড়িয়া লইতে পারেন।

বিষয়প্রসঙ্গ তাঁহাকে পীড়া দিত। কেহ ঐরূপ কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।" তাঁহার মুখে কাহারও নিন্দা শোনা যাইত না। ভুলক্রমে তাঁহার মুখ দিয়া একবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা নির্গত হওয়ায় শাস্তিস্বরূপে তিনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া স্বীয় মস্তকে এরূপ আঘাত করেন যে, মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে। মনেও ঐরূপ চিন্তা আসিলে তিনি অনুরূপ প্রতিকার করিতেন। একবার রিপুজয়ের জন্য কয়েক দিন নিরম্বু উপবাসান্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সম্ভবত তখন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে মনে কোন বিপরীত

চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগ মহাশয় ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং সুরেশবাবুকে বারংবার প্রণাম করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেদিন আর অন্নাহার হইল না। এইরূপে গৃহে থাকিয়াও নাগ মহাশয় অরণ্যবাসী যোগীর ন্যায় সর্ব বিষয়ে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুত যম-নিয়মাদিতে তিনি তখন সিদ্ধ হইয়াছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছেন। গিরিশবাবু তাই বলিয়াছিলেন, "অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগ মহাশয় তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন—তার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।" শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত 'নাহং-নাহং তুঁহু-তুঁহু' সাধনার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভের পর এইরূপে প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল। ক্রমে যখন ঠাকুরের লীলাসমাপনের কাল আগ্রতপ্রায়, তখন তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিতে, এমন কি স্মরণ করিতেও নাগ মহাশয়ের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইত বলিয়া তিনি কাশীপুরে অধিক যাইতে পারিতেন না। ঠাকুর সম্ভবত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন যখন তাঁহার দেহে দুর্বিষহ জ্বালা হইতেছিল তখন নাগ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহার শীতল দেহের স্পর্শে নিজের গাত্রদাহ প্রশমিত করিবার মানসে নাগ মহাশয়কে নিকটে ঘেঁসিয়া বসিতে বলিলেন এবং তিনি ঐরূপ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আর একদিন ঠাকুরের মনে কি এক সঙ্কল্প উদিত হইল। রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসার জন্য নাগ মহাশয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "ওগো, এসেছ? তা বেশ হয়েছে। ডাক্তার-কবিরাজেরা তো হার মেনে গেছে—দেখ দেখি, যদি কিছু উপকার করতে পার।" নাগ মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়াই তিনি উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং ইচ্ছাবলে ঠাকুরের রোগ স্বীয় দেহে লইবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প, সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব উত্তেজনা, আর মুখে বলিতেছেন, "হাঁ, হাঁ, পারি, আপনার কৃপায় সব পারি; এখনি রোগ সেরে যাবে।" ঠাকুর তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি পারো, রোগ সারাতে পারো।"

ঠাকুরের মহাসমাধির পাঁচ-সাত দিন পূর্বে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে গিয়া শুনিলেন যে, মুখ বিস্বাদ হইয়া যাওয়ায় তিনি আমলকী খুঁজিতেছেন। তখন আমলকীর সময় নহে; কিন্তু নাগ মহাশয় জানিতেন যে, সত্যসঙ্কল্প পুরুষের অভিলাষ ব্যর্থ হয় না—কোথাও না কোথাও আমলকী পাওয়া যাইবেই! তাই আহার ভুলিয়া তিনি উদ্যানে উদ্যানে উহার অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে উহা পাইয়া

সোৎসাহে ঠাকুরের নিকট ফিরিলেন। ঠাকুরও উহা হস্তে লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং পরে নাগ মহাশয়কে আহার করাইতে বলিলেন। শশী তদনুসারে নিচে অন্ন পরিবেশন করিলেন; কিন্তু সেদিন একাদশী—নাগ মহাশয় অন্ন গ্রহণ না করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অন্নের পাত্র নিজের নিকট আনাইয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন; অতঃপর নাগ মহাশয়ের আর আপত্তি থাকিতে পারে না; "প্রসাদ! প্রসাদ! মহাপ্রসাদ!" বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং উহা গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের নিদারুণ শোকে আহার-নিদ্রা, এমন কি শৌচাদিও পরিত্যাগপূর্বক নাগমহাশয় শয্যাগ্রহণ করিলে উহা জানিতে পারিয়া হরি ও গঙ্গাধরের সহিত নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাড়িতে যাইয়া আহারভিক্ষা করিলেন। নাগ মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া রান্না করিয়া তাঁহাদিগকে খাইতে দিলেন; কিন্তু শত অনুরোধেও স্বয়ং না বসিয়া ঠাকুরের প্রিয় সন্তানগণকে ভোজ্য গ্রহণপূর্বক গৃহস্থের কল্যাণসাধনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অগত্যা আহার সমাপন করিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনর্বার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং জানাইলেন যে, নাগ মহাশয় না খাইলে তাঁহারাও অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবেন। অনেক সাধ্যসাধনার পরে সেদিন তিনি আহার করিয়াছিলেন।

নিজ দেহাদির যত্নে বীতরাগ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় যখনই দেশে যাইতেন, তখনই পিতার সর্বপ্রকার যত্ন লইতেন। দীনদয়াল ক্রমেই অথর্ব হইয়া পড়িতেছিলেন; সুতরাং পুত্র তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্নান-শৌচাদি করাইতেন, পরিপাটিরূপে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তিনি যেদিন যাহা খাইতে চাহিতেন তাহা আনিয়া দিতেন। একদিন তিনি অপরের মুখে শুনিলেন যে, পিতা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "দুর্গাচরণ তো উপার্জন করল না, নতুবা আমরাও শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের অর্চনা করতে পারতাম।" তদবধি নাগ মহাশয় প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা ইত্যাদির আয়োজন করিতেন। একবার অর্ধোদয়যোগের সময় তিনি কলকাতা হইতে দেশে উপস্থিত হইলে দীনদয়াল আক্ষেপসহকারে বলিলেন, "এ তোমার কিরূপ ধর্ম বুঝি না; কোথায় এই সময় গঙ্গাস্নানের জন্য লোকে ভাগীরথীতীরে যায়, আর তুমি কিনা এখানে এলে! এখনও তিন-চারদিন সময় আছে—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।" নাগ মহাশয় শুধু বলিলেন যে, বিশ্বাস থাকিলে মা গঙ্গা ভক্তের গৃহে উপস্থিত হন। আশ্চর্যের বিষয় এই, যোগের দিন দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গণের এক কোণ হইতে প্রবলবেগে জল উদ্গত হইয়া প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। লোকের কলরবে নাগ মহাশয় গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে

আসিয়া উহা দেখিলেন এবং "মা পতিতপাবনী! মা ভাগরথী!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অঞ্জলি অঞ্জলি জল মস্তকে গ্রহণ করিলেন, পল্লির লোক তখন "জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে" রবে নাগপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিল। দীনদয়াল সেই পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এই স্রোতোবেগ প্রায় একঘন্টা ছিল।

অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে যোগশক্তি এইভাবে প্রকটিত হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ নাগ মহাশয় সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না। পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকের প্রাধান্য—বামাচার ও সিদ্ধাইকে তখন ধর্মের আসন দেওয়া হইয়াছে। নাগ মহাশয় ইহা জানিতেন বলিয়াই সিদ্ধাই-এর নিন্দা ও শ্রদ্ধা ভক্তির প্রশংসা করিতেন। এইজন্য বারদীর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। নাগ মহাশয় এইসকল সাধকের নিকট কখনও যাইতেন না; কিন্তু একদিন ব্রহ্মচারীর একজন ভক্তের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে নাগ মহাশয়ের মনে ক্রোধের উদয় হওয়ায় তিনি শাস্তিবিধানে উদ্যত হইবেন, এমন সময় অকস্মাৎ স্বাভাবিক শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং "হায় ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কেন আমি সাধুদর্শনে এলাম, কেন আমার মতিভ্রম হলো?" বলিয়া আপনাকেই শাস্তিদানব্যপদেশে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। পরে "হা রামকৃষ্ণ, হা রামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি এক ব্যক্তির মুখে শুনিলেন যে, ব্রহ্মচারী অভিশাপ দিয়াছেন এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে রক্তবমি করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। ঐরূপ অহিতকামনায় নাগ মহাশয় অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যে, উহাতে তাঁহার কেশাগ্রেরও ক্ষতি হইবে না। বস্তুত নাগ মহাশয় ইহার পরেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন।

নাগ মহাশয় সহজে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিন্দা শুনিলে এই দীনের দীন ব্যক্তিটিও অগ্নিমূর্তি হইতেন। একবার দেওভোগের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি নাগগৃহে আসিয়া ঐরূপ নিন্দা করিতে থাকিলে নাগ মহাশয় প্রথমে তাঁহাকে ভদ্রভাবে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সুর ক্রমেই উচ্চ পরদায় উঠিতে থাকিলে অবশেষে তাঁহার পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত করিয়া বলিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে, এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দা!" লোকটি শাসাইয়া গেল যে, সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। কার্যত সে ঐরূপ না করিয়া নিজের ভুল বুঝিয়া কয়েকদিন পরে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি জল হইয়া গেলেন। গিরিশবাবু ঘটনাটি শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি তো জুতো পরেন না, তবে জুতো পেলেন কোথায়?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, "কেন, তারই জুতো নিয়ে তাকে

মারলুম।'' ঠাকুরের মঠের নিন্দাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার নৌকাযোগে বেলুড়ের সন্নিকটে আসিয়া তিনি মঠের উদ্দেশে প্রণাম করিতে থাকিলে আরোহী এক ব্যক্তি অকথ্যভাবে মঠের নিন্দা আরম্ভ করিল। তিনিও অমনি অগ্নিশর্মা হইয়া তাঁহার সম্মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঘুরাইয়া দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিলেন যে, ভোগে লিপ্ত সামান্য গৃহীর পক্ষে না জানিয়া এইভাবে সাধুনিন্দা করা অতি গর্হিত! অবস্থা দেখিয়া সেই আরোহী সেখানেই নৌকা থামাইয়া নামিয়া পড়িল।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে। নাগ মহাশয়ের নিকট তখন বহু গণ্যমান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আসিতেন; কিন্তু নিরভিমান নাগ মহাশয় কখনও গুরুর আসন গ্রহণ না করিয়া সদ্‌গৃহস্থের ন্যায় অতিথিসেবায় ব্যস্ত হইতেন। অতিথিকে তামাক সাজিয়া দিতেন, দাঁড়াইয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতেন, বাজার হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী-সংগ্রহান্তে নিজমস্তকে বহন করিয়া আনিতেন, বর্ষার রাত্রে সবেমাত্র উত্তম ঘরখানি অতিথির জন্য ছাড়িয়া দিয়া সস্ত্রীক অন্য সচ্ছিদ্র চালাঘরে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এইসকল বিষয়ে তিনি অতিথিদের নিষেধ বা অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেন না। দরিদ্রের সংসার—অথচ কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিতে পারিতেন না। নাগ মহাশয় শূলবেদনায় এত ভুগিতেন যে, অনেক সময় চলা-ফিরা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। একদিন অতিথিদের জন্য বাজার হইতে চালের মোট মাথায় বহিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় শূলব্যথা আরম্ভ হওয়ায় তিনি চলিতে অক্ষম হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ''হায় হায়! রামকৃষ্ণদেব কি করলেন! গৃহে অতিথি উপস্থিত। তাঁদের সেবায় বিলম্ব হলো।'' পরে বেদনা প্রশমিত হইলে গৃহে আসিয়া অতিথিদিগের নিকট এই সেবাপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বর্ষার এক দারুণ দুর্যোগে চারিদিক জলে প্লাবিত; এমন সময়ে ট্রেন হইতে নারায়ণগঞ্জে অবতরণান্তে দেওভোগে যাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একটি ভক্ত সন্তরণক্রমে রাত্রি নয়টায় নাগ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাশয় ভক্তটিকে এই বিষয়ে সস্নেহ মৃদু ভর্ৎসনা করিলেও অবিলম্বে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। সচ্ছিদ্র রন্ধনশালায় ব্যবহারোপযোগী শুষ্ক কাষ্ঠ না পাইয়া অগত্যা গৃহের একটি খুঁটি কাটিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করাইলেন—সহধর্মিণী এবং অতিথির নিষেধসত্ত্বেও তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সত্যপরায়ণ নাগ মহাশয় অপরকেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দোকানি যে দর বলিত, নির্বিবাদে সেই দরেই জিনিস কিনিতেন। বাকি প্রাপ্য কাহারও নিকট চাহিতেন না। কেহ ভাবিত, ইনি পাগল; সুতরাং পয়সা ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজনও বোধ করিত না। কেহ ভাবিত, ইনি সাধু; কাজেই সে যে শুধু বাকি পয়সা ফিরাইয়া

দিত তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রত্যেক জিনিস কম মূল্যে দিত। নাগ মহাশয় কিন্তু সাবধান করিয়া দিতেন, "অন্যকে যা দেন আমাকেও তাই দেবেন, বেশি দেবেন না।"

এইরূপ অমিত ব্যয়ের ফলে নাগ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বন্ধুরা তাঁহাকে ঋণের বিষয় স্মরণ করাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "না মেলে, নাই বা খাব; তবু গৃহস্থের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করিতে বলিয়াছিলেন; সুতরাং অন্যথা করার শক্তি তাঁহার ছিল না; এমন কি বলরামবাবু একবার তাঁহাকে পুরীধামে লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর গৃহে থাকতে বলে গেছেন; তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করতে আমার সাধ্য নাই।" এই আদর্শ গৃহীর ঋণ শোধ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অগ্রসর হইলে নাগ মহাশয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর অর্থ গ্রহণ করিতে অপারগ।

তিনি অপরের সেবাগ্রহণেও পরাঙ্মুখ ছিলেন; এমন কি জীর্ণ গৃহের সংস্কারাদির জন্য নিযুক্ত শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দিতেন না—করিতে গেলে ব্যথিত হইতেন। একবার তাঁহার পত্নী একজন ঘরামিকে ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত করিলে নাগ মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাখলে? আমার সুখের জন্য অপরে খাটবে—এও আমাকে দেখতে হল!" অবস্থা দেখিয়া ঘরামি চালা হইতে নামিয়া আসিলে নাগ মহাশয় তাহাকে তামাক সাজাইয়া খাওয়াইলেন এবং পূর্ণ মজুরি দিয়া বাড়ি পাঠাইলেন। এই অবস্থায় হয় ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতে হইত, নতুবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐসব কাজ করাইতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৌকায় উঠিয়া নিজে নৌকা চালাইতেন, মাঝিকে লগি ধরিতে দিতেন না। ধর্মভীরু মাঝিও সাধুকে পরিশ্রম করিতে দিয়া পাপ অর্জন করা অপেক্ষা তাঁহাকে নৌকায় না তোলাই শ্রেয় মনে করিত। বস্তুত এই অদ্ভুত সাধুর জীবনে অহর্নিশ এইরূপ জটিল সমস্যা লাগিয়াই থাকিত।

অহিংসায় তিনি এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, পক্ষীরা নিঃসংশয়ে তাঁহার হস্তে বসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিত। একবার প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ একটি গোক্ষুরা সর্পের আবির্ভাব হইলে নাগগৃহিণী উহাকে মারিয়া ফেলাই স্থির করিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয় তুড়ি দিতে দিতে যেন সর্পটিকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সর্পও নির্বিবাদে ঐ শব্দ অনুসরণ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। একটি বাঁশের বেড়াতে উই লাগিয়াছে দেখিয়া জনৈক ভক্ত উহা সজোরে নাড়িয়া বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। অমনি ব্যথিত নাগ মহাশয় সজলনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি করলেন!" তারপর

উইগুলিকে বলিলেন, "আপনারা আবার বাসা প্রস্তুত করুন।" বলাবাহুল্য, বেড়াটি শীঘ্রই বল্মীকস্তূপে পরিণত হইয়া আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল—তথাপি আর কাহাকেও তিনি উহাতে হাত দিতে দিলেন না। মশা, মাছি, ছারপোকা মারা তো দূরের কথা, পাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক থাকিতেন এবং পথ চলিতে সাবধান হইতেন যাহাতে কোন কীট-পতঙ্গাদিকে মাড়াইয়া না ফেলেন। একবার পাখি মারিবার জন্য সাহেবরা দেওভোগে আসিলে তিনি প্রথমে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা বন্দুক উঠাইলে তিনি অকস্মাৎ উহা অমিতবলে কাড়িয়া লইয়া গেলেন। পরে এক বন্ধুর হাত দিয়া ফেরত পাঠাইলে সাহেবরা কতকটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু শাস্তি দিবারও পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না; অধিকন্তু ঐ অঞ্চলে যাওয়াও বন্ধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর দেশে আসিয়া নাগ মহাশয় পৃথক কুটির রচনাপূর্বক নির্জনবাসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধর্মিণী জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু করেন নাই; অতএব পৃথক বাসের আবশ্যকতা নাই। নাগ মহাশয় ভরসা পাইয়া স্বগৃহেই রহিয়া গেলেন। এদিকে দীনদয়াল পিণ্ডলোপের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গুরুবংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা পুত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ করাইলেন। শুনিয়াই নাগ মহাশয় ইষ্টকদ্বারা স্বমস্তকে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই অসঙ্গত আদেশ করছেন?" আঘাতের ফলে কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া নবীনচন্দ্র আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের পরে তাঁহার সহধর্মিণী বলিয়াছিলেন, "তাঁর শরীরে কিংবা মনে কখনও কোনরূপ মানবীয় বিকার লক্ষিত হয়নি। ...তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করেছেন বটে; কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।" নাগ মহাশয় নিজে এই বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন, তাহার আভাস একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। এক প্রৌঢ়া বিধবা প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতে থাকিলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, বিধবার উদ্দেশ্য মন্দ। অমনি সহধর্মিণীকে বলিলেন, "হায় হায়, কাক কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়-মাসের খাঁচার মাংস খেতে সাধ হয় না—এতে ওর কেন এমন ভাব হলো?" নাগগৃহিণী সেই প্রৌঢ়াকে আর আসিতে নিষেধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়া দীনদয়াল মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিতেন। একদিন মাত্রা একটু অধিক হওয়ায় নাগ মহাশয় জানাইলেন যে, স্ত্রীসঙ্গ তিনি কখনও করেন নাই এবং করিবেনও না—কারণ সংসারসুখে তিনি বীতস্পৃহ। বলিতে বলিতে বস্ত্রাদি-উন্মোচনান্তে 'নাহং নাহং'-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক

গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে সাধ্বী স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। তখন অপরে প্রবোধ দিয়া সেই বৈরাগীকে আবার গৃহে লইয়া আসিল।

সাধনরাজ্যে যেরূপ, অনুভূতিরাজ্যেও তিনি তেমনি অতি উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। একবৎসর সরস্বতীপূজার দিনে তিনি জনৈক ভক্তকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবদেবীর ও তাঁহাদের কৃপায় সিদ্ধিলাভের কথা বলিতেছিলেন। শুনিয়া শ্রোতা ভাবিলেন, "ইঁহার অনুভূতি শুধু দেবদেবীর রাজ্যেই সীমাবদ্ধ—উহা সসীমকে ছাড়াইয়া অসীম নির্গুণে উপস্থিত হয় নাই।" ইতোমধ্যে কর্মব্যপদেশে নাগ মহাশয় বাহিরে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিও তাঁহার অন্বেষণে বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, নাগ মহাশয় রন্ধনগৃহের পশ্চাতে আম্রবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে বলিতেছেন, "মা কি আমার এই খড়-মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী—মা যে আমার মহাবিদ্যাস্বরূপিণী" বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে সেই সমাধিভঙ্গ হইল। সন্দেহমুক্ত ভক্তের মুখে সমস্ত শুনিয়া নাগগৃহিণী বলিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এই অবস্থা আজ নূতন দেখলে। এক একদিন দুই-তিন প্রহরেও তাঁর চেতনা হয় না।"

নাগ মহাশয় কলকাতায় আসিলে আলমবাজার মঠে যাইয়া সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইতেন। একবার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উদ্যানে যাইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণদর্শন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ সেই দিন বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পমান তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া মাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গেলে মা তাঁহার আনীত সন্দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাই ফিরিবার পথে নাগ মহাশয় ভাবের ঘোরে বারংবার বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!" ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও দক্ষিণেশ্বরে তিনি যাইতেন; কিন্তু ঠাকুরের কক্ষে একবার মাত্র প্রবেশের পরে পূর্বস্মৃতি ও দারুণ বিরহে এরূপ মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, আর ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না—দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাশীপুরের যে উদ্যানবাটিতে ঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, উহার দর্শনেও অনুরূপ ভাবান্তর হওয়ায় আর তিনি সে পথে চলিতেন না। গিরিশবাবু তাঁহাকে একখানি কম্বল দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তের এই দানকে সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়া অবহেলা প্রদর্শন করা অপেক্ষা স্বীয় মস্তকে ধারণ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত একখানি বস্ত্রও ঐরূপে তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছিল। একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বস্ত্র ও মিষ্টান্ন

লইয়া যাইবার কালে বাগবাজারে শূলবেদনা আরম্ভ হওয়ায় তিনি এক রোয়াকে পড়িয়া প্রায় দুই ঘণ্টা 'হায় হায়' করিয়াছিলেন; তথাপি মায়ের দ্রব্য মাকে না দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সেই দিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়াছিল।

নাগ মহাশয় যেমন ছিলেন ভক্ত, তেমনি ছিলেন সেবাপরায়ণ। কলকাতায় প্লেগের সময় পাল বাবুরা বাটির ভার তাঁহার উপর দিয়া দেশে চলিয়া গেলে নাগ মহাশয় একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণ মুহুরী ও একটি চাকরের সহিত ঐ বাটিতে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ মুহুরীটির প্লেগ হইলে নাগ মহাশয় তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিলেন; মৃত্যুর পূর্বে ব্রাহ্মণ গঙ্গাযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লোকাভাববশত একাই তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার ৺গঙ্গাপ্রাপ্তির পর নিজেই সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় পঁচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "ইনি বদ্ধ পাগল।" পরবর্তী ঘটনাও তাঁহার এই বাতুলত্বেরই প্রমাণ দিবে।

পালবাবুরা একবার তাঁহাকে ভোজেশ্বরে লইয়া যান এবং ফিরিবার সময় স্টিমারভাড়া ইত্যাদি বাবদ আট টাকা ও একখানি কম্বল দেন। স্টেশনে টিকিট কিনিবার সময় নাগ মহাশয়ের নিকট তিন-চারিটি শিশু সন্তান লইয়া এক ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া সেই আটটি টাকা ও কম্বল তাহাদিগকে দিয়া পদব্রজে কলকাতায় চলিলেন—তাঁহার সম্বল ছিল সাড়ে সাত আনা পয়সা। নদীগুলি তিনি সম্ভবস্থলে নৌকায় পার হইতেন, অন্যত্র সন্তরণক্রমে উত্তীর্ণ হইতেন; দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নতুবা মুড়িমুড়কি। এইরূপে উনত্রিশ দিনে তিনি কলকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। আর একবার অনেক দিন অর্ধাশনে কাটাইয়া কুতের কার্যে খিদিরপুরে সারাদিনের পরিশ্রমান্তে যে তের আনা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা গড়ের মাঠে এক ব্যক্তিকে দিয়া তিনি রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

গৃহস্থের চরম পরীক্ষা হয় বিপদের সময়। একবার চৈত্রমাসে পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়া আগুনের ফিনকি নাগভবনের চালে পড়িতে থকিলে প্রতিবেশীরা উহার রক্ষায় তৎপর হইলেন এবং নাগগৃহিণী ভীত হইয়া শশব্যস্তে কাঁথা, কাপড় ইত্যাদি বাহির করিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় তখন 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর' রবে বাটির প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এখনও অবিশ্বাস! ব্রহ্মা আজ বাড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাঁহার পূজা করিবে, না সামান্য কাঁথা-কাপড় লইয়া ব্যস্ত হইলে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" দৈবক্রমে অগ্নিদেব পার্শ্বের গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন—নাগগৃহের তৃণখণ্ডও স্পর্শ করিলেন না।

সাধু হিসাবে নাগ মহাশয়ের নাম দিকে দিকে ছড়াইলেও অভিমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। গৃহে কীর্তনকালে তিনি যুক্তকরে এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কিংবা তামাক সাজিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর বাটিতে আসিলে অপরের সহিত সমান আসনে না বসিয়া মেজেতে বসিতেন। একবার স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেহ নিজেকে দীনহীন ভাবিলে দীনহীনই হইয়া যায়, সুতরাং নাগমহাশয়ের ঐরূপ ভাবা অনুচিত। ইহার উত্তরে নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীট যদি আপনাকে কীট ভাবে তবে যেমন সত্যের অমর্যাদা হয় না, তেমনি তিনি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিলে সত্যের অপলাপ হয় না, কাজেই দোষস্পর্শও হয় না। মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, "নরেনকে ও নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে যায়—মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হলো যে, মায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যত বাঁধেন, নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।" নাগ মহাশয়ের কৃপায় অনেকে আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। কেহ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি "আমি শূদ্দুর-ক্ষুদ্দুর, আমি কি জানি?"—এই বলিয়া মাথা খুঁড়িতেন; আর বলিতেন, "আমাকে আপনারা পদধূলি দিয়ে পবিত্র করতে এসেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম!"

দীনদয়ালের শেষসময়ে নাগ মহাশয় দেওভোগেই ছিলেন। পুত্রের ঐকান্তিক যত্নে শেষ জীবনে তাঁহার মন হইতে সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হইয়াছিল—তিনি সন্ধ্যাপূজা লইয়া থাকিতেন এবং তুলসীর মালা জপ করিতেন। অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন। পিতার সমুচিত ঔর্ধ্বদেহিক কার্য করিতে নাগ মহাশয়কে আগ্রহান্বিত জানিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাদিগকে বিরত করিলেন। প্রত্যুত তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়া এবং বসতবাটি বন্ধক রাখিয়া যথোচিতরূপে শেষকৃত্য সমাপন করিলেন এবং অতঃপর গয়াধামে যাইয়াও পিণ্ডপ্রদান করিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সমস্ত ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই।

ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার নিজের যাইবার দিন উপস্থিত হইল। শূলবেদনা ও আমাশয় তাঁহাকে তখন শয্যাশায়ী করিয়াছে; অথচ ঐ অবস্থায় তিনি শীতের রাত্রেও খোলা বারান্দায় শুইয়া থাকিতেন। অসুখ হওয়া অবধি তিনি আর

গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করেন নাই। সেবাগ্রহণেও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শেষ কয়দিন তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও গীতা-উপনিষদাদির পাঠশ্রবণে রত থাকিতেন। অথচ ঐ সময়ে অতিথি আসিলে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই তাঁহাদের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার উচ্চ ধর্মকথা বা গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবের আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। স্বামী সারদানন্দ তখন কার্যোপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। তিনি প্রায়ই নাগ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। একদিন তিনি "শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে", "মজল আমার মনভ্রমরা" ও "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি"—এই তিনখানি গান গাহিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় উহাতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। একদিন নাগ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল ৺রক্ষাকালীর পূজা হয়। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দের পরামর্শে উহা নাগ মহাশয়ের দর্শনের জন্য তাঁহার শিয়রে স্থাপন করা হইল। অমনি তিনি 'মা মা' বলিতে বলিতে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সেই রাত্রে সেই সমাধিভঙ্গ হইতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে তিনি পঞ্জিকা আনাইয়া জানিলেন যে, ১৩ পৌষ ১০টার পরে যাত্রার দিন ভাল। ইহা জানিয়া তিনি পঞ্জিকাপাঠক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন, "আপনি যদি অনুমতি করেন তবে ঐ দিনই-মহাযাত্রা করিব।" শুভদিন স্থির করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে রাত্রি দুইটার সময় তিনি মুদিত চক্ষু খুলিয়া অকস্মাৎ শরৎবাবুকে বলিলেন, "আপনি যে সকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" শরৎবাবু একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, কাশীধাম ও জগন্নাথক্ষেত্রের নাম করিলেন। নাগ মহাশয়ও ভাবস্থ হইয়া ঐসকল তীর্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন—যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। অতঃপর ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) বেলা নয়টার সময় নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল—তাঁহার চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত, যেন কি উচ্চারণ করিতেছেন। অর্ধঘণ্টা পরে দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ ও সর্বশরীর কণ্টকিত হইল এবং নয়নকোণে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দশটার কয়েক মিনিট পরে প্রাণবায়ু নির্গত হইল—নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

# বলরাম বসু

শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম বসু জীবনপ্রভাতে হুগলি জেলার আঁটপুর-তড়া হইতে ব্যবসায়ব্যপদেশে কলকাতায় আসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং জীবনমধ্যাহ্নে সরকারের পক্ষে হুগলি জেলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলকাতায় বর্তমান শ্যামবাজারে ট্রামডিপো ও তৎপার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ এবং শ্রীশ্রীকালী ও শিবমন্দির স্থাপনপূর্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। জীবনসায়াহ্নে তিনি দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া এবং ব্রাহ্মণপরিপোষণের জন্য ভূসম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ট্রাম ডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট আজও তাঁহার গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে।

কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মবরণান্তে স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে পল্লির নাম হয় শ্যামবাজার। গুরুপ্রসাদ একদিকে যেমন ভজনশীল ছিলেন, অপরদিকে তেমন ছিলেন মুক্তহস্ত। কিন্তু সহসা কলকাতার 'ঠাকুর-ব্যাঙ্ক' দেউলিয়া হওয়ায় তাঁহার আমানত চৌদ্দ লক্ষ টাকা কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গেল। অগত্যা গৃহসম্পত্তি হারাইয়া তিনি শ্রীরামপুর-মাহেশের বাড়িতে শ্রীবিগ্রহসহ আশ্রয় লইলেন। গুরুপ্রসাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনেও লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে একটি 'কুঞ্জ' বা দেবায়তন নির্মাণপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা বর্তমানে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত।

গুরুপ্রসাদের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দুই সহোদর—বিন্দুমাধব ও রাধামোহন বংশানুক্রমে একান্নভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের আমলে ভাগ্যলক্ষ্মী পুনঃ প্রসন্না হওয়ায় উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় আবার জমিদারি আরম্ভ হইল এবং কোঠার মৌজায় প্রধান কাছারি-বাড়ি স্থাপিত হইল। বিন্দুমাধবের পুত্র নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ 'রায়-বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। নিমাইচরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, মধ্যম হরিবল্লভ কটকে উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলকাতায় থাকিতেন।

রাধামোহন বিষয়কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া সাধন-ভজনে রত হইলেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রায়শ বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে একাকী বাসপূর্বক অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরবিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন, অবসর সময়ে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতা'দি ভক্তিগ্রন্থ পড়িতেন, অথবা কোন অনুরূপ গ্রন্থের প্রতিলিপি

করিতেন; আবার কখনও-বা বৈষ্ণবদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করাইতেন ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১১৯ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৯৩)। কোঠারে থাকা কালেও তাঁহার জীবন ঐভাবেই অতিবাহিত হইত। কুলপ্রথানুসারে তিনি মন্দিরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া জপ করিতেন এবং জপান্তে ঐ অঙ্গনেই ধ্যানে বসিতেন। রাধামোহনের তিন পুত্র—জগন্নাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসাদ এবং দুই কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও হেমলতা।

বলরামের জন্ম হয় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪২-এর ডিসেম্বর মাস)। বৈষ্ণববংশসম্ভূত বলরাম স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টা কাল কাটাইতেন। অহিংসাধর্মপালনে তিনি এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীটপতঙ্গাদিকেও কখনো কোন কারণে আঘাত করিতেন না। "জমিদারি প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময়ে নির্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে চলে না দেখিয়া তিনি নিজ বিষয়-সম্পত্তির ভার নিমাইবাবুর উপরে সমর্পণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতিমাসে আয়স্বরূপ যাহা পাইতেন, অনেক সময় উহা পর্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও ঐসকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা একসময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর তাঁহাকে অন্ন ত্যাগপূর্বক যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল ৺পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্রশ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্যেই তাঁহার তখন দিন কাটিত এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল, সেই-সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে পাইয়াছিলেন।...

"প্রথমা কন্যার বিবাহদানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারের শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু কলকাতার রামকান্ত বসু স্ট্রিটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশত পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটিতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের

পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।” (‘লীলাপ্রসঙ্গ’ ২য় ভাগ—দিব্যভাব, ১৭০-৭১ পৃঃ)।

বসুজমহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদাস বর্মণ-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত’ এবং শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি’-তে প্রদত্ত বিবরণের সহিত উদ্ধৃত বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি। কেশবচন্দ্র সেনের সংবাদপত্র হইতেই বলরাম প্রথম জানিতে পারিলেন—দক্ষিণশ্বরে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার মুহুর্মুহু সমাধি হইয়া থাকে এবং যাঁহার শ্রীমুখের বাণীতে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ বিমুগ্ধ। ঐ সময়ে বসু মহাশয়দিগের পুরোহিতবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কলকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামদয়াল। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভে ধন্য ও কৃতার্থ এই ব্রাহ্মণ বলরামকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইলে তিনি তাঁহার দর্শনমানসে অবিলম্বে উড়িষ্যা হইতে কলকাতায় চলিয়া আসিলেন। পরদিন যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, তখন মুড়ি খাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া কেশবচন্দ্রও সদলবলে তথায় উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে মুড়ি খাইবার জন্য সকলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলরামকে একান্তে পাইয়া প্রেমসিক্তস্বরে কহিলেন, “তোমার কি কথা আছে বল?” বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, ভগবান আছেন কি?” উত্তরে ঠাকুর কহিলেন, “তিনি যে শুধু আছেন তাহাই নহে, আপনার ভাবিয়া ডাকিলে তিনি দর্শন দেন। আপনার সন্তান-সন্ততিতে যেমন মমত্ববোধ আছে, তাঁহাকেও সেই রকম ভাবিয়াই ডাকিতে হয়।” বলরাম ইহাতে নূতন আলোক পাইলেন; কারণ আজীবন জপধ্যানাদিতে মগ্ন থাকিলেও আজ পর্যন্ত ঠিক এইভাবে তাঁহার ডাকা হয় নাই। তাই ঠাকুরের মধুর আলাপনে আকৃষ্ট বসুজ মহাশয় এইসকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিরিলেন এবং কোন প্রকারে রাত্রিযাপনান্তে প্রত্যুষে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সেইদিন ঠাকুর তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিলেও তিনি ধর্মলাভার্থে দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন দেখিয়া অতীব আত্মীয়তা-সহকারে জানাইলেন, “ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।” বলরামও ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইলেন; অতএব পদধূলিগ্রহণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে স্থির করিলেন যে, যাহা পাঠাইবেন তাহা স্বয়ং দেখিয়া-শুনিয়াই ক্রয় করিবেন; অধিকন্তু বিচারপূর্বক মনে মনে নিশ্চিত জানিলেন যে, এমন মিষ্ট ব্যবহার ও পুনঃপুনঃ ভাবসমাধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে—ফলত শ্রীমহাপ্রভুই প্রেমবিতরণের জন্য এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা

হউক, এবংবিধ চিন্তায় নিমগ্ন বসুজ মহাশয় গৃহে ফিরিলেন এবং স্নানাহারান্তে স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, ঠাকুর তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। বলরামকে দেখিয়াই তিনি হৃদয়কে সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "ও হৃদু, এ সেই চৈতন্যদেবের কীর্তনের মানুষ—সেই এদের সব দেখেছিলুম, তোর মনে আছে?" তদবধি অন্তরঙ্গ-সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায় বলরাম প্রায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন এবং প্রতি মাসে প্রভুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ডালি সাজাইয়া শ্রীচরণে পাঠাইতে লাগিলেন।

"ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শোনা—এক সময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা। আর সেই উন্মাদ তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ। সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির-অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তি-জ্যোতিপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরামবাবু যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটিতে উপস্থিত হন, সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি সেই লোক।[১]

"বসুজ মহাশয়ের কোঠারে জমিদারি ও শ্যামচাঁদবিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলকাতার বাটিতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও সেবাদি আছে।[২] ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।' বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন বলরামের বাটিতেই হইত। ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটি ব্যতীত অপর কাহারও বাটিতে কোনদিন অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্যকথা।

"সাধনকালে ঠাকুর একসময়ে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, 'মা,

---

১। "বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এসব দেবে কে?" (কথামৃত, অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৯৫)।

২। বর্তমানে এই বিগ্রহ কোঠারে আছেন।

আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসেবসে রাখিস।' জগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে। ...বলরামবাবুকে ঠাকুর তাঁহার রসদদারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনও নির্দেশ করিয়াছেন, একথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরূপ সেবাধিকার দেখিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথুরবাবু ভিন্ন অপর রসদদারদিগের সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।...বলরামবাবু যেদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুরের অদর্শনদিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি...

"প্রথম রসদদার মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কলকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতর শম্ভুবাবু, মথুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশবপ্রমুখ কলকাতার ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্ধ রসদদার সুরেশবাবু[১] শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব হইতে চারি-পাঁচ বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।...আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকাবাসিনী মহিলা (মিসেস সারা সি বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড়-মঠস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন, তাঁহারাই কি এই দেড় জন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর অদর্শনে একথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?[২]

"বলরামবাবুর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাটিতে লইয়া আসেন। বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রিটে তাঁহার বাটি, অথবা তাঁহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাটি। বলরামবাবু তাঁহার ভ্রাতার বাটিতেই থাকিতেন—বাটির নম্বর ৫৭। এই ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রিট বাটিতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িকে ঠাকুর কখনো কখনো 'মা-কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, কলকাতার বসুপাড়ার এই বাটিকে তাঁহার 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ

১ এই গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনী দ্রষ্টব্য।

২ 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগে (৩২০—৩৩৫ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৩) পাঁচজন রসদদারের উল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই গৌরবর্ণ। "প্রথম সেজবাবু, তারপর শম্ভু মল্লিক...আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই।" সুরেন্দ্র অনেকটা রসদদার বলে মনে হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে' বলরামকে রসদদার বলা হইয়াছে।

করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' কর্তা-গিন্নী হইতে বাটির ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ।...

"পূর্বেই বলিয়াছি, এ বাটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল; কাজেই রথের সময় রথ-টানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই—বাড়িসাজানো, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এসবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ, বাহির বাটির দোতলায় চকমিলান বারান্দার চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত; একদল কীর্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত—আর ঠাকুর ও তাঁর ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। ...এইরূপে কয়েকঘণ্টা কীর্তনের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন । তারপর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তেরা দুই-চারিজন ব্যতীত যে যাঁর বাটিতে চলিয়া যাইতেন" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ১৪১পৃঃ)।

পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বলরামের একদিনের মিলনের যে চিত্র 'কথামৃত'-কার অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা যেরূপ চিত্তাকর্ষক, বলরামের আচরণও তদ্রূপ মনোমুগ্ধকর। ঐ একটি ঘটনাতেই যেন পাই বলরামের চরিত্রের অনুপম অবদ্যোতনা। ১৮৮২-র আগস্ট মাস। বিদ্যাসাগরভবনে দীর্ঘসময় ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাটাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য "ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্ত হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি।...শ্রাবণ কৃষ্ণা ষষ্ঠী, তখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।" ফটকের কাছে পৌঁছিলে "সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙালির পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ; মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ি, পরনে কাপড়, মোজা, জামা—চাদর নাই।...পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ" প্রণাম করিলেন। তিনি উঠিলে "ঠাকুর বলিলেন, 'বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?' বলরাম (সহাস্যে)—'আমি অনেকক্ষণ এসেছি—এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'ভিতরে কেন যাও নাই?' বলরাম—'আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন—মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা!' এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।" অতঃপর ঠাকুর মিষ্টভাষে নিরভিমান ও অনুগত ভক্তকে

বিদায় দিয়া গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, ২১-২২ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫৭)।

ইহার পরে আমরা বলরামের আর একবার সাক্ষাৎ পাই ১৮৮২ খ্রিঃ, ২৪ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে। ঐদিন 'কথামৃত'-কার যদিও লিখিয়াছেন, "বলরাম নূতন আসিতেছেন," তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার যাতায়াত প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ঐ বৎসরের প্রারম্ভে কিংবা পূর্ব বৎসরের শেষে; ইহা 'কথামৃতে'ই উল্লিখিত আছে (১ম ভাগ, ৬ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫)। তবে স্বকীয় বিনয়-নম্র স্বভাববশত বলরাম দীর্ঘকাল গমনাগমন করিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাহিরেই থাকিতেন। বস্তুত ১৮৮২-র ১১ মার্চ ঠাকুরকে বলরাম-ভবনে আনন্দোৎসব করিতে দেখিয়া এই কথারই সমর্থন পাই এবং ঐ দিনই বলরামের আত্মগোপনেরও পরিচয় লাভ করি। ঐ দিন 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, "এইবার ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন—দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ির কর্তা" (৫ম ভাগ, ১ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৩৩)।

"ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্য পূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদনপূর্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপূর্বক তিনি সর্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

"বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্মপালনসম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক উপাসনাকালেও মশকাদিদ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না—মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদিত হইল, সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি কীট-পতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব দুই-

চারটি মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অর্ধম হওয়া দূরে থাকুক, সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, 'অহিংসাধর্ম-প্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহনির্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম।...দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে। সেইজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই-তিন বৎসরকাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি—দিনে আসিয়াছি, রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায়গ্রহণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি দিন ঐরূপে আসা-যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই। ঐরূপ কেমন করিয়া হইল? তখন নিজ অন্তরেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতঃপূর্বে ইঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপর অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরমকারুণিক ঠাকুর সেজন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কখনও করেন নাই" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—দিব্যভাব, ১২৮-২৯ পৃঃ)।

"তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐরূপ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথম, তাঁহারা বৈষ্ণবরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারে তাঁহাদিগের ধর্মমত যে কতকটা একদেশী ও অতিমাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন বাহ্যচিহ্নমাত্রধারণে পরাঙ্মুখ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাব-সম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, ধন মান আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান-অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে।...ঐ বংশমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া

তাঁহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ কার্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল।...কালনার ভগবানদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমের আতিশয্য কীর্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কখনও কখনও তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না।...উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।...সুতরাং পাছে হরিবল্লভবাবু তাঁহার উক্ত বাটি খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাইবাবু বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্বক ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।...

"আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাঁহার উভয় ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভবাবু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া...অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতোমধ্যে হরিবল্লভবাবুও (১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে) কলকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।" (ঐ, ১৬৯-৭১)।

হরিবল্লভবাবু যেদিন কলকাতায় আসিলেন সেদিন বলরাম নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। অতঃপর হরিবল্লভের আগমনবার্তা শুনিয়া কহিলেন, "সে লোক কেমন? তাহাকে একদিন এখানে আনতে পারো?" বলরাম জানাইলেন যে, হরিবল্লভবাবু লোক খুব ভাল হইলেও একটু 'কানপাতলা'—অপরের কথাতেই বলরামের সম্বন্ধে কি-একটা ঠাওরাইয়াছেন; অতএব তাঁহার কথায় হয়তো আসিবেন না। অগত্যা

ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের সাহায্য লইলেন—হরিবল্লভবাবু গিরিশের বাল্যবন্ধু। পরদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে হরিবল্লভ শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে সমাগত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে অতি নিকট আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণপূর্বক সাদরে সুমিষ্টভাবে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গের পর সুমিষ্ট ভগবৎ-সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরের সমাধি হইল; উপস্থিত দুই-তিনজন যুবকেরও ভাবান্তর হইল; এমন কি, বিরুদ্ধ ধারণা লইয়া আসিয়া থাকিলেও সেই মর্মস্পর্শী বাণীশ্রবণে এবং সেই দিব্যভাবোজ্জ্বল মূর্তিদর্শনে বিহ্বলহৃদয় শ্রীযুক্ত হরিবল্লভেরও নয়নদ্বয়ে অশ্রু বিগলিত হইতে থাকিল। বস্তুত বিদায়কাল উত্তীর্ণ দেখিয়াও সমস্ত সন্দেহাদি হইতে নির্মুক্ত হরিবল্লভ সন্ধ্যার পরেও কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের স্থানে কাটাইয়া অবশেষে যেন অনিচ্ছাক্রমেই বিদায় লইলেন। বলা বাহুল্য যে, গুণগ্রাহী হরিবল্লভবাবু অতঃপর ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঠাকুরের বারণ সত্ত্বেও তিনি কুলমর্যাদা ও পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া বলপূর্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বলরামের এক সমূহ বিপদ কাটিয়া গেল।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ঠাকুরের দেহত্যাগ পর্যন্ত বলরামের গৃহদ্বার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তদের জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকিত। ঠাকুর স্বচ্ছন্দে তাঁহার এই 'কেল্লাতে' যাইতেন এবং তাঁহার শুভাগমন-সংবাদে ভক্তগণও সম্মিলিত হওয়ায় গৃহখানি প্রায়ই আনন্দমুখরিত থাকিত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষে ঐ বাটিতে আগমনপূর্বক ঠাকুর তথায় একাধিক দিন বাস করিয়াছিলেন ('কথামৃত', ৪।২৩)। ইহা বলরামের প্রতি কৃপারই নিদর্শন; কারণ সুস্থাবস্থায় তিনি কখনও কলকাতায় রাত্রিবাস করিতেন না। পরে গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ সময়েও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ডাক্তারের পরামর্শে ভক্তগণ যখন ঠাকুরকে কলকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার উদ্দেশ্যে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটের ক্ষুদ্র একখানি বাটি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিলেন, তখন ভাগীরথী-তীরে কালীমন্দিরের প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটিতে প্রবেশ করিয়াই উহাতে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া পদব্রজে ভক্তবর বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া গেলেন এবং বসু মহাশয়ও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক যতদিন মনোমত বাসস্থান না পাওয়া যায় ততদিন স্বগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে ঐ সময়ে ঠাকুর সাহ্লাদে ঐ বাটিতে সপ্তাহখানেক বাস করিয়াছিলেন। এই কয়দিন বলরামভবন ভক্তগণের অবিরাম গমনাগমনে আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল এবং সে আনন্দবর্ধনে নিরত ঠাকুরেরও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ লীলাস্মৃতিবিজড়িত এই গৃহখানির পবিত্রতা স্মরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন—"ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন—যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটিতে বসে বসে কাঁদেন—নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বলে ব্যাকুল! ...মাকে বলেন, 'যদি না আসতে পারে, তা হলে মা, আমায় সেখানে লয়ে যাও...।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে আসেন। ...যখন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ করতে বলরামকে পাঠান—বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস।'...এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের খেলা হইয়াছে" (১ম ভাগ, ২২৩ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৭৬৭)। স্বামী অদ্ভুতানন্দের মতে এই গৃহে ঠাকুর শতাধিকবার আসিয়াছিলেন। এইরূপে বহুধা পবিত্রীকৃত এই ভবনটি পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে 'বলরাম-মন্দির' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং মহা পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়।

বলরামের উপর ঠাকুরের অপূর্ব ভালবাসা ও বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা ছিল বলিয়াই তিনি একসময়ে নিজ মানসপুত্র রাখালকে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪)। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়েও ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ বসু মহাশয়ের কলকাতার গৃহে, বৃন্দাবনের 'কুঞ্জে' অথবা পুরীর আবাসে নিঃসঙ্কোচে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বিভিন্ন সময়ে ঐ তিন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বস্তুত ঠাকুর ও ঠাকুরের জনের নানাভাবে সেবা করিয়াও যেন বলরামের আশা মিটিত না। কিন্তু তাঁহার আয় অধিক ছিল না—নিতান্ত পরিমিত মাসোহারার উপর নির্ভর করিতে হইত; সেজন্য হিসাব করিয়া চলিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক জানিতেন ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয়। সুতরাং বলরামের কার্পণ্যের কথায় তিনি আমোদমাত্রই করিতেন এবং সে অনাবিল রসিকতায় বলরামের প্রতি তাঁহার প্রীতিই অধিকতর প্রকাশ পাইত—এ যেন আপনার স্নেহপাত্রের দোষগুণ সমস্ত লইয়াই আহ্লাদ প্রকাশমাত্র! দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে নরেন্দ্র যখন একদিন (১৪ জুলাই, ১৮৮৫) বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক গান গাহিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন, "যন্ত্র নাই, শুধু গান!" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের, বাছা যেমন অবস্থা! এইতে পার তো গাও! তাতে বলরামের বন্দোবস্ত। বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন।'...খ্যাঁট দিয়েছে—আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে।" এইরূপ কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তারপর রাম খোল বাজাবে, আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই

(সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব—আপনারা গাও, নাচ, আনন্দ কর!" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৬০ পৃষ্ঠা; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৬৫)। বলরামের এই আপাত-কৃপণতার আর একটা দিকও ছিল—তিনি স্বয়ং কষ্টে বাস করিয়াও সাধুসেবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাই লাটু যখন একদা তাঁকে স্বল্পপরিসর শয্যায় শুইতে দেখিয়া প্রশস্ততর বিছানা ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তখন বলরাম কহিলেন, "মাটির দেহ মাটিতে মিশবে কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগবে।"

বলরামের আত্মীয়স্বজন অনেকেই ক্রমে ঠাকুরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ঐটুকুমাত্র বলিলেই বলরাম-পরিবারের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল না। বলরামের বহু আত্মীয় শুধু ভক্ত ছিলেন না, ঠাকুরের অতি ঘনিষ্ঠ পার্ষদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বলরামের শ্যালক শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের সুপরিচিত স্বামী প্রেমানন্দ; তিনি ঈশ্বরকোটির অন্তর্ভুক্ত। বলরামের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "তিনি শ্রীমতীর (রাধারানীর) অষ্টসখীর প্রধানা।" ভাবিনী ঠাকুরানীর যত্নেই সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-ভবনে সেবাদির সুব্যবস্থা হইত। বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভবাবুর সহিত পাঠক পূর্বে পরিচিত হইয়াছেন। পিতা রাধামোহন বসু মহাশয় বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপামুগ্ধ বলরাম ধর্মপ্রাণ পিতাকে এই অমৃতপানে বঞ্চিত রাখা অনুচিত মনে করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বসু মহাশয়ও এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বলরামের তিনটি সন্তান—ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী। প্রথমা কন্যা ভুবনমোহিনী ১৮৯৪-এর শেষভাগে দেহত্যাগ করেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং আজীবন ভক্তসেবার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ফলত এইরূপ একটি সমপ্রাণ ভক্তপরিবার জগতে দুর্লভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাদের ভক্তিতে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, একবার ভাবিনী ঠাকুরানীর অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলকাতায় গিয়া রোগিণীকে দেখিয়া আসিতে বলেন। লজ্জাশীলা মাতাঠাকুরানী ভাবিলেন যে, কোন যান ব্যতীত যাওয়া অনুচিত হইবে; কারণ পল্লিগ্রামে পদব্রজে চলা তাঁহার অভ্যাস থাকিলেও মহানগরীর রাজপথে তিনি ঐরূপে চলিলে ঠাকুরের দুর্নাম হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও যান পাওয়া গেল না। ঠাকুর উহা শুনিয়া একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "কেন? তুমি হেঁটে যাবে! আমার বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর তুমি যান পেলে না বলে যাবে না?" যাহা হউক, একখানি পালকি সংগৃহীত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাতাঠাকুরানী উহাতে করিয়াই বলরাম-মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর

যখন শ্যামপুকুরে তখনও মাতাঠাকুরানী সেখান হইতে একবার পদব্রজে পীড়িতা ভাবিনী ঠাকুরানীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন কাশীপুরে যাওয়া স্থির হইল, তখন ব্যয়নির্বাহসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। গোপালচন্দ্র ঘোষের বাড়ির ভাড়া ৮০ টাকা, এতদ্ব্যতীত অন্য খরচও প্রচুর—গরিব ভক্তেরা এত টাকা কোথায় পাইবেন? তাই ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ভাড়ার টাকা দিতে বলিলে তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন। পরে বলরামের দিকে ফিরিয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি চাঁদায় খাওয়া পছন্দ করেন না, অতএব বলরাম যেন খাওয়ার খরচটা দেন। বলরামও মহানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ অনেক বিষয়েই বলরামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন। চিকিৎসাদিব্যপদেশে বা অন্যান্য কারণে ত্যাগী যুবকগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন। বস্তুত সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন মঠের অকৃত্রিম বন্ধু। বরাহনগর মঠের আদিম অবস্থায় বলরামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখিলেন মঠের ভ্রাতারা শুধু শাকভাত খাইতেছেন। অমনি গৃহে ফিরিয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন যে, তিনিও সেদিন তদ্ভিন্ন কিছু গ্রহণ করিবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন অম্বলের পীড়ার জন্য তিনি ঐরূপ করিতেছেন; কিন্তু বসু মহাশয় জানাইলেন যে, মঠের সাধুদের অবস্থা দেখিয়া অন্য ব্যঞ্জনাদিতে তাঁহার আর রুচি নাই। অতঃপর তিনি ঠাকুর-সেবার জন্য প্রত্যহ এক টাকা দিতেন এবং শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন মঠের সব সংবাদ তাঁহাকে দেন। এতদ্ব্যতীত মঠের পাচকের নিকট সংবাদ লইয়াও তিনি সব অভাব দূর করিতেন। তিনি যখন শেষবার শয্যাগ্রহণ করেন, তখন এই-সব কথা স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অবিলম্বে কাশী হইতে কলকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? ঠাকুরের অপর বহু ঘনিষ্ঠ পার্ষদের ন্যায় বলরামও অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিলেন (১ বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ; ১৩ এপ্রিল, ১৮৯০ খ্রিঃ)।

# মাস্টার মহাশয়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বপ্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' 'শ্রীম', 'মাস্টার', 'মণি', 'মোহিনীমোহন' বা 'একজন ভক্ত' ইত্যাদি ছদ্মনাম বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাঁহার অনুপম কীর্তিসৌরভ আপনা হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজারস্থ শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি 'মাস্টার' মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমন কি, ঠাকুরও তাঁহাকে কখনও মাস্টার বলিয়া অভিহিত করিতেন।

'কথামৃতে'র আদিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

**তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।**
**শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥**

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির গৃহপার্শ্বে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করাইয়া সর্বোত্তম ফলদানের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গাম্ভীর্য, স্বল্প কথায় সজীব চিত্রাঙ্কন, সর্বজনীন সহানুভূতি, অসীম উদারতা ও অবাধ অন্তর্দৃষ্টির সুনির্মল দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উচ্চাসন অধিকারপূর্বক লেখককে অমর করিয়াছে। একটি জীবনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইলেও মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ মৌখিক উপদেশপ্রভাবে শত সহস্র দুর্বল ধর্মপথচারীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের উজ্জ্বল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগাইয়াছেন। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কয়েকটি বৎসরের চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পূত-সঙ্গলাভে ধন্য দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ চিত্রসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাসুদিগকে অবলীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থাপনপূর্বক শান্তি ও বিশ্বাসের শুভ্র পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশয় সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের স্মৃতিরাজ্যে বাস করিতেন এবং

বাহিরের যে কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই কোন ঘটনার চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে উহারই সহিত বিজড়িত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আসিয়া যেকোন বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্তরচ্ছলে তিনি জীবন্ত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কিয়দংশ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত ব্রতই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই (১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১ আষাঢ়) শুক্রবার নাগপঞ্চমী দিবসে মহেন্দ্রনাথ কলকাতার সিমুলিয়া পল্লিস্থ শিবনারায়ণ দাস লেনের পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা শ্রীমধুসূদন গুপ্ত ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহখানি ক্রয়পূর্বক তথায় চলিয়া আসেন। গৃহখানি অদ্যাবধি বর্তমান এবং ঐ অঞ্চলের 'ঠাকুরবাড়ি' বলিয়া পরিচিত। পিতা মধুসূদন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মাতার স্নেহ ও সদ্‌গুণরাশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল। মাতার সহিত তাঁহার যে বহু অপূর্ব শৈশবস্মৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন চারি বৎসরের বালক মহেন্দ্র মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাঁদনীর ঘাটে নামিয়া যখন নবনির্মিত উদ্যান ও মন্দিরে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কালীমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত বালক অকস্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। অমনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলে বালক সুস্থ হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকে। উত্তরকালে মাস্টার মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, "হয়তো বা ঠাকুরই হবেন; কারণ তার কিছুদিন (চার বৎসর) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা কালীর পূজকপদে রয়েছেন।" আর একবার পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক সুবৃহৎ ছাদে অবস্থানপূর্বক অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে অনন্তের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিঝুম বারিপাতের মধ্যে অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন। কালীঘাটের ছাগবলি তাঁহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা দর্শনান্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কৈশোরেই

ফেলিয়া চলিয়া যান। সেদিন মহেন্দ্র অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, জননী সস্নেহে বলিতেছেন, "আমি এযাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না।" জগদম্বা পরে সত্যসত্যই তাঁহার লালনের ভার লইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে একটা এক-টানা ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আশ্বিনের ঝড় (৫ অক্টোবর, ১৮৬৪) মনে আছে?" তখন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন "আজ্ঞে হাঁ! তখন খুব কম বয়েস—নয় দশ বৎসর বয়স—এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম।" কোন দেবমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গমনাগমনকালে তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৺দুর্গাপূজার সময় দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। যোগাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাব্যপদেশে কলকাতায় সাধুসমাগম হইলে তিনি তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির জন্য আকুল হইতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহাই তাঁহাকে এককালে সর্বোত্তম সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যালয় ও কলেজ পাঠের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পাঠ্যগ্রন্থেও ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া রাখিতেন। 'কুমারসম্ভবে' যেখানে শিবের ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, গুহাভ্যন্তরে মহাদেব সমাধিমগ্ন, আর গুহাদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন—আর সে অলঙ্ঘ্য নির্দেশে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মূক, পশুবৃন্দ নিশ্চল এবং সমগ্রকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; অথবা 'শকুন্তলা'য় যেখানে কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিংবা 'ভট্টিকাব্যে' যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক তত্রত্য বৃক্ষলতাদিকে যজ্ঞধূমে কজ্জলবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন—সেইসব স্থল তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো ঐ বই পড়তাম।" বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের সহিত তিনি এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্য বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্যয়নকালে তিনি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথা শিখিয়া লইয়াছিলেন; তাই পরে বলিতেন, "ওকালতি কর আর নাই কর, আইন পড়ো; কারণ তাতে ঋষিদের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন অনেক জানতে পারবে।"

বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পরীক্ষায় তাঁহার স্থান ছিল পঞ্চম। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করেন। ইংরেজির অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নীসম্পর্কীয়া শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশান্তে তাঁহার অধ্যয়ন আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু সংসারের আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগপূর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল। পরে অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হইয়া তিনি বহু উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পদ শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনেক সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার গাম্ভীর্য, ধর্মভাব ও সহজ অধ্যাপনা প্রণালীতে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁহাকে বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তুত কার্যে তিনি সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সমাজ-মন্দিরে এবং 'কমল কুটীর' প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এ প্রকার আকর্ষণ-শক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত এবং দেবতা বলে মনে হত তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না করে প্রচার করছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও নিজের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হওয়ায় উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিবস বরাহনগরে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটিতে অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহ্নে (২৬ ফেব্রুয়ারি) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে রত আছেন। সুন্দর

দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সম্মুখে ঠাকুর যেন শুকদেবের ন্যায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন। ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতূহলী কবিসুলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া চলিল। উদ্যানপর্যবেক্ষণান্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। অচিরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক হইতেছেন দেখিয়া মাস্টার ভাবিলেন, "ইনি ঈশ্বরচিন্তা করিবেন", অতএব বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেলা আটটায়। ঠাকুর পুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা। মাস্টার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ!" অমনি ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওরে রামলাল, যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!" তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, মাস্টারের একটি ছেলেও হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীতি হইল যে, এযাবৎ যদিও তিনি ধর্মচর্চা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি জাগতিক স্তরের অধিক ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এইরূপে তাঁহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণীকৃত হইতে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্য না করিয়া যেন সান্ত্বনাচ্ছলেই বলিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল—আমি কপাল চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি।" ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও মাস্টার মহাশয়কে শীঘ্রই আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। কাণ্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত সুপরিচিত মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, মানবজীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এবং যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকারে বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাঁহার নিরাকার ভাল লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাকা উত্তম বটে, তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসদ্বয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না—তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নহেন, চিন্ময়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে যাঁহারা প্রতিমায় উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুত মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "কলকাতার লোকের ওই এক!

কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথা-ব্যথা কেন? তোমার নিজের যাতে জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।" মাস্টারের অভিমানের সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বস্তু—বুদ্ধি ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না; বুদ্ধিরূপ দুর্বল যন্ত্র-সাহায্যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না এবং তাদৃশ তত্ত্বলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্যক—তদ্ব্যতীত অতি মার্জিত বুদ্ধিও আমাদিগকে ভগবৎসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আরও কিছুদিন বরাহনগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় উপর্যুপরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মাস্টারের প্রতি কার্যে ও কথায় ঐ অন্তরঙ্গ সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে ঐ বৎসর ৫ মার্চ মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদিগকে বলিলেন, "ঐরে আবার এসেছে!" বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকৃত একটি ময়ূরের গল্প বলিলেন—ঐ ময়ূরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং ময়ূরেরও এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে একই স্থানে উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সত্যই তখন মৌতাত ধরিয়াছে। তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করেন; দীর্ঘ বিরহ অসহ্য বোধ হইলে ছুটিয়া শ্রীগুরুপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজে ঘর্মাক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এর মধ্যে (নিজের দেহ দেখাইয়া) কী একটা আছে যার টানে ইংলিশম্যানরা (ইংরেজি শিক্ষিতেরা) পর্যন্ত ছুটে আসে।" এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর একদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হলো না, তোমার হলো কেন? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার।" আর একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তরবাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এসব তো আমি জানি!" ('কথামৃত', ৪।৯।৫; অখণ্ড সং, পৃঃ ৩৭৮)। অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম—তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম" (ঐ, ২।১১।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ৩১৯)। আরও পরিষ্কার করিয়া একসময়ে কহিলেন, "তোমায় চিনেছি—তোমার 'চৈতন্য-ভাগবত'-পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র" (ঐ, ৪।৮।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ৩৫২)।

এরূপ সংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাধনা-সহায়ে ক্রমে অনুভূতির ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত সুপরিচিত থাকায় তাঁহাকে সদ্‌গৃহস্থ হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার মনে কখনও বৈরাগ্য আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবৃত্ত করাইতেন। একদিন তাই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সব ত্যাগ করিয়ো না, মা। ...সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা দিস—না হলে কেমন করে থাকবে? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা?—আচ্ছা, শেষে যা হয় করো।" অপরাপর দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন, "ছেলে হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক। তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার । ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" "আর বাপের সঙ্গে প্রীতি করো। এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? ...মা আর জননী—যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই জননী।" "যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; ...এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।" আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোর আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের নিকটে গিয়া তত্ত্বকথা শুনাইলেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে। ...ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।" আর উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।" "ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। ...তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। ...ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানত শুদ্ধা ভক্তিরই উপদেশ দিতেন। একদিন বলিলেন, "দ্যাখ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে—আর না। বল, আর করবে না।" মাস্টার যুক্তকরে বলিলেন, "আজ্ঞে, না।" মাস্টার স্বভাবত লাজুক ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই শালা, নাচ!" আর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা ভগবদালাপ করিতে। একদিন মাস্টার ও নরেন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৈতিক অবনতির কথা আলোচনা করিতেছেন জানিয়া মাস্টারকে বলিলেন, "এসব কথাবার্তা ভাল নয়—ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।" এইরূপে সাধুসঙ্গ,

নির্জন-বাস এবং ভগবদালাপনের সঙ্গে ব্যাকুলতার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।" এইসব স্থলে ব্যাকুলতার উল্লেখ দেখিয়া এবং পূর্বে বিচার-বিষয়ে নিষেধবাক্য শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে যে বৃথা তর্কপ্রবণতা আসে এবং ভগবৎসম্বন্ধহীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি, "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার—কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়...এই পর্যন্ত; ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং সমস্ত ব্যাপার ও পরিবেশটি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে পূর্বাভ্যাসানুসারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখেন। এই প্রকারেই যথাকালে 'কথামৃতে'র সৃষ্টি হয়।

মাস্টার মহাশয় প্রথমত নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশই দিতেন। একবার মতি শীলের ঝিলে ক্রীড়ারত মৎস্যগুলিকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মে ঐরূপে মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাস্টার সেই পথেই চলিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে একদিন (২২ অক্টোবর, ১৮৮২) তিনি স্বীকার করিলেন, "আমি দেখছি, প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা সহজ নয়।" ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, "দেখলে তো? তাহলে সাকার-ধ্যানই কর না কেন?" মাস্টার উহা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্বক তাঁহারই নির্দেশানুসারে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল; অবসরমত দুই-চারি দিন তিনি সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের প্রায় সমগ্র ডিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীগুরুসকাশে যাপন করেন।

এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যে মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই;" তিনিই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বীকার করিলেন, "আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করছেন—যেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে;"

আর তিনিই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জানাইলেন, "আমার মনে হয় যিশুখৃস্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।" ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিলেন যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি সে ফাঁকটি কী?" মাস্টার বলিলেন। "সে ফোকর আপনি।" অমনি ঠাকুর তাঁহার গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে অসুস্থ, তখন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। সেই পথে সে সময়ে দস্যুর উপদ্রব ছিল; তাই পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। তখন মাস্টারের চক্ষে নবানুরাগের অঞ্জন—দূর হইতে কামারপুকুর দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কামারপুকুরের পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই অভিবাদন জানাইলেন; আর সর্বত্রই ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জানিয়া পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-স্পর্শন করিতে লাগিলেন। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তার কি ভালবাসা। কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির আধিক্যে আপনা থেকে এত কষ্ট সহ্য করে ঐসব জায়গায় গিয়েছিল—কারণ আমি সেসব জায়গায় যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মতো। বিভীষণ মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পুজো-আরতি করত, আর বলত, এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।" আর কামারপুকুর হইতে প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "কি করে গেলে ও-ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।" সশরীরে একসঙ্গে যাওয়া অবশ্য হয় নাই; কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি তাঁহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসময়ে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন। মা কিন্তু সহাস্যে বলেন, "বাবা, ও-জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো—ওখানে থাকতে পারবে না।" অবশেষে মায়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল।

বাল্যের ন্যায় যৌবনেও মাস্টার মহাশয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হস্তের আভাস পাইতেন। ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখর দর্শনপূর্বক আনন্দে আপ্লুত ও ভক্তিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুর তাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা

দেখিতেন। স্বভাবত লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তখন কথা ফুটিত না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।" আর একদিন তিনি গান গাহিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও স্কুলে দাঁত বার করবে; আর এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা।" কখনও বা বলিতেন, "এর সখাভাব।"

যাহা হউক, এই নম্রপ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষসিংহ নরেন্দ্রের প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই। পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য জোগাড় করিয়া দেন; একবার নরেন্দ্রের বাড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্য একশত টাকা দেন; এতদ্ব্যতীত গোপনে নরেন্দ্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, নরেন্দ্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তখন বিরল দুই-চারি জন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠসংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই ঐ মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা স্মরণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে (গরিব ছোঁড়াগুলো) মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ (সুরেন্দ্র মিত্র), মাস্টার ও চুনীবাবু—এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মাস্টার মহাশয় তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শনলাভে ধন্য হন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটিরে তপস্যায় রত হন; কিন্তু আর্দ্র গৃহে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান। বরাহনগরের মঠে বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। আর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাঁহার; স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাত্রে গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যা লইয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদের

মধ্যে শয়নপূর্বক আপনাতেও সহায়সম্বলহীন গৃহশূন্য ব্যক্তির অবস্থা-আরোপের চেষ্টা করিতেন। পরে কেহ যদি এই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত, "এত কঠোরতা করতেন কেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "গৃহ ও পরিবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, আঠার মতো লেগে থাকে।" পর্ব উপলক্ষ্যে তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে যাইয়া দেখিতেন, মুক্তাকাশতলে কেমন তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বা জপরত রহিয়াছেন। কখনও হাওড়া স্টেশনে যাইয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহাপ্রসাদ চাহিয়া খাইতেন—উদ্দেশ্য, এইভাবে ঐ মহাতীর্থে গমনের অন্তত কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চির সামীপ্যবোধের জন্য তিনি দিবাভাগেও অবসরকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়া শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দ্দিবস যাপনান্তে প্রায় এক বৎসর তীর্থভ্রমণাদি করেন। এই অবকাশে তিনি মাসাধিককাল কনখল সেবাশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে একটি কুটীয়ায় থাকিয়া তপস্যা করেন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত 'কৃষ্ণ-সুদামা'র পালা দেখিয়া আহ্লাদিত হন।

প্রকাশ্যে এই সকল সাধনা ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখনও হবিষ্যান্ন-ভোজন বা পর্ণকুটিরে বাস করিতেন; কখনও বা বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, আর বিশাল আকাশ, গগনচুম্বী পর্বত, অপার সমুদ্র, সমুজ্জ্বল তারকামণ্ডলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, সুকোমল সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরীয় চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহু ঋষিদের তপোভূমিতে লইয়া যাইত। সুযোগ পাইলেই তাঁহার অন্তর্নিহিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইত। এইরূপে ১৯২৩ অব্দে মিহিজামে পাকা বাটি থাকা সত্ত্বেও তিনি নয় মাস পর্ণকুটিরে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহর মন ছিল উচ্চসুরে বাঁধা; প্রভাতসূর্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদা উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের মুখে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হইত। ফলত সর্বদা প্রাচীনের চিন্তাধারায় আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল। তাই তিনি যখন

নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশান্তললাট, সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ খ্রিঃ) ঐ অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, সামালাইতে না পারিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; অনেকক্ষণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

গৃহে থাকিলেও তাঁহার সাধুচিত অশেষ সদ্‌গুণরাশি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রাতে স্নানান্তে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বদা এই চিন্তা মনে জাগাইয়া রাখিতেন যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বস্তুর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, আর বলিতেন, "মৃত্যুচিন্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও জিনিসে আসক্তি থাকে না।" সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতে পারিতেন না। অন্যায় দেখিলে বলিতেন, "যার যে রকম স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে—মানুষের আর দোষ কি?" সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী—নিকটে ভৃত্য থাকিলেও তাহার সেবাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেন। এমনকি, আটাত্তর বৎসর বয়সে স্নায়ুশূলে হস্ত নিদারুণ ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণা-উপশমের জন্য স্বহস্তে পুঁটুলি গরম করিয়া সেক দিতেন। আবার এত সদ্‌গুণের আধার হইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্ত্যক্তস্বরে বলিতেন, "Mutual admiration (পারস্পরিক প্রশংসা) রেখে দাও।" নিরভিমান মাস্টার মহাশয় 'আমি, আমার' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন প্রয়োগ করিতেন বা গৌণভাবে কথা কহিতেন। তাঁহার বাড়ির প্রচলিত নাম ছিল 'ঠাকুরবাড়ি'। তিনি কখনও কখনও ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রমে থাকিতেন। একবার ঐরূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্যোপলক্ষে উত্তর কলকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া যাইতেন, "আমি এখানে খাব না—এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।" ভক্ত আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাদির পর তিনি ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্‌স্টিটিউট ক্রয় করেন। বিদ্যালয় পরে ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটির চার তলার ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন এবং তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মালাপ করিতেন। ঐ কক্ষই ছিল তাঁহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হইয়া তাঁহাকে ভগবৎপ্রসঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করিল। 'কথামৃত'-প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা মিটাইতে তাঁহার নিকট আসিত এবং মাস্টার মহাশয়ও তাঁহাদিগকে স্বীয় ভাণ্ড উজাড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

শেষজীবনে যাঁহারা মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার বাসস্থান তখন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হইয়াছিল—সংসারের প্রবল তরঙ্গোদ্বেলিত স্রোত নিম্নে প্রবাহিত, আর রাজপথের কোলাহলের ঊর্ধ্বে হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যখন যিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-ভক্তির আলোচনাতেই মগ্ন! ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাঁহার অসীম আনন্দ, অবিরাম ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের আগ্রহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্‌গ্রন্থপাঠ চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যিশু, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাখিয়াছেন। কেহ অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে আলোচনার ধারাকে ভগবন্মুখী করিয়া দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টার মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানের বাণী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হলে তাঁর কথা বলবে কারা? সেইজন্য মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন।" শ্রীশ্রীজগদম্বার মহিমাপ্রচারের জন্য ঠাকুর যাঁহাদিগকে 'চাপরাশ-প্রাপ্ত' বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টার মহাশয় ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে রাখিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ অসুখের সময় তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও রিপণ কলেজে তাঁহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাঁহার ধর্মভাবের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা রামবাবুর আকর্ষণে কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল; অথচ রামবাবুর তদানীন্তন ধারণা ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, "বিলে (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুরকে মানতই না,

তর্ক করত,'' "ঠাকুরকেই যদি ভগবান বলে বিশ্বাস হলো, তবে তাঁর কথাই তো শাস্ত্র; অপর শাস্ত্রের দরকার কি? ঠাকুরকে বকলমা দিলেই হলো; আর কোন সাধন-ভজনের দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কৃপা করবেন'' ইত্যাদি। অতএব কাঁকুড়গাছিতে তাঁহারা বরাহনগর মঠ কিংবা মঠবাসী সাধুদের কোন সংবাদই পান নাই। এদিকে তাঁহাদের উৎসুক নয়ন শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে, তাঁহাদের গম্ভীরপ্রকৃতি ও বেশভূষায় পারিপাট্যহীন মাস্টার মহাশয় কলেজের অবসরকালে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি (অর্থাৎ 'কথামৃত') নিবিষ্টমনে পড়েন। তাঁহার অন্যান্য চাল-চলনও একটু অসাধারণ। অতএব তাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহেও গেলেন। মাস্টার মহাশয় মাদুর পাতিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্শ্বে বসিলেন—অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণত যে কায়দা-দুরস্ত ব্যবহার দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। এইরূপে যুবকদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইয়া মাস্টার বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী; তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তাঁর যে সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়; গৃহস্থেরা হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক বলতে পারে না।'' এই উপদেশের ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেন।

মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।'' আর একজনকে বলিয়াছিলেন, "হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ! বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন।'' আবার বলিতেন, "যখন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।'' এইসব উপদেশ দিয়া তিনি আরও বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল ত্যাগ; এমন কি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে এই জন্মেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইত; অপর স্থলে ভাবী জন্মে ঐরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না, তিনি চন্দ্রসূর্যকে আলো ও উত্তাপ দেবার জন্য রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন—আমরা দেখে অবাক। লোকের চৈতন্য হবার জন্য তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে বেশি ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন।'' ভক্ত আপত্তি

জানাইলেন, "এই যে সব সাধুরা আসেন, এঁরা কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন?" মাস্টার মহাশয় ঈষন্মাত্র ইতস্তত না করিয়া উত্তর দিলেন, "এদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলঙ্কসাগরে মগ্ন হয়েও আবার কলঙ্ক অর্জন করছে। ...সাধুরা যদি অন্যায়ও করে তবু আবার ঝেড়ে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।" সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সদালাপ করিতেন আর বলিতেন, "সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন! এঁর জন্য আমার স্নানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না।" সাধুদিগকে তিনি শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না—কিছু না কিছু অবশ্যই খাওয়াইতেন, আর বলিতেন, "আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি—আমি পূজা করছি ও তাই দেখছি।" বস্তুত তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহার মুখে সাধুর উচ্চ আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে অধিকতর যত্নবান হইতেন।

যেকোন ঘটনা বা বিষয় অবলম্বনে ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, সেই সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, তেমনি পরিচিত সকলকেও তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। উৎসবাদিতে যাওয়া যখন তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তখন অনুরক্ত ভক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন। একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাবে! কালকে দশহরা—সেখানে পুজো দেখবে। হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'কি করে সর্বদা আপনাকে স্মরণ থাকে?' রামচন্দ্র বললেন, 'উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।' তাই পর্ব-উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রসাদে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল—উহা ধারণ করিবার পূর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণান্তে মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণায় একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, "গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।" আর ছিল তাঁহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওটা করবেন না। 'তৃণাদপি সুনীচেন'—ও থাক। ঠাকুর বলতেন, 'এর দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্য আসনে বসাতে হয়।' যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।"

স্বয়ং ভগবৎকৃপালাভে ধন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় অপরের সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া যাঁহারা সুদীর্ঘকাল তথায় যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাঁহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। শাসন তিনি করিতেন না—মুখে ছিল তাঁহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র আশীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাঁহার জীবন দুর্বিষহ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া বৃথা স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি শক্তিক্ষয় বা অনুরাগীকে বিব্রত করিতেন না। সর্বাবস্থায়ই তিনি শান্ত থাকিতেন; সুখ-দুঃখ তাঁহাকে অকস্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। অবস্থা মন্দ না হইলেও তিনি আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুরের উপদেশই এই ছিল যে, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে হইবে। জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন ও লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্র পরিধানের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া আগন্তুকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনে ত্যাগ হলেই হলো; অন্তঃসন্ন্যাসই সন্ন্যাস।" মাস্টার মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণয়নই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতুম, তখনই বিশেষভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। তাই দক্ষিণেশ্বরে যা পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ পড়ে পাছে সব গুলিয়ে যায়, এই ভয়ে আমি তাঁর কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত ঐসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তাঁর উপদেশ আরো ভাল করে জীবনে পরিণত করতে পারি।" এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে লিখিত 'Gospel of Sri Ramakrishna'(শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও

উপদেশ প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এদিকে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় 'কথামৃত'-রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ অব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমে ১৯০৪ অব্দে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ অব্দে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অব্দে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হইল; ১৯৩২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়।[১] তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যভাবেও অর্থাদির দ্বারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত ভক্তদের সাহায্যার্থে এবং তপোরত সাধুদের অভাব মিটাইবার জন্যও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন। ঐসমস্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাঁহার ন্যায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুমহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার পরদিবস ১৯৩২ খ্রিঃ ৪ জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২০ জ্যৈষ্ঠ) সকাল সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হন। পূর্বরাত্রি নয়টায় 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখিতে দেখিতেই হাতের স্নায়ুশূলের অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে "মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও" বলিতে বলিতে তিনি চিরনিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করেন। শ্রীগুরুর বাণী-প্রচারে উৎসৃষ্টপ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ কার্যেই রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

---

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)', ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

# অধরলাল সেন

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ দোলপূর্ণিমার দিনে সুবর্ণবণিককুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কলকাতায় আহিরীটোলা অঞ্চলে ২৯ নং শঙ্কর হালদার লেনে পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে বাস করিতেন, পরে পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগপূর্বক কলকাতায় আসেন। অধরের পিতা রামগোপাল আরমানী স্ট্রিটে সুতার কারবারে প্রচুর অর্থোপার্জন করিলেও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ছিল; অধরলাল তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচাঁদ শিক্ষা, সাহিত্যানুরাগ ও বদান্যতার জন্য সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। অধরলালের দুইজন ভগিনীও ছিলেন। তাঁহার পিতা রামগোপাল পরে ৯৭ নং বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে নূতন বাসভবন-নির্মাণান্তে সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। 'কথামৃত'-কার তাই লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের বাটির বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়া আছে" (২।৩।৬; অখণ্ড সং, পৃঃ ১৭২); "আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে" (৪।১৭।১; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫১৬); আর অধরের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "অধর ঠাকুরের পরমভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি আমার পরম আত্মীয়'।"(২।৩।৬; অখণ্ড সং, পৃঃ ১৭২)।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধরলাল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকারান্তে ইংরেজি সাহিত্যে ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বয়সেই তাঁহার দুইখানি কবিতা-পুস্তক—'ললিতাসুন্দরী' ও 'মেনকা' প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থখানি তাঁহার উনিশ বৎসর বয়সে মুদ্রিত হইলেও উহা দুই-তিন বৎসর পূর্বের রচনা। 'মেনকা' উহার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয়। 'মেনকার' তিন বৎসর পরে (১৮৭৭) 'নলিনী' ও 'কুসুমকানন' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরবৎসর 'কুসুমকাননে'র দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হয়। এইসকল পুস্তকে আমরা অধরকে প্রধানত প্রেমের কবিরূপেই পাই। এই প্রেমিক ও ভাবুক কবির কাব্যের নায়ক-নায়িকার উক্তি অবলম্বনে তাঁহার তদানীন্তন ধর্মভাবের স্পষ্ট পরিচয়প্রদানের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সম্ভবত সমসাময়িক খ্রিস্ট ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে 'ললিতাসুন্দরী'তে তথাকথিত পৌত্তলিকতা

ও বলিদানের প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে; 'মেনকা' কাব্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে এবং 'কুসুমকাননে'র ২য় ভাগে 'মহাবীর' কবিতায় অদ্বৈতের ছায়া পড়িয়াছে।

অধরলাল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রাম যান। তথায় সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের প্রাচীন কীর্তিসমূহ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি পুরাতত্ত্বের সহিত পরিচয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় পুরাণ এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'The Shrines of Sitakund' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং পরবৎসর মার্চ মাসে উহা কলকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধটি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই তিনি বদলি হইয়া যশোহরে যান এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল ডেপুটি কালেক্টর হইয়া কলকাতায় আসেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ নভেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুত অধরের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহার বেনিয়াটোলার বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। যৌবনোদ্‌গমে অধরবাবু স্বীয় কাব্যমধ্যে ধর্মসম্বন্ধে যত সন্দেহই প্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, স্বগৃহে তিনি হিন্দুভাবেই চলিতেন। বিশেষত সীতাকুণ্ডের নির্জন মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁহার মনে যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল, উহা তাঁহাকে অধিকতর ধর্মপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আবার শিক্ষিতসমাজেও তাঁহার যশ বিস্তৃত হওয়ায় তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সহাধ্যায়ী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিতাগ্রণী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসিয়া 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন, জনৈক বন্ধুর কীর্তনাদি শ্রবণ এবং বন্ধুর ভাব বা দশা উপস্থিত হইলে তাহা নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সন্দেহের নিরাস হয় নাই; তাঁহার শুধুই মনে হইত, ভাবাবস্থাদি যদি ভগবৎপ্রেমেরই বিকাশ হয়, তবে বন্ধুর সেরূপ অবস্থায় মুখে একটা দুঃখের কালিমা লক্ষিত হয় কেন? এদিকে সাহিত্যরসিক ও ধর্মানুসন্ধিৎসু শ্রীযুত অধরলাল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সংবাদপত্রপাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কলকাতায় আগমনের পর উহা কার্যে পরিণত করার সুযোগ ঘটিল।

সম্ভবত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ ('কথামৃত', ৫।৪।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ১৪৪) তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং তদবধি প্রাণমন তাঁহাতেই

অর্পণপূর্বক শান্তির অধিকারী হন। তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন হয় ঐ বৎসর ৮ এপ্রিল ('কথামৃত', ২।৩।৫; অখণ্ড সং, পৃঃ ১৭০)। বৃদ্ধ সাধক ও পুত্রশোকসন্তপ্ত সারদাচরণকেও সেদিন তিনি সঙ্গে নিয়াছিলেন; কারণ প্রথমদর্শনেই অধরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃখজ্বালা মোচন করিতে সক্ষম। 'কথামৃতে'র পাঠক অবগত আছেন যে, শ্রীযুত অধরের সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল। ঠাকুর অতঃপর তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "তুমি ডিপুটি; এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য। সংসার কর্মভূমি—এখানে কর্ম করতে আসা। ...কিছু কর্ম করা দরকার— সাধন। ...খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়।" একদা ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দিব্যানন্দের আস্বাদ করাইলেন; অধিকন্তু সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবিতে যথার্থ ভাব-মহাভাবের অন্তর্নিহিত প্রেমানন্দের দ্যোতনাদর্শনে তিনি বৃদ্ধ সারদাচরণকে বলিলেন, "তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়েছিল; তোমাদের ভাব দেখে মনে হতো যেন ভিতরে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরের আনন্দঘন মধুর হাসি ও তাঁর মাধুর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল।" ব্রহ্মানন্দজী তাই বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে দর্শন না করলে—তাঁর কাছে আসা-যাওয়া না করলে অধরবাবুর মনে সংশয় ঘুচত না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার গৃহে যাইতেন। তিনি একদিন (২০ জুন, ১৮৮৪) মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ভাবে দেখিলাম—অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, সুরেন্দ্রর বাড়ি, এসব আমার আড্ডা। ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।" তাই তিনি পুনঃপুনঃ ইঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিতেন। তিনি কতবার কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। তবে 'কথামৃত' হইতে জানা যায় যে, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন, ১৪ জুলাই ও ২১ জুলাই অধরভবনে ঠাকুরের পদার্পণ হয়; পরবৎসর ৬ সেপ্টেম্বর তথায় তাঁহার শুভাগমন হয়; ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ঐ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অধর-গৃহে উপস্থিত হইলে অধর বলিলেন, "আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম—এমন কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "বল কি গো!" যেদিন অধরগৃহে যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মিলন হয়, সেদিন

যে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, তাহা বড়ই শিক্ষাপ্রদ, বড়ই উপভোগ্য—উহাতে তদানীন্তন ভারতীয় ভাবরাজ্যের অনেক রহস্যস্থল সমুদ্ভাসিত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নহে। আমরা অধরলালের জীবনালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি।

চারি-পাঁচ বৎসর ডেপুটির পদে অবস্থিতির পর অধর কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদের জন্য প্রার্থী হন। ডেপুটি হিসাবে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল তিন শত টাকা; আর প্রার্থিত পদের বেতন ছিল মাসিক হাজার টাকা। তাই তিনি এই পদলাভার্থে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুত যদু মল্লিক প্রভৃতির সাহায্য চাহিয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণও জগদম্বাকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন, তাই অধর, মাস্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে ঠাকুর একদিন কহিয়াছিলেন, "হাজরা বলেছিল, 'অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল।' অধরও বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম, 'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে; যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, 'মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান, ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এইসব চাচ্ছে!' (অধরের প্রতি)—কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে এত আনাগোনা করলে!" অধর উত্তর দিলেন, "সংসার করতে গেলে এসব না করলে চলে না। আপনি তো বারণ করেননি।" ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই; তবে তাঁহার প্রকৃত ভাব বিশ্লেষণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "আপনাদের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।" আলোচ্য দিনে ঠাকুর শ্রীযুত অধরকে ত্যাগের কথাই শুনাইতে লাগিলেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে আত্মজীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অধরের সন্দেহ কিন্তু তবু মিটিল না, এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়া বসিলেন, "চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন—...অত পণ্ডিত, অত মান!" ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরার্থে—শুধু ভগবানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নতুবা মান, যশ প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সর্বশেষে তিনি বলিলেন, "আপনি হাকিম কি বলব! যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি মূর্খ।" অমনি অধরবাবু হাসিয়া কহিলেন, "উনি আমাকে একজামিন (পরীক্ষা) করছেন।" ঠাকুরও সহাস্যে বলিলেন, "নিবৃত্তিই ভাল।" আর অধরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মাসিক তিনশত টাকা ও ডেপুটির সম্মানাদি নিতান্ত হেয় নহে; অতএব উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইরূপে অধরকে ভর্ৎসনা করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যথাসময়ে যদু মল্লিককে অধরের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু মল্লিক যখন বলিলেন, "অধর যুবক, তার কর্মের বয়স যায়নি," তখন ঠাকুর আর ঐ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিলেন না। ফলত অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটই থাকিয়া গেলেন; পরন্তু এই ঘটনাপরম্পরায় তাঁহার জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল।

সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্যের অনুভূতি কিন্তু একদিনেই দৃঢ়মূল হয় না। সদ্‌গুরু তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিষ্যদের দৃষ্টি চরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে অধরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টস-এর একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারত সরকার কর্তৃক এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো মনোনীত হন। এই সময়ে কোন কোন দিন অফিসের পরে সন্ধ্যায় সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদির সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতএব সভাসমিতির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এসব অনিত্য; মিটিং স্কুল অফিস—এসব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।" শ্রীযুত অধরকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এসব অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই; তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।" গৃহী ভক্তকে এরূপ অবিমিশ্র অনাসক্তির উপদেশ-দান ঠাকুরের জীবনে বড় বিরল। এই ক্ষেত্রে তিনি কি দিব্যচক্ষে ভক্তের আসন্ন মৃত্যুর চিত্র দেখিতেছিলেন? অধরবাবু ইহার পরে দীর্ঘকাল ইহজগতে ছিলেন না।

ইহা মনে করিলে কিন্তু অধরবাবুর প্রতি অবিচার করা হইবে যে, তিনি কার্যে ডুবিয়া ঠাকুরকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মান ও ঐশ্বর্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও বর্ধিত হইয়াছিল। অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই তিনি প্রায় প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ৺ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণামান্তে ঠাকুরের পদতলে প্রণত হইতেন এবং পরে আরতিদর্শনে যাইতেন। আরাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেন কিংবা উপদেশ শ্রবণ করিতেন। কিন্তু দিবসব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের পর তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা সম্ভব হইত না। তাই ঠাকুর তাহার জন্য মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেন এবং তাঁহার অবসন্ন দেহ অচিরেই তথায় নিদ্রাভিভূত হইত। রাত্রি নয়টা-দশটায় তাঁহাকে উঠাইয়া দিলে তিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মবন্দনান্তে গাড়ি করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এই যাতায়াতে তাঁহার প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত; সুতরাং অন্য প্রকার আমোদ-আহ্লাদের তাঁহার অবকাশ বা প্রবৃত্তি ছিল না। আবার ঠাকুরকে প্রায়ই গৃহে আনিয়া তিনি আনন্দোৎসব করিতেন। কোন সময়ে ঠাকুর দীর্ঘকাল না গেলে তাঁহার মনে হইত যেন গৃহের বায়ু দূষিত হইয়াছে; সেজন্য ঠাকুরকে বলিতেন, "আপনি অনেক দিন যাননি; ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে," অথবা "আপনি অনেক দিন এ বাড়িতে আসেননি; ঘর মলিন হয়েছিল, যেন কি একরকম গন্ধ হয়েছিল।" দুর্গোৎসবে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভবনে যাইতেন এবং প্রতিমার সম্মুখে ভাবমগ্ন হইতেন; আর সমাধিভঙ্গে বলিতেন, "এমন হাস্যময়ী

প্রতিমা আর দেখা যায় না।" আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে সে আনন্দনিকেতনও শ্রীযুত অধরের নিকট নিরানন্দ মনে হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে অধরবাবু কিছুদিন বৈষ্ণবচরণের পদাবলীকীর্তন শুনিতেন এবং ঠাকুরও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও ভাবগাম্ভীর্য শতগুণ বর্ধিত করিতেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ঠাকুর তাঁহার বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাহারও কাহারও সুবর্ণবণিকের গৃহে ভোজনে দ্বিধা ছিল বলিয়া তাঁহারা অবকাশ খুঁজিয়া আহারের পূর্বেই সরিয়া পড়িতেন। তবে এমনও হইত যে, ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ ঐরূপ জাতিবিচার তখনকার মতো পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে একদিন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে দ্বিধা লইয়াই প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু ইহার পর ভক্তগৃহে এ প্রকার সঙ্কোচ অযৌক্তিক জানিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন; তখন ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।"

অধরলাল স্বল্পায়ু ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার সরকারি কার্যোপলক্ষ্যে তিনি অশ্বারোহণে মানিকতলা ডিস্টিলারি-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে শোভাবাজার স্ট্রিটে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতনের ফলে তাঁহার বাম হস্তের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অচিরে ধনুষ্টঙ্কার আরম্ভ হয়। বহু পূর্বেই ঠাকুর তাঁহাকে অশ্বারোহণ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে? তাঁহার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তখন তিনি বাক্‌শক্তিহীন। তবু ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ তাঁহার দুই নয়নে দরদরধারে অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুরও ম্লানমুখে সাশ্রুনয়নে তাঁহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অভয়বাণী শুনাইলেন। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপৃষ্ঠে গমনকালে অধরের ইষ্টদর্শন হইয়াছিল এবং সেই আনন্দে তিনি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি (১২৯১ সালের ২ মাঘ) বুধবার প্রত্যূষে বেলা ছয়টার সময় শ্রীযুত অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন। সে নিদারুণ শোকে মুহ্যমান ঠাকুর ৺জগদম্বার নিকট অভিমানভরে স্বীয় বেদনা জানাইয়া বলিলেন, "মা, তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো এই অবস্থা!" আহা! ভক্তের জন্য ভগবানের কি অচিন্তনীয় আর্তি![১]

---

১ 'উদ্বোধন', ১৩৫৬, ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৫৭, আষাঢ়-শ্রাবণে শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সেনের লিখিত প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

# গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন-রচিত 'রামকৃষ্ণপুঁথি'তে (৪৫৬-৫৭ পৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া,
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তাঁয়,
কহিল, 'ভৈরব মুই আইনু হেথায়।'
'কিবা প্রয়োজন?'—তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল, 'কার্য করিব তোমার।'
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর,
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর।

গিরিশকে ভৈরবরূপে দেখার উল্লেখ 'লীলাপ্রসঙ্গে'ও (১ম ভাগ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৪৩ পৃঃ) আছে—"পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে ভাবসমাধিতে একদিন তাঁহাকে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন।"

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বঙ্গসমাজে প্রধানত মহাকবি, নাট্যকার ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে তিনি একনিষ্ঠা ভক্তি ও ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া গিরিশ-জীবন যেমন মহিমমণ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেমনি অপরিহার্য।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার (১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন) গিরিশের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নীলকমল ঘোষ কলকাতায় ১৩নং বসুপাড়া লেনে বাস করিতেন। গিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন ঘোষ ঐ বাটিটি ক্রয় করিয়া কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই গৃহেই গিরিশের জন্ম হয়। নীলকমল সওদাগরী অফিসে বুককিপারের (হিসাব-রক্ষকের) কার্য করিতেন। ঐ কার্যে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া সাহেবদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাঁহার উপার্জন মন্দ ছিল না। সাংসারিক বিচক্ষণতা, উদারতা, পরোপকার ও অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকুলসম্ভূতা ভক্তিমতী জননী রাইমণিও অন্যান্য অশেষ গুণের সহিত বংশপরম্পরায় ধর্মভাব পাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরদেবতার কথা শুনিতে ও স্তবপাঠ করিতে ভালবাসিতেন এবং বৈষ্ণব-ভিখারি বাড়িতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। গিরিশের মাতুল নবীনকৃষ্ণ ভাবপ্রবণ, বিদ্যানুরাগী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন এবং তর্কে ছিল তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা। জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণের অমায়িকতা ও আমোদপ্রিয়তা পাড়ায় সুবিদিত থাকিলেও তিনি সুরাসক্ত ছিলেন। গিরিশ উত্তরাধিকারসূত্রে এই সকলের গুণাগুণই লাভ করিয়াছিলেন। খুল্লপিতামহীর প্রভাবও তাঁহার উপর অনেকখানি পতিত হইয়াছিল। পিতামহীর বর্ণনাভঙ্গীতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প গিরিশের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিত। একবার শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাগমনের চিত্রটি বৃদ্ধা এমন প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, গোপ-গোপীদের নয়নজল, প্রকৃতির মৌনকাতরতা এবং মা যশোদার ক্ষিপ্তপ্রায় হাহাকার উপেক্ষা করিয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গেলেন শুনিয়া কাতরকণ্ঠে বালক গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কি আবার এলেন?" পিতামহী বলিলেন, "না।" আবার প্রশ্ন হইল, "আর এলেন না?" "না!" তৃতীয়বারও অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং উত্তর পাইয়া কাতরহৃদয়ে বালক অন্যত্র চলিয়া গেলেন, সে দারুণ বিরহ-ব্যথা দূর হইতে তিনদিন লাগিয়াছিল। কোমল-হৃদয় বালক সেই তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসে নাই।

গিরিশ ছিলেন রাইমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান; তাই পাছে মায়ের দৃষ্টিতে পড়িয়া সন্তানের অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে জননী গিরিশকে কোনরূপ আদর করিতেন না। তবে জননীর স্নেহে তিনি যতটুকু বঞ্চিত ছিলেন, পিতার আদর ততটুকু অধিক পাইতেন। অতঃপর একটি ঘটনায় গিরিশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই মঙ্গলকামনায় জননী এই অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। একদিন গাল ও গলা ফুলিয়া বালক গিরিশ জ্বরে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, সেই সময় রাইমণি নীলকমলবাবুকে ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তুমি যেমন করে পার বাঁচাও।" অকস্মাৎ স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া নীলকমল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাইমণি বলিলেন, "আমি রাক্ষসী এক সন্তান খেয়েছি। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না। ...আমার হেলায় কত কষ্ট পেয়েছে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" ইতঃপূর্বে বাইশ বৎসর বয়সে গিরিশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। জননীর পূর্ণ স্নেহে বঞ্চিত থাকার আর একটি কারণও ছিল। পুত্রপ্রসবের পর রাইমণি সূতিকারোগে শয্যাশায়িনী হন এবং মাতৃস্তনে বঞ্চিত গিরিশ এক বাগদি

মেয়ের স্তন্যপানে বাধ্য হন। জননী অতঃপর দীর্ঘদিন ধরাধামে ছিলেন না—গিরিশের দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গিরিশের বাল্য-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণ গতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। বিশেষ এই যে, পিতার আদরের দুলাল গিরিশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড়ই আবদারে হইয়া উঠিতেছিলেন; যেখানে বাধা পাইতেন সেখানেই তাঁহার অশান্ত ভাব দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিত। জুজুর ভয় দেখাইলে তিনি জুজুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইতেন। পুত্রের এই প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া পিতা সম্ভবক্ষেত্রে মোটেই বাধা দিতেন না। গৃহদেবতা শ্রীধরকে নিবেদন করিবেন মনে করিয়া জেঠাই-মা বাগানের প্রথম শশাটি কুটো-বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। গিরিশের উহা খাইবার ইচ্ছা হইল, তাই পিতার বাড়ি ফিরিবার পূর্বে কান্না শুরু করিলেন, "তেষ্টা পেয়েছে"—"জলখাবার তেষ্টা নয়" বা "বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়, খিড়কির বাগানের শশাখাবার তেষ্টা।" বাবার আদেশে শশা গিরিশের হাতে আসিল। জেঠাই-মা দেবরকে বারণ করিলে নীলকমল উত্তর দিলেন, "বালক যার জন্য এত করে কাঁদছে, শ্রীধর কি তা তৃপ্তি করে খাবেন?"

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশ বিদ্যালয়ে গেলেন; কিন্তু প্রকৃতিচালিত পুত্রকে স্নেহপ্রবণ পিতা ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে সরাইতে থাকায় পুত্রের বিদ্যাভ্যাস অতি মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসকালেই তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম শুনিয়া তিনি কবিতা-রচনায় মন দিয়াছিলেন এবং গুপ্ত-কবির 'সংবাদপ্রভাকরে'র গ্রাহক হইয়াছিলেন। হাফ-আখড়াই, কথকতা, রামায়ণ-গান ইত্যাদির প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,' 'অন্নদামঙ্গল,' পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাড়িতে বসিয়া পড়িতেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সময়ে হিন্দুর ধর্মজীবন ও ধর্মভাবের সহিত ক্রমেই সুপরিচিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনে হয় যে, ইহাতে তাঁহার কবিকল্পনার পরিপুষ্টি ঘটিলেও তিনি ইহার আধ্যাত্মিক আহ্বানে আত্মবিসর্জন দিতে কখনও প্রস্তুত ছিলেন না।

ভাবী জীবনের জন্য গিরিশ যখন এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছেন তখন তাঁহার চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা নীলকমল অকস্মাৎ পরলোকগমন করিলেন। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে গিরিশ তখন স্বাধীন। পিতার দূরদৃষ্টির ফলে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর যত্নে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা পাইলেও গিরিশকে রক্ষা করা ভগিনীর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধিমতী কৃষ্ণকিশোরী পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পর নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী প্রমোদিনীর

সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটাইলেন। নবীনবাবু গিরিশের পিতৃবন্ধু এবং বিচক্ষণ ভদ্রসন্তান; তিনি এ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানির বুক-কীপার ছিলেন। দিদি ভাবিলেন, ইঁহার সাহায্যে গিরিশকে শাসনে রাখিতে পারিবেন। ফল কিন্তু বেশি কিছুই হইল না। পিতার মৃত্যুতে গিরিশের বিদ্যালয়ের পাঠ কিছুদিন বন্ধ রহিল। পরে পুনর্বার অধ্যয়ন আরম্ভ হইলে তিনি পূর্বেরই ন্যায় বিদ্যালয় বদলাইতে লাগিলেন; অবশেষে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পাইকপাড়া সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইলেন। বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। তবে পূর্বাভ্যাসানুসারে স্বগৃহে সাহিত্যচর্চা চলিতে লাগিল।

তখন ইংরেজি শিক্ষার সর্বাধিক আদর। গিরিশ বিবাহের যে যৌতুক পাইয়াছিলেন, উহা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থ কিনিলেন এবং মনোনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। গিরিশ যখন যাহা ধরিতেন তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন; ইংরেজি-পাঠকালে নিজের গৃহেই অধিক সময় কাটিত—বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্পগুজব পর্যন্ত হইত না। এই কালে তিনি বঙ্গভাষারও ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং গৃহে বসিয়া উৎকৃষ্ট ইংরেজি কবিতার পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিতেন। নিজের সংগৃহীত পুস্তকে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে অভিভাবকহীন গিরিশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দোষও বৃদ্ধি পাইল। পানদোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা ক্রমেই প্রবল হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একটি বওয়াটে দলের সৃষ্টি হইল। দলপতি গিরিশ কখনও তুবড়ীওয়ালা সাপুড়ের সঙ্গে বাণ খেলিতেছেন, কখনও পাড়ায় আগত ভণ্ড সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিতেছেন, কখনও-বা লোকাভাবস্থলে মৃতের সৎকারে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গরিবের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রতিবেশীরা যদিও তখন গিরিশ ও তাঁহার দলের অযাচিত সাহায্যে উপকৃত হইতেন ও উহার প্রত্যাশা রাখিতেন, তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খল দলকে তাঁহারা ভালবাসিতেন না। জামাতার ভাবগতিক দেখিয়া শ্বশুর নবীনবাবু তাঁহাকে স্বীয় সওদাগরী অফিসে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ বর্ষ গিরিশবাবু বিভিন্ন অফিসে চাকরি করিয়াছিলেন।

বাংলার ধনাঢ্যগৃহে তখন পাশ্চত্যের অনুকরণে থিয়েটারের প্রচলন হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উহা দেখার সৌভাগ্য ঘটিত না। তাই জনসাধারণের জন্য সখের থিয়েটার আরম্ভ হয়। গিরিশবাবু অভিনেতা বা সঙ্গীত-রচয়িতারূপে এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতেন। পরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগে অভিনীত

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশেষে যুগধর্মানুসারে সখের থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশবাবু উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও বন্ধুদের আগ্রহে এবং নিজের অভিনয়স্পৃহাবশত মাঝে মাঝে উহাতে যোগ দিতে লাগিলেন। কালক্রমে থিয়েটারে বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইল এবং সখের দল পেশাদারী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই উভয় পরিবর্তনের জন্য গিরিশ দায়ী না হইলেও, ইহাও সত্য যে বাঙলার থিয়েটারে পূর্ণ পরিণতাবস্থার তিনিই অধ্যক্ষ, অভিনেতা, নাট্যাচার্য ও নাট্যকার হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালনভার গ্রহণপূর্বক বঙ্গীয় নাট্যালয়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। থিয়েটারে প্রথম দীনবন্ধু ও মাইকেল প্রভৃতির নাটক অভিনীত হইত, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করা হইত। গিরিশবাবু প্রথমত সঙ্গীত-রচনা, উপন্যাসাদিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করা এবং স্বয়ং অভিনয় করাতেই তৎপর ছিলেন; পরে রঙ্গামোদীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ মিটাইবার জন্য মৌলিক নাট্যরচনায়ও অগ্রসর হইলেন।

তিনি তখনও সওদাগরী অফিসে চাকরি করিতেন বলিয়া অর্থের জন্য অভিনয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না; একটা প্রকৃতিগত রসসৃষ্টি ও রসপরিবেশনের প্রেরণাতেই তিনি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই—'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ে (১৮৭৩ খ্রিঃ, ২২ ফেব্রুয়ারি) ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি যখন শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন এবং উহার পুরস্কারস্বরূপ নাটোরের মহারাজের নিকট হইতে রাজবেশ ও তরবারি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উহা আত্মসাৎ না করিয়া থিয়েটার-সম্প্রদায়কেই দান করেন। এইভাবে আরও কয়েক বৎসর থিয়েটার ও চাকরি একসঙ্গে চালাইয়া ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে তিনি স্বীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে থিয়েটারের সৌষ্ঠব সাধনে অর্পণ করিলেন। ঐ দিন তিনি প্রতাপচাঁদ জহুরীর অনুরোধে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন।

অতঃপর অনেক স্থানেই তিনি অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। যখন যেখানে যাইতেন সেখানেই তিনি হইতেন নূতন থিয়েটারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও প্রাণ। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য সকল সম্প্রদায়ই লালায়িত থাকিত। অথচ নির্লোভ গিরিশবাবু নিজদোষে কোন সম্প্রদায় ত্যাগ করিতেন না বা কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না—সকলেই ছিলেন তাঁহার বন্ধু। আবার সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার নিস্পৃহতা সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। অমৃতলাল প্রভৃতি বন্ধুরা যখন তাঁহারই উৎসাহে স্টার

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইয়া উহার গৃহনির্মাণে তৎপর, তখন এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল গিরিশবাবুকে বলিলেন যে, তিনি যদি বিশ হাজার টাকা বোনাস (অতিরিক্ত পারিতোষিক) ও সাড়ে-তিন শত টাকা মাসিক বেতন লইয়া এমারেল্ডের অধ্যক্ষ না হন, তবে শীল মহাশয় স্টারের সর্বনাশ করিবেন। এই সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশবাবু স্বীয় বোনাস হইতে ১৬০০০ টাকা স্টারের জন্য দান করিয়া এমারেল্ডের পরিচালনভার লইলেন (১৮৮৭)। পরে তিনি পুনর্বার স্টারে ফিরিয়া আসেন (১৮৮৯)।

শ্রীযুত গিরিশের নাট্যপ্রতিভা দিকে দিকে কিরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; কারণ আমরা ভক্ত গিরিশের সন্ধানে ফিরিতেছি। আমরা শুধু অমৃতলালের ভাষায় এইটুকু বলিয়াই শেষ করিব যে, "গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক। ...বাঙলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র। ...ইঁহার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলেন না।"

ভক্ত গিরিশের অনুসরণের পূর্বে আমরা তাঁহার চরিত্রের আর একটু দিগ্‌দর্শন করিয়া লইব। প্রতিবেশীদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও পীড়াদি তাঁহাকে ব্যথিত করিত বলিয়া তিনি এক সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন; কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিক বিধি মানিতে পারে না দেখিয়া বিরক্তিসহকারে উহা বর্জন করেন, কিন্তু পরোপকারী হইলেও যৌবনারম্ভে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, অধিকন্তু যুগপ্রভাবে ধর্মে আস্থা হারাইয়াছিলেন। তবে পিতার প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে তিনি পিতৃতর্পণ করিতেন—বলিতেন, "জল দিই; কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য হয়।" একবার শারদীয়া পূজার পূর্বদিন কাহারা তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রতিমা রাখিয়া গেল এবং প্রাতে প্রতিবেশীরা অনেকেই মজা দেখিবার জন্য তথায় সমবেত হইল। নিম্নের কোলাহলে নিদ্রোত্থিত গিরিশবাবু সমস্ত বুঝিলেন এবং মদ্যপানান্তে কালাপাহাড় সাজিয়া কুঠার হস্তে প্রতিমাকে আক্রমণপূর্বক খণ্ড-বিখণ্ড করিলেন—দিদির আর্তনাদ, প্রতিবাসীর প্রতিবাদ প্রভৃতি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। সারাদিনের পরিশ্রমান্তে স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশিকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল ও মুখ ফুলিয়া উঠিল। দিদি মানসিক করিলেন, চারি বৎসর মায়ের পূজা দিবেন এবং যথাকালে সে প্রতিজ্ঞা পালনও করিলেন। গিরিশের কিন্তু কোন অনুশোচনা দেখা গেল না। শোনা যায়, অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছাদিতবুদ্ধি গিরিশ তখন পথে চলিতে চলিতে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গকে অপমান করিয়া দেখিতেন, শিব শাস্তি দেন কিনা। তদানীন্তন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর-না-মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত।

কিন্তু হিন্দুর দেশে ...হিন্দুর প্রাণ ঈশ্বরকে একেবারে হঠ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন ঈশ্বর লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার।...ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট।...জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ—তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।" গিরিশের তখনকার দার্শনিক বিশ্বাস স্বরচিত কবিতায় প্রকটিত হইয়াছে—

পঞ্চভূত ধরি করে মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলাপ্রায়।
একত্র যখন বাঁধে পঞ্চভূত হাসে কাঁদে
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়!

চিরদিন সকলের একরূপ যায় না। পরবর্তী কালে যিনি লোকচরিত্র অঙ্কন করিয়া মহাকবি নামে পরিচিত হইবেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বৈচিত্র্যময়। তিনি ১৮৬৮ খ্রিঃ দ্বিতীয়া ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ও অল্প পরেই অব্যবহিত অনুজ কানাইলালকে হারাইলেন। তাঁহার তেইশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র জন্মিয়া এক মাস পরেই বিদায় লইল; ইহার সাত বৎসর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই শোকানল নির্বাপিত হইবার পূর্বেই আর একটি সহোদরার মৃত্যু হইল। অবশেষে গিরিশপত্নী সূতিকারোগে প্রায় এক বৎসর ভুগিয়া গিরিশের আপ্রাণ সেবাসত্ত্বেও দেহত্যাগ করিলেন (১৮৭৪-৭৫ খ্রিঃ)। দুঃখে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের শরণ লয়; কিন্তু গিরিশবাবু স্বেচ্ছায় সে সহায়তায় বঞ্চিত। এখন তাঁহার যন্ত্রণালাঘবের সহায় মাত্র সাহিত্যচর্চা, কাব্য-প্রণয়ন এবং সুরাপান। গিরিশচন্দ্র তাহাতেই ডুবিলেন।

বিপত্নীক গিরিশবাবু শীঘ্রই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন পরিবারের ঐকান্তিক যত্নে গৃহে আবার শ্রী ফিরিল। তিনিও কতক সংযত হইলেন এবং থিয়েটারের কার্যে পূর্ণোদ্যমে যোগ দিলেন। রসসৃষ্টি এবং আনন্দপ্রদান ব্যতীত এই কার্যে তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু এই থিয়েটারই তাঁহার জীবনকে অতঃপর এক মধুর পরিণতির দিকে লইয়া চলিল। তিনি চাহিয়াছিলেন পুরুষকার এবং যুক্তিতর্ক-পরিপুষ্ট অবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণ তীরদ্বয়ের মধ্যে জীবনপ্রবাহকে আবদ্ধ রাখিতে; কিন্তু ঘটনাপরম্পরার আকর্ষণে সে প্রবাহ ক্রমেই অধিকতর বিশাল ও শক্তিশালী হইয়া কখন কিরূপে যে অসীম সমুদ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না।

বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ঘোর দ্বন্দ্বে তখন তাঁহার মন বিক্ষুব্ধ। বিপদে পড়িয়া তিনি

কখনও অপরের অনুকরণে ঈশ্বরকে ডাকিয়া ফেলিতেন বটে; কিন্তু তখনই আবার কার্যকারণের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বলিতেন, "এটা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে।" দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি যখন ফ্রাইবার্জার কোম্পানির কাজে ভাগলপুরে ছিলেন, তখন একদিন বন্ধুদের সহিত বেড়াইতে গিয়া এক অন্ধকার গুহায় নামিয়া পড়েন। কিন্তু বহির্গমনের পথ না পাইয়া বন্ধুগণ বলিতে থাকেন যে নাস্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটিয়াছে—এখন বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকা ভিন্ন উপায় নেই। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনিও সে প্রার্থনায় যোগ দিলেন এবং তখনই সম্মুখে পথ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, "ভাই, আজ বিপদে পড়েই তাঁকে ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস করে কখনও তাঁর নাম নিতে পারি তবেই নেব, নতুবা বিপদে কি—মৃত্যুভয়েও নয়।"

গিরিশবাবু প্রথমে ঐতিহাসিক নাটক লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙালি দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণপূর্বক রঙ্গমঞ্চকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পৌরাণিক ও ধর্মবিষয়ক নাটক-রচনা আবশ্যক। সম্ভবত এই প্রয়োজনের তাড়নায়ই তিনি দেব-দেবী ও অবতারদের চরিত্রাঙ্কনে ব্রতী হইয়াছিলেন। নতুবা পূর্বোক্তরূপ মনোবৃত্তিবিশিষ্ট গিরিশবাবু যে অকস্মাৎ তাঁহাদের পূজায় আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহা মোটেই যুক্তিসহ নহে। বস্তুত অভিনেতা যেমন নাটকীয় ভূমিকাকে বুদ্ধিপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াও তাহার সহিত একীভূত হন না, গিরিশও তেমনি লেখনীমুখে দেবচরিত্রাদি ফুটাইয়া তুলিলেও সর্বদা দ্রষ্টা ও সাক্ষী হইয়াই রহিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য রহিল দর্শকের চিত্তবিনোদন এবং প্রয়োজন হইল নামযশ ও জীবিকা।

ইহার সহিত বাল্যের সুসংস্কার যে একেবারেই মিশ্রিত ছিল না, তাহা নহে। অধিকন্তু তিনি তখন নিছক অর্থার্থীই নহেন, তিনি আর্তও বটেন। কত শোকই না তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছে! ইহারই মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ছয়মাস পরেই বিসূচিকা-রোগে তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। মৃত্যু যখন শিয়রে দণ্ডায়মান, তখন তিনি সহসা দেখিলেন সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব মাতৃমূর্তি—তাঁহার সীমন্তে সিন্দূর, নয়নদ্বয় স্নেহপূর্ণ, পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। সেই দেবী তাঁহাকে দিলেন মহাপ্রসাদ খাইতে। গিরিশবাবুর যখন চমক ভাঙ্গিল, তখনও তাঁহার মুখে সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ রহিয়াছে! অতঃপর তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই অলৌকিকরূপে পুনর্জীবনলাভান্তে আর একদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দিকে শত্রু; এমন কি, বন্ধুগণও নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত।

পুরুষকারসহায়ে সংসারে অভ্যুদয়লাভ করিয়া তিনি আজ পদে পদে বিপর্যস্ত! অধিকন্তু বিসূচিকা হইতে আরোগ্যের পরও তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। অগত্যা তিনি সর্বব্যাধিহর ৺তারকনাথ মহাদেবের শরণ গ্রহণপূর্বক কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলেন এবং শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন-ভোজনে মন দিলেন। এই সময়ে তিনি প্রতি বৎসর শিবরাত্রি-ব্রত করিতেন এবং ৺তারকনাথদর্শনে যাইতেন; কখনও বা কালীঘাটে যাইয়া যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে আসন পাতিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে ডাকিতেন। শোনা যায়, সকাম সাধকের প্রার্থনা মা অন্তত আংশিক পূর্ণ করিয়াছিলেন—গিরিশ তখন ঔষধপ্রয়োগ ব্যতিরেকে শুধু ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ আরোগ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার মনে তখন আকুলতাও জাগিয়াছে; তাই তাঁহার মুখে তখন রব উঠিত, "মা, মা," আর ৺তারকনাথের নিকট তিনি প্রার্থনা জানাইতেন, "আমার সংশয় ছেদন কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয়ছেদন না হয়, তুমি আমার গুরু হও।"

সাহিত্যক্ষেত্রে গিরিশবাবু তখন পৌরাণিক নাটক রচনায় লিপ্ত। একখানির পর একখানি নাটকে সাফল্যলাভের পর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের এক শুভমুহূর্তে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাঁহার 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হইয়া বিকৃতরুচি নবীন বঙ্গকে পুরাতনের অবিস্মরণীয় আস্বাদ প্রদানপূর্বক তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। গিরিশও কি তখন ভক্তিতে পরিপ্লুত? তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তো ঐরূপ মনে হয় না। 'চৈতন্যলীলা'র রসাস্বাদে বিমুগ্ধ জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী স্বীয় প্রীতি ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের জন্য গিরিশগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কবিবর সুরার বোতল লইয়া বসিয়া আছেন। নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ঔষধ সেবন করছেন?" নিন্দা ও স্তুতিতে ভ্রূক্ষেপহীন কবি জানাইলেন যে, বোতলে ঔষধ নহে, মদ্য আছে। গৌরলীলার সহিত এইরূপ আচারের অসামঞ্জস্য দেখিয়া বাবাজী তৎক্ষণাৎ বিদায় লইলেন।

বাবাজী গেলেন, কিন্তু এই 'চৈতন্যলীলা'ই অযাচিতভাবে গিরিশের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণকে আনিয়া দিল। 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয়ে সুখ্যাতি শ্রবণে ঠাকুর একদিন (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪) ভক্তগণসহ থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবু অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলে ঠাকুরই তাঁহাকে প্রথমে প্রণাম করিলেন। গিরিশ প্রতিনমস্কার করিলে ঠাকুর আবার নমস্কার করিলেন। এইভাবে কয়েকবার চলিলে গিরিশ দেখিলেন, ঠাকুরের ভাগে সর্বদা একটি নমস্কার অধিক থাকিয়া যাইতেছে। গিরিশবাবু পরে বলিয়াছিলেন, "রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে

জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।" তিনি প্রণামাস্ত্রে পরাজিত হইয়া মনে মনে শেষ নমস্কার জানাইলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া গিয়া উপরে বসাইলেন। তারপর একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া তিনি অসুস্থতাবশত বাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহা কিন্তু প্রথম দর্শন নহে, তৃতীয় দর্শন।

প্রথম দর্শন হইয়াছিল বসুপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়িতে (সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রিঃ)। গিরিশবাবু 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কথা পড়িয়াছিলেন। সেই সময় আর্ত ও জিজ্ঞাসু গিরিশ বিসূচিকা হইতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভের পর ধর্মে মন দিয়াছেন; কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাস তখনও মনে স্থান পায় নাই। 'মিরর'-পাঠান্তে তাঁহার মনে হইল, "ব্রাহ্মরা কি আবার এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে!" যাহা হউক, পাড়ায় তিনি আসিয়াছেন জানিয়া কৌতূহলবশে সেখানে গিয়া দেখিলেন, পরমহংস মহাশয় উপদেশ দিতেছেন এবং কেশববাবু প্রভৃতি সানন্দে শুনিতেছেন। সন্ধ্যাসমাগমে একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" শুনিয়া গিরিশ ভাবিলেন, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে! সম্মুখে সেজ জ্বলছে, তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।" সুতরাং আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া তিনি বাড়ি ফিরিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে দ্বিতীয় দর্শন। ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামণি বলরাম পল্লির অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যোগী ও পরমহংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ সাধ্যসাধনা করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস কিন্তু উহার বিপরীত! ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল—তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না। সেইদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে?" শ্রীযুত গিরিশের ইচ্ছা ছিল আরও দেখেন; কিন্তু শিশিরবাবু জোর করিয়াই সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তৃতীয় দর্শনকালে ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিকটে আসিলেও সন্দেহ ও দম্ভের ঘোর কুজ্ঝটিকা তখনও কাটে নাই। সুতরাং গিরিশবাবু চিনিয়াও চিনিলেন না।

চতুর্থ দর্শনের পূর্বে জগদম্বাকে ডাকিয়া তিনি দেবতার ইহলৌকিক শক্তিতে

বিশ্বাসী হইয়াছেন; কিন্তু পরলোকের পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান পান নাই। শাস্ত্রে বলিয়াছে বটে, "গুরুর্ব্রহ্মাগুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভগবানকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও মানুষকে তো গুরুর আসন দেওয়া চলে না—দম্ভ যে প্রতিপদে বাধা দেয়! এই সময়ে একজন বৈষ্ণব বলিলেন যে, তিনি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দেন এবং ভগবান তাহা গ্রহণ করেন; কখনও কখনও রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে। কিন্তু গুরুলাভ না হইলে তাদৃশ সাক্ষাৎকার অসম্ভব। ঘটনাটি যাহাই হউক, গুরুলাভসম্বন্ধে এই উক্তিটি শুনিয়া রুদ্ধগৃহে বসিয়া নিঃসহায় গিরিশবাবু অশ্রুবিসর্জন করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছেন। এমন সময় ভক্তসমভিব্যাহারে ঠাকুর সেই পথে বলরাম-মন্দিরে যাইবার কালে গিরিশের সহিত চক্ষুর মিলন হইতেই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু গিরিশ প্রতিনমস্কার করিলে আর পুনর্নমস্কার না করিয়াই, তিনি নিজপথে চলিতে থাকিলে গিরিশের মনে হইল, কে যেন অদৃশ্য সূত্রে তাঁহার হৃদয় টানিয়া লইতেছে। একটু পরেই জনৈক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" তদনুসারে তিনি বলরাম-মন্দিরে গেলে কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি ভাল আছি; বাবু, আমি ভাল আছি"—বলিতে বলিতে কেমন যেন অবস্থা হইয়া গেল। পরে কহিতে লাগিলেন, "না না, ঢং নয়—ঢং নয়।" এ কি গিরিশের সন্দেহের উত্তর? একটু পরে গিরিশের সহিত এইরূপ আলাপ হইল—(গিরিশ) "গুরু কি?" "গুরু কি জান?—যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।" (গিরিশ) "মন্ত্র কি?" "ঈশ্বরের নাম।" আরও কথাবার্তার পর প্রত্যাবর্তনকালে গিরিশ অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার দম্ভের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—অবশেষে একদিন এই দেবমানবের নিকট তাঁহাকে মস্তক নামাইতেই হইবে।

পঞ্চম দর্শনকালেও সেই ভগ্ন দম্ভের কাঠামো দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার থিয়েটারের সাজঘরে প্রবেশপূর্বক যখন জানাইলেন যে, ঠাকুর অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন, তখন স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়াই গিরিশ কহিলেন, "ভাল বক্সে লইয়া গিয়া বসান।" দেবেনবাবু যখন বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবেন না?" তখন বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না?" কিন্তু গেলেন ঠিকই। সেদিন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের সৌম্য মুখপদ্মদর্শনে গিরিশের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল—তিনি চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। অভিনয়ের অবকাশকালে পরমহংসদেব দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন; দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা গিরিশের অনুরোধসত্ত্বেও না বসিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন—সাহিত্যিক গিরিশ তখনও জানেন না, বাস্তব জগতে গুরুকে শিষ্য কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যাহা হউক,

গিরিশের সহিত আলাপ চলিতে লাগিল। গিরিশ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার মধ্যে যেন কি একটা নবধারা প্রবাহিত হইতেছে! ইতোমধ্যে ঠাকুর ভাবাবস্থায় একটি বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিলে গিরিশের মনে প্রবল বিজাতীয় ভাবের উদয় হইল। অমনি ঠাকুর বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" ইনি মনের ভাব বুঝিতে পারেন দেখিয়া অবাক হইয়া গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁক যায় কিসে?" উত্তর হইল, "বিশ্বাস কর।"

ষষ্ঠ দর্শন হইল মধু রায়ের গলিতে শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। সেদিন গিরিশবাবু হঠাৎ একটু চিরকুট পাইলেন—সেখানে পরমহংসদেব আসিতেছেন। অপরিচিত গৃহে যাইবেন কিনা এই বিচারবুদ্ধি আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেও এক অদৃশ্য টানে তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন সন্ধ্যাসমাগমে রামবাবুর প্রাঙ্গণে নৃত্য-পরায়ণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ভক্তেরা নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন, "নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।" নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলে ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত গিরিশের দম্ভ ও ভক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিল—তিনিও ঐরূপ করিবেন কি-না। অমনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত ঠাকুর তাঁহারই ঠিক সম্মুখে আসিয়া পুনঃ সমাধিস্থ হইলে তিনি সাগ্রহে পদধূলি লইলেন। সঙ্কীর্তনান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া গিরিশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে তো?" আশ্বাসের বাণী আসিল, "যাবে।" আবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি একই উত্তর পাইলেন। দুইবার জিজ্ঞাসা করায় সেদিন মনোমোহনবাবু তাঁহার অবিশ্বাসের জন্য রূঢ়স্বরে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বাধায় অসহিষ্ণু অভিমানী গিরিশ কিন্তু তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও সেদিন প্রতিবাদ করিলেন না। পরে তিনি থিয়েটারে যাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্রবাবু কিয়দ্দূর সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পরামর্শ দিলেন।

গিরিশের মন স্তরে স্তরে উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরে সপ্তম দর্শনকালে তাঁহার বোধ হইল যে, গুরুই জীবনের সর্বস্ব। সেদিন তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি মন্ত্রও আবৃত্তি করিলেন। ঠাকুর বসিতে বলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে গিরিশ বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি উপদেশ শুনব না। আমি অনেক উপদেশ লিখেছি—তাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করে দিতে পারেন করুন।" ঠাকুর রামলাল দাদাকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন; উহার ভাবার্থ—বিশ্বাসই সব। গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" উত্তর আসিল, "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ; কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ; আমি এখানেই থাকি।" ফিরিবার সময় গিরিশ জানিতে চাহিলেন, "আমি আপনাকে

দর্শন করেছি—আবার কি আমায় যা করতে হয় তাই করতে হবে?” ঠাকুর গিরিশকে কিছুই ছাড়ার উপদেশ না দিয়া ইতিমূলক বিশ্বাসের রাজবর্ত্মে চলিতে বলিলেন।

ঠাকুর কোন বিষয়ে গিরিশকে নিষেধ করিতেন না, জনৈক ভক্ত একদা ঐরূপ করিতে বলিলে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, “না গো না ওকে কিছু বলতে হবে না; ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।” এই বিষয়ে গিরিশও সাক্ষ্য দেন—“এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ-সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি এ কি আপদ!” একদিন গিরিশ সুরাপানে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া অশ্বযানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, “গাড়িতে কিছু ফেলে এল কি-না দেখে আয় তো।” লাটু তাহাই করিলেন। আর একদিন কাশীপুরে গিরিশ উপস্থিত হইলে লাটুকে তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন, ফাগুর দোকান হইতে গরম কচুরি আনাইয়া খাওয়াইলেন এবং নিজ হাতে এক গেলাস জল গড়াইয়া দিলেন। গিরিশ এক রাত্রে বারাঙ্গনাগৃহে বন্ধুদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় প্রাণে দক্ষিণেশ্বরের আকর্ষণ অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই বন্ধুর সহিত ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন মন্দিরোদ্যানের ফটক বন্ধ হইয়াছে, লোকজন নিদ্রিত। গিরিশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরমহংসদেব বাহিরে আসিলেন এবং মদ্যপানে বিহ্বল তাঁহার হাত ধরিয়া আনন্দে হরিনাম ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে স্নেহের স্পর্শে গিরিশের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। পরমহংসদেব সম্বন্ধে গিরিশ পরে বলিয়াছিলেন—“জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। ... তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন—আবার পিতার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ। ...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই; কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।”

একদিন ঠাকুর অভিনয় দেখিতে গেলে অপ্রকৃতিস্থ গিরিশবাবু ধরিয়া বসিলেন, “তুমি আমার ছেলে হবে—বল।” ঠাকুর জানাইলেন যে, তাঁহার বাবা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হইতে যাইবেন? গিরিশবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অনেক গালাগালি করিলেন। ইহাতে উপস্থিত ভক্তেরা খুবই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন এইরূপ পাষণ্ডের নিকট আর না যান।

ঠাকুর চুপ করিয়া শুধু সব শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। পরদিন দক্ষিণেশ্বরেও ঐ প্রসঙ্গ হইতেছে, এমন সময়ে ভক্তবীর রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "রাম, তুমি কি বল?" রামবাবু উত্তর দিলেন, "দেখুন, কালীয় সাপ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, 'প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব কোথায়?'—গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?" রামবাবুর কথা শুনিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "তবে চল, রাম, তোমার গাড়িতেই একবার সেখানে যাই।" ওদিকে প্রকৃতিস্থ হইয়া গিরিশ নিজ অপরাধ-স্মরণান্তে আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন; ঠাকুরকে দেখিয়াই পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন, আর কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে?"

কয়েকবার যাতায়াতের পর গিরিশবাবু ঠাকুরকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এখন থেকে আমি কি করব?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যা করছ, তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক দুদিক রেখে চল; তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।" গিরিশবাবু তখন ভাবিতেছেন, "আমার স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই নিয়মিত সময় নাই; সুতরাং শ্রীগুরুর বাক্য স্বীকার করিয়া পরে অক্ষমতার জন্য কেবল দোষভাগীই হইতে হইবে।" আবার তিনি জানিতেন যে, "কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইলাম"—এই কথা ভাবিতেও তিনি হাঁপাইয়া উঠেন। অতএব নিজের অপারগ ও অসহায় অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ করে নিও।" গিরিশ তখনও নীরব। তাঁহার আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই; আবার বৈষয়িক বিভ্রাটে আহার ভুল হইয়া যায়। নিদ্রার অবস্থাও তাই। এত সহজ গুরুবাক্যগ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আপন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশের মনে তখন নৈরাশ্যের ঝড় বহিতেছে। তাই ঠাকুর আবার বললেন, "তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি।'—আচ্ছা তবে আমায় বকলমা দে।" ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা। কথাটি মনের মতো হওয়ায় গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল—তিনি ভাবিলেন, সমস্ত দায় ঠাকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বকলমার গূঢ় অর্থ ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে এক কঠিন সাধনসমরে অবতীর্ণ করিল। কোন কার্যে আর তাঁহার 'আমি,' 'আমার' বলার পর্যন্ত অধিকার থাকিল না; সুখ-দুঃখে তাঁহার হর্ষ-বিষাদের অবকাশ রহিল না; এমন কি, তিনি

বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি বকলমা দিয়াছে, তাহার সাধনভজন-জপতপরূপ কার্যের আর অন্ত নাই—"তাকে প্রতিপদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটা করলে।" অচিরেই বকলমার পরীক্ষা দিতে হইল। দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহাকে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্ররত্ন উপহার দিয়াছিলেন। অকালে সেই কন্যা দুইটি কালগ্রাসে পতিত হইল এবং স্ত্রীও পুত্রপ্রসবের পর সূতিকারোগে শয্যাগ্রহণ করিলেন; আর তিনি উঠিলেন না। ব্যথিত গিরিশবাবু লিখিলেন, "শূন্য প্রাণ, শূন্য এ সংসার!" কিন্তু বকলমা দিয়া তিনি নিঃশেষে আত্মদান করিয়াছেন; অতএব শেষপর্যন্ত স্থির করিলেন, "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।"

ক্রমে এমন দিন আসিল, যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্বে যাঁহাকে ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীগুরুমূর্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বসাইলেন পূজার আসনে। শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ যে নিশীথে ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন গিরিশ। আবার কাশীপুরে ইংরেজি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের শুভ প্রথম দিনে যখন ঠাকুর 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন সেইদিনও গিরিশেরই অন্তস্তল হইতে উত্থিত অপূর্ব স্তব ঠাকুরের ঐশী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কল্পতরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে গিরিশকে ঠাকুর যখন প্রশ্ন করিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ?"—তখন গিরিশ কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদগদস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?" শ্রীযুত গিরিশের তখন পাঁচসিকা পাঁচআনা বিশ্বাস। ঠাকুরের গলা হইতে একদিন পুঁযরক্তাদি পড়িয়াছে; পাত্রাদি তখনও পরিষ্কার হয় নাই। গিরিশবাবু কাশীপুরে আসিলে ঠাকুর ইঙ্গিতে সেসব দেখাইয়া বলিলেন। "আবার বলে অবতার!" গিরিশ একটুও ইতস্তত না করিয়া বলিলেন, "এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে—তাই এই রোগ।" ঠাকুর অপর সকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "পাঁচসিকে পাঁচআনা।"

গিরিশবাবু জানিতেন যে, এমন পাপ নাই যাহা এই জ্বলন্ত দেবচরিত্রের সংস্পর্শে অচিরে ভস্মে পরিণত না হয়। তাই সাহঙ্কারে বলিতেন, "তুমি আসবে আগে জানলে আরো বেশি করে অপচার করে নিতুম।" আর কহিতেন, "ঠাকুরের কাছে আর সকল শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল; আর এমন পাপ নেই যা আমি করিনি। তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন। ...তিনি কিছু নিষেধ করেননি—সব আপনি

ছুটে গেল।" এই সবই সত্য; কিন্তু শুধু পাপ-বিমোচনের দিক হইতে শ্রীযুত গিরিশকে দেখিলে অন্যায় হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার 'ভৈরব' এক হস্তে সুধাপাত্র অপর হস্তে সুরাভাণ্ড লইয়া মায়ের মন্দিরে উপস্থিত। গিরিশ 'চৈতন্যলীলা'দির ভিতর দিয়া যে সুধা বিতরণপূর্বক বঙ্গবাসীকে তৃপ্ত করিতেছিলেন, ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের পরে সে সুধা আরও অকাতরে বিতরিত হইতে লাগিল এবং উহার আস্বাদও অধিক রুচিপ্রদ হইল। 'চৈতন্যলীলা'দিতে যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমবারি-সিঞ্চনে তাহা ফলপুষ্পসমন্বিত মহামহীরুহে পরিণত হইল। অতঃপর 'বিল্বমঙ্গল,' 'পাণ্ডব-গৌরব', 'নসীরাম' ইত্যাদি নাটকের প্রতি চরিত্র ও প্রতি পঙক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাবধারার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যা করছ তাই করো; ওতেও লোকশিক্ষা হবে।" আর একদিন তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়জনকে লোকশিক্ষার জন্য শক্তি দেন; কারণ একা ঠাকুরের পক্ষে এত কাজ করা অসম্ভব। জগন্মাতা সে প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও গিরিশচন্দ্রের অবদান অমূল্য। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার গৃহ ছিল ত্যাগী ভক্তদের একটি আনন্দের স্থান। অর্থ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা করিয়া গিরিশ সর্বতোভাবে সঙ্ঘকে রক্ষা ও লালন-পালন করিয়াছিলেন। আর সেই ছোট ভাইদের উপর কত বিশ্বাস ও ভালবাসা! বিবেকানন্দ প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ সালে যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যোগ দেন, সেদিন তিনি গিরিশকে পঞ্চবটীতলায় সমাসীন দেখিয়া প্রণামানন্তর চলিয়া যাইবার সময় কে যেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি কুৎসিত টিপ্পনী করিলেন। অমনি গিরিশ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "শালারা নিজেরাও ভাল হবে না আবার অপরের ভালও দেখবে না।... তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'ওরা (নরেন প্রভৃতি) হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে?' ওদের যদি নিজের চোখেও অন্যায় করতে দেখি, তা হলে বলব, ওরা অন্যায় করেনি, করতে পারে না—আমার নিজের চোখেরই দোষ হয়েছে। চোখ উপড়ে ফেলতে রাজি আছি, তবু ওরা অন্যায় করছে বলতে পারব না।"

ইহা শুধু মুখের কথা নয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রবীণ ভক্তেরা অকস্মাৎ ভাবিয়া বসিলেন যে, নরেন্দ্রাদি যুবকগণ সেবার নামে অযথা গৃহস্থদের কষ্টার্জিত অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। প্রমাণ কিছুই ছিল না;

তথাপি হিসাব দেখিতে চাহিলেন এবং দুই-চারি পয়সা ঠিকে ভুল পাইয়া ক্রুদ্ধভাবে শাসাইয়া গেলেন যে, তাঁহারা আর চাঁদা দিবেন না। কথাটা ঠাকুরের কানে উঠিলে তিনি সস্নেহে যুবকদিগকে বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি তাঁহাদের আনীত ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। পরে শ্রীযুত গিরিশকে ডাকাইয়া সব শুনাইলেন। গিরিশ বিনা বাক্যব্যয়ে নিম্নে নামিয়া আসিলে যুবকগণ হিসাব দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। অমনি শূরভক্ত সে হিসাব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "কারো কাছে যেতে হবে না; আমি বাড়ির এক-একখানি ইট বিক্রি করে সব খরচ জোগাব।" কার্যত অবশ্য ততদূর করিতে হইল না; কারণ ভক্তেরা অচিরে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

১৮৯১ খ্রিঃ গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের অতি আদরের পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল। গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার জন্য পুত্ররূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন। এই পুত্রের আচরণাদি-দর্শনে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার ঘরে আসিয়াছেন; অতএব ঐ দৃষ্টিতেই পুত্রের সেবাদি চলিতেছিল। সে কুসুমকলি অকালে বৃন্তচ্যুত হইলে তিনি দুঃসহ শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। অথচ ঠাকুরকে বকলমা দেওয়াতে শোকপ্রকাশেরও অবকাশ ছিল না—তিনি শুধু অন্তরেই জ্বলিয়া মরিতেছিলেন। এই শোকের কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। প্রবীণ কবি নবীন ছাত্রদের ন্যায় শ্লেট-পেন্সিল লইয়া গণিতশাস্ত্রের চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও পুনর্বার আরম্ভ করিলেন এবং অভিনয়াদি নিত্যকর্ম হইতে অবসর লইয়া ভগবদালাপনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও এই শোক অতি গভীর এবং উহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত থাকিয়া তাঁহার জীবনে অবসাদ আনিয়া দিতেছে, ইহা কাহারও বুঝিতে বাকি ছিল না। তাই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছেন, চল দুজনে কোথাও চলে যাই।" গিরিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমরা যা বলবে, ঠাকুরের কথা-জ্ঞানে আমি এখনই করতে প্রস্তুত; কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা করে সন্ন্যাসী হবারও যে আমার সামর্থ্য নাই—ঠাকুরকে আমি যে বকলমা দিয়েছি।" নিরঞ্জন কহিলেন, "আমি বলছি, চল।" গিরিশ আর ইতস্তত না করিয়া যাত্রা করিলেন। নিরঞ্জন জানিতেন, গিরিশের এই জ্বালা জুড়াইবার উপযুক্ত স্থান ঠাকুরের জন্মস্থান শ্রীধাম কামারপুকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বাসভূমি জয়রামবাটি। তিনি তাঁহাকে সেই পুণ্যতীর্থদ্বয়ে লইয়া গেলেন। ঐ অঞ্চলে গিরিশ মায়ের আদর পাইয়া ও ঠাকুরের কৃপা অনুভব করিয়া কয়েকমাস আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। অতঃপর শান্তহৃদয়ে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন যে, নিরঞ্জনের কৃপায়ই তাঁহার এবংবিধ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ৺দুর্গাপূজাদর্শনের জন্য গিরিশ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটি হইতে বলরাম-মন্দিরে আসেন এবং গিরিশভবনে প্রতিমা দর্শন করিয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করেন। গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ৺জগদম্বা-জ্ঞানেই পূজা করিতেন এবং অজ্ঞাতসারেও তাঁহার প্রতি ঈষন্মাত্র অবজ্ঞা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। এক সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে পায়চারি করার কালে সহসা গিরিশের পত্নী তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্তী বলরাম-মন্দিরের গৃহচ্ছাদে অবস্থিতা মাতাঠাকুরানীর প্রতি আকর্ষণ করিলেন। অমনি গিরিশ নিচে নামিয়া আসিলেন এবং সহধর্মিণীকে বলিলেন, "না, না, আমার পাপনেত্র; এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।"

ইং ১৯০৬ অব্দ হইতে তিনি প্রতি বৎসর হেমন্ত-সমাগমে শ্বাসরোগে কষ্ট পাইতেন। তদবধি তিনি সর্বপ্রকারে সংযত হইয়া চলিতে থাকিলেও রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯০৯-১০ অব্দে তিনি কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নিকটে এক ভাড়াবাড়িতে চারি মাস থাকিয়া আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেবাশ্রমে আগত রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন এবং এই চিকিৎসায় শহরে তাঁহার বেশ সুনাম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের মতো জিনিস ছিল ঠাকুরের প্রসঙ্গ করা। স্বামী প্রেমানন্দ তখন কাশীতে গিরিশকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হচ্ছে। আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। আহা, তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল, 'তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে।' ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি! যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে হ্যাক্-থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন—তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়স, কিন্তু বালকের মতো স্বভাব দেখি। ...শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা। ...তাঁর চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা।" কাশীতে থাকাকালে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শঙ্করাচার্য' রচনা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার মন সর্বদা ধর্মভাবে পূর্ণ থাকায় গ্রন্থেও উহার যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। রচনা শেষ হইলে তিনি শঙ্কর-টিলায় যাইয়া শঙ্করাচার্যের বিগ্রহের সম্মুখে উহা পাঠ করিয়া আসেন ও নাটকের প্রথমাভিনয়ে লব্ধ অর্থ শঙ্কর মঠে দান করেন।

জীবনসন্ধ্যা যদিও ঘনাইয়া আসিতেছিল, তথাপি কাশী হইতে ফিরিয়া তিনি নব উৎসাহে রঙ্গালয়ের কার্যে যোগদান করিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আষাঢ়

বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে, গিরিশবাবু 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। দুর্যোগ-রজনীতে কেহ আশা করে নাই যে, বিশেষ দর্শক-সমাগম হইবে। কিন্তু শ্রীযুত গিরিশের যাদুময় নামে আশাতীত লোক সমাগম হইল। বন্ধুগণ তাঁহাকে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে অভিনয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এত লোক আগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, আর তিনি নামিবেন না—ইহা কিরূপ কথা? তাই সেই রাত্রে করুণাময়ের ভূমিকায় কয়েকবারই তাঁহাকে অনাবৃত দেহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইহার ফলে তাঁহার হাঁপানি আরম্ভ হইল। ইহাই শেষ পীড়া। জীবনের বাকি কয়টা দিন তিনি আর পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এইরূপে প্রায় আট মাস ভুগিবার পর সকলেই বুঝিলেন, আর আশা নাই। শেষ তিনদিন রোগযন্ত্রণায় তিনি বসিয়া বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতে করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে তৃতীয় প্রহরে সহসা নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিন বার রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণান্তে তিনি বলিলেন, "প্রভু, শান্তি দাও, শান্তি দাও।" শরীর আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রিঃ (২৫ মাঘ, ১৩১৮) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় মহাকবি মহাপ্রয়াণ করিলেন।

# সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "জগদম্বা তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) জোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে। ...এই চারিজনের ভিতর রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ প্রথম ও শম্ভু মল্লিক দ্বিতীয় ছিলেন। সিমলার সুরেন্দনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখনও 'সুরেন্দ্রর' ও কখনও 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্ধেক রসদদার'—অর্থাৎ সুরেন্দ্র পুরা একজন রসদদার নয় বলিতেন।[১]...সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যে সকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন" (২য় ভাগ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ১৩৯ পৃঃ)।[২] "কাশীপুরের উদ্যানবাটি যখন...ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০ টাকা) জানিতে পারিয়া...ডস্ট কোম্পানির মুৎসদ্দী পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদায় তুলতে কেমন করে পারবে; অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।' সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন" (২য় ভাগ, দিব্যভাব, ১৯৫ পৃঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাদেহ অপ্রকট হইলেও শ্রীযুত সুরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘদেহের পরিপুষ্টিবিধানে সতত নিরত ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যখন গৃহী ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, কাশীপুরের বাগানবাটি ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক এবং যুবক সেবকগণের গৃহে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, তখন তারক, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালী প্রভৃতির এরূপ করিতে ইচ্ছা বা সুযোগ না থাকায় তাঁহারা তীর্থাদিতে থাকিয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অফিস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত সুরেন্দ্র সন্ধ্যাকালে পূজাগৃহে বসিয়া এক দিব্য দর্শন পাইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" শুনিয়াই সুরেন্দ্র

---

১ "সব গৌরবর্ণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদদার বলে বোধ হয়"—কথামৃত, ৪।৩১।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৩। "এই তিনজন রসদদার" (শম্ভু, বলরাম ও সুরেন্দ্র)—শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৯৭

২ "ভক্তদের আহারের জন্য তিনি মাসিক ১০ টাকা দিতেন।" 'The Life of the Holy Mother' (Madras), P. 64.

উন্মত্তবৎ ছুটিয়া সমপল্লিবাসী নরেন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাড়ির সন্ধানে ইতস্তত ঘুরিতে লাগিলেন এবং বরাহনগরে গঙ্গাতীরে মুন্সীদের একটি জীর্ণ উদ্যানবাটি মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির করিলেন। এইরূপে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসের শেষভাগে আদি শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সূত্রপাত হইল। সুরেন্দ্র প্রথম দুই মাস ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন। ক্রমে মঠে ত্যাগী ভাইদের যোগদানের ফলে যেমন ব্যয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি দানের পরিমাণও বাড়িয়া মাসে ১০০ টাকা পর্যন্ত উঠিল। এই টাকা হইতে বাড়ি-ভাড়া ১১ টাকা এবং পাচক-ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬ টাকা দেওয়া হইত; বাকি অর্থ ডালভাতের জন্য ব্যয়িত হইত। সুরেন্দ্রের এই সময়ের বদান্যতা স্মরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, "ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। ...ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ি-ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে" (২য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১ম পরিচ্ছেদ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১৪২)।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রীযুত সুরেন্দ্র যখন প্রথম যান, তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক ত্রিশ বৎসর, শরীর সুগঠিত ও বলবান এবং বর্ণ গৌর। তিনি তখন মুৎসদ্দীর কার্যে মাসিক তিন-চারি শত টাকা রোজগার করেন। স্বভাব আপাতত একটু কর্কশ মনে হইলেও অন্তরে তিনি অতি সরল এবং মন সুদৃঢ়; স্বধর্মের বিরোধী না হইলেও উহাতে তাঁহার আস্থা নাই; মেজাজ একটু সাহেবীভাবাপন্ন; অধিকন্তু সমসাময়িক পাশ্চাত্যভাবানুকরণে "সুরাপানে সুরেন্দ্রের বড়ই পিরিতি।" বাহ্যত সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিলেও তাঁহার অন্তরে তখন হুতাশনপ্রায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা। উহা হইতে নিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি বিষপানে প্রাণনাশের উদ্যোগ পর্যন্ত করিতেছিলেন। এমন সময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রামচন্দ্র ও মনোমোহন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল তাহা রামচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ধৃত

হইতেছে—"সেইদিন পরমহংস নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, 'দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আর সেই স্থানে লইয়া যাইবে? হংসমধ্যে বকো যথা! ঢের দেখিয়াছি—তিনি যদ্যপি কোন বাজে কথা কহেন তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দিব' " ('ভক্ত মনোমোহন', ৭০ পৃঃ)। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই চরিত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তরকালে সুরেন্দ্র ইহা নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিন গিরিশবাবুকে দেখাইয়া সহাস্যে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি তো কি? ইনি তোমার চেয়ে—" কথা সম্পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র সমর্থনের সুরে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা!" যাহা হউক, আলোচ্য সময়ে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্র ও মনোমোহনের পীড়াপীড়িতে সুরেন্দ্রকে তাঁহাদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল।[১] শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া সুরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন। ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত ঠাকুরের বদন হইতে তখন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে। সুরেন্দ্র তেজস্বী, পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হইলেও আজ সবিস্ময়ে শুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন, "লোকে বাঁদর-ছানা হইতে চায় কেন? বিড়াল-ছানা হইলেই তো ভাল হয়, বাঁদরের স্বভাব এই, যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিড়াল-ছানার স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই 'ম্যাও ম্যাও' করিতে থাকে। বাঁদর-ছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান ও বিড়াল-ছানার স্বভাব ভক্তি-প্রধান।" সুরেন্দ্রের মনে হইল, এ যেন তাঁহাকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাত্র নির্ভর করিয়াও তিনি জীবনসমস্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই; এমন কি, স্বীয় অপারগতায় হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যার আয়োজন করিতেছিলেন। অথচ ইনি সমস্ত ভার লইবার ইঙ্গিতের সহিত তাঁহাকে এক শান্তিময় নূতন পথের সন্ধান দিলেন। সুরেন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন, সুরেন্দ্র মজিলেন। অতঃপর তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে না যাইয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর প্রকাশ্যে বলিতেন, "তাঁহার কান মলিয়া দিব বলিয়া গর্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু ফিরিবার পথে তাঁহার নিকট কানমলা খাইয়া

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গে'র (দিব্যভাব, ৫৫ পৃঃ) মতে ইহা ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ঘটিয়াছিল। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে কিন্তু আছে—"আমরা যখন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিতেছি তাহার কয়েক মাস পরে...অটুট বিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ মিত্র...আমাদের সহিত যোগদান করিলেন" (৮০ পৃঃ)। ঐ স্থলেই উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্দ্রের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। রাম ও মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান ১৮৭৯-এর শেষভাগে ('কথামৃত', ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫)। অতএব ধরা যাইতে পারে যে, সুরেন্দ্রের গমনাগমন আরম্ভ হয় ১৮৮০-এর প্রথমে। ঐ সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর; অতএব জন্মবৎসর সম্ভবত ১৮৫০খ্রিঃ।

আসিলাম। তিনি কি যেমন তেমন গুরু!" প্রথম দিনে ফিরিবার কালে পরাজিত সুরেন্দ্র পরমহংসদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সাদরে পুনর্বার আসিতে বলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু বিপরীত পথে চলিয়া যখন নিজের প্রায় সর্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যথার্থ পথ দেখিতে পাইলেন। এখন তিনি নিত্য ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ধ্যানাদি অভ্যাস করেন। একদিন তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার বাসনা জাগিল; তিনি স্থির করিলেন, পূজাগৃহে ধ্যানকালে যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয়, তবেই তিনি জানিবেন যে, ঠাকুর অবতার। কি আশ্চর্য—

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান।
ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান ॥
এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর।
সুরেন্দ্রের প্রভুপদে পড়িল নির্ভর ॥ ('পুঁথি')

শ্রীযুত সুরেন্দ্রের পরবর্তী জীবনকাহিনী অতীব চমকপ্রদ। আমরা গিরিশবাবুর জীবনালোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি, তিনি কিরূপ স্তর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপায় কীদৃশ উচ্চ নিষ্কাম ভক্তির ভূমিতে উঠিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের জীবনেও অনুরূপ ঘটনারই পরিচয় পাই। নতুবা ধর্মে আস্থাহীন, মদ্যপ, আত্মহত্যায় কৃতোদ্যম সুরেন্দ্র কিরূপে রামকৃষ্ণভাবধারার অন্যতম পরিপোষক হইতে পারেন? ইহা পরমহংসদেবেরই মহিমা। কারণ উত্তমকে সকলেই উত্তম পথে পরিচালিত করিতে পারে; কিন্তু অধমকে যিনি পরহিতার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি অসীম। মুৎসদ্দীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যে কর্তব্যপরায়ণ সুরেন্দ্রের অবসর ছিল না বলিলেই হয়—সারাদিনেও তাঁহার কর্ম শেষ হইত না। অথচ ইহারই মধ্যে তাঁহার অন্তরে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মনন চলিত; আবার কখনও কখনও মন এমনই চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, অসমাপ্ত কার্য ফেলিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটিতেন। এইরূপে এক অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপনীত সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার জন্য তখনই কলকাতায় যাইতে উদ্যত। সুরেন্দ্রকে দেখিয়াই তিনি ঐকথা বলিলেন। সুরেন্দ্র কিন্তু ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া কলকাতায় লইয়া আসিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু শুধু শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিয়া এবং বিবিধরূপে তাঁহার প্রেম-আস্বাদন ও তৎপ্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিয়াই স্থির থাকিতে পারেন নাই; যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করিতে এবং অপরকেও

তাহার আস্বাদন করাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমরা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, সুরেন্দ্রের গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যের প্রথম মিলন হয়। ঐ গৃহ প্রায়ই ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদের সমাগমে মহোৎসবে মাতিয়া উঠিত। 'কথামৃতে' (৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৭৫-৭৭ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ১১০৩) এইরূপ একখানি চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুরেন্দ্র-ভবনে কীর্তনানন্দাদিতে মগ্ন থাকিলেও ভক্তের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহার চিত্তে সর্বপ্রকার বাসনা-কামনার সহিত সুপরিচিত ঠাকুর প্রয়োজনস্থলে তাঁহাকে শাসন করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ঘটনাটি এইরূপ—১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুরেন্দ্রের দ্বিতলে বৈঠকখানায় ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেন্দ্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে গেলে তিনি উহা হাতে লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তখন সুরেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় যাইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং সমীপস্থ ভক্তবৃন্দকে অভিমানভরে কহিলেন, "রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ করে এই মালা! ক্রোধে বললাম, সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ—ভগবান পয়সার কেউ নয়, অহঙ্কারের কেউ নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রুধারায় গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যসিদ্ধি হইয়াছে; অনুতপ্ত ভক্তকে অতঃপর কৃপাপ্রদর্শন আবশ্যক। অতএব ঐ সময়ে কীর্তন ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইলে তিনি পরিত্যক্ত মালাটি তুলিয়া লইয়া এক হস্তে উহা ধারণপূর্বক অপর হস্ত নানা ছন্দে দুলাইতে দুলাইতে মধুর নৃত্যলহরীতে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উহা গলায় পরিলেন এবং নৃত্যশেষে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "আমায় কিছু খাওয়াবে না?"—বলিয়া তখনই সুরেন্দ্রের আহ্বানে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া তখন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি বিরাজিত!

শ্রীযুত সুরেন্দ্রের চরিত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসম্বন্ধে ঠাকুর অবহিত ছিলেন বলিয়াই একদিকে যেমন তাঁহাকে শাসন করিতেন, অন্যদিকে তেমনি সাহস দিয়া ক্রমে উচ্চাদর্শের প্রতি লইয়া যাইতেন—অকস্মাৎ অসম্ভব কর্তব্য সম্মুখে স্থাপনপূর্বক তাঁহার জীবন হতাশাচ্ছন্ন করিতেন না। সেদিন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণেশ্বরে স্বকক্ষে উপবিষ্ট ঠাকুর সস্নেহে সুরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। ...সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। ...তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে, আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

বীরভক্ত না হলে দুদিক রাখতে পারে না। ...তুমি অফিসে মিথ্যা কথা কও; তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান-ধ্যান আছে! তোমার যা আয়, তার চেয়ে বেশি দান কর—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি!” (‘কথামৃত’, ৫।১৬।৩; অখণ্ড সং, পৃঃ ৭৩৫)। আর একদিন (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৩) সুরেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, “আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?” ঠাকুর যদিও বুঝিলেন যে, ক্ষমতানুসারে সরলভাবে সাধন করাই উন্নতির রহস্য—ইহা না জানিয়া সুরেন্দ্রনাথ অপরের অনুকরণে স্বীয় অধিকার অতিক্রমপূর্বক অকস্মাৎ উচ্চস্তরে আরোহণের বৃথা প্রচেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিতেছেন, তথাপি সেই রূঢ় সত্যসহায়ে ভক্তের দৃষ্টি তদীয় প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বৃথা পীড়া দেওয়া অনুচিত, বরং পূর্বলব্ধ সাফল্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে সাহস দেওয়াই কর্তব্য, এই বিবেচনায় কহিলেন, “স্মরণ-মনন তো আছে?” সুরেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা, ‘মা মা’ বলে ঘুমিয়ে পড়ি।” অমনি উৎসাহ দিয়া ঠাকুর বলিলেন, “খুব ভাল—স্মরণ-মনন থাকলেই হলো।”

সুরেন্দ্রনাথের দান ও ঈশ্বরপ্রণিধানে মুগ্ধ ঠাকুর অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। এইভাবে (২৭ অক্টোবর, ১৮৮২) কেশবচন্দ্রের সহিত স্টিমারে বিহারের পর সন্ধ্যাসমাগমে গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পথে তিনি ভক্তগণসহ সিমুলিয়া স্ট্রিটে সুরেন্দ্রভবনে পদার্পণ করিলেন। সুরেন্দ্র তখন গৃহে ছিলেন না। সুতরাং গাড়ি-ভাড়া মিটাইবার সময় ভক্তেরা যখন জানাইলেন যে, হাতে টাকা নাই, তখন সুরেন্দ্রের প্রতি অনুপম আস্থা ও আত্মীয়তা-প্রদর্শনচ্ছলেই যেন ঠাকুর নিঃসঙ্কোচে নির্দেশ দিলেন, পরিবারের মহিলাদের নিকট হইতে ভাড়ার টাকা চাহিয়া লওয়া হউক এবং বলিলেন যে, অন্তঃপুরচারিণীদেরও উহা দেওয়া উচিত; কারণ তাঁহাদের তো জানাই আছে যে, সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান। বলা বাহুল্য, ভাড়ার ব্যবস্থা সেদিন ঐভাবেই হইল; অধিকন্তু গৃহবাসীরা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে সাদরে উপরে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্রের বৈঠকখানায় বসাইলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, নরেন্দ্রও সংবাদ পাইয়া আসিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত সুরেন্দ্র ফিরিলেন না দেখিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কৃপাবিতরণার্থে ঠাকুর কতবার কিভাবে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে আমরা জানি যে, কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধনভূমিদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে (২৬ ডিঃ, ১৮৮৩) ঠাকুর সুরেন্দ্রের তত্রত্য উদ্যানবাটিতে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক সাধুর সহিত আলাপনান্তে জলযোগ করেন। আর একবার (১৫ জুন, ১৮৮৪) তিনি সুরেন্দ্রের

আমন্ত্রণে ভক্তসহ ঐ উদ্যানবাটিতে উপস্থিত হইয়া কীর্তনাদিদ্বারা আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটি হয়েছে। বড় স্পষ্টবক্তা ...আর খুব মুক্তহস্ত।" ১৮৮২-এর ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর শ্রীযুত সুরেন্দ্রের কলকাতার গৃহে গিয়াছিলেন এবং পরবৎসর ৺অন্নপূর্ণা-দর্শনে তথায় যাইয়া নৃত্যগীতাদি-সহকারে কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু মদ্যপান করিতেন—প্রথম প্রথম একটু বাড়াবাড়িই হইত। এদিকে তাঁহার পল্লিবাসী বন্ধু রামচন্দ্র বৈষ্ণব এবং এরূপ আচরণের ঘোর বিরোধী। তিনি সুরেন্দ্রকে মদ্য ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐরূপ না করিলে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই দুর্নাম হইবে। সুরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, দুঃসাধ্য হইলেও তিনি উহার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাহাই গুরুদেবের অভিপ্রেত হয়; কিন্তু কহিলেন, "ভাই, যদি ত্যাগ করাই উচিত হত, তাহলে পরমহংস মশায় কি তা বলে দিতেন না?" অগত্যা স্থির হইল যে, নির্দেশ লইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে। তাঁহারা যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বকুলতলায় বসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের অবস্থা তিনি জানিতেন এবং ঐজন্য চিন্তিতও ছিলেন। আজ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি স্বতই মদ্যপানের বিষয়ে কথা তুলিলেন; পরন্তু অকস্মাৎ পানত্যাগের আদেশ না দিয়া বরং বলিলেন, "দেখ, যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে; আর যেন মাথা না টলে, পা না টলে। তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার পান করতে আর ভাল লাগবে না—তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।" সেইদিন এই আনন্দের চাক্ষুষ পরিচয় দিবার জন্যই যেন ভাবে গরগর মাতোয়ারা হইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢলঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না ॥ ইত্যাদি

ঠাকুর আরও কহিলেন, "প্রথম কারণানন্দ হবে, তারপর ভজনানন্দ।" "সুরেন্দ্র তদবধি তদ্রূপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনন্যকর্মা হইয়া কিঞ্চিৎ কারণ ৺মা-কালীকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ পান করিতেন; কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়া তাঁহার ভজনানন্দের উদয় হইত। সেই সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রুধারা, মুখে মধ্যে মধ্যে মর্মস্পর্শী করুণস্বরে 'মা মা' রব, মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ ধ্যানে মগ্ন অবস্থা দেখিয়া নাস্তিক দর্শকের হৃদয়েও ভগবদ্ভাবের সঞ্চার হইত এবং এই সময়ে তিনি ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা কহিতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন না। ...সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার মনের অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার পূর্ব স্বভাবকে

সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। তাঁহার বন্ধুরা রামকৃষ্ণদেবকে জানাইলেন যে, তিনি আবার পূর্বের মতো মন্দ লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'আচ্ছা, এখনও ভোগবাসনা আছে—দিন কতক ভোগ করে নিক; এর পরে ওসব কিছুই আর থাকবে না—সে নির্মল হয়ে যাবে।' তাহার পর রবিবারে সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলজ্জভাবে রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'কি গো, চোরটির মতো অমন দূরে গিয়ে বসলে কেন? এগিয়ে কাছে এস।' সুরেন্দ্র নিকটে আসিলে রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, লোকে যখন কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন? মা সঙ্গে থাকলে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।'...সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার রোগের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই, অদ্য রামকৃষ্ণদেবের কথায় তাহার প্রকৃত ঔষধ প্রাপ্ত হইলেন—রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত,' ১৯১-১৯৪ পৃঃ)।

ভক্তিশ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সহিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রের চরিত্রের যেমন উন্নতি হইতে থাকিল এবং তিনি যেমন অধিকতর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন, ঠাকুরও তেমনি আরও স্পষ্টতরভাবে তাঁহার ভুলত্রুটি দেখাইয়া তাঁহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রবাবু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি এক সময়ে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা ও ভিখারিরা 'পয়সা দাও' 'পয়সা দাও' রবে বড়ই বিরক্ত করিতে থাকে; তাই তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি পাণ্ডা প্রভৃতিকে মুখে যদিও বলিলেন যে, পরদিন কলকাতায় ফিরিবেন, তথাপি সেই দিনই তাহাদের অজ্ঞাতসারে পলাইয়া আসিলেন। শুনিয়া এইরূপ মিথ্যাচারের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। লজ্জিত সুরেন্দ্রনাথ তখন প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিয়া জানাইলেন যে, বৃন্দাবনের নির্জন স্থানগুলিতে যাইয়া তিনি তপস্যানিরত অনেক বাবাজীকে দর্শন করিয়াছেন। অমনি ঠাকুর জানিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাদের কিছু দিয়াছেন কি-না। সুরেন্দ্র যখন উত্তর দিলেন যে, কিছুই দেওয়া হয় নাই, তখন ঠাকুর বলিলেন, "ও ভাল কর নাই—সাধু-ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।" শাসনের সঙ্গে সুরেন্দ্র আবার স্নেহস্পর্শও পাইতেন। কাশীপুরে একদিন (১৭ এপ্রিল, ১৮৮৬) রাত্রি নয়টায় সুরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের আনীত মালা পরিধান করায় ঠাকুরকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সেদিন সুরেন্দ্রের প্রতি আরও কৃপাবর্ষণের জন্য

তাঁহাকে ইঙ্গিতে স্বপার্শ্বে আনাইয়া প্রসাদী মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলে শ্রীপদে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। সে স্নেহস্পর্শে সেদিন সুরেন্দ্রের আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি সানন্দে ভক্তদের সহিত কীর্তনে যোগ দিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি মায়ের পাগল ছেলে, (আমার) মায়ের নাম শ্যামা ॥ ইত্যাদি।

কাশীপুরে আরও একদিন (২২ এপ্রিল, ১৮৮৬) ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে সুরেন্দ্রবাবু দুইগাছি মালা পাইয়াছিলেন। বস্তুত এইরূপ সৌভাগ্য তাঁহার প্রায়ই ঘটিত।

আমরা দেখিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে পূজা-ধ্যানাদি প্রচলিত রীতি-অবলম্বনে বৈধী ভক্তির পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারাও বহুদিন যাবৎ যুক্তি ও অনুমানাদি-অবলম্বনেই পরিচালিত হইত। তাই একদিন (২ মার্চ, ১৮৮৪) তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন?" ঠাকুর এই গতানুগতিক চিন্তাধারার ত্রুটিপ্রদর্শনচ্ছলেই যেন বলিলেন, "এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল—কিছু বোঝা যায় না।"

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে সুরেন্দ্র দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগ্রহে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হওয়ায় তিনি নিত্য ঠাকুরের স্বীয় ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার সম্মুখে দীর্ঘকাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাসে একসময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, অন্যান্য বহু ভক্তের ন্যায় তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ঠাকুরের সান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে অন্তত রাত্রিকালে বাস করিয়া সাধনাদিতে ডুবিবেন। সঙ্কল্পানুসারে একটি বিছানা আনিয়া তথায় রাখিলেন এবং দুই-এক দিন রাত্রিবাসও করিলেন। ঠাকুর শুধু দ্রষ্টা হিসাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন—কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "তুমি দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও; রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না।" অতএব সুরেন্দ্রের আর সেখানে রাত্রিবাস হইল না। এইরূপে আপাতত বিফলকাম হইলেও সুরেন্দ্রের হৃদয়ে বিষয়কামনা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল জীবন সংযত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাই কেদারবাবু একদা (১০ মাঘ, ১৮৮২) যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন, "যদ্যপি এদের (রাম, সুরেন্দ্র, মনোমোহন) চরণে স্থান দিয়েছেন, তবে আর কেন এদের নিগ্রহ দেন; একবার ভাল করে দয়া করুন, যেন এরা নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে," এবং ঠাকুর যখন তদুত্তরে উদাসীনপ্রায় বলিলেন, "আমি কি করব? আমার কি ক্ষমতা আছে? যদি তিনি মনে করেন তো সকলই হতে পারে," অধিকন্তু আর কিছুই না

করিয়া কিয়ৎকাল পরে সন্ধ্যার প্রারম্ভে পঞ্চবটীমূলে যাইয়া নিশ্চেষ্টপ্রায় বসিলেন, তখন সুরেন্দ্র আর আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আমাদের আর কেন যন্ত্রণা দিতেছেন? আমরা জানি আমরা পাপী; কেন না আমরা মহাপুরুষের নিকট সর্বদা আসিতেছি, হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছি, ভাবে গদগদ হইতেছি, লোকে দেখিতেছে যে ইঁহারা সাধু হইতেছেন, কিন্তু যদ্যপি আপন আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যায়, সে বলিবে, 'আমি সাধুর একবিন্দু বাতাসও পাই নাই।'...আমাদের মনের যে সকল অসৎ সংস্কার ছিল, তাহা যখন বিন্দুমাত্র কমে নাই, তখন কি করিয়া আমরা সাধু হইলাম? বরং শঠতা বিলক্ষণ শিখিলাম—আগে এমন করিয়া কাঁদিতে পারিতাম না, এখন বেশ কাঁদিতেছি।" ঠাকুর কিন্তু দেখিতেছিলেন যে, এই চক্ষের জলে এবং আত্মবিশ্লেষণের ফলে সুরেন্দ্রের পূর্ব সংস্কার ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে; সুতরাং সুরেন্দ্রাদির পুনঃপুনঃ করুণ মিনতির উত্তরে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "আনন্দময়ী করুন, তোমরা সকলে আনন্দে থাক।"

সত্যসংকল্প ঠাকুরের সে আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইয়া সুরেন্দ্রকে ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৺দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে বাস করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রের গৃহে পূজা হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারেন নাই। বিজয়ার দিনে (১৮ অক্টোবর) ৺মহামায়ার আশু বিদায়ের দুঃখ সহ্য হইবে না বোধে সুরেন্দ্র বাড়ি ছাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রাণের আবেগে 'মা মা' করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে বহু কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া ঠাকুরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল; তিনি মাস্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বিগলিতস্বরে বলিলেন, "কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!"—এই বলিয়া সুরেন্দ্রকে জানাইলেন যে, নবমীর রাত্রে সাতটা সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার এক দিব্য দর্শন হইয়াছিল। তিনি সম্মুখে দেখিলেন সুরেন্দ্রদের দালান, ঠাকুরপ্রতিমা রহিয়াছেন—সব জ্যোতির্ময়; শ্যামপুকুরের আবাস-স্থল ও সেই ঠাকুর-দালান এক হইয়া গিয়াছে—যেন একটা আলোর স্রোত দুই জায়গার মধ্যে প্রবাহিত। সুরেন্দ্র বলিলেন, "আমি তখন ঠাকুর-দালানে 'মা মা' বলে ডাকছি—দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠল—মা বললেন, আমি আবার আসব।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সুরেন্দ্রবাবুর বিশ্বাসের পরিচয় আর একদিনের (১৩ এপ্রিল, ১৮৮৬) ঘটনায় পাওয়া যায়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত। সুরেন্দ্র অফিসের কার্যসমাপনান্তে চারিটি কমলা লেবু ও দুই ছড়া ফুলের মালা

লইয়া রাত্রি আটটায় সেখানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আজ ১ বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হলো না— ভাবলাম, যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে" ('কথামৃত,' ৩।২৬।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০৩৬)। সুরেন্দ্র সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন যে, পূর্বদিন সংক্রান্তি ছিল; কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই; তাই স্বগৃহেই ঠাকুরের ছবি ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া সমীপস্থ মাস্টার মহাশয়কে ইঙ্গিতে বলিলেন, "আহা, কি ভক্তি!"

শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার সুরেন্দ্রের দানের পরিমাণ কিরূপ ছিল, তাহা কেহ স্পষ্টত লিখিয়া রাখেন নাই; তবে প্রবন্ধের প্রারম্ভে 'লীলাপ্রসঙ্গের' যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠক উহা হইতে কতক বুঝিতে পরিবেন। আর একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উল্লেখ করিলেও মন্দ হইবে না। 'কথামৃতে' (২।২৭।১; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০৬০) আছে, "সুরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থসংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন—তাই বড় অভিমান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।" মনে রাখিতে হইবে যে, তখন নগদ মাসিক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইত। এই মোটা খরচ দেওয়া ছাড়াও ঠাকুরের ছোট-খাট সুখসুবিধা-বিধানে সুরেন্দ্রবাবু সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। কখনও হয়তো উত্তাপ নিবারণের জন্য খসখসের পরদা কিনিয়া আনিতেন, কখনও সেবার জন্য ফল প্রভৃতি লইয়া আসিতেন, আবার কখনও মাল্যাদি দ্বারা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গকে মনের সাধে সাজাইতেন। উদারহৃদয় সুরেন্দ্রের পরবর্তী কালের মহাপ্রাণতার একটি নিদর্শন স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে (৫১ নং পত্র, পৃঃ ৪৫) লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার (সুরেন্দ্র ও বলরামের) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অস্থি সমাহিত করা হয়...এবং সুরেশ (সুরেন্দ্র) বাবু তজ্জন্য ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।"

যাহা হউক, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালেই ফিরিয়া যাই। আপন বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে রূপপ্রদান করিতে সুরেন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। মনোমোহন ও রামচন্দ্রের পরামর্শক্রমে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের দ্যোতক একখানি চিত্র আঁকাইয়াছিলেন। উহাতে শিবমন্দির, মসজিদ ও গির্জার সম্মুখে যিশু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারপুরুষ বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ রহিয়াছেন এবং নৃত্য, বাদ্য ইত্যাদি সহকারে আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন—অপর পার্শ্বে পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া কেশবচন্দ্রকে সেই অপূর্ব মিলনোৎসব দেখাইতেছেন। এ প্রকার গম্ভীরভাবব্যঞ্জক

চিত্রদর্শনে কেশবচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া সুরেন্দ্রকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন, "যাঁহার দ্বারা এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।" মনোমোহন ও রামচন্দ্রের সহায়তায় সুরেন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি প্রতীকও নির্মাণ করাইয়াছিলেন—উহাতে বৈষ্ণবদের খুন্তি, খ্রিস্টানদের ক্রশ, মুসলমানদের পাঞ্জা ইত্যাদি মিলিত হইয়াছে। কেশববাবু ঐ সম্মিলনপ্রতীকটি লইয়া একবার নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের আর একটি অবদান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের প্রবর্তন। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (৮০ পৃঃ) মনোমোহন বলিতেছেন, "মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের যত্নে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয়। আমরা সেই দিবস কয়েকটি মাত্র বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করি। ...প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর উক্ত উৎসবের সমুদয় ব্যয়ভার ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বহন করিয়াছিলেন; কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর প্রস্তাবমত সকলে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও ভক্ত সুরেন্দ্রনাথই সেই মহোৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন—অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।"

ঠাকুরের হয়তো ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার রসদদারগণ দীর্ঘজীবী হন; তাই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে (১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) রাত্রে অনুমান চল্লিশ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ স্বকার্য-সমাপনান্তে অভীষ্টলোকে চলিয়া যান।

# রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুত রামচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৪ কার্তিক বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে (৩০ অক্টোবর, ১৮৫১) কলকাতার অন্তঃপাতী নারিকেলডাঙ্গায় পিতা নৃসিংহপ্রসাদ দত্তের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। মাতৃস্নেহ তিনি অধিক দিন উপভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ জন্মের মাত্র আড়াই বৎসর পরেই তিনি মাতৃহারা হন। কিন্তু মাতাকে হারাইলেও মাতার একটি বিশেষ গুণ সর্বদা মনে রাখিয়া তিনি স্বীয় জীবনে উহা প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। দয়াবতী তুলসীমণি গৃহকর্মসমাপনান্তে যখন আহারে বসিতেন, তখন কেহ হয়তো গল্পচ্ছলে সেখানে বসিয়া স্বীয় দারিদ্র্য ও অনাহারের কথা নিবেদন করিত; তুলসীমণি অমনি সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়া উঠিয়া পড়িতেন; অপরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সেদিন তাঁহার আহারে রুচি নাই। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। রামচন্দ্রের পিতামহ সংস্কৃতে কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক মন্ত্রশিষ্য ছিল। ফলত উত্তম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

বালক রামচন্দ্র নিজের খেলাঘরে নিজস্ব ঠাকুরের ভোগ দিতেন; কখনও সখী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য করিতেন; কখনও বা মহোৎসবে সমবয়স্কদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রমে ও শিখের বাগানে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট গমনাগমন করিতেন। বৈষ্ণব রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি একবার হরিপালে এক কুটুম্বগৃহে যান। কুটুম্ব মাংসাশী ছিলেন; সুতরাং প্রিয়দর্শন আত্মীয় বালককে প্রথমে আদর করিয়া মাংস খাওয়াইতে চাহিলেন। বালক তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে বলপ্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন। অমনি বালক অন্ন ও আত্মীয়গৃহ ত্যাগ করিয়া কলকাতাভিমুখে চলিল—কাহারও নিষেধ শুনিল না। তাহার সঙ্গে পয়সা ছিল না, পথও অজ্ঞাত; তথাপি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে পদব্রজে কোন্নগরে পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নিরুপায় হইয়া বালক এক জায়গায় বসিয়া ইতিকর্তব্যতা স্থির করিতেছে, এমন সময় এক স্নেহশীলা গৃহস্থবধূর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন এবং গৃহে স্থান না থাকায় এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা

করিলেন। সেই বৈঠকখানায় গুলিখোর ভদ্রলোকদের যাতায়াত ছিল; তাঁহারা অধিক রাত্রে মাদকদ্রব্য-সেবনকালে বালককেও নানা প্রকারে দলে টানিতে চেষ্টা করিলেন; বালক এই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইল এবং দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল। কিন্তু আসিলে হইবে কি—হাতে যে পয়সা নেই! সৌভাগ্যক্রমে পূর্বরাত্রের পরিচিত এক ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরিবার পথে স্টেশনে বালককে দেখিতে পাইলেন এবং কলকাতার টিকিট কিনিয়া দিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি রামচন্দ্র বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পিতার তখন ঘোর দারিদ্র্য। পিতামহ প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গেলেও পিতা তাহা ব্যয় করিয়া তখন পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং রামচন্দ্র এক আত্মীয়ের বাটিতে থাকিয়া ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ইহারও শেষ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রতাপনগরে কিছুকাল চাকরি করার পর কলকাতায় চল্লিশ টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের অধীনে কুইনাইন-পরীক্ষকের সহকারী শ্রেণীর মধ্যে নিয়োজিত হইলেন। সি. এইচ. উড সাহেব তখন কুইনাইনপরীক্ষক। তিনি রামচন্দ্রের নিকট শুধু দৈনন্দিন কাজ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অবসরমত তাঁহাকে রসায়নশাস্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। সাহেব অল্পকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার কালে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ একটি ঘড়ি ও অনেকগুলি পুস্তক প্রিয় ছাত্র ও সহকারীকে প্রদান করেন। কিন্তু রামচন্দ্র এই সামান্য উপহার অপেক্ষাও আর একটি মূল্যবান দান পাইলেন—সাহেবের একনিষ্ঠ বিদ্যানুরাগ। সাহেব তাঁহার হৃদয়ে যে বিদ্যোৎসাহের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে রামচন্দ্র রসায়ন-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অচিরে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ-উপার্জনে সমর্থ হইলেন। তাঁহার পিতার অবস্থাবিপর্যয়ের ফলে নারিকেলডাঙার পৈতৃক ভবন বহু পূর্বে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এখন রামচন্দ্র সিমুলিয়া-পল্লির মধু রায়ের গলিতে নূতন বাটি নির্মাণ করিলেন।

রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ক্রমে এত সুবিদিত হইয়াছিল যে, অনেক বি. এ., এম. এ.-উপাধিধারী ও ডাক্তার তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন। ক্রমে তিনি ইংলণ্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য হন এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক ও সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত নানা সভা-সমিতিতে তিনি রসায়নবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। রসায়নে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তির ফলে তিনি কুচির ছাল হইতে 'কুর্চিসিন' নামক একটি আমাশয়-প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইহাতে দেশবিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগমও হয়। ক্রমে

সরকারি কার্যেও বেতনবৃদ্ধি হইয়া ২০০ টাকায় উঠে। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনভাবে বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন; এমন কি, কোন সময়ে মাসিক সহস্র মুদ্রা গৃহে আসিত।

যৌবনে একসময়ে নাটক-রচনায় ও অভিনয়ের প্রতি রামচন্দ্র আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই আকর্ষণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানেই তিনি অধিক আনন্দ ও কৃতিত্ব লাভ করিয়া ঐ দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

এই কালমধ্যে রামবাবুর পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাকরির প্রথমাবস্থাতেই তিনি বালাখানার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইতে থাকিল, অপর দিকে তিনি তদ্রূপ ক্রমেই নাস্তিক হইতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজন হইলে তিনি অপরের বিশ্বাসে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষুরধার যুক্তিদ্বারা অপরের সমস্ত কথা খণ্ড খণ্ড করিতেন। সুতরাং স্বধর্মে আস্থাবান ভদ্রলোকেরা এই নাস্তিকের সহিত সহজে বিচারে অগ্রসর হইতেন না। বাল্যে বৈষ্ণবকুলে লালিত যে বালক স্বহস্তে দেবার্চনান্তে প্রসাদবিতরণ করিত ও মধুর নৃত্যে অপরকে মোহিত করিত, সেই যে যৌবনে এই প্রকার নিরীশ্বরবাদী হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? বস্তুত সে যুগের যে সর্বগ্রাসী জড়বাদ তৎকালীন শিক্ষিতসমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছিল রামচন্দ্রও তাহার হস্তে অব্যাহতি পান নাই। ধর্মমাত্রে আস্থাহীন রামবাবু আবশ্যক স্থলে খ্রিস্টধর্মের প্রতিও স্বীয় অবিশ্বাস-স্থাপনে অগ্রসর হইতেন। একদিন তিনি ট্রামে যাইতেছেন এমন সময় একজন বাঙালি খ্রিস্টানবাবু উহাতে উঠিয়া স্থানকাল-বিবেচনা না করিয়াই সকলকে মরণের পরে পরিত্রাণের জন্য যিশুর শরণ লইতে আহ্বান জানাইলেন। কথার ভঙ্গি কাহারও মনঃপূত না হইলেও সকলেই নীরব রহিলেন; কেবল রামচন্দ্র যৌবনোচিত রহস্যভরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, মরলে পরিত্রাণের যা হয় হবে, আপনি তো এ যাত্রা পরিত্রাণ করুন—আপনার বক্তৃতার জ্বালায় যে প্রাণান্ত উপস্থিত!" উহার ফল ফলিল—তুমুল হাস্যের মধ্যে বক্তৃতাস্রোত থামিয়া গেল। প্রচারক কিন্তু রামবাবুকে ছাড়িলেন না; গাড়ি হইতে নামিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের পথেও তিনি যিশুমহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অগত্যা রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নহেন এবং তৎসহ নাস্তিকতার তূণীর হইতে এইরূপ দুই-একটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে, প্রচারক স্বীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

তিনি নাস্তিক হইলেও কোনদিনই বৈষ্ণবোচিত সদাচার ত্যাগ করেন নাই। একবার পত্নীর অসুখের সময় ডাক্তার মাংসের ঝোল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী মরে যাবে, তবু আমি বাড়িতে মাংস এনে কুলাঙ্গার হব না।" সৌভাগ্যক্রমে ঐ পথ্য ভিন্নও রোগিণী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি এযাবৎ যুক্তির তরণী-অবলম্বনে ভবনদীতে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ শোকের তুফান উঠিয়া তাঁহার সে তরণীকে এমন একটি দোল দিল যে, তিনি আর শুধু উহার ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন তাঁহার প্রাণসম একটি কন্যা কালস্রোতে বিলীন হইলে যুক্তিবাদী রামবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিল, মৃত্যুর পশ্চাতে কি কোন গভীর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে? পরবর্তী ৺কালীপূজার দিন দীপাবলীর দীপসজ্জাকালে তিনি শোকভারে নিপীড়িত হৃদয়ে এই সমস্যার সমাধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য—আকাশে মেঘ ভাসিতেছে ও অকস্মাৎ বিবিধ রাগে রঞ্জিত হইয়া নয়ন মন হরণ করিতেছে। শুধু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে তো এ সৌন্দর্যের রহস্যভেদ হয় না! এই বিচিত্র ক্রীড়ার পশ্চাতে কি কোন ক্রীড়াকারী আছেন, এই সৌন্দর্যের উৎসস্থলে কি কোন সৌন্দর্যবান আছেন? রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ক্রমেই শৈশবের বিশ্বাসপূর্ণ দিনগুলিকে স্মৃতিপথে আরূঢ় করাইয়া অন্তরে অনুসন্ধিৎসা জাগাইল, "ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়?"

শ্রীযুত রামচন্দ্রের শোকবিদগ্ধ মনে যখন এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, ঠিক তখনই কুলগুরু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, ইঁহার নিকট পথের সন্ধান পাইবেন; কিন্তু কুলগুরুর আচরণ তাঁহার মার্জিত মনে বিদ্রোহ জাগাইল—তিনি হতাশ হইয়া অন্যত্র উহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, কর্তাভজা ইত্যাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিতেন এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদিতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া উহা পাঠ করিতেন, কিন্তু ইহাতে মনের খাদ্য জুটিলেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহার এই লাভ হইল যে, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহাকে দর্শনের বাসনা ক্রমেই সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

অবশেষে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর (৺কালীপূজার পরে কার্তিক মাসের শেষে) এক শুভ মুহূর্তে রামচন্দ্র, মনোমোহন ও গোপালচন্দ্র মিত্র নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম আগমন; শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন জানেন না; ঘাটে নামিয়া চাঁদনিতে উপস্থিত লোকেদের নিকট সংবাদ লইয়া তাঁহারা পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, আর

উত্তর-পূর্ব বারান্দায় কতকগুলি পুলিশের লোক বসিয়া আছে। পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাঁহারা ঘরে ঢুকিবার পথ না পাইয়া পুনর্বার চাঁদনির লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিলেই উহা খুলিয়া যায়। তাঁহারা ঐরূপ করিলেন এবং দ্বার অচিরাৎ উন্মুক্ত হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে স্বীয় শয্যায় আসনগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য রীতি-অনুসারে শুধু মস্তক নত করিয়াই অভিবাদন জানাইলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশশ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত মূর্তি, মধুর আলাপ, বাহ্যাড়ম্বরশূন্যতা, সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ সমস্যা-সমাধান ইত্যাদিতে তাঁহারা বিশেষ মুগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত যাপনান্তে এক অননুভূতপূর্ব শান্তি ও বিমল আনন্দ লইয়া নৌকাযোগে কলকাতা যাত্রা করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনাই চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "এরূপ যুক্তিপূর্ণ ভগবৎ-সিদ্ধান্ত আগে কখনও শুনি নাই।" মনোমোহন বলিলেন, "তিনি আমাদেরও সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন যেন আমরা তাঁর কত আপনার জন—কত কালের পরিচিত!" সমর্থন করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন "মহৎ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে ক্ষণকালের মধ্যে পরমাত্মীয় করে নিতে পারেন।" প্রথম দিনেই তিনি আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া জানিলেন।

শ্রীযুত রামচন্দ্র এত দিনে অকূলে কূল পাইলেন। ইহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবের কথামৃতে অন্তরের পিপাসা মিটাইতেন। সপ্তাহের কার্যব্যস্ততার মধ্যে তিনি ঐ দিনটিরই অপেক্ষায় থাকিতেন এবং উহা দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইয়া রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রবিবার সন্ধ্যার সময় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া আমরা একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম—ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম—

**গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।**
**ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।"**

এই পূতসঙ্গের ফলে রামচন্দ্র যদিও তখন আস্তিক ও শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পিতপ্রাণ, তথাপি অলৌকিকত্বের প্রমাণের জন্য তাঁহার প্রাণ লালায়িত। এমন সময়ে একদিন নিশাশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি এক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া

পবিত্র হইয়াছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় আগমনপূর্বক মন্ত্র-প্রদানান্তে প্রতিদিন স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে উহা একশত বার জপ করিতে বলিতেছেন। এই অপূর্ব স্বপ্ন তাঁহার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাঁই।"

বিশ্বাসের পথে রামবাবু এযাবৎ বহুদূর অগ্রসর হইলেও যুক্তি তখনও নিরস্ত না হওয়ায় আবার তাঁহার মনে সন্দেহ উঠিল—স্বপ্ন তো মস্তিষ্কের বিকারমাত্র, উহাতে আস্থা কি? এতদপেক্ষাও স্থিরতর প্রমাণ চাই। সে প্রমাণ পাইতেও বিলম্ব হইল না। একদিন দ্বিপ্রহরে পটলডাঙ্গার গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া জনৈক বন্ধুর নিকট তাঁহার এই মানসিক অশান্তির কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন, সয়ে থাক।" দুই বন্ধুই প্রত্যক্ষ দেখিলেন, কিন্তু চকিতে সে পুরুষ কোথায় মিলাইলেন—তাঁহারা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। রামচন্দ্র ভাবিলেন, "ইহাও হয়তো মস্তিষ্কের বিকার"; কিন্তু তখনই মনে হইল, "এরূপ বিকারও ভাল, যাতে এমন আশ্বাসের বাণী পাওয়া যায়, আর যাতে মন এমন শান্ত হয়ে যায়।" ঠাকুর ঐ বিবরণ শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন, "অমন কত কি দেখবে!"

রামবাবুর মনে তখনও শান্তি-অশান্তির আলো-ছায়ার খেলা চলিতেছে। এক অশান্তির মুহূর্তে তিনি "কিছু হইল না" বলিয়া ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করিতে থাকিলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি করব বাপু, সবই হরির ইচ্ছা।" রামচন্দ্র ক্ষান্ত না হইয়া আবার শান্তিকামনা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি কারো খাইও না, নিইও না—তোমাদের এখানে আসতে ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না।" কি নিদারুণ উপেক্ষা! কিন্তু ভক্তকে নিষ্কাম প্রেম-ভক্তি আস্বাদ করাইতে হইলে গুরুকে বোধ হয় বাধ্য হইয়াই এই নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করিতে হয়, সে অবহেলায় রামচন্দ্রের ব্যথিত মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল—এমন কি, মনে হইল যে, এইরূপ নিষ্ফল জীবনে কোন লাভ নাই। অবশেষে স্থির করিলেন—শাস্ত্রে বলে, নামী অপেক্ষা নামের মহিমা অধিক; অতএব নামজপ করিয়া দেখিবেন, ঠাকুরের মন টলে কি না। এই ভাবিয়া রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন এবং নামজপ করিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে ঠাকুর নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন ও রামচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার সমস্ত খেদ দূর করিলেন।

রামচন্দ্র প্রথম জীবনে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন। ঠাকুর ইহা জানিতেন; তাই

অপর ভক্তদের অনুকরণে রামবাবু একবার যখন ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন, তখন তিনি অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরে একদিন কি ভাবিয়া নিজেই যাইবার অভিলাষ জানাইলেন এবং দিনও স্থির করিয়া দিলেন। তদনুসারে ভদ্রতা হিসাবে রামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন এবং যথাসময়ে ঠাকুর ভক্তসহ আগমনপূর্বক আনন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্রের ভক্তিমহিমা খ্যাপিত হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত উহার যোগ না থাকায় তিনি উহাকে ঠাকুরের প্রকৃত শুভাগমন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুনরায় জানাইলেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে তিনি রামভবনে পদার্পণ করিবেন। ব্যয়কুণ্ঠ রামবাবু বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ঐ দিবসের মহোৎসব স্বগৃহে না হইয়া অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু সত্যসন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের মত-পরিবর্তন না হওয়াতে তিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন ভক্তদের আগমন, সংকীর্তন ও শ্রীমুখের বাণীতে রামভবন মুখরিত ও পবিত্রীকৃত হইল এবং ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্রের কার্পণ্যও দূরীভূত হইল। নবজীবন লাভ করিয়া তিনি অতঃপর এই শুভদিনের স্মরণে প্রতিবৎসর ঐ দিবসে উৎসব করিতেন। বলা বাহুল্য, বৈশাখী পূর্ণিমার পরে বহুবার এই গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। এইসব দিনে রামচন্দ্রের সুব্যবস্থায় ঠাকুর এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, অন্যান্য ভক্তগৃহেও তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে যখনই অনুরূপ মহোৎসবের আয়োজন হইত, তখনই তিনি সেই সেই ভক্তকে রামচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার রামবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কার্যপরিচালনার ভার লইতেন।

ফুলদোলের পরদিবস রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক ঠাকুরের কথামৃতপানান্তে রাত্রি প্রায় দশটায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর অকস্মাৎ কক্ষের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" রামচন্দ্র ফাঁপরে পড়িলেন—সম্মুখে নয়নবিমোহন কল্পতরু সমস্ত মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু অন্তরে কোন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তো জাগিতেছে না! অগত্যা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "প্রভু, কি চাইব কিছুই জানি না; কি চাইতে হয়, আমায় বলে দিন।" রামচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ঠাকুরই রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটি ফিরাইয়া লইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার সাধনভজন হইবে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতি; ঐ প্রেমের নিকট বাহ্য সাধন অকিঞ্চিৎকর। রামচন্দ্র আজ নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্তহৃদয়ে স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার আরাধ্য দেবতা আর একমাত্র প্রেমই তাঁহার আরাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে ও অনুপ্রেরণায় ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল ভক্তসেবা। আগেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের পূর্বে তিনি ব্যয়াদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সতর্ক ছিলেন; ক্ষেত্রবিশেষে উহা কৃপণতারূপে আত্মপ্রকাশ করিত। সম্ভবত ইহারই প্রতিকারকল্পে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি উকিল ও ডাক্তারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্য রামবাবু ডাক্তারি পাস করিলেও ডাক্তারি করিতেন না, তিনি রাসায়নিক পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। তথাপি কথাটা তাঁহার প্রাণে বিদ্ধ হইল। ভক্তের অর্থ ইষ্টের সেবায় লাগিবে না—ইহা যে বিষম সঙ্কট। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি স্পষ্টই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি ভক্তসেবা কর; তা হলেই আমার সেবা করা হবে।" তদবধি রামচন্দ্রের প্রাঙ্গণ ভক্তদের মিলনভূমি ও সঙ্কীর্তনক্ষেত্রে পরিণত হইল। প্রত্যহ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ জন ভক্তের সমাগম হইত এবং সকলেই প্রচুর প্রসাদ পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার ভক্তপ্রীতি দেখিয়া মনে হইত, তিনি ঠাকুরের এই বিধান-বাক্যই জীবনের ধ্রুব অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিজ আচরণ এবং বাক্যেও তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিতেন, "যে জন রামকৃষ্ণ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" বস্তুত শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে প্রণাম করিত, 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিত, সে শত্রু হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামচন্দ্রের হৃদয় জয় করিত।

রামচন্দ্র ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলেন—ভক্তের অর্থ সাঁকোর জলের মতো, সাঁকোর জল কখনও সঞ্চিত থাকে না। তাই তিনি অর্থসঞ্চয়ে যত্নপর না হইয়া ভক্তসেবার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, অভাবের পীড়নে কেহ তাঁহার দ্বারস্থ হইলে রিক্তহস্তে ফিরিত না।

রামচন্দ্র ঠাকুরকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিলেও স্বমুখে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার বাঞ্ছা পোষণ করিতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখছ?" রামবাবু বলিলেন, "আপনাকে।" আবার প্রশ্ন হইল, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" রামবাবু বলিলেন, "আপনাকে আমার চৈতন্যদেব বলে মনে হয়"—তিনি তখন 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠ করিতেন। উত্তরশ্রবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বামনীও (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) ঐ কথা বলত বটে।" এই বিশ্বাস রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "গিরিশ দাদা, বুঝেছ কি? এবারে একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব; একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান।"

রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল অতুলনীয়। একবার রোগশয্যাগত হইয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক ভিন্ন অন্য ঔষধসেবনে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশেও সে ধনুর্ভঙ্গপণ অটুট রহিল। সৌভাগ্যক্রমে চরণামৃতই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিল। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া আহারে বসিতেন না। এই জন্য প্রসাদী কোন মিষ্টান্নাদি গৃহে আনিয়া রাখিতেন এবং স্নানান্তে উহারই এক কণিকা গ্রহণান্তে ভোজন করিতেন। একদিন প্রসাদী করাইবার জন্য কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক উহা যথাবিধি শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে স্থাপন করিলেও ঠাকুর তৎসম্বন্ধে উদাসীন রহিলেন, এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও উহা স্পর্শ না করিয়াই পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রামবাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন—গৃহে ফিরিতে হইবে, অথচ মিষ্টান্ন প্রসাদীকৃত হয় নাই! কি হইবে? ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, পার্শ্ববর্তী ডাবরে ঠাকুরের মুখামৃত আছে—উহা স্পর্শ করাইলেই মিষ্টান্ন প্রসাদে পরিণত হইবে। যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ কার্য—রামচন্দ্র তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভক্তকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়াই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া দিলেন। শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজার রাত্রে পূজোপকরণ উপস্থিত থাকিলেও পূজারম্ভের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তদের মন যখন সমস্যামগ্ন, তখন শ্রীযুক্ত রামই গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "যাওনা, যাও।" অমনি গিরিশের অনুকরণে ঠাকুরের শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি পড়িতে লাগিল এবং "জয় জয়" রবে কক্ষ মুখরিত হইল।

রামবাবুর ধারণা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে পদার্পণ করিতেন, কিংবা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেন, তাহাই পবিত্রীকৃত হইত এবং ঐ সকলের স্পর্শে অপরেও নিষ্পাপ হইত। এমন কি, দূর হইতে তাঁহার দর্শনও মুক্তিপ্রদ ছিল। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর একদিন এই প্রসঙ্গ চলিতেছে, এমন সময়ে জনৈক শ্রোতা অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোক তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখেছে; কত গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস তাঁকে দেখেছে; তা বলে তারা সকলেই কি মুক্ত হয়ে যাবে?" অবিশ্বাসের অপ্রীতিকর উষ্ণ সমীরস্পর্শে রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, আর কণ্ঠে হুঙ্কার উঠিল, "যা যা, সেই গাড়োয়ান, সহিসের একটু পায়ের ধুলো নিগে যা—তোর মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" সে উদাত্ত কণ্ঠের আবেগময় কশাঘাতে সমালোচকের মন সেই দিন হইতেই পরিবর্তিত হইয়া গেল।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, নিজের ও পরের জন্য শ্রীমুখের বাণীগুলি লিখিয়া

রাখেন। সেজন্য কাগজ-পেন্সিল লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুর প্রসঙ্গ করিতে থাকিলে তিনি লিখিয়া লইতেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, "রাম, তুমি এত করছ কেন? এর পর দেখো, তোমার মনই তোমার গুরু হবে।" প্রভুর এই ইঙ্গিতে ও আশীর্বাদে রামচন্দ্র অতঃপর এই কার্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারের আনন্দ তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার জন্য আর এক নূতন কর্মক্ষেত্র রচনা করিল। ঠাকুরের লীলাবস্থায়ই তিনি তাঁহার অনুমতিক্রমে কোন্নগরে হরিসভায় 'সত্যধর্ম কি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের উপদেশপ্রচারের মানসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে তিনি 'তত্ত্বসার' নামক একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। প্রথমত এই কার্যে ভক্তেরা বাধা দেন—এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করা হয়। ঠাকুর তাই গোপনে রামচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ গা, এরা সব বলছিল তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ?" রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি শ্রীমুখের উপদেশই মুদ্রিত করিয়াছেন এবং উহার কথঞ্চিৎ আভাসও দিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না, তবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, রামচন্দ্রের কোন কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকিলে উহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না—নিরহঙ্কারভাবেই ঐ কার্য করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি কহিলেন, "দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপো না—আমার জীবনী বের করলে শরীর থাকবে না।" রাম তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বে 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও ঐরূপ উপদেশপ্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করেন। লীলাবসানের পরেই এই পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুত সেই যুগে কেশবচন্দ্রের পরে রামচন্দ্রই রামকৃষ্ণপ্রচারের গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দের কীর্তনে মাতামাতি প্রতিবেশীদের বিরক্তির সঞ্চার করে দেখিয়া রামবাবু একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, নির্জনে একটা সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ঠাকুর সে শুভসঙ্কল্প অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "এমন জায়গায় বাগান কিনো যেখানে একশটা খুন হলেও টের পাওয়া যায় না।" তারপর ১৮৮৩-র মধ্যভাগে কাঁকুড়গাছিতে এক উদ্যানবাটি ক্রয় করা হইল। উহাই বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানের সূত্রপাত। ঐ অঞ্চল তখন নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ—পথও পঙ্কিল। উদ্যানক্রয়ের পর ঠাকুর উহা দর্শন করিতে আসিলেন (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৩)। ঐ উপলক্ষ্যে বর্তমানে যেখানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, সেখানে তুলসী-কানন রচিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহার এক বৃক্ষতলে প্রণাম করেন, কলকাতা হইতে আনীত ফল-মিষ্টান্নাদি ভক্ষণান্তে পুষ্করিণীর জল পান করেন, একস্থানে উপবেশনপূর্বক সৎপ্রসঙ্গ করেন আর এক স্থানে পঞ্চবটী নির্মাণের আদেশ দেন।

সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে প্রত্যেক বস্তু পবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে রামচন্দ্র ঐ বাগানে আম্রবৃক্ষের নাম রাখিলেন 'রামকৃষ্ণ-ভোগ', পুষ্করিণীর নাম হইল 'রামকৃষ্ণ-কুণ্ড', যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন তাহা সযত্নে রক্ষিত হইল এবং যে তুলসীবৃক্ষতলে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সেখানেই তদীয় পূতাস্থি সমাহিত ও তদুপরি মন্দির নির্মিত হইল। রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটীর স্থানটিও অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ এবং রামচন্দ্রের ভক্তির মিশ্রণে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান আজ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মহাতীর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীযুত রামচন্দ্র যে শুধু অতুল ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তদবধি তাঁহার নিকট অস্পৃহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষকরূপে একবার তিনি এক ব্যবসায়ীর কেরোসিন তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উহা খাঁটি নহে। ব্যবসায়ী বুঝিলেন এই দোষাবিষ্কারের ফলে তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইবে; তাই বহু সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপূর্বক কার্যোদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্র কিন্তু ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার এক ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর পদ শূন্য হইলে অনেকে উহার জন্য আবেদন করিলেন। শুধু তিনি নির্বিকার রহিলেন। ইহা অফিসের বড় সাহেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি রামচন্দ্রকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্মপ্রার্থী হইতে আদেশ করিলেন। রামবাবু উপস্থিত মত তদনুরূপ করিলেও ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি বিবেকবৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; আর তিনিই কিনা অর্থলোভে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবেন? সুতরাং আবেদনপত্র ফিরাইয়া লইয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই জাতীয় প্রলোভন অনেক স্থলে প্রকারান্তরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কিন্তু উহার মুখোশ অপসারণপূর্বক প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিত না। একদা যোগোদ্যানের অবস্থা ভাল নহে দেখিয়া জনৈক ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে মন্দিরাদি-নির্মাণের প্রস্তাব করিলে রামচন্দ্র উহা প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইভাবে কার্যের প্রতিদানে ঐ ব্যবসায়ী নিজের ঘৃতাদি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট উত্তম প্রশংসাপত্রলাভের আশা পোষণ করেন।

পারিবারিক জীবনেও তাঁহার এই বৈরাগ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত। তাঁহার স্নেহের পুত্তলি একটি কন্যার অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগের পর তাঁহাকে শান্ত থাকিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "প্রভুই কন্যা দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন—এতে আমার দুঃখ করবার কী অধিকার

আছে?" তিনি অর্থ উপার্জন করিলেও পরিবারের জন্য বিশেষ সঞ্চিত হইতেছে না বলিয়া জনৈক বন্ধু অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি একদিনও ভাবিনি যে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিচ্ছি—প্রভুই আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খেতে দিচ্ছেন। আমি মরে গেলে তিনিই খাওয়াইবেন।"

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁহার পূত চিতাভস্ম সমাহিত করিয়া তদুপরি স্মৃতিমন্দির-নির্মাণের জন্য অন্য কোন উপযুক্ত ভূমি না থাকায় রামচন্দ্রের আগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সম্মতিক্রমে সাতদিন পরে জন্মাষ্টমী তিথিতে শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তগণ চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি কাঁকুড়গাছির উদ্যানবাটিতে লইয়া গিয়া তথায় সমাহিত করেন।[১] তদবধি পাঁচ-ছয় মাস কাল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল নিত্যপূজাদি করিতে থাকেন এবং রামচন্দ্র সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। অবশেষে নিত্যগোপাল অসুস্থ হইলে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ রাখিয়া সেবা পরিচালিত হয়। রামবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে তথায় যাইতেন এবং ছুটির দিন সেখানেই কাটাইতেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন যে, প্রভুর জন্য আনীত মিষ্টান্নের উপর পিপীলিকা রহিয়াছে। সেবাপরাধে ভীত হইয়া তিনি তদবধি কাঁকুড়গাছিতে অবস্থানপূর্বক নিজহস্তেই পূজা, আরতি, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য চালাইতে লাগিলেন।

তাঁহার যোগোদ্যানে বাসের সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি ধর্মপ্রাণ যুবক তথায় আগমনপূর্বক ঠাকুর-সেবায় সাহায্য ও তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া যোগোদ্যানেই থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল যুবক ভিন্ন অপর অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুও ছুটির দিনে রামচন্দ্রসমীপে সমবেত হইতেন। যুবকবৃন্দ প্রতি রবিবারে কলকাতার পথে পথে রামকৃষ্ণ নাম-কীর্তনে প্রেরিত হইতেন। ক্রমে রামবাবুর প্রচার-প্রচেষ্টা আর একটি রূপ ধারণ করিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র, শুক্রবার, গুডফ্রাইডের দিনে তিনি স্টার থিয়েটারে সর্বজনসমক্ষে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা'—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পূর্বে অনেক ভক্তই এরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন; কিন্তু রামবাবু সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। শুধু তাহাই নহে; ঐ দিনের বক্তৃতা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তিনি ক্রমে স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-অবলম্বনে মোট আঠারোটি বক্তৃতা দিলেন (১৮৯৩-৯৭ খ্রিঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতে প্রচারিত করার আকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় হইলেও রামচন্দ্রের

---

১ বিশেষ বিবরণ 'উদ্বোধন', ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ধারাবাহিক ধর্মবক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি মধুমেহ (ডায়েবিটিস) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না এবং শয্যাশায়ী না হইলে কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে পৃষ্ঠব্রণ, আমাশয় ইত্যাদিতে ভুগিয়াও তিনি অফিসের কাজ ও রামকৃষ্ণ-প্রচার সমভাবেই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিল। এই সময়ে একবার উরুদেশে নিদারুণ বেদনাগ্রস্ত হইয়া তিনি বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। একসময়ে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, অনেকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগশয্যাত্যাগের পর যদিও তিনি বুঝিলেন যে, শরীর নিতান্তই নিঃসার হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি শুধু মানসিক বলে যথারীতি আরব্ধ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিলেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ আর মাসিক বক্তৃতার অনুমতি দিলেন না। তাই 'তত্ত্বমঞ্জরী'ই হইল তাঁহার জনসাধারণে প্রচারের একমাত্র উপায়। অবশ্য ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববৎ ছুটির দিনে যোগোদ্যানে ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। তখনও কিন্তু বন্ধুবান্ধবের একান্ত অনুরোধে চিকিৎসাব্যপদেশে তিনি মধ্যে মধ্যে স্বগৃহে অবস্থান করিলেও যোগোদ্যানই ছিল তাঁহার স্থায়ী বাসস্থল।

রামবাবুর প্রচারের একটা নিজস্ব ধারা ছিল। তিনি নিজে বুদ্ধিবিবেচনায় যেরূপ ভাল মনে করিতেন তাহাতেই সোৎসাহে নিরত হইতেন। এইভাবেই কোন্নগরে বক্তৃতা, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' প্রকাশ এবং উপদেশ-সংগ্রহান্তে ১৮৮৬ খ্রিঃ জুলাই মাস হইতে 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক পুস্তক খণ্ডশ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অত্যুৎসাহ অনেকের নিকট অহঙ্কাররূপে প্রতিভাত হইলেও, উহা সত্য সত্যই নিছক অহঙ্কার বলিয়া মনে হয় না; কারণ দেখা যায় যে, শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয়দিগের পদসেবা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। বেশভূষায় তাঁহার কোনও পারিপাট্য ছিল না। একখানি থান কাপড় ও একখানি লংক্লথের চাদরই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অফিসের পোশাকও অতি সাধারণ রকমের ছিল। যোগোদ্যানে অবস্থানকালে তাঁহার পরিধানে একখানি অল্পপরিসর পাঁচহাতি বস্ত্র মাত্র থাকিত। তিনি এইরূপ অনাড়ম্বর জীবনই অতিবাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দিরের সমস্ত কার্য তিনি যথাসম্ভব স্বহস্তেই করিতে ভালবাসিতেন; ব্রাহ্মণ নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতেন; প্রভুর নামকীর্তন করিবার জন্য নগ্নপদে রাজপথে বাহির হইতেন; এমন কি শরীর অসুস্থ থাকিলেও প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়াও শোভাযাত্রাসহকারে অনাবৃত মস্তকে সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছিতে যাইতেন। বস্তুত সুবিবেচকের দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিকার্যে ভক্তির আতিশয্যই প্রকাশ পাইত। ভক্তির প্রেরণাতেই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষাদানচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ করিতেন; ভক্তির আবেগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবার

সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্তের প্রয়াসে যোগোদ্যানে ও অন্যত্র স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইতেন।

আবার শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নহে, জাগতিক ক্ষেত্রেও বহু উপযাচক তাঁহার দয়ায় সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। একবার দুই ভদ্রলোক চাকরি যাওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলেন না। অথচ রামচন্দ্রের দ্বারস্থ হইতেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না; কারণ তাঁহারা ধর্মপাগল রামচন্দ্রকে উপহাসই করিতেন। অবশেষে একদিন দৈবক্রমে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি কুশলাদি-জিজ্ঞাসাব্যপদেশে তাঁহাদের অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন যে, ঠাকুরের দয়ায় ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। ফলে নূতন কর্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনিই অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল; অপিচ স্বগৃহ ও যোগোদ্যানের প্রাত্যহিক ব্যয়নির্বাহে এবং উৎসবাদি-পরিচালনে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। তথাপি তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কত বালকের তিনি শিক্ষাভার বহন করিতেন, কত ব্যক্তির পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে সাহায্য করিতেন, কত কন্যাদায়গ্রস্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন এবং কত ভিখারির মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

গৃহে থাকিয়াও ঠাকুরের উপদেশানুসারে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করা ও তাঁহার অর্থ নানা ভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করা ছিল রামচন্দ্রের আদর্শ। যোগোদ্যানে থাকিয়া যাঁহারা ঠাকুরের সেবা করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি ঐ আদর্শেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন; তাঁহারাও ঠাকুরের সেবায় ব্যয় করিবেন বলিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। কিন্তু অর্থের অনতিক্রমণীয় মোহিনীশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় নিজ জীবনে অনুভূত হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই ইচ্ছামাত্র উহা অতিক্রম করিতে পারে। কার্যত ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল—অর্থোপার্জনে রত যোগোদ্যানের সেবকগণ অনেকেই একে একে সংসারে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া তিনি অবশিষ্ট সকলকে সন্ন্যাসে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। কোনও কিছু সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করাই ছিল রামচন্দ্রের স্বভাব। তাই যে রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে ঠাকুরের যুবক ভক্তদিগকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি জীবনের শেষ তিন বৎসর সন্ন্যাসমহিমাখ্যাপনে তৎপর হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার দুইজন শিষ্য ঐ সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লীলাসমাপনের কিয়দ্দিবস পূর্বে এক অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বোপবিষ্ট রামচন্দ্র

প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি মাকে বলছিলাম যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয় ও কেদার—এদের একটু শক্তি দে—এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।" প্রার্থনাচ্ছলে ঠাকুরের এই আশীর্বাদ রামচন্দ্রকে অবলম্বনপূর্বক প্রচারক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; এতদ্ব্যতীত রামবাবুর শেষজীবনে অপরের মধ্যে ভাবসংক্রমণের শক্তিও প্রকটিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহার নিকট গমনাগমনকারী এক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন, "মহাশয়, কিছু অদ্ভুত দেখাতে পারেন তো আপনার কথায় বিশ্বাস করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানতে পারি," তখন রামচন্দ্র অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আজ হতে তিন দিনের ভিতর তোমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু অদ্ভুত ঘটবে।" এই ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ঐ ব্যক্তির অন্তর মথিত করিয়া এরূপ এক দুর্দমনীয় হাস্যরোল উঠিল যে পরিচিত সকলে সেই অবিরাম হাস্য দেখিয়া স্থির করিল, তিনি প্রেতাবিষ্ট হইয়াছেন। পরে রামচন্দ্রের উপদেশে আস্থা-স্থাপনান্তে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কর্মস্থলে যে নিভৃত কক্ষে উপবেশনপূর্বক রামবাবু অবসরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন, সেই কক্ষে একদিন এক উকিলবাবু ঠিক ঐরূপ ভাবেই বলিলেন, "এসব ছেঁদা কথায় আমি ভুলি না। আপনার কথায় বিশ্বাস হয় যদি আমার মতো পাষণ্ডের মনকে ভগবানের জন্য কাঁদাতে পারেন!" রামবাবু বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় সবই হতে পারে।" উকিল ঐ কথাও উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিলেন। তখন রামচন্দ্র আবেগভরে আরক্তিম নয়নে বলিলেন, "আপনি অবশ্যই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্য কাঁদবেন।" তিন দিনের প্রয়োজন হইল না, তিন মিনিট যাইতে না যাইতে বাবুটি তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের হেমন্ত ঋতু আসিয়া পড়িল। রামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে তখন রোগের আক্রমণ হইয়াছে; হৃৎপিণ্ড অতীব দুর্বল; তদুপরি শ্বাসরোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্বাসকষ্ট কখনও কখনও এতই দুর্বিষহ হইত যে, তিনি শয্যায় বসিয়া বহু রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইতেন। তথাপি ঐ অবস্থায়ও প্রতিশ্বাসে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইত। এই রোগ হইতে কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনর্বার কার্যে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু অচিরেই আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। এইভাবে সিমুলিয়ার বাটিতে প্রায় দেড় মাস ভুগিয়া তিনি মনে মনে জানিলেন যে, জীবন আর বেশি দিন নাই—এইবার রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করিতে হইবে; অতএব অবশিষ্ট দিবসগুলি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে শ্রীগুরুর শেষ স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে

সম্মত নহেন দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার দেহ কঙ্কালসার ও উত্থানশক্তিরহিত...পার্শ্বপরিবর্তনেরও ক্ষমতা নাই; কিন্তু সেই দিন তিনি যোগোদ্যানে যাইবার আগ্রহে সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অগত্যা পালকি ডাকিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠান হইল (২৮ পৌষ)। যোগোদ্যানে তিনি মাত্র পাঁচদিন ছিলেন। এখানে আসিয়া শ্রীমন্দিরের সেবকদিগকে বলিয়াছিলেন, "গুরুদেবের কাছে জুড়াতে এসেছি। আমার জন্য তোমাদের একদিন মঙ্গলারতির বিঘ্ন হবে। কি করি, বল?—একদিন।" বেলুড় মঠের সাধুরা তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। চিরবিদায়ের একঘণ্টা পূর্বে নাভিশ্বাস আরম্ভ হইলে তিনি গঙ্গাতীরে যাইতে চাহিলেন এবং কেহ ঐ কথা বুঝিতেছে না দেখিয়া বলিলেন যে, 'রামকৃষ্ণকুণ্ড'ই তাঁহার গঙ্গা। সেখানেই তিনি প্রভুপদে মিলিত হইলেন (৪ মাঘ, ১৩০৫, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রিঃ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১০ টা ৪৫ মিনিট)। তাঁহার পূতদেহ যথারীতি সৎকার করিয়া চিতাভস্ম যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

বৈষ্ণবকুলভূষণ রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বীয় আবাল্য সংস্কার অনুযায়ী বুঝিয়া থাকিলেও সেই বোধের মধ্যে একটা সার্বভৌমিকতাও ছিল; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যাঁহারাই আসিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার উদার ভাবের অন্তত কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্রের কার্যধারা ও ভাবরাশির সহিত অপর ভক্তেরা সর্বদা একমত না হইলেও সকলেই তাঁহার ঊর্জিতা ভক্তির প্রশংসা করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীতে তাঁহাকে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাগবত জীবনের স্ফূর্তি হইয়াছিল তাহা সর্বকালে সর্বজনে শ্রদ্ধার্হ।

# মনোমোহন মিত্র

'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী লিখিয়াছেন, "ভক্ত রামচন্দ্রের জীবনের সহিত মনোমোহনের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।...যাঁহারা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দৈবী কৃপা এবং ভাগবত সংস্পর্শে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও তাঁহার যুগলীলার আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অল্পাধিক সহায়তা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, মনোমোহন সেই চিহ্নিত ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।...মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা ছিল তাঁহার সুগভীর তেজোদীপ্ত ভাবাবিষ্টতা। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি খুব মাতিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশের উন্মাদনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত।... নামসংকীর্তনের সময়েও তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা ও ভাবাবেশ ভক্তগণের মধ্যে এক নিবিড় উন্মাদনা সৃষ্টি করিত।"

মনোমোহনের পিতা ভুবনমোহন মিত্র এবং মাতা শ্যামসুন্দরী। তিনি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর (১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র, শুক্লা চতুর্দশীতে) হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহন চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সরকারের নিকট রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আচারে একনিষ্ঠ হিন্দু হইলেও যুক্তিপরায়ণ ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্যামাসুন্দরীও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন এবং পরিবারে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই দম্পতির একমাত্র পুত্র মনোমোহনের শৈশব অতি আদরেই যাপিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালও সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের মতোই কাটিয়াছিল। প্রায় তের বৎসর বয়সে তিনি কলকাতার ঝামাপুকুর পল্লিতে তাঁহার মেসোমহাশয় রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের বাটিতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র প্রায়ই রাজেন্দ্রবাবুর বাটিতে আসিতেন এবং রাজেন্দ্রবাবুও কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎলাভের মানসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যাইতেন। এই সূত্রে কেশব ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সহিত মনোমোহন পরিচিত হন এবং তাঁহাদের ভাবধারাও অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করেন। সহপাঠী রাজমোহন বসু ও এম. এন. ব্যানার্জির (পরে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) সহিতও মনোমোহন এই সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মূলে হয়তো ছিল মনোমোহনকে ব্রাহ্মপ্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা; কারণ রাজেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত

করিলেও মনোমোহন ঐদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। বিবাহের পর মনোমোহন পিতার সহিত ঢাকায় চলিয়া যান এবং ঐখানেই প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাস করেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই। বিশেষত তাঁহার একুশ বৎসর বয়সে ঢাকাতেই পিতার দেহত্যাগের পর পরিবারের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে সংসারে মন দিতে হয়।

পিতার সঞ্চিত অর্থ অল্পই ছিল; অতএব শীঘ্রইঅর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিল। বিশেষত যে সামান্য পুঁজি ছিল, তাহাও কলকাতায় পূর্ব হইতে বায়না করা ২৩নং সিমুলিয়া স্ট্রিটের বাটিখানি ক্রয় করিতে প্রায় নিঃশেষিত হইল। সুতরাং নতুন বাড়ি ভাড়া দিয়া মনোমোহনকে মাতা ও ভগিনীদের সহিত কোন্নগরে চলিয়া যাইতে হইল। এখানে থাকিয়া ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চাকরির অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং অবশেষে রাজেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ৪০ টাকার একটি কাজ পাইলেন। সেখানে ক্রমে পদোন্নতি হইয়া তাঁহার বেতন ১৫০ টাকা হইয়াছিল। তিনি কোন্নগর হইতে অফিসে যাতায়াত করিতেন বলিয়া অবসর খুব কমই ছিল। যেটুকু সময় পাইতেন তাহা তিনি পিতার সংগৃহীত পুস্তক ও মন্তব্যপাঠে ব্যয় করিতেন। মনোযোগসহকারে পিতার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য-পাঠকালে সমাজসংস্কারবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনিও ক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং বাল্যে যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যৌবনে তাহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিলেন। একটি ঘটনায় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের সুযোগ ঘটিল।

মনোমোহনের একটি সপ্তম মাসের কন্যা ইহলোক ত্যাগ করিলে তিনি এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। সময় পাইলেই তিনি অন্যের অলক্ষ্যে শ্মশানে যাইয়া কন্যার শেষ বিশ্রাম-স্থলের অন্বেষণ করিতেন। মাতা শ্যামাসুন্দরী ইহার অন্য কোনও প্রতিকার না দেখিয়া স্থানপরিবর্তনের জন্য কলকাতার বাড়ির ভাড়াটিয়া উঠাইয়া দিয়া সেখানে আসিলেন। তখন মনোমোহনের বাল্যবন্ধু রাজমোহন কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলেই কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি বিষয়ে আলোচনা হইত। ঐ সময়ে সমাজসংস্কারের দিকেই মনোমোহনের ঝোঁক থাকিলেও রাজমোহনের মুখে কেশবের যোগসাধনার কথা শুনিয়া ও মাতার উৎসাহ পাইয়া তিনি উপাসনায় রত হইলেন এবং উহাতে মন স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মগণের অনুকরণে ব্যাঘ্রচর্ম, একতারা এবং খান-দুই গৈরিকবস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা তিনি নিজেই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, "ভাল ভাল কতকগুলি

বিশেষণ যোগ করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনা করাকেই উপাসনা বলিয়া গণ্য করিতাম। ...আমাদের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, মানব-অন্তরে প্রকৃত অনুতাপ না জন্মিলে কোন উপাসনাকেই প্রকৃত উপাসনার মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। অনুতাপ ব্যতীত, চোখের জল ব্যতীত আত্মার মলিন আবরণ ধৌত হয় না। আত্মা শুদ্ধ না হইলে পবিত্র শুদ্ধাত্মাস্বরূপ ভগবানকে জানা যায় না।"

এই উপাসনায় বাদ সাধিলেন মনোমোহনেরই মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত। বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসহীন রামচন্দ্রের প্রবল যুক্তির স্রোতে মনোমোহনের অদৃঢ়সংবদ্ধ উপাসনা-ভেলা বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু বাল্য-সংস্কার নির্মূল না হওয়ায় তিনি ভোগে মগ্ন না হইয়া বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে দুলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন— দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাও মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্যত কিছুই হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন চারিদিক জলে জলময়, আর সে প্রবল বন্যায় তিনি একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন— মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা, কেহ কোথাও নাই; অকস্মাৎ অশরীরী বার্তা বিঘোষিত হইল, "জগতে কেহ বাঁচিয়া নাই—সকলে মরিয়াছে।" মনে হইল, "তবে আমারই বা বাঁচিয়া লাভ?" দৈববাণী উত্থিত হইল, "আত্মহত্যা পাপ।" আবার মনে হইল, "কেহই যখন নাই, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব?" আকাশবাণী কহিল, "যাঁহারা ভগবান কি বস্তু জানেন, কেবল তাঁহারাই বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহাদের সহিত তোমার শীঘ্রই দেখা হইবে।" রাত্রিশেষে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও অপূর্ব স্বপ্নের ঘোর কাটিতে অনেক সময় লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিয়া নিকটস্থ আত্মীয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে, আর আমি কোথায়?" তাঁহারা তো অবাক।

সেইদিনই প্রত্যুষে রামচন্দ্র এক গোস্বামীর সহিত মনোমোহনবাবুর গৃহে আসিয়া সদালাপে রত হইলেন। তাঁহাদের আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে মনোমোহনও উহাতে যোগ দিলেন। গোস্বামী মহাশয় সেদিন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হিন্দুধর্মের এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন যে, উহাতে মনোমোহনের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। রামচন্দ্রও তখন অবিশ্বাসের ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল ও ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় বিদায়গ্রহণান্তে মনোমোহনের মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন যে, সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ মায়াঘোরে অচৈতন্য—কেহই জীবিত নাই। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল যে, সেদিন অবকাশ আছে; অতএব উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যেমন সঙ্কল্প তেমনি কার্য—

তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র-প্রসঙ্গে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনোমোহনের মনের পরিবর্তন হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজসংস্কারের আগ্রহে মত্ত মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুনিলেন যে, তাঁহারা যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা সামাজিক ধর্ম—সমাজের শুভাশুভ লইয়াই তাহার কথা, সে ধর্মে ভগবানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু তিনি (তাঁহাদিগকে) যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও শুনাইলেন যে, জাতি আছেও বটে, আবার নাইও বটে—জাগতিক দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ অনিবার্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহা নাই। ফলত শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মনোমোহন ক্রমেই নিজ অন্তরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

মনোমোহন প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে এবং সপ্তাহে অন্য দুই-একদিন ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর কামারপুকুরে গমন করিলে মনোমোহন ছুটির দিনও ব্রাহ্ম সমাজেই কাটাইতেন। এতদ্ব্যতীত মাসতুতো ভাই শ্রীযুত নিত্যগোপাল ও রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন। নিত্যগোপাল পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে তিনি রামচন্দ্রেরই গৃহে অবস্থান করিতেন।

ঐ বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলে রামচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে মনোমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ নহেন—অবতার। মনোমোহনের তখন বাসনা জাগিয়াছে, ঠাকুরের সেবা করিবেন। একদিন কোন্নগর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি দেখিলেন ঠাকুর শ্রীচরণদ্বয় বিস্তারপূর্বক উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু মনোমোহনের আগমনে উহা সঙ্কুচিত করিলেন। অমনি অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া মনোমোহন বলিলেন, "বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন? শিগ্‌গির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে গিয়ে কোন্নগরে রাখব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে চরণসেবার অধিকার দিলেন। ঠাকুরের কৃপায় ধন্য মনোমোহন ক্রমে স্বীয় আত্মীয়বর্গ এবং পরিচিতদিগকেও ঠাকুরের শ্রীচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজ জননী শ্যামাসুন্দরীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার অব্যবহিত পরেই ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরীর আগ্রহে কলকাতায় মনোমোহন-গৃহে পদার্পণপূর্বক মিষ্টান্নাদি গ্রহণ

করিয়াছিলেন। মনোমোহনের চারিটি ভগিনী—মনোমোহিনী, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী ও সুরেশ্বরী—সকলেই ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর পতি শশিভূষণ দে এবং সুরেশ্বরীর স্বামী বলরাম সিংহও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। বিশ্বেশ্বরী ও তাঁহার পতি রাখালচন্দ্রের কথা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

মনোমোহনবাবু কয়েকবার কেশবচন্দ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন, কেশবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন; তাই শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহাকে প্রণতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে এবং নীরবে শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিতে দেখিয়া মনোমোহনের ভক্তি যে আরও দৃঢ় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৮১ অব্দের ৩ ডিসেম্বর মনোমোহন ঠাকুরকে স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে একটি মহোৎসবের আয়োজন করেন। তাহাতে অন্যান্য ভক্তদের সহিত কেশবও আসিয়াছিলেন। পরবর্তী শনিবারে (১০ ডিসেম্বর) ঠাকুর স্বেচ্ছায় মনোমোহনের মেসোমহাশয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটিতে আসেন এবং সেখানেও মহোৎসব হয়। ঐ দিনও ঠাকুর মনোমোহনগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহাকে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের' স্টুডিওতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁহার ফটো তোলা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাজেন্দ্রবাবুর বাটিতে যে ভক্তসম্মেলন ও কীর্তন হয়, তাহাতে কেশব উপস্থিত ছিলেন। কেশবের ঐকান্তিক সেবার ভাব সেদিনও অপূর্ব আকারে অভিব্যক্ত হইয়া মনোমোহনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেশব বলিতেন যে, সাধারণের সহিত ঠাকুরকে উদ্দাম নৃত্য করিতে দিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটানো উচিত নহে—তাঁহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া তাঁহার উপদেশামৃত পান করাই উচিত। এইরূপ কীর্তনে ক্লান্ত হইতে দেখিলেই কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্যত্র লইয়া যাইতেন, স্বয়ং তাঁহার আননের ঘর্ম অপসারিত করিতেন, পাখা লইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেন এবং মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে ও সন্তর্পণে শ্রীমুখে তুলিয়া দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের পর মনোমোহনের মন সাধনক্ষেত্রে যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা উহাই দুই-চারিটি ঘটনা অবলম্বনে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন সাধারণত খুব শান্ত ও নিরীহ হইলেও বড় স্পষ্টবক্তা ছিলেন—অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অযথা কটূক্তি করিতে থাকিলে মনোমোহন দৃঢ়স্বরে শাসন করিয়া, এমন কি, প্রহারের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু ঘটনাটি ঠাকুরের অজ্ঞাত রহিল না। পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ক্রোধ সম্বন্ধে মনোমোহনকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "কেউ আমার নিন্দা করল, কি সুখ্যাতি করল, তাতে আমার কি! আমি

সকলের রেণুর রেণু।" ইহাতে মনোমোহন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি কি তোমায় বকেছি যে তুমি চুপ করে মুখ গোঁজ করে বসে আছ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি? ক্রোধ না চণ্ডাল। শাস্ত্রে কামের পরই ক্রোধকে শত্রু বলেছে। কাউকে রাগ করতে দেখলে আমি তাকে ছুঁতে পারি না।" ইহার ফলে মনোমোহন অতঃপর কাহাকেও স্বমতে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেন না। কেহ কথা না শুনিলে বা বিপরীত তর্ক করিতে থাকিলে তিনি তাহার সদ্বুদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন মাত্র।

একবার অসুস্থা জ্যেষ্ঠা কন্যা মানিকপ্রভার প্রায় অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনোমোহনবাবু সেইদিন আর রামচন্দ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। কিন্তু মাতা শ্যামাসুন্দরী ইহা জানিয়া বলিলেন যে, তাহার যাওয়া উচিত; কারণ ইহাই বিশ্বাসের পরীক্ষা দেবার সময়। মাতা আরও বলিয়া দিলেন, মনোমোহন যেন ঠাকুরের নিকট মানিকপ্রভার কথা বলেন এবং ঠাকুরের সাধনভূমি হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া আসেন। ঐরূপ সকাম উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কৃপাভিক্ষা করা অসঙ্গত জানিয়াও মনোমোহন মাতার আদেশে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সেদিন ঠাকুর কেবল বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেছিলেন; অতএব মনোমোহন নিজ বক্তব্য বলিতে পারিলেন না। পরে অন্তর্যামী ঠাকুর শৌচে গমনকালে মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় সাধনার স্থানও দেখাইয়া দিলেন। মনোমোহনের কানে তখনও বৈরাগ্যের বাণী ধ্বনিত হইতেছে—তিনি মৃত্তিকা লইতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে ঠাকুর নিজেই হৃদয়ের দ্বারা কিছু ধূলি ও একটি ফুল তাঁহাকে দেওয়াইলেন। মনোমোহন বাড়িতে ফিরিয়া মাতাকে উহা দিলেন এবং বলিলেন, "মা, আমায় আর কখনও এমন পরীক্ষায় ফেলো না।" মানিকপ্রভা সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

পিতার আদরের দুলাল মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। সেই অভিমান কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। একবার তাঁহারই সমক্ষে ঠাকুর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথের ভক্তির প্রশংসা করিলে মনোমোহন অভিমানে ফুলিয়া উঠিলেন। পরবর্তী শনিবার দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি কোন্নগরে চলিয়া গেলেন এবং পর পর কয়েক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না; বলিলেন "তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন, আমি সেখানকার কে?" শুধু কি তাই? ঠাকুর কোন্নগর হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য রাখালকে পাঠাইলেও তিনি নিজে তো গেলেনই না, অধিকন্তু রাখালকেও যাইতে দিলেন না; কেবল অপর কোন ভক্তের মুখে ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আগে ভক্তি হোক তবে যাব।" কিন্তু অভিমানবশে বিপরীত আচরণ করিলেও অশান্ত মন সর্বদা দক্ষিণেশ্বরেই ধাবিত হইতে লাগিল; তিনি শয়নে-স্বপনে

ঠাকুরের কথা ভাবিতে লাগিলেন—অন্য কোন বিষয়ে মন স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এইরূপ অশান্ত মন লইয়া কোনপ্রকারে দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে একদিন গঙ্গাস্নানকালে অকস্মাৎ একখানি নৌকায় ভক্ত বলরামবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আজ প্রাতেই ভক্তদর্শন হলো—আজ আমার মহাসৌভাগ্য দেখছি।" বলরাম বলিলেন, "শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ আসিয়াছেন।" প্রভুর কথা শুনিয়াই মনোমোহন চমকিয়া উঠিলেন। নৌকায় অবস্থিত নিরঞ্জন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যান না কেন? আপনাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠাকুর স্বয়ং এখানে এসেছেন।" নৌকা মনোমোহনের নিকটবর্তী হইলে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে দৃশ্যে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোমোহনও নিজের অভিমান, অত্যাচারের কথা ভাবিয়া অকস্মাৎ বিবশ হইয়া পড়িলেন—দেহ ঢলিয়া জলে পড়িতে উদ্যত হইল। তখন নিরঞ্জন তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া ভক্ত মনোমোহন ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেদিন মনোমোহনের বাটিতে পদধূলি-অর্পণান্তে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্তন করিতে বলিয়াছিলেন। পূর্বে অভ্যাস না থাকিলেও ঐ উপদেশের পর তাঁহারা কীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন; কিন্তু অচিরেই অনুভব হইল যে, যদিও কীর্তন-অবলম্বনে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ভাবুকতার বৃদ্ধি হয়, তথাপি সঙ্কীর্তনের মত্ততা জীবনের অপর অংশগুলিকে মোটেই স্পর্শ করিতেছে না—সেখানে যে তিমির সেই তিমির। মনে মনে স্থির করিলেন, ইহা বৈরাগ্যের অভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে, সুতরাং একদিন (১৮৮২ খ্রিঃ, ১০ মাঘ) শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন, যেন আর তাঁহাদিগকে সংসারবন্ধনে পতিত হইতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শোল মাছের ঝাঁকের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, ঝাঁকের নিচে মাছটিকে অবলম্বন করিয়াই যেমন চারাগুলি বাঁচিয়া থাকে, বড় মাছটিকে সরাইলে সেগুলিকে অপর মাছে খাইয়া ফেলে, তেমনি গৃহস্বামীই পরিবারের অবলম্বন—তাঁহাকে গৃহে থাকিয়াই সাধন করিতে হইবে। তারপর জগন্মাতার উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করার প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি গাহিলেন—

"যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে।<br>
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাব বজায় রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়—শুধু ভেকধারণ করিলেই একজনের

ভাবরাশি অকস্মাৎ অপরের মনে সঞ্চারিত হয় না। তিনি বলিলেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ঈশ্বরলাভ করা যায় না—একথা সত্য। আবার এও বলছি যে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই ঈশ্বরলাভ হয় না।...জেনে রাখ, এ সংসার তোমার নয়—এ সংসার ভগবানের।" এইসকল কথায় মনোমোহনের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, অনাসক্তিই সাধনের সার কথা এবং উহাই জীবনে প্রতিফলিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই নির্লিপ্ত ভাবের পরীক্ষা মনোমোহনকে একাধিকবার দিতে হইয়াছিল। একদিন রামবাবুর গৃহে মহোৎসব-কালে নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে মনোমোহনের মাতার শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া মনোমোহনকে সংগোপনে ডাকিয়া উহা জ্ঞাপন করিলেন এবং মহোৎসবের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় তজ্জন্য অপরকে বলিতে বারণ করিলেন। অশেষ সংযম-সহকারে মনোমোহন মাতৃবাণী পালন করিয়া ঐ বিষয়ে নীরব রহিলেন। উৎসবান্তে ভক্তগণ চলিয়া গেলে দেখা গেল, শ্যামাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের পর আর একটি কন্যার মৃত্যুকালেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া সমভাবে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বন্ধুগণ সান্ত্বনা দিতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে না যাই।" কন্যা মানিকপ্রভার মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের ছবি কন্যার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাল করে দেখ এবং তাঁকে ডাক। ভয় নাই, মা—তিনি সর্বদাই সঙ্গে আছেন। কেঁদো না, মা—এখন কাঁদবার সময় নয়।" তিনি কন্যার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেন। মানিকপ্রভা মুখে বিমলহাস্য ফুটাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলে পিতা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মানিক বেঁচে গেল!" ঐ বিদায়মুহূর্তে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছেন, মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই—সমস্তই চৈতন্য, এমন কি মুমূর্ষু কন্যাটিও চৈতন্যের পুত্তলি মাত্র। এই অনুভূতির ফলে তিনি পাগলপ্রায় হইয়া কখনও কাঁদিতে এবং কখনও হাসিতে লগিলেন। বাটির লোকে ভাবিল, কন্যার শোকেই এইরূপ হইয়াছে—অন্তরের কথা কেহই জানিল না।

ভগিনীপতি ও ভগিনী সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ নির্লিপ্ততা ছিল। প্রথমে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি ভগিনী বিশ্বেশ্বরীর সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন বলিলেন, "মনোমোহন, তুমি রাগই কর আর যাই কর, রাখালকে বললাম, 'ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনতে প্রস্তুত, তবু কারো দাসত্ব করছিস, চাকরি করছিস, একথা যেন না

শুনি'।"—সেদিন হইতে তাঁহার সকল ক্ষোভের অবসান হইল। বস্তুত মনোমোহনের এই অনুভূতি হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিবারের সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও সেবিকা, মনোমোহন শুধু ইহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত।

এই সময়ে মনোমোহনবাবুর ভাগ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাপ্রচারের এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিল। ১৮৮২ অব্দের ৩ ডিসেম্বর বৈষ্ণবচূড়ামণি নবচৈতন্য মিত্র মহাশয়ের বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে যে মহোৎসব হয় তাহাতে যোগদান করিয়া এবং পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া কোন্নগরবাসীরা তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মনোমোহনবাবুকে প্রতি সপ্তাহে কোন্নগরে প্রচার করিতে বলিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র প্রচারের নামে তখন উন্মাদবৎ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন কিছু করিবেন না; তাই তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "টেনে-বুনে কিছু করো না, তাঁর যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি করাবেন।" ইহাকেই আদেশ মনে করিয়া মনোমোহন ও রামচন্দ্র কোন্নগরে প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই জন্য প্রতি শনিবারে তাঁহারা কোন্নগরে যাইতেন। স্টেশন হইতে মনোমোহনের গৃহে যাইবার কালে কোন্নগরবাসী অনেকে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন; মনোমোহনের বাটিতেও আলোচনাদি চলিত। রবিবার প্রাতে মনোমোহন, রামচন্দ্র ও নবচৈতন্য সংকীর্তনে বাহির হইতেন—পথে শত শত ব্যক্তি উহাতে যোগ দিতেন। এই সময় একদিন কোন্নগর হইতে কলকাতায় প্রত্যাগমনকালে রামবাবু ও মনোমোহনবাবু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখানে অন্য কেউ নাই, তোমরা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ; তোমাদের বলছি, শোন—একটি কথা আছে, 'সাঁঝ পহরে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত?' তোমরা এখনই এত পরিশ্রম করছ কেন? এরপর এমন সময় আসবে, যখন তোমরা খেতে-শুতে সময় পাবে না।" তদবধি সাপ্তাহিক প্রচার বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পরেও কোন্নগরবাসীরা শ্রীযুত রামচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশেও তাঁহারা একবার গিয়াছিলেন। সেবারে কোন্নগর হরিসভায় বাৎসরিক উৎসবে সভার সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি রামবাবু ও মনোমোহনবাবুকে যাইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "তোমরা গেলেই আমার যাওয়া হবে।" রামচন্দ্র তথায় 'সত্যধর্ম কি' এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। পরে সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনের মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ও মনোমোহন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; কোন্নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া সেই ভাববিহ্বল নৃত্যে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্ত মনোমোহন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া উচ্চহাস্য করিতে থাকিলে

কয়েকজন তাঁহার হতচেতন দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া পল্লিতে হরিধ্বনিসহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি একটা পর্যন্ত তাহার সংজ্ঞা ফিরিল না দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া গেলেন। ঐ রাত্রে প্রায় তিনটার সময় তিনি বাহ্যভূমিতে ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনার পর তিনি কোন্নগরবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন এবং অনেকেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিত। শোনা যায়, কোন্নগরে যখন এই কীর্তনের উন্মাদনা চলিতেছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেবল বলিতেছিলেন, ''লাগ ভিল্‌কি লাগ।''

এইসকল প্রচারকার্য ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশসম্বলিত 'তত্ত্বসার' নামক পুস্তিকা এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক পুস্তকপ্রকাশে মনোমোহনবাবু রামচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে পরমহংসদেবের অনুমতিক্রমে, নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কালীপদ ঘোষ ও মনোমোহনের অর্থসাহায্যে এবং রামচন্দ্রের সম্পাদনায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। উহার অধিকাংশ সংখ্যাই ঠাকুরের ভাবে ও উক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং উহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ফলত ঐ সময়ে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলিয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন ও রামচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন।

ঠাকুর অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবা চালাইবার জন্য অনুগত ভক্ত মনোমোহন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। এই জন্য একখানি পত্রে তাঁহার সহধর্মিণীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, ''একটি পয়সাও যেন বাজে খরচ না হয়। যে পয়সাটি বাজে খরচ করিবে, জানিবে সেইটি প্রভুর সেবাকার্যে লাগাইতে পারিলে না। এখন প্রভুর সেবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যুবকগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, তাহাদের সেবাকার্য দেখিলে আনন্দ হয়। যাহাতে অর্থাভাবে এই সেবাকার্যটি অচল না হইয়া পড়ে তাহা আমাদের দেখা অবশ্য কর্তব্য।'' শুধু অর্থ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারিলেন না, অফিস কামাই করিয়াও মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিন কাশীপুরে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু চাকরি ছাড়িয়া দিবার কথাও ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে অফিসে যাইতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যুবক ভক্তরাই সব করিতেছে, অপর কাহারও সেখানে থাকা অনাবশ্যক। মনোমোহন মস্তক পাতিয়া সে আদেশ মানিয়া লইলেন।

ঠাকুরের পূত দেহাবশেষ কাঁকুড়গাছিতে সমাহিত হইবার পর মনোমোহনবাবু প্রায়ই সেখানে যাইয়া অনেক সময় কাটাইতেন। বৃষ্টি নিবারণের জন্য সমাধিস্থানের

উপর আচ্ছাদন ছিল না। মনোমোহনবাবু একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পরলোকগতা জননী বলিতেছেন, "ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে।" সুতরাং তিনি শ্রীযুত রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, যাহাতে পাকা আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; অতএব এই প্রস্তাবে আপত্তি উঠিল। অবশেষে সমস্যা-সমাধানের জন্য এক সভা আহূত হইল এবং ভক্তগণ এই মর্মে একখানি স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিলেন যে, কস্মিন্ কালে কেহ ঐ অস্থিপূর্ণ কলসটি স্থানান্তরিত করিবেন না। এইসকল কার্যে মনোমোহনকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অতঃপর মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলে তিনি প্রতিদিনই তথায় যাইয়া বেলা নয়টা পর্যন্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পূর্বেই মন্দির সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং ৺শ্যামাপূজার দিনে উহাতে বিশেষ পূজাদি হয়।

জন্মাষ্টমীতে কাঁকুড়গাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপূর্ণ কলসটি সমাহিত হইয়াছিল। এই ঘটনা স্মরণার্থে প্রতিবৎসর শ্রীযুত রামচন্দ্রের গৃহ হইতে কাঁকুড়গাছিতে যখন গীতবাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা যাইত, তখন মনোমোহনবাবু থাকিতেন উহার পুরোভাগে। ঐরূপ একটি কীর্তন (সম্ভবত ১৮৯০ কি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে) সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ (তদানীন্তন কালীকৃষ্ণ) পরে বলিয়াছিলেন, "রামবাবু, মনোমোহনবাবু, দেবেনবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক গৃহী ভক্ত ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। 'ত্রিতাপে সদা তনু দহিছে'—এই গানটি ধরা হয়েছিল। যোগোদ্যানে পৌঁছেও খুব সংকীর্তন হলো। রামবাবু ও মনোমোহনবাবুর ভাবাবেশ হলো। রামবাবু 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে হুঙ্কার দিয়ে সিংহবিক্রমে ঘুরতে লাগলেন। মনোমোহনবাবু ভাবে কি যেন অপূর্ব দর্শন বা অনুভূতি করছেন, তাই খিলখিল করে হেসে উঠছিলেন। মাঝে মাঝে কুঁজো ও আড়ষ্ট হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। খুব মাতামাতি হয়েছিল। আমরা সকলেই খুব অভিভূত হয়েছিলাম।"

এদিকে বরাহনগরের মঠে ত্যাগী ভক্তেরা সমবেত হইয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্নবস্ত্রের বড়ই অভাব। মনোমোহনবাবু ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন মঠে যাইয়া স্বচক্ষে যে অভাব দেখিলেন তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কলকাতায় গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট উহা জ্ঞাপন করিয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করাইলেন। মঠের সাধুদের অসুখ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহার গুরুভাই এবং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি সন্ন্যাসীর মর্যাদা বিস্মৃত হইতেন না, দেখা হইলেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের প্রতিও তাঁহার তুল্যরূপ আকর্ষণ ছিল এবং এক বৎসর কাল

তিনি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। তথায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিত, সময়ে সময়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত এবং শরীর পুলকিত হইত। এতদ্ব্যতীত যখনই তিনি যাইতেন তখনই মিষ্টান্নাদি লইয়া গিয়া ঠাকুরের ঘরে এমনভাবে নিবেদন করিতেন, যেন প্রত্যক্ষ ঠাকুর সেখানে রহিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মনোমোহনবাবু এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। একই সঙ্গে তাঁহার দুইটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় বিসূচিকায় দেহত্যাগ করে। ইহাদের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে এক জ্যোতির্ময় প্রশান্ত মূর্তি মনোমোহনের বক্ষ স্পর্শপূর্বক দেখাইয়া দিলেন যে, এই বিশ্বসংসার একটি খেলাঘর মাত্র; এই দর্শনের ফলস্বরূপ লোকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, মনোমোহন পুত্রশোকে মোটেই বিহ্বল হইলেন না; সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা সান্ত্বনার জন্য আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেই ব্যস্ত রহিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।

এই সময়ে রামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখিবার সঙ্কল্প করিলে উহার উপাদান সংগ্রহের জন্য মনোমোহনবাবু কামারপুকুরে গমন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের নিকট অনেক তথ্য অবগত হইয়া ঘাটালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রচার প্রধানত মহোৎসব ও নাম-সংকীর্তন অবলম্বনেই চলিতেছিল; ১৮৯২ খ্রিঃ হইতে যোগোদ্যানের যুবকগণ নামকীর্তনসহকারে নগরভ্রমণ আরম্ভ করেন। পরবৎসর ১৯ চৈত্র রামচন্দ্র স্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে বক্তৃতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। এইসকল কার্যে মনোমোহন বিশেষ সহায়তা করিতেন। বক্তৃতাস্থলে যাইবার কালে যোগোদ্যান হইতে রামচন্দ্রের পুরোভাগে সংকীর্তনের যে দল চলিত উহার নেতা হইতেন মনোমোহন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উদ্যমে পরিচালিত সিমলা-পল্লির সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পর্যায়ক্রমে পরমহংসদেবের ভাবধারায় পুষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়লাভের পর এই প্রচারকার্য অধিকতর সহজ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিবার আগ্রহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু সভাসমিতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের অনেকগুলিরই সহিত উদ্যোগী ভক্ত মনোমোহনের সংযোগ ছিল। এই সূত্রে তাঁহাকে কলকাতার বাহিরে ঘাটাল, যশোহর, ঢাকা, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, গয়া, আরা প্রভৃতি স্থানেও যাইতে হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভক্তমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' নবকলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হইলে তিনি উহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

১৮৯৩ হইতে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার গৃহে প্রতিদিন অনেক ভক্তের সমাগম হইত এবং তিনিও অক্লান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেন কিংবা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে সুধীর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, চারুচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের লীলাপার্ষদগণের ভিতর স্বামী অদ্ভুতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ভবনাথ ও মাস্টার মহাশয় তাঁহার গৃহে সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতেন।

তাঁহার শেষ কয় বৎসর বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল পুত্রবৎ প্রতিপালিত তাঁহার ভাগিনেয় সত্যানন্দ ঘোষ দশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিল। তিন-চারি বৎসর পরে তাঁহার বিবাহিতা কন্যা মানিকপ্রভা শ্রীরামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিল। ইহার অল্প পরেই (২৩ মার্চ, ১৯০০) তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রীরামকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল রহিলেন। স্ত্রীর শ্রাদ্ধদিবসে মনোমোহনকে কীর্তনের মাঝে শঙ্খধ্বনিসহকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া একজন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমার মহামায়ার গুরু নিপাত হইয়াছে—আজ আমি বন্ধনমুক্ত।" ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী সুরেশ্বরীর মৃত্যু হয়। তখন তিনি সকলকে জানাইয়া দেন যে, ইহার পরে তাঁহার পালা।

স্ত্রীবিয়োগের পর মনোমোহনবাবু সমস্ত অবসরসময় ধর্মপ্রসঙ্গ ও যোগোদ্যানের কার্যের তত্ত্বাবধানাদিতে কাটাইতেন। অনেক সময় সারা রাত্রি ধ্যানে কাটিয়া যাইত। সকাল নয়টা পর্যন্ত গঙ্গাস্নান ও পূজাদিতে অতিবাহিত হইত। অফিসেও অবসরকালে অনুরাগীদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ চলিত। শনিবারে নিজগৃহে আলোচনা-সভা বসিত এবং রবিবারে যোগোদ্যানে অনুরূপ প্রসঙ্গাদি হইত। শেষ বয়সে তাঁহার বহু দর্শনাদিও হইয়াছিল। কোন সময়ে তিনি সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দেখিয়া আত্মহারা হইতেন, কখনও বা শ্বেতপক্ষীর শ্রেণী পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া নীল আকাশে মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন দেশকালের ঊর্ধ্বে ধাবিত হইত, আবার কোন সময়ে বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে লক্ষ্মীরূপে দর্শন করিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। কাঁকুড়গাছির মন্দির-বেদিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির পশ্চাতে একবার তিনি দেখিলেন, ঠাকুর উঁকি মারিতেছেন। বিশ্বাস না হওয়ায় পুনঃপুনঃ চক্ষু মার্জিত করিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, সেই একই মূর্তি। অমনি তিনি দীর্ঘ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গের পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে-ফিরিতে বহুক্ষণ যাবৎ সেই মূর্তি তাঁহার সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল। একবার

পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে যাইয়া তৎস্থলে ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণরূপী জগন্নাথের জয়!" আর একবার কাঁকুড়গাছির মন্দিরসম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোমোহনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "রামকৃষ্ণ-ভাবের বন্যা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে," আর বলিলেন, "দেখ, এই যে তিনি; তিনি আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন, আর ওষ্ঠদ্বয়ে মধুর হাসি।" অতঃপর প্রায় একঘণ্টা ভাবের ঘোর চলিতে লাগিল—সকলে দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু আরক্তিম, কপোল অশ্রুসিক্ত আর দেহ ঘন ঘন কম্পিত।

কঠিন পরিশ্রম ও হাঁপানিরোগে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দেখিয়া তিনি গৃহে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন—আর উঠিলেন না। ডাক্তারদিগের মতে তাঁহার সন্ন্যাসরোগ হইয়াছিল; কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যোগস্থ ছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ তিন দিন প্রায় অবিরাম তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন। এই তিন দিন ভক্তবর মনোমোহনের মুখে অনুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়াছিল; যখন অধরোষ্ঠ উচ্চারণে অক্ষম হইল তখনও উহা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, অন্তরে জপ চলিতেছে। যখন তাহাও সম্ভব হইল না, তখন অপরের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহ পুলকিত হইল এবং ৩০ জানুয়ারি (১৬ মাঘ, ১৩০৯) তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

# দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ধ্যানলব্ধ সত্যকে গার্হস্থ্য জীবনে রূপপ্রদান করা এক বিষম সমস্যা; অথচ উহা না করিতে পারিলে সাধারণ মানব তাদৃশ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল জনকয়েক ভক্তের মধ্যে ঐ সহজবোধ্য আদর্শ স্থাপন করা। তাই দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণের আকুতি জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে ভূমি হইতে তুলিয়া শচীমাতার ভাবে গান ধরিলেন—

"কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হবি?
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি?
একে বিশ্বরূপের শোকে,
শক্তিশেল রয়েছে বুকে
তুইও কি অভাগী মাকে অকূলে ডুবাবি?"

বলা আবশ্যক যে, দরিদ্র দেবেন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা তখনও জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রের শোক ভুলেন নাই, আর তাঁহার ঘরে আছেন সাধ্বী স্ত্রী।

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ (জানুয়ারি, ১৮৪৪) মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা প্রসন্ননাথ দেবেন্দ্রের জন্মের দুইমাস পরে দেহত্যাগ করেন। মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলের সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যেই দেবেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার অভিভাবক হন। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্র কলকাতায় অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত গতাসু হইলে একবিংশ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রই সংসারভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেবেন্দ্র অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

পিতৃহীন, গৌরবর্ণ, সুদর্শন দেবেন্দ্র শৈশবে সকলের আদরে একটু দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন মাতা তাঁহাকে দৌরাত্ম্যের জন্য শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলে তিনি লম্ফপ্রদানপূর্বক পলায়ন করিলেন; কিন্তু বাম হস্তখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। উহা জোড়া লাগিলেও চিরজীবন একটু বাঁকিয়াই রহিল। পাঠাদিতে তাঁহার মন ছিল না; তবে হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল এবং হিসাব ও দলিলপত্র লেখায় খুব পটুতা জন্মিয়াছিল। সরল দুরন্ত বালক একবার এক গোপবালকের প্ররোচনায় আকাশ ধরিতে ইতস্তত ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে অভিজ্ঞতা চিত্তপটে মুদ্রিত থাকিয়া পরে সঙ্গীতাকারে নির্গত হইয়াছিল—

"সৃষ্টিজোড়া তোমার মায়া, কায়া নয় কেবলই ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা,
ঘুরে সারা চারিধারে।"

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র অধ্যয়নার্থে কলকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর। এখানে আসিয়াও তাঁহার পড়াশুনা অধিক দূর অগ্রসর হইল না; চারি-পাঁচ বৎসর কোনও প্রকারে শিক্ষালয়ে কাটাইয়া তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন।

পুঁথিগত বিদ্যার অবসান হইলেও কাব্যামোদী সুরেন্দ্রের সান্নিধ্যবশত দেবেন্দ্রের সাহিত্যস্পৃহা বর্ধিত হইল। যৌবনারম্ভে সুরেন্দ্র সংসারের তাড়নায় বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও সর্বদা বাণীর আরাধনায় রত থাকিতেন। পরিণত বয়সেও ইংরেজি দর্শন ও ইতিহাস-চর্চায় তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হইত, আর অন্তরের সৌন্দর্য কাব্যরচনায় আত্মপরিচয় দিত। তৎপ্রণীত 'মহিলা', 'সবিতা-সুদর্শন' ইত্যাদি কাব্য তাঁহার উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কবি সুরেন্দ্রের আসরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হইত এবং উভয় সাহিত্যরসিকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যালোচনা চলিত। দেবেন্দ্র পার্শ্বে বসিয়া সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আর একটি গুণ ছিল যোগাভ্যাস। ভ্রাতার দ্বারা অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রও যোগাভ্যাসে তৎপর হইলেন এবং দীর্ঘ সাধনার পর চৌষট্টি প্রকার আসনে তাঁহার অধিকার জন্মিল।

এই সময়ে দেবেন্দ্রের জননী তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে; এমন কি, পুত্র সম্মত নহেন দেখিয়া তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। কাজেই ১২৭৭ বঙ্গাব্দের এক শুভ মুহূর্তে দেবেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। ইহারই আট বৎসর পরে (১২৮৫ সালের ৩ বৈশাখ) সুরেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া একচল্লিশ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রের জীবন তখন সমস্যাময়—অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারের দায়িত্ব তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বহু দিবস অনশন ও অর্ধাশনে কাটাইয়া এবং অযাজনীয়দের গৃহে শ্রাদ্ধের দান পর্যন্ত স্বীকার করিয়া তিনি অবশেষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারি সেরেস্তায় একটি অল্প বেতনের চাকরি পাইলেন। এইরূপ স্থানে অপরেরা উৎকোচ গ্রহণপূর্বক স্বীয় অভাব মেটায়। দেবেন্দ্রবাবু কিন্তু এতটা হীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না; অতএব ঋণ বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিলে তিনি নিজ মনিবকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মনিব দেবেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট চিনিয়াছিলেন; তাই স্বেচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া

ভবিষ্যতে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিলেন। তখনও ব্যয়সঙ্কোচের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, ব্যয়বহুল মহানগরী পরিত্যাগপূর্বক হাওড়া শহরের শালকিয়া অঞ্চলে বাস করিবেন। ঐ স্থান তখন ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ছিল। ফলে তিনি অচিরেই রোগগ্রস্ত হইলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে পুনর্বার কলকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আহিরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনে বাড়িভাড়া লইলেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগাভ্যাস করিতেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একাদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, অপরূপ জ্যোতিদর্শন কিংবা অশ্রুতপূর্ব শব্দশ্রবণ হইত। কখনও শরীর অতি লঘু মনে হইত—যেন ইচ্ছা করিলেই আকাশমার্গে চলিতে পারেন; কখনও বা ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্বিন্দু প্রকাশিত হইয়া বিস্তারলাভপূর্বক সমস্ত গৃহ স্নিগ্ধ আভায় উদ্ভাসিত করিত। কিন্তু এইরূপ উন্নতিসত্ত্বেও মজুমদার মহাশয়ের অভাববোধ বা বিষয়চিন্তা দূরীভূত না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয় নাই। আবার এত চেষ্টাও বিফল হইতেছে দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তবে সৌভাগ্যবশত জন্মগত বিশ্বাস ও সংস্কার তাঁহাকে ঐ পথে অধিক দূর যাইতে না দিয়া বরং অচিরে গভীরতম সাধনায় মগ্ন করিল। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সংস্পর্শ পরিত্যাগপূর্বক তিনি পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরবাড়ির ত্রিতলের এক নির্জন কক্ষে ভগবদ্ধ্যানে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। ঈদৃশ নিভৃত চিন্তার ফলে তাঁহার এই অনুভূতি হইল যে, ভগবদ্দর্শন ভগবানেরই কৃপাসাধ্য; অতএব তিনি লিখিলেন—

কে তোমারে জানতে পারে
তুমি না জানালে পরে?
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত,
খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে। —ইত্যাদি

অতঃপর ঈশ্বরসাক্ষাৎকারে ব্যাকুল দেবেন্দ্রবাবু যেখানে ঐ বিষয়ে সাহায্যলাভের সম্ভাবনা দেখিতেন, সেখানে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আরম্ভ হইল। একদিন মাতুলগৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি বৈঠকখানায় 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিতে' পড়িলেন—একবার অঘোরনাথ ডাকাতের হস্তে পড়িয়াছিলেন, প্রাণনাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাঁহার ভক্তিদর্শনে দস্যুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বিবৃতি পড়িয়া মজুমদার মহাশয় উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নাই? এই যে ভগবান আছেন দেখছি, নইলে

অঘোরনাথকে কে বাঁচালে?" তখনই আপন গৃহে ফিরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, আর ব্যাকুলতার আবেগে কেশ ছিন্ন করিতে করিতে ও দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় কে আছ, দেখা দাও।" তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিল। চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে ছাদে পদচারণকালে অরুণরাগে ঢলমল বালার্ককে উদীয়মান দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নেই? ঐ যে ভগবানের নিদর্শন।" আর মন হইতে স্বতই বাণী উঠিল, "গুরু চাই।"

গুরুর সন্ধানে তিনি প্রথমে কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কালনার স্টিমার সেদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব ক্ষুণ্ণমনে পূর্বপরিচিত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে প্রাপ্ত 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। উহার এক স্থানে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ ছিল। 'পরমহংস রামকৃষ্ণ!'—কথা দুইটির মধ্যে না জানি কি মোহিনী শক্তি লুক্কায়িত ছিল! অজ্ঞাতসারে নবালোকে উদ্বোধিত দেবেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, "পরমহংস তো খুব উচ্চ অবস্থা! ভগবদ্দর্শন নাহলে এমন অবস্থা হয় না। তিনি কি আমার সহায় হবেন?" এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে দৈবক্রমে এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট তিনি পরমহংসের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর বাসায় ফিরিয়াই দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহিরীটোলার ঘাট হইতে অন্যান্য যাত্রিসহ নৌকা পাল তুলিয়া বেগে উত্তরাভিমুখে চলিল।

আবেগভরে সহসা গৃহীত সঙ্কল্পানুসারে দেবেন্দ্র চলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণসন্দর্শনে; কিন্তু ঐরূপ চলা ঠিক হইয়াছে তো? তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন; "হয়তো না আসিলেই ছিল ভাল। কিরূপ সাধু ইনি? নামিয়া পড়াই কি উচিত নয়?" এইরূপ আন্দোলন মনোমধ্যে চলিতেছে, এমন সময়ে নৌকা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। স্পন্দিতহৃদয়ে দেবেন্দ্রবাবু তীরে নামিলেন এবং স্নানরত নিরঞ্জনের নির্দেশ অনুসারে ঠাকুরের কক্ষের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষ তখন শূন্য; কিন্তু অচিরেই ঠাকুর আগমন করিলেন। দেবেন্দ্রের মন বলিয়া দিল, ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া এবং পাদুকা বাহিরে রাখিয়া ঘরে আসিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া পুনঃ প্রণামান্তে মাদুরের উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" দেবেন্দ্র—"কলকাতা থেকে।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান

হইয়া বলিলেন, "কি এমনি দেখতে?" দেবেন্দ্র—"না, আপনাকে দেখতে।" অমনি ঈষৎ ক্রন্দনসুরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "আর আমায় কি দেখবে বল? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না—এই জায়গাটি। দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না? বড় যন্ত্রণা, কি করি?" দেবেন্দ্রবাবু স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, সারবে তো?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞে সেরে যাবে।" সরল বালকের ন্যায় ঠাকুর অমনি সোৎসাহে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন।" দেবেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "এ ঢং নয় তো? কোথায় আমি সাধুদর্শনে এলাম, আর ইনি আমায় সাধু বানিয়ে দিলেন! ইনি যেন আমায় বাক্‌সিদ্ধ পেলেন। কী এর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মানুষে হতে পারে? না, হয়তো এ সমস্ত লোক-দেখানো ঢং।" অনিমেষনেত্রে তিনি ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশে হরিশ সন্দেশ ও জল আনিয়া দেবেন্দ্রকে দিলেন। জলযোগের পর ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলাপ চলিল। পরে ঠাকুরের উপদেশানুসারে তিনি দ্বিপ্রহরে বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, সেদিন আর স্নান করিলেন না। ঠাকুরের মধুর আলাপ ও ততোধিক মধুর ব্যবহারে মজুমদার মহাশয়ের হৃদয় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইল। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর অন্তর্যামিবৎ তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতি ও নিরামিষাহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন, কৌশলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করাইয়াছেন ও সস্নেহে আহারাদি করাইয়াছেন। সাধু সম্বন্ধে তাঁহার এযাবৎ যে সকল ধারণা ছিল, তাহার অনেকটাই বর্তমান ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলেও এখানে এমন একটা দেবদুর্লভ ভাব ছিল যাহা সর্ব কল্পনার অতীত।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া ও দেবালয়াদি দর্শন করিয়া যখন দেবেন্দ্রনাথ পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে আসিলেন, তখন ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক এবং দেহ উত্তপ্ত। ঠাকুরের সমুৎসুক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, তিনি অসুস্থ বোধ করিতেছেন। ইহাতে ঠাকুর বিচলিত হইলেন এবং সমীপাগত বাবুরামকে সঙ্গে দিয়া দেবেন্দ্রকে নৌকাযোগে কলকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলকাতায় আসিয়া টলিতে টলিতে দেবেন্দ্রবাবু এক আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং স্বগৃহে যাইবার জন্য পালকি আনিতে বলিলেন। কিন্তু স্বগৃহে আর যাওয়া হইল না। প্রবল জ্বরে অজ্ঞানপ্রায় ও চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় ঐ গৃহেই তাঁহার একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। রোগযন্ত্রণামধ্যে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় বলিতেন, "ঠাকুরবাড়িতে শৌচ-প্রস্রাব করা ভাল হচ্ছে না।" মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নামোচ্চারণপূর্বক অনুচ্চস্বরে কত কি বলিতেন এবং যেমনই রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চক্ষু উর্ধ্বদিকে ফিরাইতেন, অমনি যেন শিয়রে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন। অথচ আরোগ্যলাভান্তে দক্ষিণেশ্বরের

নামে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, আর তিনি মনকে বুঝাইতেন, "সেখানে গেলে বুঝি তিনি তোমায় চতুর্ভুজ দেখিয়ে দেবেন—না? এই তো গিয়েছিলে—কেমন ভগবান দেখে এলে? বাপ! প্রাণ নিয়ে টানাটানি! তার চেয়ে যা রয় সয় তাই কর না কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিঃসহায় তো নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ করে কর না কেন?" তাহাই হইল—দক্ষিণেশ্বরে তিনি গেলেন না; তবে গায়ত্রী-জপের সময় বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে রাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিন পর এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় বসিয়া দেবেন্দ্রবাবু 'সুলভ সমাচার' পড়িতে পড়িতে দেখিলেন এক স্থানে আছে, "অদ্য বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটিতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন।" পরমহংস-নামের বিমোহিনী শক্তি আবার তাঁহাকে বিচলিত করিল—তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে বলরাম-মন্দিরে উপনীত হইলেন। ঠাকুর তখন কীর্তনানন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছেন। সহসা তিনি সমাধিস্থ হইলে সকলে সাদরে পদধূলি লইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র এযাবৎ আপনাকে পৃথক রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ভাবিলেন, এই তো সুযোগ, এই সময়ে পদধূলি লইলে ঠাকুর লক্ষ করিবেন না—সুতরাং সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ দেখাইতে গিয়া ভক্তসমাজে লজ্জিত হইতেও হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন্দ্রের পৃষ্ঠে হস্তস্থাপনপূর্বক ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো, কেমন আছ? এতদিন ওখানে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।" ধরা পড়িয়া লজ্জাবনতবদনে মজুমদার মহাশয় জানাইলেন, "আজ্ঞে, ভাল আছি। বড় অসুখ করেছিল, তাই যাওয়া ঘটে ওঠে নি।" ঠাকুর পুনরায় সস্নেহে বলিলেন, "এখন থেকে যেও, ওখানে যেও। কেমন, যাবে তো?" "আজ্ঞে, যাব বৈকি" বলিয়া দেবেন্দ্র চুপ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভুলেন নাই, তিনি তাঁহাকে চাহেন। তিনি তদবধি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন।

মজুমদার মহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমার বড় ইচ্ছা আপনার কাছে মন্তর নিই।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কি করব বাপু, আমি তো কাউকে মন্তর দিই না।" ইহাতে দুঃখিত হইলেও দেবেন্দ্র নিরাশ না হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং অবিলম্বে একদিন গঙ্গাস্নানান্তে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং পুষ্প, মাল্য ও একটি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া মন্ত্রগ্রহণোদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া প্রীতিসহকারে ঠাকুর বলিলেন, "বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাও ঠাকুরদের দিয়ে এস।" দেবেন্দ্র জানাইলেন, এই মালা তাঁহারই জন্য; ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার। তুমি আমায়

কি ঠাওরাও?" বাধা-অসহিষ্ণু দেবেন্দ্র অভিমানভরে কহিলেন, "এ দুয়ের মধ্যে একটা মনে করেছি।" অমনি ঠাকুর ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটি নিচ্ছি, বাকিগুলো মায়ের ঘরে দিয়ে এস।" অগত্যা তাহাই হইল। কিন্তু মন্ত্র না পাইলেও তিনি তদবধি কিছুকাল যখন তখন ঠাকুরের দর্শন পাইতে লাগিলেন—পথ চলিতে ঠাকুর তাঁহার অগ্রগামী, গৃহে তিনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান, চলিতে-ফিরিতে সর্বদা তিনি রক্ষাকর্তা।

দক্ষিণেশ্বরে বালক-ভক্তগণকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখিয়া দেবেন্দ্রের মনেও একদা অনুরূপ ইচ্ছার উদয় হইল। সুযোগ পাইয়া তিনি একদিন ঠাকুরের শৌচে গমনকালে গাড়ু-গামছা লইয়া পশ্চাতে চলিলেন। কিছু দূর যাইয়াই ঠাকুর পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলেন এবং জিব কাটিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ! তুমি কেন নিয়ে এসেছ? তোমার সঙ্গে যে আমার ও-ভাব নয়।" অভিমানী মজুমদার মহাশয় ভাবিলেন, "আমি কি এতই হীন যে, গাড়ু-গামছা বইবারও অধিকারী নই?" অগত্যা গাড়ু নামাইয়া অপরাধীর ন্যায় নিম্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং ঠাকুর দূরে চলিয়া গেলে পঞ্চবটীমূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইলেন। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নিস্পন্দ করিল—বৃক্ষলতা, বাটি, গঙ্গা সব অন্তর্হিত, নিজের অস্তিত্বজ্ঞানও নাই। জ্ঞান হইলে দেখিলেন, ঠাকুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "দেখ, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি সকাল বেলা আর সন্ধ্যে বেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো; তা হলেই হবে। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন—বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবে।"

আর একদিন ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি যে এখানে আসছ যাচ্ছ, তা কি বুঝলে? কি হলো?" চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "তা মশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছি না; তবে ধর্মসম্বন্ধে, কি ঈশ্বরসম্বন্ধে জানবার জন্য আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না, আর মনটাও তেমন হাঁকপাক করে না।" ঠাকুর দুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি অনেক করেছ বটে; কিন্তু খাপে খাপে লাগেনি। কি জান? যে ঘরের যে।"

পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া দেবেন্দ্র তদবধি হরিনামজপে মন দিলেন। জপ তখন তাঁহার এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, নিদ্রাবস্থায়ও মুখ হইতে 'হরি হরি' ধ্বনি উঠিত। তখন জমিদারি সেরেস্তার কার্য পরিত্যাগ করায় সময়েরও অভাব ছিল না। অন্যের প্রবেশরহিত গৃহে তিনি আপন সাধনায় মগ্ন থাকিতেন—আহার সেখানেই পৌছাইয়া দিতে হইত। ধ্যানাবস্থায় তখন তাঁহার বিবিধ দর্শন হইত। একদিন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা

ও তিলকভূষিতা কয়েকটি স্ত্রীলোক একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ওরা অবিদ্যার সহচরী—তোমায় প্রণাম করে চলে গেল।" একদিন তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার দেহ পৃথক হইয়া পড়িয়া আছে—তিনি দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছেন। অকস্মাৎ কেমন ভয় হইল, "তবে কি দেহত্যাগ হইল?" অমনি শরীর কম্পিত হইল—তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সাধনার ফলে এই সময়ে তাঁহার দেহে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইত, আর বাহ্য ব্যবহার উন্মাদপ্রায় হইয়াছিল—বিষয়ীর সংস্পর্শ অসহ্য বোধ হইত, আত্মীয়স্বজন কালসর্পবৎ ও গৃহ অন্ধকূপসদৃশ প্রতিভাত হইত। কিন্তু গুরুভ্রাতাদের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হইয়া এমন হইল যে, তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না, কেহ আসিলে বলপূর্বক দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতেন। সব জানিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, ওকে এত দিস না। আহা, ও ছা-পোষা লোক, ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে।" অনন্তর দেবেন্দ্রনাথের মন সহজাবস্থায় ফিরিল; সংসারপালনের জন্য তিনি ভ্রাতৃজামাতা যোগেশপ্রকাশ বাবুর জমিদারিতে কার্য গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর স্বয়ংকৃতার্থ দেবেন্দ্র অপরকেও শ্রীরামকৃষ্ণচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন রামচন্দ্রের গৃহে ঠাকুরকে দর্শনান্তে গমনোদ্যত গিরিশবাবুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাটির এক যুবক তাঁহার প্রেরণায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিল। দেবেন্দ্রেরই টানে তাঁহার মাতুল হরিশচন্দ্র মুস্তাফি এবং বীরভূমবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই কৃপায় অক্ষয় মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষার্থে দেবেন্দ্রবাবু একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বসিবার ছোট চৌকির তোশকের কোণ তুলিয়া উহার তলায় একটি রূপার দু-আনি রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া বারংবার বসিতে চাহেন, কিন্তু বসিতে পারেন না; অগত্যা দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হাঁগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা ছুঁতে পারছি না কেন?" লজ্জায় ম্রিয়মাণ দেবেন্দ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "কি, আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।" কাঞ্চনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর তখনও ভক্তের নিকট কামিনীবিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত দেবেন্দ্রকে তিনি একদিন বলিলেন যে, একজন মহিলার জন্য তাঁহার মন কেমন করিতেছে—অনেক দিন তাঁহাকে দেখেন নাই। তারপর রসগোল্লা আনাইয়া দেবেন্দ্রকে খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলাই উহা দিয়াছেন এবং তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাসেন।

দেবেন্দ্রের সন্দেহ জাগিয়াছিল; তাই অনিচ্ছাক্রমেই ইহা গলাধঃকরণ করিলেন। অবশেষে ঠাকুর গাড়ি করিয়া উক্ত মহিলার গৃহে চলিলে দেবেন্দ্রও আমন্ত্রিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে ঠাকুর নারীমূর্তিদর্শনে "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করেন, আর দেবেন্দ্রের গা টিপিয়া জানাইয়া দেন, "আমি কারো ভাব নষ্ট করি না।" ক্রমে সদলবলে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর একাকী সটান অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্রের সন্দেহ তখন চরমে উঠিয়াছে, আর এদিকে সঙ্গী মাস্টার মহাশয় গান ধরিয়াছেন—

আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে,
গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে,
গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা (ভাব বুঝতে নারলুম রে)।

ইতোমধ্যে ঠাকুরও বাহিরে আসিয়া অসমাপ্ত গানের বাকি অংশ গাহিতে লাগিলেন। একটু পরেই ভিতর হইতে আহ্বান আসায় তিনি জলযোগ করিতে গেলেন। স্বল্প পরেই আহূত হইয়া দেবেন্দ্রাদিও ভিতরে প্রবেশপূর্বক দেখেন এক বৃদ্ধা বাৎসল্যভাবে আপ্লুতা হইয়া সজলনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণপার্শ্বে উপবেশন পূর্বক তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন এবং ঠাকুরও পাঁচ বছরের ছেলের মতো আলুথালু অবস্থায় বসিয়া আছেন। এই প্রকার স্বর্গীয় দৃশ্য-দর্শনে দেবেন্দ্রের সন্দেহাকুল মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল এবং দুষ্ট মনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কিয়ৎক্ষণ জলযোগের কথা ভুলিয়া সেই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র পরে জানিলেন, এই ভক্তিমতী মহিলা যদুবাবুর মাসী।

দেবেন্দ্র এই সময়ে যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, উহার খাতিরে তাঁহাকে বিদেশী পোশাক পরিয়া মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইতে হইত; ঐ বেশেই আদালতের নথিপত্র সহ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিলেন; কারণ তিনি জানিতেন যে, ঠাকুর আদালতের কালিমালিপ্ত দলিলপত্র পছন্দ করেন না। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন এবং তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ওতে কোন দোষ হবে না, তুমি ভিতরে এস।" আর একদিন হঠাৎ গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে অশুচি বস্ত্রেই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্র স্থির করিলেন যে, সেদিন ঠাকুরকে স্পর্শ করিবেন না; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে আপন সন্নিকটে টানিয়া বসাইলেন। আর একদিন গরম মিহিদানা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় স্থানাভাববশত দেবেন্দ্রকে জনৈক দীর্ঘশ্মশ্রু বিধর্মীর নিকট বসিতে হয় এবং সে ব্যক্তি অনর্গল কথা বলিতে থাকিলে দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, বক্তার মুখ হইতে অবিরাম থুৎকারবিন্দু নির্গত হইতেছে। অতএব সন্দেহ জন্মিল যে, হয়তো

মিহিদানা অপবিত্র হইয়াছে। কাজেই দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া উহা এক কোণে রাখিয়া দিলেন। এদিকে ঠাকুর ক্ষুধাবশে খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে উহা দেখিয়া আনন্দসহকারে খাইতে লাগিলেন, ভাবদোষ, স্পর্শদোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন ঠাকুরের এরূপ আচরণদৃষ্টে স্বতই মনে হয়, "সত্যই তো, ভগবানও যদি ভক্তের ভাব না দেখিয়া আচারমাত্র দেখেন, তবে দুর্বল মানুষ দাঁড়ায় কোথায়?"

শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বগৃহে আনিয়া ভক্তগণ আমোদ-আহ্লাদ করেন দেখিয়া দেবেন্দ্রেরও একদিন অনুরূপ ইচ্ছা হইল। তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিলে দেবেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "গাড়িভাড়া যে অনেক লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।" দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তা হোক মশাই, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" বস্তুত সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎসহ আগত ভক্তবৃন্দ দেবেন্দ্রের সেবা ও আতিথ্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। আহারকালে, দেবেন্দ্রের পরিবারবর্গের ভক্তিসন্দর্শনে ঠাকুর বিশেষ প্রীত হইয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, তিনি যেন একদিন সকলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। সপরিবারে দেবেন্দ্র যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রের মাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জননীর ন্যায় সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা দেবেন্দ্রজননীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত আলাপান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা দেবেন্দ্রের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলে দেবেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার পর দেবেন্দ্রবাবু প্রায়ই তথায় যাইতেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। দেরেন্দ্রবাবু যদিও জানাইলেন যে, ইহা ঠাকুরের অনুমোদিত নহে, তথাপি স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইলেন। ইহাতে অন্তরের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে এতই বিভোর করিল যে, তিনি সঙ্গী মাতুলকে জানাইলেন, আর "আমি বাড়ি যাব না।" মামা অবশ্য নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসের সে ঘোর কাটিতে প্রায় একমাস লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভাবে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। একদা গিরিশবাবুর বাড়িতে নারিকেলবৃক্ষের শাখা বায়ুভরে দুলিতেছে দেখিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছচূড়ার কথা মনে পড়ায় তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। জ্ঞান হইলে গিরিশচন্দ্র ভাবুক দেবেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখ, দেবেনবাবু, আমার এখানে ভাবটাব করো না—ওতে আমার বড় ভয় করে।" আর একদিন সশিষ্য

এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, "সসীম মনের দ্বারা অসীম ভগবানের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?" প্রশ্ন শ্রবণে দেবেন্দ্রনাথ মা-কালীর ছবির দিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার জ্ঞানলাভান্তে পণ্ডিতের শিষ্য যখন আবার ঐ প্রশ্নের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন পণ্ডিত কহিলেন, "বাপু, তোমার চেয়ে মূর্খ তো আর দেখিনি। চোখের সামনে দেখলে কি করে মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা হলো—তবু আবার জিজ্ঞাসা করছ?"

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় দেবেন্দ্রকে বড়ই বিব্রত থাকিতে হইত। তাই মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি তথায় ক্যাশিয়ারের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে দিনে জমিদারি সেরেস্তায় এবং রাত্রে থিয়েটারে কাজ চলিতে লাগিল। থিয়েটারের অনুরোধে তাঁহাকে বহু উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর সংস্পর্শে আসিতে হইত; এমন কি, অনেক সময় নটীদিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিতে হইত। ইহার ফলে দেবেন্দ্রের মনে কুচিন্তার উদ্ভব হইয়া ক্রমে উহা আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার আকারে দেখা দিল। অতএব তিনি ১৮৯৫-এর মার্চ মাসে ঐ কার্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তদের নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নাগ মহাশয় বলিলেন, "কাজলের ঘরে কাজ করতে গেলে গায়ে দাগ ল্যাগেই; তা ভয় কিসের? গুরু সঙ্গী আছেন, ধুয়ে নিবেন।" এতদিনে দেবেন্দ্র সত্যকার আশ্বাসবাণী শুনিয়া শান্ত হইলেন। ঠাকুরই তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। পরে তিনি সকলকে বলিতে লাগিলেন, "লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানতে পারলে বুঝতে পারবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্য করলে যে তাকে ভগবানের পথ হতে জন্মের মতো বিচ্যুত হতে হবে তার কোন কারণ নাই। আমি সেই সময়ে কত গর্হিত কাজ করেছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমায় ত্যাগ করেন নি।" জীবনের এই অধ্যায়ের কথা জানিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, একটানা উন্নতিই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান উহাই প্রকৃত মহত্ত্ব।"

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জমিদারির কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্র প্রায় এক বৎসর বেকার ছিলেন; এই সময়মধ্যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পরিবারে অতঃপর রহিলেন তাঁহার সহধর্মিণী ও ভ্রাতৃজায়া। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে চাকরিহীন থাকা অসম্ভব জানিয়া তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন তারিখে ইটালি অঞ্চলের মহেন্দ্রবাবুর জমিদারিতে চাকরি লইলেন; বেতন ধার্য হইল মাসিক ২৫ টাকা। এই কর্মগ্রহণের প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পরে তিনি সপরিবারে ইটালি ৩৩ নং দেব লেনের বাটিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কার্যের অবসরকালে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারবাবুদের পুষ্পোদ্যানে নিভৃতে জপধ্যানে রত থাকিতেন; কখনও বা তিনি কেওড়াতলার শ্মশানে সাধন করিতেন; কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে আপনাকে সাধক বলিয়া পরিচয় দিতেন না, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাও প্রচার করিতেন না; বরং তাঁহার আয়ের তুলনায় পোশাকের পারিপাট্যের আধিক্য দর্শনে লোকে মনে করিত, তিনি ঘোর বিষয়ী ও বিলাসী। ইতোমধ্যে আচার্য বিবেকানন্দের বিজয়লাভের পর কলকাতাবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের অন্বেষণে ফিরিতেছে এবং তাঁহাদের নিকট যে গুপ্তধন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া উহার অংশগ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছে। তাই মজুমদার মহাশয়েরও মনে হইল যে, তিনিও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গে ধন্য হইয়াছেন, তখন শ্রীগুরুর মহিমাখ্যাপন তাঁহারও অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবেই মহেন্দ্রবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উপেন্দ্রবাবুকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। উপেন্দ্র শৈশবে পরমহংসদেবকে কয়েকবার দেখিয়াছিলেন; সুতরাং দেবেন্দ্রবাবুকে পাইয়া সেইসব স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই দেবেন্দ্রের প্রচারকার্যের আরম্ভ। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার বাটির পার্শ্বস্থ দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাঘরে সমাগত লোকদিগকে লইয়া সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তিন-চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

তখনও মজুমদার মহাশয় আচার্যের আসন গ্রহণ করেন নাই; সে সুযোগও শীঘ্রই আসিল। একদিন মহেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রবাবুর বিশেষ অনুরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরের বৈঠকখানায় এক সন্ন্যাসীর মুখে শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে যাইয়া ভাবে এতই বিভোর হইলেন যে, আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া সভামধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিন হইতে ইটালি অঞ্চলে তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে অনেকে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিল।

প্রাগুক্ত ঘটনার অল্প পরে (১৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) দেবেন্দ্রবাবুর সহধর্মিণী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯০৫-এর শেষভাগে ইঁহারও দেহান্ত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্র নামক ঐ অঞ্চলের এক যুবক তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া স্বীয় আবাসবাটি ৪৩নং দেব লেনে কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। নির্দিষ্ট গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি রাখিয়া ভক্তগণ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে সন্ধ্যার সময় মহানন্দে নিয়মিত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের' প্রতিষ্ঠার দিন। এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাবু ভক্তবৃন্দসঙ্গে যোগদানপূর্বক কীর্তন এবং সুমধুর গল্প ও সরস উপদেশাবলীতে

সকলের মন হরণ করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, উপস্থিত ভক্তদের উপযুক্ত সঙ্গীত অতীব বিরল; অতএব সুনিপুণ লেখনি-অবলম্বনে গম্ভীরভাবপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনায় অগ্রসর হইলেন। এইসকল গান পরে 'দেবগীতি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'ইটালির অর্চনালয়' অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। স্বামী সারদানন্দ একসময়ে প্রায় দুই মাস কাল প্রতি শনিবারে সেখানে শাস্ত্রপাঠাদি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও তথায় শুভাগমন হইয়াছিল (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১)। ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীদের এবং গিরিশবাবু ও মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদেরও প্রায়শ আগমন হইত। স্বামী অখণ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমের জন্য দেবেন্দ্রবাবু নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ করিতেন। আর বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল তাঁহার এক অপূর্ব সৌহার্দ্য। গোপীভাবে বিভোর মজুমদার মহাশয়কে স্বামীজী অনেক সময় 'সখী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আর তাঁহার নৃত্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই গান ধরিতেন ঃ

"আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।" ইত্যাদি

অমনি দেবেন্দ্রের পদদ্বয় নৃত্যচঞ্চল হইয়া উঠিত। কিন্তু স্বামীজী অধিক ভাবপ্রবণতা পছন্দ করিতেন না; তাই স্নায়ুমণ্ডলী দৃঢ়করণার্থে তাঁহাকে আমিষাহারের পরামর্শ দিতেন। দেবেন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী হইলেও স্বামীজীর এই কথাকে আদেশরূপে গ্রহণপূর্বক মৎস্যাহার আরম্ভ করেন; কিন্তু মাংসভোজন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে অর্চনালয়ে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব হয়। তদবধি প্রতিবৎসরই উহা হইয়া আসিতেছে। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে অর্চনালয়ের বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাটিটি ভাড়া করা হইলে দেবেন্দ্রবাবু উহাতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই দোলের সময় হইতে সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্র ঠাকুরকে রথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা করিলেন। তদনুসারে সুসজ্জিত বালকদিগকে দেবেন্দ্র-বিরচিত একটি গান শিখাইয়া দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীমা উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া রথপুরোবর্তী নৃত্যপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন—

"এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে!
বেড়াই বলে যেথা সেথা, মা বুঝি তাই কস্‌নে কথা,
শুনি নাই এমন কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র মলে!"

শ্রীশ্রীমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বালকমুখে দেবেন্দ্র স্বীয় আর্তি তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি পূর্বে তাঁহার সম্মুখে ঘোমটা খুলিয়া কথা বলিতেন না; আজ কিন্তু উহার ব্যতিক্রম হইল—তিনি দেবেন্দ্রকে সম্মুখে ডাকাইয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

দেবেন্দ্রবাবুর প্রেরণায় অনেক যুবক ঐ সময়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিরত হইতেন। তাঁহাদেরই মধ্যে শ্রীযুত নফরচন্দ্র কুণ্ডু একদিন ঐ অঞ্চলের ঢাকা নর্দমা-পরিষ্কারে নিযুক্ত মরণাপন্ন দুইটি ধাঙ্গড় বালককে বাঁচাইবার জন্য নর্দমার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; ফলে তাঁহারও মৃত্যু হইল। অতঃপর দেবেন্দ্রবাবু সভাসমিতির সাহায্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইলেন।

শেষ বয়সে মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ১৯০৬-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি পুরীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ১৯০৭ অব্দে তিনি মীরাটে গমন করিলে তাঁহার গুণমুগ্ধ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে হৃষিকেশাদি-দর্শনান্তে পর বৎসর জানুয়ারি মাসে তিনি কলকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ভক্তগণ তাঁহাকে দুর্বল শরীরে পরের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। তদবধি তিনি শুধু ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই রহিলেন। ১৯০৮ অব্দেও তিনি মীরাটে গিয়াছিলেন। সেখানে শীতলচন্দ্র মিত্র নামক এক ভক্তের মাতা পীড়িতা হইলে দরিদ্র শীতলচন্দ্র ভাবিয়া আকুল হইলেন যে, মায়ের সেবা ও চাকরি কিরূপে একসঙ্গে চলিবে। সব শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ সেবাকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শীতপ্রধান স্থানে বারংবার বাহিরে যাতায়াতের ফলে অচিরেই স্বয়ং অসুস্থ হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া, প্রাণসংশয়। যাহা হউক, ভক্তদের যত্নে ও ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া তিনি পর বৎসর মার্চ মাসে কলকাতায় ফিরিলেন।

কলকাতায় স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনিতই হইতে লাগিল। অথচ ভক্তসমাগম ও উপদেশদান বাড়িয়াই চলিল। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি বিভিন্ন সময়ে ভবানীপুর, হেতমপুর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তগণ স্থির করেন যে, অর্চনালয়ের বাটি অস্বাস্থ্যকর; অতএব উপযুক্ত স্থানে বাড়ি ক্রয় করিবেন। বাটি নির্বাচিত হইয়া বায়না পর্যন্ত হইয়া গেল; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, বহু মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত ও তীর্থীভূত বর্তমান বাটি তিনি ত্যাগ করিবেন না। সুতরাং সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল।

ক্রমে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ আসিল। মজুমদার মহাশয়ের বয়ঃক্রম তখন ৬৮ বৎসর।

তাঁহার শরীর তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতেছে, দেহে দুর্বলতা আছে, তদুপরি শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ও সায়েটিকার যন্ত্রণা, অথচ সবল ব্যক্তির ন্যায় তিনি তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভক্তদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এপ্রিল মাসে গুডফ্রাইডের ছুটিতে মহাসমারোহে তাঁহার জীবনের শেষ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবু পূর্বসংস্কারানুযায়ী নৃত্যগীতে পূর্ণোৎসাহে যোগ দিলেন এবং সমাগত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহীদিগকে উৎসবানন্দে মাতাইলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন তিনি থাকিবেন না—ভক্তদিগকে তাহা জানাইয়াও রাখিলেন। অনন্তর ২৭ আশ্বিন, শনিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৪ অক্টোবর, ১৯১১) বেলা ১ টা ৫৫ মিনিটে অশ্রু-পুলক-কম্পমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বাঞ্ছিত লোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

# সুরেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালে যাঁহারা তাঁহার উপদেশমধ্যে একটা শাশ্বত সৌন্দর্য ও অমৃতরসের আস্বাদলাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া সর্বসাধারণের উপকারার্থে উহা প্রকাশপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত সেই অগ্রণীবৃন্দের অন্যতম। আবার গৃহস্থ হইয়াও যাঁহারা অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সরলতা প্রভৃতি সাধূচিত গুণরাশি নিজ জীবনে প্রকটনপূর্বক সেই উপদেশলাভের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, সুরেশবাবু তাঁহাদেরও মধ্যে অতি উচ্চাসনের অধিকারী।

তিনি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অন্তঃপাতী হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', 'সাধকসহচর', 'নারদসূত্র' (বা 'ভক্তিজিজ্ঞাসা'), 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমালোচনা', 'বেদ ও বাইবেল', 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ', 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি পুস্তকের সংগ্রাহক বা রচয়িতারূপে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তকখানি এখনও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে উহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হয়। পরে ১২৯৭ সালে উহা 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে দুই ভাগে পরিবর্ধিতাকারে বাহির হয় এবং ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়; তখন উহার প্রতিখণ্ডে একশতটি উপদেশ ছিল। এই কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্রের অদম্য উৎসাহ ও সহায়তা ছিল এবং তিনিই ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক। প্রতি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গেলে তিনি আরও নূতন উপদেশ-সংযোজনের জন্য সুরেশবাবুকে অনুরোধ করিতেন ও গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত মুদ্রণকার্যে অগ্রসর হইতেন না। ইহার ফলে নূতন সংস্করণপ্রকাশে বিলম্ব হইয়া যাইত। চতুর্থ সংস্করণের সময় অধিক বাধা ঘটিল এই যে, হরমোহনকে ঠাকুর স্বধামে টানিয়া লইলেন। সুতরাং নবকলেবর লইয়া গ্রন্থখানি ১৩১৫ সালের পূর্বে জনসমাজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতঃপর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্রও বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিলেন। বর্তমানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামে ঐ গ্রন্থখানি একখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে পরমহংসদেবের জীবনী ও ৯৫০ টি উপদেশ আছে। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে প্রদত্ত 'প্রকাশকের নিবেদন' পাঠে জানা যায় যে, সুরেশবাবু সমস্ত উপদেশ স্বকর্ণে

না শুনিলেও নির্ভরযোগ্য ভক্তগণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত।

সুরেশবাবু সম্ভবত ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের কোনও একসময়ে নাগ মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ করেন। এই ঘটনা ও নাগ মহাশয়ের সহিত সুরেশের সৌহার্দ্যের কথা আমরা নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুরেশ নাগ মহাশয়কে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া সাকারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন; সুতরাং 'মামার' সহিত তাঁহার প্রায়ই তুমুল তর্ক হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনে আগত সুরেশবাবু মন্দিরের দেবদেবীকে প্রণাম করেন নাই। পরে একাকী বা নাগ মহাশয়ের সহিত তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। সুরেশবাবুর উহাতে বিশ্বাস না থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের মত জানিবার জন্য উভয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সুরেশকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসংস্কারাপন্ন সুরেশ জানাইলেন, "আমার তো মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় রূপে বিশ্বাস নেই।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে; সময়ে তোমার দীক্ষা হবে।"

ইহার পরে যখন তাঁহার মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগিল, তখন তিনি কোয়েটার ইংরেজ সরকারের সমরবিভাগে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে চাকরি করেন। তখন (১৮৮৫ খ্রিঃ) আফগান যুদ্ধ চলিতেছে এবং সরকার ঐজন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্রুত কার্যসম্পাদনের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে হয় বলিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হয়; বহু বিষয়ে তাঁহাদের মঞ্জুরী থাকিলেই আয় ব্যয়াদির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে না। এই সুযোগে অসাধুতাবৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুরেশবাবুর উর্ধ্বতন জনৈক কর্মচারীও এই প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ সুরেশচন্দ্রকে দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। সুরেশবাবু উহা অস্বীকার করিলে কর্মচারী ভয় দেখাইলেন যে, অবাধ্যতাদির অভিযোগ আনিয়া তিনি তাঁহাকে সামরিক আইন অনুযায়ী বন্দি করিবেন অথবা বলপূর্বক স্বকার্য সিদ্ধ করাইবেন। সুরেশবাবু তখন চাকরিত্যাগে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কর্মচারী জানাইলেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। নিরুপায় সুরেশবাবু তখন এক সহৃদয় ইংরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোক তাঁহার সততায়

মুগ্ধ হইয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন যে, সুরেশচন্দ্র সমরবিভাগের কার্যের অনুপযুক্ত। এইরূপে অব্যাহতি পাইলেও তাঁহার স্থলে নূতন লোক না আসা পর্যন্ত আরও কিছুদিন তাঁহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

মুক্তি পাইয়া সুরেশচন্দ্র কলকাতায় চলিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বল তখন মাত্র কুড়ি টাকা। কাশীতে পৌঁছিবার পরেই ঐ সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি অতঃপর পদব্রজে কলকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তিনি অযাচিত অন্নে উদরপূর্তি করিতেন এবং বিশ্রামস্থলে পথের সহায় 'গীতা'খানি খুলিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইভাবে ভাগলপুরে উপনীত হইলে জনৈক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে কলকাতা অবধি একখানি টিকেট কিনিয়া দিলেন। বাড়িতে যখন তিনি আসিলেন তখন তিনি নিঃস্ব, আর ভ্রাতার মাসিক আয় মাত্র পঁচিশ টাকা। সুরেশবাবুর পোষ্য তখন তাঁহার স্ত্রী এবং একটি কন্যা। ইঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি কুলি সাজিয়া কলকাতার রাস্তায় আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে আলু ফেরি করিয়া দৈনিক সাত-আট আনা গৃহে আনিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি মাসিক ষাট টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইলেন। ঈশ্বরভাবে ভাবিত অনাড়ম্বর জীবনেই তিনি আনন্দ পাইতেন; অতএব অল্প আয়ই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। স্বল্পে তুষ্ট থাকিয়া তিনি ধর্মকর্মে অধিকতর মন দিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে আছেন। অতএব সুরেশের মনে এখন দীক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি উহার সম্ভাবনা দেখিলেন না। বস্তুত তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই ঠাকুর স্বধামে প্রয়াণ করিলেন।

সুরেশের অন্তর তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। নিশীথে তিনি ভাগীরথী-তীরে যাইয়া ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, অথবা একাকী কাঁদিয়া বুক ভাসান। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিরাকারবাদী হইলেও ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনাদি করিতেন। অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নাগ মহাশয়ের পূত সঙ্গে সাকারোপাসনা ও দীক্ষাদির প্রয়োজনবোধ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হওয়ায় পূর্বসঞ্চিত ভক্তিসংস্কার ঐ নবভাবগুলিকে অচিরে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। এইরূপ অশান্তচিত্তে শয়ন করিয়া এক রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন, পরমহংসদেব গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কি হইতেছে বুঝিবার পূর্বেই বিস্মিত সুরেশচন্দ্রকে অধিকমাত্রায় বিস্মিত করিয়া ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষা দিলেন। শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সুরেশবাবু অবনতমস্তকে প্রণামান্তে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে

উদ্যত হইলেন; কিন্তু ঠাকুরকে আর দেখিতে পাইলেন না। ভোরের স্বপ্ন, বিশেষত দেবস্বপ্ন মিথ্যা হয় না; অতএব তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটলীলা সমাপ্ত হইলেও তাঁহার নিত্যলীলার আরম্ভ মাত্র; কারণ তিনি যুগাবতার। ইহার পর লব্ধমন্ত্রাবলম্বনে তিনি সাধনায় অধিকতর মগ্ন হইলেন।

সুরেশবাবুর পরবর্তী জীবনও লোভশূন্যতা ও ভক্তিপরায়ণতায় ভরপুর। স্বাধীনচেতা তাঁহাকে প্রায়ই সততা রক্ষার জন্য বেকার সাজিতে হইত; একবার কলকাতায় ঐরূপ কর্মবিহীন অবস্থার কালে লিপ্‌টন কোম্পানি ঘোষণা করেন যে, চায়ের সম্বন্ধে যিনি ইংরেজিতে সর্বোত্তম প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সুরেশবাবু যে প্রবন্ধ লিখিলেন লণ্ডনের বড় সাহেব উহাকে সর্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ২৫০ টাকা বেতনে চাকরিতে ভর্তি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি চাকরি পাইলেন। কিন্তু কলকাতার এক সাহেব চায়ের মিশ্রণে অসাধুতার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভের পর একদিন মঠে ঠাকুরকে ভোগ দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, কলকাতা হইতে জিনিসপত্র আনিয়া সময়মত ভোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুরেশবাবু এই সংবাদ পাইয়া শরৎবাবুকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। পরদিন ভোররাত্রি চারিটার সময় শরৎবাবুকে লইয়া তিনি নূতন বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচিত লোকদের নিকট হইতে সমস্ত সংগ্রহান্তে প্রত্যুষে শরৎবাবুকে একখানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠে পাঠাইয়া দিলেন। সুরেশবাবুকে গাড়িতে উঠিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "না হে, আমি দই হাতে করে হেঁটে যাব; না হলে গাড়ির ঝাঁকুনিতে চলকাবে। ঠাকুরের ভোগে লাগবে কিনা!" সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবুকে মঠে উপস্থিত এবং ঠাকুর যেসব জিনিস পছন্দ করিতেন সেই সবই আসিয়াছে দেখিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই তোর কাজ নয়। কে বাজার করেছে বল তো?" শরৎবাবু সুরেশবাবুর নাম করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তাঁকে আনলি না যে?" শরৎবাবু কারণ বলিলে স্বামীজীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল, আর তিনি আবেগভরে বলিলেন, "দেখলি, ঠাকুর যাদের ছুঁয়েছেন, তারা সোনা হয়ে গেছে।"

সুরেশবাবুর এই গুণাবলী লক্ষ্য করিয়াই ১৩১৯ সালের পৌষ মাসের 'উদ্বোধনে' লিখিত হইয়াছে—"সাধু দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় পঠদ্দশা হইতে সুরেশবাবুকে প্রিয় সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্যন্ত বিশেষভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকটে সুরেশবাবুর

সম্বন্ধে একসময় বলিয়াছিলেন যে, নিজ চরিত্র একেবারে সাদা (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি সুরেশের ন্যায় বিরল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও সুরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় সর্বদা প্রদান করিয়াছেন।...শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সঙ্গগুণে সুরেশবাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও সাধনানুরাগ উত্তরকালে এত পরিবর্ধিত হইয়া উঠে যে, তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গের জন্য কয়েক মাসের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারের সকল কার্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। চাকরি নাই, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়বর্গ নিরন্তর তাড়না করিতেছে; অথচ হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন—এরূপভাবে কাল কাটাইতেও আমরা সুরেশবাবুকে অনেক দিন দেখিয়াছি। ...ঈশ্বরে নির্ভরশীল কর্মদক্ষ সুরেশবাবু ঈশ্বরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার জন্য অনেকবার স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন; পরে ঐ কালের অবসানে পরিবারবর্গের অভাব দেখিয়া পুনরায় স্বল্পদিনেই অন্য চাকরি জুটাইয়া লইয়াছেন। ঐরূপে মোটা ভাত-কাপড়মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কাম-কাঞ্চনময় সংসারের সাদরাহ্বান সর্বদা উপেক্ষা করিয়া এই গৃহী-উদাসীন নিজ জীবনের গতি সর্বদা ঈশ্বরাভিমুখে রাখিয়াছিলেন। লোকনয়নের অন্তরালে অনুষ্ঠিত তাঁহার এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন সাধনানুরাগ আজ সফলীকৃত হইয়া তাঁহাকে দিব্যধামে পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাস-সমন্বিত নিষ্কাম কর্মজীবনের একটি জ্বলন্ত ছবি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের জন্য ইহলোকে রাখিয়া দিয়া আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছে।”

# অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হলধর সেন এবং মাতার নাম বিধুমুখী। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় ইন্দাসের নিকটবর্তী রোলগোপালনগরে। এই পত্নী পনেরো বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুধীষ্ঠা গ্রামে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পক্ষে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। 'পুঁথি'-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনকে শ্যামপুকুরে 'শাঁকচুন্নী মাস্টার' আখ্যা দেন—

"জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্যবিদিত হৈনু শাঁকচুন্নী নামে ॥"

তাঁহার বর্ণ ছিল ঘনকৃষ্ণ এবং শরীর রুগ্‌ণ ও মধ্যমাকৃতি—সমস্ত মিলিয়া প্রায় কদাকার বলিলেই হয়। স্বামীজী সম্ভবত এইজন্যই রহস্যপূর্বক তাঁহাকে এই নাম দিয়াছিলেন। কলকাতায় ঠাকুরদের বাড়িতে বালকদিগকে পড়াইতেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ছিল 'অক্ষয় মাস্টার'। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' রচনা করিয়া ইনি অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়াছেন। এই 'পুঁথি'র প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ ছিলেন—"তাঁর কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! ...আমি তাঁর পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব! ...আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোরে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি, ভাই! ...শাঁকচুন্নী বাঙলার জনসাধারণের ভাবী বার্তাবহ।"

অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরের অনুগ্রহ ব্যতীত সহসা তাঁহার সন্নিধানে যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না। তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাটিতে তিনি কার্যোপলক্ষ্যে বাস করিতেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও তথায় নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবু স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে মধ্যস্থ ধরিয়া তিনি শ্রীপ্রভুর দর্শন পাইবেন; তাই তিনি মজুমদার মহাশয়ের অনুগ্রহলাভের জন্য তামাক সাজিয়া ও অন্যভাবে তাঁহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে থাকিলেন। অবশেষে মহিম চক্রবর্তী মহাশয় একদিন কাশীপুরে স্বগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ উপলক্ষ্যে 'ঘটা ছটা' সহকারে মহোৎসবের আয়োজন করিলেন এবং ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে শ্রীযুত দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ গাড়িতে

চড়িয়া তথায় যাইতে উদ্যত হইলে অক্ষয়বাবুও সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পরে যথাস্থানে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রাদির সহিত তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে প্রণতি জানাইয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপ্রভু তাঁহার কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সেই—

"করুণ কটাক্ষপাতে জানি না কি আছে তাতে
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্তি নয়নদ্বারে প্রবেশি হৃদয়পুরে,
হৃদয় করিল অধিকার ॥...
আপনে আপন-হারা বহিল নূতন-ধারা
সেই দেহে হইনু নূতন।...
কিছুই না পাই খুঁজে যেন কোন নবরাজ্যে
স্বপনে হয়েছি আগুয়ান ॥"

—'পুঁথি', ৩৯৭ পৃঃ

শ্রীপ্রভুর লীলাসন্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া অক্ষয়কুমার সেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং অতঃপর পুনঃপুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে যাইতে লাগিলেন। মজুমদার মহাশয়ের কৃপায় এই দর্শনলাভ হইল বলিয়া এখন হইতে অক্ষয়বাবু তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই পারমর্শে তিনি 'পুঁথি'-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ কার্যে তাঁহার সাহায্যও পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বোক্তিতে আছে—

"প্রথমত গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হইল প্রভুদরশন ॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥" —'পুঁথি', ৬২৬

কাশীপুরে 'কল্পতরু'-দিবসে সৌভাগ্যক্রমে অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কয়েকজন তখন গাছের ডালে বানর-বানর খেলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিকে আসিলে ঝটিতি বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অক্ষয়কুমার দুইটি চম্পক পুষ্প হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর যেমন পথের উপর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন,

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে ॥"

তারপর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া ঠাকুর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক "তোমাদের চৈতন্য

হোক” বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। ‘কথামৃত’-পাঠে (৩।১৩।৪; অখণ্ড সং, পৃঃ ৭৯২) যদিও জানা যায় যে, দেবেন্দ্রের গৃহে অক্ষয়বাবু শ্রীপ্রভুর পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তগোষ্ঠীতে ইহা বিদিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহাকে ঐ ভাবে শ্রীঅঙ্গস্পর্শের অধিকার সাধারণত দিতেন না; বলিতেন, “মনের ময়লা কাটুক, তারপর হবে।” আলোচ্য দিবসে কল্পতরু-লীলাবসানে ঠাকুর যখন ঘরে ফিরিতেছিলেন, তখন অক্ষয়বাবুকে দূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া—

“দূর থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে ॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে ॥” —‘পুঁথি’, ৬০৭

সে অপ্রত্যাশিত, সুদুর্লভ ও সপ্রেম স্পর্শের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অক্ষয় মাস্টার মহাশয়ের দেহ বাঁকিয়া-চুরিয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে-রাত্রে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়, সেরাত্রে অক্ষয়কুমার নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞামত প্রভুর সেবার জন্য কাশীপুরে ছিলেন। অধিক রাত্রে ঠাকুর লীলাসংবরণে উদ্যত হওয়ায় তিনি কলকাতায় গমনপূর্বক গিরিশচন্দ্র ও রামবাবুকে ডাকিয়া আনেন। এইরূপে শেষ দিনেও শ্রীপ্রভুর সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার পাইয়া অক্ষয় মাস্টার মহাশয় চিরকৃতার্থ হইলেন।

‘পুঁথি’,-রচনাসম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন (৬২৫-৬ পৃঃ) যে, গ্রন্থারম্ভ হইলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বরাহনগর মঠে আহ্বানপূর্বক বাল্যলীলা শ্রবণানন্তর সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, গ্রন্থ বৃহৎকলেবর হইবে। অধিকন্তু এই শুভকার্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভাশীর্বাদ আবশ্যক বোধ করিয়া তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা ও কবির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। মা তখন বেলুড়ে ছিলেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন, ‘পুঁথি’ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে। স্বামীজীর কৃপায় মায়ের শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত ঠাকুরের লীলালোচনা করিতে লাগিলেন। বিশেষত একবার কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে শ্রীমা ঠাকুরের সময়কার সমস্ত গ্রামবাসীকে আহ্বানপূর্বক অক্ষয়ের দ্বারা ‘পুঁথি’ পড়াইয়া শুনাইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া সাফল্যকামনা করিলেন। এতদ্ব্যতীত পুস্তক-রচনায় দেবেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, যোগানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট উপাদানাদি পাইয়াছেন বলিয়া কবি স্বীয় গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

পরিণত বয়সে তিনি ‘বসুমতী’ অফিসে কাজ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় ঐ কাজ

ছাড়িয়া স্বগ্রামে চলিয়া যান এবং অবশিষ্ট জীবন প্রায় সেখানেই অতিবাহিত করেন। কেবল একবার ডাক্তার উমেশবাবু এবং আরও দুই-তিনজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে ভক্তদের বাড়িতে সাত-আটমাস কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের এই সকল ভক্ত ছাড়া মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, দ্বারভাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মাঝে মাঝে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন।

দেশের বাড়িতে থাকাকালে তিনি সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে মন না দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মননেই দিন কাটাইতেন। প্রাতে উঠিয়া নিজহাতে ঠাকুরের বাসন মাজিতেন ও ফুল তুলিতেন। তারপর একতারা বাজাইয়া নামগান করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার স্বর বেশ মিষ্ট ছিল। ইহার পরে তিনি স্নান করিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেন এবং পূজা হইয়া গেলে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিতেন অথবা কিছু লিখিতেন। তখনও তাঁহার চক্ষের জ্যোতি অব্যাহত ছিল—চশমার প্রয়োজন হইত না। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা ঠাকুরঘরে বসিয়া তিনি ঠাকুর ও মাকে বাতাস করিতেন। শেষ বয়সে তিনি হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন; তাই দুর্বল শরীরে এত কাজ করা সম্ভব হইত না বলিয়া পূজার পূর্বে চা পান করিতেন। দেহত্যাগের তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহাকে পূজার কাজে বিদায় লইতে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের অগাধ ভক্তি ছিল। 'পুঁথি'তে তিনি তাঁহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন—

"জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥"

শ্রীশ্রীমা দেশে থাকিলে অক্ষয়কুমার ছোট একখানি কাপড় পরিয়া, দীর্ঘ যষ্টি হস্তে লইয়া, নানাবিধ দ্রব্য স্বমস্তকে বহন করিয়া, খালি পায়ে হাঁটিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে পড়িয়া বৃদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশান্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করিতেন। শ্রীশ্রীমাও তখন তাঁহাকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিতেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হাঁপানিতে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন; সঙ্গে পারিবারিক অশান্তিও ছিল। ঐ সময়ে একজন যুবক তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রীমা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার শেষ বয়সে একটু ভোগ আছে।' সেই একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙ্গুলটা আর একটু লম্বা করে দেখাতেন, তবে এ শরীরে আর সহ্য হত না।" দেহত্যাগের চারি দিন পূর্বে তাঁহার সামান্য জ্বর ও রক্ত-আমাশয় হইয়াছিল। চতুর্থ দিন (১৩৩০ সালের

২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৩ শুক্রবার) প্রাতে বেলা নয়টার সময় তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্ছিত লোকে চলিয়া যান। ঐ সময়ে তাঁহার ছোট ভাই তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণনাম শুনাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা চুপ কর, আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি।" চরম মুহূর্তে দেখা গেল, তাঁহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত, আর আনন্দে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। এই বিমল আনন্দের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

# নবগোপাল ঘোষ

শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কলকাতায় বাদুড়বাগানে বাস করিতেন এবং হেণ্ডারসন কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক তিন শতাধিক টাকা পাইতেন। তিনি বড়ই ভক্তিমান, উদার ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ভজন-কীর্তনাদিতে তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহার বর্ণ শ্যাম এবং চেহারা দোহারা, মুখ সদা হাস্যময় এবং স্বাস্থ্য উত্তম ছিল। দুইবার বিপত্নীক হইবার পর তৃতীয়বার যে তিনি ভাগ্যবতীকে গৃহের লক্ষ্মীরূপে পাইলেন, তিনি নিজে যেমন ভক্তিমতী, পরিবারের সকলের মধ্যেও তেমনি অচলা ভক্তির সঞ্চারপূর্বক উহাকে একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। কুলীন কায়স্থ নবগোপালবাবু পদমর্যাদা ও সদাশয়তার জন্য পল্লিবাসীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

নবগোপালবাবু প্রথম যেদিন সন্তানবৃন্দ ও পত্নীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণপদতলে উপস্থিত হন, সেদিন নাম ধাম ও কুশলপ্রশ্নাদি ব্যতীত বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। তবে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, তিনি যেন নিত্য কীর্তন করেন। তদনুসারে তিনি প্রত্যহ পরিবারের বালকবালিকাদিগকে লইয়া খোল-করতালসহ কীর্তন করিতেন। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইলেও নবগোপালের আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই একদিন ভক্ত কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ হে, তোমার সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে যে একজন এসেছিল—বাদুড়বাগানে বাড়ি, অফিসে বড় কাজ করে, আর গরিবদের বিনামূল্যে ঔষধ দেয়—সে কোথায়? তার সঙ্গে দেখা হলে অন্তত একবার আসতে বলো তো।" কিশোরীর মুখে সে সংবাদ পাইয়া নবগোপালের আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি ভাবিলেন, "ইনি সর্বজনসম্মানিত অবতাররূপে পূজিত হইয়াও আমার ন্যায় দীন ব্যক্তিকে এই দীর্ঘকাল স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।" সে অহেতুক দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। পরের রবিবারে সন্তানবৃন্দসহ সপত্নীক নবগোপাল প্রভুদর্শনে চলিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পাইয়া এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নবগোপাল জানাইলেন যে, তাঁহার উপদেশানুযায়ী এই তিন বৎসর নামকীর্তনে কাটিয়াছে। ঠাকুর সব শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে আর বৈধী সাধনামাত্রের

মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। বার তিনেক শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে গমনাগমন করিলেই তিনি ভক্তির উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবেন।

এই মিলনের প্রভাব নবগোপালবাবুর জীবনে এমন এক আমূল আলোড়ন আনিয়া দিল, যাহার ফলে ইহার পরে তিনি সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং সুযোগ পাইলেই স্ত্রীপুত্রাদিসহ পুনঃপুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। রত্নগর্ভা নবগোপালপত্নীর প্রথম পুত্র সুরেশের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র। জন্মাবধি তাহার এমনই তালবোধ ছিল যে, অল্পবয়সেই কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজাইতে পারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিশুটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।[১]

তখন প্রায় প্রতি রবিবারে কোন-না-কোন ভক্তের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব হইত। নবগোপালবাবুর মনেও একদিন মহোৎসব করিবার বাসনা জাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতিলাভান্তে যথাবিধি আয়োজন হইল এবং ভক্তবর্গ নবগোপালবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে আগমনপূর্বক ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ হইলে পাঠ বন্ধ হইল। পরে বনোয়ারী নামক একজন বৈষ্ণব আপনার দল লইয়া প্রাঙ্গণে পদাবলীকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিলেন; কীর্তনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সিংহবিক্রমে কীর্তনমধ্যে আসিয়া ত্রিভঙ্গমুরলীধারী হইয়া মহাভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু পূর্ব হইতেই সুগন্ধি ফুলের বড় গোড়ে মালা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন উহা ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন—মালা লম্বিত হইয়া চরণ স্পর্শ করিল। ভক্তেরা যে যেখানে ছিলেন ক্রমে সেখানে সমবেত হইয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভাব হইল। ঠাকুরের দেহেও তখন ভাব, মহাভাবের উদ্দাম লীলা চলিতেছে। সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি আসনগ্রহণ করিলেন এবং নবগোপাল সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার ভুবনমোহন রূপসুধা পান করিতে থাকিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, ঠাকুরের লীলাদেহে যেন চাঁদের কিরণ খেলিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ভাবিলেন, ইহা হয়তো দৃষ্টির বিভ্রম; তাই অপর সকলের প্রতি নয়নপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরও বদন তুল্যরূপ সমুজ্জ্বল কিনা। কিন্তু সেরূপ জ্যোতি কোথাও ছিল না। তিনি মধ্যম ভ্রাতা জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ প্রভুর চেহারার বিশেষ কিছু দেখছ কি?" ভ্রাতা উত্তর দিলেন, "না। অন্য দিনের মতো সাফই দেখছি।" নবগোপাল তখনও জ্যোতি দেখিতেছেন; অথচ সন্দেহ দূর হইতেছে না। তাই তিনি শীতল জলে নয়নদ্বয়

---

১ নবগোপালবাবুর অন্যতম পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করেন

ধৌত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তখনও দেখেন, প্রভুর মুখমণ্ডলে পূর্বেরই মতো দীপ্তি রহিয়াছে। অবশেষে তাঁহার সংশয় বিনষ্ট হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কেবল তাঁহারই প্রতি শ্রীপ্রভুর বিশেষ কৃপা।

এদিকে ভক্তিমতী ঘোষগৃহিণী দ্বিতলে ভোজনের সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রতিবেশিনীদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাই ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়া উপরে চলিলেন। তথায় মহিলাগণ প্রণাম করিতে থাকিলে ঠাকুর পদযুগল সঙ্কুচিত করিলেন এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গৃহিণীর কিন্তু প্রাণের ইচ্ছা যে, তিনি চরণধূলি গ্রহণ করেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুমতি দিলেন। নবগোপাল-পত্নী মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াইবেন। ঠাকুর এমনি প্রশ্ন করিলেন, "কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি?"—এই বলিয়া একটু স্থির হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দে।" ঘোষজায়া ঠাকুরের মুখকমলে মিষ্টান্ন দিতে যাইয়া দেখেন, যেন তাঁহার ভিতর হইতে কি একটা বস্তু 'আঁক' করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া উহা গ্রহণ করিতেছে। দর্শনমাত্র মিষ্টান্ন শ্রীমুখে প্রদান করিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে নিরস্ত হইলেন। অতঃপর ঠাকুর স্বাভাবিকভাবে কিঞ্চিৎভক্ষণান্তে তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন। অপর সকলের পূর্বে তাঁহার উহা গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও ঠাকুরের আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকারপূর্বক সমস্ত প্রসাদ নিচে পাঠাইয়া দিলেন। প্রসাদ ও তৎসহ উপরের লীলার সংবাদ নিচে পৌঁছিবামাত্র সেখানে মহা রোল উঠিল—সকলে সাগ্রহে প্রসাদ লুটিয়া লইতে লাগিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া ঠাকুর ঘোষগৃহিণীকে বলিলেন, এই জন্যেই তিনি তাঁহাকে তখনই লইতে বলিয়াছিলেন। অবশেষে ঠাকুর নিম্নে অবতরণ করিলে আরও কীর্তন হইল। তাহার পর ভোজনান্তে সেদিনের মহোৎসব সমাপ্ত হইল।

একবার নবগোপালবাবু ৺গঙ্গাপূজার দিনে পান্‌সি ভাড়া করিয়া গিরিশবাবু প্রভৃতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। পথে, গঙ্গাস্নান করিবেন কিনা, এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিচার উঠিল। গঙ্গার ঘাটে তখন খুব ভিড় এবং বৃষ্টিও হইতেছে, অতএব স্নানে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইল না। অধিকন্তু তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঠাকুরকে দর্শন করিলেই গঙ্গাস্নানের পুণ্য হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "সে কি গো—তোমরা নাইবে না? আজ দশহরা—আজকে গঙ্গাস্নান করতে হয়।" অগত্যা সকলেই গঙ্গাস্নান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে বিরাজ করিতেছিলেন, সম্ভবত ঐ কালে একটি বিড়াল শাবকসহ তাঁহার নিকট আশ্রয় লইলে তিনি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন। এমন সময়

একদিন ঘোষপত্নী তথায় আসিলে ঠাকুর সঙ্কোচপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমায় একটা কথা বলব? দেখ, আমার এখানে একটা বেড়াল আছে; তার আবার কতকগুলি বাচ্চা হয়েছে। এখানে মাছ নেই, দুধ নেই; তাহাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বাপু, তোমায় যদি দিই, তুমি নিয়ে যাবে কি? তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?" ঘোষজায়া বলিলেন, "এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! আমি সাধারণত বেড়াল ভালবাসি। আর আপনি দিচ্ছেন—এ আমার প্রতি আপনার কত অনুগ্রহ!" ঠাকুর আরও জানিয়া লইলেন যে, ইহাতে বাড়ির কর্তাদের অমত হইবে কিনা। সব জানিয়া যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন ঘোষগৃহিণীকে উহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং তিনিও সানন্দে তাহাই করিলেন। ঠাকুরের দান জানিয়া তিনি ইহাদিগকে সযত্নে পালন করিতেন এবং কাহাকেও প্রহারাদি করিতে দিতেন না।

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন (১ জানুয়ারি, ১৮৮৬), সেদিন অপর অনেকের[১] সহিত নবগোপালবাবুও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। ঐদিন কৃপামুগ্ধ রামবাবু নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন—ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" শুনিয়া নবগোপাল দ্রুতবেগে যথাস্থানে গমনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "প্রভু, আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "একটু ধ্যান-জপ করতে পারবে?" নবগোপাল উত্তর দিলেন, "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ইহাতে ঠাকুর পুনর্বার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তা একটু-একটু জপ করতে পারবে না?" উত্তর—"তারই বা অবসর কোথায়?" আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" উত্তর—"তা খুব পারব।" ঠাকুর তখন কহিলেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

নবগোপালের বয়স তখন পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পর তিনি যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণনামে মগ্ন থকিতেন। তাঁহার অফিস হইতে ফিরিবার সময় একজন ভৃত্য বাতাসা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত বালক-বালিকারা উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে থাকিলে

---

১ শ্রীমৎ 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই কয়েকটি নাম স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন—গিরিশ, অতুল, রাম, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, মাস্টার (?) (২য় ভাগ, দিব্যভাব, ২০১)। শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তে' (১৪৬ পৃঃ) অক্ষয়, নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, গাঙ্গুলি ইত্যাদি এবং হরমোহন মিত্রের উল্লেখ আছে। "তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'তোমার আজ থাক'।"

তাহাদিগকে বাতাসা দেওয়া হইত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ এইরূপ করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার নাম দিয়াছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'। ঐ নামে তিনি পল্লিতে সুপরিচিত ছিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই ছেলেমেয়েরা বলিয়া উঠিত 'জয় রামকৃষ্ণ আসছে রে', আর বাতাসাদির জন্য রাস্তায় নামিয়া পড়িত।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন নবগোপালবাবু তাঁহার পুত্র নীরদের সহিত বৃন্দাবনে যান। ইঁহারা কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন এবং অন্য কুঞ্জে প্রসাদ পাইতেন। ইঁহারা ফিরিবার সময় ব্রহ্মানন্দজীর সহিত প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচল হইয়া আসেন। বিন্ধ্যাচলে তাঁহারা যে বাটিতে উঠিলেন, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ের ভক্ত শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাস করিতেন। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, মাত্র তিন রাত্রি তথায় থাকেন; কিন্তু সেন মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাদিগকে পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন থাকিতে হইয়াছিল।

নবগোপালবাবু জীবনসন্ধ্যায় বাদুড়বাগানের বাটি ত্যাগ করিয়া হাওড়ার অন্তঃপাতী রামকৃষ্ণপুরে একটি বাড়িতে চলিয়া আসেন। ঠাকুরের নামের সহিত সাদৃশ্যবশত নবগোপালবাবুর নিকট রামকৃষ্ণপুর নামের একটা আকর্ষণ ছিল। ঐ আকর্ষণের ফলেই তিনি ঐ বাড়ি কিনিলেন এবং উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্য একটা নূতন অংশ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আমন্ত্রণে ১৩০৪ সালের মাঘী পূর্ণিমায় (২৫ মাঘ) নৌকাযোগে বেলুড় হইতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে "দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে"—এই গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে কীর্তনসহ অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে ৮১নং রামকৃষ্ণপুর লেনের নূতন কক্ষে পদার্পণ করিলেন। সেখানে স্বহস্তে ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং পূজা করিলেন। পরে নীরাজনান্তে পূজাগৃহে বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়া দিলেন—

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥"

ঐ দিনের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গৃহিণী ঠাকুরাণী যখন স্বামীজীর নিকট নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলেন, তখন স্বামীজী রহস্যসহকারে বলিলেন, "তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেলমোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি। ...এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন!" যাহা হউক ঐ বাড়িতে আজও ঠাকুরের নিয়মিত পূজা হইয়া থাকে। ঐ দিনের স্মরণে বহুকাল যাবৎ ঘোষভবনে প্রতি বৎসর উৎসব ও সাধুভক্তের সমাগম হইত।

নবগোপালবাবু যেমন অতি ভক্তিমান ছিলেন, তাঁহার সহধর্মিণীও তেমনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না ছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বৃন্দাবনে ৺রাধারমণ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন—যেন নবগোপালবাবুর স্ত্রী ৺রাধারমণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। ফিরিয়া তিনি যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, "যোগেন নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এই রকম দেখলুম।"

অসুখের সময় অনেক সাধুই ঘোষ-জায়ার মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্পর্শে মুগ্ধ হইতেন। অসুস্থ সাধুকে তিনি স্বগৃহে রাখিয়া ঔষধ, পথ্য ও সেবাদির দ্বারা অচিরে নিরাময় করিতেন।[১]

রামকৃষ্ণপুরে আসা অবধি নবগোপালবাবু প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে কীর্তন করিয়া বাড়ি ফিরিতেন এবং যাহাকে পাইতেন বলিতেন, "বল, জয় রামকৃষ্ণ" এবং নিজেও "জয় রামকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিয়া দোকান হইতে সংগৃহীত বাতাসা বিলাইয়া দিতেন। পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসিয়া রোগীদিগকে ঔষধ দিতেন এবং সামর্থ্যহীনদিগের পথ্যেরও ব্যবস্থা করিতেন। তিনি প্রতিবেশীদের লইয়া নিত্য ভজন করিতেন এবং ঠাকুরের মহিমা, বাণী ও ভাবধারা প্রচার করিয়া সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতি জাগাইতেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ডাক্তার রামলাল ঘোষ, নগেন্দ্র ঘোষ, হারাণবাবু প্রভৃতি অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ নবগোপালবাবুর মন হইতে জাগতিক আকর্ষণ কতটা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার এক বিবাহিতা কন্যার মৃত্যুকালে পাওয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে সকলেই যখন শোকে মুহ্যমান, তখন সদাপ্রসন্ন হাস্যময় নবগোপালবাবু তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা; এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর কাল তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়া সকলকে নিকটে ডাকিয়া ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা দুঃখ করো না। দেহের নাশ আছেই। আমি কর্তা নই, ঠাকুরই কর্তা। আমরা তাঁর সন্তান—তিনি তোমাদের দেখবেন। তোমরা শোক ছেড়ে তাঁর নাম কর।" ইহার পর তিনি ঠাকুরের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দেখা গেল, তাঁহার মুখ তখন এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—মৃত্যুর কালিমা তাহাতে নাই।

---

১ এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধা ঘোষজায়ার শেষ অসুখের সময় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ছিন্নমস্তার ভাবে ভাবিতা ছিলেন এবং অপবিত্র কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না।

# হরমোহন মিত্র

শ্রীযুত হরমোহন মিত্র মহাশয় পূজ্যপাদ স্বামীজীর সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। 'পুঁথি' হইতে (৩৬০ পৃঃ) জানা যায় যে, তাঁহার চেহারা 'পরম সুন্দর' ছিল। 'কথামৃতে' তাঁহার একাধিকবার উল্লেখ আছে। শ্রীযুত মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দকে সাঙ্গোপাঙ্গ ও দর্শক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হরমোহনকে প্রথম দলে স্থান দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহের পর কতক ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথায়ই প্রকাশ পায়। একদিন (৩ জুলাই, ১৮৭৪) বলরাম-ভবনে বসিয়া তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "হরমোহন যখন প্রথমে (দক্ষিণেশ্বরে) গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল, দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭।১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামাদের বাড়িতে ছিল, বেশ ছিল, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে [সকলের হাস্য]। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'যা, এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে' " ['কথামৃত', ৪।১৫।৩; অখণ্ড সং, পৃঃ ৪৯৮]।

হরমোহন দরিদ্রের সন্তান, তাই কলকাতার সিমলা-অঞ্চলে মাতুল শ্রীযুত রামগোপাল বসু মহাশয়ের গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্যা হইয়াছিলেন। তিনি অতি ভক্তিমতী ছিলেন এবং পুত্রকে ঠাকুরের নিকট যাইতে উৎসাহ দিতেন। ফলত বিবাহের পরও হরমোহন বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলেন কাশীপুরে 'কল্পতরু' দিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যেকোন কারণেই হউক, ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করেন নাই; শুধু বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ থাক" ('পুঁথি', ৬০৭ পৃঃ)।

হরমোহনবাবু উত্তরকালে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তাঁহার বহু অনুভূতি ও ভ্রূযুগলমধ্যে অনেক দেব-দেবী দর্শন ঘটিয়াছিল। ইহা সম্ভবত তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন-কালের কথা—যখন তিনি ঠাকুরের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি ঈশ্বরানুরাগ, উদারস্বভাব ও মিষ্ট আলাপনের জন্য ভক্তসমাজে সুপরিচিত ছিলেন এবং স্বামীজী ও অন্যান্য

সন্ন্যাসীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া সময়ের কথা ভুলিয়া যাইতেন। অহর্নিশ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা, তাঁহার দিব্য লীলার অনুধ্যান ও নামগুণগান করিতে করিতেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং ঐ ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণপদে বিলীন হন।

স্বামীজী তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। বাল্যবন্ধু হিসাবে ইঁহারা পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাব-প্রচারে হরমোহনবাবু বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-সংবলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহার প্রকাশক ছিলেন, হরমোহন বাবু—ইহা আমরা সুরেশ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হরমোহনবাবু উহা নিজব্যয়ে পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ছাড়া উহাতে আলমবাজার মঠের উল্লেখ ছিল এবং উক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে গুরুস্তোত্রের আবৃত্তি হইত তাহাও মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে স্বামীজীর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতাও ছাপাইয়াছিলেন। ঐ সকলের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আলমবাজার মঠের পরিচয় থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেন, উহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে পাদটীকারূপে নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

হৃদয়ে উৎসাহ থাকিলেও অর্থসামর্থ্যহীন হরমোহনবাবুর পক্ষে স্বামীজীর গ্রন্থ ভাল করিয়া ছাপানো সম্ভব ছিল না। ইহাতে এদেশীয় অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন; স্বামীজীও ইহা পছন্দ করিতেন না, অথচ বন্ধুপ্রীতিবশত নিজে বারণ করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার 'পত্রাবলী'তে আছে—"হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম; কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরিব;" "ঐ হরমোহনটা একটা মূর্খ; বইছাপানো বিষয়ে সে তোমাদের মাদ্রাজীদের চেয়েও ঢিলে, আর তার ছাপা একেবারে কদর্য। বইগুলির এভাবে শ্রাদ্ধ করার মানে কি? দুঃখের বিষয় যে, সে গরিব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তো লোক-ঠকানো—যা করা উচিত নয়।" মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আদিযুগের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রচার যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকেই ঐ বিষয়ক গ্রন্থ ছাপাইয়া অযথা পয়সা নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থায় ঐ আশাহীনতার মধ্যেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতি এবং হরমোহনবাবুর অসীম সাহস নবযুগের বাণীকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে জাগ্রত রাখিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা হরমোহনবাবুর সাহসের উল্লেখ করিয়াছি। উহার আর একটু বিস্তার প্রয়োজন। তিনি প্রতাপবাবুর পুস্তিকায় সমালোচনাত্মক মন্তব্য যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহার বিরুদ্ধ মত-খণ্ডনের স্পৃহা অন্যভাবেও প্রকাশ পাইত। আলবার্ট হলে ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজিতে 'কালী দি মাদার' (কালী মাতা) শীর্ষক লিখিত ভাষণের পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিমাপূজার সমালোচনা করিলে উহার প্রতিবাদকল্পে হরমোহনবাবু সুললিত ইংরেজি ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া এমন একটি বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ উহাতে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর আমেরিকা হইতে কলকাতায় পদার্পণের পরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে অক্সফোর্ড মিশন-হলে বক্তৃতায় এবং তাহাদের কাগজ 'এপিফেনি'তে হিন্দুধর্মের সমালোচনা আরম্ভ হয়। ঐরূপ এক বক্তৃতায় উপস্থিত হরমোহনবাবু ইংরেজিতে তেজোদৃপ্ত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ ভাষার উপর তাঁহার বেশ দখল ছিল, যদিও বক্তা হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি অন্য কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন—বক্তৃতা তিনি এইরূপ বিরল স্থলেই করিতেন।

তাঁহার প্রচারের আর একটি ধারা ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও তাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রয় করা। ম্যাক্সমূলার-লিখিত ঠাকুরের জীবনী তিনিই এদেশে প্রচার করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীরা ছবি কিনিতে তাঁহারই নিকট যাইতেন এবং ঐ সূত্রে যুগাবতার ও তাঁহার পার্ষদবর্গের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতেন। অনেক ছাত্র এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় জজ বিহারীলাল সরকার মহাশয় ছাত্রজীবনে এই উপায়েই বেলুড় মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মঠপ্রতিষ্ঠার দিনে বন্ধুবান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকেন।

বই ও ছবি বিক্রয় করিলেও হরমোহনবাবুর অর্থের প্রতি লোভ ছিল না—তিনি ঐ কার্য ঠাকুরের সেবা হিসাবেই করিতেন। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় লিখিতেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ দীর্ঘ লিথো ছবি ইনি বিক্রয় করিতেন। স্বামী যোগানন্দের আদেশে কোন কিশোরবয়স্ক বালক হরমোহনবাবুর নিকট উক্ত লিথো ছবি কিনিতে যান। তখন ঠাকুরের ছবি বাজারে পাওয়া যাইত না। হরমোহনবাবু বিডন স্ট্রিটের সন্নিকটে ৪০নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে বাস করিতেন। বালক হরমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে পরমহংসদেবের ছবি পাওয়া যায়? দাম কত?' হরমোহনবাবু বলেন, দাম ছয় পয়সা—এখানেই ছবি বিক্রয় হয়।' বালকটি পয়সা দিলে হরমোহনবাবু ছবি আনিয়া দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এখানকার ঠিকানা জানলেন কেমন করে?' বালক বলিল, 'যোগানন্দ স্বামীজী আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়ে ছবি কিনতে বলেছেন।' হরমোহনবাবু অমনি

বলিয়া উঠিলেন, 'ও! তবে আপনি ভক্ত। দাঁড়ান, দাঁড়ান, ঠাকুরের প্রসাদ এনে দি।' ইহা বলিয়া প্রচুর মিষ্ট ও ফল আনিয়া দিলেন। তাহার দাম তখনকার দিনে কমপক্ষে আট আনা আন্দাজ হইবে। ইহা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের কথা।" ইহার পরও হরমোহনবাবু ঐ বালকের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং প্রায়ই তাহার বাড়িতে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

আমরা অন্য সূত্রে অবগত আছি যে, হরমোহনবাবু এই ছবি ও বই-বিক্রয় হইতে লব্ধ অনেক টাকা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাধুর বিবাহের পূর্বে কয়েকখানি গহনা তিনি ঐ টাকা হইতে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে হোগলা-পাকের বালা থাকিত। উহা দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে ঘষিয়া যাওয়ায় হরমোহনবাবু অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া নূতন বালা গড়াইয়া দেন এবং মাস খানেকের মধ্যেই ঋণশোধ করেন।

# মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৪ ফাল্গুন, কৃষ্ণা একাদশী তিথি, বুধবার, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা গোসাঁইদাস গুপ্ত মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন।

মণীন্দ্রকৃষ্ণের বাল্যকাল কলকাতার বাহিরে ব্যয়িত হওয়ায় তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অধিকন্তু স্বভাবতই তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। এই ভাবুকতার ফলে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও বিদ্যালয়ের পাঠ অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

কৈশোরে এগারো-বারো বৎসর বয়সে তিনি যখন একবার কলকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ইয়ংমেন্স নেস্ট (যুবকদের নীড়) নাম দিয়া এক ধর্ম ও সদালোচনার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রকৃষ্ণও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা বিদ্যালয়ের ছুটিতে মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণও এই সূত্রে বজরা বা গাড়িতে কয়েকবার সেখানে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। অপক্কবুদ্ধি বালক তখন ঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে সাক্ষাৎকার পরিচয়ে পরিণত হয় নাই। তবে ঐ সময়েও তিনি ঠাকুরের সস্নেহ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সদলবলে সাঁতার কাটিয়া ও অন্যভাবে আমোদপ্রমোদ করিয়া ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেই দেখিতেন, ঠাকুর তাঁহাদের জন্য প্রসাদী ফলমূল, মিষ্টান্ন, লেবুর রস ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। একদিনের কথা মণীন্দ্রকৃষ্ণের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। সেদিন অন্যান্য বারের মতো বাহিরে কপাটি খেলিয়া ও পরে গঙ্গাস্নান করিয়া অপর যুবক ও বালকগণ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার কথামৃতপানে নিরত আছেন, তখন মণীন্দ্র কিশোরসুলভ অনুসন্ধিৎসাবশত বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন ভিতরে কি হইতেছে। ঠাকুর তখন ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন এবং সম্মুখস্থ সকলকে হাত দিয়া দেখাইয়া স্নেহভরে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কেমনসব চাঁদের হাট বসেছে দেখ!" মণীন্দ্র ঠাকুরের সে প্রেমময় মূর্তি-দর্শনে আর কোন দিকে চোখ ফিরাইতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ যে

তিনি ঐ ভাবে ছিলেন, তাঁহার স্মরণ নাই। পরে যখন বিদায়ের সাড়া পড়িল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

ইহার পরে তিনি ভাগলপুরে পিতার কর্মস্থলে চলিয়া যান—বৎসর তিনেক আর ঠাকুরের দর্শন পান নাই। এই সময়ের পরে তিনি যখন আবার কলকাতায় আসিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে আছেন। একদিন মণীন্দ্রকৃষ্ণের পূর্বপরিচিত সারদাবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে, এক জায়গায় যাবে?" দুই জনে ঐ ভাবে প্রায়ই বেড়াইতে যান; সুতরাং মণীন্দ্র না ভাবিয়াই বলিলেন, "বেশ তো।" পরে সারদাবাবু জানাইলেন যে, তাঁহারা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেছেন। উহা সম্ভবত ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসের শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে আসিলেও শ্রীমা আসেন নাই এবং সেবাদির সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। মণীন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো রাজি হইলেন।

ইঁহারা উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলে তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মণীন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া ও তাঁহার লক্ষণাদি দেখিয়া কানে কানে বলিলেন, "কাল একলা এসো, ওর সঙ্গে এসোনি।" সেই একটু স্নেহস্পর্শেই মণীন্দ্রের মনে যেন কেমন একটা আলোড়ন আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় ও তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিনিদ্র রজনী কোন প্রকারে কাটাইয়া এবং পরদিনের কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া দিবাশেষে তিনি আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে বসিবামাত্র ঠাকুর চিরপরিচিতের মতো তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলি?" অতঃপর সাদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সমাধিস্থ হইলেন। মণীন্দ্র তখন পনেরো বৎসরের বালক। সমাধিভঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস?" ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্যোপাসক মণীন্দ্র কিছুই না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এই জগতের সৌন্দর্য ও লোকের নানা ভাবের বিচিত্র চরিত্র দেখে নিজের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাই প্রকাশ করবার আমার বড় ইচ্ছা ও এইটেই আমার কামনা।" কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে তো ভালই! কিন্তু তাঁকে পেলেই তো সব হয়!" ইত্যবসরে মণীন্দ্রকৃষ্ণের দেহমন জুড়িয়া কি যেন এক ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। তিনি বোধ করিলেন, কি এক শক্তি অধোভাগ হইতে ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতেছে, যেন সমস্ত জগৎ কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে, আর সেই মহাশূন্যমধ্যে তাঁহার প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মণীন্দ্রের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে কান্না আর থামে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে

তাঁহাকে অন্য কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও সে ক্রন্দন থামিতে প্রায় আধঘণ্টা লাগিয়াছিল।

এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘন ঘন শ্যামপুকুরে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের সেবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া সেখানেই থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুরে স্থানাভাব; বিশেষত বালকের পক্ষে রাত্রি জাগরণ অনুচিত ভাবিয়া বয়স্কগণ তাঁহাকে শুধু দিবাভাগেই সেবার সুযোগ দিতেন। রাত্রে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটিতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সেবার সুযোগে তিনি ঠাকুরকে আরও নিকটে পাইলেন এবং ভক্তদের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল। এই পরিচয়-সূত্রগুলি তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে ইনি অল্প বয়সের জন্য 'খোকা' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রের এই সেবাব্রত কাশীপুরেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিনের কথা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের পীড়ার সময় খোকা (মণীন্দ্র) ও পতু তাঁকে হাওয়া করছিল। সেদিন দোলে সবাই আবির নিয়ে খেলা করছে। ঠাকুর তাদের বারংবার যেতে বলছেন; কিন্তু ঠাকুরের সেবা ফেলে তারা গেল না। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আরে, এরাই আমার রামলালা!' "

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) খোকাকে খুব ভালবাসিতেন; মণীন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নরেন্দ্র ও অপর ভক্তদের মুখে ভজনগান শুনিলেই মণীন্দ্র ভাবে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেন। ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিতেন যে, মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাব—সখীভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি গুরু ও ইষ্টরূপেই জানিতেন। তবে তাঁহার দীক্ষার সম্বন্ধে শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন—"আমি তাঁহাকে দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদিন ঠাকুরের কাছে বসে আছি, এমন সময়ে মহিম চক্রবর্তী এসে তাঁকে বললেন, গতকাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন একে (মণীকে) মন্ত্র দিচ্ছি আপনার আদেশে। ঠাকুর বললেন, কি মন্ত্র পেয়েছ আমায় শোনাও। মহিম চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করামাত্রই ঠাকুর একেবারে সমাধিতে মগ্ন হলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ঐ মন্ত্র দিতে বললেন।' " শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর মণীন্দ্রবাবু মহিম চক্রবর্তীর আদেশে গেরুয়া পরিতেন এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেই থাকিতেন। তবে বরাহনগর মঠেও তাঁহার খুব যাতায়াত ছিল। পরে গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করেন।

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে লেখাপড়ায় আগ্রহ কমিতে থাকে। বিশেষত কলকাতায় আসিবার পর এই অবহেলা ও বিতৃষ্ণা অভিভাবকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীরে ধীরে স্কুলে

যাওয়া বন্ধ হইল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষক রাখিয়া মণীন্দ্রকে পড়াইতে লাগিলেন। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই অধ্যয়ন চলিতে থাকে—মধ্যে কেবল বৎসর দেড়েক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও মহিম চক্রবর্তীর সহিত অবস্থানকালে পাঠাভ্যাস বন্ধ ছিল। এই গৃহশিক্ষক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং ইঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনিচ্ছুক মণীন্দ্রও অনেক বিষয় শিখিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষত সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশিত 'সংবাদপ্রভাকর' দৈনিক কাগজখানি উত্তরাধিকারসূত্রে মণীন্দ্রের পিতার হস্তে আসে। মণীন্দ্রবাবু কোন চাকরি লইয়া জীবিকার্জন করিতে চাহেন না বলিয়া এই পত্রের সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইল। এই সুযোগে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি অনেকেরই সহিত সুপরিচিত হইলেন। কিন্তু 'সংবাদপ্রভাকরে'র উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই ঘটিতে থাকিল। মণীন্দ্রবাবু তখন অভিনয় করা ও নাটকরচনার দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছেন এবং মনোমোহন পাঁড়ে, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। এইসব হুজুগে 'সংবাদপ্রভাকর' দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া গেল। এদিকে মণীন্দ্রের নাট্যপ্রতিভারও তেমন বিকাশ হইল না। তিনি নানা কারণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন না, রচনাশক্তিরও উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি দেখা গেল না। কাজেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজী প্রথমবারে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মণীন্দ্রবাবু যখন আলমবাজার মঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহার দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। পরে স্বামী যোগানন্দজীর দ্বারা তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে ডাকাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর হাত দিয়া ১২০০ টাকা দেওয়াইলেন। ব্রহ্মানন্দজী একখানি খামে পুরিয়া ঐ টাকা তাঁহাকে দিলেন এবং ভিতরে কত আছে না জানাইয়া শুধু বলিলেন, "খোকা, তুই কষ্ট পাচ্ছিস জেনে স্বামীজী এই টাকা দিলেন।" এই সহৃদয়তায় তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না—কারণ তখন তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন পর্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত মণীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধ সর্বাবস্থায় সারাজীবন রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রথমাবস্থায় স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকে প্রায়ই তাঁহার গৃহে যাইতেন। তিনিও সুবিধা পাইলেই সাধ্যানুসারে ফলমিষ্ট ইত্যাদি লইয়া বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যাইতেন। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে তাঁহার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগরাগ হইত

এবং ভক্তগণও সেইসব উৎসবে যোগ দিতেন। তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ও কাঁকুড়গাছিতে কীর্তন করিতে যাইতেন। গিরিশচন্দ্র ও রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন এবং সাদরে গ্রহণ করিতেন। শ্রীমাতাঠাকুরানীরও তিনি স্নেহপাত্র ছিলেন। মণীন্দ্রেরই আগ্রহে তাঁহার পরিবারে অনেকে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তাঁহার দুরবস্থা চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্বের ন্যায় আর তেমন যাইতে পারিতেন না। শেষ বয়সে পুত্রগণ উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহার সচ্ছলতা ফিরিয়া আসে এবং তখন হইতে তিনি আবার স্বামী সারদানন্দজী, শিবানন্দজী প্রভৃতির নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে মগ্ন থাকিতেন। ফলত বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন বিফল হইলেও অন্তরের সম্পদে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং আধ্যাত্মিক আনন্দেরও তাঁহার ন্যূনতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের কথায় তিনি মাতিয়া উঠিতেন এবং তাঁহার চক্ষু ছলছল করিত। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ৺মহালয়ার দিনে বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতার আহিরীটোলায় তখনকার ৩১ নম্বর নিমু গোস্বামী লেনে মাতুলালয়ে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮), শুক্রবার, পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁহার পিতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ ছিল হুগলী জেলার বলাগড়ে। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ (ফুলে মুখোটী) বলিয়া তিনি চাকদহে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করিতেন; তাঁহাদের অনেক পত্নীরই জীবন পিতৃগৃহে অতিবাহিত হইত। উপেন্দ্র-জননীরও শ্বশুরগৃহবাস হয় নাই। উপেন্দ্রনাথের মাতুলের নাম শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভাগিনেয়কে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন। তিনি রাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকানে চাকরি করিতেন; অবস্থা ভাল ছিল না।

উপেন্দ্রনাথ যদুপণ্ডিতের স্কুলে 'কথামালা' পর্যন্ত পড়িয়া লেখা-পড়া ছাড়িয়া দেন। মাতুল তখন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কোনও কাজ জোগাড় করিতে বলিলেন। দুই-এক দিন ঘুরিয়াই তিনি এক ঔষধালয়ে চাকরি পাইলেন; কাজ—ঔষধের শিশি-বোতল ধোওয়া, বোতলের গায়ে লেবেল লাগানো ইত্যাদি। কিছুদিন কাজ করিয়া উপেন্দ্রনাথ যখন বুঝিলেন যে, ডাক্তারের নৈতিক চরিত্র ভাল নহে, তখন তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। পরে আবার ঘোরাঘুরি করিয়া বটতলায় (আপার চিৎপুর রোড) বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম্মসংগ্রহ করিলেন। এখানে কাজ ছিল দোকানঘর ঝাঁট দেওয়া, বই-সাজানো ও বিক্রয় করা। কিছুকাল পরে মালিক ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দোকান বিক্রয় করিতে চাহিলে উপেন্দ্রনাথ উহা কিনিতে উদ্যত হইলেন। দোকানের দাম মাত্র ৭৫ টাকা হইলেও মাতুল ঐ টাকা দিতে চাহিলেন না। অগত্যা মাতুলানীর সাহায্যে তিনি দোকানটি হাতে লইলেন এবং দুই-তিন মাসের মধ্যেই ধারের টাকা শোধ করিলেন। ঐ কালে এক পয়সা দুই পয়সার চুটকি বই বাহির হইত; তাহাতে নানা রকম ছড়া থাকিত। উপেন্দ্রনাথ ঐরূপ চুটকি বই অনেকগুলি একত্র করিয়া বড় বই ছাপাইলেন। ইহাতে বেশ আয় হইল। পরে আরও বই ছাপাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রকাশিত পুস্তকও বিক্রয় করিতে থাকিলেন। ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের অগ্রজ

---

১ সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবীর প্রদত্ত উপাদান-অবলম্বনে এই তারিখ স্থিরীকৃত হইল।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের তিনিই ছিলেন একমাত্র বিক্রেতা। এই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

আহিরীটোলায় তখন দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অধরলাল সেনও বাস করিতেন। ঐ সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় যাইতেন। সম্ভবত এই ভাবেই উপেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ করেন এবং তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণও এই সুলক্ষণ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উপেন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় দিলে ঠাকুর বলিলেন, "ও, তুমি ব্রাহ্মণ! তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরসেবা আছে কি?" উপেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ, নারায়ণের নিত্যপূজা হয়।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পার?" উপেন্দ্রবাবু স্বীকৃত হইয়া মাতুলালয়ে ফিরিলেন; কিন্তু কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, মাতুলানী এই অনুরোধ ভালভাবে গ্রহণ করিবেন কি? অনেক ভাবিয়া শেষে তাঁহাকে বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির একজন সদ্ব্রাহ্মণ ৺নারায়ণের প্রসাদ চাহিয়াছেন। মাতুলানী ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া সহজেই সম্মত হইলেন এবং উপেন্দ্রনাথও একদিন প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন যুবকভক্ত প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। উপেন্দ্রের হাতে নারায়ণের প্রসাদ দেখিয়া ঠাকুর সানন্দে উহা হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং পরে সকলের পাতে দিতে বলিলেন।

এই ঘটনার পূর্বে উপেন্দ্রবাবুর দেখাদেখি পাড়ার ছেলেরা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলে অভিভাবকগণ জগবন্ধুবাবুর নিকট নালিশ করেন এবং মাতুলও উপেন্দ্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু মামীমার সাহায্যে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদ লইয়া যাইবার পর হইতে ঐ বাধা দূরীভূত হয়। মামীমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর একদিনও প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল রাঁধিতে পারিতেন।

অপর ভক্তদের ন্যায় উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিছু দিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হয়—ইহা ভাবিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দুই পয়সার জিলিপি আনিতে বলিয়াছিলেন। এইজন্য পরে উপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ঠাকুরের উৎসবে জিলিপিভোগ দেওয়া হইত। উপেন্দ্রবাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী জানাইয়াছেন যে, উপেন্দ্র বিবাহে সম্মত ছিলেন না; পরে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তিনি বিবাহ করেন। মেয়েটি ঠাকুরের পূর্বপরিচিত ঘরের। তাহার নাম ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ায় তিনি বলিলেন, 'ও নাম ভাল না, একটা ভাল নাম রাখ না কেন?' মেয়ের নাম ঠাকুরকে দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, 'উহার নাম হোক ভবতারিণী।' সেই নামেই ইনি এখন পরিচিতা। ভবতারিণী দেবীর বর্ণ কালো ছিল বলিয়া স্বামীজীর এই বিবাহে আপত্তি

ছিল। ভবতারিণীর ইহা মনে ছিল। তাই পরে একদিন স্বামীজী তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি স্বামীজীকে সুপারি দিতে অস্বীকৃতা হন। তখন স্বামীজী বলেন, "উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছই তখন সুপারি কেন, তোমার হাতের রান্নাও খেতে হবে।" ইহার পর তাঁহার রাগ পড়িল।

ক্রমে উপেন্দ্রনাথ ভক্তমহলে সুপরিচিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বিভিন্ন ভক্তগৃহে যাইতে ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটিতে যেদিন ঠাকুরের শুভাগমন হয় (৬ এপ্রিল, ১৮৮৫), সেদিন উপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের সহিত ঠাকুরের পদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কার্যকারী ভক্তদের মধ্যে ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুস্তাফি, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মহোৎসব-কার্যটি আরম্ভ করিলেন।" ফলত উপেন্দ্রনাথ দরিদ্র হইলেও পূর্ণোদ্যমে সমস্ত উৎসবাদিতে যোগ দিতেন, সাধ্যমত সমস্ত কার্য করিতেন এবং অবকাশ পাইলেই কলকাতায় ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া ধন্য হইতেন।

তথাপি দারিদ্র্য তাঁহার বুকে যেন একটা জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া থাকিয়া তাঁহার ভক্তিপ্রকাশ ও ভক্তিলাভের চেষ্টাকে প্রতিপদে বাধা দিতেছিল। অপর ভক্তেরা যেখানে অসঙ্কোচে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করেন, সেখানে উপেন্দ্র যেন হৃদয়ে তেমন স্বাধীনতা বোধ করিতে পারেন না। বাড়িতে মাতুলও সর্বদা তাঁহার অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। ফলত ভক্তিলাভের চেষ্টার সহিত এই দারিদ্র্যনাশের চিন্তা সর্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস?" তখন স্বতই তাঁহার উত্তর আসিল, "অর্থ চাই।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর এই যাচ্ঞার সার্থকতা বুঝিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "খুব হবে।" ঠাকুর ভক্তের এই ভক্তিপথের বাধা দূর করিলেও তাঁহাকে গৌণভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, অর্থস্পৃহা জীবনের কাম্য বা উচ্চতর ভক্তির সহগামী হইতে পারে না। পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতি কথা'য় তাই উল্লিখিত আছে—"সে (উপেন্দ্রবাবু) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত তখন একদিন ঘর-ভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই

ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থকামনা করে আসে যায়'।" শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "ভক্তসমাবেশে কোন ভক্ত একদিন দরিদ্র উপেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি তো উপেনের কিছু করলেন না।" তাহাতে ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ও তো কিছু চায় না! ওর ইচ্ছা, ওর ছোট দুয়ারটি বড় হয়—তা হবে।" ঠাকুরের শুভেচ্ছা কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। কিন্তু পাঠক যদি মনে করেন যে, উপেন্দ্রনাথ শুধু অর্থার্থী ছিলেন, তবে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ঠাকুরের সহিত মিলন ও পরবর্তী কালের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বরং মনে হয় যে, অর্থিত্বের সহিত প্রকৃত ভক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রনাথ কাশীপুরের শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিতাগ্নি নির্বাপণান্তে ভক্তগণ যখন কাশীপুরের ঘাটে অবগাহনাদির জন্য একে একে যাইতেছিলেন, তখন এক বিষধর সর্প উপেন্দ্রনাথের পদে দংশন করে। সর্পাঘাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভক্তেরা তাঁহার পায়ের উপরিভাগ খুব জোরে বাঁধিয়া ক্ষতস্থানটি তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা পোড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার জীবনরক্ষা হইল; কিন্তু ক্ষতস্থানটি প্রায় চার-পাঁচ মাস নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া রহিল ('পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত', ১৫৩ পৃঃ)। সেই নীল দাগ আজীবন ছিল।

উপেন্দ্রনাথ যে যুগে পুস্তকের দোকান খোলেন, সে যুগের বাঙালিদের তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তকব্যবসায় ছিল না, আর বটতলাই ছিল ঐ ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ধীরে ধীরে তিনি একটি ছাপাখানা কিনিয়া প্রকাশকের কার্যে হাত দিলেন এবং 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক এক ক্ষুদ্র কাগজ ঐ মুদ্রণালয় হইতে বাহির করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর বঙ্গানুবাদ 'ঈশানুসরণ' ঐ পত্রে প্রকাশিত হইত। অকস্মাৎ তিনি 'রাজভাষা' নাম দিয়া ইংরেজি ভাষাশিক্ষার সহজ প্রণালীযুক্ত একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তক বহুজনসমাদৃত ও বহুলপ্রচারিত হওয়ায় তাঁহার অর্থভাগ্য ফিরিল, ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ৩ নম্বর বিডন স্কোয়ারের একখানি দ্বিতলগৃহ ভাড়া লইয়া ব্যবসায়ের প্রসারে উদ্যত হইলেন। শীঘ্রই 'বসুমতী' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত হইল।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, উপেন্দ্রবাবু শুধু অর্থার্থী ছিলেন না; তিনি ব্যবসায়ী হইলেও মুখ্যত ভক্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ এই সময়ের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন—"পাশ্চাত্য দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ

কলকাতায় আসিতেছেন—ইহা লইয়া কলকাতায় তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। কলকাতায় অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজনে স্বামীজীকে খিদিরপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপেন্দ্রবাবু পূর্বদিন কলকাতা ও শহরতলীর প্রায় সর্বস্থানে প্ল্যাকার্ড মারিয়া বড় বড় অক্ষরে স্বামীজীর পৌঁছিবার স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া স্বামীজীকে সংবর্ধনা করিবার জন্য কলকাতাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমস্তই উপেন্দ্রবাবুর নিজব্যয়ে। নবপ্রকাশিত 'বসুমতী'তে স্বামীজীর উপবিষ্ট ছবি এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মঙ্গলঘট দিয়া উহার নিচে স্বামীজীর আগমনোপলক্ষ্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচিত নূতন গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার 'বসুমতী' হাজারে হাজারে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ এবং পরমভক্ত গিরিশবাবু ও পূর্ণবাবুর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল যে, শীতকালে অতিপ্রত্যূষে স্পেশাল ট্রেন আসিবে, সুতরাং হয়তো শিয়ালদহে লোকের বেশি সমাগম হইবে না। এমন সময় সহসা উপেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশবাবু ও স্বামীজীদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'কাল স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য বহু সহস্র লোক যাবে। আমি সমস্ত কলকাতা, বরাহনগর, কাশীপুর, ভবানীপুর, আলিপুরে প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছি এবং দশ হাজার 'বসুমতী' বিতরণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় খুব ভোরে, এমন কি, রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই লোকে লোকারণ্য হবে।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'ভাই, এটা যদি হয়, তবে তুই মস্ত একটা কাজ করলি।' উপেনবাবুর কথায় অনেকে সেদিনকার বৈঠকে আশ্বস্ত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কারণ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপনের তেমন উদ্যম ছিল না—তাঁহারা সংবাদপত্রের স্তম্ভে শুধু তাঁহার আগমনসংবাদ ছাপাইয়া নিরস্ত ছিলেন।" স্বামীজীর জীবনীর সহিত পরিচিত সকলেই জানেন যে, উপেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

শীঘ্রই উপেন্দ্রবাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়া গ্রে স্ট্রিটের একটি সুবৃহৎ বাড়ি ভাড়া লইয়া মুদ্রণালয় প্রভৃতি তথায় লইয়া গেলেন। 'বসুমতী'র গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় ছাপাখানাও বাড়াইতে হইল এবং প্রথিতনামা সাহিত্য-মহারথীরা সম্পাদকশ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। বিভিন্ন সময়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুরেশ সমাজপতি 'বসুমতী'র সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুস্তক প্রকাশন বিভাগও অনুরূপ বর্ধিত হইতে লাগিল। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, টেকচাঁদ, গিরিশচন্দ্র, রঙ্গলাল,

দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অতি সুলভ সংস্করণ এবং সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হইয়া অনেক দরিদ্র সাহিত্যমোদীর গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লোকের দৈনিক সংবাদ পাইবার আগ্রহ আছে জানিয়া উপেন্দ্রবাবু সান্ধ্য 'দৈনিক বসুমতী' প্রচার করেন। সমরসংবাদ-সংবলিত এই পত্রিকাকে লোকে 'বসুমতী টেলিগ্রাফ' বলিত। প্রথমে উহাতে সংবাদই অধিক থাকিত; পরে উহা পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্রে পরিণত হয়। উপেন্দ্রবাবুর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "উপেনের ব্যবসায়বুদ্ধি খুব।"

উপেন্দ্রনাথের অর্থোপার্জন-ক্ষমতা সমধিক বর্ধিত হইলেও তাঁহার ধর্মস্পৃহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা ঘটে নাই; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী 'বসুমতী'র শিরোভূষারূপে সন্ন্যাসীদের অভিবাদনমন্ত্র 'নমো নারায়ণায়' নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উপেনবাবু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণীপ্রচারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। তখনকার দিনে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'বসুমতী' এই কাজে অগ্রণী ছিল। উপেনবাবু 'স্বামিশিষ্যসংবাদ'-প্রণেতা শরৎবাবু ও অপর একজনকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বামীজীর বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া পাঠাইতে। ঐ সকল তাঁহার পত্রিকায় সাদরে মুদ্রিত হইত। তিনি প্রতি নভেম্বর মাসে তাঁহার আহিরীটোলার বাড়িতে যে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করিতেন, উহা ক্রমে একটি দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। কীর্তন, ভজন, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণাদিতে সমস্ত বাটীটি সেদিন আনন্দমুখরিত থাকিত। বাড়ির ভিতরদিকে অনতিদীর্ঘ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ কুসুমে ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইত এবং ছবির সম্মুখে মঠের সাধুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত হইত। বহুবাজারে বাসস্থান ও ব্যবসায় স্থানান্তরিত হইবার পরও কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া এই উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত।

সাধু ও ভক্তসেবায় তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতিকথা'য় আছে—"ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজীপ্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন ...কোন দিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া ...রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌঁছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গারি নানা প্রকারের খাবার ও দোনা দোনা পান খাওয়াইয়া তাজা করিয়া দিত। বিডন স্কোয়ারের ধারে ছ্যাকড়া গাড়ির আড্ডা ছিল। গাড়োয়ানরা 'বরাহনগর, কাশীপুর, চার পয়সা' বলিয়া হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের খাওয়াইয়া

বরাহনগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানানন্দ অবধূত (নিত্যগোপাল) তখন রাম দাদার (দত্তের) বাড়িতে থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে উপেন্দ্রের দোকানে আসিয়া ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাকিতেন এবং জলযোগ করিয়া একটু বেশি রাত্রে চলিয়া যাইতেন।" শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) উপেন্দ্রবাবুর নিকট অশেষ সাহায্য পাইতেন এবং অনেক সময় 'বসুমতী' অফিসে বাস করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' শুধু সাহিত্যসেবীদেরই মিলনস্থান ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদিগকেও প্রায়ই সেখানে দেখা যাইত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের পদধূলিলাভে উহা ধন্য হইয়াছিল। আবার দরিদ্র শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অনেকেই সেখানে নানাভাবে উপকৃত হইতেন। তাই 'বসুমতী'র একজন প্রিন্টার রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, "এটা বসুমতী অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত" ('সাহিত্য', বৈশাখ, ১৩২৬)।

এই শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগের সহিত তাঁহার উদারহৃদয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্রের সন্তান হইলেও তাঁহার আচারব্যবহারে অর্থসম্বন্ধে অনুদারতার স্থলে গভীর সহৃদয়তাই প্রকাশ পাইত। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের শেষে 'সাহিত্য' নামে নামান্তরিত করিয়া সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সমুদয় স্বত্ব দান করেন।

'বসুমতী'র কর্মচারীরা আপদে-বিপদে তাঁহার সাহায্য পাইত। একবার সরকারি সংশোধনালয়ের দুইটি বালককে কাজ শিখিবার জন্য 'বসুমতী' সাহিত্যমন্দিরে পাঠানো হয়। তাহাদের একটি কয়েকখানি পুস্তক চুরি করিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু দয়ার্দ্র উপেন্দ্রনাথ পুলিশ আদালতে গিয়া বলেন যে, ঐ বইগুলি তিনি বালককে উপহার দিয়াছেন। বিচারক অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দেন। একদিন অফিসে আসিয়া তিনি দেখিতে পান, কয়েকজন লোক একটি যুবককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সে ছাপাখানার হরফ চুরি করিয়াছে; তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। উপেন্দ্রবাবু পুলিশকে বলিলেন যে, তিনি যুবককে ঐগুলি দান করিয়াছেন। পুলিশ চলিয়া গেলে তিনি অপরাধীকে বলিলেন, "বাপু, চলে যাও; অমন কাজ আর কখনো করো না।" যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁহার কাগজ সরবরাহ করিত, একদিন সেখান হইতে পত্র আসিল যে, বহু টাকা বাকি পড়িয়াছে। উপেন্দ্রনাথ জানাইলেন যে, তিনি সমস্ত টাকাই উক্ত কোম্পানির কর্মচারীকে দিয়াছেন। তদনুযায়ী কোম্পানীর লোক আসিয়া বসুমতী অফিসের হিসাব পরীক্ষা

করিয়া যখন বুঝিল উপেন্দ্রনাথের কথাই ঠিক—কর্মচারী ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন উপেন্দ্রনাথ সমস্ত টাকা নিজে শোধ করিবার দায়িত্ব লইলেন এবং অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। এইরূপ দয়ার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন। একদিন কার্যক্ষেত্রে যাইবার পথে এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি সেদিনকার বিক্রয়লব্ধ টাকা তাহাকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তিকে ৩০০ টাকা দিয়া প্রতিজ্ঞামুক্ত হন।

উপেন্দ্রবাবু আদর্শ গৃহী ছিলেন। তিনি নিজে সদ্ভাবে অর্থ উপার্জন করিতেন এবং দশ জনকে ঐরূপ প্রেরণা দিতেন। সুরেশ সমাজপতি 'সাহিত্যে' লিখিয়াছিলেন—"বসুমতীর প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পর্যন্ত প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণভক্ত।" এই সাধুবৃত্তি তাঁহার পরিবারের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দ্রের মনে একবার সন্ন্যাসগ্রহণের স্পৃহা জাগিয়াছিল। কিন্তু মঠ কর্তৃপক্ষ তখন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দেন।

উপেন্দ্রনাথের কার্যে সফলতার একটি প্রধান কারণ ছিল শ্রমশীলতা। দিনের পর দিন তিনি বসুমতী কার্যালয়ে সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়া দেখিতেন। প্রতিদিন যথাকালে আহিরীটোলার বাড়ি হইতে আসিয়া তিনি সারাদিন অফিসে থাকিয়া সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া যাইতেন। গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি হইতে বসুমতী-মুদ্রাযন্ত্র ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রভৃতি বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমে বিপুলাকার ধারণ করে। সাহিত্যপ্রচারে উপেন্দ্রনাথ শীঘ্রই 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রনাথ ও 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদের সমকক্ষ হইয়া উঠেন। এই নূতন বাড়ি বাঙলার দুইটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে 'কলকাতা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল' স্থাপিত হয়। পরে এখানেই শ্রীঅরবিন্দের 'ন্যাশনাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনে সাফল্যলাভ করিলেও উপেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, এই সমস্তেরই মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদ। আর ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীগুরু তাঁহাকে বিপথে যাইতে দিবেন না। ফলত উপেন্দ্রবাবুর সমস্ত জীবনই গুরুবলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১৭ চৈত্র, সোমবার সায়াহ্নে তিনি আহিরীটোলার মাতুলালয়ে দেহত্যাগ করেন (ইং ৩১ মার্চ, ১৯১৯)।

# চুনীলাল বসু

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসে কাজ করিতেন এবং স্বাভাবিক আকর্ষণবশত অবসরকালে সাধুদর্শনের জন্য ইতস্তত গমনাগমন করিতেন, কিংবা অন্তত একবার গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া আসিতেন। একদিন জনৈক সহকর্মী তাঁহার মনোভাব জানিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "যদি সাধু দেখতে চাও তো রাসমণির কালীবাটিতে পরমহংসকে দেখে এসো।" কোথায় কালীমন্দির বা কিরূপে তথায় যাইতে হয়, তিনি জানিতেন না। তাই বন্ধুকে প্রশ্নপূর্বক শুধু এইটুকু জানিয়া লইলেন যে, উহা কলকাতার উত্তরে গঙ্গার উপরে অবস্থিত; আহিরীটোলা হইতে জোয়ারের সময় নৌকাযোগে যাওয়া চলে। দ্বিপ্রহরে গমন আবশ্যক এবং ঐ সময়ে অফিসের ছুটি ও জোয়ার উভয়ের সংযোগ হওয়া প্রয়োজন; সুতরাং সুসংবাদ পাইয়াও দক্ষিণেশ্বরে যাইতে দুই-তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পরে এক রবিবারে অবস্থা অনুকূল দেখিয়া তিনি আহারান্তে আহিরীটোলাঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মাঝিদের সাদর আহ্বানে নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। অনিশ্চিত স্থানে যাইতেছেন, অধিকন্তু পূর্বে তিনি কখনও নৌকাযোগে কোথাও যান নাই; অতএব মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষার পর উপযুক্ত আরোহী পাইয়া মাঝিরা জোয়ারের নৌকা ছাড়িয়া দিল। ক্রমে উহা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে আসিয়া উত্তরের ঘাটে থামিল। চুনীলাল পাঁচ পয়সা ভাড়া দিয়া নামিয়া পড়িলেন।

অপরিচিত উদ্যানে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ ও পদচারণান্তে তিনি একখানি কুটিরে জনৈক ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই—ঔষধ?" চুনীলালবাবু উত্তরে জানাইলেন, "না, আমি পরমহংসদেবের দর্শনে এসেছি।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলিলেন, "হাঁ, একজন পরমহংস ঐ কোণের ঘরে থাকেন।" তদনুসারে তিনি গৃহের উত্তরের বারান্দায় আসিয়া দ্বারপথে দেখিলেন, একজন কক্ষমধ্যে একা বসিয়া আছেন। ভিতরে প্রবেশপূর্বক প্রণাম করিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি জন্য এসেছ?" চুনীলাল বলিলেন, "দর্শন করতে।" পরমহংসদেব যে ছোট্ট খাটটির উপর বসিতেন, উহার উত্তর দিকে একখানি বেঞ্চি ছিল। তিনি চুনীলালকে উহাতে বসিতে বলিলেন এবং পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার সংসারের খবর আদ্যোপান্ত শুনিয়া লইলেন; প্রেমভক্তি বা ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিষয় কোন প্রসঙ্গই সেদিন হইল না। বিদায়কালে ঠাকুর তাঁহাকে একটু মিছরি-প্রসাদ খাইতে দিলেন। উহা সম্ভবত ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ঘটনা। ঐ সময়ে রামলাল-দাদা ব্যতীত আর কাহাকেও চুনীবাবু সেখানে দেখেন নাই।

ইহার পরের ঘটনা চুনীবাবু এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, "মার্চ মাসের শেষে অফিসের মাহিনা পাইলে মনে কেমন প্রবল ইচ্ছা জাগে বাটি হইতে পলাইবার এবং কিছুদিন হৃষিকেশে বাস করিবার। মাহিনা ভিন্ন বাটি হইতে আরও ২০০ টাকা লইয়া অফিসের আর একজনের সহিত পলাইয়া যাই। সে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়াছে ও তাহার অনেক জানাশোনা আছে বলিয়া গল্প করিত। বাটিতে স্ত্রীপুত্রাদি রহিয়াছে, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কেবল অফিসে এক মাসের ছুটির জন্য একখানি দরখাস্ত রাখিয়া দুইজনে রওনা হই। পথে তাহার অনেক আলাপী লোকের সহিত দেখা হইতে থাকে এবং এখানে দুদিন, ওখানে একদিন—এই করিতে করিতে দশ-বার দিন কাটিয়া যায়। ক্রমাগত এইরূপ নানাস্থানে ঘোরাঘুরির জন্য বিরক্তি আসে এবং তাহাকে বলি যে, আমি আর তাহার সহিত যাইব না—আমার ইচ্ছা হৃষিকেশে গিয়া কিছুদিন থাকা; এভাবে ঘুরিতে আমি আসি নাই। এই বলিয়া তাহার সহিত কানপুরের এক স্থান হইতে পৃথক হইয়া হৃষিকেশে যাই। সেখানে যে কেবল সাধুরা বাস করে, জানিতাম না। কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া মর্কট বৈরাগ্যের অবসান হইল এবং এক মাস পূর্ণ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই পত্র লিখিয়া বাটি ফিরিয়া আসি।"

অফিসে ফিরিলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানাইলেন যে, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার চাকরি গিয়াছে। তিনি উহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুত শ্যাম বিশ্বাস সুপারিন্টেন্ডেন্টের সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করিয়া চুনীবাবুকে বিনা বেতনে একমাস ছুটি দিয়া কাজে বহাল করিলেন।

পরবর্তী ঘটনা তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন—'ইহার কয়েকদিন পরেই আমি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাই এবং পরমহংসদেবের নিকট বলরামবাবুকে দেখিতে পাই। বলরামবাবু প্রায় এক বৎসর হইল কলকাতায় আসিয়া রহিয়াছেন। বড়লোক—পার্শ্বের বাটিতে হইলেও আলাপ পরিচয় হয় নাই। ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিলেন, 'ইনি তোমার পাশেই থাকেন; তুমি যখন আসবে, এঁকে নিয়ে এসো।' অতঃপর যখনই বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, আমায় লইয়া যাইতেন। তবে রবিবার বা ছুটি না থাকিলে আমার যাওয়া ঘটিত না।' বলরামবাবু প্রতি রবিবারে নৌকা ভাড়া করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। ইহাতে দরিদ্র ভক্তদের বিশেষ সুবিধা হইত। এইরূপে চুনীবাবুর সহিত বলরামের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইয়াছিল এবং উভয়েই পরস্পরের খবরাখবর রাখিতেন। চুনীলালের অসুখ হইলে বলরাম চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতেন এবং প্রতিদিন সংবাদ লইতেন। প্রতিবেশীরা

অবশ্য এইজন্য চুনীবাবুকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, 'বড়লোকের গা-ঘেঁষা।' কিন্তু বন্ধুত্বের আকর যেখানে অন্যরূপ, সেখানে এরূপ উক্তিতে কেহ বিচলিত হয় না।

চুনীবাবুও সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। তাঁহার বাড়ি ছিল বলরামভবনের ঠিক পশ্চিমে; তাই উভয়ের মিলনের সুযোগ ঘটিত প্রচুর।

চুনীবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদে আগমনের পূর্বে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিবসংহিতা-দর্শনে যোগাভ্যাসে রত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পরেও এই সাধনা চলিতেছিল। তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার হাঁপানিরোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন ঠাকুরকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। একটু সুস্থ হইয়া একদিন যখন তাঁহার নিকট গেলেন, তখন আর কেহ সেখানে ছিল না। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ওসব কেন? তোমরা গৃহী মানুষ, ওসব যোগটোগ তোমাদের জন্য নয়। ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস থাকলেই হলো। এখান থেকে ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও, ওসব কাজ আর করো না।" চুনীবাবু শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; কারণ অপর কেহ তাঁহার যোগাভ্যাসের কথা কিংবা যোগাভ্যাস হইতেই যে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জানিত না। তিনি আরও আশ্চর্য হইলেন যখন ঐ তিন মাত্রা ঔষধ সেবনে তাঁহার রোগ সারিয়া গেল। ইহার পরে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুর অবতার।

চুনীবাবু অপরের ন্যায় সেবা করিতে উন্মুখ, অথচ দারিদ্র্যবশত পারেন না বুঝিয়া ঠাকুর ভক্তের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য বলেন যে, ধাতুপাত্রে তাঁহার জলপান সম্ভব হয় না; অতএব চুনীলাল যেন তাঁহার জন্য একটা কাঁচের গ্লাস কিনিয়া আনেন। আবার অপরের ন্যায় প্রণবোচ্চারণে অনধিকারহেতু চুনীলাল মনঃকষ্টে আছেন জানিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, 'ভগবানের যেকোন একটি নাম উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট; প্রণবের আবশ্যকতা নাই।' তদবধি তিনি ঠাকুরের নির্দেশানুসারে জপধ্যান ও ঠাকুরের নামোচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেন না।

চুনীবাবু একবার তীর্থাদিভ্রমণের জন্য তিন মাসের ছুটি লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহধর্মিণী অম্লরোগে ভুগিতেছিলেন; তাই তিনি স্থির করিলেন তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন। বলরামবাবু এই সংবাদ পাইয়া জানাইলেন যে, তিনিও শীঘ্রই তথায় যাইবেন। অতএব একসঙ্গে যাওয়াই উচিত। বলরামবাবুর স্বভাব ছিল এই যে, তিনি শীঘ্র কিছু করিতে পারিতেন না, আবার কোথাও যাইলে ছয় মাস কি এক বৎসর না থাকিয়া নড়িতেন না। বলরামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে দুই

মাস বৃথা নষ্ট হইল দেখিয়া চুনীলাল আর বিলম্ব না করিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা মোট বিশ দিন ছিলেন। সে সময় বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত তারক (শিবানন্দজী) ছিলেন; আর ছিলেন গৌরী-মা। গৌরী-মা খুব তেজস্বিনী ছিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন। কিছু পরেই শ্রীযুক্ত রাখালকে (ব্রহ্মানন্দজীকে) লইয়া বলরামবাবু সস্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। চুনীবাবু ও অপর সকলেই বলরামবাবুদের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' থাকিতেন এবং তথায় প্রসাদ পাইতেন। চুনীবাবু সহধর্মিণীকে বৃন্দাবনে রাখিয়া বলরামবাবুদের পূর্বেই কলকাতায় ফিরিয়া আসেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে যান, সেদিনের কথা 'কথামৃতে' (২।১৪।১ ও ৪।১৭।১; অখণ্ড সং, পৃঃ ৫২০, ৫৫৩) বর্ণিত হইয়াছে। চুনীলালের আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনের উল্লেখ আমরা ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাঁহার একদিনের শ্রীমুখের কথায় প্রকটিত হইয়াছে। ঠাকুর সেদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "চুনীতে আর তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে" (৪। ৩১।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১৩)।

কল্পতরু ঠাকুর যেদিন (১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ খ্রিঃ) কাশীপুরের বাগানে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া শয্যায় বিশ্রাম করিতে থাকেন এবং নিরঞ্জন দ্বারে অবস্থান করিয়া সকলকেই ভিতরে যাইতে বারণ করিতে থাকেন, সেদিন বিকালে চুনীলাল উদ্যানবাটিতে উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন যে, ঠাকুরের শরীর আর বেশি দিন থাকিবে না; সুতরাং চুনীলালের কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে যেন এখনই নিবেদন করেন। কিন্তু দ্বারী নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব জানিয়া চুনীলাল বিমর্ষচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিরঞ্জন একটু সরিয়া যাইবামাত্র নরেন্দ্র ইঙ্গিত করিলেন এবং চুনীলাল ভিতরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" চুনীলাল কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুর নিজের দেহ দেখাইয়া বলিলেন, "এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো। তোমারও হবে।" বাহিরে আসিয়া চুনীলাল নরেন্দ্রনাথকে সব জানাইলে তিনি বলিলেন, "তবে আর আপনার ভয় কি?" চুনীলাল ঠাকুরের ঐ কথাটি জীবনের সম্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চুনীবাবু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাই স্বামীজী তাঁহার অভাবের কথা জানিতে পারিয়া আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেন, "দুই-তিন মাসের

মধ্যে আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিব। ...বলরাম, সুরেশ, মাস্টার ও চুনীবাবু, এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।”

চুনীবাবুর দেহত্যাগের পর ‘উদ্বোধনে’ (আষাঢ়, ১৩৪৩) তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়—“গত ৩০ মে ( ১৯৩৬, শনিবার, বেলা ১২টার সময়) শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী শিষ্য চুনীলাল বসু মহাশয় ৫৮ বি, রামকান্ত বসু স্ট্রিটস্থ তাঁহার নিজ বাটিতে মূত্রাবরোধরোগে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপদে লীন হইয়াছেন। ...চুনীলাল বসু মহাশয় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রিটস্থ নিজ বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুলে পাঠসমাপন করিয়া প্রায় ২২ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩ বৎসরকাল পেনশন ভোগ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। ...শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে তিনি সদাসর্বদা তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করেন। ‘কথামৃত’ এবং স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রণীত ‘লীলাপ্রসঙ্গে’ তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে আদর করিয়া ‘নারায়ণ’ বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। এই অসুখের সময় স্বামী ভাগবতানন্দজী তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাগবাজার অঞ্চলে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স্ক গৃহী ভক্ত ছিলেন।”

# কালীপদ ঘোষ

উত্তর কলকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরের ঘোষ বংশে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের এক অমাবস্যার রাত্রে কালীপদর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ ঘোষ। পিতা কালীভক্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সামান্য পাটের ব্যবসায় ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কালীপদের বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে কাগজবিক্রেতা জন ডিকিন্সন কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিদ্যা অল্প হইলেও বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে কালীবাবু শীঘ্রই কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন; তখন তাঁহাকে কোম্পানির হর্তা-কর্তা বিধাতা বলিলেই চলে। বিলাত হইতে কোম্পানির যে কাগজ আসিত তাহাতে অনেক সময় কালীবাবুর মূর্তি অঙ্কিত থাকিত; আর অফিসে স্থান খালি হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সেখানে চাকরি পাইতেন।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সহিত ইঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল। দুই জনকে অনেক সময়ই একত্রে দেখা যাইত; উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, এমন কি পানাদিও একসঙ্গে চলিত। ইঁহাদের চরিত্রগত সাদৃশ্য দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের কেহ কেহ ইঁহাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন। গিরিশচন্দ্র এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর নামে স্বরচিত 'শঙ্করাচার্য' উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে; কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।" কালীপদবাবু গিরিশচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক না হইলেও অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ শ্রীযুত রামচন্দ্রের পরমহংসদেব-বিষয়ক বক্তৃতায় উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকারে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার বাঁশী শুনিয়া ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। রন্ধনবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁহাকে গিন্নী বলিয়া পরিহাস করিতেন।

ইং ১৮৮৪ অব্দের প্রথমভাগে গিরিশচন্দ্রেরই সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া জীবন ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে কালীপদবাবুর "যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেব-দেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ

আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়।...ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ের সেই স্মরণীয় ৺কালীপূজার দিনে কালীপদবাবুর বাটি হইতে প্রস্তুত সুজির পায়সই প্রভুর সেবার প্রধান উপকরণ হয় এবং ভগবান বুদ্ধ-কর্তৃক সুজাতা নিবেদিত পরমান্নগ্রহণের ন্যায় ভক্তবৎসল ঠাকুরও সেই পায়স গ্রহণ করেন। উহার পুণ্যময় স্মৃতি আজও কালীবাবুর বংশধরগণ সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন" ('উদ্বোধন', পৌষ, ১৩২৯)।

স্বামীজী ইঁহাকে 'দানা' আখ্যা দিয়াছিলেন; তাই রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন 'দানা-কালী'। কালীবাবু বলিতেন, "জগাই-মাধাইয়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল হইলেও আমাকে ঠাকুর নিজগুণে কৃতার্থ করিয়াছেন।"

তিনি স্থূলকায় এবং দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নয়নদ্বয় আয়ত এবং মুখ সদা প্রফুল্ল ছিল। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার যেমন বন্ধুত্ব ছিল, স্বভাবও সেইরূপ অদান্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমনের পূর্বে বারাঙ্গনাসক্তি ও সুরাপানাদিতে তাঁহার সমস্ত অর্জিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইত। ঠাকুরের মহিমাশ্রবণে তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। কিন্তু এই আগমন ভক্তিপ্রসূত নহে, পরন্তু ঔৎসুক্যজনিত। হয়তো ইহার পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ ছিল; কারণ বহু পূর্বে একদা অনেক কুলললনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সমাগতা কালীপদ-গৃহিণী প্রভুর চরণে প্রণামান্তে পতির কদাচারকাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কালী সেখানকারই লোক; সুতরাং একদিন মতিগতি অবশ্যই ফিরিবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঐ ভক্তিমতীকে কৃপা করিয়াছিলেন। অধুনা ঠাকুরের শ্রীপদে উপনীত হইলেও দানা-কালী প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই বিদায় লইলেন।

গৃহে প্রত্যাগত কালীপদর মনে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণচরিতশ্রবণ ও দক্ষিণেশ্বরে পুনর্গমনের এক অদম্য স্পৃহা জাগিতে লাগিল; সুতরাং তিনি শীঘ্রই নৌকাযোগে অপর ভক্তদের সহিত তথায় চলিলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আগমনের অব্যবহিত পরেই শ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার কলকাতা যাইবার বাসনা আছে। কালীবাবুও মহানন্দে জানাইলেন যে, তিনি লইয়া যাইতে প্রস্তুত—ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। অতএব লাটু ও কালীপদের সহিত ঠাকুর সেই নৌকায় উঠিলেন এবং পথে সাধনাদি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসাপূর্বক ঠাকুর ইহাও জানিয়া

লইলেন যে, কালীপদ ৺কালীমাতার ভক্ত এবং তাঁহার দীক্ষা হয় নাই; কারণ তিনি সাধারণ গুরুতে বিশ্বাসী নহেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "জিব বের কর তো কেমন দেখি।" কালীপদ জিহ্বা বাহির করিলে ঠাকুর অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা উহাতে লিখিয়া দিলেন। এদিকে জাহ্নবী-বক্ষে তরী ধীরে ধীরে চলিয়া ঘাটে লাগিল; কিন্তু ঠাকুরের গমনের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহারই আলয়ে যাইবেন। অতএব গাড়ি করিয়া তিনি শ্রীপ্রভুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। এইরূপে স্বেচ্ছায় ভক্তকে কৃপা করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

কালীপদ অচিরেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি যাঁহারা প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, সেই প্রবীণদের মধ্যে স্থান পাইয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব, কলকাতায় মহোৎসব এবং পরে তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কর্মতৎপরতাদর্শনে তাঁহাকে 'ম্যানেজার' অ্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হইল। ইহা শুনিয়া ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রিঃ, ১৮ অক্টোবর) সানন্দে বলিলেন, "কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।" ঠাকুর তখন প্রবীণ ভক্তগণের পরামর্শে শ্যামপুকুরে আছেন। তাঁহার আজ্ঞায় কালীপদ ৺কালীপূজা দিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য স্বগৃহ হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন। তিনি দীপাবলী প্রজ্বলনান্তে অর্চনার দ্রব্যসম্ভার নিকটে সাজাইয়া দিলে যথাকালে ঠাকুর পূজাসনে বসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন গিরিশাদি ভক্তের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাঁহাদের পূজা লইবার জন্যই প্রভু ঐ ভাবে পূজাসনে বসিয়া আছেন। অতএব উপস্থিত সকলেই কালীমাতার ভাবাবিষ্ট বরাভয়কর প্রভুর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরে সামান্য প্রসাদ-গ্রহণান্তে শ্রীপ্রভুর আদেশে সকলে সুরেন্দ্রের গৃহে ৺কালীপূজার প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলেন।

তারপর শ্রীপ্রভু কাশীপুরে আসিয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর সকালে "প্রেমের ছড়াছড়ি"। ঠাকুর "কালীপদর বক্ষস্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্য হও'! আর চিবুক ধরিয়া তাঁহাকে আদর করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।' " ('কথামৃত'। ৪।৩১।১; অখণ্ড সং, পৃঃ ১০১০)

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর দেখা যাইত যে, গিরিশ ও কালীপদ তাঁহার ছবির সম্মুখে দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিতেন, যেন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আকুলতাপূর্ণ মৌন প্রার্থনা জানাইতেছেন; আর মাঝে মাঝে অশ্রুভারাক্রান্ত-হৃদয়ে

বলিতেন, "ঠাকুর, দেখা দাও।" পরে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কালীপদ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেখানকার এক প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠেন। কাঁকুড়গাছির ভক্তেরা তাঁহার স্থূলদেহকে ঘিরিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতেন, আর তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। একবার নবগোপালবাবুর বাড়ির বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত কালীবাবু সেখানে গিয়া কাঁকুড়গাছির কীর্তনীয়াদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র ভক্তগণ উল্লসিত হইয়া খোলে চাঁটি দিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করতালেও ঘা পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গিরিশ ও কালীপদ নগ্নগাত্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভক্তগণ এই নবযুগের 'জগাই-মাধাই'কে ঘিরিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। অমনি নবগোপাল দুই ছড়া প্রসাদী মালা আনিয়া ভক্তদ্বয়ের গলে পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা তখন পরস্পরের হাত ধরিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—চক্ষু মুদিত, শরীর অচঞ্চল, আর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতেছে 'রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ'। তাঁহাদের সে ভক্তিবিহ্বল গাম্ভীর্য কীর্তনীয়াদের মনে অসীম উৎসাহ জাগাইতে লাগিল। কে বলিবে ইঁহারাই একসময়ে কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অগ্রণী ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণরূপ পরশপাথর আজ লোহাকেও সোনা করিয়াছে—'জগাই-মাধাই' এখন ভক্তদের কীর্তনের মধ্যমণি।

পরবর্তী জীবনে কালীপদবাবু যখন জন ডিকিন্‌সন্ কোম্পানির কর্মোপলক্ষ্যে বোম্বাই নগরের প্যাখেল রোডে থাকিতেন তখন তীর্থাদিদর্শনে নিরত ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন; অথবা বোম্বাই আসিলে একবার তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন।

সাংসারিক জীবনে কালীপদবাবুর সাফল্যের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় ভারতের বহু বড় বড় শহরে কোম্পানির শাখা খোলা হইয়াছিল। বিলাতী কোম্পানি হইলেও কালীবাবুর নির্দেশে এইসকল শাখা-অফিসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি শোভা পাইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ও কার্যে উন্নতির মূলে ছিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন তিনি আনন্দধামে গমন করেন।

# রানী রাসমণি

রানী রাসমণির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারেতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণা রানী সেই প্রারম্ভাবস্থায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে তিনি ও তাঁহার জামাতা সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক যুগপ্রবর্তনকার্যের সহায়করূপে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। রানীর জীবনীর অনুসরণ করিলে স্বতই মনে হয়, সুযোগ-সুবিধা পাইলে বঙ্গললনা যেকোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও কার্যক্ষমতা বিকাশ করিয়া দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থা হইতে পারেন। বিশেষত তাঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্মভাব উপযুক্ত আবেষ্টন পাইলে সহজেই শতধা প্রকটিত হইয়া থাকে। রানী ভবানী, রানী স্বর্ণময়ী, রানী হেমন্ত কুমারী প্রভৃতি দানশীলা বঙ্গনারীগণই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী হালিশহরের অদূরে কোনা নামক গ্রামে ১২০০ বঙ্গাব্দের (১৭৯৩ খ্রিঃ) ১১ আশ্বিন, বুধবার প্রাতঃকালে মাহিষ্যবংশে রানী রাসমণির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস (হারু ঘরামী) এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। রাসমণি দরিদ্রের কন্যা; তাঁহার পিতা গৃহনির্মাণ এবং কৃষিকার্যাদির দ্বারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থা করিতেন। স্নেহময়ী জননী কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন 'রানী'; পরে তাঁহার নাম হয় রাসমণি। অতএব পল্লিবাসীর নিকট তিনি রানী রাসমণি নামে পরিচিতা হন।[১] অবস্থা মন্দ হইলেও হরেকৃষ্ণ সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং রানীকেও শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে রাত্রে বাঙলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পঠিত হইত এবং উহা শুনিবার জন্য গ্রামবাসীরা সমবেত হইত। অধিকন্তু কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ দাস-দম্পতি মালা-তিলকাদি ধারণ করিতেন; রানীও নিষ্ঠাসহকারে ঐরূপ করিতে শিখিয়াছিলেন। রানীর মাতা দীর্ঘজীবী ছিলেন না; কন্যা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে তিনি অষ্টাহব্যাপী জ্বরবিকারে ভুগিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

ক্রমে রানীর একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার বর্ণ গৌর, দেহের গঠন সুন্দর এবং কৃষ্ণকেশদাম দীর্ঘবিলম্বী। এক কথায় তাঁহার রূপ অনুপম না হইলেও তাঁহাকে সুন্দরী বলা চলে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সুলক্ষণা ছিলেন। এই সময়ে

---

১ 'দক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থে (৭ পৃঃ) আছে—"দানমুগ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক রানী নামে অভিহিতা হন", অর্থাৎ 'রানী' নামের প্রয়োগ অনেক পরে হয়। আমরা এখানে 'রানী রাসমণি' গ্রন্থের (২ পৃঃ) অনুসরণ করিতেছি।

জানবাজারের ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত প্রীতরাম দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হইলে তাঁহার জন্য একটি পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজচন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। ঐ সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সঙ্গিগণ কোনার ঘাটে রানীকে দেখিতে পায় এবং রাজচন্দ্রবাবুকেও দূর হইতে তাঁহাকে দেখায়। অতঃপর পুত্রের সম্মতি আছে বুঝিয়া প্রীতরামবাবু হরেকৃষ্ণ দাসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শীঘ্রই হরেকৃষ্ণের সম্মতি আসিল এবং ১২১১ বঙ্গাব্দের ৮ বৈশাখ শুভ পরিণয় হইয়া গেল। রাসমণি জমিদার-গৃহের বধূরূপে আসিয়া রানী নাম সার্থক করিলেন।

এখানে রানীর শ্বশুরকুলের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রীতরামের আদি গৃহ ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঘোষালপুর গ্রামে। তাঁহার পিতৃষ্বসা শ্রীযুক্তা বিন্দুবালা দাসী মান্না বাবুদের কুলবধূ ছিলেন। তখন বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গদেশ বিপর্যস্ত। সে দুর্দিনে গৃহবিচ্যুত প্রীতরাম অপর দুই বয়ঃ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামতনু ও কালীপ্রসাদকে লইয়া কলকাতায় আগমনপূর্বক পিতৃষ্বসার গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অক্রূরচন্দ্র মান্না মহাশয় তখন ডন্‌কিন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। প্রীতরামের পাঠ সমাপ্ত হইলে মান্নাবাবু তাঁহাকে সাহেবের বেলিয়াঘাটায় লবণের কারবারে সামান্য বেতনে মুহুরির কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি তাঁহার সাহায্যে কিছুদিন ঢাকা শহরে চাকরি করেন এবং স্বীয় পারদর্শিতার ফলে নাটোরের রাজার দেওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ কার্য হইতে অবসরগ্রহণান্তে কলকাতায় আসিয়া তিনি উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর তালুকটি নিলামে ক্রয় করেন এবং অর্জিত অর্থের দ্বারা বেলিয়াঘাটায় দুইটি আড়ত চালাইতে থাকেন— একটিতে বাঁশ ও অপরটিতে মকিমপুর পরগণা হইতে লব্ধ দ্রব্যসমূহ বিক্রয় হইত। অনেকগুলি বাঁশ একত্র বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র আনা হয়; ইহাকে বাঁশের মাড় বলে। তদনুসারে প্রীতরাম মাড় নামে পরিচিত হন। এই ব্যবসায়ের সহিত তিনি নিলামে দ্রব্য কিনিয়া সাহেবদের নিকট বিক্রয় করা এবং রসদ-যোগানোর কার্যও করিতে থাকেন। এইসব কার্যে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়।

স্বীয় উদ্যমে প্রীতরামের অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে দেখিয়া শ্রীযুত অক্রূরচন্দ্রের ভ্রাতা যুগলকিশোর মান্না মহাশয় স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ ষোল বিঘা জমি দান করিলেন। কালে ইহাতে প্রীতরামের আবাসবাটি নির্মিত হইল। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল—হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। হরচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। রাজচন্দ্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া সৌভাগ্যবতী রানী রাসমণি ধনগর্বে স্ফীত না হইয়া পূর্বেরই ন্যায় সর্বদা নানা গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন; শ্বশ্রূমাতা নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। অধিকন্তু পূজাহ্নিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত এবং শ্বশুর-শাশুড়ির পাদোদক পান না করিয়া তিনি আহারে বসিতেন না। এইসকল কারণে এবং তাঁহার আগমনের পর শ্বশুরবংশের আর্থিক উন্নতি হইতেছে দেখিয়া রানীকে সকলেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজচন্দ্র প্রীতরামেরই ন্যায় কর্মকুশল ছিলেন; অধিকন্তু পরামর্শদাত্রীরূপে বুদ্ধিমতী ভার্যা রানীকে পাইয়া তিনি অধিকাধিক সাফল্যমণ্ডিত হইতে থাকিলেন। অবশেষে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সার্ধ ছয় লক্ষ মুদ্রা ও স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া প্রীতরাম দেহত্যাগ করিলে রাজচন্দ্র একমাত্র উত্তরাধিকারিরূপে সমস্ত কার্যভার স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন।

রাজচন্দ্র স্বীয় অমায়িকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বদান্যতার জন্য তদানীন্তন কলকাতা-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্রূর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধিকন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম অভিজাত অংশীদার জন বেব্ সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এইসকল সদ্‌গুণের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

রাজচন্দ্র যেমন বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, দানও করিয়াছিলেন তেমনি প্রচুর; আর ইহাতে সহধর্মিণী রাসমণির উৎসাহ পাইয়াছিলেন যথেষ্ট। ইঁহাদের বহু সদনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৩০ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে বন্যা হয়, তাহাতে বহু পরিবার বিপন্ন ও সহায়-সম্বলহীন হওয়ায় রানী তাহাদের পানভোজন ও আশ্রয়াদির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ঐ বৎসরই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রানী চতুর্থী করিবার জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন যে, ঘাট পঙ্কিল, বন্ধুর ও বিপজ্জনক; পথও তদনুরূপ অব্যবহার্য। অতএব কার্যসমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়া তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে ঘাট ও রাস্তা বাঁধাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কিছুকাল পরে কোম্পানির অনুমতিক্রমে রাজচন্দ্রের অর্থে 'বাবু-ঘাট' (১৮৩০ খ্রিঃ) ও পরে 'বাবুরোড' নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য রাজচন্দ্র আহিরীটোলার গঙ্গায় এক ঘাট প্রস্তুত করেন। নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য গৃহনির্মাণ এবং উহাতে চিকিৎসক ও দ্বারবান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। মেটকাফ হলে গভর্নমেণ্টের পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য তিনি ১০,০০০ টাকা দান করেন। বেলিয়াঘাটার খালের জন্য তিনি নিজ জমি গভর্নমেণ্টকে দান করেন এবং উহার বিনিময়ে বিনা ব্যয়ে

সাধারণের পারাপারের অনুমতিলাভ করেন। তাঁহার অপর কীর্তি সাধারণের জন্য চানকের তালপুকুর-খনন। সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার রক্ষার জন্যও রাজচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন। হুক ডেভিডসন এণ্ড কোম্পানির মুৎসদ্দী রামরতনবাবু তাঁহার বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অনুরোধে তিনি একবার ঐ কোম্পানির মালিককে এক লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হন। পরদিনই প্রকাশ পায় যে, সাহেব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। রাজচন্দ্র তথাপি পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ঋণ দিয়াছিলেন।

১২১৩ সালে এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির পদ্মমণি নামে একটি কন্যা জাত হয়। ১২১৮ সালে দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর, ১২২৩ অব্দে তৃতীয় কন্যা করুণাার এবং ১২৩০ সালে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার জন্ম হয়। জগদম্বার জন্মের চারিবৎসর পূর্বে রানী একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। এযাবৎ ইঁহারা ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দ্বিতল বাটিতে বাস করিতেছিলেন। তারপর রাজচন্দ্র বর্তমান বাটি নির্মাণ করেন। সাত মহলে বিভক্ত এই বাটিতে তখন অন্যূন তিন শত ঘর ছিল। ১২২০ সালে আরব্ধ হইয়া উহা ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয় এবং উহাতে ব্যয় হয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা। ইহাই 'রানী রাসমণি কুঠি' নামে অভিহিত। এইরূপে সর্ববিষয়ে সফলকাম এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও রাজচন্দ্র স্বল্পায়ু ছিলেন। ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ছিল অনুমান ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই রাজচন্দ্রের স্বোপার্জিত।

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও রাসমণি স্বামীর মৃত্যুতে শোকে অধীর হইয়া তিন দিবস তিন রাত্রি অনশনে কাটাইলেন। তারপর অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। যথারীতি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া গেলে তুলাদণ্ডে উঠিয়া রানী নিজের দেহের পরিমিত ৬০১৭ টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। অবশেষে বিষয়কর্মে মন দিতে হইল। কিন্তু রানী তখনও ব্রহ্মচারিণীরই ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে তিনি গৃহদেবতা ৺রঘুনাথজীউকে প্রণাম করিতেন ও তাহার পর স্ফটিকের মালা লইয়া জপে বসিতেন। গলায় তিনি তুলসীর মালা ধারণ করিতেন এবং উহার নিম্নে একগাছি সোনার হার শোভা পাইত। সারাদিন কার্যপরিচালনা ও বিশ্রামাদির পর সন্ধ্যার সময় তিনি আবার দেবার্চনায় বসিতেন। শাস্ত্রব্যাখ্যা, পুরাণাদিপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতি শ্রবণেও তাঁহার যথেষ্ট সময় কাটিত।

রাজচন্দ্রের পরলোকগমনের পর অনেকেরই মনে সন্দেহ উঠিল যে, রানী এই অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা। এমন কি, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু রানী স্বীয় জামাতা মথুরামোহনের দ্বারা বলিয়া দিলেন যে, প্রিন্সের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তিকে এইরূপ কার্যে নিয়োগ করা অশোভন; সামান্য যে বিষয়কর্ম আছে তাহা রানীই উপযুক্ত জামাতাদের সাহায্যে চালাইতে পারিবেন। এবংবিধ আত্মবিশ্বাস লইয়াই তিনি কার্যে অগ্রসর হইলেন।

রানীর তিন জামাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণিকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আটা, মধ্যমা কুমারীকে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী এবং তৃতীয়া করুণাময়ীকে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে করুণা পরলোকে গমন করিলে মথুরামোহনের সহিত কনিষ্ঠা জগদম্বার বিবাহ দেওয়া হয়। বিশ্বাসী, কর্মকুশল, ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ, প্রতিভাবান ও স্বধর্মনিষ্ঠ মথুরামোহন রানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। রানীর নির্দেশে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন; প্রয়োজনস্থলে আবশ্যকীয় আদেশপত্র, হিসাব ও দলিলাদিতে রানী স্বাক্ষর করিতেন।

বিষয়-কর্মে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইলেও রানীর দেবভক্তির কোন ন্যূনতা ছিল না। দৈনিক পূজারাধনা ব্যতীতও তিনি মহাসমারোহে উৎসবাদি করিতেন। সাধারণের রুচি ও রানীর অবস্থানুযায়ী উহাতে রাজসিক ধুমধামের প্রাচুর্য লক্ষিত হইলেও এইসকল ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব সাত্ত্বিক ভাবের ব্যতিক্রম হইত না। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে রথযাত্রার পূর্বে তাঁহার বাসনা জাগিল যে রৌপ্যময় রথে বসাইয়া দেবতাকে কলকাতার রাস্তায় ভ্রমণ করাইতে হইবে। রানীর ইচ্ছাপালনে সর্বদা তৎপর মথুরামোহন অমনি বিখ্যাত জহুরী হ্যামিল্টন কোম্পানিকে কার্য ভার দিতে চাহিলেন। কিন্তু রানী বলিলেন যে, দেশী কারিগর থাকিতে বিদেশীকে আহ্বান করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অতএব দেশী কারিগর ডাকা হইল এবং যথাসময়ে রথ প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপর আড়ম্বর সহকারে স্নানযাত্রার দিনে রথ প্রতিষ্ঠা হইল। মোট ব্যয় পড়িল,১,২২,১১৫ টাকা। রথের দিনে রানীর জামাতারা নগ্নপদে রথের পুরোভাগে চলিলেন এবং রানীর দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণও বিবিধ যানে আরোহণপূর্বক রথের পশ্চাতে চলিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে চলিল বিরাট শোভাযাত্রা। দুর্গোৎসবেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ-বিদায়, সধবাদিগকে শাঁখা-সিন্দূর ও বস্ত্রাদিদান এবং আহূত ও রবাহূতদিগের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত।

এক বৎসর ষষ্ঠীর দিন প্রত্যুষে বাদ্যোদ্যমসহকারে দিগন্ত কম্পিত করিয়া যখন নবপত্রিকা স্নানের জন্য ব্রাহ্মণগণ ভাগীরথীতীরে যাইতেছিলেন, তখন বাবু রোডের পার্শ্ববর্তী কোন শ্বেতাঙ্গের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া উহা

বন্ধ করিতে চাহিলেন। সংবাদ পাইয়া রানীর অনুচরগণ পরদিবস আরও বাদ্যাদির আয়োজন করিল। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে রানীর নিকট নিষেধাজ্ঞা আসিল এবং ক্রমে মকদ্দমা বাধিল। উহাতে রানীর পরাজয় ও ৫০ টাকা জরিমানা হইল। তিনি জরিমানা দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরান কাঠের দ্বারা জানবাজার হইতে বাবুঘাট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটি বন্ধ করিয়া দিলেন; সরকার হইতে আপত্তি আসিলে তিনি জানাইলেন, উহা তাঁহার খাসের জমি—ইহার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছানুরূপ করিতে পারেন। অবশেষে সরকারের অনুরোধে রাস্তা খোলা হইল এবং জরিমানার টাকাও ফেরত দেওয়া হইল।

রানী রাসমণির বাড়িতে দোল ও রাসোৎসবেও প্রচুর ব্যয় হইত। গৃহদেবতা ৺রঘুনাথজীউকে কেন্দ্র করিয়া সেসব দিনে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা আনন্দে মত্ত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজনাদিতেও অজস্র ব্যয় হইত। এতদ্ব্যতীত বাসন্তীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা ও কার্তিকপূজা প্রভৃতিও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত।

১২৫৭ বঙ্গাব্দে রানী নৌকারোহণে পুরুষোত্তমদর্শনে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গার মোহনায় তাঁহার নৌকা অপর নৌকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও ঝড়ে বিপদগ্রস্ত হইলে তিনি তীরবর্তী এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং যাইবার সময়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থে ব্রাহ্মণকে ১০০ টাকা দান করেন। জগন্নাথক্ষেত্রাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া রানী দেখিতে পান যে, সুবর্ণরেখার পরপার হইতে পথ প্রায় অব্যবহার্য। এই হেতু তিনি নিজব্যয়ে সুবর্ণরেখা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া তিনি ৺জগন্নাথ, ৺বলরাম ও ৺সুভদ্রার জন্য যাট হাজার টাকা ব্যয়ে তিনটি হীরক-খচিত মুকুট দান করেন। অধিকন্তু পাণ্ডাদিগকেও প্রচুর অর্থ দিয়া আপ্যায়িত করেন।

পর বৎসর তিনি সাগরসঙ্গমে স্নান করিতে যান। সেই বৎসরই ত্রিবেণীস্নান এবং নবদ্বীপদর্শন করেন। ফিরিবার পথে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং দ্বাদশ সহস্র মুদ্রাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করেন। রানীর সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইয়াছিল। ইতোমধ্যে তিনি একবার স্বীয় জন্মভূমি কোনা গ্রাম দেখিয়া আসেন এবং মিষ্ট আলাপ ও অর্থাদিদানে দরিদ্র পল্লিবাসীদিগকে তৃপ্ত করেন। তাঁহার পিত্রালয়ের নিকটে গঙ্গার ঘাট ছিল না। তাই গ্রামবাসীর অনুরোধে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় ঘাট নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত রানীর অর্থে হুগলীতে একটি এবং বাবুগঞ্জে আর একটি ঘাট প্রস্তুত হয়।

কোনা গ্রাম হইতে তিনি বংশবাটিতে ৺হংসেশ্বরীদর্শনে যান এবং রাজা নৃসিংহদেবের স্ত্রী রানী শঙ্করীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বংশবাটির

ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু রানী শঙ্করী বলেন যে, রাসমণি সেখানে দান করিলে শঙ্করীর দানের স্থান থাকিবে না। অগত্যা রাসমণি ঐ কার্যে বিরত হন। ইহার পরে রানী রাসমণি দ্বিতীয়বার নবদ্বীপদর্শন ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে দানের জন্য সাত দিনে ২০ হাজার টাকা খরচ করেন। এই দীর্ঘ চারিবৎসরব্যাপী তীর্থদর্শনাদিতে তাঁহার মোট প্রায় চারি-পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রানীর অন্যতম কীর্তি গঙ্গার জলকর বন্ধ করা। গভর্ণমেণ্ট একসময়ে গঙ্গায় মৎস্য ধরার জন্য কর নির্ধারিত করিলে ধীবরগণ অনন্যোপায় হইয়া রাসমণির নিকট উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি দশ হাজার টাকা দিয়া ঘুসুড়ি হইতে মেটিয়াবুরুজের সীমা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা লইলেন এবং রজ্জু ও বংশদণ্ডসহায়ে ('লীলাপ্রসঙ্গ'-মতে গঙ্গাকে শৃঙ্খলিত করিয়া) জাহাজ ও নৌকাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। সরকার আপত্তি জানাইলে রানী বলিলেন যে নদীতে বাষ্পীয় পোত চলিলে মৎস্য অন্যত্র পলাইয়া যাইবে এবং তাঁহার মৎস্যজীবীদের ক্ষতি হইবে; এই কারণে সরকার হইতে লব্ধ অধিকারসূত্রে তিনি তাহা বন্ধ করিয়াছেন। অবশেষে সরকার রানীকে তাঁহার টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন এবং জলকর তুলিয়া দিলেন; গঙ্গাও শৃঙ্খলবিমুক্ত হইলেন। বিজয়িনী রানীর সংবর্ধনার্থে বাঙালি গান গাহিল—

**ধন্য রানী রাসমণি রমণীর মণি।**
**বাঙলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥**
**দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে জননী।**
**দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্য বাঁচালে পরাণী ॥**

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রানীর দূরদৃষ্টি-বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছিল। পরামর্শদাতৃগণ তাঁহাকে টলটলায়মান ইংরেজ সরকারের কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বলিলেও তিনি তাহা করেন নাই; অধিকন্তু গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অনেক গোরা সৈন্য ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে থাকিত এবং পথচারী ও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার করিত। একদিন ঐরূপ অত্যাচারী গোরাদের কয়েকজনকে দ্বারবানগণ প্রহার করে। ইহার প্রতিশোধকল্পে গোরারা দলবদ্ধ হইয়া রাসমণির বাটি আক্রমণপূর্বক দ্রব্যাদি ভঙ্গ ও গৃহপালিত পশুপক্ষীকে হত্যা করিতে থাকিলে প্রাণভয়ে ও রানীর পরামর্শে সকলে পলাইয়া যান; শুধু রানী খড়্গহস্তে ৺রঘুনাথজীউর মন্দির-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া অসীম সাহস ও দেবভক্তি প্রদর্শন করেন। সৌভাগ্যক্রমে গোরারা সেদিকে যায় নাই। ইহার পর পল্টনের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা গোরাদের এই তাণ্ডবলীলা বন্ধ করেন এবং রানীর বাড়িতে গোরা সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত হয়।

রানী তাঁহার জমিদারির প্রজাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করিতেন। মকিমপুর পরগণার জনৈক নীলকর সাহেব উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে রানীর হস্তক্ষেপের ফলে উহা অচিরে নিবারিত হয়। জগন্নাথপুর তালুকের প্রজাদের উপর পার্শ্ববর্তী অপর জমিদারের অত্যাচার হইতে থাকিলে কাছারির কর্মচারী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হন। সংবাদ পাইয়া রানী বলিয়া পাঠান যে, প্রজাদিগকে রক্ষা করাই কর্মচারীর কর্তব্য; আক্রমণ যেন করা না হয়। যাহা হউক, আয়োজন দেখিয়াই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় এই অপ্রিয় ব্যাপার অধিকদূর গড়ায় নাই। বস্তুত এ প্রকার বলপ্রয়োগাদির ক্ষেত্রে রানী আনন্দ পাইতেন না; তাঁহার মাতৃহৃদয় গঠনকার্যেই তৃপ্তিলাভ করিত। তাই দেখিতে পাই যে, তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে 'টোনার খাল' খনন করাইয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগসাধন করেন এবং সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাটে ঘাট নির্মাণ করিয়া তিনি প্রভূত যশের অধিকারিণী হন।

রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরস্থাপন। ইহাই তাঁহাকে বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া করিয়াছে। এই বিষয়ক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। আমরা প্রধানত 'লীলাপ্রসঙ্গো'ক্ত বিবরণেরই অনুসরণ করিব।

১২৫৪ বঙ্গাব্দে রানীর ৺বিশ্বেশ্বরদর্শনের অভিলাষ হইল। তখনও রেলপথ সর্বত্র প্রসারিত হয় নাই; অতএব রানীর দাস-দাসী, খাদ্যসম্ভার এবং আত্মীয়-স্বজনকে জলপথে কাশীধামে লইয়া যাইবার জন্য পঁচিশখানি বজরা প্রস্তুত হইল। অশেষগুণশালিনী রানীর শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে অসীম ভক্তি ছিল। "জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ-অভিলাষিণী রানী রাসমণি' ('লীলাপ্রসঙ্গ')। কাশীধামে গমনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যাত্রার পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেবীর প্রত্যাদেশ পাইলেন,[১] "কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথী-তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্যপূজা গ্রহণ করিব" (ঐ)। এই দৈবনির্দেশলাভান্তে রানী সংগৃহীত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিলেন এবং তীর্থযাত্রার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভূমিক্রয় ও মন্দিরনির্মাণে ব্যয় করিতে আদেশ দিলেন। 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী-সমতুল'—এই প্রবাদবাক্য-স্মরণে মথুরানাথ প্রথমে পশ্চিম তীরেই জমির

১ "কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রানী কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন (লীলাপ্রসঙ্গ)।"

অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী সরকারি বারুদখানার দক্ষিণে ষাট বিঘা ভূমি ও তাহাতে অবস্থিত একটি কুঠি পঞ্চান্ন হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। স্থানটি হেষ্টি নামক কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন এটর্নীর ছিল। উহা দেখিতে কূর্মপৃষ্ঠ; উহার একাংশে কুঠির এবং অপরাংশে মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজী সাহেবের দরগা ছিল। শক্তিপীঠস্থাপনের পক্ষে এইরূপ কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশান অতি প্রশস্ত। ভূমিসংগ্রহান্তে প্রথমে গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট প্রস্তুত হয়; কিন্তু প্রবল বানের আঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায় মেকিন্টশ্ কোম্পানিকে উহা পুনর্নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। অতঃপর মন্দিরাদির কার্য আরম্ভ হইয়া ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৪ ইং) প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু রানীর ভয় হইল যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা শীঘ্র সমাপ্ত না হইলে তাঁহার জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে। অধিকন্তু দেবীমূর্তি নির্মাণের পর ভগ্ন হইবার ভয়ে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; এই সময়ে ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠিল এবং দেবী স্বপ্নে রানীকে বলিলেন, "আমাকে আর কত দিন ঐভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি। আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।" কিন্তু নিকটে কোনও সুদিন ছিল না; অতএব ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে বৃহস্পতিবার) প্রতিষ্ঠার দিন অবধারিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্বের একটি ঘটনার ফলস্বরূপে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইল।

রানীর বাসনা ছিল যে, মন্দিরে দেবীর অন্নভোগ হইবে। অথচ সামাজিক প্রথানুসারে উক্ত মন্দিরে কোন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পূজারি-পদে ব্রতী হইতে চাহিলেন না। রানী এই বিষয়ে প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমার বিধান দিলেন, "রানী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ঐ মন্দিরে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না" (ঐ)। তদনুসারে রানী নিজের গুরুর নামে দেবালয় অর্পণান্তে অন্য উপযুক্ত পূজকের অভাবে শ্রীযুক্ত রামকুমারকেই দেবীর পূজকপদে বরণ করিলেন।

নির্দিষ্ট স্নানযাত্রার দিনে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস আনন্দমুখরিত হইতে লাগিল। রানী অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দূরদেশাগত ব্রাহ্মণ ও অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করিলেন। 'দেবালয়-নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রানী প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে

ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগনা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন" (ঐ)।

রানীর ঐ সময়ের সাত্ত্বিকভাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, "দেবীমূর্তিনির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রানী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্নভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপূজাদি করিতেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে ভ্রাতার অনুরোধসত্ত্বেও কালীবাড়িতে বাস ও অন্নপ্রসাদগ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু দৈববিধানে পরে উহাতে স্বীকৃত হন; অধিকন্তু মথুরানাথের বিশেষ অনুরোধে দেবীর পূজকপদেও ব্রতী হন; এই সূত্রে রানীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে এবং উভয়ে পরস্পরের গুণগ্রামে মুগ্ধ হন। ইহার পর ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিনে ৺গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় পূজক ক্ষেত্রনাথ ভূপতিত হইলেন এবং বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সমস্যা দাঁড়াইল, নূতন মূর্তি গড়াইতে হইবে অথবা ভগ্নপদের সংস্কার করিলেই চলিবে! রাসমণির আহ্বানে পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বিধান দিলেন যে ভগ্নমূর্তি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত এবং তৎস্থলে নূতন বিগ্রহ নির্মিত হওয়া উচিত। তদনুসারে নূতন মূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সভাভঙ্গ হইলে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, "ছোট ভট্চাজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয়নি। তিনি কি বলেন জানতে হবে।" মথুরানাথ পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রেমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলিলেন, "রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে এনে তার জায়গায় বসানো হত, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হত? এখানেও সেইরকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা করা হচ্ছে তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" রানী এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিগঠনে অভিজ্ঞ জানিয়া জামাতা মথুরানাথের পরামর্শে তাঁহাকেই সংস্কারের ভার দিলেন। নিপুণহস্তে সংস্কারকার্য এমন সুসম্পন্ন হইল যে, পরীক্ষা করিয়াও ভগ্ন স্থান ধরিতে পারা যাইত না। অতঃপর ক্ষেত্রনাথ কার্যচ্যুত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে ৺রাধাগোবিন্দ-মন্দিরের পূজাভার গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে বিভিন্ন কালে ৺কালীমন্দিরে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেসব বিবিধ ভাবের পূজা চলিতেছিল মন্দিরের কর্মচারিগণ তাহাকে অনাচার আখ্যা দিলেও গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান মথুরানাথের বুঝিতে বাকি ছিল না যে, এই পূজারির ঐকান্তিক ভক্তির

ফলে দেবী জাগ্রতা হইবেন এবং রানীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। রাসমণি পূর্বেই ঠাকুরের মুখে ভক্তিমাখা সঙ্গীত-শ্রবণে পুলকিত হইয়াছিলেন। এই গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

**কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।**
**সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে ॥**
**জেনেছি জেনেছি তারা, তারা কি তোর এমনি কারা।**
**তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে ॥**

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের সংস্কারের পূর্বে ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত সিদ্ধান্তের পরিচয়লাভে সে প্রীতি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। তথাপি অল্পকাল পরে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রানীর নিজমনে সাধনাসম্ভূত অতি উচ্চ ভক্তিভাব না থাকিলে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সেদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। রানী সেদিন "মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐ স্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া 'এখানেও ঐ চিন্তা' বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রানী উহাতে নিজমনের দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল" ('লীলাপ্রসঙ্গ')। এদিকে রানীর উপর প্রহার হইতে দেখিয়া মন্দিরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; এমন কি, ভট্টাচার্য মহাশয়কে শাস্তি দিবার জন্য কর্মচারীরা শশব্যস্তে তথায় সমবেত হইল। কিন্তু রানী গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, "ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই; তোমরা তাকে কেউ কিছু বলো না।" মথুরবাবুও সমস্ত শুনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরানীর আদেশই বহাল রাখিলেন।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, মে) পর রানী রাসমণি দীর্ঘকাল ইহধামে ছিলেন না। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। তখনও দক্ষিণেশ্বরের জন্য ক্রীত দিনাজপুরের জমিদারি দেবোত্তর করা হয় নাই। এখন উহা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে তখন কেবল শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা বাঁচিয়া ছিলেন। ভবিষ্যতে সম্পত্তির অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য রোগশয্যাশায়িতা রানী উভয় কন্যাকে দেবোত্তর করিবার সম্মতিযুক্ত একখানি ভিন্ন একরারনামা লিখিয়া দিতে বলিলেন। জগদম্বা উহাতে সম্মতা হইলেও পদ্মমণি সহি দিলেন না। তাই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রানী শান্তিলাভ করিতে পারিলেন

না। অগত্যা ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দেবোত্তর দানপত্রে সহি করিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা করিবার পরদিন (মঙ্গলবার) রাত্রিকালে শরীর ত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

"শরীরত্যাগের কিছু পূর্বে রানী রাসমণি কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন আমার মা আসছেন! তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে।' কিছুক্ষণ পরে 'মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে, মা!'...কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রানী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে" (ঐ)।

এইরূপ ভক্তিমতী নারীর জীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ণয় করা অসম্ভব; ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ধারণায় আনিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরই অনুধ্যান করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজাপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।... রানীর প্রতিকার্যেই জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।"

# গোপালের মা

আনুমানিক ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীযুক্তা অঘোরমণি দেবী কলকাতা মহানগরীর প্রায় সাত মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী কামারহাটী গ্রামে ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল) মহাশয়ের দরিদ্রগৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। নয় বৎসর বয়সে চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত পাইগহাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। সেই একবার মাত্র স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিতৃগৃহে অবস্থানকালেই তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিধবা হন। বালবিধবা অঘোরমণি পিতামাতার জীবদ্দশায় মস্তক মুণ্ডিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহার পর পূর্ণ বৈধব্যের বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহ ছিল কিঞ্চিৎ খর্ব, সুস্থ ও সুগঠিত; বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সর্বশরীরে ছিল পবিত্রতার এক অলৌকিক আভা। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পরেও প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

কামারহাটীতে অঘোরমণির পিতৃগৃহের নিকটেই কলকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাটি ছিল। দত্ত মহাশয় কামারহাটীতে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাসমারোহে সেবাপূজাদি চালাইতে থাকেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় যখন পূজার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তখন দত্তগৃহিণী ঠাকুর-বাটিতে অবস্থানপূর্বক পূজাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হন। ধর্মপ্রাণা গৃহিণী কঠোর ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান পূর্বক ভূমিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, একসন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস ও শ্রীবিগ্রহের পূজা ইত্যাদি লইয়া থাকিতেন। ঐ সময়ে দত্তবংশের পুরোহিতকুলের শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য ঐ মন্দিরের পূজক ছিলেন; তিনি অঘোরমণির ভ্রাতা। ঐ সূত্রে এবং স্বভাবগত ও আচারগত সাদৃশ্যবশত দত্তগৃহিণী ও অঘোরমণির মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্যের উদয় হয়। অঘোরমণি শ্বশুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দত্তগৃহিণীর ঠাকুর বাড়িতেই আসিয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। পিত্রালয়ে মাত্র দিনে দুই-একবার যাইতেন।

দত্তদের ঠাকুরবাটির দক্ষিণপ্রান্তে যে কক্ষে বালতপস্বিনী অঘোরমণি বাস করিতেন উহার দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গা দর্শন হইত। উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। ঐ ঘরে তিনি দিবারাত্র জপে মগ্ন থাকিতেন। জপের সময় কেহ কাছে থাকে, ইহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না; কাজেই ঐ ঘরে আর কেহ

থাকিতে পাইত না। তিনি খুব আচারী ছিলেন। নিত্য দুই বেলা স্নান করিতেন—সকালে গঙ্গায়, বিকালে পুষ্করিণীতে। গঙ্গাস্নানান্তে তটবর্তী বিল্বমূলে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতেন; বিকালে ৺রাধাকৃষ্ণের দালানে বসিয়া জপাদি করিতেন। আম্রবৃক্ষের বিপরীত দিকে তাঁহার যে রন্ধনশালা ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। তথায় স্বহস্তে রন্ধনান্তে কদলীপত্রে গোপালের ভোগ সাজাইয়া সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন পাতিয়া ও ক্ষুদ্র পানপাত্রে গঙ্গাজল রাখিয়া দেবতাকে আহ্বানপূর্বক আহার করাইতেন; পরে স্বয়ং প্রসাদ পাইতেন। আলু-উচ্ছে ও মুগের ডাল ভাতে ছিল তাঁহার প্রায় নিত্যকার আহার। রাত্রে জলখাবার ছিল মাত্র বাগানের নারিকেলে প্রস্তুত নাড়ু ও একটু দুধ। বাগানে শুষ্ক পত্র ও ভগ্ন শাখাদি কুড়াইয়া তিনি রন্ধন করিতেন। শ্বশুরকুল হইতে লব্ধ ধানজমি ও স্ত্রীধনাদি বিক্রয় করিয়া যে পাঁচ-সাত শত টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দত্তগৃহিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যে সামান্য আয় হইত, উহা দ্বারাই ব্যয়সংকুলান করিতেন। ছয় মাসের মশলা, চাল-ডাল ইত্যাদি দ্রব্য কয়েকটি হাঁড়ির মধ্যে মেজেতেই থাকিত। তরিতরকারি কামারহাটীর কলের ধারে হপ্তার বাজার হইতে কিনিতেন। কুলা, শিল-নোড়া ইত্যাদি সব একই ঘরে থাকিত। একটি শিকায় মুড়ি, বাতাসা, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি আহার্য থাকিত। একটি তোরঙ্গে সামান্য বস্ত্রাদিও রক্ষিত ছিল। দাঁত শেষ পর্যন্ত দুই-চারিটি ছিল—গুল দিয়া দাঁত মাজিতেন। আহারের পর জোয়ান, ধনের চাল ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মুখে দিতেন। পান নিজে না খাইলেও গোপালকে ভোগ দিতেন, অথবা কেহ ছেঁচিয়া দিলে একটু-আধটু প্রসাদ পাইতেন।

দত্তগৃহিণীর সহিত প্রীতি এবং নিজ স্বাভাবিক ভক্তির প্রেরণায় ৺রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে কিঞ্চিৎ কার্যও তিনি করিতেন, এতদ্ব্যতীত গৃহিণীর সহিত বসিয়া ভোগের জন্য তরকারিও কুটিতেন। তূষ্ণীম্ভাবে একান্তে বাস করাই ছিল তাঁহার রীতি। রাত্রি দুইটায় উঠিয়া শৌচাদিসমাপনান্তে তিনটা হইতে সকাল আটটা পর্যন্ত তিনি জপে মগ্ন থাকিতেন। পরে মন্দির পরিষ্কার করা, বাসন-মাজা, ফুল-তোলা, মালা-গাঁথা, চন্দন-বাটা ইত্যাদিতে কিছুকাল ব্যয়িত করিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদির পর স্বপাক আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন। অতঃপর আবার জপারাধনায় বসিতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শনান্তর আবার সাধনা চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে প্রায় ত্রিশ বৎসর ঐরূপে এই ক্ষুদ্রকক্ষেই সাধনার একটানা স্রোত চলিয়াছিল। সম্ভবত একবারমাত্র তিনি এই তপস্যা ভঙ্গ করিয়া দত্তগৃহিণীর সহিত রেলযোগে কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পড়িতে পারিতেন কিনা বলা কঠিন। তবে কামারহাটী ত্যাগের পর তাঁহার গৃহে চশমা সহ গৈরিকবস্ত্রাবৃত একখানি কাশীদাসী

মহাভারত, একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি গীতা এবং রামচন্দ্র দত্তের দেওয়া একখানি সঙ্গীত-পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

অঘোরমণি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভদিনে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম তখন সুবিদিত। দত্তগৃহিণী সেই নামশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সে দিবস তাঁহার দর্শনার্থে অঘোরমণির সহিত নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগকে সাদরে নিজের ঘরে বসাইলেন এবং ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দিয়া ও ভজন শুনাইয়া পুনর্বার আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। দত্তগৃহিণীও তাঁহাকে একদিন কামারহাটীর ঠাকুরবাড়িতে যাইবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন। ঠাকুর উহা গ্রহণ করিলেন এবং পরে একদিন তথায় গমনপূর্বক শ্রীবিগ্রহের জীবন্ত প্রকাশের সম্মুখে সংকীর্তন ও নৃত্যাদি করিলেন এবং প্রসাদগ্রহণান্তে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইতোমধ্যে অঘোরমণির জীবনে এক মহা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট হইল। প্রথম দর্শনের দিনেই ঠাকুরের প্রতি তিনি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেন; মনে হইল "ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভক্ত এবং ইহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব।" অতএব অল্পদিন পরেই জপ করিতে করিতে অঘোরমণির প্রাণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমনের অভিলাষ উদিত হওয়ামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া তিনি একাকিনী পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ? আমার জন্য কি এনেছ দাও।" অঘোরমণি তো ভাবিয়া অজ্ঞান, "কেমন করে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি? এঁকে কত লোক কত ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে—আবার তাও ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!" সলজ্জভাবে সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলে ঠাকুর উহা সানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয় যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলুবেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" ধর্মকর্মের কথা না হইয়া এইরূপে কেবল খাবার কথাই হইতেছে দেখিয়া অঘোরমণি ভাবিলেন, "ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই! আমি গরিব কাঙাল লোক, কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, আর আসব না।" কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে দেখেন, মন কিছুতেই দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের বহির্দ্বার অতিক্রম করিতে চায় না; অনেক বলপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে কামারহাটীতে লইয়া আসিতে হইল। ইহারই কয়েকদিন

পর কামারহাটীতে ব্রাহ্মণী চচ্চড়ি রান্না করিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহা চাহিয়া খাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "আহা, কি রান্না! যেন সুধা, সুধা!" সে আনন্দে ব্রাহ্মণীর চক্ষে জল আসিল—ভাবিলেন, তিনি গরিব কাঙাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন। তিন-চার মাস এইরূপেই ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল—আর সেই খাই খাই! কেবল "এটা এনো, ওটা এনো"—ইত্যাদির জ্বালায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধা ভাবেন, "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসব না!" কিন্তু সে কি বিষম আকর্ষণ—দূরে গেলেই আবার টানিয়া আনে!

ক্রমে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের বসন্ত আসিয়া পড়িল। রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়া জপসমাপনান্তে ব্রাহ্মণী জপসমর্পণের পূর্বে প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বামে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি মুষ্টিবদ্ধপ্রায় আর মুখে মৃদু হাস্য—ঠিক যেমন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়াছেন তেমনি। ভাবিলেন, "একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে এলেন?" অবাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস করিয়া স্বীয় বাম হস্তে ঠাকুরের বাম হস্তটি ধরিলেন, অমনি সে মূর্তি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার গোপাল। সে হামা দিয়া এক হাত তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মা ননী দাও।" ব্রাহ্মণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত—এ কি কাণ্ড! তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথায় পাব, বাবা?" সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই—সে খাইবেই। তখন শিকা হইতে নারিকেল নাড়ু দিয়া বলিলেন, "বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।" জপ সেদিন আর হইল না—চলিতে লাগিল গোপালের অপূর্ব লীলা। সে ক্রোড়ে বসে, মালা কাড়িয়া লয়, স্কন্ধে বসে, ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়! যেমন সকাল হইল অমনি গোপালের মা পাগলিনীর ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন; গোপালকে বুকে লইয়া চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলেন, গোপালের লাল টুকটুকে পা-দুখানি বুকের উপর ঝুলিতেছে।

সকাল প্রায় সাতটার সময় আলুথালু বেশে 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গোপালের মা ঠাকুরের কক্ষে পূর্বদিকের দ্বারপথে ঢুকিলেন। তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, আঁচল ভূমিতে লুটাইতেছে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়া ঠাকুরের পার্শ্বে বসিলেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সাশ্রুনয়নে গোপালের মা নিজের সহিত আনীত ক্ষীর, সর, ননী গোপালরূপী

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব-সংবরণ করিয়া ঠাকুর আপনার চৌকিতে বসিলেন। গোপালের মার কিন্তু ভাব আর থামে না—সারাক্ষণ তিনি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন "ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে শিব"—ইত্যাদি। এই দেবদুর্লভ দৃশ্যে মুগ্ধা গৃহসম্মার্জনরতা অপর ভক্তমহিলা ভাবিতে লাগিলেন—যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির স্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার আজ এ কীদৃশ আচরণ! একদিকে দ্বিষষ্টিবর্ষাতীতা বৃদ্ধার অনুপম মাতৃস্নেহ, অপরদিকে অষ্টচত্বারিংশৎ বয়স্ক প্রৌঢ়ের গোপালভাব! শোনা যায় বটে যে, যশোদাভাবে আত্মহারা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ক্রোড় কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইত; কিন্তু উহা অতীতের শোনা কথা আর ইহা প্রত্যক্ষ! ভাবসংবরণান্তে গোপালের মার সে-আনন্দ দেখিয়া উপস্থিত অপর মহিলাটিকে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!" ভাবের আধিক্যে অঘোরমণি সেদিন ঠাকুরকে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন, "এই যে গোপাল আমার কোলে, ঐ যে তোমার ভেতর ঢুকে গেল; ঐ আবার বেরিয়ে এল; আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়"—ইত্যাদি। গোপাল এইরূপে কখনও ঠাকুরের সহিত মিশিয়া এবং কখনও বাল্যলীলার তরঙ্গ তুলিয়া একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকেই গোপালরূপে প্রত্যক্ষ করাইল, অপরদিকে তেমনি গোপালের মাকে আত্মহারা করিল। অঘোরমণি আজ হইতে বাস্তবিকই গোপালের মা হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবপ্রশমনের জন্য ঠাকুর সেদিন বহু প্রকারে যত্ন করিতে লাগিলেন—তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, তাঁহাকে ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়াইলেন এবং সমস্ত দিন নিকটে রাখিয়া স্নানাহার করাইলেন। খাইতে খাইতে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতা করে বেচে দিন কাটিয়েছে—তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছ?"

সন্ধ্যায় ঠাকুর যখন গোপালের মাকে বিদায় দিয়া কামারহাটী পাঠাইলেন, তখন গোপালও ক্রোড়ে উঠিয়া চলিল এবং গৃহে পৌঁছিয়া নানা রঙ্গ, আবদার ইত্যাদিতে মায়ের জপভঙ্গ করিতে লাগিল। অবশেষে গোপালের মা জপ ছাড়িয়া তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন। তক্তপোশের উপর মাদুর পাতা—নরম বিছানা বা বালিশ তাঁহার নাই—তাই গোপাল খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অগত্যা ব্রাহ্মণী স্বীয় বাম বাহুতে তাহার মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ এই রকমে শোও, রাত পোহালেই কাল কলকাতা গিয়ে তোমায় নরম বালিশ করিয়ে দেব।" পরদিন সকালে প্রত্যক্ষ গোপালের রান্নার জন্য বাগান হইতে কাঠ কুড়াইতে গেলে গোপালও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কাঠ আনিয়া রান্নাঘরে রাখিতে লাগিল। রন্ধনকালেও দুরন্ত শিশু কাছে

বসিয়া বা পিঠে পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল ও আবদার করিতে থাকিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে কখনও মিষ্ট কথায় ভুলাইতে লাগিলেন, কখনও বা বকিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত আলাপনান্তে নহবতে জপে বসিলেন। জপশেষে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, এমন সময় পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুর তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?" ঠাকুর—"সব হয়েছে।" গোপালের মা—"সব হয়েছে?" ঠাকুর—"হাঁ, সব হয়েছে।" গোপালের মা—"বল কি? সব হয়েছে?" ঠাকুর—"হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে। তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয়তো করতে পার।" গোপালের মা—"তবে এখন থেকে যা কিছু করব সব তোমার, তোমার, তোমার।" ইহার পরে তিনি মালার থলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দিন পরে ভাবিলেন, "একটা কিছু তো করতে হবে, চব্বিশ ঘণ্টা করি কি?" অতএব গোপালের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণে মালা ফিরাইতে লাগিলেন।[১]

অঘোরমণি বালবিধবা ছিলেন বলিয়া অত্যধিক আচারনিষ্ঠা পালন করিতেন। প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আগমনকালে একদিন তিনি যখন রন্ধনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পাতে বোকনা হইতে ভাত পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতর্কিতে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সেদিন আর খাওয়া হইল না। তিনি যেদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রন্ধন করিয়া খাইতেন, সেদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য ঝোল-ভাত রান্নার পর গোবর গঙ্গাজল প্রভৃতির দ্বারা উনুন পাড়িয়া দিতেন; তবে ব্রাহ্মণীর বোকনা চাপিত। কিন্তু গোপালের সাক্ষাৎকারের পরে সেই মহাভাবতরঙ্গে নিষ্ঠাদিও কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোপাল যখন যাহা চায় তখনই খাইতে দিতে হয়; আবার খাইতে খাইতে সে মায়ের মুখে গুজিয়া দেয়। তাহা ফেলা চলে না—ফেলিলে গোপাল কাঁদে। ব্রাহ্মণী মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই লীলা। ইহার পর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ায় তাঁহার আহারাদি সম্বন্ধে আর আপত্তি রহিল না।

একদিন ব্রাহ্মণী এক পয়সার বাতাসা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ধনী ভক্তেরা অনেক মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছেন, তাই ঠাকুর তাঁহার নিকট খাবার

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণও যে আপনাকে গোপাল মনে করিতেন এবং অঘোরমণির ভিতরে অধিষ্ঠিত গোপাল খাইলেই তাঁহার খাওয়া হইত, এই বিষয়ে একটি ঘটনা যোগানন্দপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ('লীলাপ্রসঙ্গ' ২য় ভাগ—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চাহিলেও লজ্জায় উহা বাহির করিতে পারিলেন না। তবু ঠাকুর ভাবাবস্থায় উহার দুই-একটি তুলিয়া লইয়া খাইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে গোপালের মা অবশিষ্ট বাতাসাগুলি লইয়া আসিলেন এবং উহাতে প্রসাদবুদ্ধি থাকিলেও পথে যাতায়াতের ফলে অশুচি হইয়াছে মনে করিয়া উহা বাগানের মালিকে খাইতে দিলেন। তারপর এক দিবস খড়দহে শ্যামসুন্দরদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে একজন পূজারি তাঁহাকে প্রসাদ দিলে তিনি উহা লইয়া অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কে একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি গো, খাবি তো? না আবার মালিকে দিবি?" চমকিতা ব্রাহ্মণী শুনিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরব, যদিও আকৃতিটি ভিন্ন। অমনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আমি অপরাধ করেছি, আমার কি হবে?" চিরশিশু রামকৃষ্ণ সেই ঘটনা শুনিয়া কেবল হাসিলেন।

অঘোরমণি অবিরাম দুইমাস কাল বাৎসল্যরতির প্রবলতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়াছিলেন এবং বালগোপালকে কোলেপিঠে লইয়া বাস করিয়াছিলেন। এইরূপ দীর্ঘকাল চিন্ময়-নাম, চিন্ময়-ধাম ও চিন্ময়-শ্যামের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অতি অল্প মহাভাগ্যবানেরই সম্ভব। দুই মাস পরে ভাবের আতিশয্য মন্দীভূত হইলেও অঘোরমণি একান্তমনে একটু চিন্তা করিলেই গোপালের দর্শন পাইতেন। তাঁহার পরবর্তী জীবন এই লীলাখেলারই ইতিহাস।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের উলটা রথের দিনে ঠাকুর বলরাম মন্দিরে আগমনপূর্বক দুই দিন ও দুই রাত্রি তথায় যে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহার আবেগে প্রায় প্রত্যেক ভক্তই তৎসকাশে আগমন করিলেও গোপালের মাকে না দেখিয়া ঠাকুর জলযোগকালে গৃহের স্ত্রীভক্তদিগকে তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনাইলেন এবং বলিলেন, "তাঁকে এখানে আনতে পাঠাও না।" সংবাদ পাইয়া বলরাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যাকালে ঠাকুর দ্বিতলে হল-ঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ বালগোপাল-মূর্তির ন্যায় দুই জানু ও এক হাতে ভূমিতে হামা দেওয়ার মতো অবস্থানপূর্বক এক হাত তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে সতৃষ্ণ নয়নে যেন কাহার দিকে তাকাইয়া কি চাহিতে লাগিলেন—ভাবপ্রাবল্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছবিতে আঁকা গোপালবৎ নিশ্চল এবং চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত হইল। ঠিক তখনি গোপালের মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে স্বীয় ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে গোপালের মার সম্মান ও সংবর্ধনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তিপ্রভাবেই ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালরূপ ধারণ করিলেন। গোপালের মা কহিলেন, "আমি কিন্তু, বাবু, ভাবে অমন কাঠ

হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড়ুবে—ও মা, ওকি, একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নাই!" বাস্তবিকই ঠাকুর যেদিন প্রথম কামারহাটীতে যান, সেদিন তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া অঘোরমণি ভয়ে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন?"

গোপালের অবিরাম দর্শন যখন প্রথম বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোপালের মা ভীত হইয়া সাশ্রুনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন, "গোপাল, তুমি আমার কি করলে, আমার কি অপরাধ হলো, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মতো (গোপালরূপে) দেখতে পাই না?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ওরূপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না। একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।" গোপালের দর্শন বিরল হওয়ায় আর এক বিপরীত অবস্থা ঘটিল। বায়ুপ্রধান ধাতে ব্যাকুলতাবৃদ্ধির ফলে বুকে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; তাই ঠাকুরকে বলিলেন, "বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরছে।" ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন, "ও তোমার হরি-বাই। ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভাল। যখন বেশি কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ো।" এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সেদিন অনেক ভাল জিনিস খাওয়াইলেন।

ঠাকুর সকাম ব্যক্তিদের আনীত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে খাইতে দিতেন না। শুধু নরেন্দ্রের বেলা ইহার ব্যতিক্রম হইত। তাদৃশ জীবন্মুক্তি-লাভের পর গোপালের মার সম্বন্ধেও ঠাকুরের অনুরূপ আচরণই লক্ষিত হইল। একদিন এরূপ অনেক সকাম ভক্ত নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপালের মা উপস্থিত হইলে শিশু যেমন মাতাকে পাইয়া আদর করে, তেমনি ঠাকুরও তাঁহার মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোপালের মার শরীর দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, "এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা—হরিময় শরীর!" গোপালের মা তখন নির্বিকার—ঠাকুর পাদস্পর্শ করিলেও কোন প্রতিবাদ নাই। পরে ঘরে যত কিছু উত্তম জিনিস ছিল সব আনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বস্তুত গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর ঐভাবে খাওয়াইতেন বলিয়া তিনি একদিন প্রশ্ন করিলেন, "গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।" গোপালের মা—"আগে কবে খাইয়েছি?" ঠাকুর—"জন্মান্তরে।" আলোচ্য দিবসে সর্বক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া গোপালের মা যখন সন্ধ্যায় কামারহাটী ফিরিবেন, তখন ঠাকুর ভক্তদের আনীত সমস্ত মিছরি তাঁহাকে

দিলেন। গোপালের মা যখন ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, তখন ঠাকুর তাঁহার চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিলেন, "ওগো ছিলে গুড়, হলে চিনি, তার পরে হলে মিছরি! এখন মিছরি হয়েছ, মিছরি খাও আর আনন্দ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—গোপালের মার আচরণের প্রতি ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি। বলরাম-ভবনে পূর্বোক্ত উলটা-রথের পর ঠাকুর যে নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন তাহাতে দুই-একজন বালকভক্ত ও গোলাপ-মার সহিত গোপালের মাও একটি বড় পুঁটুলি লইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণীকে দরিদ্র জানিয়া বলরামবাবুর পরিবারবর্গ তাঁহাকে বস্ত্রাদি বহু আবশ্যকীয় দ্রব্য দিয়াছিলেন। যে ঠাকুর গোপালের মার সহিত এযাবৎ অতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেছিলেন, তিনি ঐ পুঁটুলিটি দেখিয়া যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন। ভাবস্রোত বাধা পাইয়া বিপরীত মুখে চলিল। গোপালের মার সহিত তিনি কথা বলেন না, অপরের নিকট বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে ঐ পুঁটুলির দিকে চাহেন—এইসকল দেখিয়া গোপালের মা মরমে মরিয়া গেলেন; তাঁহার মনে হইল, পুঁটুলিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়াই উচিত। তাহার পর দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে বলিলেন, "ও বউমা, গোপাল এইসব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়?—তা এসব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই!" বুড়ির কাতরতা দেখিয়া করুণাময়ী মা বলিলেন, "উনি বলুন গে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, মা?—দরকার বলেই তো এনেছ!" গোপালের মা তথাপি কয়েকটি দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন এবং সভয়ে দুই-একটি তরকারি রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে গেলেন। বৃদ্ধাকে অনুতপ্ত দেখিয়া ঠাকুর তখন প্রসন্ন হইয়াছেন; অতএব আশ্বস্তা হইয়া গোপালের মা কামারহাটীতে ফিরিলেন।

অশেষরহস্যময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি যেন তাঁহার দর্শনাদির কথা নরেন্দ্রকে বলেন। ইহার পূর্বে যখন যাহা কিছু দর্শন হইত, গোপালের মা সমস্তই ঠাকুরকে বলিতেন। তাহাতে ঠাকুর সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, দর্শনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই—এমন কি, তাঁহাকেও না; বলিলে দর্শন আর হয় না। তাই আজ অন্যরূপ আদেশ পাইয়া গোপালের মা প্রশ্ন করিলেন, "তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?"

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, হইবে না। তখন গোপালের মা নরেন্দ্রকে আনুপূর্বিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান; আমি দুঃখী কাঙালী—কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এসব তো মিথ্যা নয়?" বৃদ্ধার ভক্তি, প্রেম, ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির

বিবরণ শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না; তাই সাশ্রুনয়নে উত্তর দিলেন, "না মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য।"

এই সময়ে একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে লইয়া কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুর ও রাখালকে দত্তবাবুদের বৈঠকখানায় বিছানা পাতিয়া বসাইয়া রন্ধনে মন দিলেন। তারপর ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া মেয়েমহলের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে আপনার লেপখানির উপর ধোপদস্ত চাদর পাতিয়া ঠাকুরকে বিশ্রাম করিতে দিলেন। রাখালও পার্শ্বে শয়ন করিলেন। এমন সময় ঠাকুর একটি দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন এবং ঘরের কোণে তাকাইয়া দেখিলেন, দুইটি কঙ্কালময় প্রেতমূর্তি সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতেছে, "আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন; রাখালও সঙ্গে গেলেন। কিন্তু গোপালের মাকে ঠাকুর কিছুই বলিলেন না; কারণ বৃদ্ধাকে সেখানে বাস করিতে হইবে। রাখালকে পরে সব বলিলেন।

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর শোকে ম্রিয়মাণা ও সর্বদা গোপালচিন্তায় নিমগ্না গোপালের মা বহুবার সর্বভূতে গোপালের সাক্ষাৎকার পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবার মাহেশের রথযাত্রায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, যাহারা রথ টানিতেছে এবং দর্শনার্থী অপার জনসঙ্ঘ—সকলেই গোপালের বিভিন্ন রূপ। ঐ অনুভব সম্বন্ধে তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন, "তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না—নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।" আর একদিন তিনি আহারের সময় ভাবে গদগদ হইয়া গোপালবুদ্ধিতে উপস্থিত স্ত্রীভক্তদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

দর্শনাদির ফলে গোপালের মার মন এতই উদার হইয়াছিল যে, ঠাকুরের লীলাকালে দক্ষিণেশ্বরে একদিন নরেন্দ্র একবাটি মহাপ্রসাদ খাইয়া উঠিয়া গেলে ঠাকুর যখন জনৈক স্ত্রীভক্তকে স্থানটি পরিষ্কার করিতে বলিলেন, তখন গোপালের মা স্বতই অগ্রসর হইয়া ঐ কাজ করিলেন। উহা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, "দেখ দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!" স্বামীজী বিদেশ হইতে পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ-সহ ফিরিয়া একদিন গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, "আমার সব সাহেব-মেম চেলা আছে, তাদের কি তুমি কাছে আসতে দেবে, না তোমার আবার জাত যাবে?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "সে কি বাবা? তারা তোমার সন্তান, তাদের আমি আদর করে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো। তোমার ও-ভয় আর

নাই।" সত্যই দেখা গেল যে, গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম স্বামী সদানন্দের সহিত বাগবাজারের রাস্তায় দেখিতে পাইলেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও গুপ্ত, এটি কেরে? একি নরেনের মেয়ে—যে তার সঙ্গে এসেছে?" অনুমান সত্য জানিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা সারা বুল, শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতা একদিন নৌকাযোগে কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা তাঁহাদিগকে সাদরে আপনার বিছানায় বসাইলেন, তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন এবং মুড়ি ও নারিকেল নাড়ু খাইতে দিলেন। বিদেশিনীরা উহা তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিলেন এবং আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শ দেখে এসেছ! উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যাময় ভারত বিদায় নিচ্ছে—আর সে ফিরবে না!"

ঠাকুরের প্রকটলীলা-সমাপনের পরে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে বলরামবাবুর বাটিতে বাস করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে কখনও কখনও খাবারের দোকানে যাইতে দেখা যাইত। তখন নারীরা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া যেরূপ বাঁকিয়া চলে, তিনি সেইরূপ ভাবেই চলিতেন এবং অপরের অদৃশ্য দুষ্ট গোপালের সহিত প্রকাশ্যে কথা বলিতেন, "খাবি, খাবি? খা, খা—কত খাবি খা। আমি কিনতে কোথা পাব?" অঘোরমণির একটি প্রিয় বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যেও তিনি গোপালের দর্শন পাইতেন। একদিন ১৭নং বসুপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার ঘাড়ে বিড়ালটি শুইয়া আছে—নিবেদিতা নির্বিকার! কিন্তু সেবিকা উহাকে তাড়াইয়া দিতে গেলে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন, "কি করলি মা, কি করলি? গোপাল গেল রে, গোপাল গেল।" গোপালভাবে ভাবিতা অঘোরমণির দেহত্যাগের কিছু পূর্বে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি "আমি খাব", "আমি শোব" ইত্যাদি না বলিয়া বলিতেন, "গোপাল খাবে", "গোপাল শোবে"।

শুধু তাহাই নহে, গোপালই ছিল তাঁহার সমস্ত জ্ঞানের আকর। ১৮৮৭-এর শেষভাগে তাঁহার বলরাম-গৃহে অবস্থানকালে এক সায়াহ্নে অনেক ভক্ত তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "ওগো, আমি যে মেয়েমানুষ! বুড়ো মানুষ! আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের কথা জানি? তোমরা শরৎ, তারক, যোগেনকে জিজ্ঞাসা করগে, যাও না।" জিজ্ঞাসুরা জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞাসা করি। ও গোপাল, গোপাল, ওরে, এরা কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি? তুই বাপু, এদের একবার বলে দে না।" অতঃপর

প্রশ্ন চলিতে লাগিল, আর উত্তরও আসিতে লাগিল, "ওগো, গোপাল এই বলছে।" মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতে কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছেন! এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গোপালের মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও গোপাল, গোপাল, তুই চলে যাচ্ছিস কেন? ওদের কথার জবাব দিবিনি?" গোপাল চলিয়া গেল—আর প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

মাঝে মাঝে তিনি ত্যাগী ভক্তদের মঠে গমন করিয়া ও সাধুদের অনুরোধে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। সাধুদের প্রতি তাঁহার মন অনুপম মাতৃস্নেহে পূর্ণ ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের কথা যখন তাঁহার নিকট পৌঁছাইল, তখন তিনি কামারহাটীর নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। "এ্যাঁ, নরেন নেই?" বলিয়া তিনি অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। ঐ পতনের ফলে কনুইয়ের কাছটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কিছুকাল বাড় বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

স্বামীজীর অনুরোধে তিনি একবার দুইজন মহিলাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। মহিলাদ্বয় দীক্ষা চাহিলেও গোপালের মা সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তুমি কি যে সে? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে পারবে না তো কে পারবে? বলি কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও—তাতেই ওদের কাজ হবে। তোমার আর কি হবে?" দীক্ষার পর স্পৃহাশূন্যা গোপালের মা গুরুদক্ষিণা কিছুই লইবেন না দেখিয়া বলরামবাবু বলিলেন, "কিন্তু না নাও, অন্তত ষোল আনা করে নাও।" শিষ্যাদের পাছে ক্ষোভ হয় তাই একটি একটি করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি উপদেশ দিলেন, "ওগো, মনপ্রাণ যে দেবার কথা! টাকা তো তুচ্ছ! ...নাম নেওয়া হেলনা-ফেলনা জিনিস নয়। অন্তত দশহাজার জপের পর আসন ত্যাগ করবে।"

কামারহাটীর বাগানে ভূতের উৎপাত ছিল। দত্তগৃহিণীর আমলে যে পাহারার ব্যবস্থা ছিল, উহা রহিত হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ নিজব্যয়ে তথায় একটি মালি নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহ বাগানে থাকিত না। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদে পড়িয়া গিয়া যখন গোপালের মার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, তখন একজন সেবিকার তথায় থাকার ব্যবস্থা হয়। গোপালের মা যেন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচেন, এমনি ভাবে বলিতেন, "কখন যাবি? এ্যাঁ, থাকবি নাকি? মতলব কি? একথা বলছি বলে কিছু মনে করিসনি।" ইহার পূর্বে (১৯০১) তাঁহার আমাশয় হইলে কন্যাস্থানীয়া একজন সেবিকা সেখানে ছিলেন, আর এক ব্রহ্মচারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া আসিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও নিবেদিতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। স্বামীজীও একবার গিয়াছিলেন।

সেবিকাকে দেখিয়াই অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, "কেন এখানে এলি? কষ্ট পাবি। আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একটা ঘর ঠিক কর! সব ঘরে চাবি। পূজারি বামুনকে বল—একটা খুলে দেবে। দ্যাখ, যখন শব্দ-টব্দ পাবি, তখন খুব জপ করবি—গোড়া থেকেই বাপু বলে রাখছি। এখানে নানান রকম আছে।" রাত্রে সেবিকার অগ্নি-পরীক্ষা চলিল—ছাদে দুড় দুড় শব্দ, জানালায় আওয়াজ, আর একটা ছমছম ভাব। অথচ জানিয়া শুনিয়া ইহারই মধ্যে গোপালের মার দীর্ঘজীবন যাপিত হইল!

ঠাকুরের শিক্ষাগুণে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিতা অঘোরমণিকে কেহ কিছু দিতে আসিলেও তিনি গ্রহণ করিতেন না। একবার একটি মশারির প্রয়োজন হইলে তিনি অল্পমূল্যে ছোট একটি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু জনৈক ভক্ত এক বৃহৎ মশারি উপস্থিত করিলে তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। পরে অপর একজনের ছোট মশারির সহিত উহা বদল করিয়া তবে শান্তি পাইলেন। শিষ্য তাঁহাকে কিছু দিতে চাহিলে বলিতেন, "তোরা আর কি দিবি? গোপাল আমার সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে। শুকনো উচ্ছে চারটি আনবি যখন আসবি। ব্যস, তা হলেই তোদের হবে।" এই পরিবেশের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াই হয়তো তিনি বিদায় লইতেন; কিন্তু ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইলে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে কলকাতায় বলরামবাবুর বাটিতে লইয়া আসিলেন।

তাঁহার শেষবারে কামারহাটী পরিত্যাগের পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে একটি ভক্ত বালক কলকাতা হইতে কিছু দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার অনুমতিক্রমে তাঁহারই গৃহে শয়ন করিল। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সে ভক্তটি শুনিতে লাগিল, মাতাপুত্র তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। পুত্র অন্ধকার থাকিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাই-ঝুড়িতে চাহিতেছে। মা বলিতেছেন, "রোস রোস, কাক কোকিল এখনও ডাকেনি। লক্ষ্মী-ধন আমার, ফরসা হোক, তখন নাইবি।" সকালে ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?" তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন, "জানিস না বুঝি?—গোপাল যে আমার কাছে থাকে। তারই বেয়াড়া রকমের দুরন্তপনা সায়েস্তা করছিলুম।" বলরামবাবুর বাড়ির নিকটে অপর একটি ছেলের বাড়িতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং দুধ মুড়কি সন্দেশ দিয়া ফলার করিতেন—উহারা কায়স্থ। ১৯০১ অব্দে ব্রাহ্মণীর আমাশয়ের সময় স্বামীজীর আদেশে ঐ ছেলেটি এক মাস কামারহাটীতে থাকে এবং স্নেহময়ী গোপালের মা তাহাকে আপন কক্ষেই শয়ন করিতে দেন। সে দেখিত যে, বৃদ্ধা চলচ্ছক্তিহীনা হইলেও এই কষ্টদায়ক পীড়ার

মধ্যেই দুই বেলা বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল মালা জপ করিতেন! অন্য সময় শুইয়া সর্বদা হাতে জপ করিতেন। শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার মুখে উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ-নাম শোনা যাইত।

বলরাম-ভবনে আসিয়া কিয়ৎকাল বাসের পরেই নিবেদিতা তাঁহাকে স্বগৃহে আনিতে চাহিলে উদারমনা ব্রাহ্মণী সানন্দে তাঁহার ১৭নং বসুপাড়া লেনের বাড়িতে গমন করিলেন এবং স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতাও মাতৃনির্বিশেষে সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের ব্যবস্থা নিকটবর্তী এক ব্রাহ্মণের বাটিতে করিয়া দেওয়া হইল। যতদিন চলচ্ছক্তি ছিল ততদিন বৃদ্ধা এক বেলা সেই গৃহে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। রাত্রে ঐ পরিবারের কেহ লুচি প্রভৃতি তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। পরে দুই বেলাই আহার তাঁহার ঘরে আসিত; দুপুরে নিরামিষ ঝোল-ভাত, আলু-উচ্ছে, দুটো-একটা তরকারি এবং রাত্রে মাত্র চারখানি লুচি, একটু তরকারি, ভাজা ও দুধ। গোপালের মার তখন বালিকার স্বভাব। কোন দিন হয়তো দুপুরে খাইলেনই না। বিকালে সেবিকা আসিয়া দেখিলেন, খাবার যেমন পাঠানো হইয়াছিল তেমনি পড়িয়া আছে; সেবিকা দেখিয়া অনুযোগ করিলেন, "আজ কেন গোপালের এত বেলা পড়ে গেল? খাওয়া-দাওয়া হলো না? আসনে বসে একবার দুষ্ট গোপালকে চোখ বুজে ডাকুন তো?" তাহাই হইল। পরে চোখ চাহিয়া গোপালের মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোপাল বলছে, আজ আর নিজে খাবে না।" অগত্যা ছোট বালিকাকে খাওয়াইবার মতো সেবিকা তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। রাত্রেও অনেক সময়ে এই ভাবে সামান্য কিছু মুখে দিয়াই গোপালের মা শুইয়া পড়িতেন। আহার ভিন্ন অন্য সময়ে নিবেদিতা নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং একটি ঝিও রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বৃদ্ধার বাক্ রুদ্ধ হইবার কিছুকাল পূর্বে শ্রীশ্রীমা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলে অঘোরমণি জানিতে পারিয়া বলিলেন, "গোপাল এসেছ? এস, এস; দ্যাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।" অঘোরমণির মস্তক মায়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি স্নেহভরে উহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে রক্তিমচ্ছটা বিচ্ছুরণের ন্যায় গমনোদ্যতা অঘোরমণির ম্লান মুখে একটা পরম শান্তির শ্রী ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার কি একটা পাইবার জন্য যেন হাত বাড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সেবিকা বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি শ্রীমাকে গোপাল, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখিয়া তাঁহার পদধূলি চাহিতেছেন, তারপর তিনি বস্ত্রাঞ্চলে

শ্রীশ্রীমায়ের পদরেণু লইয়া অঘোরমণির সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। মা আজ নির্বিকার! অঘোরমণি তাঁহার নিকট শাশুড়ির সম্মান পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভোজননিরতা শ্রীশ্রীমাকে গোপালের মা একদিন বলিয়াছিলেন, "বউমা, কি খাচ্ছিস, একটু দে না!" শ্রীশ্রীমা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "বাপরে, আপনাকে দিতে পারব না।" আজ বৃদ্ধার অন্তিম কাল আগতপ্রায়—আজ আর সে আপত্তি নাই! মা তখন ধ্যানস্থা; বাহ্যজ্ঞানই নাই, তো বাধা দিবে কে?

অঘোরমণির গঙ্গাকূলে জন্ম ও বাস, গঙ্গাবারিতে রন্ধন ও পিপাসানিবারণ, গঙ্গাতটে তপস্যা ও গোপাল-লাভ—গঙ্গার সহিত তাঁহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তিমকালে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। নিবেদিতা স্বয়ং নগ্নপদে সঙ্গে যাইয়া পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদি দ্বারা স্বহস্তে তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিলেন এবং গোপালের মার জীবনের অবশিষ্ট দুই দিন তাঁহারই পার্শ্বে রহিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই (১৩১৩ সালের ২৪ আষাঢ়) উদীয়মান সূর্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত, সেই সময় গোপালের মার শরীর শোভাবাজারের রাজাদের গঙ্গাযাত্রার ঘাটে গঙ্গাতরঙ্গে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় স্থাপিত হইল। তখন তাঁহার হাত দুইখানি বক্ষে জপমুদ্রায় বিন্যস্ত, মুখশ্রী জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে; আর ভক্তগণের কণ্ঠে ভবভয়হারী তারকব্রহ্মনাম উত্থিত হইয়া জাহ্নবীর স্রোতোধ্বনির সহিত মিলিত হইতেছে। অঘোরমণি গঙ্গাগর্ভে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্বদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন" ('লীলাপ্রসঙ্গ')। কৃষ্ণলাল মহারাজের একখানি গৈরিক দশহাতি কাপড় তিনি একবার বাগবাজার হইতে লইয়া যান এবং পরে বলেন, "দ্যাখ, তোমার এই কাপড়খানি পরে বসলে আমার বেশ জপ হয়।" তাঁহার দেহত্যাগের পর নিবেদিতা তাঁহার জপমালা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোখানি বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে রক্ষিত হয়।

# যোগীন-মা

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির সহিত যোগীন-মা ও গোলাপ-মার স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্রীশ্রীমা একসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে যা-সব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগেন এরা সব জানে।" আর একসময়ে বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী" এবং পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখপূর্বক জানাইয়াছিলেন, "যোগেন আমার জয়া—আমার সখী, সহচরী, সাথী।" জগদম্বার সহচরীরা যেমন জগদম্বাকে জানিতেন, জগদম্বাও তেমনি সহচরীদ্বয়ের তত্ত্ব বিদিত ছিলেন; তাই স্ত্রীভক্তদিগকে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন, গোলাপ, এরা সব কত ধ্যান-জপ করেছে, সেসব আলোচনা করা ভাল—এতে কল্যাণ হবে।" যোগীন-মাকে শ্রীশ্রীমা মেয়ে-যোগেন নামে উল্লেখ করিতেন; সেজন্য কোন কোন গ্রন্থে যোগেন-মা নামেরও প্রয়োগ আছে। আমরা যোগীন-মা নামটিই গ্রহণ করিব।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ৬টার সময় শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী কলকাতার ৫৯।১ বাগবাজার স্ট্রিটের পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া উত্তর কলকাতায় 'ধাই-পেসন্ন' নামে পরিচিত হন এবং ঐ সূত্রে প্রভূত অর্থ অর্জন করেন। পিতার উদ্যান, প্রাঙ্গণ ও শিবালয়সুশোভিত বৃহৎ বাটিতেই যোগীন-মার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন। আদরের দুলালী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে এই আশায় প্রসন্নবাবু দুহিতাকে খড়দহের বিখ্যাত ও সুসমৃদ্ধ বিশ্বাস-বংশের পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বাসদের পূর্বপুরুষগণ শাক্ত এবং দানধ্যানাদির জন্য বঙ্গ দেশে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহাদেরই আনুকূল্যে 'প্রাণতোষিণী' তন্ত্রখানি প্রচারিত হয়। লক্ষশালগ্রাম-সমন্বিত এক রত্নবেদি-নির্মাণের অভিপ্রায়ও তাঁহাদের ছিল; কিন্তু আশিহাজার সংগ্রহের পর ঐ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশ্বাসদের কুলদেবতা ছিলেন বিষ্ণু-দামোদর। পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণ বংশমর্যাদা অথবা সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না—ভ্রষ্টচরিত্র ও পানাসক্ত হইয়া তিনি অচিরে গৃহহীন ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। সাধ্বী যোগীন-মার শত প্রচেষ্টাও এই বিপথগামীকে ফিরাইতে পারিল না দেখিয়া তিনি স্বামীর চরম অবনতির পূর্বেই এই পাপস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন তাঁহার একমাত্র কন্যা 'গণু'। একটি পুত্র ইতঃপূর্বেই জন্মলাভের ছয়মাস পরে গতাসু হইয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত

পরিণতি দেখিবার জন্য প্রসন্নবাবু বাঁচিয়া ছিলেন না। যোগীন-মার জননী দুহিতা ও দৌহিত্রীকে সাদরে গৃহে তুলিয়া লইলেন।

বলরামবাবুদের সহিত বিশ্বাসবংশের দূর আত্মীয়তা ছিল, বলরামবাবু ছিলেন যোগীন-মার মামা-শ্বশুর। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা যোগীন-মার অবিদিত ছিল না। তাঁহার মাতামহীও একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন; যদিও ঠাকুরের পরিচয়লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার সাধুসুলভ বেশভূষা না দেখিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "পরমহংস কোথায়?" আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছাবশতই হউক অথবা 'পরমহংসাভিমান' হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যই হউক, ঠাকুর উত্তর দিলেন, "খুঁজে দেখ।" প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যোগীন-মাও এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের একদিবস বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হইলে যোগীন-মা নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় আসিলেন। দ্বিতলের বৃহৎ কক্ষের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঠাকুর তখন ভাবে মাতোয়ারা—চলিতে চরণ টলিতেছে। যোগীন-মা স্বীয় জীবনের সর্বোত্তম অংশ এক মদ্যপের ক্লেশকর সাহচর্যে কাটাইয়া এ রকম মত্ততার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। অতএব বিপরীত মনোভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভাবিলেন, ইনি সুরাসক্ত শক্তি-সাধকদেরই অন্যতম হইবেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া তিনি পরিচিতা স্ত্রীভক্তদের সহিত দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনমানসে যাতায়াত করিতে থাকিলেন এবং এইরূপ পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎকারের ফলে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আবাল্যকল্পনা যে সর্বোত্তমচরিত্র মহাপুরুষকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি শুধু তদনুরূপই নহেন, ইনি সেই গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য মহিমায় সদা অধিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলেন এবং ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমায়েরও তিনি স্নেহের অধিকারিণী হইলেন। যোগীন-মার তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার ইঙ্গিত 'কথামৃতে' বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনায় পাই (৩।১৯।২; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৮৫-৮৬)।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই রাত্রি প্রায় আটটার সময় গোলাপ-মার বাটি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'গণুর-মার' আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় একতলার বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলে ঐক্যতানবাদ্য ও "কেশব কুরু করুণা-দীনে", "এস মা জীবন-উমা" ইত্যাদি সঙ্গীত চলিতে লাগিল। পরে জলখাবারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "এইখানেই এনে দাও।" কিন্তু ইহাতে গোলাপ-মা কহিলেন, "গণুর-মা বলেছে, ঘরটায় একবার

পায়ের ধূলা দিন, তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে—ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু "গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের" অভ্যুদয় হইবে। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবর্তিনী। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী স্বল্পই সংরক্ষিত হইয়াছে। যোগীন-মার সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' যে কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা জীবৎকালে প্রকাশিত হওয়ায় 'জনৈক স্ত্রীভক্ত' প্রভৃতি গুপ্ত পরিচয়ের পশ্চাতে চিরকালের মতো অবিদিত রহিয়া গিয়াছে। তথাপি 'লীলাপ্রসঙ্গ' (২য় ভাগ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ১১৯-২৪ পৃঃ) অবলম্বনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের রথযাত্রার পরে ঠাকুর যখন বলরাম-মন্দির হইতে সকাল আটটা-নটায় দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন, তখন স্ত্রীভক্তেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্দরের পূর্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পর্যন্ত আসিয়া বিষণ্নমনে ফিরিয়া যাইলেন। সকলে এইরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও যোগীন-মা যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চকমিলানো বারান্দা অবধি আসিলেন—বাহিরে যে অপরিচিত পুরুষেরা আছেন, সে বিষয়ে যেন হুঁশ নাই। ঠাকুরও তখন গোঁ ভরে চলিয়াছেন; কাজেই কে ফিরিয়া গেল, বা কে আসিল—সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপে চলিতে চলিতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখেন, যোগীন-মা সঙ্গে চলিয়াছেন; দেখিয়াই "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। যোগীন-মাও শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চ'না গো মা, চ'না!" যাঁহাকে বলিলেন তিনি গাড়িপালকি ব্যতীত পদব্রজে প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে অভ্যস্ত নহেন। অথচ ঠাকুরের সে আহ্বানে এমন একটি মোহিনীশক্তি ছিল যে, তিনি আর কিছু না ভাবিয়াই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—শুধু ভিতরে যাইয়া বলরামবাবুর গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, "আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম।" তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া অপর এক স্ত্রীভক্তও সঙ্গে চলিলেন। এদিকে যাইতে বলিয়াই ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া বালকভক্তদের সহিত নৌকায় আসিয়া বসিয়াছেন; অতএব স্ত্রীভক্তদ্বয় ছুটাছুটি করিয়া নৌকায় উঠিয়া পাটাতনের উপর বসিলেন—নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকায় যোগীন-মা জানাইলেন যে, ভগবানে ষোল-আনা মন দিতে চাহিলেও মন কিছুতেই বাগ মানে না। ঠাকুর উপদেশ দিলেন, "তাঁর উপর ভার দিয়ে থাক না গো। ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকতে হয়।" ইত্যাদি কথার মধ্যে নৌকা ঘাটে

লাগিলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতখানায় শ্রীশ্রীমাকে ও ৺কালীমাতাকে প্রণাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে সমবেত হইলেন। ঠাকুর তখন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ঘরে কিছু তরিতরকারি আছে কিনা। কিছুই নাই জানিয়া তাঁহার ভাবনার অন্ত নাই—কে এখন বাজারে যায়? বাজার হইতে কিছু না আনিলে আগত ভক্তেরা খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগীন-মা ও অপর স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "বাজার করতে যেতে পারবে?" তাঁহারাও বলিলেন, "পারব" এবং বাজারে যাইয়া দুইটি বড় বেগুন, কিছু আলু ও শাক কিনিয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীমা রন্ধন করিলেন; কালীমন্দির হইতেও ঠাকুরের বরাদ্দ-প্রসাদের থালা আসিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেরা প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর সমস্ত দিন ঠাকুরের সহিত সৎপ্রসঙ্গান্তে সন্ধ্যাসমাগমে যোগীন-মা সঙ্গিনীসহ পদব্রজে কলকাতায় ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে কুলবধূদের ঈদৃশ অসঙ্কোচ ব্যবহারের ব্যাখ্যাকল্পে স্ত্রীভক্তেরা বলিয়াছেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলেই অনেক সময় মনে হতো না; মনে হতো, যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকট আমাদের যেমন লজ্জা-সঙ্কোচ আসে ঠাকুরের নিকট তার কিছুই আসত না। যদি বা কখনও আসত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলে যেতুম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলে বলতুম" (ঐ ৩২ পৃঃ)।

দক্ষিণেশ্বরে দুই-চারিবার গমনাগমনের পর যোগীন-মা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সুপরিচিতা হন। উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন; অধিকন্তু স্নেহপ্রবণা মাতাঠাকুরানী শুদ্ধসত্ত্বা যোগীন-মাকে সহজেই বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। যোগীন-মা সাত-আট দিন পর পর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন; সেখানে রাত্রিযাপন করিতে হইলে নহবতেই আশ্রয় লইতেন। মা তখন নহবতের নিচ তলায় থাকেন এবং বাহিরের রোয়াকে রন্ধন করেন। স্ত্রীভক্ত কেহ আসিলে নহবতের উপরে স্থান পাইতেন। তদনুসারে যোগীন-মাও পৃথক শয়ন করিতে চাহিলে মা কিছুতেই ছাড়িতেন না, কাছে টানিয়া শোওয়াইতেন। যোগীন-মার সহিত মা সর্ববিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিতেন। যোগীন-মা তাঁহার কেশবন্ধন করিয়া দিতেন এবং উহা মা এত পছন্দ করিতেন যে, তিন-চারি দিন পরেও স্নানকালে খুলিতেন না; বলিতেন, "ও যোগেনের বাঁধা চুল; সে আবার আসলে সেই দিন খুলব।" প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই মা যখন নৌকাযোগে পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, তখন যতক্ষণ নৌকাখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল ততক্ষণ যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে উহা দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর বিষাদে অবসন্নহৃদয়ে নহবতে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিবার পথে ঠাকুর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় কক্ষে

আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?" এই বলিয়া সান্ত্বনাদানের জন্য স্বীয় সাধকজীবনের অনেক ঘটনা তাঁহাকে শুনাইলেন। এক বৎসর কিংবা দেড় বৎসর পরে মা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া মাকে বলিলেন, "সেই যে ডাগর-ডাগর-চোখ মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে—তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কাঁদছিল।"

যোগীন-মা পূর্বেই শ্বশুরবংশের কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে জীবনী-শক্তি ছিল না এবং সে-জপেও আনন্দ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পর যোগীন-মার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হইল এবং স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া তিনি আত্মীয়-স্বজনকেও সেই রসাস্বাদনে আহ্বান করিলেন; এইরূপে তাঁহার কন্যা গণু প্রভৃতি অনেকেই আসিলেন। জামাতাও আসিলেন; কিন্তু ধনদৌলতে গর্বিত যুবককে ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করিতে অক্ষম দেখিয়া যোগীন-মা আর দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ডাকিলেন না। স্বামী অম্বিকাচরণ বিশ্বাসও যোগীন-মার ঐকান্তিক আকর্ষণে শুধু যে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তাহাই নহে, তিনি সৎপথে চলিতেও সচেষ্ট হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী উন্মার্গগামী হইলেও সতীর পতির প্রতি একটা অপরিহার্য কর্তব্য আছে। তদনুসারে যোগীন-মা সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নকেও সুখময় বাস্তবে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকার দিন তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাই যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে থাকিলেন, তথাপি শীঘ্রই ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিন জ্বরাদিতে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। যোগীন-মা শেষ কয়দিন পতিকে নিজ সকাশে রাখিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিয়াছিলেন।

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, তোমার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরেই আছে। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়বে।" যোগীন-মাও পরে দেখিয়াছিলেন যে, ধ্যান করিতে বসিলেই ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেন। ঠাকুরের নিকট তিনি জপের বিধিও শিখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ডানহাতের আঙুলগুলি পাশাপাশি একেবারে জুড়িয়া রাখিতে হয়, নতুবা আঙুলের ফাঁকে জপের ফল বাহির হইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বে এক গুরু মার নিকট যোগীন-মার সামান্য বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে বলিলেন, তখন তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি এরূপ অভিনিবেশ-সহকারে আয়ত্ত করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। আখ্যায়িকাগুলির সহিতও তাঁহার

এমন নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল যে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার **'Cradle Tales of Hinduism'** (হিন্দু-শিশুদের আখ্যায়িকা) রচনাকালে তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়া গ্রন্থের ভূমিকায় উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে সাধিকা যোগীন-মার দিবস অতিবাহিত হইত। স্ত্রীধনরূপে যে সামান্য অর্থ তাঁর ছিল, তাহা হইতে তাঁহার বৈধব্যজীবনের ব্যয়সঙ্কুলান হইত এবং উহারই সাহায্যে তিনি কেদারনাথ হইতে কন্যাকুমারী এবং কামাখ্যা হইতে দ্বারকা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সব প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণকালে তিনি বৃন্দাবনে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ি 'কালাবাবুর কুঞ্জে' বাস করিতেছিলেন। অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে গমন করেন এবং যোগীন-মার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া "ও যোগেন গো" বলিয়া বিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অতঃপর ঠাকুরের অদর্শনজনিত শোক নিবারণের জন্য যোগীন-মার তপস্যার বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্বভাবতই এরূপ তপস্যাপ্রবণ ছিলেন যে, ইহা লক্ষ্য করিয়া এবং পাছে উহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের আর কি বাকি গো? (নিজ দেহ দেখাইয়া) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে, সেবা করলে!" যাহা হউক, বৃন্দাবনে তিনি ভগবদ্ধ্যানে এমন আত্মহারা হইতেন যে, অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। লালাবাবুর ঠাকুরবাটিতে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ধ্যানে বসিতেন। এক সন্ধ্যায় ধ্যানকালে তিনি সমাধিমগ্না হইলেন। আরাত্রিক শেষ হইয়াছে, যাত্রিগণ চলিয়া গিয়াছে, এমন কি, মন্দিরের বহির্দ্বার রুদ্ধ হইবে, তথাপি তাঁহাকে একই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া সেবায়েতগণ বলিতে লাগিল, "ও মায়ি, ওঠ;" কিন্তু তবু কোন সাড়া নাই। এদিকে এত রাত্রেও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা যোগীন মহারাজকে আলোকহস্তে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। কোথায় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, তাহা জানাই ছিল, তাই তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনাইয়া সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন। ঐ সময়ের অনুভূতিবিষয়ে যোগীন-মা পরে বলিয়াছিলেন, "তখন ...জগৎ আছে কি নাই, এও যেন আমার ভুল হয়ে গেছিল। ...যখন যেদিকে চাই সর্বত্রই ইষ্টদর্শন। তিন দিন অমন ছিল।"

যোগীন-মার সমাধি এই প্রথম নহে; পিতৃগৃহে আর একবার ঐরূপ হইয়াছিল এবং উহা জানিতে পারিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যোগীন-মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে।" এই প্রকার সমাধির সঙ্গে ছিল আবার অলৌকিক দর্শনাদি।

সাধনার ফলে সূক্ষ্মরাজ্যে উপনীত তাঁহার মন দিব্য শব্দাদি উপলব্ধি করিত এবং ভবিষ্যতের আভাসও পাইত। এইরূপে কলকাতায় বসিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কাশীধামে তাঁহার একটি দৌহিত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তিনি অন্তরের সহিত দুইটি বালগোপাল মূর্তির পূজা করিতেন। ঐ ঐকান্তিকতার ফলে তাঁহার যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা নিজমুখে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, "একদিন পূজাকালে ধ্যান করতে করতে দেখি কি, দুটি অনুপম সুন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়িয়ে বলছে, 'আমরা কে চেন?' বললুম, 'তোমাদের আবার চিনি না? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ।' ছোটটি (কৃষ্ণ) বললে, "তোমার মনে থাকবে না।' 'কেন?' 'ঐ ওদের জন্য'—এই বলে আমার নাতিদের দেখালে।" বাস্তবিক যোগীন-মার একমাত্র কন্যা গণুর মৃত্যুর পর দৌহিত্র তিনটিকে লইয়া তিনি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং তৎকালে ধ্যানের গভীরতাও হ্রাস পায়।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে শ্রীশ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটিতে বাস করিতেন, তখন যোগীন-মাও সঙ্গে ছিলেন। বস্তুত এখন হইতে সম্ভবস্থলে যোগীন-মা প্রায় সর্বত্রই মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। ঐ উদ্যানবাটিতে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রখর সূর্যকিরণে অনাবৃত মস্তকে উপবিষ্টা মা যখন পঞ্চতপা সাধন করেন তখন যোগীন-মাও তাঁহার সহিত ঐ কঠোর ব্রতে যোগদান করেন। যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চর্যার আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। একবার তিনি জলপান ত্যাগ করিয়া ছয় মাস যাবৎ কেবল দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে প্রয়াগে শীতকালে একমাস কল্পবাস করিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার জন্য নির্দিষ্ট তিথ্যাদিতে তিনি ব্রত উপবাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার জপধ্যানে অনুরাগ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইত। শত কোলাহলাদি সত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ নিয়মিত কাল নির্দিষ্ট সংখ্যক জপে অতিবাহিত করিতেন; গঙ্গাস্নানের পরও ঘাটে দুই ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা জপে নিরত থাকিতেন—শীত-বর্ষাদিতে পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হইত না। ধ্যানকালে তাঁহার শরীরবোধ এমনই লুপ্ত হইত যে নয়নকোণে মাছি বসিয়া থাকিলেও তাঁহার চক্ষু অচঞ্চল থাকিত। আবার বৈধী পূজার্চনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এতই অধিক ছিল যে, তাহা পুরুষদের মধ্যেও অল্প দৃষ্ট হয়। এইসকল কারণে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন খুব তপস্বিনী—এখনও কত ব্রত উপবাস করে।" চিরাভ্যস্ত এই জপারাধনাদি তাঁহার এতই অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, শেষ অসুখের সময় যখন তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, তখনও নিয়মিত জপাদির জন্য তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে হইত। আর ঐরূপ উত্থান-শক্তিরহিত হইয়াও তিনি 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ভাগবত' প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন।

ফলত সিদ্ধিলাভে ধন্য হইলেও তিনি আমরণ সাধনাতেই রত ছিলেন। তাঁহার খর্ব অথচ সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা এবং সুবিবেচনাপূর্ণ আলাপ-ব্যবহারের সহিত অন্তরের এই সৌন্দর্য মিশ্রিত হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতীব গম্ভীর অথচ চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপ্রদ করিয়াছিল। তাঁহার ধীরস্থির গতি ও বাক্যালাপের সম্মুখে সর্বপ্রকার চপলতা এককালে শান্ত হইয়া যাইত। তাঁহার ধীমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্য যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাঁহার সহিত দীক্ষার্থীদের মন্ত্রাদিসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও দেবমাতা প্রভৃতি বিদেশী মহিলা তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ ছিলেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের সহিত, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত যোগীন-মার সম্বন্ধ ছিল অতীব প্রীতিপূর্ণ। নৌকাযোগে মঠ হইতে আগত স্বামীজী হয়তো বাগবাজারের ঘাটে অবতরণ করিয়াই যোগীন-মাকে দেখিলেন; অমনি বলিয়া উঠিলেন, "যোগীন-মা, আজ তোমার ওখানে দুটি খাব গো! পুঁইশাক চচ্চড়ি করো।" যোগীন-মা একবার যখন কাশীতে ছিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যোগীন-মা, এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো!" আর যোগীন-মার রান্নায় তাঁহার এত তৃপ্তি ছিল যে, আবদার করিয়া বলিলেন, "আজ আমার জন্মতিথি গো! আমায় ভাল করে খাওয়াও; পায়েস করো।" ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আলমোড়ায় অবস্থানকালে, স্বামীজী যোগীন-মার তথায় গমনের আয়োজন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "যোগেন-মার জন্য ডাণ্ডি হইবে; কিন্তু বাকি সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।" স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, যোগীন-মা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুরের ভাবরাশি স্ত্রীজাতির মধ্যে অনুস্যূত হইবে। তিনি তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের অধিনেত্রীপদে ইঁহাদিগকে অধিষ্ঠিতা করিবার আশা পোষণ করিতেন।

শ্রীমায়ের প্রতি যোগীন-মার অনুরাগের পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। ঐ প্রীতি শুধু মায়ের লীলাবিগ্রহে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদির প্রতিও প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শরণাপত্তি একদিনে হয় নাই। তাঁহার মনে একবার সন্দেহ জাগিয়াছিল, "ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী।" তারপর একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জপকালে ভাবচক্ষে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে।" যোগীন-মা দেখিলেন, এক সদ্যোজাত, নাড়ীনালবেষ্টিত, রক্তাক্ত শিশু ভাসিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে। ওকে আর একে (নিজদেহকে) অভিন্ন জানবে।" তদবধি যোগীন-মা সন্দেহমুক্ত হইলেন এবং তিনি শ্রীমায়ের প্রতি অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তিনি মায়ের প্রকট লীলাকালে বহুবার জয়রামবাটি গিয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ১৯২৩

খ্রিস্টাব্দে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি জয়রামবাটিতে যাইয়া পূজা ও উৎসবের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তিনি সন্দেহাদি-ভঞ্জন বা নূতন আলোকলাভের আশায় মাতাঠাকুরানীর দ্বারস্থ হইতেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন। মায়ের অনুপস্থিতিকালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দের নিকট স্বীয় সমস্যা লইয়া উপস্থিত হইতেন।

স্ত্রীভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ ও ব্যবহারাদির ইতিহাস তাঁহার স্মৃতিশক্তিবলে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এবং প্রয়োজনস্থলে হুবহু পুনরুজ্জীবিত হইত। এই সব কথা অন্য গ্রন্থ বা অপর কাহার নিকট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; এইজন্য 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনাকালে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। গ্রন্থের বহু স্থলে তাঁহার বর্ণনা, এমন কি, ভাষা পর্যন্ত অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ঐ-সকল স্থলে যোগীন-মার নামোল্লেখ না থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, তিনি যেন আমাদের সম্মুখে দেহপরিগ্রহপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রতিমাসে 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যোগীন-মাকে উহা শুনাইয়া তাঁহার মতামত লওয়া হইত এবং নিরভিমান গ্রন্থকার তদনুযায়ী উহার পরিবর্তনাদি করিয়া দিতেন।

যোগীন-মার দৈনন্দিন জীবন বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি স্নানাহ্নিকান্তে নিত্য 'মায়ের বাটি'তে আসিয়া ঠাকুরের দুই বেলার ভোগের জন্য তরকারি কুটিতেন এবং অন্যান্য কার্যসমাপনান্তে অদূরবর্তী স্বগৃহে গমনপূর্বক রন্ধন করিয়া উহা গৃহদেবতার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদন করিতেন। পরে স্বীয় জননী ও অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া ও স্বয়ং আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণান্তর পুনর্বার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিতেন। অবশেষে মায়ের বাটিতে রাত্রের ভোগ সমাপ্ত হইলে তিনি স্বগৃহে ফিরিতেন। বস্তুত শ্রীমায়ের এইরূপ সেবা যোগীন-মার জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীমাও তাঁহার এবং গোলাপ-মার এই সেবায় তুষ্ট হইয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, "গোলাপ-যোগীন না থাকলে কলকাতা থাকা হবে না।"

যোগীন-মার একটি সদ্‌গুণ ছিল, দীনদুঃখীদের প্রতি অসীম হৃদয়বত্তা। মায়ের বাটিতে ভিখারি আসিয়া রিক্তহস্তে ফিরিত না; তাই গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, "যোগীন পয়সা দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিখারি এলেই পয়সা চায়—বলে, 'মা, এখানে আমরা একটি করে পয়সা পেয়ে থাকি'।" তীর্থাদিতে তিনি যথেষ্ট অর্থ বিতরণ করিতেন ও লোকজনদের খাওয়াইতেন। জয়রামবাটি প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতেও তিনি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন।

যোগীন-মা গৃহে বাস করিলেও তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট কৌলসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপূজার গুহ্য তত্ত্ব শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে তদনুরূপ সাধনও করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলকাতায় থাকিলে তাঁহার গৃহে প্রতি বৎসর ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় আগমন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীন-মার দেবীভক্তির সহিত একটি অতি মনোহর উদার ভাবও মিশ্রিত ছিল। দেওয়ালে বহু দেবদেবী ও সাধুর ছবি শোভা পাইত। শীতলা, ষষ্ঠী, গোপাল প্রভৃতি অনেক দেবতাই তাঁহার পূজা পাইতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার পরিণতিস্বরূপে তিনি স্বামী সারদানন্দের নিকট বৈদিক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; ঐ অনুষ্ঠানে স্বামী প্রেমানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও তিনি অপরের নিকট উহা প্রকটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাই গেরুয়া পরিধান করিতেন শুধু পূজাকালে—অন্য সময়ে শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে একদা বলিয়াছিলেন, "ও কুঁড়ি—ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে! ও যে সহস্রদল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।" এই মহাবাণী যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সাধনজগতের আনন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে যোগীন-মার শৈশব ভিন্ন সমস্ত জীবনই দুঃখময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার কন্যা গণু বিধবা হইলেন। তিন বৎসর পরে একটি দৌহিত্রের মৃত্যুর পর যোগীন-মা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিরও কাশীপ্রাপ্তি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং অনাথ দৌহিত্রত্রয়কে লইয়া কলকাতায় ফিরিলেন। এই অসহায় বালকদের আত্মীয়স্বজন থাকিলেও তাঁহাদের দ্বারা উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদীক্ষা অসম্ভব জানিয়া যোগীন-মা স্বামী সারদানন্দের সাহায্যে ইহাদের প্রতিপালনের ভার স্বহস্তে লইলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও তিনি কখনও তাহাদিগকে বলপূর্বক রামকৃষ্ণভাবে প্রভাবান্বিত করার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। তথাপি তাঁহার দেহত্যাগের ছয় মাস পূর্বে সর্বকনিষ্ঠ দৌহিত্রটি তাঁহাকে জানায় যে, সে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক। তখন তিনি তাহাকে সন্ন্যাসজীবনের দুঃখকষ্টের কথা সমস্ত খুলিয়া বলেন; কিন্তু ইহাতেও সে নিরস্ত না হইলে তাহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করেন। ১৯১৪ অব্দে যোগীন-মার মাতা গঙ্গালাভ করেন। যোগীন-মাই ছিলেন বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁহার এই দারুণ শোকের অবধি ছিল না।

দেহত্যাগের পূর্বে যোগীন-মা দুই বৎসর বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রায় প্রত্যহ সুমধুর কণ্ঠে 'গোপাল, গোপাল' উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,

এই যুগে গোপালভাবে সাধনা বিশেষ ফলদায়ক; তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেও যোগীন-মার জীবনে এই অপূর্ব পরিণতি ঘটিয়াছিল। শেষ দিন যতই ঘনাইতে লাগিল, ততই তিনি ভগবান ব্যতীত আর সমস্তই যেন ক্রমে ভুলিতে থাকিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গগণের স্মৃতি কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সদা জাজ্বল্যমান রহিল। দু-তিন দিন বাক্যালাপ বন্ধ আছে এবং তরল খাদ্যগ্রহণেও তাঁহার সম্পূর্ণ অসম্মতি রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন, ইহা রোগজনিত আচ্ছন্নতা কিনা। ডাক্তার বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া জানাইলেন যে, তিনি ঐরূপ কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন না। তখন স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, "ব্যাকুল হয়ো না গো! মরণকালে তোমার সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হয়ে তোমায় পরম জ্ঞান দান করবে।" অবশেষে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন, বুধবার ঠাকুরের নৈশ ভোগাদির পরে যখন সকলে কর্তব্যমুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত, তখন শেষ মুহূর্ত আগত দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাঁহার মস্তকপার্শ্বে বসিয়া গম্ভীর স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। তদবস্থায় যোগীন-মা রাত্রি ১০-২৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মিলিত হইলেন।

# গোলাপ-মা

শোক, এমন কি, মর্মন্তুদ শোক সকলের জীবনেই আছে। কিন্তু যে শোক আর্ত ব্যক্তিকে সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি করাইয়া ক্রমে ভগবদ্ভক্তি আস্বাদন করায় তাহা অধিকারীরই আধ্যাত্মিক মাধুর্যের দ্যোতক। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী'—এই ছদ্ম নামেই 'কথামৃতে' গোলাপ-মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; অথচ একটু মনোযোগসহকারে এই পূত জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদে ভূষিতা এক মহীয়সী মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

কুলীন ব্রাহ্মণবংশে সমর্পিতা শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবীর অবস্থা সচ্ছল ছিল না; বিশেষত একটি পুত্র ও চণ্ডী নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া স্বামী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তিনি বিশেষ বিপন্না হইলেন। পুত্রটি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে আরও দুঃখে নিমগ্না করিল। অতঃপর কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার জীবন সুখময় করিবার আশায় তিনি কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই কলকাতা পাথুরিয়াঘাটার লোকপ্রথিত ঠাকুরবংশের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। দুহিতাটি সুশ্রী ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিল; কিন্তু ভবিতব্যকে কে সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারে? তাই গোলাপ-মার সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া এই কন্যারত্ন অকালে তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় লইল। শোকাতুরা ব্রাহ্মণী তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

গোলাপ-মা পূর্ব হইতেই সমপল্লিবাসিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিতা শ্রীমতী যোগীন-মার সহিত সুপরিচিতা ছিলেন। এরূপ শোকের শান্তি শুধু দক্ষিণেশ্বরেই হইতে পারে, এই বিশ্বাসে যোগীন-মা একদিন তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উপস্থিত করিলেন। যোগীন-মার আশা সফল হইল—ঠাকুরের দিব্যালাপ-শ্রবণে গোলাপ-মার শোক প্রশমিত হইতে থাকিল। একদিনের কথা—সেদিন (১৩ জুন, ১৮৮৫) শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন; শোকাতুরা ব্রাহ্মণী উত্তরের দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপদেশামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর ক্রমে তাঁহার বাল্যসখা শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু ও তজ্জন্য শ্রীরামের শোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জন্ম-মৃত্যু এ-সব ভেলকির মতো; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। ...তাঁর উপর কি করে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর—শোক করে কি হবে?" কথাগুলি

শোকাতুরা ব্রাহ্মণীকে প্রত্যক্ষভাবে না বলিলেও, ইহার তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি এইরূপ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে উহা ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ। তিনি হয়তো ভাবিতেন, "আবাল্য সংসার-সম্পর্কহীন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মুখে এইরূপ বৈরাগ্যের বাণী শোভা পাইলেও, আমার ন্যায় শোকতাপগ্রস্ত সংসারীর পক্ষে উহা আকাশের চাঁদ পাওয়ার কল্পনার মতোই।" কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল। উপদেশের সহিত মানবসুলভ হৃদয়ের বিকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সেদিন মুগ্ধ হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইলে সকলেই যখন চুপ করিয়া আছেন, তখন সে ব্যথাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শোকার্তা বলিলেন, "তবে আমি আসি।" অমনি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন, "তুমি এখন যাবে? বড় দূর!—কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি করে যাবে।" সেদিন জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি—বেলা তিনটা।

আর একদিনের কথা (২৮ জুলাই, ১৮৮৫)। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন শ্রীযুত নন্দ বসু মহাশয়ের বাড়ি হইয়া ব্রাহ্মণীর গৃহে পদার্পণ করিবেন; তাই ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যথাসময়ে সংবাদ আসিল, ঠাকুর নন্দবাবুর বাটিতে আসিয়াছেন। শুনিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ব্রাহ্মণী ঘর-বাহির করিতেছেন—বুঝি বা এখনই আসিবেন। আবার দেরি হইতেছে দেখিয়া বুক সন্দেহে কাঁপিয়া উঠিতেছে—হয়তো তিনি আসিবেন না। বাড়িটি ইষ্টকনির্মিত হইলেও পুরাতন। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী—উভয়েই বিধবা। একই বাটিতে ভ্রাতারাও সপরিবারে বাস করেন। বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণী নন্দ বসুর বাটিতে সংবাদ লইতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তথায় আসিয়া সহাস্যবদনে ভক্তগণসহ ছাদে আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার ভগিনী উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামান্তে কি করিবেন কিরূপে প্রাণের আবেগ জানাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! ... ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সেপাই-সান্ত্রী সঙ্গে করে, ...তখন যে এত আহ্লাদ হয় নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না; যেখানে আসবেন, একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, দেখে চলে আসব। যাই—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা...ওগো, (সুর্তি) খেলাতে একটি টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল; সে যাই শুনলে একলাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে

গিছল। ওগো, আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব" ('কথামৃত', ৩।১৯।১; অখণ্ড সং, পৃঃ ৮৮৩-৮৪)।

ব্রাহ্মণীর আর্তিদর্শনে মুগ্ধ জনৈক ভক্ত তাঁহার পদধূলি লইলেন, ব্রাহ্মণীও প্রতি-প্রণাম করিলেন। এইরূপ উচ্ছ্বাস চলিতেছে, এদিকে রন্ধননিরতা ভগিনী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন, "দিদি, এস না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয়? নিচে এস—আমরা কি একলা পারি?" আনন্দে আত্মহারা ব্রাহ্মণী তখন সংসার ভুলিয়া ঠাকুর ও ভক্তদিগকে দেখিতেছেন। এই বিহ্বলতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্রাহ্মণী অতি ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন; ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া মিষ্টমুখ করিলেন। রাত্রি আটটার সময় ঠাকুরের বিদায়গ্রহণকালে ব্রাহ্মণী বাড়ির সকলকে ডাকিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করাইলেন। ঠাকুর এখান হইতে 'গণুর মা'র বাটিতে উপস্থিত হইলেন; ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেখানে সামান্য জলযোগের পর ঠাকুর বলরামের বাটি যাইলে ব্রাহ্মণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অবশেষে সকলে বিদায় লইলে ব্রাহ্মণীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আহা, এদের কি আহ্লাদ!" মাস্টার অমনি কহিলেন, "কি আশ্চর্য! যিশুখ্রিস্টের সময়েও ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি বোন—মেরি আর মার্থা।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের গল্প শুনিতে উৎসুক হওয়ায় মাস্টার বাইবেল-অবলম্বনে তাঁহাদের অপূর্ব কাহিনী শুনাইলেন—যিশু ভগিনীদ্বয়ের গৃহে সমাগত হইলে এক ভগিনী ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া যিশুর পদপ্রান্তেই বসিয়া রহিলেন; আর অপর ভগিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর আহারাদির উদ্যোগ করিতে করিতে অভিযোগ করিলেন, "প্রভু, দেখুন তো, দিদির কি অন্যায়। উনি এখানে চুপ করে বসে আছেন, আর আমায় একলা সব করতে হচ্ছে!" যিশু উত্তর দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি শত চিন্তা ও শত ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছ; কিন্তু জীবনে একটা জিনিসের তবু অভাব আছে। মেরি সেই শ্রেয়ঃটিকেই বেছে নিয়েছে, যা তাকে কোনদিন হারাতে হবে না" (লুক, ১০।৩৮-৪২)।

এই ব্যথিত অথচ ভগবদেকশরণ হৃদয়টিতে ঠাকুর কত ভাবেই না শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি ওকে খুব পেট ভরে খেতে দেবে—পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে;" "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" আর গোলাপ-মাকে তিনি শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" তাই প্রথম হইতেই গোলাপ-মা মাঝে মাঝে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বাস করিতে

লাগিলেন এবং ঠাকুরের স্নেহাশীর্বাদের সহিত মায়েরও মমতাস্পর্শে ধন্য হইলেন। নহবতে বাসকালে গোলাপ-মা ঠাকুরের সহিত সুদীর্ঘ আলাপের সুযোগ পাইতেন; শ্রীশ্রীমাও ঐরূপ অবকাশদানেরই জন্য যেন আহার্য-সামগ্রী ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য গোলাপ-মার হাতে দিতেন। একদিন ভাতের থালা সম্মুখে স্থাপনপূর্বক গোলাপ-মা নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের আহার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিতেছেন, তখন ভিতর হইতে কে যেন সাপের মতো ছোবল মারিয়া উহা গিলিয়া ফেলিতেছে। দেখিয়া তিনি তো হাসিয়া আকুল। ঠাকুর অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো? বল দেখি, আমি খাচ্ছি, না কে খাচ্ছে?" গোলাপ-মা যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিলে ঠাকুর খুশি হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ"—ইহা বলিয়া গোলাপ-মাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, "সর্পাকারা কুণ্ডলিনীর আহুতিগ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে আনা হইলে তাঁহার ও সেবক ভক্তদের রন্ধনাদির বিষয়ে গোলাপ-মা সাহায্য করিতেন। পরে মাতাঠাকুরানী আসিয়া ঐ কার্যভার লইলে গোলাপ-মা তাঁহারও সহায় হইতেন। কাশীপুরেও তিনি মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতেন। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করায় কোনরূপ অপমানাদিতে তিনি বিচলিত হইতেন না। ঐ সময়ে কেহ কেহ স্বীয় প্রকৃতিবশে হয়তো অদোষদর্শী ঠাকুরের নিকট গোলাপ-মার বিরুদ্ধে বলিতেন। ঠাকুর শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু গোলাপ-মা স্বপ্নযোগে সব জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য! সেই সময় কেউ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতুম, ঠাকুর সে-সব আমাকে বলে দিচ্চেন, 'ওগো, তোমার বিরুদ্ধে এই-সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক (জনৈক স্ত্রীলোকের নাম করিয়া) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই-সব বলেছে।' সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম।" এইসব জানিয়াও তাঁহার মন নির্বিকার থাকিত। বস্তুত এই সহনশীলতা তাঁহার জীবনে সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। উত্তরকালে বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহাকে অনেক অল্পবয়স্ক সাধুর তত্ত্বাবধান করিতে হইত, তখন তাঁহার কঠোর শাসনের প্রতিবাদে বয়সোচিত অবিবেচনাবশত কোন যুবক হয়তো এমন রুক্ষ কথাও বলিয়া ফেলিতেন যাহাতে গোলাপ-মাকে অশ্রুবিসর্জন করিতে হইত; তথাপি 'সতের রাগ জলের দাগ'—গোলাপ-মা সেই স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া পুনর্বার সকলের সহিত মাতৃবৎ আচরণ করিতেন।

ইহার সঙ্গে ছিল তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ—নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা। শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর একদিন সকালে চা-পানের সময় অল্পবয়স্ক সাধুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "মা কাল দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি ওদের আর বকো না।' এই সন্দেশগুলো তোমরা খাও।" সাধুরা গোলাপ-মার শাসনকে অনেকটা দিদিমার ভর্ৎসনা হিসাবেই গ্রহণ করিতেন; তাই সেদিনকার স্নেহমিশ্রিত দুঃখপ্রকাশের উত্তরে সোৎসাহে বলিলেন, "গোলাপ-মা, রোজ যদি সন্দেশ খাওয়ান তো রোজই আমাদের বকুন—তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।"

তবে গোলাপ-মার একটি বিশেষত্ব ভুক্তভোগীর নিকট দোষরূপেই প্রতিভাত হইত—তিনি ছিলেন বড় স্পষ্টবক্তা। তাঁহার বেপরোয়া সত্যবাদিতায় সন্ত্রস্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা কখনও কখনও বলিয়া উঠিতেন, "ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার? 'অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়'।" মা বলিতেন, "গোলাপের সত্য কথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে।" বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সত্যবাদিতার আদর শুধু নিজ প্রিয়জনের মধ্যেই হইতে পারে—অপরে অতটা সহ্য করিবে কেন? কাজেই যথার্থ কথা বলিতে গিয়া তাঁহাকে যে অনেক ক্ষেত্রে অপরের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে ঠাকুর ও মায়ের কথা আলাদা। ঠাকুর শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া শ্যামপুকুরে চলিয়া গেলে গোলাপ-মা অপরের যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া বসিলেন যে, মায়ের উপর রাগ করিয়াই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া শ্রীমা শ্যামপুকুরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে এসব কাল্পনিক কথা গ্রাহ্য না করিতে বলিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং গোলাপ-মা পুনরায় আসিলে তাঁহাকে ভর্ৎসনান্তে শ্রীমায়ের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। গোলাপ-মা তদনুসারে মায়ের নিকট ক্ষমা চাহিতেই মা "গোলাপ গো" বলিয়া তাঁহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতেই গোলাপ-মার ক্ষোভ বিদূরিত হইল।

ফলত ইঁহাদের সম্বন্ধ কোন বাহ্য ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, দৈবনির্দেশেই ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অবিবেচনার সহিত গোলাপ-মার আপ্রাণ মাতৃসেবার কথা ভাবিলেই কথাটির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে শ্রীমা যখন অতিদুঃখে কামারপুকুরে নিঃস্ব জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন লোকপরম্পরায় ঐ সংবাদ পাইয়া গোলাপ-মা অগ্রণী হইয়া ভক্তদের সাহায্যে তাঁহাকে কলকাতায় আনান এবং তদবধি প্রায়ই

তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থদর্শন বা কলকাতায় অবস্থানকালে গোলাপ-মা তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতেন, এমন কি, জয়রামবাটিতেও বহুবার তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন। এইসব সময়ে গোলাপ-মা সানন্দে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন এবং পরে বহু ভক্তাদির যাতায়াত আরম্ভ হইলে তিনি মায়ের বিশাল পরিবারে প্রকৃত গৃহিণীর আসন অধিকার করিলেন। অবিবেচক ভাবপ্রবণ ভক্তদের আবদার হইতে স্পষ্টবাদিনী গোলাপ-মাই শ্রীমাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। একবার জনৈক ভক্ত ধূপধুনা জ্বালিয়া মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদিসহ ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ও স্তব করিতে থাকিলে তিনি ঘর্মক্লিষ্ট হইয়াও সঙ্কোচে কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোলাপ-মা কার্যান্তর হইতে তথায় আসিয়া সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি কাঠ-পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা?" বলিয়া ভক্তকে সরাইয়া দিলেন। গোলাপ-মার এই সেবা ও প্রীতিপূর্ণ দৃঢ়তা শ্রীশ্রীমাকে অন্যক্ষেত্রেও রক্ষা করিত এবং নানাভাবে সাহায্য করিত বলিয়া মা কোথাও যাইতে হইলে গোলাপ-মাকে সঙ্গে লইতেন; বলিতেন, "গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা।" ইহা যে শুধু মায়িক সম্বন্ধ নহে তাহা শ্রীশ্রীমা স্বমুখেই বলিয়াছিলেন, "এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যানজপ করেছে! গোলাপ জপে সিদ্ধ;" "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।"

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত গোলাপ-মা বৃন্দাবন, পুরী, কোঠার, কৈলোয়ার, কাশী, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু স্থানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল অবস্থানও করিয়াছিলেন। কলকাতা ও বেলুড়ের ভাড়াবাড়িগুলিতেও তিনি মায়ের সহচারিণী ছিলেন; অতঃপর বাগবাজারে মায়ের জন্য স্থায়ী বাটি নির্মিত হইলে তথায় গোলাপ-মার অবশিষ্ট জীবন ব্যয়িত হয়। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, মা ও ভক্তদের আহারাদির ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য। বয়স্ক ভক্তদের প্রণামের সময় লজ্জাপটাবৃতা মাতাঠাকুরানী অনুচ্চ স্বরে যে কুশলপ্রশ্ন বা আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেন, গোলাপ-মা তাহা স্পষ্টভাবে তাঁহাদের শ্রুতিগোচর করাইতেন। কোথাও যাতায়াতের সময় দেখা যাইত যে, মা গোলাপ-মার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামিতেছেন বা নববধূর ন্যায় গোলাপ-মার আঁচলটি ধরিয়া চলিয়াছেন।

গোলাপ-মার ব্যক্তিগত জীবন ছিল তপোময়, অথচ কর্মবহুল। বাগবাজারের মায়ের বাটিতে অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, তিনি রাত্রি চারি ঘটিকার পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্বগৃহে জপারাধনায় বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইলে ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীকে

প্রণামানন্তর তিনি নিচে নামিয়া আসিতেন ও দৈনিক রন্ধনের দ্রব্যসম্ভার ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া তরকারি কুটিতে বসিতেন। ঐ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই শ্রীশ্রীমাকে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে হইত। স্নানান্তে তিনি পূজার জন্য গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী আনিয়া ঠাকুরঘরে রাখিতেন এবং আবার তরকারি কুটিতে বসিতেন। পরে পান সাজিতেন। তখন ঐ বাটিতে পানখরচ হইত প্রচুর; অতএব গোলাপ-মাকেও ঐ কার্যে বেশ কিছুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে হইত। ঠাকুরের নিত্যপূজা হইবার পর তিনি সকলকে প্রসাদবিতরণ করিয়া দিতেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে তিনি গীতা, মহাভারত বা স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অথবা রাত্রের রান্নার জন্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, কিংবা সাধুদের ছিন্ন মশারি প্রভৃতি সেলাই করিতেন। সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীশ্রীমা প্রভৃতির সহিত সদালাপ করিতেন ও জপ করিতেন। সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইলে পুনর্বার ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত জপাদিতে নিমগ্ন থাকিতেন। রাত্রেও আহারকালে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত, সকলে সকল জিনিস এবং প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ দ্রব্যাদি পাইল কিনা। কেহ হয়তো কার্যানুরোধে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই; সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য বিশেষ কিছু আসিয়া থাকিলে গোলাপ-মা অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভাগটি তুলিয়া রাখিতেন।

ভক্ত-ভগবানের সেবারাধনায় নিবেদিতপ্রাণা গোলাপ-মা গৃহের সমস্ত দ্রব্যসম্ভারের তত্ত্বাবধান করিতেন ও হিসাব রাখিতেন। বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সাধু-ব্রহ্মচারী অনবধানতাবশত যথাতথা অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিলে তিনি তাহা পরিষ্কার করাইয়া গুছাইয়া রাখিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা ছিল—"অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" তাই তিনি ভাঙ্গা অব্যবহার্য পাত্রাদি বদলাইয়া নূতন বাসন আনিতেন। ভক্তদের আহারের পর পাত্রে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কিংবা তরকারির খোসা রাস্তার গরুকে দিতেন; এমন কি কমলালেবুর খোসা কিংবা আখের ছিবড়া শুকাইয়া রাখিতেন—উনুন ধরাইতে প্রয়োজন হইবে বলিয়া। পানসাজা হইয়া গেলে বোঁটাগুলি গিনিপিগদের খাইতে দিতেন। ইহার কারণ ঐগুলির প্রতি তাঁহার ভালবাসা নহে, কিন্তু উহারা পানের বোঁটা ভালবাসে, তাই ঐ ভাবে উহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

পাঠক যেন মনে করিবেন না, ইহা তো প্রতি গৃহস্থ-ঘরের বৃদ্ধারাই করিয়া থাকেন—ধর্মজীবনের অনুধ্যানকালে এইসবের অবতারণা কেন? ইহার উত্তরে আমরা তাঁহাকে একবার স্মরণ করিতে বলি—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকার্য কিরূপ সুশৃঙ্খল ছিল এবং ভক্তদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার কতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত;

আর তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি—স্বামীজীর শিক্ষাগুণে বর্তমান যুগে কর্ম কিরূপে সেবা ও পূজায় পরিণত হইয়াছে। গোলাপ-মা অন্তরে অন্তরে জানিতেন, তিনি যে-কার্যে নিযুক্ত আছেন, উহা তাঁহার নহে, উহা ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের। অতএব কোনও কার্যের সহিত স্বার্থ বিজড়িত না থাকায় উহা তাঁহাকে বিমল আনন্দের অধিকারী করিত।

দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্তা। তাঁহার দৌহিত্র তাঁহাকে মাসিক যে দশটি টাকা দিতেন, উহার অর্ধাংশ স্বীয় আহারাদির জন্য তিনি মায়ের বাটিতে দিতেন; বাকি অর্ধাংশ দীন-দুঃখীর অভাবমোচনেই ব্যয়িত হইত। অভাবগ্রস্তেরা জানিত যে, গোলাপ-মার নিকট উপস্থিত হইলে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে না—'মা' বলিয়া ডাকিলেই উপর হইতে কিছু পড়িবে। এক পাগলী ছিল—সে আসিয়াই হাঁকিত, "গোলাপের মা, আমি এসেছি।" তাহার আগমনের সময়াসময় ছিল না; কখনও বা রাত্রে সকলের শয্যাগ্রহণের পর আসিয়া উপস্থিত! সম্মুখের দরজায় সুবিধা হইল না দেখিয়া পশ্চাতের দরজায় গিয়া ডাক শুরু করিল, "গোলাপের মা।" গোলাপ-মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এত রাতে তোকে কি দিই?" শেষ পর্যন্ত দিলেন কিন্তু কিছু, আর বলিলেন, "আহা, পাগল অনাথ, দোরে দোরে মেগে খায়; সময় হোক অসময় হোক, এলে একমুঠো দিতে হয়!" এমনও দেখা গিয়াছে, অপরের অভাব দূর করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। আবার অন্যকেও তিনি এরূপ সেবায় আহ্বান করিতেন; এইরূপে দরিদ্র প্রতিবেশীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকাইয়া আনিতেন। অথচ নিতান্ত অসমর্থ না হইলে স্বয়ং কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না।

সিদ্ধির উচ্চস্তরে আরূঢ়া বিধবা ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা অর্থহীন কিংবা উচ্চাবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন বহু সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগপূর্বক এক অপূর্ব উদারভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ অসুখের পর অরুচিদূরীকরণার্থে শ্রীশ্রীমা একদিন সেবককে একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে বলিলেন। অব্রাহ্মণ সেবক মায়ের আদেশে চুপি চুপি উহা আনিয়া দিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে গোলাপ-মা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "শূদ্রের হাতের সকড়ি জিনিস খাচ্ছ কি করে, মা?" মা বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্তের আবার জাত আছে?" পরক্ষণেই মায়ের মুখের প্রসাদী ডাঁটা মুখে পুরিয়া গোলাপ-মা নীরবে বিদায় লইলেন।

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত পায়খানা পরিষ্কার করিয়া হয়তো পরমুহূর্তেই ঠাকুর-ঘরের কার্যে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী একদিন মায়ের নিকট অভিযোগ জানাইলেন, "গোলাপ-দিদি পায়খানা সাফ করে এসে

আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল; আমি বললুম, 'ও কি গোলাপ-দিদি; গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।' গোলাপ-দিদি বললে, 'তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না'!" সমস্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "গোলাপের মন কত শুদ্ধ—কত উঁচু মন! তাই ওর অত শুচি-অশুচির বিচার নেই—অত শুচিবাই-টাইয়ের ধার ধারে না। ওর এই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাই রামপ্রসাদ-বিরচিত গানটি গাহিতেন—

"শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি?
(তাদের) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।"

গোলাপ-মার শুদ্ধ মন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন—"বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি—সঙ্গে ছেলে যোগেন এরা সব। কাদের ছেলে মেয়ে যেন নোংরা করে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিটকুচ্ছে, কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা কচ্ছে না। গোলাপ তা দেখে অমনি নিজের নূতন মকমলের ধুতি ছিঁড়ে পরিষ্কার করলে। মাগীগুলো দেখে বলছে, 'এ যখন ফেলেছে, তবে এরই ছেলে নোংরা করেছে রে।' আমি মনে মনে বলছি, 'মাধব, দেখ দেখ, কি বলছে!' কেউ বা বলছে, 'এঁরা সাধুলোক, এঁদের আবার ছেলে পিলে কি? এরা ফেলছেন সব্বায়ের দর্শনের অসুবিধা হচ্ছে—মন্দিরে ময়লা রয়েছে এজন্য।' এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখে তো গোলাপ হেথা-সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটিঘটি জল ঢেলে ধুয়ে দিলে। এতে দশজনের সুবিধা হলো। তারা যে শান্তি পেলে ওতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে—তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে। অনেক সাধন-তপস্যা করলে, পূর্বজন্মের বহু তপস্যা থাকলে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।"

আর গোলাপ-মার ছিল অপূর্ব গঙ্গাভক্তি। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যষ্টিসাহায্যে নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। দেহত্যাগের জন্য তিনি প্রস্তুতই ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যোগেন যাবে শুক্লপক্ষে আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে।" ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪), কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অপরাহ্ণ চারিটার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একনিষ্ঠ সেবিকা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিলেন।

# গৌরী-মা

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে প্রশ্ন করিতেছেন, "গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।" গৌরী-মার ইহা অতি উত্তম পরিচয়। গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নানাভাবে অভিহিত হইতেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি ছিলেন 'গৌরদাসী'। স্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপান্তর 'গৌর-মা' নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাঁহার মধ্যম বয়সের প্রচলিত নাম। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নাম হয় 'গৌরীপুরী' তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পরে 'গৌরী-মা' বলিয়াই পরিচিত হন। স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন 'মাতাজী'; আবার পিতৃগৃহে তাঁহার নাম ছিল 'মৃড়ানী' বা 'রুদ্রাণী'।

মৃড়ানীর জন্ম হয় ভবানীপুরে মাতুলগৃহে। তাঁহার পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে বাস করিতেন এবং প্রত্যহ পূজার্চনান্তে সেখান হইতে খিদিরপুরে এক সওদাগরী অফিসে কার্য করিতে যাইতেন। নিষ্ঠাবান পার্বতীচরণের কপালে চন্দন দেখিয়া অফিসের সাহেব উপহাস করিলেও তিনি স্বধর্মচিহ্ন ত্যাগ করিতেন না। পার্বতীচরণের সহধর্মিণী গিরিবালা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় পিতৃগৃহেই থাকিতেন। পার্বতীচরণেরও সপ্তাহে দুই-এক দিন শ্বশুর বাড়িতেই কাটিত। মৃড়ানী ছিলেন এই দম্পতির চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয়া কন্যা।

মাতা গিরিবালা বাঙলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু স্তব ও ধর্মসঙ্গীত রচনাপূর্বক 'নামসার' ও 'বৈরাগ্য-সঙ্গীতমালা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার সুকণ্ঠোত্থিত স্বরচিত সঙ্গীতে ধর্মপিপাসুর মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্না সাধিকা। আবার বিষয়কর্মেও ছিল তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতা। শান্তপ্রকৃতি পার্বতীচরণ সহধর্মিণীকে বলিতেন, "এত ঝঞ্ঝাটের দরকার কি? আমাদের তো কিছুর অভাব নেই। এসব আপদ ছেড়ে চল কাশী গিয়ে বাকি কটা দিন শান্তিতে কাটাই।" অমনি কালী-সাধিকা গিরিবালা সদর্পে বলিয়া উঠিতেন, "অন্যায়-অত্যাচার আমি নীরবে সইব কেন? মা অসুরনাশিনী আমার সহায়—আমার অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না, দেখে নিও।" পিতা ও মাতার এই ধর্মানুপ্রাণিত কুসুমকোমল ও বজ্রদৃঢ় স্বভাবের মিশ্রণে মৃড়ানীর চরিত্র বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মাতৃধ্যানে নিমগ্না

গিরিবালা এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, মহামায়া যেন এক জ্যোতির্ময়ী রূপলাবণ্যসম্পন্না দেবকন্যাকে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। ইহারই পরে মৃড়ানী ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্মকাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে (১২৬৪ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। মাস বা তিথিও অজ্ঞাত। তবে একসময়ে ভক্তগণ তাঁহার জন্মোৎসব করিতে আগ্রহান্বিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জন্মোৎসব তোরা যদি নিতান্তই করবি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথিতেই করিস।" ইহা তাঁহার জন্মতিথির পরিচায়ক না হইয়া সম্ভবত তাঁহার নিরভিমানতারই দ্যোতক।

বাল্যকাল হইতেই মৃড়ানীর জীবনে ধর্মস্পৃহা ও বৈরাগ্যের আভাস পাওয়া যাইত। বালিকা আপনমনে দেবপূজাদিতে রত থাকিত, ক্রন্দনকালে দেবতার নাম শুনিয়া শান্ত হইত, আর ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া ক্ষান্ত হইত না। আশৈশব সে নিরামিষাশী। তাহার বেশভূষায় মন ছিল না এবং কোন বিষয়ে যাজ্ঞাও ছিল না। একদিন অগ্রজের সহিত নৌকাভ্রমণকালে তাহার মনে হইল, "অলঙ্কার তো বৃথা। এসব না থাকলে আমার কষ্ট হবে কি?" অমনি সোনার বালা খুলিয়া চিবাইয়া দেখিল উহাতে কোন স্বাদ আছে কিনা। তারপর অপরের অলক্ষিতে উহা জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পাড়ার 'চণ্ডীমামা' জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি বালিকার হাত দেখিয়া বলিলেন, "এ মেয়ে যোগিনী হবে।" চণ্ডীমামার নিকট মৃড়ানী তাঁহার তীর্থভ্রমণের কথা তন্ময় হইয়া শুনিত এবং তাদৃশ পটভূমিকায় স্বীয় ভাবী জীবনের পরিকল্পনা রচনা করিত।

মৃড়ানীর জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির একটা প্রত্যক্ষ পূর্বাভাসও পাইতে বিলম্ব হইল না। বালিকা যখন মাত্র দশমবর্ষীয়া, তখন সে এক সকালে ক্রীড়ারতা অপর সমবয়স্কাদের সহিত মিলিত না হইয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে নীরবে উপবিষ্টা ছিল; এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে আগত আজানুলম্বিতবাহু উদারদৃষ্টি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটি চুপচাপ বসে আছ?" বালিকা ব্রাহ্মণচরণে প্রণাম করিয়া উত্তর দিল, "ওসব খেলা আমার ভাল লাগে না।" ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন, "কৃষ্ণে ভক্তি হোক!" বালিকা তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইল ও কিছুদিন পরে অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের সহিত বরাহনগরে মাতৃষ্বসা বগলা দেবীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতে থাকিল এবং অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী নিমতে-ঘোলার এক কদলীবনে সেই ব্রাহ্মণকে ধ্যাননিরত দেখিতে পাইল। ধ্যানভঙ্গে সাধক তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এসেছিস?" তারপর এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং পরদিন গঙ্গাস্নানান্তে পুনর্বার উপস্থিত হইলে তাহাকে দীক্ষা দিলেন। সেদিন

ছিল রাসপূর্ণিমা। এদিকে পরিবারের লোক বালিকাকে গৃহে না দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর অবিনাশচন্দ্র নিমতে-ঘোলার সাধকসমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সাধক বলিলেন, "দেখ বাবা, ও ছেলেমানুষ, ওকে যেন কেউ বকো না। হলদে পাখী ধরে রাখা দায়।" বালিকা সাধকের ইঙ্গিতে গৃহে ফিরিল।

মৃড়ানী বাল্যকাল হইতেই ৺কালীভক্ত ছিলেন; তিনি নিত্য দেবীর পূজার্চনা করিতেন এবং নিদ্রাভঙ্গে দেবীর নাম লইতেন। এদিকে চণ্ডীমামার নিকট গৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার প্রতিও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত মৃড়ানী একদিন মৃত্তিকানির্মিত শালগ্রাম-পূজায় রত হইলেন; তাদৃশ প্রতীকে পূজা করিতে নাই জানিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। নিমতে ঘোলার সাধকের নিকট দীক্ষালাভের কিয়ৎকাল পরেই এক অপরিচিতা ব্রজরমণী মৃড়ানীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে বালিকার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ব্রজরমণী 'দামু', 'দামোদর' বা 'রাধাদামোদর' নামীয় এক নারায়ণশিলাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজাদি করিতেন এবং তাঁহার সহিত অনুরূপ আচরণও করিতেন। বিদায়কালে তিনি সেই শিলা মৃড়ানীর হস্তে সমর্পণপূর্বক বলিলেন, "এই শিলা আমার ইহকালের ও পরকালের সর্বস্ব, বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি। তোমার প্রেমে ইনি মজেছেন।" তদবধি ব্রজরমণীর অনুকরণে মৃড়ানী দামোদরের পূজায় নিরত হইলেন, আর তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল যে, এই ঠাকুরটিকেই জীবনমন অর্পণপূর্বক ধন্য হইবেন, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যপতি বরণ করিবেন না।

এই সময়ে (১৮৬৮ খ্রিঃ) কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিলম্যানের কর্তৃত্বাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকাদের জন্য ভবানীপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে মৃড়ানী উহাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই বিদ্যালয়ে সর্ববিষয়ে উত্তম ছাত্রী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় একটি স্বর্ণপেটিকা পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুদারতানিবন্ধন অপর অনেক বালিকার সহিত তাঁহাকে অচিরে ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত অপর হিন্দুবিদ্যালয়ে যোগ দিতে হইল। অতঃপর মিশনারিরা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন বটে; কিন্তু মৃড়ানীর আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হইল না। কারণ বিবাদের অবসান হইলেও হিন্দুসমাজ তখনও বালিকাদের অধ্যয়নসম্বন্ধে বড়ই সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করিত। তথাপি ইতোমধ্যেই মৃড়ানী চণ্ডী, গীতা, বহু দেবদেবীর স্তোত্র, রামায়ণ, মহাভারত এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।

বালিকার বয়স বাড়িতেছে, অতএব বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরন্তু বালিকার ধনুর্ভঙ্গপণ—তিনি "তেমন বরকেই বিবাহ করিবেন, যাহার মৃত্যু নাই।" পাত্রী দেখিতে আসিয়া পাত্রপক্ষীয়গণ কন্যার রূপাদির প্রশংসা করিলেন; কিন্তু তাহার সৃষ্টিছাড়া কথা শুনিয়া গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্থির হইল যে, বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটী-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের হস্তেই ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া মৃড়ানীকে অর্পণ করা হইবে। মৃড়ানী অমনি রুদ্রাণী সাজিলেন এবং বিবাহের রাত্রে আত্মরক্ষার জন্য একটি অর্গলবদ্ধ কক্ষে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক সর্বপ্রকার অনুনয়-বিনয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অবশেষে ইহাতেও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া জননীর সাহায্যে এক মাসিমার বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়গণ তথাপি প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, ভগিনীপতির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

গৃহে প্রত্যাগত মৃড়ানী পূজারাধনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে চণ্ডীমামার বর্ণিত তীর্থগুলি তাঁহাকে মৌন আহ্বান জানাইতেছিল; তাই প্রত্যুষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু অনভ্যস্ত থাকায় বেশি দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই স্বজনবর্গের দৃষ্টিপথে পড়িয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া নজরবন্দি হইতে হইল। এই মুক্তিকামী বালিকাকে গৃহে ধরিয়া রাখিতে হইলে অন্তত মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি ও সাধু-দর্শনের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় অতঃপর তাঁহাকে কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবেই একদিন ভগিনী বগলা ও ভগিনীপতি প্রভৃতির সহিত তিনি সাগরসঙ্গমে চলিলেন—তাঁহার বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। মেলার জনসমাগমের মধ্যে সুযোগ পাইয়া তৃতীয় দিবসে মৃড়ানী আত্মগোপন করিলেন। এদিকে বহু চেষ্টাতেও আত্মীয়গণ তাঁহার সন্ধান না পাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে মৃড়ানী গুপ্তস্থান হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পশ্চিমদেশীয় একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সহিত পার্বত্যাঞ্চল-বাসিনীর বেশে হরিদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সাধুসঙ্ঘে তিনি 'গোরী-মায়ী' নামে পরিচিতা হইলেন। ক্রমে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানান্তে গৌরী-মা হিমালয়পাদমূলে হৃষিকেশে গমন করিলেন। স্থানটি তপস্যার অনুকূল; সুতরাং তিনি তথায় কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হইলেন। পরে তাঁহার মন ৺কেদারবদরী প্রভৃতি দর্শনে ধাবিত হইল। উত্তরাখণ্ডের বহুজনবিশ্রুত ঐসকল তীর্থ দেখিয়া তিনি ৺অমরনাথ ও জ্বালামুখী প্রভৃতিও দর্শন করিলেন। ইহারই মধ্যে একবার তিনি যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রীও দর্শন করিয়াছিলেন।

গলায় দামোদর-শিলা ঝুলাইয়া গৈরিক-পরিহিতা সন্ন্যাসিনী তখন চলিয়াছেন—

পদব্রজে—এক দুর্গম তীর্থ হইতে দুর্গমতর তীর্থান্তরে। তাঁহার ঝোলাতে আছে মা কালী ও গৌরাঙ্গদেবের পট, চণ্ডী, ভাগবত ও নিত্যব্যবহার্য সামান্য দ্রব্য। লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি কেশকর্তন করিয়া অঙ্গে ভস্ম কিংবা মৃত্তিকা মাখেন এবং কখনও পাগলিনীর ন্যায় ব্যবহার করেন। কখনও বা আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিয়া পুরুষদের বেশে চলেন; বাক্যালাপ বিশেষ করেন না এবং ভিক্ষাদির জন্যও লোকালয়ে গমনের তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। অবহেলায় দুর্বল শরীর মধ্যে মধ্যে শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা হারায়, আর পার্বত্য নারীদের শুশ্রূষায় পুনঃ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। আবার উহারই মধ্যে চলে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রতা বা উদয়াস্ত জপ। সে এক চমৎকার চিত্র![১]

কয়েক বৎসর এইভাবে পরিভ্রমণের পর তিনি যখন বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাভূমিসন্দর্শনে নিরত আছেন, তখন শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক মথুরাবাসী তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় কাকা তাঁহাকে অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া বলপূর্বক স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং কলকাতায় সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু গৌরী-মা এই কৌশল বুঝিতে পারিয়া মথুরা হইতে পলাইয়া গেলেন ও রাজপুতানার তীর্থাদিদর্শনান্তে সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন। এই যাত্রায় জয়পুর, পুষ্কর, প্রভাস, দ্বারকা ইত্যাদি বহু তীর্থ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। সুদামাপুরীর নিকটে কোন গ্রামে চিকিৎসা ও সেবার অভাবে বিসূচিকারোগে অনেকের প্রাণনাশ হইতেছে জানিয়া গৌরী-মার মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি প্রান্তীয় সরকার ও জনসাধারণের সাহায্যে ইহার যথাসাধ্য প্রতিকার করিলেন। দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে জপ করিতে করিতে বালকবেশী শ্যামসুন্দরের তিনি দর্শন পাইলেন। এইভাবে বিভিন্নস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে পাইবার অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গৌরী-মা পুনর্বার বৃন্দাবনে আসিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত থাকিয়া তিনি আত্মবিসর্জনোদ্দেশ্যে নিশাকালে ললিতাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন; পরন্তু সেখানে এক অভূতপূর্ব দর্শনলাভ করিয়া বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন—পূর্বের ইচ্ছা আর কার্যে পরিণত হইল না। ইতোমধ্যে শ্যামাচরণ কাকাও তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন; সুতরাং পূর্বসংকল্প অনুসারে গৌরী-মাকে গৃহে আনিলেন এবং সঙ্গে করিয়া কলকাতায় লইয়া গেলেন। দীর্ঘকাল পরে গৃহে প্রত্যাগতা মৃড়ানী আত্মীয়স্বজনের প্রাণঢালা স্নেহমমতা পাইলেন এবং সমুৎসুক সকলকে তীর্থভ্রমণাদির গল্প শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর পক্ষে ঐভাবে দীর্ঘকাল যাপন

---

১ আমরা এই প্রবন্ধরচনার জন্য প্রধানত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'গৌরী-মা' গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি। গৌরী-মার তীর্থভ্রমণ ও তপস্যার কাহিনী উহা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্রে গৌরী-মার কিছুকাল গার্হস্থ্য-জীবনযাপনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, এই আশা দিয়া ৺পুরুষোত্তম-দর্শনে চলিলেন।

গৌরী-মার গভীর নিষ্ঠাভক্তি ও পাণ্ডিত্য ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া ৺জগন্নাথের পুরোহিতগণ তাঁহার ইচ্ছামত দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে তিনি কোঠারের জমিদার ও ভক্ত রাধারমণ বসু মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে বসু মহাশয়ের সহিত গৌরী-মার প্রথম পরিচয় হয়। ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রসঙ্গে বসু মহাশয় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কলকাতাস্থ নিজ বাটিতে ও বৃন্দাবনে 'কালাবাবুর কুঞ্জে' আহ্বান করিয়া রাখিতেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত বলরাম বসু ইঁহারই পুত্র। বলরামবাবুর সহিত গৌরী-মার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে গৌরী-মা নবদ্বীপ যান। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলানিকেতন এই নবদ্বীপ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, "নদে আমার শ্বশুরবাড়ি।" ইহাই ছিল নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার চিরসম্বন্ধ। নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নয়নগোচর হইলে তিনি ভাসুরবোধে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া তিনি পুনর্বার বৃন্দাবনে গেলেন। এই সময়ে বলরামবাবু বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তৎপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি গৌরী-মাকে জানাইলেন, "দিদি, দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি—সনক-সনাতনের মতো তাঁর ভাব। ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতেই সমাধি হয়। তুমি একবার অবশ্য তাঁকে দেখে আসবে।" গৌরী-মা শুনিয়া গেলেন মাত্র। কিন্তু তখনই কলকাতার দিকে যাত্রা না করিয়া অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে হৃষিকেশে উপস্থিত হইলেন—অভিপ্রায়, আবার কেদার-বদরিদর্শনে যান। কিন্তু খবর পাইলেন যে, তাঁহার মাতা অসুস্থ; অতএব মথুরা হইয়া কলকাতায় ফিরিলেন। সেখানে মাতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এখানেও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামক এক বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ—অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি।" শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যখন বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন, তখনও বসু মহাশয় তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে সাধুদর্শনে যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু গৌরী-মা তখনও কোন আকর্ষণ অনুভব না করায় সহাস্যে জানাইলেন, "জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধুদর্শনের সাধ আমার নাই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান—তার আগে আমি যাচ্ছিনে।"

টান একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে আসিল। সেদিন গৌরী-মা অভিষেকান্তে দামোদরকে সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন, সেখানে মানুষের দুইখানি জীবন্ত চরণ, অথচ দেহের অন্য অবয়ব নাই। অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া বুঝিলেন, নয়নের ভ্রম হয় নাই। দামোদরকে তুলসী দিলেন—তুলসী গিয়া পড়িল ঐ চরণযুগলে। গৌরী-মা বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বসুপত্নী অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সাড়া না পাইয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিলেন তিনি ভূলুণ্ঠিতা ও জ্ঞানশূন্যা। তিন-চার ঘণ্টা পরে জ্ঞানলাভ করিয়াও তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না—শুধু বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার হৃদয়কে সুতায় বাঁধিয়া টানিতেছে। দিন-রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষের পূর্বেই তিনি বহির্দ্বারে আসিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন। দ্বারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবেন?" গৌরী-মার কিন্তু উত্তর নাই। ইতোমধ্যে বসু মহাশয় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কাছে যাবে?" গৌরী-মা নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাকেই সম্মতিজ্ঞানে গাড়ি ডাকাইয়া স্বপত্নী ও আর দুই-একজন মহিলাসহ গৌরী-মাকে লইয়া বসু মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আগত ভক্তগণ দেখিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ স্বকক্ষে বসিয়া আপন মনে সুতো জড়াইতেছেন আর গাহিতেছেন,

"যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা?
একবার নাচ গো শ্যামা!" ইত্যাদি

ভক্তগণের কক্ষপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সুতা-জড়ানো শেষ হইল। গৌরী-মা বুঝিলেন, তাঁহার সেই অব্যক্ত বেদনার উৎস কোথায়, আর সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চরণযুগল! শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না! তিনি বলরামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরী-মার পরিচয় পাইলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেন। বিদায়কালে গৌরী-মাকে বলিলেন, "আবার এসো, মা।" ইহা ১২৮৯ বঙ্গাব্দের কথা —গৌরী-মার বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ।

পরদিবস প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র ও বক্ষে দামোদরকে লইয়া গৌরী-মা পুনর্বার একাকী দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তোর কথাই ভাবছিলুম।" গৌরী-মাও ভাবে গদগদ হইয়া নিজজীবনের অনেক কাহিনী ও দামোদরের সিংহাসনে তাঁহারই পাদপদ্ম দর্শনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পারিনি, বাবা!" উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে এত সাধনভজন কি করে হত?"—

অবশেষে নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে—এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।" তদবধি কিছুকাল গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরানীর অবর্তমানে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। দূরে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনস্পৃহা তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে এতই প্রবল হইত যে, তিনি একদিন আহারান্তে হস্তপ্রক্ষালনাদির পূর্বেই ঐরূপ আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিবেন এমন সময় মনে পড়িল যে, হাত অপবিত্র—লজ্জিত হইয়া হাত ধুইতে চলিলেন।

গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, গৌরী-মা অনেক সময় নিজহস্তে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে খাওয়াইতেন এবং নহবতে মধুরকণ্ঠে ঠাকুরকে উচ্চ উচ্চ ভাবের গান এবং কীর্তনাদি শুনাইয়া সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। আরও লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর গৌরী-মাকে মহাতপস্বিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। গৌরাঙ্গলীলায় আকণ্ঠমগ্না গৌরী-মার মনে শ্রীরামকৃষ্ণাবতারেও তুল্যরূপ মহাভাবে মত্ততা ও ভূপতনাদি-নিরীক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জাগিত এবং তখনই ঠাকুরের দেহাবলম্বনে ঐরূপ লীলা প্রকটিত হইত। ইহাতে গৌরী-মা একদিকে যেমন পুলকিতা হইতেন, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের দৈহিক কষ্ট দেখিয়া ঐরূপ বাসনা দমনে যত্নবতী হইতেন। গৌরী-মার জননী গিরিবালাও কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর গৌরী-মাকে কত উচ্চাধিকারিণী মনে করিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় খ্রিস্টান ভক্ত উইলিয়ম সাহেবকে ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি সাহেবকে বলরামগৃহে গৌরী-মার সহিত দেখা করিতে বলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎ হইলে সাহেব গৌরী-মাকে 'মাদার মেরি' বলিয়া সম্বোধনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন এবং ভগবানে ভক্তিলাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ইহারই একসময়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যের ফলে গৌরী-মা সর্ববিষয়ে উদারদৃষ্টিসম্পন্না হইয়াছিলেন। একবার রামনবমীর উপবাসদিবসে ঠাকুর জলযোগকালে অর্ধভুক্ত মিষ্টান্ন গৌরী-মাকে দিলে তিনি অম্লানবদনে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন; তখনই রামনবমীর কথা স্মরণ হওয়ায় ঠাকুর কহিলেন, "এই রে! আজ যে রামনবমীর উপবাস!" গৌরী-মা অমনি উত্তর দিলেন, "তোমার উপরেও কি আবার বিধিনিষেধ?" গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণ অবতার

ও মাতাঠাকুরানীকে স্বয়ং ভগবতী বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কেহ অন্যরূপ বলিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইতেন। গৌরাঙ্গগতপ্রাণা যে গৌরী-মার চক্ষে মহাপ্রভুর নামে অশ্রু ঝরিত, তিনিই এককালে বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য—এই দুয়ে অভেদ।" শ্রোতা যখন আপত্তি করিলেন যে, মানুষ ও দেবতা এক হইতে পারে না, তখন গৌরী-মা সদর্পে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ"—ইহা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি গৌরী-মার অনুরাগের আধিক্য দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "তুই কাকে বেশি ভালবাসিস?" গান গাহিয়া সুকণ্ঠী গৌরী-মা উত্তর দিলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী;
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।"

গান শুনিয়া মাতাঠাকুরানী কুণ্ঠায় গৌরী-মার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ঠাকুরও হার মানিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

কলকাতার জননীকুলের জন্য ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিত; তাই তিনি গৌরী-মাকে প্রেরণা দিতেন, যাহাতে তিনি মায়েদের নিকট ভগবানের কথা বলিয়া তাঁহাদের ভক্তি উদ্দীপিত করেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "যদু মল্লিকের বাড়ির মেয়েরা তোকে দেখতে চেয়েছে—একদিন যাস ওখানে।" অনুযোগ করিয়া গৌরী-মা বলিলেন, "তোমার ঐ কাণ্ড! তুমি লোকের কাছে আমার এত প্রশংসা কর কেন?" ঠাকুর আর একদিন ঊষাকালে বামহস্তে নহবতের নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের শাখা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে পুষ্পচয়নরতা গৌরী-মাকে বলিলেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।" গৌরী-মা সবিস্ময়ে কহিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চটকাব? সবই যে কাঁকর!" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু—তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" গৌরী-মার সাধনপ্রবণ ও নির্জনতাপ্রিয় মন যদিও তখন বলিয়াছিল, "সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না—ইহাই আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্চি," তথাপি ঠাকুর হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে—এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!" গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি ঐজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

দক্ষিণেশ্বরের এই দিনগুলি গৌরী-মার জীবনে অতি আনন্দপ্রদ ও ফলপ্রসূ

হইলেও তখনও তাঁহার মনে তপস্যার প্রবল আকর্ষণ থাকায় এবং উদয়াস্ত একাসনে বসিয়া নয়মাস সাধনা করার সঙ্কল্প প্রবল হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও লীলাসংবরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গৌরী-মার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেরিত হইলেও তাহা যথাকালে তাঁহার নিকট পৌঁছিল না। শেষ পর্যন্ত গৌরী-মাকে না দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না—আমার ভেতরটা যেন বিল্লীতে আঁচড়াচ্ছে।" পরে শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে গেলেন, তখন তিনি তপস্যানিরতা গৌরী-মাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং জানাইলেন যে, ঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়া বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর গৌরী-মার নিকট এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি শুনিয়া লইতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা গৌরী-মাও শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারপূর্বক কহিলেন, "ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।"[১] শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবনত্যাগের কিছুকাল পরে গৌরী-মা হিমালয়ভ্রমণে গমন করেন। এইরূপে বৃন্দাবন ও হিমালয়ে দশ বৎসর যাপনান্তে তিনি কলকাতায় ফিরেন। ইহার পর তাঁহার একবার বিসূচিকা ও একবার জ্বর হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের পরিবারে থাকিয়া সেবাদিগ্রহণ করায় তাঁহার মনে হইল, হয়তো তিনি মায়ার বন্ধনে পড়িতেছেন। অতএব আরোগ্যান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ ৺রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হইলেন।

দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থদর্শনান্তে তিনি রামেশ্বর উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আনীত গঙ্গোত্রীর জলে ৺রামেশ্বরকে স্নান করাইলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ৺বালাজী গোবিন্দকে দর্শন করিলেন এবং পরে দক্ষিণদেশের অপরাপর তীর্থ এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়া কলকাতায় ফিরিলেন। এইবারে তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল—এই সময়ে মাতৃজাতির কল্যাণকামনা তাঁহার হৃদয়ে ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করিতে থাকিল।

প্রথমে তিনি রামপ্রসাদের সাধনভূমির নিকটে গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর অনুরাগিবৃন্দের আহ্বানে এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে ১৩০১ বঙ্গাব্দে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এই আশ্রমনামীয় পর্ণকুটিরে একে একে প্রায় পঁচিশজন কুমারী, সধবা এবং বিধবা আগমনপূর্বক গৌরী-মার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। অভাব সেখানে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু এই অসচ্ছলতার মধ্যেও একটা অপূর্ব

১ "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"য় (২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ; অখণ্ড সং, পৃঃ ২৩৬-৩৭) কিন্তু দেখিতে পাই যে, শ্রীমায়ের নিজের মতে ইহা বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কামারপুকুরে সংঘটিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা 'গৌরী-মার' অনুসরণ করিলাম, যদিও আমাদের বিশ্বাস যে, অন্য বিবরণই নির্ভরযোগ্য।

তৃপ্তি ছিল এবং উহাই আশ্রমবাসিনীদিগকে আকৃষ্ট করিত। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, গঙ্গাস্নান, গৃহকর্ম ও পাঠাভ্যাসে দিনগুলি বড়ই মধুময় মনে হইত। গৌরী-মা একদিকে যেমন শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে তেমনি ছোট ছোট বালিকাদের সহিত স্নেহময়ী মাতার ন্যায় ক্রীড়াও করিতেন। কোমল কঠোরের সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ এখানে মূর্তিলাভ করিতেছে দেখিয়া অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আশ্রমদর্শনে আসিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুরাও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কলকাতায় একটি 'মাতৃসভার' অনুষ্ঠান করিয়া গৌরী-মা হিন্দুনারীর আদর্শাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইরূপে ক্রমে বাগ্মিতার জন্যও তিনি সুনাম অর্জন করিতে থাকেন। কিন্তু আদর্শপ্রচার, আশ্রমগঠন ইত্যাদি কার্যকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও গৌরী-মার প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জীবন গঠনের প্রতি; বিশেষত তিনি বুঝিয়াছিলেন, একান্তভাবে মাতৃজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে এইরূপ একটি সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে না পারিলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সুতরাং এই সময় হইতে তিনি ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহাকে সর্বতোভাবে তজ্জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহার প্রেরণায় মন্দিরের দেবতাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক যথাকালে সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।

কার্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মা বুঝিতে পারিলেন যে, কলকাতা মহানগরীর সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রাখা আবশ্যক। তদনুসারে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রমের কার্য আরম্ভ হইল। সেখানে দশ-বার জন কুমারী ও বিধবা বাস করিতেন এবং প্রায় ৬০ জন বালিকা নিত্য পড়িতে আসিত। কাজের প্রসার ও অন্যান্য কারণে আশ্রম অতঃপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এভাবে কার্য দৃঢ়মূল হয় না জানিয়া গৌরী-মা জমির সন্ধান করিতে থাকিলেন এবং অবশেষে ২৬ নং মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে বর্তমান আশ্রমভূমির কিয়দংশ (চারি কাঠা) ক্রয় করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বৎসর গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল না। অনন্তর ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজাদিবসে গৌরী-মা উহার ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং পরবৎসর ২৭ অগ্রহায়ণ দেবতাসহ নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। নূতন বাটিতে আগমনের পর ক্রমে আশ্রমবাসিনীদিগের সংখ্যা পঞ্চাশ ও দৈনিক ছাত্রীদের সংখ্যা তিন শত হইল। সহায়সম্পদহীনা সন্ন্যাসিনীর পক্ষে এইরূপ সাফল্যলাভ সহজ ছিল না; কিন্তু ভগবচ্ছক্তিতে একান্ত বিশ্বাসভরে তিনি বলিতেন, "যিনি কাজে নামিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিঘ্ন এলেও আমার কোন দুঃখু নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।"

কার্যের বিস্তারদর্শনে গৌরী-মার মনে হইল যে, দায়িত্ব তাঁহার একার স্কন্ধে রাখা সমীচীন নহে। এইজন্য বিখ্যাত জননেতাদিগকে লইয়া একটি 'পরামর্শ-সভা' গঠিত হইল এবং শিক্ষিতা মহিলাদিগকে একটি 'মহিলাসমিতি'র অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' এবং ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাদের লইয়া 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠিত হইল। প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে গৌরী-মা আশ্রমের প্রধান-পরিচালিকা ও মাতৃসঙ্ঘের সভানেত্রী হইলেন।

প্রথম হইতেই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, আশ্রমজীবনে যাহাতে প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শ রূপপরিগ্রহ করে। এই আশ্রমের শিক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "পুরুষের এবং নারীর শিক্ষা যে একই আদর্শে, একই পথে চলিতে পারে না, বিজাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুর অন্তঃপুর-বাসিনীগণের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা অনেকেই মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা যখন হিন্দুর কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময়ে আসিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, আসিলেন গৌরী-মা। এই তপঃসিদ্ধা দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া তাঁহার গুরুপত্নীর পবিত্র নামে ...আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্যা গড়িয়া উঠিতে পারেন—হিন্দুর সমাজকে সুশিক্ষার মধ্য দিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারেন।"

নিজের ভিতর অমৃত সঞ্চিত থাকিলেই মাত্র উহা বিতরণ করিতে অগ্রসর হওয়া শোভা পায়, নতুবা অন্ধকে পরিচালনের জন্য অন্ধের অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সে প্রচেষ্টা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, গৌরী-মা সাধনাবলে তাদৃশ কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালেও তাঁহার সে সাধনার বিরাম ছিল না—তখনও চলিয়াছিল নিয়মিত জপ-ধ্যান-পূজা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়া জনগণকে চমৎকৃত করিতেছিল। দামোদরকে তিনি চেতন দেবতা ও চিরজীবনের পতি বলিয়া জানিতেন। একদিন তিনি সকল কার্যসমাপনান্তে দ্বিপ্রহরে শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু কেন যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, কত্তার যে দুধ খাওয়া অভ্যেস—দুধ খাওয়া তো আজ হয়নি, তাই কত্তার ঘুম আসছে না।" অমনি দামোদরকে দুধ নিবেদন করিতে চলিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই দুধটুকু খেয়ে ঘুম এল।" আর এক রাত্রে গৌরী-মার শরীর তেমন সুস্থ না থাকায় রন্ধন হইল না, কিছু ফলমিষ্টান্ন দিয়া দামোদরের ভোগ হইল। কিন্তু

দ্বিপ্রহর রাত্রে দেখা গেল, রন্ধনশালায় আগুন জ্বলিতেছে—গৌরী-মা লুচি ভাজিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে; তাই এ ব্যবস্থা।" এক রাত্রে ভোগনিবেদনান্তে গৌরী-মা গান ধরিলেন।

"মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয় ॥"

ধীরে কপাট খুলিয়া জনৈকা আশ্রমবাসিনী দেখিলেন, 'গৌরী-মা দামোদরকে বুকে ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা তাই ভক্তদের নিকট বলিতেন, "পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলে!"

এই দামোদর-বিগ্রহের প্রীতির সহিত তাঁহার ছিল জীবরূপী দামোদরপ্রীতি। সে হৃদয়বত্তা তাঁহাকে আত্মহারা করিত। এক প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, অথচ তীরের লোকগুলি কিছু না করিয়া বৃথা 'হায় হায়' করিতেছে। গৌরী-মা গর্জিয়া উঠিলেন, "একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে, আর মরদগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোমরে আঁচল বাঁধিয়া গঙ্গায় নামিয়া পড়িলেন—হৃদয়াবেগে ভুলিয়া গেলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। যাহা হউক, অপরেরা তখন বালিকাটিকে উদ্ধার করিলেন। এক রাত্রে গৌরী-মা আশ্রমবাসিনীদিগকে পুরাণের গল্প শুনাইতেছেন, এমন সময়ে অদূরবর্তী এক গৃহ হইতে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উত্থিত হওয়ায় তিনি একটি যষ্টি হস্তে লইয়া সেই নির্যাতিতার উদ্ধারসাধনে চলিলেন। আশ্রমবাসিনীরা তাঁহাকে এইভাবে পরগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য—একটি বধূকে নিগ্রহ করা হইতেছে। তিনি গৃহের কর্তৃপক্ষকে আইনআদালতের ভয় দেখাইয়া বধূটিকে উদ্ধার করিলেন। এবং পুলিশের সাহায্যে তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে শ্বশুরগৃহের লোকেরা গৌরী-মারই মধ্যস্থতায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বধূকে যখন পুনর্বার গৃহে আনিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, "পরের মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে এনেছ, তাকেও নিজের মেয়ের মতোই আদরযত্ন করবে।" গয়াধামে একবার কয়েকজন মহিলাযাত্রীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া পাণ্ডাগণ অর্থ-আদায়ের চেষ্টা করিতেছে জানিয়া তিনি পুলিশের সাহায্যে কৌশলে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইতরপ্রাণীর দুঃখেও তিনি ব্যথা পাইতেন। একসময়ে কয়েকটা বাঁদর একটা কুকুরশাবককে কিভাবে এক গৃহের ছাদের উপর আনিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে।

গৌরী-মা দেখিলেন শাবকের মৃত্যু অনিবার্য, অথচ ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই। অগত্যা যষ্টিহস্তে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এবং বাঁদরগুলার মুখভঙ্গিতে বিচলিতা না হইয়া অপর বাড়ির ভাঙ্গা প্রাচীর অবলম্বনে কোন প্রকারে সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন এবং শাবকটিকে আঁচলে বাঁধিয়া নামাইলেন। আশ্রমের গরু-ঘোড়া প্রভৃতির প্রতি তাঁহার তুল্যরূপ সহানুভূতি ছিল। চাকর উপস্থিত না থাকিলে তিনি স্বয়ং যথাসময়ে তাহাদিগকে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিতেন, ঘোড়ার ডলাই-মলাই ঠিক ঠিক হইল কিনা অনুসন্ধান করিতেন এবং গাভীকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিতেন।

বেশভূষায় তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না—সব বিষয়ে যেন একটা উদাসীনতা লক্ষিত হইত। যে-কিছু সাজসজ্জা বা ভোগ-রাগের ব্যবস্থা হইত, তাহা শুধু দামোদরের জন্য। তাঁহার নিজের প্রয়োজন বলিতে ছিল মাত্র সাধারণ রকমের চওড়া লালপাড় শাড়ি ও দুই-গাছি শাঁখা। ভক্তগণ মূল্যবান বস্ত্রাদি দিলে তিনি আপত্তি করিতেন, অথবা একান্ত পীড়াপীড়ি করিলে গ্রহণপূর্বক পুঁটুলি বাঁধিয়া ভাণ্ডারে ফেলিয়া রাখিতেন। আদরের বস্তুর সেরূপ গতি দেখিয়া ভক্তগণ ভবিষ্যতে সাবধান হইতেন।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং নানা উপচারসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতেন। মায়ের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি আদেশ হিসাবে গ্রহণ করিতেন। নিজের যেমন তাঁহাতে দেবীজ্ঞান ছিল, অপরেও যাহাতে ঐরূপ বোধ করে, তদ্বিষয়ে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। একবার বিষ্ণুপুর স্টেশনে দর্শনোৎসুক পশ্চিমা কুলিদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জানকীমায়ী, এবং তাহারাও সরল বিশ্বাসে প্রণামাদি করিয়া বিদায়কালে 'জানকীমায়ী কী জয়' রবে ঐ স্থান মুখরিত করিয়াছিল। জয়রামবাটীতে গৌরী-মা বহুবার গিয়াছিলেন এবং তিনি মায়ের স্বজনগণের প্রতি বিশেষ স্নেহসম্পন্ন ছিলেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থিনী হইলে তিনি তাহাকে মায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন এবং বলিতেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।"

গৌরী-মার কার্যক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। একদিন সারদেশ্বরী আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হইবার পূর্বে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মাতাজী মেয়েমানুষ হয়ে যা করলেন, তা সত্যি আশ্চর্য। তিনি প্রথম যখন আমাকে জমি কেনার কথা বলেন, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, আশ্রম শেষটায় এত বড় হবে।" কথাটিতে আরও জোর দিয়া

মন্মথনাথ বলিলেন, "মেয়েমানুষ কি বলছেন, মশায়, কটা পুরুষ-মানুষ একা অমন কাজ করতে পেরেছে?" মনে রাখিতে হইবে যে, সে প্রকার কর্মদক্ষতা যখন বঙ্গসমাজকে অবাক করিতেছে, তখন বঙ্গ নারীগণ 'পুরমহিলা', 'অন্তঃপুরচারিণী', 'অবলা', ইত্যাদি শব্দেই উল্লিখিত হইতেন।

অতঃপর শেষের কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মার স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছিল এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু গিরিডি প্রভৃতি স্থানে যাইতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন; বলিতেন, "এ বুড়ো বয়সে তীর্থস্থান ছাড়া কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না।" তাই তাঁহাকে বৈদ্যনাথ ও নবদ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। পরে কলকাতায় ফিরিয়া তিনি দুর্বলতাবশত ক্রমে স্বকক্ষত্যাগে অক্ষম হইয়া পড়িতে থাকিলেন। ঐ অবস্থায়ও ডাক্তারি ঔষধ তিনি সেবন করিতেন না, কবিরাজি ঔষধ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শেষ পর্যন্ত বার্ধক্যজনিত ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ছাড়া তাঁহার আর কোনও উল্লেখযোগ্য পীড়া ছিল না। দীক্ষিত ভক্তদিগের প্রতি কৃপায় তখনও তাঁহার মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। পুরুষভক্তগণ উপরে যাইয়া দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তিনি কখনও কখনও নিষেধ না মানিয়া অপরের সাহায্যে নিম্নে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন।

জীবনের শেষ কয়দিন যেন ভাবরাজ্যে সর্বদা দামোদরের সহিতই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত—কখনও কথা বলিতেছেন, কখনও ফুল ছুঁড়িতেছেন, কখনও ভাবাবেশে মুখে দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের (১৯৩৮ খ্রিঃ) ১৬ ফাল্গুন শিব-চতুর্দশীর দিনে তিনি জানাইলেন, "ঠাকুর সুতো টানছেন।" একবার সেই টানে গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই বারের টান যে নিত্য মিলনেরই পূর্বাভাস, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি ছিল না। অপরাহ্নে তিনি বলিলেন, "আমায় ভাল করে সাজিয়ে দে।" সাজানো হইলে বলিলেন, "কি সুন্দর সেজেছি, দ্যাখ! আমার রথ আসছে। শেষরাত্রে দামোদরকে আনাইয়া সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিলেন। পরে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে দামোদরের ভার অপরের উপর অর্পণ করিয়া গৌরী-মা দায়মুক্ত হইলেন। পরের দিন মঙ্গলবার ভালভাবেই কাটিয়া গেল; আশ্রমবাসিনীরা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিসমাগমে মন্দিরের ভোগরাগাদি সম্পন্ন হওয়ার পর আশ্রমবাসিনীগণের মনে যখন শান্তি নামিয়া আসিয়াছে, তখন রাত্রি আটটা পনেরো মিনিটের সময় গৌরী-মা চিরশান্তিতে নিমগ্না হইলেন।

# লক্ষ্মী-দিদি

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "যে সকল মহিলা এই সময়ে প্রায় সর্বদা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাঁদের মধ্যে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী-দিদি ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই বিধবা—তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোক্তা বাল-বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীবাটিতে ছিলেন, তখন ইঁহারা সকলেই শিষ্যারূপে গৃহীতা হন; লক্ষ্মী-দিদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষালাভের জন্য অনেকে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষ গুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি যখন পালা-গান বা যাত্রা-পুস্তক হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, কখনও বা পৌরাণিক মূকাভিনয়ে একা বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নীরব কক্ষে মৃদু আনন্দলহরী তুলেন। তিনি কখনও কালী সাজেন, কখনও সরস্বতী, কখনও জগদ্ধাত্রী, আবার কখনও বা কদম্বতলবাসী শ্রীকৃষ্ণ; অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোশাক ব্যতীতই তিনি যথোচিত বাস্তবতার অবতারণ করেন" ('The Master As I Saw Him', P. 191 )।

এইরূপ একটি মহিলা-সংসদে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গোলাপ-মা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ি হইতে নানারূপ পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনিয়া লক্ষ্মী-দিদিকে সাজাইয়া দিলে তিনি বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালা গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল দেবীসদৃশ, স্বর অতি মিষ্ট, স্মরণ-শক্তি অদ্ভুত এবং সর্বোপরি হুবহু অপরের নকল করার ক্ষমতা। এইভাবে তিনি দুই-তিন ঘণ্টা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। সেদিনও শ্রীশ্রীমা ও আর সকলে ঐ ভাবেই সেই আসরে বসিয়া রহিলেন। পরে নিবেদিতার অভিপ্রায়ানুসারে লক্ষ্মী-দিদি রামপ্রসাদের গান গাহিলেন। সর্বশেষে নিবেদিতা সিংহ সাজিয়া লক্ষ্মী-দিদিকে জগদ্ধাত্রীরূপে স্বীয় পৃষ্ঠে বসাইলেন এবং তর্জন গর্জন সহকারে চতুষ্পদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকলে হাসিয়া কুটপাট!

আরও পূর্বের কথা—সেবার কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়ির ছাদে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মহিলাসংসদ বসিয়াছে এবং লক্ষ্মী-দিদির কীর্তন চলিতেছে। গৃহের পুরুষগণ ডাকাডাকি করিয়াও অন্যমনস্কা পুরস্ত্রীদের প্রত্যুত্তর না পাইয়া বাহির হইতে দ্বারে শিকল ও তালা দিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে কীর্তন সমাপ্ত হইলে

মহিলারা যখন নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন নিরুপায় হইয়া একে একে নিচের ছাইয়ের গাদায় লাফাইয়া পড়িয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। পরে পুরুষরা আসিয়া দেখেন, তাঁহারা সর্বথা অকৃতকার্য হইয়াছেন।

ভাবময়ী লক্ষ্মী-দিদি আবার বলরামের আবেশে বিভোর হইয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া উদ্দাম অথচ মধুর নৃত্য করিতেন! ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা যে সময়ের ঘটনাটি উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে লক্ষ্মী-দিদি গুরুপদে অধিষ্ঠিতা ও দক্ষিণেশ্বরের মৃন্ময় কুটিরে থাকেন। সকালে বিপিন নামধেয় জনৈক অনুরক্ত শিষ্য তাঁহার গলায় মল্লিকার মালা পরাইয়া দিলেন, ফল মিষ্টান্ন আহার করাইলেন এবং পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিলেন। অমনি বলরামের ভাবে আবিষ্টা লক্ষ্মী-দিদি বক্ষে একখানি লাল গামছা ফেলিয়া এবং কেশদাম বক্ষের উভয় পার্শ্বে আলুলায়িত করিয়া গান ধরিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এমন লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিলেন যে, সেই অপূর্ব নৃত্যদর্শনার্থে পল্লির স্ত্রী-পুরুষে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুত কীর্তনাদিতে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটা প্রকৃতিগত ঝোঁক ছিল। তাই একবার আপসোস করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, কি করি? বেটাছেলে হলে দেখাতাম—কীর্তন কি রকম!" এইরূপ ভাববিলাস কিন্তু ভক্তমহলে কিংবা বিশেষ বিশেষ গৃহেই হইত। লক্ষ্মী-দিদি ভক্তদের নিকট নিঃসঙ্কোচ হইলেও সাধারণের নিকট নির্লজ্জ ছিলেন না।

দেবদেবীর দর্শন ও ভাবসমাধি লক্ষ্মী-দিদির প্রায়ই হইত। কখনও জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া দেখিতেন জগন্নাথের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান; আর তাঁহার অনুভূতি হইত যে, ঠাকুর ও জগন্নাথ অভিন্ন। কোন দিন তিনি ভাবে বৈকুণ্ঠে বা শ্রীরামকৃষ্ণলোকে উপনীত হইতেন, আবার কোন দিন বা সূক্ষ্মশরীরে ঠাকুর, শ্রীমা ও শিবদুর্গার সহিত মিলিত হইতেন। কোন দিন শিবভাবে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যাদের পূজা গ্রহণ করিতেন, কোন দিন বা অর্ধবাহ্যদশায় ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন। একবার পুরীতে স্বর্গদ্বারে একাকী সমুদ্রস্নানে যাইয়া তিনি বাহির-টানে চক্রতীর্থ পর্যন্ত ভাসিয়া যান। তখন অকস্মাৎ গোপবেশী এক হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কয়েক ঘণ্টা পরে পদব্রজে গৃহে ফিরিয়া তিনি যখন ৺জগন্নাথদর্শনে গেলেন, তখন দেখেন যে, বলরামের স্থলে সেই গোপবালক দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।

দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মী-দিদি যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন, তখন ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কোন্ ঠাকুর ভাল লাগে?" দিদি বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণ।" ঠাকুর ঐ বীজ ও নাম তাঁহার জিহ্বায় লিখিয়া মুখেও উহা উচ্চারণ

করিলেন; লক্ষ্মী-দিদির রাধাশ্যাম-মন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গেল।[১] ইহার পূর্বে উত্তর দেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মী-দিদির শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। সে কথা শ্রীমা পরে ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "তাহা হোক, লক্ষ্মীকে আমি ঠিকই দিয়েছি।" গোঘাটের যে গোস্বামিবংশে লক্ষ্মী-দিদির বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাও বৈষ্ণব ছিলেন; তাই কামারপুকুরে দিদিকে কেহ কেহ গোসাঁই-মা বলিয়া ডাকিত। কামারপুকুরেও তখন বৈষ্ণবদের বিশেষ প্রভাব ছিল। লক্ষ্মী-দিদিকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার গৃহে আসিয়া কীর্তনাদি শুনিতেন। এই-সব সাধন, অনুভূতি ও সমাধি প্রভৃতি মিলিয়া লক্ষ্মী-দিদির জীবনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থের প্রণেতা ও লক্ষ্মী-দিদির আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাই লিখিয়াছেন, "মার (লক্ষ্মী-দিদির) রাধাকৃষ্ণ-ভজন-পূজন দেখিয়া কেহ কেহ ভাবেন যে, তিনি হয়তো এই রামকৃষ্ণ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্তা নহেন; কিন্তু দুঃখের কথা, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ঠাকুর সর্বদেবময় এবং তিনিই মাকে যথার্থ বৈষ্ণবরূপে নিজ হাতে গড়িয়াছিলেন।" (২৪১ পৃঃ)।

লক্ষ্মী-দিদির উপদেশাবলী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসম্পদে পূর্ণ থাকিত এবং তিনি সর্বদা তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন। অবশ্য তিনি প্রথমাবধিই শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পুরীতে লক্ষ্মীনিকেতনে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে যখন তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল, তখন পদপ্রান্তে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্য তাঁহার সহিত ঠাকুরের তুলনা করিতে থাকিলে দিদি ভর্ৎসনামিশ্রিত অনুশোচনার সুরে বলিয়াছিলেন, "কিসে আর কিসে? তখন যদি এত জানতে পারতুম!" পরে কিন্তু তিনি ঠাকুরকে অবতার বলিয়াই জানিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের উপাসিকা হইলেও ঠাকুরের উদারভাব অবলম্বনে বহু প্রার্থীকে অন্যান্য মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কামারপুকুর, কলকাতা ও পুরীতে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যা-সংখ্যা বিদিধিক একশত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত ছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইতেন অথবা বেলুড় মঠ প্রভৃতিতে যাইয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অল্পবয়স্ক সাধুরাও তাঁহার নিকট যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতেন। তবে ইহাও ঠিক যে স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবা ও লক্ষ্মী-দিদির অনুসৃত বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল, যাহা দিদি নিজেও জানিতেন।

এই দৈবসম্পদসম্পন্না, কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায়কুলসম্ভবা লক্ষ্মীমণি ছিলেন

---

১ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষাপ্রদান ঠাকুরের জীবনে অবিদিতপ্রায় হইলেও আমরা এখানে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থের (৫৮ পৃঃ) অনুসরণ করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের কন্যা। রামলাল তাঁহার অগ্রজ ও শিবরাম তাঁহার অনুজ সহোদর। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সম্পর্কবশত ঠাকুরের সন্তানবৃন্দের নিকট তিনি ছিলেন লক্ষ্মী-দিদি; এইভাবে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সকলেরই দিদি। ১২৭০ সালের ১ ফাল্গুন (১৮৬৪ খ্রিঃ, ফেব্রুয়ারি) বুধবার সরস্বতী-পূজার দিন বেলা বারোটার সময় লক্ষ্মী-দিদি পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি গৃহদেবতা ৺শীতলা ও রঘুবীরের পূজাদিতে আনন্দ পাইতেন। নীরব থাকাই ছিল তাঁহার স্বভাব। এমনকি, বাড়ির লোক ভিন্ন অপরের সহিত তিনি কথা বলিতেন না। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শরৎ ভাণ্ডারী নামক একটি একাদশবর্ষ বয়স্ক বালক তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়াইয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মী-দিদির বাল্যকালেই পিতা রামেশ্বর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করিয়া যান যে, গোঘাটের উত্তরপাড়ায় রামলালের এবং দক্ষিণপাড়ায় লক্ষ্মীর বিবাহ হইবে। তদনুসারে পিতার মৃত্যুর স্বল্প পরেই একাদশ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। এই সংবাদ দক্ষিণেশ্বরে রামলালের মুখে শ্রবণান্তে ভাবসমাধিতে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সে বিধবা হবে।" পার্শ্বোপবিষ্ট হৃদয় ইহাতে আপত্তি করিলে ঠাকুর কহিলেন, "মা বলালেন, কি করব? ...লক্ষ্মী মা শীতলার অংশ। সে ভারী রোখা দেবী—আর যার সঙ্গে বিয়ে হলো সে সামান্য জীব। সামান্য জীবের ভোগে লক্ষ্মী আসতে পারে না। ... সে তো বিধবা হবেই।" ইহার পূর্বেও কামারপুকুরে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মী যদি বিধবা হয় তো ভাল হয়। তাহলে বাড়ির দেবতাদের সেবাদি করতে পারবে।" বিবাহের দুই-এক মাস পরেই লক্ষ্মীমণির স্বামী শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ ঘটক একবার একদিনের জন্য কামারপুকুরে আসেন এবং তথা হইতে কর্মের সন্ধানে নির্গত হন। তারপর তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই। দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষান্তেও যখন কোন সংবাদ আসিল না তখন শ্বশুরগৃহের আহ্বানে লক্ষ্মীমণি তথায় গমনপূর্বক কুশপুত্তলিকাদাহ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্বামীর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্বশুরগৃহেও তাঁহার বাস করা হয় নাই; কারণ উহাতে ঠাকুরের অমত ছিল। ঠাকুরের দেহাবসানে একবার মাত্র তিনি সেখানে গিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী-দিদির প্রথম জীবন কষ্টের সংসারে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন খুব অল্প তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে অবস্থানকালে একদিন গৃহে অন্ন না থাকায় লক্ষ্মী-দিদির মাতা কন্যার খুঁটে আট আনা পয়সা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে মুকুন্দপুরে অন্নসংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী রিক্তহস্তে ফিরিবার কালে ঠাকুরের দৃষ্টিতে পড়িয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া

তাঁহাকে সজলনয়নে সবই বলিয়া ফেলিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুর তখনই গঙ্গাবিষ্ণুর সাহায্যে কামারপুকুরে ডোমপাড়ায় এক বিঘা ও হৃদয়ের সাহায্যে শিওড়ে চৌদ্দ বিঘা জমি ক্রয় করাইলেন। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের পরলোকগমনান্তে (১২৮০ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ) পরিবারের অধিকতর দুরবস্থা হইলে লাহাবাবুদের স্বনামধন্য কন্যা প্রসন্নময়ী পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে বাবুদের দৈনিক অতিথিসেবার সময়ে রামলাল থালা লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং প্রসাদবণ্টনকালে থালাগুলি আগাইয়া দেন। অধিকন্তু চট্টোপাধ্যায় বংশের গৃহদেবতার সেবার জন্যও লাহাবাবুরা সিধা পাঠাইতেন। এইভাবেই সেই দুর্দিনে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছিল।

১৮৭২ খ্রিঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। তখন শ্রীমা ও দিদিকে ঠাকুর রহস্যপূর্বক শুক-সারী বলিয়া উল্লেখ করিতেন; কারণ তাঁহারা পিঞ্জরপ্রায় নহবতে বাস করিতেন। এই সময়ে ঠাকুরের নিকট দিদির শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঠাকুরের সেবার জন্য শ্রীমায়ের শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে থাকা কালে লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিরোভাবের প্রাক্‌ক্ষণে ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকে একটু নজরে রেখো। সে করে খাবে—তোমাদের উপর ভার হবে না।" অতঃপর বৃন্দাবন ও পুরী গমনকালে শ্রীমা দিদিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীমার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; সম্ভবস্থলে লক্ষ্মী-দিদি তাঁহার সহিত থাকিতেন, অথবা কামারপুকুরে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত রামলালের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি ভগিনীকে দক্ষিণেশ্বরস্থ নিজকুটিরে আনিয়া রাখেন। এই গৃহে দিদির প্রায় দশ বৎসর অতীত হয়। এই স্থানে তিনি দীক্ষাদি দ্বারা শিষ্যমণ্ডলী গড়িতে থাকেন এবং ক্রমে শিষ্যগণ তাঁহার জন্য ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেন। এই গৃহে আরও দশ বৎসর বাসের পর তিনি পুরীধামে চলিয়া যান।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর লক্ষ্মী-দিদিকে খুব সাধন-ভজনের উপদেশ দিতেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তিনি ঝাউতলায় যাইবার পথে লক্ষ্মী-দিদি ও শ্রীমাকে শয্যাত্যাগের জন্য আহ্বান জানাইতেন; তাঁহারা উঠেন নাই বুঝিতে পারিলে দ্বারে জল ঢালিয়া দিতেন। উহাতে বিছানা ভিজিয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা ত্বরান্বিতা হইয়া শয্যাত্যাগ করিতেন; কোন দিন বা একটু ভিজিয়াও যাইত। তাঁহারা নহবতের ঝাঁপে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্রের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস সন্দর্শন করিতেন। ঠাকুর লক্ষ্মীমণিকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর-দেবতাকে যদি মনে না পড়ে তো আমায় ভাববি—তা হলেই হবে।" লক্ষ্মী-দিদি ঠাকুরকে গুরু বলিয়া জানিতেন এবং গুরু ও ইষ্টে অভিন্ন বুদ্ধি রাখিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, ঠাকুর 'অবতারী'। মা

শীতলা একদিন স্বপ্নযোগে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমি একরূপে ঘটে, আররূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ানো হবে।" কাশীপুরে তিনি লক্ষ্মী-দিদিকে দুইবার শীতলা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকে মিষ্টিটিষ্টি একদিন খাইও—তাহলে মা শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। তাঁরই অংশ!" একবার ঠাকুরের সাধ হইয়াছিল যে, লক্ষ্মীকে বালা ও হার পরাইবেন; কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভক্তগণ পরে উহা জানিতে পারিয়া ঐগুলি গড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ত্যাগে সুপ্রতিষ্ঠিতা দিদি একদিন মাত্র পরিয়া বালা-জোড়া অপরকে দিয়াছিলেন এবং হারও কিছুদিন পরেই স্বগলচ্যুত করিয়াছিলেন। সংসারে আজন্ম বিতৃষ্ণাবশত তিনি একবার পুনর্জন্মবিষয়ে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমায় তামাক-কাটা করলেও আর আসছি না।" ঠাকুর ইহার উত্তরে স্বীয় লীলার কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন, "যাবি কোথায়? কলমির দল—টানলেই আসতে হবে।" দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে লক্ষ্মী-দিদি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেন এবং গান গাহিয়া শ্রীমাকে শুনাইতেন। কাশীপুরে অবস্থানের সময় ঠাকুর একবার তাঁহাকে ও মাস্টার মহাশয়ের সহধর্মিণীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর লক্ষ্মী-দিদি অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের সহিত তাঁহার বৃন্দাবন ও পুরীধামে গমনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পরেও তিনি কয়েকবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক এক ভক্ত ও কামারপুকুরে রুক্মিণী নাম্নী জনৈকা শিষ্যার সহিত তিনি যেবারে বৃন্দাবনে যান, সেবারে ভক্তটির লু লাগায় বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই দিদি রুক্মিণীকে আবাসস্থল-সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রুক্মিণী এই অবকাশে বাক্স ভাঙ্গিয়া দুইশত টাকা লইয়া পলায়ন করিল। দিদি গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন যে, কয়েক আনা পয়সা ব্যতীত তিনি অকস্মাৎ সম্পূর্ণ সম্বলহীন। পূর্বে এক ব্রজবাসী তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এখন দিদিকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেও সম্মত হইলেন না। নিরুপায় দিদি সাহায্যের জন্য দেশে পত্র লিখিয়া দিন কয়েক বাসি রুটি অল্পমূল্যে কিনিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। ছয়-সাত দিন পরে এক শিষ্য কামারপুকুর হইতে আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া গেল। এদিকে রুক্মিণী শীঘ্রই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া দিদির নিকট অপরাধ স্বীকার করিল এবং জানাইল যে, অর্থ প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব; কারণ সে উহা তাহার ভাইদের দিয়াছে। সে লক্ষ্মী-দিদির নিকট ক্ষমা ও প্রসাদ চাহিল; তিনিও অম্লানবদনে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

পুরীধামেও তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত গয়া, কাশী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতিও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। পুরীধামের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ভক্তগণ সেখানে তাঁহার জন্য একখানি ইষ্টকময় গৃহ নির্মাণপূর্বক এক প্রস্তরফলকে উহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন 'লক্ষ্মীনিকেতন' এবং ঐ ফলকের শিরোদেশে অঙ্কিত ছিল 'জয় প্রভু রামকৃষ্ণ'। দক্ষিণেশ্বর হইতে সদলবলে পুরীধামে যাইয়া লক্ষ্মী-দিদি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ ফাল্গুন ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন প্রধানত সেখানেই যাপনান্তে ১৩৩২ সালের ১২ ফাল্গুন (ইং ১৯২৬-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি) বুধবার ঐ গৃহে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী-দিদির গঙ্গাভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোতলার ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন করিবার আশায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতল গৃহ নির্মাণপূর্বক উপরে ঠাকুরঘর করিতে বলিয়াছিলেন। উহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত স্বল্পায়তন মৃত্তিকাগৃহেই দীর্ঘকাল কাটাইয়াছিলেন। শেষবারে ঐ গৃহ ছাড়িয়া পুরীধামে গমনকালে মা-ভবতারিণী ও গঙ্গাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পুরীতে সময় আসন্ন জানিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

লক্ষ্মী-দিদির দৈনন্দিন জীবন একটানা সাধনায় পূর্ণ ছিল। পুরীতে লক্ষ্মী নিকেতনে বাসকালে তিনি প্রত্যহ ভোর তিনটায় উঠিয়া শৌচাদি-সমাপনান্তে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের স্মরণপূর্বক দীর্ঘকাল জপ করিতেন। পরে সামান্য প্রসাদ গ্রহণানন্তর নয়টা বা দশটার সময় স্নান করিয়া পুনর্বার এগারোটা বারোটা পর্যন্ত জপ করিতেন। বৈকালে তিনি আর একবার মালা লইয়া বসিতেন এবং সন্ধ্যাসমাগমে দুই ঘণ্টা পুনরায় জপ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিনামকীর্তনও চলিত। অবশেষে রাত্রি আটটার সময় রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া প্রসাদগ্রহণান্তে তিনি শয়ন করিতেন।

তাঁহার রাধাকৃষ্ণপ্রেম এতই সুগভীর ছিল যে একবার ভোর চারিটা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি অবিরাম রাধাকৃষ্ণকথার পরও তাঁহার বিরামের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার মুখে হস্তার্পণপূর্বক উহা বন্ধ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি বৃন্দাবনের লোক" অথবা কহিতেন, "আমি গোপবালা।" বৈষ্ণবভাবে ভাবিতা লক্ষ্মীদিদি প্রয়োজনস্থলে স্বীয় ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য অসীম সাহস প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার উপেন্দ্র লাহা মহাশয় কামারপুকুরে চট্টোপাধ্যায়বংশের কুলদেবতা ৺শীতলার সম্মুখে ছাগবলি দিতে উদ্যত হইলে দিদি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও লাহা মহাশয়ের সঙ্কল্পত্যাগের

লক্ষণ না দেখিয়া দিদি প্রাণপণে বাধা দিতে থাকেন। অগত্যা উপেন্দ্রবাবু নিরস্ত হন। তদবধি আর কেহ তথায় বলিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই।

সাধনসিদ্ধা লক্ষ্মী-দিদির শেষ বয়সে অন্যান্য অশেষ গুণাবলীর সহিত এমন একটা সর্বজনীন উদার স্বভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে, একদা জয়দেব গোস্বামীর উৎসব উপলক্ষে কেন্দুবিল্ব গ্রামে গমন করিয়া তিনি ভক্তির আতিশয্যে জাতিবিচার অতিক্রমপূর্বক গোস্বামীজীর স্বকুলোদ্ভব যুগীজাতীয় বৈষ্ণবদের পক্ক অন্নগ্রহণেও সঙ্কুচিত হন নাই। বৈষ্ণবভক্তিও তাঁহার তুল্যরূপ ছিল। প্রার্থী বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষাপূরণার্থে তিনি নিজের বহুমূল্য শীতবস্ত্রাদিও অকাতরে তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেন। অথচ ত্যাগীদের জীবনে বিন্দুমাত্র স্খলনের আভাস পাইলে তিনি অগ্নিমূর্তি হইতেন। একবার জনৈক সাধুকে মাত্রাতিক্রমপূর্বক মেয়েমহলে মিশিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ছি! ছি! মেয়েমানুষের পেছু পেছু ছোটা! দাদা, তুমি সিংহের শাবক হয়ে শৃগালের আচরণ করছ!" শেষ বয়সে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া কিরূপ বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ ভক্তিতে পূর্ণ ছিল।[১] তিনি বলিতেন, "আমি যা কিছু জেনেছি বা শিখেছি, সবই ঠাকুর হতে।" কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ঠাকুর এই অশেষ স্নেহপাত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে কতভাবেই না শিক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুত লক্ষ্মী-দিদির জীবনী আলোচনান্তে পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর সহিত স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়, "লক্ষ্মীদেবীর জীবনীমধ্যে হিন্দু বৈধব্য-জীবনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভাবরাজ্যের অপার আনন্দ এবং দৈবীসম্পদের স্ফুরণ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা ও উক্তিসমূহের অক্ষুণ্ণ সত্যতাই জ্ঞাপন করে" (শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবীর মুখবন্ধ)।

# নির্ঘণ্ট


অক্রূর ৫১২

অক্ষয় ৪৪৭

অক্ষয় কুমার বড়াল ৬১০

অক্ষয় কুমার সেন ৪৭৭, ৫১১, ৫৭৯, ৫৯২, ৬০০, ৬১৪

অখণ্ডানন্দ, স্বামী ২৬, ৩০-৩২, ৮০, ৮১, ৮৬, ৮৭, ৯৫, ৯৬, ১৮৩, ২৬৭, ৩১২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৫৮, ৩৬৭-৩৮৮, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪২১, ৪৬৬, ৬১৪, ৬১৭, ৬২৮

অখিলানন্দ, স্বামী ৯৬

অঘোর বাবু (গায়ক) ৮৯

অঘোরনাথ, সাধু ২৬৪, ৫৭৪, ৫৭৫

অঘোরমণি দেবী, গোপালের মা দ্রষ্টব্য

অচলানন্দ, স্বামী ৮৬, ১৬২-১৬৪

অর্জুন ১১৭

অজ্ঞেয়বাদ ১১

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ৬০০, ৬১৪

অতুলানন্দ, স্বামী ১৯১, ৩২২, ৩২৫-৩২৭

অদ্বৈত (চৈতন্য পরিবার) ৫৪৯

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ২৩, ২৪, ৭৬, ১৮০, ১৮১, ২৬৩, ৩৩৬-৩৪৬, ৩৬৮, ৩৯৭, ৩৯৯, ৫৩০

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী ২৩, ৭৫, ৯১, ১১৩, ১১৬, ১৫৩, ১৫৭-১৬০, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ২০৮, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৫৯, ২৬১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৮৩-৩০৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৭-৩৪০, ৩৪২, ৩৯৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৫২৩, ৫৩০, ৫৭০, ৬১৮, ৬২৬

অধরলাল সেন ৭১, ৭২, ৫০৫-৫১০, ৬১৬

অন্নদা দত্ত ২১২

অন্নদামঙ্গল (কাব্য) ৫১৩

অপরেশ মুখোপাধ্যায় ৬১০

অবতার ১, ১৫, ২৩, ২৬, ২৯, ১০১, ১২০, ১২১, ১২৫, ১৭৪, ১৮৪, ১৮৯, ২০৭, ২৫২, ২৬১, ২৯৬, ৩১৬, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৮২, ৩৯২, ৪৩১, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৬২, ৫১৮, ৫২৫, ৫৩৩, ৫৪০, ৫৫৩, ৫৫৬, ৫৫৮, ৫৬১, ৫৬৭, ৫৬৯, ৫৯৭, ৬০১, ৬০৫, ৬২২, ৬৭২, ৬৮৩, ৬৯৩

অভয়ানন্দ, স্বামী (মাদাম মেরি লুইস) ৪৭

অভেদানন্দ, স্বামী ২৩, ২৪, ২৬, ৩২, ৩৬, ৪৮, ৮৬, ১১৩, ১১৪, ১২৪, ১৩৩, ১৭৯, ১৮১, ১৯৫, ২১০, ২১২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৬, ২৫৮-২৭৯, ২৮১, ২৯৬, ৩২১, ৩৩৯-৩৪১, ৩৬১, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৭, ৪১২, ৫৩০, ৬২৮

অমূল্য মহারাজ, শংকরানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য

অমৃতবাজার পত্রিকা ৫২০

অমৃতলাল ৫১৫, ৫১৬
অম্বিকাচরণ ঘোষ ১৫২
অরবিন্দ ৬১৯
অলকট, কর্নেল ৩৭১
অশ্বিনী বাবু (অশ্বিনী কুমার দত্ত) ২১৭
অষ্টাবক্র সংহিতা ২২, ২৬৩
আত্মানন্দ, স্বামী ১৮৬, ২৩৮
আত্মারামের কৌটা ১৬০
আনন্দ চার্লু ২৪৯
আনন্দনারায়ণ পণ্ডিত ৩৭৬
আনন্দ মোহন ঘোষ ৫১, ৫৭, ৬৮, ৭৬, ৭৭
আলমবাজার মঠ ৫০, ১১৭, ১১৮, ১৩৩, ১৩৫, ১৬২, ১৮৪, ১৯০, ২৩৯, ২৪১, ২৬৮, ২৯৬, ৩৪২, ৪১২, ৪৭১, ৬০৪, ৬১০
আসীন ৪৮
ইঙ্গাঁরসোল ৪৪
ইন্ডিয়ান মিরর ২৩৩, ৩৫৭, ৫০৬, ৫২০, ৬১৭
ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব ২৭৮
ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, রাজা ২৩২
ইয়ংমেনস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন ২৪২
ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ৬৩১
ঈশা ২৬, ২৭, ৪৮, ১১৮, ১৪৪, ১৮৯, ১৮১, ২১৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৯৬, ৩০৩, ৩৫৫, ৪৫২, ৪৯৫, ৫০০, ৫৪০, ৫৪৪, ৬৬৯
ঈশান চন্দ্র কবিরাজ ৪৯১
ঈশ্বর কোটী ৫১, ১০০, ১২৫, ১৫২, ৪২৫, ৪৩১, ৪৮৬
ঈশ্বরচন্দ্র ২১৭, ২২০, ২৩২, ৬৬৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি ৫১৩, ৬০৭, ৬১০
ঈশ্বরাবতার, অবতার দ্রষ্টব্য
উইলিয়ম ৬৮৩
উদ্বোধন (পত্রিকা) ৫৪, ১৮৬, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৪, ২৩৭, ৩৪৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৮৭, ৪৩১, ৪৩২, ৫১০, ৫৫৩, ৫৯০, ৬২৪, ৬২৬, ৬৬৩
উপনিষদ্ ১১৮, ১৬৩, ২৪২, ২৬৫, ৩০১, ৩১৪, ৩২০, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪৭, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৭৮, ৪০৫, ৪৭৪, ৪৯৯, ৫০০
উপেন (উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) ২৯৭, ২৯৮, ৬১২-৬১৯
উপেন্দ্র নাথ মজুমদার ৬০০
উমানন্দ, স্বামী ২২২
উমেশচন্দ্র বসু ৪২২
এডিসন (বিজ্ঞানী) ১৭০
এমার মঠ ১৩৩, ২৬৫
এরিয়ান স্কুল ১২৪
এলবার্ট, রাজা ১৯৮
এসেনী ৪৮
ওকাকুরা, শ্রীযুক্ত ৬০, ১৬৪
ওডা, শ্রীযুক্ত ৬০
ওয়াজেদ আলি শা, নবাব ৬
ওয়াল্ডো, মিস (যতিমাতা)৪৬, ২৭০
ওয়াশিংটন, বুকার টি ৩৮৬
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ২৫৮
ওলিবুল মিসেস ৪৭, ৫২, ৫৩, ২১৪, ২৭০, ২৭১
কণ্বমুনি ৪৯০
কথামৃত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—) ২৪, ১১৮, ১২৫, ১২৯, ১৩২, ১৫৩, ১৫৫-১৫৭,

১৬০, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৮১, ২৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৭, ৩৭১, ৩৯০, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৮, ৪৪৬, ৪৭৬, ৪৭৮-৪৮১, ৪৮৪-৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৩-৫০৭, ৫৩১, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৯৪, ৬০৩, ৬২৩, ৬২৪, ৬৫৭, ৬৬২
কবি-কঙ্কন চণ্ডী ৫১৩
করুণাময়ী ৪৩৬
কর্মযোগ ৪৬
কল্যাণানন্দ, স্বামী ৮৫, ১৬৩, ১৮৬, ১৯১
কানাই, ব্রহ্মচারী ১৬৬
কাণ্ট ৪১০, ৪৯২
কাঞ্জিলাল, ডাঃ ২১৬
কারমাইকেল, লর্ড ২২৮
কালভে, শ্রীমতী ৫৯, ৪৩৩
কালাবাবুর কুঞ্জ ১৩৪, ৪৭৫, ৬৬১, ৬৮১
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৬১৪
কালী, অভেদানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৬৪
কালীকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী বিরজানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
কালীকৃষ্ণ মিত্র ১৫২
কালীচরণ ব্যানার্জী ২৫৮
কালীপদ ঘোষ ৭৮, ১৫৮, ১৬৬, ৩৩৮, ৫৬৭, ৫৬৮, ৬২৫-৬২৮
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৬১৬, ৬০১
কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ২৩৩
কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (বাপুলি) ২৩২
কালীপ্রসাদ চন্দ্র, অভেদানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
কালীবর বেদান্ত বাগীশ ২৫৯
কাশীখণ্ড ৮৯
কাসল্ কার্নান ২৪১
কিশোরী ৭৪, ৫৯৭, ২১৯
কুমার সম্ভব ৪৯০
কুমুদবন্ধু সেন ৪৩২, ৫১০, ৬০৫, ৬০৯, ৬১৫
কৃপানন্দ, স্বামী ৩১
কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ) ২৬, ৩২, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৯৮, ৯৯, ১১৭, ১৩৩, ১৭৬, ২০৬, ৩১০, ৩৪৮, ৩৮২, ৪০৮, ৪১০, ৪৭২, ৪৯৮, ৫০০, ৫১২, ৫১৯, ৫২৪, ৫৪২, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৮১, ৬২৯, ৬৬২, ৬৭৭, ৬৮০, ৬৮৪, ৬৯১, ৬৯৭
কৃষ্ণকুমারী ৫১৫
কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত ৬৯৩
কৃষ্ণদাস ঘোষ ৩৮৯
কৃষ্ণদাস পাল ২৫৮, ৫০৬
কৃষ্ণভাবিনী (বসু) ১২৪, ১২৬, ৪৮৬, ৪৮৭
কৃষ্ণময়ী বসু ৪৮৬
কৃষ্ণরাম বসু ৪৭৫
কৃষ্ণলাল, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ দ্রষ্টব্য
কৃষ্ণলাল মহারাজ ৩২৫, ৩২৬, ৫৭০, ৬৫৫
কেদার চন্দ্র দাস ২১৯
কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় ৫১০, ৫৩৮, ৬১৪, ৬৮৩
কেদার নাথ মৌলিক অচলানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য
কেদার বাবু (খোড়ো কেদার) ২৯৭
কেশব চন্দ্র সেন ১১, ১৬, ১০১, ১৭২, ২০৪, ২৩২, ২৩৩, ৩১২, ৩৯০, ৪০৭, ৪৫০, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৯১, ৫০৩, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬২, ৫৭৪
ক্রিস্টিন, সিস্টার ২১৯

কৈলাস কামিনী ঘোষ ৫১
কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৫৯
ক্ষীরোদ চন্দ্র মিত্র ৩৯০, ৩৯১, ৪৮৮
খগেন বাবু ২৯৭
খোকা (খোকা মহারাজ) সুবোধানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
খ্রিস্ট-থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ২৬৮
গগনবাবু ২৯
গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ ৪৩৭, ৪৪১
গঙ্গারাম মহারাজ ৩২৭
গণু ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৬০, ৬৬২
গণুর মা, যোগীন-মা দ্রষ্টব্য
গান্ধী, মহাত্মা ১৯৪, ৩৩২
গার্গী ৪৯৯, ৬৫৮
গিরিজা ৪৫৩
গিরিশ, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ দ্রষ্টব্য
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ২২, ২৫, ৫১, ৫২, ৮২, ৯৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬৬, ২৫০, ২৫৮, ২৯৬, ২৯৭, ৩০৫, ৩৩৯, ৪১০, ৪৩৩, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৮৪, ৫১১-৫২৯, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭৩, ৫৮১, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬১১, ৬১৪, ৬১৬, ৬২৫, ৬২৭, ৬২৮, ৬৯৬
গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২০৩, ২৩২
গিরীন্দ্র লাল বসাক ২১৯
গীতা (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা) ৭৯, ১১৮, ১৩৮, ১৬৭, ২৪২, ২৪৫, ২৫৫, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৫, ২৭২, ২৭৮, ২৯৬, ৩০১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৬, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৮৩, ৪০২, ৪১৫, ৪৭৪, ৫৮৮, ৬৪৩, ৬৭৩, ৬৭৮
গীতাতত্ত্ব ২১৪
গুডউইন ৪৬, ৪৭, ২৬৯
গুরুচরণ ঘোষ ১২৪
গুরুদাস, ব্রহ্মচারী, অতুলানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
গুরুদাস, বর্মন ৪৭৭
গুরুপ্রসাদ ঘোষ ৬২৫
গেটস, মি ২৭০
গোঁসাই দাস গুপ্ত ৬০৭
গোকুলদাস, নরোত্তম মুরারজী ২৬৭
গোপাল (ছোট) ২৩৫
গোপাল, ব্রহ্মচারী ৬২০, ৬২২
গোপালচন্দ্র ঘোষ, অদ্বৈতানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
গোপালের মা ২২, ৮২, ১০৮, ৬৪১-৬৫২, ৬৯১
গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ৬৪১, ৬৫০
গোরা রায়, চৈতন্য দেব দ্রষ্টব্য
গোলাপ-মা ৮২, ১১৩-১১৫, ২১৩, ২২২, ২৩০, ২৬১, ৬৪৯, ৬৫৬-৬৫৮, ৬৬৩, ৬৬৭-৬৭৫, ৬৯১
গৌরাঙ্গ চৈতন্য দেব দ্রষ্টব্য
গৌরী-মা ২২৮, ৬২৩, ৬৭৬-৬৯০
গ্যারিবল্ডি ৩৮৬
চণ্ডী ২১০, ৩২৭, ৩৪৭, ৪৪২, ৬৭৮, ৬৮০
চণ্ডীদাস ৬৯৬
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩১০
চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ৫৭০
চারুচন্দ্র বসু ৩৮৪, ৫৭০
চিকাগো ধর্মমহাসভা ৩৬, ৪০, ৪১, ৪২, ৬০৪
চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু ৩৩২, ৩৮৬
চুনীবাবু চুনীলাল বসু দ্রষ্টব্য

চুনীলাল বসু ৪৯৭, ৬২০-৬২৪
চৈতন্য চরিতামৃত ২৩৩, ২৮৭, ৪২৭, ৪৭৫, ৪৯০, ৫০৬, ৫৪৯, ৬৬০, ৬৬২,
চৈতন্য দেব ৬৯, ১২৫, ১৩২, ১৪৮, ২৮৭, ২৯৭, ৪২৭, ৪৩৯, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৫, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫০০, ৫০১, ৫০৮, ৫১৯, ৫৪০, ৫৪৯, ৫৭২, ৫৭৮, ৫৮০, ৬৭৮, ৬৮০, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৯৭
চৈতন্য ভাগবত ৪৯৩, ৫০৬
ছবিল দাস ৩৬
ছোট নরেন ১২৯, ৪২৬
জওহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত ৪২৩
জগদম্বা, শ্রীমতী ৪৩৬, ৪৪৩, ৪৪৬
জগমোহনজী ৪০
জগন্মোহন তর্কালংকার ২০৮, ২১৭
জগদীশচন্দ্র বসু ১৪৮, ২১৯
জনক ৪৬৩
জয়দেব গোস্বামী ৬৯৮
জলধর সেন ৬১৬
জেমস, ডাঃ ২৭১, ২৭২
জেমস, প্রফেসর ২৭১, ২৭২, ২৭৫
জ্ঞানযোগ ৪৫
জ্ঞান মহারাজ, ব্রহ্মচারী ৩৯৭
জ্ঞানাঙ্কুর ৬১৫
জ্ঞানানন্দ অবধূত ১৭৬, ১৭৭, ২৮৭, ৩৮২, ৫৫৩, ৫৬১, ৬১৮
জ্যাকসন অধ্যাপক ২৭১
ঋজু ভট বিঠ্ঠলজী ৩৭৮
টনি, অধ্যাপক ৪৯১
টেকঁচাদ ৬১৬
ট্রেনিং একাডেমি ৬৪
ঠাকুর, রামকৃষ্ণ দ্রষ্টব্য
ডয়সন, পল ৪৮, ২৬৯
ডাফ, আলেকজাণ্ডার ২৫৮
ডি মেলো ৩০৩
তত্ত্বমঞ্জরী ৫৫১, ৫৬৭, ৫৬৯
তপস্বিনী মাতা ৫২
তারক, শিবানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় ৪০৬
তারাপদ ঘোষ ১২৪
তিলক, বালগঙ্গাধর ৩৬, ৩৮৬
তীর্থংকর ৩৫
তুরীয়ানন্দ, স্বামী ৩১, ৩২, ৫৪, ৮০, ৮১, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১৩৩, ১৩৯, ১৪৭, ১৮৫, ১৯০-১৯২, ২১০-২১২, ২১৬, ২২৮, ২৫২, ২৭৪, ২৭৫, ৩০৮, ৩১০-৩৩৫, ৩৪০, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯৭, ৪২১, ৪৩৩, ৪৬৬, ৪৯৮, ৬০১, ৬২৮
তুলসীদাস ৩১২
তুলসীরাম ঘোষ ১২৪, ১২৫
তেজচন্দ্র ১৫৭, ৪৮৮
ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী ২৬, ৩২, ৫৪, ১১৫, ১৫৯, ২১৯, ৩৪৭-৩৬৬, ৩৭৬, ৩৯৭, ৪৩৩, ৫০৪, ৫৭০, ৬১০,
ত্রৈলঙ্গস্বামী ১৩৪, ৪৯৭
ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ ৩৭৬
থেরাপুত্ত ৪৮
থেরাপুটী ৪৮
দত্তাত্রেয় (ঋষি) ৩৫
দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ি ১২২
দাদমার, কাউন্ট ২৭০
দিগম্বর বাউল ৩৭১
দীনদয়াল নাগ ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৭-৪৫৯,

৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৯, ৪৭০
দীননাথ ঘোষ, রায় বাহাদুর ৪২৭
দীননাথ বসু ৩১২, ৩৬৭, ৫২০
দীনবন্ধু (মিত্র) ৫১৫, ৬১৭
দুর্গাচরণ (দত্ত) ১, ৫
দুর্গাচরণ ডাঃ ২৬১
দুর্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ ২৪৯
দেববানী ৪৬
দেবব্রত বসু ২২৫
দেবমাতা, ভগিনী ৮৬, ২৩৩, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৩-২৫৫
দেবী-গিরি ৩২৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১, ১১৯, ১৫৭, ৫৫৮
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৫২১, ৫৬৮, ৫৭২-৫৮৬, ৫৯২-৫৯৪, ৬১২-৬১৪, ৬২৭
দ্বারকানাথ (বিশ্বাস) ৪৪৮
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৫৭, ৬৩১-৬৩৩
ধনরাজ গিরি ২৬৬
ধর্মেতিহাস সম্মেলন, প্যারিস ৫৯
ধীরানন্দ, স্বামী ১৩৭, ১৪৯, ২৫০
নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ৪৯১
নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ৬০১
নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৫৭৫, ৫৭৭
নফরচন্দ্র কুণ্ডু ৩৮৭, ৫৮৫
নবগোপাল ঘোষ ৫৯৭-৬০২, ৬১৪, ৬২৮
নবগোপাল মিত্র ৮
নবাই চৈতন্য (নবচৈতন্য) ৩৪৫, ৫৬৬
নবীনচন্দ্র চৌধুরী ১০০
নবীনচন্দ্র সেন ২৪৫, ৫১৫, ৬১৭
নরঋষি ১, ২২, ৬১, ১২১
নরাবতার অবতার দ্রষ্টব্য
নরেন্দ্র, বিবেকানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
নলিনী ৬৭৪
নাইটিঙ্গেল, ফ্লোরেন্স
নাগ মহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ) ৮৮, ১৪১, ৩৭১, ৪৫৪-৪৭৪, ৫৮২, ৫৮৮, ৫৯৩
নানসেন ২৭০
নারান (নারায়ণ) ৪৮৮
নারায়ণ (হঠযোগী) ১১০
নারায়ণ দাস ৩৩
নিউটন, হিবার ২৭০, ২৭২
নিকুঞ্জদেবী ১১৩
নিত্যকালী দেবী ১৭২, ১৭৭
নিত্য গোপাল, জ্ঞানানন্দ অবধূত দ্রষ্টব্য
নিত্যানন্দ (চৈতন্য পরিবার) ৫৪৯, ৬৮১
নিত্যানন্দ স্বামী ১৮৬
নিবারণ চন্দ্র দত্ত ৩০২, ৫৭০
নিবেদিতা, ভগিনী ৪৭, ৫২, ৫৪, ৮৪, ১৮৬, ৬০৫, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৬১, ৬৯১
নিরঞ্জন, নিরঞ্জনানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী ২৩, ২৬, ৪৯, ৭৬, ১০০, ১১৮, ১৫২, ১৪৩, ১৫৪-১৬৭, ২৩৭, ২৪০, ২৬১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৪২৫, ৪২৬, ৪৭৩, ৫২৭, ৫৬৪, ৫৭০, ৫৭৫, ৫৯৪, ৬২৩
নির্মলানন্দ, স্বামী ২৬৬, ২৭৬, ৩৪৫
নির্বেদানন্দ, স্বামী ৩২৯, ৩৩৪
নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী ১৯১
নীরদ ৬০১
নীলকমল ঘোষ ৫১১, ৫১২, ৫১৩
নীলমণি দেবী ২০৩, ২২০
নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়ি ৫৩, ১১৪, ১১৫, ১৮৬, ২১৬, ২৯৪, ৩০০, ৩৪২,

৩৫৪, ৪১২, ৪২০, ৪৭১, ৬৬২
নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত ৫৪২
ন্যাশন্যাল কলেজ ৬১৯
পওহারী বাবা ২৯, ২৩৬, ৩৭৫, ৪১১
পঞ্চদশী ২৬৮, ৩১৪
পতঞ্জলির মহাভাষ্য ৩২
পত্রাবলী ৫৪০, ৬০৪, ৬৭৬
পরমানন্দ, স্বামী ২৪৬, ২৭৭, ২৭৮
পরশুরাম ১৮৪
পল্টু (পল্টুবাবু) ১৯১, ৪৮৮
পশুপতি (বসু) ২৯৮
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১৬
পাণিনি ৩৩
পাণ্ডিয়া, সি. এইচ ৩৬
পার্কার, থিওডোর ৩৭৯
পার্কার, হার্শেল ২৭২, ২৭৫
পার্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায় ৬৭৬
পীটার্সন, সি. এফ ৩৫৯
পুরাণ ১০২, ২৫৫, ৪৯০, ৫০০, ৫০৬, ৫১২, ৬২৯, ৬৩২, ৬৬০
পুলিন মিত্র ২৫০, ৪৩৪
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ৪২৫-৪৩৫, ৪৮৮, ৬১৬
পূর্ণানন্দ, স্বামী ৬৯৩
প্যারীচাঁদ, মিত্র ১৫২
প্রকাশ, ব্রহ্মচারী ২৩৩, ২৬৭
প্রকাশানন্দ, স্বামী ৩৬১, ৩৬৫
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬০৪
প্রবুদ্ধ ভারত ৫৩, ২৪২
প্রভবানন্দ, স্বামী ৯৬
প্রমদাদাস মিত্র ৩০, ১৮২, ২৪০, ৩৪১
প্রসন্নকুমার মিত্র, ডাঃ ৬৫৬, ৬৫৭
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৫০৬
প্রসন্ননাথ মজুমদার ৬০৪
প্রসন্নময়ী ৬৯৫
প্রিয়বাবু, ডাঃ ২৬৬
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১১৯, ১২০
প্রীতরাম দাস (মাড়) ৬৩০, ৬৩১
প্রেমানন্দ, স্বামী ২৩, ২৬, ৬১, ৬২, ৭৬, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯২-৯৪, ১১৪, ১১৬, ১২৪-১৪৪, ১৪৭-১৫১, ১৫৫, ১৬৪, ১৮৯, ১৯১-১৯৩, ২১০, ২১৫, ২২৪, ২২৮, ২৪৬, ২৪৯-২৫১, ২৫৫, ২৬৫, ২৭৭, ৩০৫, ৩২৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৫৩, ৪০৫, ৪০৮, ৪১২, ৪৩৪, ৪৭৯, ৪৮৬-৪৮৮, ৪৯৭, ৫২৭, ৫৭১, ৫৭৬, ৫৮৪, ৬৬৫
প্লেটো ২৯৯
ফিলিপস্, মিস মেরি ২৬৯
বঙ্কিমচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়) ৫০৬, ৫০৭, ৫১৫, ৬১৬
বংশীদত্ত ১৬১, ১৬২, ১৮৪, ৩০৬, ৩৪২, ৪১২
বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৩৭৬
বঙ্গবাসী ৬১৯
বঙ্গবিদ্যালয় ১২৪, ২৫৮, ৩৮১
বদ্রীশা ১৮৩
বরদা রঞ্জন পাল ৪০৬, ৪০৮
বরাহনগর মঠ ৭৬-৭৮, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩৩, ১৬০, ১৬১, ১৮৩, ২০৯, ২১০, ২৩৭, ২৬৫, ২৬৭, ২৯৫, ৩১৭, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৭১, ৩৯৫, ৪৮৭, ৫০১, ৫৩১, ৫৮২, ৬০৯, ৬১০
বলরাম বসু ৩০, ৭৭, ৮০, ৯১, ১০৬, ১১৯, ১২৪-১২৬, ১২৮, ১৬০, ১৮১,

১৮২, ২২৬, ২৩৭, ২৯৭, ২৯৮, ৩১৪, ৪২৬ , ৪৬৯, ৪৭৫-৪৮৭, ৫০৭, ৫২০, ৫৩০, ৫৪০, ৫৬৪, ৫৭৭, ৬১৪, ৬২১-৬২৪, ৬৪৭, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৩, ৬৬০, ৬৮১, ৬৮২

বসুমতী (পত্রিকা) ৩০০, ৩৮৭, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬১৬-৬১৯, ৬৫৭

বাইবেল ২, ২০৪, ২৩৩, ২৩৮, ২৫৬, ২৭১, ৩১১, ৪৫০, ৪৫২, ৪৯০, ৫০০, ৫৮৭

বাবুরাম, প্রেমানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য

বামনদাস বসু, মেজর ৪১৫, ৪২২

বামাসুন্দরী দেবী ১৬৮-১৭০

বাল্মীকি ৫২৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৬, ৭৯, ৮০, ২৬৩

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী ৮৫, ৯৫, ১৩৪, ১৯৬, ২৬৬, ৩৯৯, ৪০৬-৪২৪

বিদ্যাপতি ৬৯৬

বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র) ২০, ৩৯০, ৩৯৪, ৪৮০

বিদ্যোদয় (পত্রিকা) ২৪০

বিনোদিনী ১৫৮

বিপিন ঘোষ, ডাঃ ৩৫২

বিবেকানন্দ, স্বামী ১-৪, বুদ্ধদেবের দর্শন ৫, ৬-১১; শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত ১২, ১৩-২০; খাপখোলা তলোয়ার ২১, ২২-২৪;—কে শ্রীশ্রীঠাকুরের শক্তিসঞ্চার ২৫, ২৬-৪১; চিকাগো ধর্মসভায় ভাষণ ৪২, ৪৩-৪৯; কলকাতায় সম্বর্ধনা ৫০, ৫১-৫৩; বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা ৫৪, ৫৫-৬১; চিরসমাধি ৬২, ৬৪, ৬৬-৬৯, ৭৫-৭৭, ৮২, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১১৪, ১১৬, ১১৭; সেবাই এযুগের সাধন ১১৯, ১২০-১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮-১৪১, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৫, ১৬০, ১৬৪, ১৭৯-১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ২০০, ২০৩, ২০৬-২০৯, ২১২-২১৮, ২২৭-২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭-২৪২, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৬-২৬৯, ২৭৩-২৭৫, ২৮৩, ২৯৪, ২৯৮-৩০২, ৩০৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০-৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩২, ৩৩৯-৩৪২, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৫-৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৮, ৩৯৬-৯৭, ৪০০-৪০২, ৪০৫, ৪১১-৪১৪, ৪১৯-৪২১, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩১-৪৩৩, ৪৬২, ৪৬৬, ৪৬৯, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০০, ৫০৩, ৫২৭, ৫৩১, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৮১-৫৮৪, ৫৯০, ৫৮৭-৫৯২, ৫৯৪, ৬০১, ৬০৩-৬০৫, ৬০৯, ৬১০, ৬১৩-৬১৭, ৬২৩, ৬২৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫২-৬৫৪, ৬৬১, ৬৬২, ৬৭৩, ৬৭৬, ৬৮০, ৬৯৩

বিবেকানন্দ সমিতি ২১৯

বিবেকানন্দ সোসাইটী (কলকাতা) ২১৯, ৪৩৩

বিবেকানন্দ সোসাইটী (মাদ্রাজ) ২৪২

বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির ২১৯

বিভীষণ ৪৯৬

বিমলানন্দ, স্বামী ২৩৮

বিরজানন্দ, স্বামী ৮৫, ১৩৪, ১৬১, ২১৩, ২৩৮, ২৩৯, ৩৪১, ৩৫৬, ৪১২, ৫০০, ৫৫৮, ৫৬৮

বিলিগিরি আয়াঙ্গার ২৪১, ২৪৭

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন) ২৩৫, ৪৫১

বিশ্বনাথ দত্ত ১-৩, ৬, ৮, ১০-১৩, ১৮, ২৫৮

বিশ্ববাণী ২৮০

বিশ্বমেলা (চিকাগো) ৪০

বিশ্বামিত্র (মুনি) ৪৯০

বিশ্বেশ্বরী ৬৯, ৭৩, ৫৬২, ৫৬৫

বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স ৫৬২

বেদ ৩৫, ৫১, ৫২, ১২০, ১২১, ২১৪, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮০, ৫৮৭

বেদ বিদ্যালয় ৬১

বেদান্ত ২২, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৫৫, ৫৭-৬০, ১৮৬, ১৮৭, ২১৩, ২৪৪, ২৫৬, ২৬২, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৮-২৭৪, ৩০৪, ৩০৬, ৩১১-৩১৪, ৩১৬, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩৬০, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭১, ৬২৫

বেদান্ত কেন্দ্র, পিটস্‌বার্গ ২৭৭

বেদান্ত কেন্দ্র, ব্রুকলিন ২৭৬

বেদান্ত সমিতি, ত্রিবান্দ্রম ২৪৫

বেদান্ত সমিতি, নিউইয়র্ক ৪৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ৩২০, ৩২১

বেদান্ত সমিতি ..শুন ২৭৮

বেদান্ত সমিতি, সানফ্রানসিস্কো ৩৫৯

বেণীমাধব পাল ৩৩৭

বেলুড়মঠ ৫৪, ৫৯, ৬০, ৮২, ৯১, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১২১ ১২৩, ১২৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৬০, ১৬৪-১৬৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬-১৯৮, ২১৬, ২২১-২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৭৯-২৮১, ৩২৭, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪১৬, ৪২১, ৫৭১, ৬০১, ৬০৫, ৬১০, ৬৮৬, ৬৯৩

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ১১৪, ১৩১, ১৫৭, ২১১, ২১২, ২৬৬, ৩৭৫, ৬০০

বৈষ্ণবচরণ ৪৩৯ ৫১০

বুদ্ধদেব ৫, ২৩, ১২১, ১৭১, ১৭৯, ২৬৪, ৩৭১, ৪১৭

বুদ্ধচরিত ২৬৪

বুল, সারা. সি ৪৭৯, ৬৫১

বৃন্দাবন চন্দ্র, কৃষ্ণ দ্রষ্টব্য

বোওয়া, জুল শ্রীযুক্ত ৫৯

বোধানন্দ, স্বামী ১৬৪, ২৩৮, ২৭৬-২৭৮

বোসপাড়ার বাড়ি (শ্রীশ্রীমায়ের) ১১৫, ১১৯, ১২২

ব্যাস ৫২৫

ব্রহ্মবাদিন ২৪২

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৬০৭

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ২৩, ৩১, ৩২, ৫১; শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ৬৩, ৬৪-৮৭, ৮৯-৯৯, ১১৪, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪১, ১৪৭-১৫০, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৪, ১৮১, ১৮৫, ১৮৮, ১৯১, ১৯৫, ১৯৭, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২২, ২৩৯, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১-২৫৩, ২৭৭-২৮০, ২৮৯, ২৯০, ৩০১, ৩০২, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৯-৩৩১, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৭৯, ৩৯২, ৩৯৪-৩৯৭, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৫, ৪১৪, ৪১৯, ৪২১, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৭, ৫০০, ৫০৭, ৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৮৪, ৬০১, ৬১০, ৬১৩, ৬১৬, ৬২৩, ৬২৮, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৬৩

ব্রাহ্ম সমাজ—১১, ১৫, ২১, ৬৪, ৬৬,

১৭২, ২০৪, ২৩২, ২৬৪, ৩৮৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৬০, ৪৯১, ৫১৭, ৫৪৫, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৬৮, ৫৮৮, ৫৮৯
ভক্তমাল (বৈষ্ণব সাধু) ১৩৪
ভক্তিযোগ ৪৭
ভগবদ দত্ত, পণ্ডিত ৪১৫
ভগবান দাস বাবাজী ১৭৯, ৪৪৭, ৪৮৩, ৫৭৫
ভট্টিকাব্য ৪৯০
ভবতারিণী দেবী ৬, ১২, ৬১৩, ৬১৪
ভবনাথ ৪২৫, ৪২৬, ৪৮৫, ৫৭০
ভাগবত ৭১, ১০১, ১০২, ১২৫, ২৯৭, ৩৩০, ৩৩২, ৩৮৯, ৪০২, ৪৩৯, ৪৫৯, ৪৮৮, ৪৯২, ৬৬২, ৬৮০
ভাগবতানন্দ, স্বামী ৬২৪
ভাস্কর সেতুপতি ৩৮, ৫০
ভাস্করানন্দ, স্বামী ১৩৪, ৪৯৭
ভুবনমোহন মিত্র ৫৫৮
ভুবনমোহিনী বসু ৪৮৬
ভুবনেশ্বরী দেবী ২, ৪, ৮, ৯, ১৯, ৪৯৭
ভূপেন্দ্র কুমার বসু ৪৮৬
ভৈরবী ব্রাহ্মণী ৪৩৯, ৪৪০, ৫৪৯, ৬৪৫
মণি মল্লিক ১৫৫, ৪০৮
মণিমোহন সেন ৪৫১
মণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত ৬০৭-৬১১
মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, মহারাজা ৩৮৪
মতিলাল নেহেরু ১৯৪
মথুরানাথ বিশ্বাস ৪৩৬-৪৩৯, ৪৫০, ৪৭৯, ৫৩০, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৩৮, ৬৩৯
মদনমোহন মালব্য ৪২২
মধুসূদন গুপ্ত ৪৮৯
মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠী ২৬৭
মণিশংকর, বিঠ্ঠলজী কবিরাজ ৩৭৭
মনু ৪৯০
মনোমোহন মিত্র ৬৪, ৬৫, ৭৪, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৫৮-৫৭১, ৬১৪, ৬২৭
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার ৬৮৭, ৬৮৯, ৬৯০
মহম্মদ ২৫৬
মহম্মদ আলি ১৯৪
মহাকালী পাঠশালা ৫২
মহাবীর ২৯১, ৪১৯, ৫০২
মহাবোধি সোসাইটি ৩৮৪
মহাভারত ২, ১০১, ৪৯০, ৫১২, ৬১৬, ৬২৯, ৬৪৩, ৬৬০, ৬৭৩, ৬৭৮
মহারাজা, আলোয়ার ৩২, ৩৩
মহারাজা, খেতড়ি ৩৩, ৩৪, ৪০
মহারাজা, নাটোর ৫১৫
মহারাজা, ভিঙ্গা ১৮৭
মহারাজা, মহীশূর ৩৭, ৩৮, ২৫৫
মহিমাচরণ ৭৪, ৫৯২, ৬০৯, ৬১০
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩১০, ৩১১
মহেন্দ্রনাথ ওয়াদেদার, ডাঃ ৪২৪
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মাস্টার মহাশয় দ্রষ্টব্য
মহেন্দ্রনাথ পাল, কবিরাজ ১০৬, ৩৩৬
মহেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ ২৬৪
মহেন্দ্রলাল কবিরাজ ৩৩৬
মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ ৭৬, ৬০৫
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৫০৬
মাইকেল ৫১৫, ৬১৬
মাতঙ্গিনী দেবী (ঘোষ) ১২৪, ১২৮
মার্থা ৬৬৯
মাস্টার মহাশয় (মাস্টার) ৭৪, ৮৯, ১১৪,

১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২৫, ১৩০-১৩২, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৪, ২২১, ২৬৫, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৯২, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩২, ৪৮৮-৫০৪, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৭০, ৫৮০, ৬০০, ৬০৩, ৬২৩, ৬৬৯
মিনিকুক, কুমারী ৩২২
মিন্টো, লেডি ১৯০
মৃচ্ছকটিক ৩৬৫
মেঘনাদ-বধ কাব্য ১৮২
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ১২৪
মেরি ৬৬৯
মৈত্রেয়ী ৬৫৮
মুগ্ধবোধ ৫, ২৫৯, ৬৭৮
মুলার, শ্রীযুক্তা ৪৬, ৪৭, ২৬৮
ম্যাকআর্থার, ধর্মযাজক ২৭১
ম্যাকলাউড, মিস ৪৭, ৫২, ৫৯, ২১৪, ২২৮, ৬৫১
ম্যাক্সমূলার, অধ্যাপক ৪৭, ২৬৯, ৬০৫
ম্যাককিনলে মিঃ ২৭১
ম্যাটসিনি ৩৮৬
যদু পণ্ডিত ১২৪, ২৫৮, ৬১২
যদুলাল (যদু) মল্লিক ১৫, ৫০৮, ৫৮০, ৬৮৪
যাজ্ঞবল্ক্য ৪৯০
যিশু, ঈশা দ্রষ্টব্য
যুগাবতার, অবতার দ্রষ্টব্য
যোগসূত্র ২৪২, ২৫৯
যোগানন্দ, স্বামী ২৩, ৫১, ৮২, ১০০-১০২, ১০৪-১১২; শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা ১১৩, ১১৪-১১৬; কৃষ্ণসখা গাণ্ডিবী অর্জুন ১১৭, ১১৮-১২৩, ১৬০, ১৬১, ১৮১, ২৬৫, ২৮৯, ৩৩৯-৩৪১, ৩৪৮, ৩৫৯, ৪০৫, ৪২৫, ৪২৬, ৫১৪, ৬০৫, ৬১০, ৬১৬, ৬৪৬, ৬৫১, ৬৬১
যোগীন-মা ১১৩-১১৫, ২১৩, ২১৭, ২২৩, ২২৫, ৬০১, ৬৫৬-৬৬৭, ৬৬৯, ৬৭২, ৬৭৫, ৬৯১
যোগীন্দ্র, যোগানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
যোগীন্দ্রনাথ সেন ৬০১
যোগেন মহারাজ, যোগানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
যোগেন্দ্রনাথ সেন ৮৫
যোগেশ্বরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী দ্রষ্টব্য
রঘুনাথদাস বাবাজী ৪৯৭
রঙ্গলাল (কবি) ৬১৭
রত্নাকর ৩০৬
রবীন্দ্রনাথ ৬১৭
রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি ৫০৬
রয়েস, অধ্যাপক ২৭৫
রসিক লাল চন্দ্র ২৫৮
রাইট, অধ্যাপক ৪১
রাইমণি (ঘোষ) ৫১২
রাখতুরাম, অদ্ভুতানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
রাখাল, ব্রহ্মানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
রাখালরাজ, কৃষ্ণ দ্রষ্টব্য
রাজচন্দ্র দাস (মাড়) ৪৩৭, ৬৩০, ৬৩১, ৬৮২
রাজনারায়ণ, গায়ক ৪৪২
রাজমোহন বসু ৫৫৮, ৫৫৯
রাজযোগ ৪৫, ২৭০, ২৭৮, ৩২৩
রাজা, মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
রাজা রামকৃষ্ণ ৫২২
রাজু গোমস্তা ১১৫
রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬২
রাধাকান্ত দেব, রাজা ৬৩১

রাধারমণ বসু ৬৮১

রাধামোহন বসু ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮৬

রাধারানী (রাধা) ২৮, ৮১, ১২৫, ১৩৪, ১৭৬, ২৮৫, ৩১৯, ৩৪৮, ৪৮৬, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৭

রাধু ২২১, ৬০৬

রানী ভবানী ৬২৯

রানী শঙ্করী ৬৩৪, ৬৩৫

রানী স্বর্ণময়ী ৬২৯

রানী হেমন্তকুমারী ৬২৯

রাম ৪, ২৫, ২৬, ৮৭, ৮৯, ১৫২, ১৭৩, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৯, ৩০৬, ৩৪৮, ৩৮০, ৩৮২, ৪০৭, ৪১০, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩, ৪৫৭, ৪৯০, ৫০২, ৫১৯, ৬৮৪

রামকানাই ঘোষাল ১৬৮-১৭১, ১৭৫

রামকুমার ৬৩৭

রামকৃষ্ণ ১, ৫, ৭, ১২-১৭, ১৯-২৬, ২৯, ৩০, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫১, ৫৫, ৬১-৭০; এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৭-৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৭-৯৯, ১০১, ১০২, ১০৭; বেদমূর্তি ১২০, ১২৫-১২৭, ১২৯-১৩২, ১৩৬-১৩৮, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২-১৬৫, ১৭১-১৭৩, ১৭৫-১৭৭, ১৮৩-১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯৬, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৫-২০৮, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৮, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৭-২৪৪, ২৪৯-২৫১, ২৫৯-২৬৪, ২৭৫;-র শতবার্ষিকী উৎসব ২৮১, ২৮৩, ২৮৫-২৯৫, ৩১২-৩১৭, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৫-৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৭-৩৭১, ৩৮০-৩৮৩, ৩৯০-৩৯৬, ৪০১, ৪০৩-৪০৫, ৪০৭-৪১১, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৪, ৪২৫-৪৩০, ৪৩২-৪৪৯, ৪৫১-৪৫৩, ৪৫৬, ৪৬০-৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৭-৪৯৭, ৪৯৯-৫১২, ৫১৯-৫৪১, ৫৪৫-৫৫৮, ৫৬১-৫৭১, ৫৭৫-৫৮৪, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৯২-৬১১, ৬১৩-৬২৮, ৬৩৭-৬৫১, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৭-৬৬১, ৬৬৩-৬৭১, ৬৭৩-৬৭৫, ৬৮২-৬৮৫, ৬৮৭, ৬৯০-৬৯৮

রামকৃষ্ণ (বসু) ৯০, ৩০৫, ৪৮৬

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম ২৮০

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্থি ভবন ২৪৫

রামকৃষ্ণ মিশন ৫১, ৫২, ৬১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১১৯, ১২১, ১৪৯, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৪, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৪২, ২৪৭, ৩৮৪, ৩৯৭, ৪১৯, ৫৫৮, ৬২৩

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম ২৪৫

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ২৩, ২৬, ৬১, ৭৬, ৮৬, ১৩৫, ১৫৯, ১৬০, ১৮৪, ২০৫, ২০৭, ২১৪, ২৩২-২৫৭, ২৫৯, ২৬২, ২৭৭, ২৯৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৮০, ৩৯৭, ৪৬৬, ৫৯৪

রামগীতা ৩১৩

রামগোপাল সেন ৫০৫

রামচন্দ্রজী, দেওয়ান ৩২

রামচন্দ্র দত্ত ৫, ১২, ১৫৮-১৬০, ১৭২, ১৭৬-১৭৮, ২৩৭, ২৬১, ২৬৫, ২৮৪-২৮৮, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬, ৩০০, ৩০৩, ৩৬৯, ৪৯৬, ৫০০, ৫০৪, ৫২১, ৫২৪, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪০-৫৫৮, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৪, ৫৬৬, ৫৬৮,

৫৬৯, ৫৭৯, ৬০০, ৬০৯, ৬১৪, ৬২৫, ৬২৭, ৬৪৩
রামদয়াল ৪৭৭
রামদয়াল চক্রবর্ত্তী ১২৬, ১২৭
রামমোহন (দত্ত) ১
রামলাল ৭১, ৮৮, ৯৬, ৯৭, ১০৯, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৯, ৫২২, ৬০০, ৬২০, ৬৮৩, ৬৯৪, ৬৯৫
রামলাল ঘোষ, ডাঃ ৬০১
রামপ্রসাদ ৫২২, ৬৭৫, ৬৯১,
রামানন্দ ৪৯২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪০৬
রামানুজ ৯৫, ২৫৬
রামায়ণ ২, ৪, ১০১, ৩৮৭, ৪২৩, ৪৯০, ৫১২, ৬২৯, ৬৪৩, ৬৬০, ৬৭৮
রামেশ্বর ৬৯৪, ৬৯৫
রাসমণি, রানী ১০১, ১১০, ১৬৮, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৮৯, ৬২০, ৬২৯
রোনাল্ডসে ২২৯
রোমাঁ রোলাঁ ১৭৬
রুজভেল্ট থিওডোর ৩৬৫
লক্ষ্মণ ৩৬৯, ৪১৯, ৪৯০
লক্ষ্মীদেবী ১১৩, ১১৪, ৬৯১-৬৯৮
লয়জন দম্পতি ৫৯
ললিত বিস্তর ২৬৪
লাটু, অদ্ভুতানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
লাবক ৩১
লালাবাবু ৬৬১
লাঁফ, ফাদার ২০৪
লীলাপ্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ) ১২, ৩৪, ১০০, ১১০, ১১১, ১২৭, ১৫৬, ১৫৭, ২২১, ২২২, ২৩৫, ২৬২, ৩১৩, ৩৪৮, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৫০, ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮২, ৫১১, ৫৩০, ৫৩২, ৫৪০, ৫৯৫, ৬০০, ৬২৪, ৬৩৫, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৬, ৬৫৫, ৬৫৮, ৬৬২, ৬৬৩
লুক ৬৬৯
লেগেট, শ্রীযুক্ত ৪৭, ৫৮, ৫৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ৩২০
লেগেট, শ্রীযুক্তা ৪৭, ৫৮, ৫৯
লেভিঞ্জ. মি. ৩৫৮, ৩৮৪
লোগান, এম. এইচ, ডাঃ ৩৫৯
ল্যানম্যান, অধ্যাপক ২৭৫
ল্যানস্‌বার্গ, হার লিঁও (কৃপানন্দ) ৪৭
শংকর পান্ডুরঙ্গ ৩৫, ২৬৭
শংকরজী শেঠ ৩৭৮
শংকরাচার্য ৩৬, ১২১, ২৫৯, ৩৩৪, ৪৬২, ৫২৭
শংকরানন্দ, স্বামী ৩২৮, ৩৯৭, ৬৯৮
শংকরানন্দ, স্বামী (বেদান্তমঠ) ২৬২, ২৬৭
শকুন্তলা ৪৯০
শচীদেবী ৫৭২
শচীন্দ্র ২২৫
শম্ভুচরণ মল্লিক ৪৫০-৪৫৩, ৪৭৯, ৫৩০
শরৎ, সারদানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
শরৎচন্দ্র গুপ্ত (গুপ্ত মহারাজ), সদানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫১, ৫২, ৪০৩, ৪৭৪, ৫৭০, ৫৯০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪৫
শরৎচন্দ্র মিত্র ৪১৪
শর্মিষ্ঠা ৫১৫
শশধর তর্কচূড়ামণি ২৫৯, ৩০১

শশিভূষণ ঘোষ, ডাঃ ৩৫৮
শশী, রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
শশীভূষণ রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য
শান্তি আশ্রম ২৭৫, ৩২৩, ৩২৫, ৩৬৪, ৩৬৬
শান্তিরাম ঘোষ ১২৪
শিবকৃষ্ণ মিত্র ৩৪৭
শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্, ৩১৭, ৪৩৯
শিবরাম ৬৯৪
শিবসংহিতা ২৫৯, ৬১২
শিবস্বামী আয়ার, পি. এস. ২৪৭
শিবানন্দ, স্বামী ২৩, ২৬, ২৯, ৮১, ৮৬-৮৮, ১১২, ১১৮, ১২৩, ১৪৭-১৫০, ১৬০, ১৬৫, ১৬৮-১৭৭, ১৮০-১৯৫; মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ১৯৬, ১৯৭-২০২, ২২৯, ২৩০, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৯৭, ৪০১, ৪০৪, ৪১২, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৬, ৪৮৭, ৫৩০, ৫৮৪, ৬১১, ৬২৩, ৬৫১
শিশির কুমার ঘোষ ৫২০
শুকদেব ২৪, ১০০, ১২১, ৩১৩, ৪৯২
শুক্ল যজুর্বেদ ৬১
শুদ্ধানন্দ, স্বামী ৬১, ১৬২, ২১৯, ২৯৬, ৩০১, ৩৫৯
শুভানন্দ, স্বামী ১৬২
শূদ্রক ৩৬৫
শেষাদ্রি আয়ার, স্যার কে ৩৭
শ্যামবসু ৪৩৪
শ্যামাসুন্দরী মিত্র ৬৫, ৬৯, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৫
শ্যামাদাসবাবু, কবিরাজ ৯৮, ৪০৪
শ্রীগৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব দ্রষ্টব্য
শ্রীধর স্বামী ৪০২, ৪০৩
শ্রীনিবাস বাবাজী ৫৪২
শ্রীবাস ৫০৫
শ্রীম, মাস্টার মহাশয় দ্রষ্টব্য
শ্রীমতী, রাধারানী দ্রষ্টব্য
শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬৭
শ্রীরাধিকা, রাধারানী দ্রষ্টব্য
শ্রীরাম মল্লিক ৬৬৭
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত ৫৫৪, ৬০০, ৬১৪, ৬১৫
শ্রীশচন্দ্র বসু ৪১৫
শ্রীশ্রীঠাকুর, রামকৃষ্ণ দ্রষ্টব্য
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, চৈতন্যদেব দ্রষ্টব্য
শ্রীশ্রীমা (মাতাঠাকুরানী) ৩৯, ৬৯, ৭৭, ৮২, ৮৯, ৯১, ৯৪, ১০৮, ১১৩-১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৬৪-১৬৬, ১৭৬, ১৮৪, ১৯৬, ২০৬, ২১৩, ২১৭, ২১৯-২২৩, ২২৭-২২৯, ২৩১, ২৪৫, ২৪৮-২৫০, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৯১, ২৯৩, ৩০২, ৩০৪-৩০৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৯২, ৩৯৬, ৪০১, ৪১৪, ৪২৭-৪২৯, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৭১, ৪৭২, ৪৮৫-৪৮৭, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫০৪, ৫২৭, ৫২৮, ৫৭০, ৫৮১, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬০১, ৬০৬, ৬০৮, ৬০৯, ৬১১, ৬২৬, ৬৪৬, ৬৪৯, ৬৫৪-৬৬৬, ৬৬৯-৬৭৬, ৬৮৩-৬৮৫, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯১-৬৯৩, ৬৯৫, ৬৯৬
শ্রীশ্রীমুম্বাদেবী ৭৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৪২৬, ৪৭৭, ৫১১, ৫৩৩, ৫৯২-৫৯৫, ৬০৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত ৪৭৭, ৪৭৯, ৫৩৭
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ৫৮৭
সংবাদ প্রভাকর ৫১৩, ৬১০
সচ্চিদানন্দ, স্বামী (দীনুমহারাজ) ২১২, ২৩৯, ৩৪১, ৩৬০
সঞ্জীব চন্দ্র ৬১৭
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০৮, ৬১৯
সৎকথা ৩০৮
সদ্ভাবানন্দ, স্বামী ৩৩৩
সদানন্দ, স্বামী ২৮, ২৯, ১৬০, ১৮২, ১৮৬, ২১৬, ২৪০, ২৪১, ২৬৬, ৩৮২, ৬৫১,
সদাশিবানন্দ, স্বামী ৪১৬
সনাতন মল্লিক ৪৫০
সলিমুল্লা, নবাব ১৪৯
সহচরী ৪৪২
সাংখ্য ৩১৪
সায়ন ভাষ্য ৫১
সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন ২৬৪
সারদানন্দ, স্বামী ২৩, ২৬, ৩১; লণ্ডনে ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার ৪৮, ৭৪, ৮৩, ৮৭, ৯০, ৯৪, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১৩৩, ১৪১, ১৪৫, ১৫১, ১৮৭, ১৯১, ১৯৯, ২০৩-২৩৭, ২৪০, ২৬৫-২৬৮, ২৭০, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৮-৩০০, ৩০২, ৩১৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫২, ৩৭৫, ৩৯৭, ৪০১, ৪০৬, ৪০৮, ৪০৯, ৪২১, ৪৭৪, ৫৩০, ৫৮৪, ৬১০, ৬২১, ৬২৪, ৬৫১, ৬৫২, ৬৬৩, ৬৬৫, ৬৬৬
সারদাপ্রসন্ন মিত্র, ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য
সালজার, ডাঃ ২৪১
সিদ্ধেশ্বর মজুমদার ৪৯১
সিরাপিস ৭
সীতা ৪, ২৮৪, ৩৬৯, ৪১৯, ৪২৩
সীতারাম, পণ্ডিত ৩৭৯
সীতারাম বাবু ১১৮, ২১২
সুজাতা ৬২৬
সুদামা ৪৯৮
সুন্দররামন আয়ার, অধ্যাপক ৩৮
সুলভ-সমাচার ৫০৬, ৫৭৭
সুবোধানন্দ, স্বামী ৭৮, ৭৯, ১৬৬, ২৯৩, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৮১, ৩৮৯-৪০৫, ৪১২, ৪৮৮
সুরদাস ৩৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩১২, ৫৭২, ৫৭৩, ৬১৩
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরেশ) ১২, ২৬, ৩০, ১৫৪, ১৮৩, ২৩৮, ৪৭৯, ৪৮৭, ৪৯৭, ৫০৭, ৫৩০-৫৪১, ৫৬৪, ৫৬৭, ৬১৪, ৬২৭
সুরেন্দ্রনাথ রায় ২২০
সুরেশচন্দ্র দত্ত ৩৯০, ৪১৮, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৪, ৪৬৫, ৫৮৭-৫৯১, ৬০৪
সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ১৪৩, ৬১০, ৬১৬, ৬১৮, ৬১৯
সেণ্ট পিটার ২১৪
সেভিয়ার, মিসেস ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৮৬

সেভিয়ার, মিঃ ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৯
স্বরূপ (শ্রীচৈতন্য পার্ষদ) ৪৯২
স্বরূপানন্দ, স্বামী ৫৩
সৌরীন্দ্র ঠাকুর ১১৫
স্পেনসার, হার্বার্ট ৪৯২
স্টার্ডি, ই. টি ৪৬, ৪৭, ১৮৪, ২১৩, ২৬৯
হনুমান, মহাবীর দ্রষ্টব্য
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫০৬
হরমোহন মিত্র ২১৩, ২৯৭, ৩৫৮, ৫৮৭, ৬০০, ৬০৩-৬০৬
হরি সিং লাডখানি ৩৭৯
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৩৬
হরিদাস বিহারিদাস, বাবু ৩৫৬
হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুরীয়ানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
হরিপদ ব্রহ্মচারী ১৬৬
হরিপদ মিত্র ৩৬, ৩৭
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
হরিবল্লভ বসু ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৬
হরিশ ৩৪৮, ৩৭০, ৫৭৬
হরেকৃষ্ণ দাস ৬২৯, ৬৩০
হলধর সেন ৫৯২
হাউইসন, অধ্যাপক ২৭৫
হাজরা (প্রতাপচন্দ্র হাজরা) ১২৯, ৪৬০, ৫০৮
হাফেজ (কবি) ২
হারান ৬০০, ৬০১
হিতবাদী ৬১৯
হুইলার, বেঞ্জামিন আইডি ৩৬৫
হুইলার, মিসেস ২১৩, ২৭০, ২৭২, ৩২১
হট্‌কো গোপাল ২৩
হৃদয় (হৃদে/হৃদয়রাম) ৭৩, ২৮৮, ৩১৩, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৭৮
হেগেল ৪১০, ৪৯২
হেমচন্দ্র (কবি) ৬১৭
হেমাঙ্গিনী দেবী ৫১
হেরম্ব পণ্ডিত ২৫৮
হেল, মি. জর্জ ডব্লিউ ৪১
হেষ্টি, অধ্যাপক ১৮